আয়ুর্ব্বেদ।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

সম্পাদকগণ—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম-এ, এম-বি

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

তৃতীয় বর্ষ।

(সন ১৩২৫ আশ্বিন হইতে ১৩২৬ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ৩৷৵

কলিকাতা।

১২৪।২।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট—সংস্কৃত প্রেসে কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায়
কবিরত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট—
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে মুদ্রাকর
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী।

(বর্ণমালানুসারে)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—আশ্বিন। | ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

—:*:—

যে গান গাহিয়া 'হিরণ্যগর্ভ' মুগ্ধ করিলা বিশ্ব,
যে গান শিখিতে 'দক্ষ' সানন্দে হইলা 'তাঁ'র শিষ্য।
যে গান আবার 'অশ্বিনীকুমার' করিলা ছু'য়ে শিক্ষা,
যে গান আবার তাঁদের সনে 'ইন্দ্র' লইলা দীক্ষা।
যে গান শিখিয়া 'আত্রেয়' ঋষি রক্ষা করিলা আর্ত্তে,
যে গান 'অনন্ত'—'চরক' হ'য়ে আনিলা এই মর্ত্তে।
যে গান শুনাতে 'ধন্বন্তরি'র 'দিবোদাস' রূপে জন্ম,
যে গান শিখিয়া 'সুশ্রুত' ঋষি বুঝা'ল তাহারি মর্ম্ম।
যে গান শুনিয়া প্রাচ্য জগত দীক্ষা লইল তা'র,
যে গান সমগ্র বেদেরি ব্যাখ্যা—বেদত্রয়ের সার।
যে গানের মূল—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ উঠুক ফুটি,
যে গানের তানে স্বাস্থ্যরক্ষার শিক্ষা উঠিছে ছুটি।
যে গানে বিজ্ঞান প্রদানি' আলো দীপ্ত করিল দেশ,
যে গানে মুমূর্ষু প্রাণ পাইয়া ছুটায় হাস্য রেশ।
যে গান শুনিয়া নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন বয়,
যে গান জানায় রোগ নাশিয়ে আয়ুর্ব্বেদের জয়।

সে গান গাহি এ সবে মিলি আবার নূতন বর্ষে,
অমৃতবর্ষণ আবার হ'বে—বিশ্ব মাতিবে হর্ষে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

"আয়ুর্ব্বেদে'র নববর্ষ।

—০*০—

আজি আবার আমাদের নববর্ষ। আশ্বিনে আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া, শ্যামল শস্য সম্ভারের ডালি সাজাইয়া, ধরিত্রী হাসিতেছে। কাননে কাননে রক্তজবা ফুটিয়া, —পুষ্করিণী গুলিতে ইন্দিবর স্তবক প্রস্ফুটিত হইয়া,—বৃক্ষবাটিকায় নবপল্লবে বিশ্ব বিটপি সজ্জা-সম্পদে সৌন্দর্য্যশালী হইয়া, মায়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।—সুকুমার মতি বালকবৃন্দ নবীন পরিচ্ছদে অঙ্গ সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য আশার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।—কর্ম্মকুশল-কেরাণীকুল আকুল অন্তরে অবকাশের দিন গণনায় সময়ক্ষেপ করিতেছে।—পল্লীপ্রান্তরে নবোঢ়া পত্নী প্রবাসী পতির আসঙ্গ-কামনায় অবশ-অলস-দেহে অধীর হইয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্যদানের কালে তাহার চাঞ্চল্য দর্শনে তাহাকে প্রহারোন্মত্তা হইতেছেন। কোনো যুবতী বহুকাল বিরহ সহিয়া, মিলনের দিন নিকট জানিয়া আনন্দে এরূপ বিহ্বলা হইয়াছেন যে, রন্ধন সময়ে ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য করিয়া বসিয়াছেন—ফলে সেজন্য তদীয়া শশ্রূদেবী তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিতেছেন। কোনো প্রৌঢ়া রমণী অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্দ্ধেক রাজত্ব সহ এক রাজকন্যা আনিয়া জীর্ণ প্রাসাদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্ত্বের চিন্তায় জাগ্রত অবস্থাতেই যেন স্বপ্ন জালে মিশিয়া পড়িয়াছেন। কোথাওবা দীন-দরিদ্র-ভক্ত-সাধক তাহার প্রাণান্ত পরিশ্রম লব্ধ অর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, সম্বৎসরে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত করিয়াছে, তদ্বারা জগজ্জননী—শিবমনোমোহিনীকে জীর্ণ আটচালায় আনিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বোধনের অপেক্ষা করিতেছে। এম্‌নি দিনে আজি আমাদের আবার নববর্ষ। দুইবৎসর পূর্ব্বে—এমনই দিনে—এমনি সময়ে আমরা "আয়ুর্ব্বেদে"র উদ্বোধন আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইহার উদ্‌যাপন নাই, চিরদিনই এই ব্রত পালন করিয়া যাইব—জীব কুশলেচ্ছু ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষির প্রগাঢ় জ্ঞান গভীর-গবেষণা সম্ভূত উপদেশরাজি স্মরণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহারই পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক, পতিত—অধঃপতিত —স্বাস্থ্যহীন—অল্পায়ু বাঙ্গালী জাতির কল্যাণ কামনায় চিরদিনই ঋষিপন্থা অনুসরণ করিব— ইহাই আমাদিগের ব্রতপালন। সুতরাং এ ব্রত পালন করিতে হইলে ইহার আদি আছে—অন্ত নাই,—আরম্ভ আছে—পরিসমাপ্তি নাই,—উদ্বোধন আছে—উদ্‌যাপন নাই।

একদা যে সময়ে আমাদের দেশ ধর্ম্ম কর্ম্মের আদর্শস্থান বলিয়া গর্ব্বপ্রবণ ছিল,—আহারে-বিহারে, কর্ম্মে-বিশ্রামে, ক্রীড়ায়-পরিহাসে যে সময় দেশের মধ্যে ব্যভিচার-স্রোত বাত্যা বিক্ষুব্ধভাবে প্রবাহিত হয় নাই, —শিক্ষাকাল হইতে সূচনা করিয়া, কর্ম্মকালের সকলটুকু যে জাতি শাস্ত্রোপদেশের প্রত্যেক অক্ষর মানিয়া চলিত,—বার্দ্ধক্যে যে জাতির বানপ্রস্থের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইত,—পতি-বিয়োগে যে জাতির পত্নী জলন্ত চিতায় আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক সতীধর্ম্মের আহুতি প্রদান করিত,—অভক্ষ্য ভক্ষণ—অখাদ্য ভোজন তো পরের কথা—যে স্থানে অখাদ্য-কুখাদ্য রন্ধন হইত—সেস্থান দিয়া গমনের ফলে 'পিরালী' বলিয়া যে জাতির মধ্যে একদা এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সে ধর্ম্মপ্রাণ-কর্ম্মকুশল সর্ব্বশক্তিমান জাতির বংশধর হইয়া, অধুনা আমরা দৈনন্দিন যে পাপ-পণ্য অর্জ্জন করিতেছি,—তাহারই ফলে আজি আমাদের আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিলাস-পরিতৃপ্তির জন্য—অদম্য আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য—অতৃপ্ত পিপাসার আহুতি সম্পাদনের জন্য অধুনা আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম - কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম মনে না করিয়া অখাদ্য—কুখাদ্য অমিত—অহিত—সকল দ্রব্যই ভক্ষণ করিতেছি।—পানে-ভোজনে, বাহ্যদৃশ্যে আত্মার পরিতৃপ্তিই এক্ষণে আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়াছে,—স্থান নাই—কাল নাই,—ভালমন্দের বিচার বুদ্ধি নাই—যেরূপ ভাবেই হউক আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা পরিপূর্ণ করিতে পারিলেই হইল!—আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা—আমাদের প্রাণস্পর্শী স্পৃহা—তা' যেমন করিয়া হউক মিটাইতে পারিলেই হইল! এই না হইয়াছে আমাদের অবস্থা। ফলে এই অবস্থার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় সংঘটন সম্ভব—আমাদের ঘটিয়াছে তাহাই। তাহারই ফলে সোণার বাঙ্গালা আজি আধি-ব্যাধির লীলা নিকেতন—জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালা-বশেষ প্রতিকৃতির জলন্ত আদর্শভূমি!—বাঙ্গালা জুড়িয়া শ্মশান ভূমির আর্ত্তনিনাদ!

বাঙ্গালার কিছু নাই, বাঙ্গালার আবহাওয়া একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার সন্তানগণের পরমায়ু আগে আশী নব্বই—একশ' বছর পর্য্যন্ত ছিল,—এখন তাহাদের পরমায়ুর হিসাব ঊর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশৎ। তাহাদের আবার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিতেছে—তাহাদের অনেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, অদৃষ্টবশতঃ—পরমায়ুর জোড়ে যাহারা না মরিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—প্লীহা-যকৃৎ তাহাদের গ্রাস করিয়া বসিতেছে! তাহার পর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর-যৌবনের সন্ধি ক্ষণে উপনীত হইবামাত্র ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হওয়ার ফলে অজীর্ণ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য রোগাক্রান্ত হইয়া সংসার সুখের বিষম অন্তরায় ঘটাইয়া জীবনযাপন ভীষণ দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালী যে আজি এত যক্ষ্মারোগাক্রান্ত—বহুমূত্র বা ডাইবিটিসে আজি বাঙ্গালার যে অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছে, সরকারি বাতুলা-লয় সমূহে বাঙ্গালীর সংখ্যা যে সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে,—বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ।

দেশের মহিলা কুলের অবস্থা আরও শোচনীয়। পুরুষ অত্যাচারী হউক—কদাচারী হউক—ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া কুকর্ম্মনিরত হউক,—কিন্তু পুরুষ যখন স্বীয় কুকর্ম্মের ফলে ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া অশান্তি উপলব্ধি করে—

তখনই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া প্রতি বিধানের ব্যবস্থার জন্য প্রয়াসপরায়ণ হয়। রমণীর নিকট কিন্তু সেইটিরই অভাব। অধুনা পুরুষ সম্প্রদায়ের মত রমণীগণও অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে পারেনা,—অবশ্য দেশের পুরুষগণই সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু যে কারণেই হউক দেশের মহিলাকুলের অবস্থাও পুরুষদিগের মত দাঁড়াইয়াছে। মহিলা দিগেরও অধিকাংশ নানারূপ রোগে আক্রান্ত, কিন্তু আরোগ্যের জন্য তাহাদের যত্ন নাই,—চেষ্টা নাই, প্রতীকারের ব্যবস্থা নাই। কাজেই দেশের অবস্থা—বাঙ্গালার অবস্থা—আমাদের জননী জন্মভূমি মাতৃভূমির অবস্থা বড়ই বিপদ সঙ্কুল! কলুষ-পঙ্কিলে দেশমাতৃকার সন্তানগণ প্রায় জানুদেশ পর্য্যন্ত মজ্জমান হইয়া পড়িয়াছে,—এ সময় তাহাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার। বেদ বিহিত সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিয়া—দেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে তাহাদের প্রকৃত সরণি দেখাইয়া দিতে হইবে,—শুধু দেখাইলেই হইবে না, সরণি দেখাইয়া দিয়া সেই মার্গ অনুসরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ" সেই পরামর্শ-সভার কর্ণধার। আয়ুর্ব্বেদের উপদেষ্টা স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ। আয়ুর্ব্বেদের বনজ ভেষজ সমূহের বৃক্ষবাটিকা সেই পরমেষ্টিরই চিত্রকলায় পরিপূর্ণ। আয়ুর্ব্বেদের দিব্যৌষধি সেই আত্মভূর কমণ্ডলু হইতেই নির্গত হইয়াছে। দেশরক্ষা করিতে হইলে, দেশবাসীর সম্মুখে আবার সেই ব্রহ্মার কমণ্ডলু-নিঃসৃত দিব্যৌষধি সকল ধারণ করিতে হইবে। এককথায় ইহাই আমাদের জীবন ব্যাপি মহাব্রত। কাজেই এ ব্রতের উদ্বোধন আছে, কিন্তু কোনোকালেই ইহার উদযাপন হইবে না।

আয় মা।

—:*:—

আয় মা আনন্দময়ী নিরানন্দ বঙ্গে,
দনুজ দলনী দেবী —দেবদূত সঙ্গে।
পাইয়া তোমার সাড়া, বঙ্গবাসী মাতোয়ারা,
বাঙ্গালীর প্রাণ আজি পুলকিত রঙ্গে,
রোগ-শোক-জ্বালা তা'র নাই যেন অঙ্গে।

রোগে জীর্ণ তনুখানি—মলিন বদন,
সব যেন ভুলে গেছে দেখে শ্রীচরণ।
পেটে অন্ন নাই তা'র, বস্ত্রাভাবে হাহাকার,
অভাব—অভাব শুধু—শুধু অনটন,
তবু তোরে পেয়ে আজি হরষে মগন।

প্রতি বর্ষে আস তুমি—প্রতি বর্ষে যাও,
তিনটি দিনের তরে শুধু দেখা দাও।
সে দর্শনে উথলিয়া ওঠে মা বাঙ্গালী-হিয়া,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—যা'র দিকে চাও—
এক সুরে বাঁধা মাগো দেখিবারে পাও।

কিন্তু মা চাহিয়া যদি দেখ ভাল ক'রে,
বুঝিবে কি জ্বালা বয় বাঙ্গালীর ঘরে।
হৃদয়েতে বল নাই, মনে কারু শান্তি নাই,
উৎসাহ—উদ্যম তা'র গেছে দূরে স'রে,
স্বাস্থ্য সুখে সুখী যেন নহে নারী নরে।

কিরূপেতে রবে স্বাস্থ্য ?—খাদ্য যে মা নাই,
অমৃতের আস্বাদন আর নাহি পাই।
দুগ্ধ বা অমৃত পিয়ে বাঙ্গালী রহিবে জীয়ে,
সে দুগ্ধ নাহিক দেশে—বল কিবা খাই ?
ঘৃত তো ভেজালে পূর্ণ—বল কিবা চাই ?

সাত্বিক আহার তাই গিয়াছে উঠিয়া,
অখাদ্য—কুখাদ্য সেবী বাঙ্গালা জুড়িয়া।
'চা'য়েতে উদরপূর্ত্তি হোটেলে খাইয়া স্ফূর্ত্তি,
দোকানের রাধা-মাংস নিতেছে লুফিয়া,
বাঙ্গালীর কথা আর কি কব খুলিয়া !

নিজ কর্ম্মদোষে মরে বাঙ্গালী এখন,
রক্ষা আর নাই তা'র আসন্ন মরণ।
খাটিবার শক্তি নাই— অকাল বার্দ্ধক্য তাই,
বাঙ্গালী শিশুর মৃত্যু তাই অগণন,
কোনোদেশে কোনোজাতি মরেনা এমন !

কোন্ দেশে অজীর্ণেতে এত লোক মরে ?
কোন্ দেশে দুর্ব্বলতা প্রতি ঘরে ঘরে ?
সোণার এ বঙ্গভূমি, জানমা সকলি তুমি
বিধবা বালিকা কত চক্ষের উপরে—
দেখা নাহি যায় আর,—দে উপায় ক'রে।

যা'দের আনন্দময়ী জননী গো হয়,
আনন্দ তা'দের কাছে কেন নাহি রয় ?
এক বর্ষ পরে আজি এলি মা আবার সাজি,
নানা উপচারে পূজি চিতে সাধ হয়,
কিন্তু মা চাহিয়া দেখ্ সব শূন্যময়।

অর্থ নাই—শক্তি নাই—মনও বুঝি নাই,
তা'রি ফলে আজি মোরা এত দুখ পাই।
দে অর্থ আবার আনি, দে শক্তি শক্তির রাণি,
দে বাসনা জাগাইয়ে পদেতে লুটাই,
মরমের অভিলাষ—এইমা, জানাই।

তুমি শক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি মোক্ষ—সব,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি তোমাতে উদ্ভব।
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, বায়ু ব্যোম, তুমি ক্ষিতি,
তোমারি যে প্রতিমূর্ত্তি বিশ্বের বিভব,
ব্যাধি হ'য়ে ব্যাধি নাশ'—এতই সম্ভব।

'আয়ুর্ব্বেদ'—যাহা হ'তে বিশ্ব ঝলকিছে,
তা'তেও তোমারি মাগো মহিমা ক্ষরিছে।
জল হ'য়ে ছিলে তুমি, ছিলনা তখন ভূমি—
'কেশব' তখন ইহা করিলা উদ্ধার,
মৎস্যাবতার তাই হইল প্রচার।

দে মা পুনঃ বল চাহি তোমার সদনে,
'মানুষ' করিয়া তোল্ প্রতি জনে জনে।
প্রতিবর্ষে আনি তোমা পূজি শিব মনোরমা,—
অবহিত মতি রাখি ওই শ্রীচরণে,
ধর্ম্ম যেন নাহি ভুলি জনমে-মরণে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য।

—:*:—

"আজকাল বাঙ্গালা দেশে নব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কথায় কথায় ডাক্তার বাবুরা বিলাতী ফুডের ব্যবস্থা করিয়া বসেন। কিন্তু সকলেরই

ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের দেশের উপযোগী ভাবে ঐ সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত কি না?

রোগীর পথ্যমধ্যে বঙ্গদেশস্থ পল্লীগ্রাম সমূহে দুগ্ধই অধিক ব্যবহৃত হয় ও চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সদ্য দোহন করা টাট্‌কা দুগ্ধ ফুটাইয়া রোগীকে খাওয়াইলে যে উপকার পাওয়া যায়, অন্য কোনরূপ বিলাতী দুগ্ধের দ্বারা সেরূপ উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অনেকে বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া বিলাতী দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহা আমাদের দেশে কিরূপ কার্য্যকরী। আমাদের দেশস্থ খাঁটী দুগ্ধ রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে তাহাতে ৪ প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়, যথা—কেজিন্, চর্ব্বিময় পদার্থ, ক্ষীরশর্করা এবং জল। আর জমান দুগ্ধ পরীক্ষায় উপরোক্ত দ্রব্য ছাড়া কেন্‌সুগার, ক্ষারময় পদার্থ, ও ফস্‌ফরিক্ এসিড্ অতিরিক্ত বর্ত্তমান থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের উপাদানগত পার্থক্য কিরূপ? আমাদের দেশের জিনিষই আমাদের পক্ষে প্রকৃত উপকারী। সকলেই দেখিয়াছেন যে, প্রাতঃকালের দোহন করা দুগ্ধ যদি বহুক্ষণ ফেলিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহা ছিটিয়া যায় বা কাটিয়া যায়, কিন্তু এই তিন চারিমাস বা আরও অধিক দিনের দুগ্ধ কি অবিকৃত ভাবে থাকিতে পারে? আরও এককথা, একটিন দুগ্ধ এক দিনে প্রায় খরচ হয় না, সে অবস্থায় তাহা খুলিয়া রাখিলে তাহাতে নানাবিধ জীবাণুর বাসভূমি হইয়া থাকে। অতএব ইহা ব্যবহার করা যে ন্যায়সঙ্গত নহে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

যখন আমাদের এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পরিবর্ত্তে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হইত, তখন এত অধিক পথ্য-বিভ্রাট হইত বলিয়া মনে হয় না। সে সময় আমাদেরই দেশস্থ যবের পালো, সাগুদানা, খৈ, মুগসিদ্ধ, পল্‌তার বড়া, মসুরের যূষ, দুগ্ধ, দধি, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আজ থিন্‌এরারুট-বিস্কুট, বেঙ্গার্স ফুড, ইত্যাদি নানাবিধ পথ্য আসিয়া দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মুরগীর যূষ খাওয়াইয়া, কেহ কেহ এসেন্স অব্ চিকেন ব্যবহার করিয়া, তাড়াতাড়ি রোগীকে বল প্রদান করিতেছেন। সদাচার বলিয়া হিন্দুর যে একটা জিনিষ ছিল, তা' আজ ম্লেচ্ছাচারে পদদলিত হইতেছে। যখন এসব পথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কি মৃত্যুসংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল? কখনই না। ইহাতে দোষ কাহার? সকলেই এক বাক্যে উত্তর দিবেন—দোষ আমাদেরই, কেননা আমরাই নূতন সভ্যতানুসারে বিলাসিতার চরম সীমায় উপনীত হইবার বাসনা করিয়া উৎসন্ন যাইতেছি। আমাদের কি ছিলনা,—বা কি নাই, সবই আছে,—গিয়াছে কেবল আমাদের সেই সেকালের বিশ্বাস। এক বিশ্বাসহীন হইয়াই আমাদের এই অবনতি। আমাদেরই দেশের জিনিষ ভালভাবে লেবেল দিয়া উত্তম শিশিতে প্যাক্ হইয়া বিদেশ হইতে ফেরৎ আসিতেছে; তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেরই চক্ষু ফুটিতেছে—"নূতন কিছু করো একটা নূতন কিছু করো"—এ কথাটার পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে পুরাণোর আদর দেখা যাইতেছে। আমাদের সেই মসুরের যূষের পরিবর্ত্তে এসেন্স অব মসুর, কিস্‌মিসের

যূষ ইত্যাদি পথ্যরূপেও সেই পুরাতন নিম, নিসিন্দা, গুলঞ্চ, কালমেঘ, প্রভৃতি ঔষধরূপে ব্যবহার করায় অনেক উপকার হইয়াছে। * * * * অন্য বিলাতী ফুড্ আমাদের দেশস্থ অর্থাৎ যাহা আমাদের শরীরের উপযোগী—সেইরূপ পথ্য ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনং"। একথা মানিয়া চলিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। এখন ইহার পরিবর্ত্তে আমরা নবজ্বরে নানাবিধ পথ্যের বাহুল্য দ্বারা রোগীর অপকারই করিয়া থাকি। জ্বরাবস্থায় প্রায় অতিরিক্ত পথ্যাদি জীর্ণ হয় না, সেই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ অত্যন্ত জ্বরের সময় পথ্য প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ও জ্বর কম হইলে লঘুপথ্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

* * * * আমাদের দেশেও যব জন্মিয়া থাকে। যবেরই ইংরাজী নাম বার্লি। এই যবই পেশচাই হইয়া বার্লি পাউডার নাম ধারণ পূর্ব্বক এদেশে আসিয়া থাকে, কিন্তু সদ্য প্রস্তুত যব চূর্ণ অপেক্ষা কি তাহার পুষ্টিকারিতা বেশী?—কখনই নয়। আরও আমাদের মাটীতে যে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

রোগীর তৃষ্ণা পাইলেই অমনি আমরা সোডা-লেমনেড্ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া বসি। হঠাৎ বিলাতীজল ব্যবহারে রোগীর পিপাসা নিবারণ করা অপেক্ষা জগদীশ্বরের উৎকৃষ্ট দান ডাবের জল অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে একটা কথা আছে, এ যে সুন্দর বোতলে ভরা লেবেল দেওয়া নয়,-কাজেই বাবুদের ভক্তি হয় না।

*   *   *

বিলাতী ফুডে যে কি আছে, তাহার প্রকৃত বিবরণ সাধারণে অবগত নহেন। তাহা গ্রীষ্ম প্রধান বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে কিরূপ উপকারী, কতদিনের পুরাতন, কতদূর হ'তে তা'র শুভাগমন হ'চ্ছে, এ সবও বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। যে জিনিষের উপাদান নিশ্চিত জানা নাই—তাহা ব্যবস্থা করাও যা, আর বিষ সেবনের ব্যবস্থা করাও তাই। প্রকৃত গুণাদি অবগত হইয়া পথ্যাদি ব্যবস্থাপিত হইলে—তাহা অমৃত তুল্য হইয়া থাকে।"

*   *   *   *

শীর্ষোক্ত কথাগুলি আমার নহে, একজন স্পষ্টভাষী বহুদর্শী ডাক্তারের কথা। শুধু ইহাই নহে, একজন দেশ-বরেণ্য বড় ডাক্তারের সুযোগ্য হস্তে পরিচালিত মাসিক পত্রে—এই সরল সংযত সুন্দর সত্য কথা গুলি সন্দর্ভাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গবিশ্রুত-কীর্ত্তি-ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম্ বি মহাশয় দেশাত্মবোধের মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া "স্বাস্থ্য সমাচার" নামে যে মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন, সেই মাসিক পত্রে, প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাখাল চন্দ্র নাগ মহাশয় ঐ কথাগুলি লিখিয়াছেন। এমন সার-গর্ভ কথা—ইতঃপূর্ব্বে আর আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। রাখাল বাবু যাহা বলিয়াছেন—তাহা দেব নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র; তিনি যে ডাক্তার হইয়া দেশীয় পথ্যের আদর বুঝিয়াছেন,—তিনি যে স্বার্থ মোক্ষ জড়পিণ্ড দেশবাসীকে নিজের ঘর চিনাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, জানিনা—আমরা কোন্ ভাষায় তাঁহার এ উদারতার প্রশংসা করিব? ডাক্তার হইয়া কার্ত্তিক বাবুও যে এই প্রবন্ধটী পত্রস্থ করিয়াছেন,—সে জন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমরা রাখাল বাবুর "দেশী ও বিদেশী পথ্যের কথা"—নামক সন্দর্ভটীর অধিকাংশই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রাখাল বাবুর প্রত্যেক কথাই—আমরা ধ্রুব সিদ্ধির মত অভিনন্দিত করিয়া লইতে পারি। বাস্তবিক, যে দেশের ভগবান—কেবল ভোগের জন্যই, এক হইয়াও 'বহু' হইয়াছিলেন,—সে দেশে কি রোগীর জন্য পথ্যের অভাব হইতে পারে! দুঃখের বিষয়—দেশের লোক একথা ভুলিয়া গিয়াছে। নহিলে—ঘরে ঘরে এত অকাল-মৃত্যু-রোগ শোক, অভাব অনটন হইবে কেন?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে—আমি আমাদের দেশীয় পথ্য ও খাদ্যের কথা ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিব। কিছুদিন পূর্ব্বে—মাতৃভাষায় আমার দীক্ষা-গুরু, স্বর্গীয় অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিড়ম্বনায় পড়িয়া আমি সেই মহাত্মার আদেশ পালন করিতে পারি নাই। আমার পরম বন্ধু—হুগলী জজকোর্টের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও দেশীয় পথ্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সময়াভাবে সে অনুরোধও আমি রক্ষা করি নাই। রাখাল বাবুর যুক্তিময়ী কথায়—আজ আমি একসঙ্গে পরলোকস্থিত গুরুর পরিতর্পণ এবং ইহলোকস্থিত বন্ধুর পুলক বর্দ্ধনে অগ্রসর হইতেছি।

এ সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রমপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হইবে, আশা করি—বিশেষজ্ঞগণ তাহার সংশোধন করিবেন। বৃন্দসংহিতা, পাকরাজেশ্বর, ভাব প্রকাশ, পথ্যাপথ্য বিধি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে—আমি একে একে সুস্থ ব্যক্তির খাদ্য এবং রোগীর পথ্য সঙ্কলন করিব। এ সম্বন্ধে পাঠকগণের কোনও জিজ্ঞাস্য থাকিলে—অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পত্র লিখিবেন। আমি তাঁহাদের প্রশ্নের যথাশক্তি সদুত্তর দিয়া কৃত কৃতার্থ হইব।

ধান্য।

আমরা বাঙ্গালী,—চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য। সকলেই জানেন—"ধান্য" হইতে আমরা সেই চাউল সংগ্রহ করিয়া থাকি। ঋষিগণ 'ধান্যকে' পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—১। শালি ধান্য, ২। ব্রীহি ধান্য, ৩। শূক-ধান্য [যব প্রভৃতি] ৪। শিম্বী ধান্য [মুগ, কলায় প্রভৃতি] এবং ৫। ক্ষুদ্র ধান্য। কাঙ্গনী দানা, শ্যামা-বীজ—প্রভৃতি তৃণ জাত ধান্যকে ক্ষুদ্র ধান্য বলা যায়।

এই শালিজাতীয় ধান্য হইতেই উৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে। শালিধান্য আবার অনেক রকম। তাহাদের নামও অনেক—রক্তশালী, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমস্তক দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন, লোধ্রপুষ্প—ইত্যাদি। এ সকল নাম এখন অভিধানের কুক্ষিগত। এখন চাষারা—বাঁকতুলসী, ঝিঙেশাল, দুধ্‌কলমা, দাদখানি, বাদ্‌শাভোগ, কামিনী, লীলাবতী, রাঁধুনী পাগল—প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় ধান্যের নাম করণ করিয়াছে। এ দেশে এত রকম ধান আছে যে,—তাহাদের নামোল্লেখ করা অসম্ভব। এক কলিকাতার মিউজিয়মেই ৫০০০ রকম চাউলের নমুনা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষ ধান্যের আদি জন্মভূমি। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে চীন দেশে পঞ্চশস্যের উৎসব হইয়াছিল,—এই পঞ্চ শস্যের মধ্যে

ধান্যই সর্ব্ব প্রধান। ভারতের বৈদিক যাগ যজ্ঞে —পঞ্চ শস্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তখন ধান্যের জন্য চাষ করা হইত না, তখন অকৃষ্ট ভূমিতে আপনা হইতেই এ দেশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত। কিন্তু এইরূপ ধান্য-জাত তণ্ডুল ঈষৎ তিক্ত ও কষায়াস্বাদ হইত।

এ দেশে কৃষি বিস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধান্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বৈদিক যুগে ভূমিকর্ষণ করিয়া ধান্য রোপণ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তখন সেইরূপ ধান্যের নাম ছিল—"কৈদার"। ইহার পরবর্ত্তী যুগে —কৃষ্টভূমিজাত ধান্য বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া ক্ষেত্রান্তরে পুনর্ব্বপন করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপে উৎপন্ন ধান্যের নাম—"রোপিত" বা "বাপিত"। বাপিত প্রথায় চাউলের তিক্তাস্বাদ নষ্ট হইয়া তাহাতে মধুর রসের আবির্ভাব হয়। অদ্যাপি, এ দেশে এই বাপিত প্রথায়, কৃষকেরা ধান্যের চাষ করিয়া থাকে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জাতীয় ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সে সকল কথা সবিস্তারে বলিবার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গদেশে, বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালে, শরৎকালে—এবং শীতকালে, এই চারি ঋতুতে চারি জাতীয় ধান্য জন্মিয়া থাকে। তাহাদের নাম যথাক্রমে—বোরো, আউস, কার্ত্তিকশাল, এবং আমন। আমন ধান্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহার চাউলই সকলের চেয়ে লঘু পাচ্য।

এক রকম ধান্য আছে—আয়ুর্ব্বেদে তাহা "ষষ্টিক" আখ্যায় অভিহিত। "গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতা"—এই চাউলের অন্ন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হজম হয়। এই ধান্যেরও অনেক জাতি আছে। তাহাদের নাম=শণপুষ্প, প্রমোদক মুকুন্দক। ইহারা ব্রীহি শ্রেণীর ধান্য। ষাইট্ (৬০) দিনের মধ্যে এই শ্রেণীর ধান্য পরিপক্ক হইয়া থাকে, তাই ইহার চলিত নাম—"ষাইট্"।

যে সকল ধান্য জলাভূমিতে জন্মে, যাহার গাছ নাড়িয়া বসানো হয় না, এবং যে ধান্য বর্ষার শেষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহার চাউল জীর্ণ হয়—বহু বিলম্বে। এ দেশের দীন দরিদ্রেরা এইরূপ চালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, উদর, রক্তহীনতা চর্ম্মরোগ, স্নায়ুর প্রদাহ, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ধান্যের উপাদান।

উপাদান—	শতকরা
জল	১২·৩
আমিষ জাতীয়	৮·০
স্নেহ জাতীয়	০·৩
শালি জাতীয়	৭৯·৪
লবণ জাতীয়	০·৪

চাউল।

(ভাত)

প্রথমেই বলিয়াছি —

আমাদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্যের নাম—"ভাত"। সাধু ভাষায় ভাতের নাম "ভক্ত"। ভক্তের অনেকগুলি পর্য্যায় আছে। যথা—অন্ন, ওদন, অন্ধ, কূর, ভিস্সা, অদ, ও দিবি। সকলেই জানেন—চাউলকে জলে সিদ্ধ করিয়া ভাত প্রস্তুত করিতে হয়। যত চাউল, তাহার ৫ গুণ জল দিয়া মৃদু আগুণে সিদ্ধ করিতে হয়। আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ—এরূপ নিয়মে ভাত রন্ধন করেন না। তাঁহারা ৫ গুণ জল মাপিয়া দেন না। ইহাতে ভাতের গুণ হয়ত ঠিক

হয় না। জল ওজন করিয়া দেওয়াই ভাল। কেননা শাস্ত্রের বিধি—

"সু ধৌতাং তণ্ডুলান্ স্ফীতাং তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তঃ প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতং॥"

প্রথমে চাউলকে বেশ করিয়া ধুইতে হইবে; জল পাইয়া চাউল গুলি ফুলিয়া উঠিলে তাহা ৫ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। চাউলের পরিমাণ যদি এক পোয়া হয়, পাঁচ পোয়া জল দিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক পোয়া চাউলে, তিন পোয়া ভাত হয়।

ভাতের ফেন গালা উচিত কি না?—ভাতের ফেন গালা উচিত। কেন না—"অস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদং।" অর্থাৎ ফেন শুদ্ধ ভাত—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, অরুচিকর এবং কফবর্দ্ধক। কাহারও কাহারও বিশ্বাস ভাতের ফেন গালিলে, ফেনের সহিত ভাতের সারাংশ বাহির হইয়া যায়। এ ধারণা ভুল। ভাতকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

উপাদান	শতকরা।
আমিষ জাতীয়	২-৮
শালি জাতীয়	৫৭-২
লবণ জাতীয়	০-২৮
লবণ জাতীয়	৩-২৮
জল	৩৯-৭২

ভাতের ফেনে (যাহা আমরা ফেলিয়া দিই) আমরা নিম্নলিখিত উপাদান দেখিতে পাই—

আমিষ জাতীয়	০-৩
শালি জাতীয়	০-৮
লবণ জাতীয়	১-৪
জল	৯৫-৭

ইহাদ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি—ভাতের ফেন গালিলে ভাতের লবণ জাতীয় উপাদান অনেকটা কমিয়া যায় বটে, কিন্তু অন্যান্য উপাদান অতি অল্পই নষ্ট হয়।

ভাতের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা জানিতে পারি—তাহাতে আমিষজাতীয়, স্নেহ জাতীয় এবং লবণ জাতীয় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণেই বর্ত্তমান থাকে। এই জন্য যে সকল খাদ্যে পূর্ব্বোক্ত উপাদান গুলি বেশী আছে,—ভাতের সঙ্গে আমরা সেই সকল খাদ্য ভক্ষণ করি। মাছ, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, ডাল—ভাতের সঙ্গে খাইতে হয়। শাক-সব্জী খাইলে,—ভাতের লবণ জাতীয় উপাদানের অল্পতার অনায়াসেই পূরণ হইয়া থাকে। কেননা শাকসব্জীতে লবণ জাতীয় উপাদানের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে—ভাত অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, তৃপ্তিজনক, শরীরের হিত সম্পাদক; ইহা মলমূত্রের প্রবর্ত্তক, স্নিগ্ধ, বল-কারক, বায়ু ও পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ কফকর, এবং লঘু। বিজ্ঞান মতে—ভাত পরিপাক হইতে সাড়ে তিনঘণ্টা সময় লাগে। ইহা সম্পূর্ণরূপে অন্ত্র মধ্যে শোষিত হয়। ইহার সারাংশের সমস্তটুকুই—শোণিতের সহিত মিশিয়া যায়।

কোন্ চাউল ভাল?—নূতন চাউলের চেয়ে পুরাতন চাউলই অধিক পুষ্টিকর। চাউল পুরাতন হইলে, রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এইজন্য পুরাতন চাউল সহজে পরিপাক করা যায়। কিন্তু অনেক দিনের পুরাতন চাউলও ভাল নহে, তাহা একদিকে যেমন স্বাদহীন, অন্য-দিকে তেমনি তাহার পুষ্টিকারিতা শক্তিও কমিয়া যায়। একবৎসর অতীত হইলেই

চাউলকে পুরাতন বলা চলে। রোগীকে পথ্য দিতে হইলে, ৪।৫ বৎসরের পুরাতন চাউল ব্যবহার করা উচিত।

পুরাতন চাউল—বলকারক, বর্ণ প্রসাদক, ত্রিদোষ নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মূত্র বৰ্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পুষ্টিজনক, এবং পিপাসা, দাহ, বিষদোষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস, ও জরাদি নাশক।

নূতন চাউল—অত্যন্ত কফবৰ্দ্ধক এবং গুরুপাক। নূতন চাউল ভোজনে—গাল ও গলা ফুলিতে পারে, অধিকন্তু উদরাময়, অজীর্ণ, জর প্রভৃতি রোগও জন্মিতে পারে। সুতরাং নূতন চাউল না খাওয়াই ভাল।

বার্ষাযিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি।
তত্তু বার্ষাষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হিতং॥

আজকাল বাজারে দুই রকম চাউল বিক্রয় হইয়া থাকে। ১। কলের ছাঁটা, ২। ঢেঁকীর ছাঁটা। কলের ছাঁটা চাউল দেখিতে অতি পরিষ্কার—মসৃণ, দানা গুলি আস্ত। কিন্তু কলে ছাঁটা চাউল দেহের পক্ষে তাদৃশ পুষ্টিকর নহে। কেননা—কলে যেরূপ প্রক্রিয়ায় চাউল ছাঁটা হইয়া থাকে, তাহাতে চাউলের ফস্‌ফরাস-উপাদানযুক্ত স্তর উঠিয়া যায়। অতএব ঢেঁকীতে ছাঁটা চাউল ব্যবহার করাই ভাল।

আবার, ছাঁটা চাউল অপেক্ষা আছাঁটা চাউলের পুষ্টিকারিতা অধিক। ছাঁটা চাউলে স্নেহজাতীয় উপাদান শতকরা ০·৫ ভাগ থাকে, আছাঁটা চাউলে উহা প্রায় ২-৫ ভাগ থাকে। ছাঁটা চাউলে আমিষ জাতীয় উপাদান শতকরা ৬-২৫ ভাগ, এবং আছাঁটা চাউলে ৭-৬৮ ভাগ থাকে। বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিকের মতে—ছাঁটিবার সময় চাউলের যে পাতলা আবরণ উঠিয়া যায়—সেই আবরণে "ভাইটামিন্" নামক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাইটামিন পুষ্টিকর। অতএব—খুব মসৃণ ছাঁটের চাউল আহার করা উচিত নহে, তবে বিলাসী বাঙ্গালী বাবুরা কি অপরিষ্কার চাউলের অন্ন তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিবেন?

চাউল হইতে জাত খাদ্য।

পায়স—চাউল, ৫ গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া অল্প ঘন হইলে তাহাকে "ক্ষিরীকা" বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম—"পরমান্ন" বা "পায়স"।—গৃহিণীরা মুখপ্রিয় করিবার জন্য—পাককালে এই পায়সের সঙ্গে চিনী বা গুড় মিশ্রিত করেন। ফলে, ইহাতে "পায়স" অত্যন্ত গুরুপাক হইয়া থাকে। মিষ্ট না দিলে —"পায়স" অপেক্ষাকৃত লঘুপাচ্য হয়। মিষ্ট বর্জ্জিত পায়স—অত্যন্ত পুষ্টিকর; যাঁহাদের শুক্রতারল্য রোগ আছে, তাঁহারা চিনী না দিয়া পায়স ভক্ষণ করিলে, উপকার পাইবেন।

"ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা হৃদ্যা মধুরা যাতি পুষ্টিদা।
রক্তপিত্ত-হরী রুচ্যা সদ্যঃ শুক্র-বিবৰ্দ্ধিনী॥"
বৃন্দ। কৃতান্ন বর্গ।

যজ্ঞে ঋষিগণ—পবিত্র ভাবিয়া এই 'ক্ষিরীকা' বা পরমান্ন ভক্ষণ করিতেন। তখন ইহার নাম ছিল 'চরু"।

খিচুড়ী—চাউলও ডাল একত্র মিশাইয়া পাক করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম "কৃশরা।" চলিত কথায় ইহাকে খিচুড়ী বলে। ইহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম—চাল যত, ডালও তত, উভয় পদার্থ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। বেশ গলিয়া গেলে, তাহাতে কিছু লবণ, একটু আদার রস এবং অতি সামান্য হিঙ্গুর 'সম্বরা' দিয়া নামাইয়া লইবে।

ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ডালে আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ বেশী আছে—এই দুই পদার্থ চাউলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়—খিচুড়ী বড় পুষ্টিকর হইয়া থাকে। উদরাময় রোগী ব্যতীত অপর সকল রোগীকে ইহা অনায়াসে পথ্য স্বরূপে প্রয়োগ করা যায়। এখনও এদেশে খিচুড়ীর প্রচলন আছে। তবে এখনকার খিচুড়ী আর সেকালের "কৃশরা" এক নহে। এখন খিচুড়ীর সঙ্গে নানাবিধ মস্লা. ঘৃত ও পলাণ্ডু প্রভৃতি মিশিয়া, খিচুড়ীকে একদিকে গুরুপাক, এবং অন্যদিকে বিলাসীর সখের খাদ্যে পরিণত করিয়াছে!

পোলাও—চাউলের সহিত মাংস,মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। উভয় দ্রব্য গলিয়া গেলে,তাহাতে কিছু ধনে চূর্ণ,শুঁঠচূর্ণ,লবণ এবং চাতুর্জাত [এলাচ, লবঙ্গ, তেজপত্র ও দারুচিনী] চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতাঢ্য করিয়া নামাইলে—তাহাকে 'অন্নমাংস' বলে। ইহার আর একটী নাম "পলান্ন"—অপভ্রংশে "পোলাও"। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক। ইহার গুণ—বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুপোষক এবং বাজীকরণে (রতিশক্তি বর্দ্ধনে) অদ্বিতীয়।

অন্নমাংসং পরং বল্যং বৃংহণং ধাতুবর্দ্ধনং।

এখন অন্নমাংস প্রস্তুতে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে—ইহার সঙ্গে বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি বহু উপকরণ মিশিয়াছে; বলা বাহুল্য পলান্ন—এখন অতিশয় গুরুপাক খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কূরা—চাউলের সহিত তাহার ৪ ভাগের ১ ভাগ মৎস্য, এবং বার্ত্তাকু, বানমূলক, মানকচু,কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারি মিশ্রিত করিয়া প্রচুর জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। সমস্ত দ্রব্য অত্যন্ত গলিয়া গেলে তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ ও গোলমরিচ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ইহার নাম "কূরা"। ইহা—বলকারক, রুচিকারক, বায়ুর প্রদাহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিষম জ্বর এবং ধাতুক্ষয় নাশক। ইহা অনেকটা "পিস্‌পাস্" শ্রেণীর খাদ্য।

তাপহরী—প্রথমে কিছু ঘৃতে অল্প হরিদ্রা চূর্ণ ভাজিয়া লইবে। পরে তাহাতে মাষকলায়ের বড়ি এবং সুধৌত চাউল ঈষৎ ভাজিয়া, ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে—এইরূপ পরিমাণে জল দিয়া মৃদু আগুণে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইয়া গেলে তাহাতে যথোপযুক্ত মাত্রায় সৈন্ধব, আদা ও হিং নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। ইহার নাম "তাপহরী।" ইহা অত্যন্ত দাহনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, শরীরের উপচয় কারক এবং রক্তস্রাব নিবারক। তবে ইহা গুরুপাক।

শালী শক্তু—চাউলকে বেশ করিয়া ধুইবে, পরে শুকাইয়া লইবে; শেষে জাঁতায় ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম "শালি শক্তু। চলিত ভাষায় "সবেদা" এবং ইংরাজী ভাষায় Rice Sturch নামে ইহা বিখ্যাত। এই সবেদা দ্বারা পিষ্টক জাতীয় বহু খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে সকল খাদ্য অত্যন্ত গুরুপাক, বিশেষতঃ অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিষের মত অপকারী। কিন্তু "সবেদা" হইতে রোগীর পথ্যও প্রস্তুত হইতে পারে।

চরক বলেন—

মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালি সম্ভবাঃ।
গ্রাহিণো রক্তপিত্তঘ্না তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দি জ্বরাপহাঃ॥

অর্থাৎ শালিশক্তু—মধুর রস, লঘু, শীতল, ধারক এবং রক্তপিত্ত, পিপাসা বমি ও জ্বর নাশক।

এই মহাযুদ্ধে—আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে, রোগীর ঔষধ-পথ্যের দামও অসম্ভব রূপে চড়িয়াছে। বার্লির মূল্যও তিনগুণ বাড়িয়াছে, দরিদ্র গৃহস্থের বিষম বিপদ। এইরূপ কতকগুলি দরিদ্র রোগীকে আমরা শালিশক্তু ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ইহার যে উপকারিতা দেখিয়াছিলাম —তাহা বার্লির অপেক্ষা অল্প নহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বিলাতী ফুডের পরিবর্ত্তে শালি শক্তু অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে খরচও কম পড়ে। শালি শক্তু ১ ভরি, আধ সের জল দিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবে,—পরে তাহাতে দুগ্ধ ও মিছরীর গুঁড়া মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ইহা শিশুদের খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইচ্ছা হইলে দুগ্ধ না দিয়া, লেবুর রস ও অম্ল লবণ দিয়া— ইহা রোগীকে দেওয়া যায়। অজীর্ণ ও অতিসার রোগীর পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট পথ্য।

যে সকল স্ত্রীলোকের স্তনে—ভাল দুগ্ধ জন্মে না, অথবা যাহাদের স্তনের দুগ্ধ—শিশুর পোষণের উপযোগী নহে,—শালিশক্তু তাহাদের পক্ষে মহৌষধ। "শালি শক্তু"— এক সপ্তাহ কাল দুগ্ধের সহিত পান করিলে— —স্তনে প্রচুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। এই সময় প্রসূতিকে একটু বেশী পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভাত না খাইয়া কেবল দুগ্ধ দিয়া ভাত খাইলে আরও ভাল হয়। শালিশক্তু প্রত্যহ ২ তোলা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা চলে। প্রসূতির অবস্থা ও প্রকৃতি বুঝিয়া আধতোলা হইতে আরম্ভ করিবে।

শাল্য পূপ—তণ্ডুল চূর্ণ ২ ভাগ নারিকেল কল্ক ১ ভাগ, লবণ ও মরিচ চূর্ণ— যথোপযুক্ত প্রক্ষেপ দিয়া দুগ্ধ দ্বারা মাখিয়া পিষ্টকাকৃতি করিয়া তপ্ত তাওয়ায় সেঁকিবে। ইহার নাম "শাল্যপূপ"। ইহা গুরুপাক—কিন্তু ক্ষীণশুক্র ও ওজোক্ষয়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য।

দুগ্ধ কূপিকা।

চাউল চূর্ণ ২ ভাগ, ছানা ১ ভাগ একত্রে বেশ করিয়া মাখিবে, পরে তাহাতে গোলাকার কূপিকা প্রস্তুত করিয়া, কূপিকার ভিতর ঘন দুগ্ধের 'পুর' দিয়া,—তাহা ঘৃতে ভাজিবে এবং কর্পূর বাসিত চিনীর রসে ডুবাইয়া রাখিবে। ইহার নাম "দুগ্ধ কূপিকা"—ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং দৃষ্টিশক্তিপ্রদ। যাঁহারা চক্ষে কম দেখেন,—তাঁহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন।

কূর ধুম্নী—চাউল চূর্ণ ২ ভাগ, ডাল (মাষ কলায়) ৪ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল দিয়া তরল করিয়া গুলিবে। ঐ তরল দ্রব্যে কিছু মৌরী, মরিচ, যমানী, আদার রস এবং উপযুক্ত পরিমাণে লবণ প্রক্ষেপ দিবে। পরে একখানি লৌহের তাওয়া আগুনে চড়াইয়া তাহাতে কিছু ঘৃত মাখাইবে, শেষে—পূর্ব্বোক্ত তরল দ্রব্য অল্পে অল্পে ঐ তাওয়ায় ঢালিবে এবং খুন্তীর সাহায্যে রুটীর মত করিয়া তাহা বিস্তৃত করিয়া দিবে। এক পিঠ ভাজা হইলে অপর পিঠ উলটাইয়া ভাজিয়া লইবে। ইহার নাম কূর ধমনী। যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি কম, যাঁহাদের ভ্রম রোগ আছে, যাঁহারা সর্ব্বদাই শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন—তাঁহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন। এই "কূর ধুম্নীই" সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া "সরু চিকুনীতে" পরিণত হইয়াছে।

চাউল হইতে আরও নানা রকম পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিস্তৃতির ভয়ে

তাহা আর লিখিলাম না। যাঁহারা ঐ সকল খাদ্যের বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা 'বৃন্দ সংহিতা', 'পাক' রাজেশ্বর' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন।

যাঁহাদের পরিণামশূল আছে, তাঁহারা কোমল নারিকেলের জলে চাউল পাক করিয়া, ভাত হইলে সেই ভাত খাইবেন।

যাঁহাদের ভাত খাইলেই জ্বর হয়, অথবা যাঁহাদের ভাত সহ্য হয় না, তাঁহারা দুইবার ফেন গালিয়া সেই ভাত খাইবেন। চাউল অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে একবার ফেন গালিতে হইবে, তারপর আবার নূতন জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চাউল খুব গলিয়া গেলে আর একবার ফেন গালিতে হইবে। এই উপায়ে প্রস্তুত করা 'অন্ন' আহার করিলে, তাহা অতি শীঘ্র—এমন কি, একঘণ্টায় হজম হইয়া যায়। 'রস্' হইবার আর ভয় থাকেনা।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী রোগী পাইয়াছিলাম, তাহার ভাত সহ্য হইত না, ভাত খাইলেই তাহার জ্বর হইত। এদিকে উপর্য্যুপরি ৪।৫ দিন রুটী খাইলেই তাহার আবার উদরাময় দেখা দিত। বন্ধুবর ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্—মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই রোগী প্রায় ৯ মাস ভুগিয়া—শেষে আমার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দুইবার ফেন গালিয়া সেই ভাত খাইবার উপদেশ দিয়াছিলাম। ইহাতেই তাঁহার আর জ্বর হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—ভেষজ দ্রব্যের ক্বাথের সহিত অন্নের মণ্ড প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে. পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

পুরাতন পীড়ায় পর্পটী প্রয়োগ।

—:*:—

(বৃদ্ধ বৈদ্যের লিখিত)

মকরধ্বজের পরই "পর্প টী" একটী উল্লেখ যোগ্য সিদ্ধফল রসৌষধ। পুরাতন পেটের পীড়ায় পর্প টীর তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ বোধ হয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। গ্রহণী, অতিসার, প্রবাহিকা [আমাশয় ও রক্তামাশয়] প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগে—"পর্প টী' অমৃত বিশেষ; বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত রোগগুলির সহিত যদি রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পায় তাহা হইলে পর্প টীই তাহার একমাত্র ঔষধ। পর্পটী প্রয়োগে আমি শত শত শোথযুক্ত আসন্ন মৃত্যু উদরাময় রোগীকে মৃত্যুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছি। কবিরাজ

মহাশয়দের কাছে পর্প্পটীর পরিচয় দেওয়া—ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি পর্প্পটীর কথাই আলোচনা করিব।

"পর্প্পটী" অনেক রকম আছে। যথা—"রস পর্প্পটী" "স্বর্ণ পর্প্পটী", "লৌহ পর্প্পটী", "তাম্র পর্প্পটী", "মকরধ্বজ পর্প্পটী" ইত্যাদি। কেহ কেহ আবার "বজ্রক্ষার" নামক ঔষধকে সোহাগ করিয়া "ক্ষীর পর্প্পটী" ও "শুভ্র পর্প্পটী" নাম দিয়া থাকেন। পর্প্পটীর মধ্যে "বিজয় পর্প্পটী' ও "স্বর্ণ পর্প্পটী'—এই দুইটি কিছু ব্যয় সাধ্য। ইহাদের অভাব "রসপর্প্পটী", "লৌহ পর্প্পটী" এবং পঞ্চামৃত পর্প্পটীর দ্বারাই পূরণ হইতে পারে।

রস পর্প্পটী।

"রস পর্প্পটী" প্রস্তুত করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহার উপাদান—কেবল পারা ও গন্ধক মাত্র। প্রথমে পারা ও গন্ধককে শোধন করিয়া লইতে হইবে।

গন্ধক শোধন। ৮ ভরি গন্ধক লইয়া একখানি লোহার হাতার উপর রাখ। পূর্ব্বে হাতার ভিতর দিকে একটু গব্যঘৃত মাখাইয়া লইলে ভাল হয়। তা'রপর ঐ হাতা নির্ধূম অগ্নির উত্তাপে চড়াও। তাপ লাগিয়া গন্ধক যেমন গলিতে আরম্ভ করিবে, অমনি একটু একটু করিয়া তাহা, জল ও দুগ্ধ পূর্ণ একটী পাত্রে ঢালিতে থাকিবে। পরে সেই পাত্র হইতে গলিত অথচ জমাট গন্ধক তুলিয়া, বেশ করিয়া জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহাই হইল গন্ধক শোধনের সহজ নিয়ম।

পারা শোধন। পারা ৮ ভরি, ছাড়ানো রসুনের কোয়া ৮ ভরি—একত্রে একখানি পাথরের খলে মাড়। মাড়িতে মাড়িতে যখন সমস্ত রসুন বাটা খুব কালো রঙ হইবে, তখন তাহাতে অল্প পরিমাণে জল দিয়া আবার মাড়িবে। ইহাতে পারা খলের তলায় পড়িবে রসুন বাটা উপরে থাকিবে। এইবার রসুন বাটা ও জল টুকু ধীরে ধীরে ফেলিয়া দিয়া পারা শুদ্ধ খলখানি রৌদ্রে রাখিবে। জল নিঃশেষ হইয়া শুকাইয়া গেলে মোটা কাপড়ে পারা ছাঁকিয়া লইবে। ইহাতে পারা শোধিত হইবে।

পর্প্পটীর প্রস্তুত প্রণালী।—এই রূপ শোধন করা গন্ধক ২॥০ ভরি ও পারা ২॥০ ভরি ওজনে লইয়া নুড়ী দিয়া ধীরে ধীরে লঘু হস্তে মাড়িবে। মাড়িতে মাড়িতে পারা ও গন্ধক একত্রে মিশিয়া খুব কালো হইবে। যখন দেখিবে পারদের কণা আর দেখিতে পাওয়া যায়না, অধিকন্তু খলের তলায় চট্ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহা খল হইতে উঠাইয়া অন্যত্র রাখিবে। এই পারা গন্ধকের মিশ্রণের নাম—"কজ্জলী।" কজ্জলী প্রস্তুত হইলে একখানি লৌহের হাতা, খানিক টাটকা গোবর, দুই একখানা কচি কলার পাতা, একখানি ছোট খুন্তী [খুন্তী এমন হওয়া চাই—যেন পূর্ব্বোক্ত হাতার মধ্যে ফিরিতে ঘুরিতে পারে] এবং একটু গাওয়া ঘৃত যোগাড় করিয়া লইবে।

তারপর কতকগুলি শুকনো কুলের কাঠ পোড়াইয়া অঙ্গারের স্তূপ প্রস্তুত করিবে। এই অঙ্গার স্তূপের পার্শ্বেই টাট্‌কা গোবর দিয়া একটী ছোট খাটো বেদী গড়িয়া লইবে। বেদীর উপর কচি কলাপাতা বিছাইয়া দিবে। আর একখণ্ড কলারপাতে খানিকটা গোবর পুরিয়া একটী পোঁটলা বাঁধিয়া রাখিবে।

এইবার লোহার হাতায় একটু ঘি মাখিবে, এবং তাহাতে আন্দাজ ২ ভরি কজ্জলী ঢালিয়া

দিবে। পরে কজ্জলীপূর্ণ হাতা খানি—পূর্ব্ব কথিত কুলকাষ্ঠের অঙ্গারস্তূপের মধ্যে বসাইবে। হাতার পার্শ্বের কজ্জলী প্রথমেই গলিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময় খুন্তিখানি দিয়া ধীরে ধীরে হাতার মধ্যস্থিত কজ্জলী ঘুঁটিয়া দিবে। সমস্ত কজ্জলী গলিয়া যাইবা মাত্র, সেই যে গোবরের বেদী—যাহার উপর কলাপাতায় আচ্ছাদন দিয়া রাখিয়াছ—তাহারই উপর দ্রব কজ্জলী ঢালিয়া দিবে। অমনি আর একজন সাহায্যকারী কলাপাতা বাধা গোবরের পোঁটলাটী দিয়া, বেদীর উপর ঢালা তরল কজ্জলীর উপর চাপ দিবে। এইরূপে যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে—তাহারই নাম "রস পর্প্পটী"।

পঞ্চামৃত পর্প্পটী।—৪ ভরি কজ্জলীর সহিত আবার ২ ভরি শোধন করা গন্ধক মিশাইয়া পুনরায় মাড়িবে, পরে তাহাতে জারা লৌহ ১ ভরি, জারা অভ্র ৷৹ ভরি, এবং জারা তামা ।৹ চারি আনা দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে। শেষে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পর্প্পটী পাক করিবে। ইহার নাম - পঞ্চামৃত পর্প্পটি।

লৌহ পর্প্পটী।—দুই ভরি কজ্জলীর সহিত ১ ভরি জারা লৌহ মিশাইয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পর্প্পটী পাক করিলেই—"লৌহ পর্প্পটী" প্রস্তুত হইল।

কোন্ রোগে কোন্ পর্পটী ব্যবহার্য্য।—জীর্ণ ও বিষম জ্বরে, কফজ শোথে, শোথযুক্ত পাণ্ডু রোগে, শোথযুক্ত গ্রহণী, অথবা শোথ রহিত গ্রহণী রোগে, পুরাতন প্রবাহিকায় —"রস পর্প্পটী প্রয়োগ করিবে।

শোথযুক্ত, জ্বরযুক্ত, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে, যকৃৎ বিকারে জাত শোথে, শোথযুক্ত বা শোথ রহিত গ্রহণী রোগে, পুরাতন সরক্ত প্রবাহিকায়, সর্ব্ববিধ পুরাতন অতিসারে—পঞ্চামৃত পর্প্পটি অত্যন্ত ফলপ্রদ। ইহা অনেক স্থলেই আমি পরীক্ষা করিয়াছি।

রোগীর দেহে রক্তের শোণিকা অর্থাৎ লালকণা কমিয়া গেলে, রক্তে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া শোথ জন্মিলে, লৌহ পর্প্পটী প্রয়োগ করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। উদরী রোগে লৌহ পর্প্পটী চমৎকার ঔষধ।

সেবনের নিয়ম।—প্রথম দিন প্রাতঃকালে (বেলা ৯ টার মধ্যে) ১ রতি ওজনের পর্প্পটী লইয়া, ২।৪ ফোঁটা মধু দিয়া কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে মাড়িবে, মাড়া হইয়া গেলে তাহাতে ১ ঝিনুক বল্‌কা দুগ্ধ দিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। দ্বিতীয় দিন ২ রতি পর্প্পটী দিবে। এইরূপে এক এক দিন এক এক রতি বাড়াইয়া ১০ দিনে ১০ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইবে। এই ১০ দিনেই আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তা'রপর আবার প্রতিদিন ১ রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা কমাইতে হইবে। ১০ দিনে যাহার রোগ না কমিবে, তাহাকে ১০ রতি মাত্রায় আরও কিছুদিন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শেষে ১ রতি করিয়া প্রতিদিন মাত্রা কমাইয়া এক রতিতে নামিলে —ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া দিবে।

রোগী যে দিন হইতে পর্প্পটী সেবন আরম্ভ করিবে, সেই দিন হইতে লবণ ও জল খাইবে না। নির্জ্জল দুগ্ধ বল্‌কা গরম করিয়া—সেই দুগ্ধের সহিত পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিবে। চিনি ও মিছরীর গুঁড়া খাইতে পারিবে। পিপাসা পাইলে একটু একটু দুগ্ধ পান করিবে। অসহ্য পিপাসা হইলে,—দাড়িমের রস, কমলা লেবুর রস, ইক্ষু রস,

এবং অল্প মাত্রায় শাসশূন্য ডাবের জল—খাইবে।

পর্প্পটী সেবনকালে জলপান করিলে যদিও অন্য কোনও বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই—তথাপি পর্প্পটী সেবনের সুফল পাওয়া যায় না। সুতরাং জলপান বন্ধ রাখা বড়ই আবশ্যক। আর শোথ, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে দেহের রক্ত কমিয়া গেলে, ডাক্তারেরাও লবণ ভক্ষণ নিষেধ করেন। যে সকল রোগে শরীর রক্ত হীন হইয়া পড়ে, সেই সকল রোগে লবণের অপকারিতা বহুযুগ পূর্ব্বেই ঋষিরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পর্প্পটী সেবনের সময়—লবণও বন্ধ রাখা চাই।

পর্প্পটী সেবন ছাড়িয়া দিলেও ২।১ সপ্তাহ—লবণ ও জল বন্ধ রাখা ভাল। ক্রমে ক্রমে—উহা সহাইতে হয়।

নব প্রসূতা নারীর শরীরে যদি শোথ দেখা যায়, অথবা প্রসূতি যদি সূতিকা-গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হ'ন,—তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পর্প্পটী প্রয়োগ করিবে। পর্প্পটী—শোথ ও সূতিকা-গ্রহণীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ বটে, কিন্তু প্রসূতির জরায়ুক্ষেত্র যদি ক্লেদশূন্য না হয়, কিম্বা প্রসবদ্বার দিয়া যদি দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইতে থাকে, অথবা প্রসূতির বস্তিদেশে (তলপেট) ভার বোধ বা বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কখনও পর্প্পটী ব্যবস্থা করিও না।

পর্প্পটী প্রস্তুত করিতে হইলে, টাট্‌কা কজ্জলী ব্যবহার করিবে। পুরাতন (অনেক দিনের প্রস্তুত) কজ্জলীতে পর্প্পটী ভাল হয় না।

গন্ধক শোধন বা পর্প্পটী প্রস্তুতের পূর্ব্বে—হাতায় ঘৃত মাখাইয়া লইবার উদ্দেশ্য—উহাতে গন্ধক ও কজ্জলী শীঘ্র গলে, আগুনের তাপে জলিয়া পুড়িয়া যায় না।

পর্প্পটীতে—শিশুর এবং বৃদ্ধের খুব শীঘ্র উপকার হয়, যুবার দেহে পর্প্পটী একটু বিলম্বে শক্তি প্রকাশ করে।

যাহারা অত্যন্ত মাছ মাংস খায় এবং যাহারা মাদক দ্রব্য সেবী, তাহাদের দেহে পর্প্পটী প্রয়োগে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

বর্ষাকাল ও শীতকালে—পর্প্পটী প্রয়োগ করিলে, শীঘ্রই উপকার দেখা যায়।

যে রোগী পর্প্পটী সেবন করিবে, তাহাকে—আলোকময় খট্‌খটে শুক্‌নো ঘরে রাখিবে। বেশী স্নান করিতে দিবে না। প্রয়োজন বুঝিলে, গরম জলে, গা' মুছিবার ব্যবস্থা করিবে।

পর্প্পটী সেবনের পর রোগী আধঘণ্টা কাল চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে, নড়িবে চড়িবে না। কাহারও সঙ্গে কথাও কহিবে না। পর্প্পটী সেবনের পর, তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে।

আর একটী পর্প্পটী আছে—তাহার নাম—"সর্ব্বেশ্বর পর্প্পটী"। বঙ্গদেশের কবিরাজগণ—ইহা বড় একটা ব্যবহার করেন না। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী বৈদ্যগণ ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন। এই পর্প্পটী, ঘৃত, মধু বা মাখনের সহিত সেবন করিতে হয়। যক্ষ্মা, পুরাতন জর, হৃদ্রোগ, মেহ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগে এই পর্প্পটী বড়ই ফলপ্রদ। ইহার উপাদান—

হিঙ্গুল—১ ভরি,
গন্ধক—১ ভরি,
প্রবাল ভস্ম ।০ আনা,
অভ্র ভস্ম—।০ ,,
লৌহ ভস্ম—।০ ,,
রসাঞ্জন ॥০ ,,

হরিতাল—৵৹ „

মনঃ শিলা—৵৹ „

তাম্র ভস্ম—৵৹ „

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, প্রথমে অর্জ্জুন ছালের ক্বাথে, তা'রপর বেড়েলার ক্বাথে, তা'রপর ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিবে। পরে পর্প্পটীর মত পাক করিবে। ইহার মাত্রা—½ রতি হইতে ১ রতি। এই পর্প্পটী সেবনে গা' বমি বমি করিলে, ঘোল খাইতে দিতে হয়। আমি একটী স্ত্রীলোকের দ্বৈকালীন জর—এই পর্প্পটী প্রয়োগে ১২ দিনে বন্ধ করিয়াছিলাম। আমার চিকিৎসাধীনে আসিবার প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে,—রোগিণী ডাক্তার কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

উষ্ণোদকের উপকারিতা।

—:*:—

পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডি—আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বাঙ্গালার বহু সাময়িক পত্রের অঙ্গ একদা অলঙ্কৃত করিত।

পল্লীবাসের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়-জলকষ্ট। অনেক সময় পল্লীবাসিগণকে পঙ্কিল জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। একদিন এই জলকষ্ট-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। সেই সময় তিনি উষ্ণজলের উপকারিতা সম্বন্ধে—আমার কাছে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া আমি সেই অমূল্য উপদেশের নোট লইয়াছিলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

হেমচন্দ্র পল্লীগ্রামের লোকগণকে জল গরম করিয়া পান করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—বঙ্গদেশে এই যে বর্ষে বর্ষে এত নরনারী অজীর্ণ-ম্যালেরিয়া ও কলেরায়—মারা পড়ে, ইহার এক মাত্র কারণ—নির্ম্মল জলের অভাব। তিনি বলিতেন—কেবল মাত্র উষ্ণোজল পান করিয়া পল্লীগ্রামের লোকগুলা পূর্ব্বোক্ত মারাত্মক রোগ সমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

বাস্তবিক এদেশের অধিকাংশ রোগই জলের দোষে হইয়া থাকে। অতএব জল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা সর্ব্ব সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত।

জলকে বিশুদ্ধ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুন্দর উপায় জল আগুণে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লওয়া। এরূপ জলে সংক্রামক রোগ জন্মিতেই পারে না। আমরা অনেকেই দেখিয়াছি—কলেরা, কয়েক প্রকার জর, কৃমি, উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধি দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জলকে আগুনে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল ব্যবহার করিলে উক্ত রোগ গুলির হস্ত হইতে অতি সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

১। খালি পেটে গরম জল পান করিলে অম্লজনিত বুকজ্বালা এবং অম্ল ঢেকুর ওঠা নিবারিত হয়।

২। আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ না হইলে, পাকস্থালীতে এক রকম বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। গরম জল পান করিলে সেই বিষাক্ত পদার্থ মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়।

৩। গরম জল পান করিলে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

৪। গরম জল পানে আমাশয়ে বা পাকস্থালী হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা বিদূরিত হয়,—উদরে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকিলে জীর্ণশক্তি কমিয়া যায়। গরম জল পানে এ দোষ থাকেনা।

৫। গরম জল পাকাশয় হইতে যকৃৎ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য করিয়া থাকে।

৬। গরম জল শুষ্ক কাসের মহৌষধ। যাঁহারা শুষ্ক কাসিতে কষ্ট পান, কাসিয়া কাসিয়া পেটে ব্যথা ধরে, অথচ শ্লেষ্মা কিছুই ওঠে না, তাঁহারা যদি রাত্রিকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক আনা সৈন্ধব লবণ সহ দেড় পোয়া আন্দাজ গরম জল খাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কফ তরল হইয়া যাইবে, ফলে- কাসির কষ্ট অনেকটা কমিয়া যাইবে।

৭। গরম জল হাঁপানির ব্যায়রামেও বিশেষ উপকারী। শ্বাস কৃচ্ছের সময় লবণ সহ পান করিতে হয়।

৮। গরম জল পানে বাত রোগ আক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। যাঁহাদের বাত আছে, তাঁহাদের বাতও ভাল হইয়া যায়।

৯। খালি পেটে আধ সের আন্দাজ গরম জল পান করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। যাঁহাদের প্রস্রাবের পীড়া আছে (অর্থাৎ প্রস্রাব অল্প অল্প হয়, প্রস্রাবের বর্ণ—রক্ত বা পীত এবং যাঁহাদের প্রস্রাব অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত বলিয়া প্রস্রাব কালীন মূত্রদ্বার জ্বালা করিতে থাকে) তাঁহারা গরম জল পান করিবেন।

১০। গরম জল পান করিলে শরীরের মেদ বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

১১। গরম জলে কিঞ্চিৎ সর্জ্জিক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, যকৃতের ভিতর পিত্ত সঞ্চয় জাত—পাথুরী জন্মিতে পারে না। সর্জ্জিকার সকল বেণের দোকানেই পাওয়া যায়।

১২। পিত্ত অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে যকৃতে এক রকম শূল হইয়া থাকে,—এই শূল—পূর্ব্বোক্ত বিধানে গরম জল মুহুর্মুহু পানে আরোগ্য হইতে পারে।

১৩। লবণ মিশ্রিত জল ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে জ্বর, বিসূচিকা, শোণিতস্রাব প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ২ রতি লবণ এক ছটাক জলে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত লবণাক্ত উষ্ণ জল পিচকারী দিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিয়া হেম বাবু ২।৩টী মৃতপ্রায় রোগীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

১৪। নূতন জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরের অভ্যন্তর গাত্র আমরস বা কফ কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য নূতন জ্বরে পিপাসা হইলে, জল পান করিলে সে জল উদরে শোষিকা হয় না। এই জন্য জল পানে পিপাসা থামেনা, পীত জল ও বমন হইয়া যায়। কিন্তু গরম জল পান করিলে, তাহা উদরে শোষিত হয়, পিপাসাও দূর হয়।

১৫। ভোজনের অব্যবহিত পরে জ্বর হইলে, তৎক্ষণাৎ লবণ মিশ্রিত গরম জল পান করিলে ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া যায়, তাহা আর উদরে থাকিয়া বাষ্পাকারে বিষাক্ত হইতে পারে না।

১৬। লবণ মিশ্রিত গরম জল বমন কারক, আবার বমন নাশক। তবে বমন নিবারণ করিবার জন্য অত্যুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করিতে হইবে, অথচ যতটা গরম—রোগী সহ্য করিতে পারে, জল তত গরম চাই এবং সেই জল—মুহুর্ম্মুহু অল্প পরিমাণে পান করাই বিধি।

১৭। গরম জল পানে স্বেদনিঃসরণ-ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়।

১৮। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে গরম জল বিশেষ উপকারী।

১৯। গরম জলের ভাপ্‌রা লইলে বাত রোগ এবং শোণিত দুষ্টি আরোগ্য হইয়া থাকে।

২০। গরম জলের বাষ্প—গলার ভিতর প্রবিষ্ট হইলে স্বরভঙ্গ ও বহুবিধ গলরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

২১। নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত গরম জলের বাষ্প ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হইলে—ফুস্‌ফুসের প্রদাহ কমিয়া যায়।

২২। অভুক্ত ব্যক্তি যদি চার' মত উষ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করে—তাহার হজম শক্তি বাড়ে।

২৩। সুস্থাবস্থায় নিয়ম করিয়া প্রত্যহ একপোয়া গরম জল খাইলে—শরীরের দূষিত মল নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়া যায়,—কোন রোগ আক্রমণের সহসা আশঙ্কা থাকে না। এই জলের মাত্রা একপোয়া হওয়া উচিত। উষ্ণ জল পানের ২।৩ ঘণ্টা পরে—তবে আহার করিবে।

২৪। ঈষদুষ্ণ জল অর্দ্ধ প্রহরে পরিপাক হয়। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিলে, তাহা এক প্রহরে জীর্ণ হয়। কিন্তু শীতল জল পরিপাক করিতে দুই প্রহর সময় লাগে।

২৫। কেবল মূর্চ্ছা রোগে, রক্তাধিক্যে, দাহ থাকিলেও সুরাপান জনিত রোগে এবং মাথা ঘোরায়—উক্ত জল পান করা বিধেয় নহে।

২৬। গরম জল পানে অভ্যন্তর দেশে স্বেদ দেওয়ার কার্য্য হইয়া থাকে।

২৭। পার্শ্বশূল, অতিসার, বাত, গলগ্রহ, আধ্মান, স্তিমিত কোষ্ঠ প্রভৃতি রোগে শীতল জল একেবারেই বর্জ্জন করিয়া গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৮। নূতন জ্বর, অরুচি, গুল্ম এবং বিদ্রধি রোগে ও শীতল জলের পরিবর্ত্তে গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৯। গরম জলে স্নান দুর্ব্বল দেহে সালসার কার্য্য করিয়া থাকে।

৩০। যাহাদের রোগ ভাল হইয়াছে—অথচ শরীরে বল হয় নাই—তাহারা গরম জলে স্নান করিবে।

গরম জলের গুণ আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বেত্তা ঋষিগণ—সত্যযুগে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠকগণের আগ্রহ দেখিলে, ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ।

প্রদর রোগ।

LEUCORRHŒA MENORRHAJIA.

—:*:—

কবিরাজী মত।—বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন (অজীর্ণের উপর ভোজন,) অজীর্ণ, মদ্যপান, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, অশ্বাদিযানে অতিরিক্ত ভ্রমণ, অধিক পথভ্রমণ, শোক, অভিঘাত, ভারবহন, উপবাসাদির জন্য ধাতুক্ষয়, দিবানিদ্রা—ইত্যাদি কারণে স্ত্রীলোকদিগের চারি প্রকার প্রদর রোগ হইয়া থাকে।

বেদনা এবং অঙ্গমর্দ্দের সহিত অতিশয় স্রাব হইতে থাকিলে, তাহারই নাম প্রদর রোগ। দুর্ব্বলতা,ভ্রম, মূর্চ্ছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ, আক্ষেপ, দাহ, তৃষ্ণা এবং দেহের পাণ্ডুতা—এইগুলি প্রদর রোগের বর্দ্ধিত লক্ষণ।

বাতিক প্রদরে—স্রাবের বর্ণ কতকটা গোলাপী রঙের, কখনও বা মাংস ধৌত জলের মত, ফেনা মিশ্রিত, স্রাব অল্পে অল্পে হয় বলিয়া তলপেট, কটিদেশ এবং উরুদেশে বিন্ধনবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রদরে—স্রাবের বর্ণ কখন পীত, কখনও নীল, কখনওবা কৃষ্ণবর্ণ। যখন স্রাব হইতে থাকে, রোগিণী স্রাবকে উষ্ণ মনে করে, স্রাব প্রবলবেগে হয়—তথাপি যন্ত্রণা থাকে, গা ঝিম্ ঝিম্ করে, গাত্রদাহ খুব বোধ হয়।

শ্লৈষ্মিক প্রদরে—স্রাব পিচ্ছিল, আঁস্টে গন্ধ, বর্ণ—কখন পীত, কখনও মাংসধোয়া জলের মত।

সান্নিপাতিক প্রদরে—স্রাব, কখনও মধুর মত, কখনও বা ঘৃত মিশ্রিতের মত, কখনও বা চর্ব্বির মত, কখনওবা হলদে রঙ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ। এ প্রদর ভাল হয় না। নিরন্তর অতিরিক্ত স্রাব হইতে থাকিলে, এবং তাহার সঙ্গে জ্বর, গায়ের জ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিলে, রোগী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে—তাহার শরীরে রক্তাল্পতা ঘটে। এরূপ রোগিণীও প্রায় বাঁচেনা।

আর একপ্রকার প্রদর আছে—তাহার স্রাব—ঠিক্ জলের মত। প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়। রোগিণীর মাথা ঘোরে, ব্রহ্মতালু জ্বালা করে, বুক ধড়্ফড়্ করে,—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হয় না—বিদাহ জনিত বুক জ্বালা করে। ইহার নাম "জলপ্রদর", চলিত কথায়—"জলভাঙ্গা" বলে।

ডাক্তারী মত।—ডাক্তারী মতে প্রদর একটী রোগ নহে—একটী লক্ষণ মাত্র। অনেক রোগে উপসর্গের মত এ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। প্রদরের স্রাব বুঝিতে হইলে, প্রথমে স্বাভাবিক স্রাব বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক স্রাব—স্কোয়েমাস ইপিথিলিয়ম হইতে নির্গত হয়, তাহাতে লসিকা মিশ্রিত থাকে। যোনির অভ্যন্তরভাগ স্রাবের পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত থাকে। এই স্রাব—অত্যন্ত তরল, স্রাবের পরিমাণ বেশী হইলে, একটু একটু জমিয়া যায়, তাহাতে সুতার মত পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমারীর এবং স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায়, স্রাবে অধিকাংশ সময়—ভেজাইনা বাসিলাস্ পাওয়া যায়। কখনও বা সামান্য ফঙ্গসও থাকে। ইহা মোনিলিয়া ক্যাণ্ডিডি নামে পরিচিত। কিন্তু রোগজনিত স্রাবে—ইহা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্রাবে—ল্যাকটিক্ অ্যাসিড্ থাকে বলিয়াই ভেজাইনা বাসিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যাসিড্ না থাকিলে বাসিলাসেরও অস্তিত্ব থাকে না।

নবজাত কন্যার ও সূতিকাবস্থায় স্রাবে বাসিলাস বর্ত্তমান থাকে না। এই সময়ের স্রাবের প্রতিক্রিয়া—সমক্ষারাম্ন। ইহা থাকিলে ষ্টাফিলোর কোকাস্, ষ্ট্রীপ্টোকো, কাস প্রভৃতি রোগের উৎপাদক জীবাণু পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। লোকিয়া প্রভৃতি স্রাবে,—ভেজাইনা বাসিলাস্ বর্ত্তমান না থাকার জন্য—স্যাপ্রোফাইটস্ ও ষ্টাফিনো-কোকাস্ ইত্যাদি পরিবর্দ্ধিত হয়।

রোগজনিত স্রাব—তরল, বর্ণ নানারকম, কখনও ঈষৎপীত, কখনও শুভ্র, কখনও পাটল, কখনও সবুজ, কখনও আরক্ত, আবার কখনও পূযের মত। রক্তের ভাগ বেশী থাকিলে—স্রাবের বর্ণ ঘোর লাল হইয়া থাকে।

স্রাব হইবামাত্র তাহা বহির্গত হইলে, কোন গন্ধ থাকে না। কিন্তু স্রাব যদি জরায়ুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া, পরে বাহির হয়—তাহা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। এই স্রাব কখনও জলের মত তরল, কখনও ফেনের মত গাঢ়, এবং চটচটে ও হয়। স্রাব মাত্রায় কখনও বেশী, কখনও সামান্য। রোগজ স্রাবে—ষ্টাফিলো কোকাই, গণোকোকাই, ষ্ট্রেপ্টো কোকাই প্রভৃতি জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় ভেজাইনা বাসিলাস্ ও মোনিলিয়া ও বর্ত্তমান থাকে।

অধিক পুরুষ সংসর্গ, অতিরিক্ত সঙ্গম, অস্বাভাবিক সঙ্গম, পরিষ্কার করিবার জন্য সাবানাদি ক্ষার পদার্থ ব্যবহার, পুনঃ পুনঃ ডুস্ প্রয়োগ—ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিক স্রাব—রোগজ স্রাবে পরিণত হইতে পারে।

স্রাব কখনও শুভ্র—সরের মত, খুব অল্প। এত অল্প যে, অনেক নারী ইহাকে রোগের মধ্যেই ধরেন না।

স্রাবে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, তাহা চটচটে হয়। এইরূপ স্রাব কখনও আর্ত্তব নিঃসরণের পূর্ব্বে, কখনও বা পরেও হয়।

নূতন মেহ ও পুরাতন এণ্ডো মিট্রাইটিস্ থাকিলে—পূয মিশ্রিত পীত বা সবুজ বর্ণের স্রাব হইয়া থাকে।

জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজিত হইলে জলের মত স্রাব হইয়া থাকে। কখন কখন ক্যানসার হইতেও এইরূপ স্রাব হয়।

পূযের পরিমাণ অল্প থাকিলে, শুভ্রস্রাব—শ্বেতপ্রদর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্ষতজন্য, পেশারী অনেক দিন আবদ্ধ থাকিলে ক্যানসার হইলে,—স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্যানসার, এণ্ডোমিট্রাইটিস্, ফাইব্রোমেটা, পলিপস্, জরায়ুর এডোনোমেটাস্, ক্ষত—ইত্যাদি কারণে যে স্রাব হয়, তাহা কখনও ঈষৎ লাল, কখনও রক্তের মত গাঢ় লাল হইয়া থাকে।

জরায়ু গহ্বরে পলিপসাদি জন্মিলে পাটল বর্ণের স্রাব হয়।

স্রাবের জন্য যোনি হাজিয়া যাইতে পারে, ত্বক্ ফাটিয়া যাইতে পারে, উত্তেজনা উপস্থিত

হইতে পারে, চুলকণার উৎপত্তিও হইতে পারে।

প্রসবের পর প্রদাহ হইলে, গর্ভাবস্থায় শোণিত বহায় রক্তাবেগ হইলে, অস্ত্রোপচারের দোষ ঘটিলে, আঘাতাদি লাগিলে, প্রদর লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। ক্রিমির জন্য—বালিকাদেরও শ্বেতপ্রদর উপস্থিত হইতে পারে।

জরায়ু গ্রীবায় কর্কটোৎপত্তির—প্রথম লক্ষণ—প্রদর। জরায়ুগ্রীবায়—ইপিথিলিওমা হইলেও প্রদর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে কোনও রোগ হউক না কেন—শরীরের পোষণ-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলেও প্রদর দেখা দেয়, মানসিক উদ্বেগের জন্য ক্ষণস্থায়ী প্রদর হইতে পারে। জরায়ুর সৌত্রিক অর্ব্বুদে—প্রদর হইতে পারে, তাহার স্রাব শ্বেতবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ। প্রমেহের জন্য শ্বেত প্রদর জন্মিতে পারে—এই প্রকৃতির স্রাবের সংস্পর্শে শুক্রকীট মরিয়া যায়। কাজেই এরূপ নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় না।

প্রদর ঔষধ প্রয়োগে, কখনও বা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আরোগ্য হইতে পারে। ডাক্তারী মতে—ডুস্, ট্যাম্পন, সপোজিটরী প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে প্রদর রোগ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার দ্বারা রোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইতে দেখি নাই। ঔষধের মধ্যে - লৌহ ও সেঁকো উল্লেখযোগ্য। পুরাতন প্রদরে, Cerevisio ফলপ্রদ। ইহা স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসায় স্থায়ীফল দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগের প্রকৃতি অনুসারে জরায়ু গহ্বর চাঁচিয়া দিতে হয়। কখনও বা কোনও অংশ একেবারে কাটিয়া উচ্ছেদ করিয়া দিতে হয়। জরায়ু গ্রীবার গ্রন্থিসমূহে প্রসারিত হইয়া পড়িলে, কটারী ব্লেড দিয়া গভীর ভাবে দগ্ধ করাই উচিত, কিন্তু একার্য্য অতি কঠিন। ২।৪ জন চিকিৎসক একযোগে মিলিয়া, একার্য্য করিতে হয়। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত একার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। বলা বাহুল্য অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে—রোগিণীকে সংজ্ঞাহারক ক্লোরফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান না করিয়া এরূপ চিকিৎসা চলিতে পারে না।

কবিরাজী মতে প্রদরের অসংখ্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। "অশোক ঘৃত", "অশোকাসব" "পুষ্যানুগচূর্ণ" "লাক্ষাদিচূর্ণ" "চন্দনাদিচূর্ণ" "প্রদরান্তক লৌহ" প্রভৃতি মহৌষধ স্থায়ী আরোগ্য কল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন পিচুধারণ, ক্বাথবিশেষ দ্বারা প্রক্ষালন,—সত্বই স্রাব নিবারণ করে।

দার্ব্ব্যাদি ক্বাথ, পঞ্চবল্কল ক্বাথ, গুলঞ্চের ক্বাথ, জটালঙ্কার ক্বাথ—ডুস্ দিয়া প্রয়োগ করিলে ক্যানসার পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

আমি একজন কবিরাজকে কেবল মাত্র পাচন প্রয়োগে একটী সাংঘাতিক প্রদর রোগিণীকে আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি।

সেই পাচনটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

দারুহরিদ্রা—
রসাঞ্জন—
বাসকছাল—
মুথা—
চিরাতা—
বেল শুঁঠ—
ভেলার মুঠী—
নীল শুঁদি—

প্রত্যেক ওজন ।০ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়।*

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
এল্, এম্, এস্।

বিবাহের বয়স।

—:০:—

চিরকাল সর্ব্বদেশেই বিবাহের একটা সময় নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি প্রাগরুক দেখিতে পাই। বিবাহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সর্ব্বদেশের মতানুযায়ী নহে কিন্তু বিবাহের দৈহিক সম্পর্কটা সকল দেশেই একই ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

এই দৈহিক সম্পর্কটাই বিবাহকে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনার গণ্ডীতে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই দৈহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়াই বিবাহ—স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বিবাহ আদৌ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত কিনা —সে কথা এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। সভ্য সমাজ-মাত্রেরই স্থষ্টি প্রবাহ যখন এই প্রথার আশ্রয়েই সংরক্ষিত হয়, তখন অবশ্য বিবাহকে করণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এ প্রথার সর্ব্ব অত্যাচার ও ব্যভিচারই যে শিরোধার্য্য করিতে হইবে—তাহা নহে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে এ প্রথার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

মানুষের সভ্যতা তাহার যাবতীয় প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ফেলে। সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্যকে নিয়মবদ্ধ করিবার জন্য সকল সভ্য সমাজেই বিবাহ প্রথার স্থষ্টি।

সন্তানোৎপাদন যদিও স্থষ্টি ধারা রক্ষণের নিমিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য, তথাপি ইহাকে নিয়মবদ্ধ করার এই উদ্দেশ্য যে, সন্তান-জনন ক্রিয়া প্রায়শঃই স্বাস্থ্যহানিকর। তাই এই জনন ক্রিয়াকে এরূপ সংযত ও নিয়মিত করিতে হইবে—যাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে। আত্মবীর্য্যের ক্ষয়দ্বারা সন্তানের স্থষ্টি হইয়া থাকে। বীর্য্যই আবার শারীরিক বল ও মানসিক মেধাদির কারণ। অতএব বীর্য্যের ক্ষয়ে শরীর ও মনের শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। তাই এমন সাবধানতার সহিত এই জনন কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত—যাহাতে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। এক

---

* এ পাচনটি 'দার্ব্বাদি' নামে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ইহা 'প্রদরে'র বিখ্যাত পাচন। ইহার মূলের বচন এইরূপ—

দার্ব্বী রসাঞ্জন বৃষাব্দকিরাত বিল্ব—ভল্লাতকৈবর কৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতো জয়ত্য বলং প্রদরং সশূলং পীতং সিতারুণ বিলোহিত নীল শুক্লম্॥—আঃ সং

কথায় বলিলে সন্তানোৎপাদন ও স্বাস্থ্যরক্ষা—দুইটাই যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়—যাহাতে সন্তানোৎপাদন-ক্রিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার মধ্য দিয়া সাধিত হইতে পারে।

মনে রাখা উচিত—সন্তানোৎপাদন একটা অতি বড় দায়িত্ব। সেবার প্রবৃত্তি এখানেও প্রবুদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এমন সন্তান জগতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যাহার দ্বারা মাতৃভূমির সম্পদ্ বাস্তবিকই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—জননী জন্মভূমির প্রকৃত সেবা সম্ভবে। নিজের কাম-বাসনার উত্তেজনার ফল স্বরূপ রুগ্ন, নিন্দিতচরিত্র কাপুরুষের সৃষ্টি করিয়া ধরার পাপভার বৰ্দ্ধিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। যিনি স্বদেশের উপর এই অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করেন, তিনি মাতৃভূমির অযোগ্য পুত্র ও চিরজীবন কৃতঘ্নতা পাপে লিপ্ত রহেন। অতএব যখন মনোবৃত্তি সমূহের সম্যক স্ফূরণ হইয়াছে—আমরা কতকটা আত্মস্থ হইতে শিখিয়াছি—বিবাহের উদ্দেশ্য বেশ বুঝিয়াছি—দায়িত্ববোধ বেশ জন্মিয়াছে—তথনই সন্তান জনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার আগে নহে। অতএব সোজা কথায় বুঝিতে গেলে—স্বাস্থ্যকে বজায় রাখিয়া সন্তানোৎপাদন কার্য্য যে বয়সে সম্ভবে, সেইটাই পরিণয়ের বয়স।

কিন্তু এখানে একটু ভাল করিয়া বলিবার বিষয় আছে। আমার কথার ভঙ্গিতে কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিতেছেন যে—আমার উদ্দেশ্য অধিক বয়সে বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করা; কারণ বেশী বয়স ভিন্ন মানুষের দায়িত্ব বুদ্ধি ও সংযম শক্তি জন্মেনা। বাস্তবিকই আমি আমার বক্তব্যকে এখানে একটু অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাই স্পষ্ট করিয়া কথাটা আবার বলিতেছি।

সন্তানোৎপাদন অবশ্যই বয়ঃপ্রাপ্তির পরে কর্ত্তব্য। কিন্তু সন্তানোৎপাদন ও বিবাহ—দুইটা কি একই কথা? অন্ততঃ আমার তাহা মনে হয় না। আমার মনে হয়, বিবাহ যেন একটা বড় বৃত্ত, সন্তানোৎপাদন যেন একটী ক্ষুদ্র বৃত্তাংশ। বিবাহ যদি কখন সন্তানোৎপাদনের সহিত একই অর্থ প্রকাশ করে,—তবে অবশ্য পরিপক্ক বয়সে বিবাহের ঔচিত্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু বিবাহের অর্থ যেখানে বিশদ—পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেখানে স্ত্রীর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের সর্ব্ববিধ ভার বহন, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ যে সমাজে যাবজ্জীবন একই স্বামীর অর্চনা, সতীত্বের চরম আদর্শ—যে দেশে সেই একই স্বামীতে অনুরক্তি,—স্ত্রীজাতির ধর্ষণ যে সমাজে মহাপাপ,—এক কথায় যে সমাজে বিবাহ—সন্তানজননকে ভিত্তি করিয়া আধ্যাত্মিকতার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সে সমাজে পুরুষের পক্ষে না হউক—অন্ততঃ স্ত্রী-জাতির পক্ষে বাল্য বিবাহের যে মোটেই দাবী থাকিতে পারিবে না—তাহা কিরূপে বলিব?

আমরা প্রথমে বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনকে একই অর্থে ধরিয়া বিবাহের বয়সের আলোচনা করিব, তৎপরে বিবাহকে বিশদ অর্থে বুঝিয়া বিবাহের বয়সের পুনরালোচনা করিয়া দেখিব। সর্ব্বশেষে উভয়ে আলোচনার ফলকেই আধুনিক সমাজের বিবাহের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া একটা সামঞ্জস্যের স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব।

ইতর প্রাণিগণ, পৃথিবীর অসভ্যজাতিগণ ও জড়বাদী সভ্যজাতিগণ বিবাহকে সন্তানোৎ-

পাদনের সহিত একই অর্থে ধরিয়া লয়—বিবাহের আধ্যাত্মিকতা ইহাদের নিকট অলীক স্বপ্ন। কিন্তু ইতর প্রাণী ও অসভ্য জাতির সহিত সভ্যজড়বাদী জাতির কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ইতর প্রাণীরা সন্তানোৎপাদনের দায়িত্বজ্ঞানমাত্র শূন্য, তাই মাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া নৈমিত্তিক বিবাহ করে, এমন কি নিষিদ্ধ ও অবৈধ সঙ্গমের উপভোগ করে,—তাই ইতর প্রাণীর মধ্যে সঙ্গম একেবারে অবাধ,—তাই প্রাচীন অসভ্যজাতির যুগে পৈশাচ-রাক্ষস প্রভৃতি নানারূপ নিন্দিত বিবাহ প্রথার প্রচলন। কিন্তু আধুনিক যুগের সভ্য জড়বাদী এই দায়িত্বটা বিলক্ষণ বোঝে, তাই তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃ নিত্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে ও সামাজিক বন্ধনের সুশৃঙ্খলার জন্য অনিয়মিত, অবৈধ সঙ্গম নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব অবর্ত্তমান। তাই ইহাদের বিবাহ—সন্তানকে জারজত্বের অপবাদ হইতে বাঁচাইবার জন্য একটা আইনানুযায়ী চুক্তি (contract),ধর্ম্ম এখানে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী-সতীত্বের একাগ্রতা এখানে নাই—বিভিন্ন সময়ে ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণের নিয়ম এখানে আছে—স্বামীর জীবন কাল পর্য্যন্ত যে নারী বিশ্বস্ত রহেন—তিনিই চরম সতী। বৈধব্যকে শিরোধার্য্য করিয়া পরকালের পানে স্বামী-প্রেমের প্রত্যাশায় চাহিয়া থাকার মাধুর্য্য এ সমাজের নারীর মর্ম্মস্পর্শ করে না। এইরূপ জড়বাদী জাতির অপ্রাপ্ত বয়সে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েরই বিবাহ হওয়া একান্ত অকর্ত্তব্য —নিতান্ত গর্হিত। কেননা সন্তানোৎপাদনই ইহাদের বিবাহের উদ্দেশ্য—কাজেই অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ—হয় নিষ্ফল,—না হয় প্রাণহানিকর এবং রুগ্ন সন্তান সৃষ্টির কারণ।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। স্নায়ুমণ্ডলী যাবৎ বলিষ্ঠ ও সুবর্দ্ধিত হয় নাই, মজ্জা অপরিপক্ক রহিয়াছে—তাবৎ শুক্রক্ষয় করা কোনো সভ্যজাতি সম্মত নহে। সুতরাং বিবাহকে যদি আমরা জড়বাদীর মত স্ত্রীগমন ছাড়া আর কিছুই না বুঝি—তবে পরিপক্ক বয়সেই মাত্র বিবাহ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হয়।

কোন্ সময় স্ত্রীগমনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত—তাহা লইয়া বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু তর্ক আছে। সে তর্কের মীমাংসা আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তবে সোজা কথায় বিভিন্ন তর্কগুলি বাছিয়া এই একটী সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে—পুরুষের পক্ষে পঁচিশের' পর অর্থাৎ যে বয়সটা পর্য্যন্ত শুক্র অপরিপক্ক ও মন চঞ্চল থাকে—সেই বয়সটা উত্তীর্ণ হইলে পর স্ত্রীগমনের উপযুক্ত সময়। স্ত্রীগণ ঋতুমতী হইবার অন্ততঃ দুই বৎসর পরে মাতার কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়। তখন তাহাদের শরীর সুবর্দ্ধিত হয় ও বুদ্ধি—সন্তান পালনের গুরুভার লইবার পক্ষে সমর্থ হয়। তবে একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সন্তানোৎপাদনের বয়স সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব। স্বাস্থ্যের ভেদাভেদে ঐ বয়স নির্ণীত হওয়া উচিত। নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য কোনো উৎকট বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্তানোৎপাদনের কার্য্য করা—অতএব জড়বাদীর মতে বিবাহ করা কোনোক্রমেই উচিত নহে। তাহাতে পৃথিবীতে রোগের প্রসার বৃদ্ধি হয় ও অকর্ম্মণ্যজীব-প্রবাহের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ স্বাস্থ্য ও মন বিশেষ উন্নত থাকিলে, কিঞ্চিৎ কম বয়সেও সন্তানজননের কার্য্য করা যাইতে পারে। মোটের উপর জড়বাদীর চক্ষু দিয়া দেখিতে গেলে, যখন শুক্র ধাতু সুস্থ-সন্তান জননের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে—ও মনের বিশেষ কর্ত্তব্য বুদ্ধি জন্মিয়াছে—তখনই বিবাহের বয়স।

কিন্তু প্রাচীন হিন্দু কখনও বিবাহকে জড়-বাদীর চক্ষু দিয়া দেখে নাই। সে বিবাহকে চিরকালই আধ্যাত্মিকতার সহিত মিলিত করিয়া দেখিয়াছিল। তাহার পক্ষে বিবাহ মাত্র আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না—মাত্র চুক্তি বা contract বলিয়া বিবেচিত হইত না —সে বুঝিত—বিবাহ একটা অতি বড় ধর্ম্ম—ইহা একটা sacrament—সে বুঝিত—সন্তান জননের সহিত বিবাহ সম্পর্কীভূত বটে, কিন্তু সন্তানজননই ইহার উদ্দেশ্য নহে। প্রেমে মুক্তি—বিবাহের চরম ফল,—এই চরম ফলকে লক্ষ্য করিয়া চলিবার পথে সন্তানোৎপাদন একটী প্রকৃষ্ট উপায়। সন্তান শুদ্ধ যে সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা করে—বংশরক্ষা করে,—নাম রক্ষা করে —তাহা নহে, মাতাপিতার আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে, দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করে। বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতালাভ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি। পুরুষ উগ্রতার মূর্ত্তি, স্ত্রীজাতি কোমলতার মূর্ত্তি। বিবাহে এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তির—এই উগ্রতার ও এই কোমলতার—মিলন হইয়া থাকে। উভয় শক্তি পরস্পরের মধ্যে গুণের আদান প্রদান করিয়া স্বকীয় অভাব পূরণ করে ও পরকীয় অভাব মোচন করে। স্ত্রীজাতি—পুরুষের নিকট শিখে—স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর, মানসিক বল ইত্যাদি। পুরুষ, স্ত্রীজাতির নিকট শিখে—কোমলতা, বাৎসল্য, ধৈর্য্য, দয়া ইত্যাদি। যখন উভয়ে উভয়ের সহিত আদান প্রদান করিয়া গুণের equilibrium প্রাপ্ত হয় বা গুণ বিষয়ে সমশক্তি সম্পন্ন হয়—তখনই তাহারা ঈশ্বরের চিন্তা করিবার অধিকারী হয়, কারণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে হইলে মনকে প্রেমে তন্ময় করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রাচীন হিন্দুর মতে প্রকৃতি-পুরুষের অপূর্ব্ব সম্মিলনের পরিণাম। দুই বিভিন্ন শক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সংস্থাপিত। উগ্রতা, কোমলতার সঙ্গে মিশিয়াছে, ক্রোধের বক্ষে ক্ষমার মণিমালিকা দোদুল্যমান, বীর্য্যের সঙ্গে ধৈর্য্যের গরিমাময় পরিণয় সাধিত হইয়াছে।

এই উজ্জ্বলে মধুরে মিশিবার পথে সন্তান প্রধান সহায়—তাই সে দুই শক্তির মিলনের পরিণাম দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করিয়া দেয়। সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, সেই সময়ই বিবাহ সার্থক হয়—কিন্তু জড়বাদীর অর্থে নহে। দুইটী বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন প্রাণী প্রথমতঃ কামজ মোহ লইয়া একত্র হয়—তাহাদের মন তখনও পরস্পরের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করে—দ্বন্দ্বের তখনও নিরাকরণ হয় না, কিন্তু সন্তান আসে সন্ধির মূর্ত্তিতে—দুই শক্তির অপূর্ব্ব সাম্যবিধান করিয়া—সর্ব্বদ্বন্দ্বের নিরাকরণ করিয়া—বিভিন্ন দুইটা শক্তিকে একত্র গ্রথিত করিয়া। সন্তান তাই দাম্পত্য মিলনের মূর্ত্ত অবস্থা—মহা জয়ের মাল্য তাহার গলে, মুক্তির ঘণ্টা তাহার হাতে বাজিতে থাকে। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই দেখে—তাহাদেরই শক্তি মিলিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা দেখে—তাহাদের সন্তান তাহাদের কাহারই সঠিক প্রতিমূর্ত্তি নহে, অথচ একই সময়ে উভয়েরই অনুরূপ—তাহাদের উভয়ের সাম্য

প্রাপ্ত বিভিন্ন শক্তির প্রতিফলিত ছবি—ঈশ্বরের স্বরূপের আলোক চিত্র। সন্তান-স্নেহ তাই ঈশ্বরের পূজার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। স্নেহ, ভক্তির সহিত গিয়া মিশে; মর্ত্ত্যের আনন্দের উপর—ইহকালের সাংসারিক জীবনের উপর —কর্ত্তব্যের উপর—স্বর্গের রশ্মি পরকালের মুক্তির প্রতিবিম্ব আসিয়া পড়িয়া ঝলসিয়া উঠে।

এই প্রাচীন হিন্দুর আদর্শে যদি আমরা বিবাহকে বুঝি—তবে দেখিব—বিবাহের মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে! বিবাহ তখন মানব জীবনের কতিপয় চরম উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমরা বুঝিতে পারিব—বিবাহ কেবল দৈহিক সংযোগমূলক নহে—বিবাহের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মনের মিলন—আত্মায় আত্মায় অন্তহীন মৌন মহাচুম্বন। সন্তানোৎপাদন এই মিলনের একটা হেতু। বিবাহের বয়স তাহা হইলে মাত্র শরীরের পরিণতি দিয়া স্থির হইবে না, মনের উন্নতির কথাও ভাবিতে হইবে। মন যখন বিদ্যাভ্যাসের ফলে প্রেমের স্বরূপ বুঝিয়াছে, তখনই বিবাহের বয়স আসিবে—তাহার আগে নহে। তাই দ্বিজের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্র পঞ্চবিংশ বর্ষের পর বিবাহের বয়স ধার্য্য করিতে চাহে। দ্বাদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া, বারো বৎসর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া, নানাবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া দ্বিজের যখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও বীর্য্য স্তম্ভিত হইয়াছে, তখনই মাত্র সে প্রেমমুক্তি যজ্ঞে ব্রতী হইতে পারে, তাহার আগে নয়। পুরুষের কথা হইল, এইবার স্ত্রীলোকের কথাটা বলি।—স্ত্রীলোকের পক্ষে বাল্যবিবাহ নিতান্ত সমীচীন বলিয়া মনু প্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ স্থির করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ চঞ্চলপ্রকৃতি ও ভাব প্রবণ, তাই হিন্দু ঋষি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই—কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে না হইতে—নবম বর্ষে বালিকাকে সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ, সুশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয় স্বামী, স্ত্রী-মাতৃকার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভার্য্যাভিগমনে বিরত থাকিতেন। সন্তান জনন কার্য্য স্থগিত থাকিলেও বিবাহ নিষ্ফল হইত না। ইতোমধ্যে উপযুক্ত স্বামী, স্ত্রীকে স্বীয় ছন্দানুবর্ত্তিনী করিয়া গড়িয়া তুলিতেন। দৈহিক মিলনের বহুপূর্ব্ব হইতেই আধ্যাত্মিক মানসিক মিলনের ক্রিয়া চলিতে থাকিত। কন্যাকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই যোগ্যপাত্রে দান করিয়া মাতা পিতা শুদ্ধ যে সামাজিক দায় হইতে মুক্ত হইতেন তাহা নহে—কন্যাকে বাল্যেই স্বামী-হস্তে সুশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইত, অধিকন্তু কন্যা হইতে জাতিনাশের সম্ভাবনা একেবারেই নিরাকৃত হইয়া যাইত।

কিন্তু সে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার যুগ আজ আর নাই,—হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা আজ পাশ্চাত্যের জড়বাদের সঙ্গে মিশিয়া একটা খিচুড়ি করিয়া তুলিয়াছে। আজ ব্রহ্মচর্য্য-জীবনের স্বতন্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত ভারতের বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাই বিবাহের আদর্শ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে,—আজ তাই এই জড়ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া, নূতন করিয়া আবার বিবাহের বয়স নিরূপণের সময় আসিয়াছে।

আজ সমাজ বিশেষে স্ত্রী স্বাধীনতা,—প্রকাশ্য দরবারে স্ত্রীশিক্ষার যুগ ভারতে বর্ত্তমান। এ সম্প্রদায়ের বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বিবাহের বয়স নিরূপণ করিব তাহাদের—যাহারা আজও

হিন্দুর আধ্যাত্মিকতাকে প্রণাম করে—কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে জড়বাদের হাত একেবারে এড়াইতে পারে না—যাহারা হিন্দু ছিলাম—হিন্দু রহিব—বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে—আমাদের সেই অতি আদরের হিন্দু সন্তানকে আজ আমরা এইরূপে বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতে অনুরোধ করি।

পুরুষ আজ জড়বাদের প্রতাপে বড় উগ্র হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে,—স্ত্রীজাতি আগের মতই চঞ্চল থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সমাজেই আজিও স্ত্রীলোক সলজ্জ। তাই স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতেই আজ আমাদের বেশী বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য অপরিপক্কশরীর বালিকাকে অস্থির মতি উগ্রস্বভাব যুবকের সহিত সঙ্গত হইতে দেওয়া কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে, কিন্তু আমার মনে হয়—তাই বলিয়া আজ আর যুবককে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার আশা বেশী করা যাইতে পারে না। এখনকার যুবকগণ আগেকার মত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ নহেন, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযমে তাঁহারা অধিকারী নহেন। এ সব কথা এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে, সুতরাং সে সব কথার পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করার আবশ্যকতা দেখি না। মোটের উপর সমাজ এখন আগেকার অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে—সেইজন্য এখনকার দিনে যুবকের পক্ষে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকা বিশেষ নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না, তাই আমার মনে হয় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এদেশের ছেলেরা যখন বিবাহ কি বুঝিতে পারে—তখনই তাহাকে বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহাতে তাহার স্ত্রীর প্রতি একটা দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার অনেকটা সম্ভাবনা। এই দায়িত্ব বুদ্ধি অনেকটা তাহাকে সর্ব্বনাশের ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিতে বাধা দিবে—একটা শঙ্কা তাহাকে অনেকটা বাঁচাইয়া রাখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া অভিভাবকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে—মন না হউক, অন্ততঃ শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীকে কখনও সঙ্গত হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। বিবাহ সাধিত হউক—স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে দেখুক, কিন্তু প্রাপ্ত বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যেন শারীরিক সম্মিলন লাভ না করিতে পারে।

শেষ কথা 'আতুরে নিয়মো নাস্তি'।

'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'।

যদি এমন অবস্থা হয় যে, যুবক ক্রমেই বিশৃঙ্খল হইয়া চলিয়াছে ও তাহাকে রক্ষা করিবার সর্ব্ব চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অপরিপক্ক বয়সেও উপযুক্ত বালিকার সহিত যুবককে পরিণীত ও সঙ্গত করা একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে যুবক নৈতিক অবনতি হইতে অনেক সময় রক্ষা পাইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুমিত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের বাক্যই আমার মানিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়, কারণ অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীজাতির এই জড়বাদের যুগেও পূর্ব্বের যুগের অপেক্ষা বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। জড়ত্বের আবহাওয়াটা পুরুষের উপর দিয়াই বেশী বহিতেছে। স্ত্রীলোকের উপর দিয়াও যদি বহিয়া থাকে—তবে সে সম্প্রদায় বিশেষে।

আমার কথাটা এক কথায় বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়—বিশেষ কারণ ব্যতীত সাধারণতঃ আমাদের আধুনিক হিন্দু সমাজে (কিংবা ভারতের অনেক সমাজেই) স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে ও পুরুষের পরিপক্ক বয়সে বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। অধিকন্তু ভারতের মত উষ্ণপ্রধান দেশে যখন অল্পেই যৌবনকাল আবির্ভূত হয়, তখন বিলাতের আদর্শে আমাদের বিবাহের বয়স স্থির করা অনুচিত। যাহারা পরিপক্ক বয়স ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় জাতির পক্ষেই বিবাহ হওয়া উচিত নহে মনে করে—তাহাদিগকে, ভারতের মানুষের আয়ুষ্কালের স্বল্পতা, ও যৌবনের শীঘ্রোদ্গমনের কথা স্মরণ করাইয়া বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। মন্বাদি আর্য্যঋষিগণ সেই সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়াই বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এক কথায় আমাদের পক্ষে তাহাই মানিয়া চলা উচিত।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

ক্ষয়-রোগের বিস্তৃতি নিবারণ।

[রোগীর প্রতি উপদেশ]

——:*:——

আমি যখন প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই—সেটা বোধ হয় ১৮৯৯ সাল—তখন এদেশে এত যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এখন দেখিতে দেখিতে এ রোগ দেশব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। রোগের ভীষণত্ব ও পরিণাম দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছে,—যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসকের অসাধ্য ব্যাধি। কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যাঁহারা শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, অন্য শারীরিক যন্ত্রের পীড়া বশতঃ মৃত্যু হইয়াছে—এরূপ শবের ব্যবচ্ছেদ কালীন শতকরা দশজনের ফুস্ফুসে যক্ষ্মারোগের আরোগ্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে যক্ষ্মারোগ আপনা আপনিই ভাল হইতে পারে—চিকিৎসিত হইলে ত কথাই নাই। আমি কবিরাজী চিকিৎসায় ৪।৫ জন ক্ষয়রোগীকে ভাল হইতে দেখিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদে ক্ষয়রোগের অনেক উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। সে সকল কথা বিশেষজ্ঞেরা বলিবেন। আমি কেবল ক্ষয়রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিব।

১। যেথানে সেথানে থুথু ফেলিবেনা। এমন কি পথে ঘাটে—যথায় সর্ব্বদা লোক জনের গতিবিধি, সেথানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

২। কাসিতে কাসিতে যে শ্লেষ্মা উঠিবে, কদাচ তাহা গিলিবে না। কারণ সেই শ্লেষ্মা উদরে যাইয়া জীবাণুর অতি-বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপসর্গও ঘটাইতে পারে।

৩। একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে শ্লেষ্মা ফেলিবে। ঐ পাত্র ধাতু পাত্র হইলে—প্রত্যহ ২ বার, অত্যুষ্ণ জলে ১ ঘণ্টা করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে,

পরে তাহাতে ক্লোরিনেটেড লাইম ও জল পূর্ণ করিয়া তাহাতেই থুথু ফেলিবে। পাত্র অভাবে কাগজে বা নেকড়ায় থুথু ফেলিয়া উহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

৪। যে রুমাল বা গামছা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিতে পারিবে না, সেরূপ রুমাল বা গামছায়—মুখ এবং গাত্র কখনও মুছিবে না।

৫। ক্ষয়রোগীরা প্রায়ই দেবতা বিশেষের কাছে মানত করিয়া দাড়ী, গোঁফ, চুল ও নখ রাখিয়া থাকে। ইহা বড় সাংঘাতিক। মুখের দাড়ী-গোঁফ—একেবারে কামাইয়া ফেলিবে। হাতের নখ—কাটিয়া ফেলিবে। মাথার চুল রাখায়—তাদৃশ আপত্তি নাই।

৬। কোন কিছু আহার করিবার পূর্ব্বে, মুখ, ওষ্ঠ ও হাত—বেশ করিয়া প্রক্ষালন করিবে।

৭। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবে।

৮। গরম দুগ্ধ শীতল করিবার জন্য—ফুঁ দিবে না। ফুঁ দেওয়া দুগ্ধ নিজেও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না।

৯। নিজের পুত্র কন্যাদির মুখ চুম্বন এবং বন্ধুর সহিত করমর্দ্দন করিবে না।

১০। লোকের সম্মুখে কাসির বেগ উপস্থিত হইলে, মুখে চাপা দিয়া কাসিবে।

১১। যতক্ষণ পারিবে—মুক্ত বাতাসে বসিয়া থাকিবে।

১২। কখনও পরিশ্রমজনক ব্যায়াম করিবে না।

১৩। রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম—সকল সময়েই ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাইবে। এজন্য ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় করিও না, কেবল গাত্রে একটা আচ্ছাদন দিবে।

১৪। রাত্রে—শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিবে, দিবসে আদৌ নিদ্রা যাইবে না।

১৫। কাজ করিতে হইলে বাড়াবাড়ি করিবে না, ধীরে সুস্থে করিবে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামও করিবে।

১৬। চিকিৎসকের উপদেশ ভিন্ন ঔষধ সেবন করিবে না। ঔষধে অনেক সময় উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে—এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।

১৭। সুরা ঘটিত উত্তেজক পদার্থ সেবন করিও না।

১৮। যে দ্রব্য পরিপাক করিতে বিলম্ব হয়, তাহা খাইবে না।

১৯। নিজের রোগকে অসাধ্য ভাবিয়া আরোগ্যে হতাশ হইওনা। আজ কাল বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের কৌশলে অনেক ক্ষয়রোগী মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে উৎসাহ এবং প্রতিকারে আগ্রহ থাকিলে, তোমার রোগও ভাল হইবে। এই বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করিও না। মানুষের দেহে সৃষ্টিকর্ত্তার এমন কৌশল আছে, যে কৌশলে ক্ষয়রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে পারা যায়।

২০। নিজের পীড়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে—এরূপ চিন্তা মন হইতে একেবারেই দূর করিবে।

২১। তোমার রোগে—তোমার আত্মীয়-স্বজন যাহাতে আক্রান্ত হইতে না পারে, সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে।

২২। লালবর্ণের জামা ও বস্ত্র এবং ঐ প্রকারে শীত বস্ত্র কখনও ব্যবহার করিবে না।

২৩। রাগ, দুঃখ, অভিমান ত্যাগ করিবে।

২৪। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না।

২৫। স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখিবে না। যে পুস্তকে প্রণয় ঘটিত ব্যাপার বা স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—সে পুস্তক পর্য্যন্ত পড়িবে না।

২৬। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গে দিন কাটাইবে।

২৭। লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করিবে।

২৮। সম্ভব হইলে, প্রত্যহ অন্ততঃ এক ছটাক ছাগলের দুগ্ধ পান করিবে এবং স্বহস্তে অন্ততঃ একঘণ্টা কাল ছাগলের সাহচর্য্যে থাকিয়া তাহার সেবা করিবে।

২৯। নারিকেল কুরিয়া তাহার দুগ্ধ বাহির করিয়া,সেই দুগ্ধে—তাহার চতুর্গুণ জল মিশাইয়া—একটী কাচ বা প্রস্তর পাত্রে করিয়া রাত্রে শিশিরে রাখিয়া দিবে, একখানি পাতলা কাপড় দিয়া ঐ পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া ঐ পাত্রের উপরিস্থিত স্নেহপদার্থ টুকু খাইবে।

৩০। সহ্য করিবার শক্তি থাকিলে, প্রত্যহ টাট্‌কা দুগ্ধের সহিত কাঁচা ডিম মিশাইয়া খাইবে। প্রথমে একপোয়া দুগ্ধে একটী ডিম, তিনদিন পরে, আধসের দুগ্ধে দুইটী ডিম, আরও ৩দিন পরে—তিন পোয়া দুগ্ধে ৩টী ডিম—এইরূপে পরিপাক শক্তি বুঝিয়া ডিম ও দুগ্ধ বাড়াইবে। ইহাতে দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে।

৩১। উন্মুক্ত বাতাসে দাঁড়াইয়া—প্রত্যহ—২।১ মিনিট করিয়া গভীর শ্বাস গ্রহণ করিবে, ইহাতে ফুস্‌ফুস্ সবল হইবে।

৩২। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে জোলাপ লইও না।

ক্ষয়-রোগ বীজাণুর প্রতিষেধক।

—যক্ষ্মা জীবাণু—দেহে প্রবেশ করিলে, তাহা একেবারে ধ্বংস করা অসম্ভব। ঔষধপ্রয়োগে উক্ত জীবাণুর বংশ বৃদ্ধির হ্রাস করা যায় মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে—এই কার্য্যের জন্য যে সব ঔষধ পরিকল্পিত হইয়াছে—ক্রিয়সট তাহার অন্যতম। আমি ক্ষয়রোগে "ক্রিয়সট" বা তদ্ঘটিত 'গুইএকল' বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এই ঔষধ—যক্ষ্মাবীজাণু হ্রাস করিবার জন্য অনেকদিন হইতেই চিকিৎসক সমাজে প্রচলিত আছে।

বৈদ্যমতে—বাসকবৃক্ষ ক্ষয়রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এমন কি, বাসক ব্যবহার করিলে, ক্ষয়রোগীর বিপদের ভয় থাকে না—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্ত। যথা—

"ক্ষয়োৎপত্তি বিনাশায় সিংহাস্যং সেব্যতাং সদা।"—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি বহুস্থলে বাসক পাতার রসের সহিত ক্রিয়সট মিশাইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিয়া—আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

বাসকপাতার রস ২ ঔন্স বা একছটাক, রস অভাবে পাতা সিদ্ধ জল—আধপোয়া লইয়া তাহাতে ২৪ মিনিম ক্রিয়সট মিশ্রিত করিয়া—দিনে রাতে ৪ বারে ইহা খাইতে হইবে। ইহাতে কাসির উপশম হয়, পুয় দোষ ও দুর্গন্ধ দূর হয়, রক্ত ওঠা নিবারণ করে। অধিকন্তু—অন্ত্রশুদ্ধ এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাসক—জ্বর নষ্ট করে—রাত্রিকালের ঘাম বন্ধ করে, অতিসার ভাল করে।

তবে এই দুইটীর মিশ্র খাইতে অত্যন্ত বিস্বাদ। একে বাসকের তিক্ত রস, তাহার সঙ্গে ক্রিয়সটের দুর্গন্ধ! পাচালীর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"এরা 'ছ'জন' স্বজনেরই চূড়ো,
যেমন, আদার রসে গোল মরিচের গুঁড়ো।

ক্রিয়সট জীবাণু নাশক, ইহা নিতান্তই খাইতে না পারিলে ইহার স্থলে—পিপারমেণ্ট তৈলও দেওয়া চলে। কিন্তু বাসককে ত্যাগ করা চলে না। বরং বাসকের দুঃস্বাদ দূর করিবার জন্য বাসকের কাথে চিনী দিয়া পাক করিয়া সিরাপ প্রস্তুত করা উচিত। সামান্য সর্দ্দী কাসি, ব্রঙ্কাইটিস হইতে—অসাধ্য ক্ষয়কাসি পর্য্যন্ত বাসক প্রয়োগে আরোগ্য হইতে পারে। এটী পরীক্ষিত সত্য।

পথ্য।—ক্ষয়রোগী এমন পথ্য গ্রহণ করিবে—যাহাতে ক্ষয়ের পুরণ হইতে পারে। ক্ষয়ের পুরণ করিতে পারিলেই—রোগীর জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর বিষ ক্রিয়াও নষ্ট হইবে। অতএব পথ্যের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা চাই। ক্ষয়রোগীকে যত পারিবে খাওয়াইবে। উপবাস দিতে দিবে না।

প্রত্যহ প্রাতে ১ গ্লাস উষ্ণজল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। ১১টার সময়—অবস্থা বুঝিয়া রুটী বা অন্নের সঙ্গে—এক পোয়া মাংসের ঝোল বা মসুর ডালের যুষ, টাটকা শাক-সব্জি তরকারি; ৩টার সময় আঙুর পেঁপে প্রভৃতি ফল ও দুগ্ধ; রাত্রে—লুচি, রুটী, মোহনভোগ, শয়ন করিবার সময়—বার্লি মিশ্রিত দুগ্ধ—এক বাটী। অবশ্য প্রবল জর ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। রোগীর হজমশক্তি থাকিলে, এবং মাংস ভোজনে আপত্তি থাকিলে ভুট্টার আটার রুটী ও মসুর যুষ—উৎকৃষ্ট পথ্য। মসুর ডালে ফস্‌ফেট ও লৌহ থাকায়; ভুট্টায় স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকায়—ক্ষয় নিবারণ করে। দুগ্ধ ও মাংস যে ক্ষয় নিবারক—বহুযুগ পূর্ব্বে ঋষিরাও ইহা জানিতেন; যথা—

"ক্ষয়ে মাংস রসঃ পয়ঃ।" আমাশয় বা উদরাময় থাকিলে, প্রথমে শীতল জলে নস দ্বারা আমাশয় ধুইয়া ফেলিবে, পরে দুগ্ধের সহিত ডিমের শ্বেতাংশ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

পরিচ্ছদ।—পরিচ্ছদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে। গাত্রে বেশী কাপড় জড়ানো ভাল নহে। পোষাক খুব ভারি না হয়। যাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে, অথচ ঘাম গায়ে না বসিতে পারে, এইরূপ পোষাক নির্ব্বাচন করিবে। পরিধেয় বস্ত্রাদি—দুইবেলা পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। পায়ে সর্ব্বদাই মোজা রাখিবে, ঋতুভেদে পরিচ্ছদ পাৎলা বা মোটা স্থির করিয়া লইবে।

বাসগৃহ। শুষ্ক ও উচ্চভূমিতে স্থিত যে গৃহ—ক্ষয় রোগী সেইগৃহে বাস করিবে। অথচ ঘরের পার্শ্বে গাছ পালা না থাকে। ঘরে রীতিমত রৌদ্র ও বাতাস আসা চাই।

বায়ু পরিবর্ত্তন।—ডাক্তারী মতে চেঞ্জ ক্ষয় রোগীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। চেঞ্জের আবশ্যক—পূতিন্ন বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রাপ্তির সুবিধা এবং রমণীয় দৃশ্য দর্শনে মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন। আমাদের এ দেশের সহর গুলি কল কারখানা, ড্রেণ পাইখানা, বহু লোক জনে পূর্ণ, কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত। অধিকন্তু এ সকল সহর মলমূত্র আবর্জ্জনা, ধূম ও কাদাধূলায় ভরা; পল্লীগ্রামগুলিও বন জঙ্গলে খানা ডোবায় পূর্ণ; সুতরাং কি সহর, কি পল্লীগ্রাম—সকল স্থানেরই জলবায়ুই দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। বরং পল্লীগ্রামের তত দূষিত নয়, সহরের বাতাস যত দুষ্ট। এইরূপ সহরে

সুস্থ মানুষ বাস করিলেই যক্ষা রোগ হয়। প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসকগণ বলিয়া গিয়াছেন—হেতু বিপর্য্যয়ই রোগের উত্তম প্রতিকারের পন্থা। অতএব যে স্থানে থাকিলে মানুষের রোগ জন্মে, রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে সে স্থান ছাড়িয়া যাওয়াই সদ্বিবেচনার কার্য্য।

এখন দেখা যাউক—ক্ষয়রোগী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোন্‌স্থানে যাইবে?

যে স্থানের বাতাসে ধূলি প্রভৃতি পার্থিব ময়লা নাই, যে স্থানের বায়ু—মলমূত্র ও বহু লোকের নিশ্বাস দুষ্ট নহে, রোগোৎপাদক জীবাণু কলুষিত করিতে পারে না, অপিচ—যে স্থানে বাতাসে পূর্ণ মাত্রায় অম্লজান আছে, এবং পূতিনাশক "ওজন" আইওডিন্, ক্লোরিন্ প্রভৃতি ভাসমান পদার্থ আছে, এইরূপ স্থানে রোগীর বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যাওয়া উচিত। যে স্থানে আকাশ পরিষ্কার, প্রায়ই মেঘ, কুজ্ঝটী ও অতিবৃষ্টি নাই, যেস্থল প্রখর রৌদ্রে উজ্জ্বল, এইরূপ স্থান রোগীর বাস যোগ্য।

পার্ব্বত্য স্থান, মরুভূমি, সমুদ্র তীর ও সমুদ্র বক্ষ রোগীর পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। এই সকল স্থানের বাতাস—জীবাণুশূন্য, শুষ্ক ও শীতল রৌদ্র তীক্ষ্ণ। এইরূপ স্থানে থাকিলে, অম্লজান ও ওজনের উত্তেজনায় দেহে শোণিত সঞ্চালনের বৃদ্ধি হয়। ফুসফুসের রক্তাধিক্য প্রশমিত হয়, শ্লেষ্মা কমিয়া যায়, উত্তাপের শান্তি হয়। এই সকল স্থানে থাকিলে শারীর যন্ত্রের শক্তি ও ক্রিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যাহাদের রোগ অনেকদিন হইয়াছে, যাহাদের প্র- ত উগ্র, যাহাদের হৃদপিণ্ডের দোষ জন্মিয়াছে, ল্যারিঙ্কসে ঘা হইয়াছে, শরীর অতি জীর্ণ ও দুর্ব্বল, ফুসফুসে ক্ষত হইয়াছে, ঘন ঘন রক্ত উঠিতেছে তাহাদের পক্ষে পার্ব্বত্যস্থান ভাল নহে। তাহারা মরুপ্রদেশে বাস করিলে উপকার হইতে পারে, কেননা—মরুপ্রবাহিত বায়ু শুষ্ক, অম্লজান ও "ওজন" পূর্ণ—জীবাণু শূন্য।

যে সকল রোগীর প্রকৃতি উগ্র, বায়ুনলির উত্তেজনায় যাহারা ক্রমাগত কাসিতে থাকে, তাহারা সমুদ্রবক্ষে বাস করিবে। সমুদ্র-বায়ু নাতি শীতোষ্ণ, সমুদ্র তীরের বায়ুও অনেকটা সমুদ্রবক্ষ বায়ুর মত। একমাস সমুদ্র যাত্রায় যে ফল পাওয়া যায়, ৬ মাস স্বাস্থ্য নিবাসে থাকিয়া, বড় ডাক্তারের ব্যবস্থাপিত সহস্র ঔষধ সেবনেও সে ফল পাওয়া যায় না।

সমগ্র শীতকালটা সমুদ্র উপকূলে বাস করিলে, ক্ষয়রোগীর বহু উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পার্ব্বত্যস্থানের মধ্যে—দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি, কুনুর উটকামণ্ড, মধ্য ভারতের আরাবল্লী পর্ব্বতমালা, আবু শিখর, উত্তরে মসুরী মারী—অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র উপকূলের মধ্যে—পুরী, ওয়ালটেয়ার, লঙ্কাদ্বীপের পূর্ব্বভাগ—খুব ভাল স্থান। মরুদেশের মধ্যে—রাজপুতানা শ্রেষ্ঠ।

কোন্ রোগীর পক্ষে কোন্‌স্থানে যাওয়া উচিত,—চিকিৎসক তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

তরুণ যক্ষ্মারোগী—যাহার উভয় ফুসফুস আক্রান্ত হইয়াছে, যাহার রোগ খুব প্রবল, যাহার ক্ষয় দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং যে রোগী বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া বিদেশ যাইতে ইচ্ছুক নহে, এরূপ রোগীকে কখনও চেষ্টা

পাঠাইবে না। রোগীকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে, অস্বাস্থ্যকর স্থানেও তাহার রোগের হ্রাস হইতে পারে, আর রোগী যদি ভরসাহীন, অবাধ্য, আবদ্ধস্থানবাসী, মুক্ত বায়ু-বিদ্বেষী, আহার-বিহারের নিয়ম লঙ্ঘনকারী, এবং মানসিক ও কায়িক অত্যাচারী হয়—স্বর্গের মত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলেও তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রবন্ধে আমি যে সকল যুক্তির উত্থাপন করিলাম, তাহা আমার নিজেরই যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার ফল। আমার একান্ত অনুরোধ—কি ডাক্তার, কি কবিরাজ, কি হোমিওপ্যাথ,—যিনি যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি যেন তাঁহার রোগীকে ও তাহার শুশ্রূষাকারীকে—এই সকল নিয়ম পালন করিবার জন্য উপদেশ দেন। ইহা ভিন্ন—এ রোগের বিস্তৃতি নিবারণের অন্য উপায় দেখি না। ইহাতে রোগীরও উপকার হইবে,—রোগীর আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর উপকার হইবে। যাঁহারা যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা বা সুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই রুমালে করিয়া ক্রিয়সটের আঘ্রাণ লইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হাল্‌দার এল্‌, এম্‌, এস্‌।

হিন্দুর স্বাস্থ্যনীতি।

—:*:—

প্রত্যেক সভ্যরাজ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ সংগঠিত আছে। রোগৎপত্তির সাধারণ কারণ সমূহ দূর করা এই স্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্য। রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা, পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা রাশি স্বত্বর দূরীকরণ, পানীয় জলের কষ্ট নিবারণ, অসহায় দরিদ্র রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, সংক্রমণ নিবারণ জন্য সংক্রামক রোগগ্রস্ত রোগীদিগকে স্থানান্তরিত করণ প্রভৃতি কার্য্য স্বাস্থ্যবিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্য হানিকর কার্য্যানুষ্ঠানে বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিবন্ধকতা আচরণে সকলকে বিরত রাখিবার জন্য আইনাদি বিধিবদ্ধ করাও স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়। প্রাচীন ভারতে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই, আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। হিন্দু চিরকালই ধর্ম্মভীরু। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে এই ধর্ম্মভীরুতার আংশিক অপনোদন হইয়াছে, তথাপি স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যাঁহারা সহর ঘেঁসা নহেন, তাঁহাদের ভিতর এই ধর্ম্মভীরুতার প্রাবল্য এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে আইন আদালতে দলিল, দস্তখত, সাক্ষী, রেজেষ্টারী প্রভৃতি সত্ত্বেও সত্য অসত্য হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরুতার প্রভাবে কেবল মুখের কথায় সত্য রক্ষা হইত। তদ্রূপ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্বাস্থ্যরক্ষাও অতি সহজে সমা-

হিত হইত। হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার প্রত্যেকটী স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বা রাত্রির শেষ যামার্দ্ধ হইতে হিন্দুর প্রাতঃকৃত্য আরম্ভ। এইকালে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণকেই নিদ্রাত্যাগ করতঃ শয্যার উপর উত্তরাস্ত বা পূর্ব্বাস্ত হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক দীক্ষাগুরুকে ধ্যান ও প্রণাম করিতে হয়—এবং দেবদেবী ও পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণের নামানুকীর্ত্তন করিয়া পরে পৃথিবীকে প্রণাম পূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিতে হয় ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের বিধি। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে early rising বা প্রত্যূষে নিদ্রোত্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ আহ্নিক-ক্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্যসাধন যে কেবল শারীর বিজ্ঞান (Physiology) অবলম্বনে সংগঠিত তাহা নহে, ইহাতে Psychology বা মনো-বিজ্ঞানও অন্তর্নিহিত আছে। মহাত্মাগণের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বারা মানবের মনোভাব গঠিত হয়। মনের সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং মানসিক উৎকর্ষও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়।

নিদ্রোত্থানের পর মলমূত্রত্যাগ বিধি। গ্রামে বাসস্থানের দেড়শত হস্ত দূরে ও নগরে তাহার চতুর্গুণ দূরে নৈঋত কোণে মলত্যাগের স্থান নির্ব্বাচন করা শাস্ত্রীয় বিধি। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, আবাস ভূমির বায়ু যাহাতে দূষিত না হয় তাহারই ব্যবস্থা। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরের লোক সংখ্যা অধিক, সুতরাং পুরীষ রাশির পরিমাণও অধিক, তজ্জন্য সেকালে গ্রাম্য বাসস্থান অপেক্ষা নাগরিক বাসস্থানের অধিক দূরে মলত্যাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। নৈঋত কোণ নির্দ্দিষ্ট হইবার কারণ, বোধ হয়—নৈঋত বায়ু প্রায় প্রবাহিত না হয়,—বা যদি প্রবাহিত হয়—তাহাও ক্ষণিক। মলমূত্র ত্যাগকালে মৌনাবলম্বন আবশ্যক, এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ ও শ্বাস গ্রহণ নিষিদ্ধ। মলত্যাগ কালে পরিধেয় বসন কটিদেশের ঊর্দ্ধভাগে স্থাপন করিতে হয়। পাদুকা পরিধান করিয়া, দণ্ডায়মান বা ভ্রাম্যমান অবস্থায় মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ। এই সব পদ্ধতি যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সেকালে কেবল যে মানবজাতির বাসস্থান স্বাস্থ্যজনক রাখিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, গবাদি গৃহপালিত পশ্বাদির স্বাস্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবার নিয়ম ছিল। যথা :—

"সদেব গো ব্রাহ্মণ বহ্নিমার্গে ন রাজমার্গে
ন চতুষ্পথে চ।
কুর্য্যাদথোৎসর্গমপীহ গোষ্ঠে পূর্ব্বাং
পরাঞ্চৈব সমাশ্রিতাং গাম্॥"

দেবতা, গো ব্রাহ্মণ ও অগ্নির অভিমুখে রাজপথে, চতুষ্পথে, গোষ্ঠে, অথবা যে স্থানে পূর্ব্বে গো চারণ হইয়াছিল বা পরে হইবে—সেরূপ স্থানে মলত্যাগ নিষিদ্ধ।

মৃত্তিকা দুর্গন্ধ হারক এবং ক্ষারাদি সংশ্লিষ্ট থাকায় ক্লেদাদি অঙ্গমল দূরীভূত করে। তদ্ভিন্ন ইহা Disinfectant বা সংক্রমণ দোষ নাশক। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে শৌচার্থে ইহা ব্যবহার করিবার নিয়ম। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত স্বাস্থ্যনীতির এতই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, সে মৃত্তিকাও আবার বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাই শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

"জলমধ্য হইতে, মূষিক গর্ত্ত হইতে, অগৃহী বা অন্যের শৌচাবশিষ্ট হইতে অথবা বল্মীক হইতে শৌচার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিবে না।

ইহার পর প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা। কিন্তু তাহাতেও নিয়মাদি বিধিবদ্ধ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নানের সময়। প্রাতস্নান ভিন্ন দৈব ও পিতৃক্রিয়ার অধিকার হয় না। সুতরাং ধর্ম্মভীরু হিন্দুর পক্ষে প্রাতঃস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। স্রোতঃজলে স্রোতাভিমুখীন হইয়া ও স্রোতঃহীন জলে সূর্য্যাভিমুখীন হইয়া, নাভিমগ্ন জলে দাঁড়াইয়া, করদ্বয় দ্বারা মুখ নাসিকা, কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ডুব দিতে হয়। জলাশয় অপরের হইলে ডুব দিবার পূর্ব্বে উহা হইতে তিনটী বা পাঁচটী মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া তীরে নিক্ষেপ করিয়া "উত্তিষ্ঠোপিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ। পাপানি বিলয়ং যান্তি শান্তিং দেহি সদা মম॥"—এই মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। ইহাও স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য। প্রত্যেকে যদি প্রতিদিন স্নান কালে তিনটী বা পাঁচটী মৃৎপিণ্ড জলাশয় হইতে উঠাইয়া ফেলে, তাহা হইলে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধর ক্রিয়া অতি সহজেই সম্পাদিত হয়, এক কথায় এইজন্যই ইহার ব্যবস্থা।

আবার স্নান কালে মস্তক, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি অঙ্গ মৃত্তিকা দ্বারা মার্জ্জনা করিবারও বিধি আছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি— মৃত্তিকা দুর্গন্ধহারক, ক্লেদ বিমোচক ও Disinfectant বা সংক্রমণ নিবারণ।

এইরূপ শয়ন, ভোজন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে হিন্দুর যে সব পদ্ধতি আছে, তৎসমুদয়ই স্বাস্থ্যোন্নতিকর। পরিচ্ছন্নতা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। রাত্রিবাস বা অধৌত বসন পরিধান করিয়া আহ্নিকপূজা ও ভোজনাদি ক্রিয়া হিন্দুর পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি, অধৌত বসনে ও স্নান না করিয়া রন্ধনাদি ক্রিয়া ও পূজাদির আয়োজন করিতে পারা যায় না।

তিথি, বার, মাস ও ঋতুভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নিষিদ্ধ আছে, তাহাও সংরক্ষণার্থ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকের দোহাই দিয়া নিবারিত হইয়াছে। বিরুদ্ধভোজন সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আবার গৃহমধ্যে যাহাতে আবর্জ্জনা রাশি স্তূপিকৃত করিয়া না রাখা হয়—তাহারও বিধি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।

আবার infection বা স্পর্শাদি দ্বারা রোগাক্রমণ নিবারণের জন্য ও ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে হিন্দুর সৎক্রিয়া পদ্ধতি সমুদায় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়— শারীরিক বা স্বাস্থ্য সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

গার্হস্থ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

—:*:—

চক্ষুরোগে—(১) হরীতকীর শাঁস মধুতে ঘসিয়া গরম করিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষুর ফুলা ভাল হয়। (২) লবঙ্গ —মধুতে ঘসিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুর ফুলা ভাল হয়। (৩) পাতিলেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষের নীচে

ও উপরে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। (৪) শ্বেত পুনর্নবার শিকড়—পুরাতন কাঁজির সহিত ঘসিয়া চক্ষে দিলে ছানি ফাল হয়।

কাণ পাকায়।—(১) খানিকটা সরিষার তৈল আগুণে চড়াইয়া একটা শামুক তাহাতে ভাজিয়া ঐ তৈল ছাঁকিয়া কর্ণে দিলে কাণ পাকা রোগ ভাল হইয়া থাকে। (২) শাঁখের গুড়া ও চোণা একত্র মিশাইয়া কিছুক্ষণ কাণের ভিতর রাখিলে কাণপাকা ভাল হয়।

মুখ রোগে—(১) ভেরেণ্ডার আটা এক তোলা, সিকি ভরি সৈন্ধব লবণ—একত্র মিশাইয়া পিতলের পাত্রে গরম করিয়া দন্ত-পাটির উভয়দিকে কিছুক্ষণ লাগাইয়া ধুইয়া ফেলিলে দাঁতের গোড়ায় নালী হইয়া যদি পুঁজ পড়ে, তাহা হইলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থা দিবসে ২।৩ বার করিবে। ২।৩ দিন এইরূপ করিলেই দন্ত হইতে পুঁজ পড়া নিবারিত হইবে। (২) দাঁতের গোড়া কিম্বা জিহ্বায় ঘা হইলে, গোয়ালিয়ালতার ডাঁটা আনিয়া ডুমা ডুমা করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ঘৃতেই ডাঁটা গুলি বাটিয়া লইয়া অবলেহ করিবে। ২।৩ দিন এই ব্যবস্থায় চলিলেই ঘা আরোগ্য যইবে।

অরুচিতে।—(১) জীরাভাজার গুঁড়া ভোজনের পূর্ব্বে জিহ্বাতে ঘসিয়া ভোজন করিলে আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে। (২) শসার পাতা পাতপোড়া করিয়া তৈল ও লবণ মাখিয়া ভোজনের সময় আগে ২।৩ বার খাইবে এবং ভোজনের সময়ও মধ্যে মধ্যে খাইবে। ইহাতে অরুচি ভাল হইবে। (৩) লালিতা-পাতা, পাতপোড়া করিয়া ঐরূপভাবে ভোজনের সময় খাইলেও অরুচি ভাল হয়। (৪) ঘোল দিয়া কুলকুচা করিয়া তাহার পর আহার করিলে আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

টাকে।—হরিতাল, বহেড়ার শাঁস ও বৃহতীর মূলের গুঁড়া সমভাগে মধু দিয়া মাড়িয়া লেপ দিলে টাক আরোগ্য হয়।

রাতকাণায়।—বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি খানিকটা গলাইয়া লইয়া সন্ধ্যার পর রোগীর ব্রহ্মতালুতে, চক্ষের উপর হাতের ও পায়ের তালুতে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বিছার কামড়ে।—(১) ছাগলের নাদি জল দিয়া গুলিয়া কিম্বা শুধু ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। (২) রাঙা শাকের পাতা মুখে চিবাইয়া যেখানে কামড়াইয়াছে—লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। (৩) গাওয়া ঘি গরম করিয়া লাগাইলেও উপশম হইয়া থাকে।

বোল্‌তা, ভিমরুল ও মৌমাছির কামড়ে।—সৈন্ধব লবণের গুঁড়া মালিশ কর উপশম হইবে।

আঁচিলে।—হলুদ পোড়াইয়া চুণে মিশাইয়া আচিলের উপর মা াইলে উহা নষ্ট হয়।

চুলকণায়। শ্বেতচন্দন ঘসিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূরের সহিত মিশাইয়া ২।৩ দিন মাখিলে গায়ের চুলকনা আরোগ্য হয়।

মাথার ঘায়ে।—(১) মুদ্রাশঙ্খ ও তেঁতুলের বীচির শাস সমান ভাগে লইয়া জল দিয়া ঘসিয়া মাথার ঘায়ে লাগাইলে তাহা আরোগ্য হয়। (২) পাকা তেঁতুলের বীচির শাঁস, অল্প লবণের সহিত মিশাইয়া মাথার ঘায়ে দিয়া ঠাণ্ডাজল দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে।

২।৩ দিন এইরূপ করিলেই মাথার ঘা সারিয়া যাইবে।

পাঁচড়া ও ঘামাচিতে।—গাওয়া ঘি একছটাক মুদ্রাশঙ্খ আধ্‌তোলা, ফটকিরি বার আনা, ভৃঙ্গরাজের পাতার রস একভরি চারি আনা, তুঁতে দুই আনা একত্র মিশাইয়া আগুণে ফুটাইয়া লইয়া পাঁচড়া এবং ঘামাচিতে লাগাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

মাথা ব্যথায়।—(১) মুথার রস রগে দিলে মাথার ব্যথা আরোগ্য হয়।

বসন্তের প্রতিষেধক।—(১) কটি-কারির মূল গোলমরিচের সহিত মিশাইয়া খাইলে বসন্ত রোগ হয় না। (২) পুনর্নবারমূল গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত হয় না।

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

চিকিৎসকের অব্যাহতি।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম,—ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার "রোহিতকারিষ্ট" প্রস্তুতের জন্য আবগারি আইনের আমল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আবগারি কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার মামলা তুলিয়া লইয়াছেন।

মান্দ্রাজে আয়ুর্ব্বেদ।—সংপ্রতি মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল শ্রীযুক্ত রঙ্গ চারিয়ার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম,—গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সার আলেকজাণ্ডার কারডিস বলেন,—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাটা কিছুই নহে, উহা হাতুড়ে চিকিৎসকগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একটা উপায় মাত্র। সার অলেকজাণ্ডারের এরূপ মন্তব্যে আমরা শুধু মর্ম্মাহত হই নাই,—বিস্মিতও হইয়াছি। তাঁহারই দেশের—তাঁহারই স্বজাতি—বহুতর লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইংরাজ ইতঃপূর্ব্বে এই আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রফেসার সার্জ্জন স্তর হাভেলক চার্লস একদিন ছাত্রগণকে উপদেশ চ্ছলে বলিয়াছিলেন,—"আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞানে যাহা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি আজ তাহাই তোমাদিগকে পুনর্ব্বার বলিতেছি। চরকে কথিত চিকিৎসার একটু সামান্য অংশমাত্র আমি তোমাদিগকে বলিতেছি।" আমেরিকা—ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক, একদা বলিয়াছিলেন, "যদি ব্রিটীশ ফার্ম্মাকোপিয়ার সমস্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া 'চরকে'র চিকিৎসা অবলম্বন করা যায়—তাহা হইলে দেশের লোকের অকাল মৃত্যু অনেক কমিতে পারে।" সার আলেজাণ্ডার আয়ুর্ব্বেদের কিছুই জানেন না, এ অবস্থায় এরূপ অযথা মন্তব্য তাঁহার মুখ হইতে কেমন করিয়া নির্গত হইল—তাহা আমরা

বুঝিতে পারিতেছি না। কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, সেই শাস্ত্র যে রীতিমত অধ্যয়ন করা উচিত—এ কথা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

বঙ্গে বাতুল বৃদ্ধি। সরকারি হিসাবে প্রকাশ,—বাঙ্গালার বাতুলালয় সমূহে বাতুল রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯১৫ হইতে ১৯১৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে মোট ১,২৮৩ জন রোগী বাতুলালয় সমূহে প্রবেশ করিয়াছিল এবার তাহাদের সংখ্যা ১,৩৩১ হইয়াছে। যতগুলি কারণে লোকে পাগল হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে—অভাব অনটনও অন্যতম কারণ। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান সময়ে বাতুলকুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। দেশের নেতৃবর্গ এ সকল কথা ভাবিতেছেন কি?

নূতন জ্বরে পাবনার কবিরাজ।—নূতন সংক্রামক জ্বরের চিকিৎসা—প্রসঙ্গে পাবনার কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন "বঙ্গবাসী"তে লিখিয়াছেন,—"আয়ুর্ব্বেদ মতে এই জ্বর কাল বিপর্য্যয় জন্য কাল বিপর্য্যয় জ্বর মাত্র; কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতজ্বর এবং কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এ জ্বরে লক্ষ্মীবিলাস এবং অগ্নিকুমার রস দিবারাত্রে ২।৩ বার পর্য্যায়ক্রমে পান, আদার রস, পিপুল চূর্ণ এবং মধু অনুপানে সেবন করিলে রোগীর বেদনা, শ্লেষ্মা দোষ ও কাসি ইত্যাদি কমিয়া গিয়া রোগী ২।৩ দিনে সুস্থ হইয়া থাকে।—কথাটা আমাদের কিন্তু ভাল লাগিলনা,—হইতে পারে ইহা কাল-বিপর্য্যয় জ্বর, কিন্তু কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতজ্বর, আবার কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতশ্লেষ্ম—এ কেমন কথা? আমরা ইহাকে বাত জ্বর বলিব না, বায়ুর সহিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকায় আমরা ইহাকে বাতশ্লেষ্মজ্বরই বলিব। তাহার পর বঙ্গবাসী'র পত্র লেখকের কথা অনুসারে ইহা যদি বাতজ্বরই হয়, তাহা হইলে 'লক্ষ্মীবিলাস' এবং 'অগ্নিকুমারে' ইহার কি হইবে? বাতশ্লেষ্ম জ্বর হইলে 'লক্ষ্মীবিলাসে' উপকার হইবার কথা। আমরা গতবারে এই জ্বর প্রসঙ্গে "মকরধ্বজ সেবনের যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তাহাই সমীচীন ব্যবস্থা। প্রথম বার এই জ্বরের আক্রমণ কালে কোন ঔষধ দাও—না দাও, আসিয়া যাইবেনা কিন্তু জ্বর অন্তে শ্লেষ্মা এবং দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য 'মকরধ্বজ' সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে—এ বিষয় এই বৎসরই আমরা বহুস্থলে পরীক্ষা করিয়াছি। 'মকরধ্বজে'র সহিত 'লক্ষ্মীবিলাস' ব্যবহারে আরও উপকার হইয়া থাকে। যাহা হউক এ জ্বর, শুধু বাতজ্বর নহে, ইহা যে বাতশ্লেষ্ম জ্বর—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আশ্বিনের সূচী।

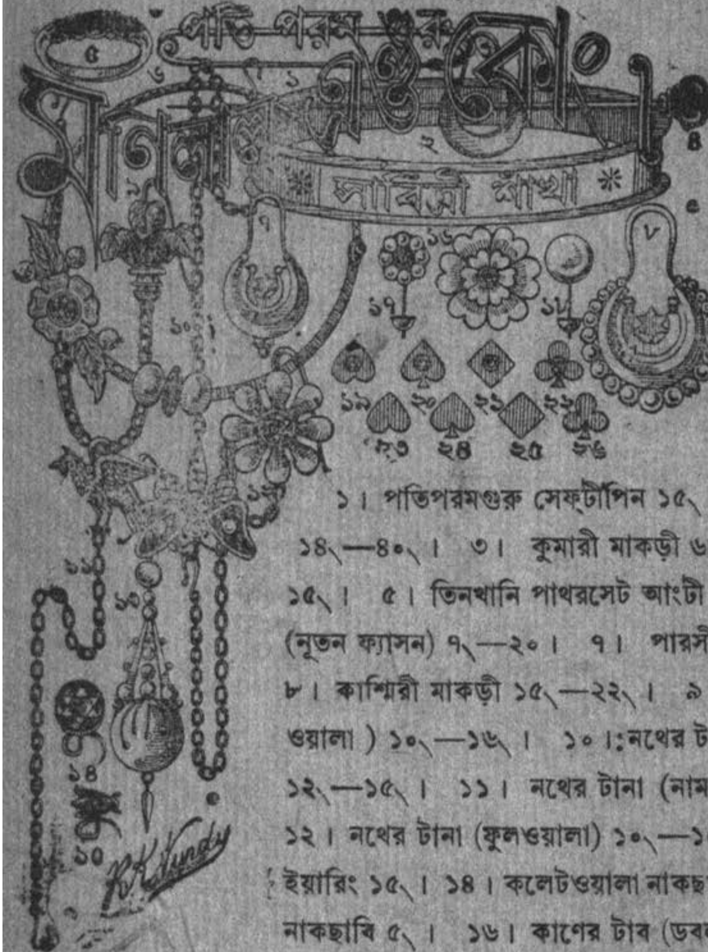
মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স।

বিনা পানের

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য

অল্প মূল্যের নানাবিধ নূতন ফ্যাসনের গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার।

সেপ্টপিন।



১। পতিপরমগুরু সেফ্‌টীপিন ১৫৲। ২। সাবিত্রী শাঁখা ১৪৲—৪০৲। ৩। কুমারী মাকড়ী ৬॥০। ৪। হেয়ার পিন ১৫৲। ৫। তিনখানি পাথরসেট আংটী ১২—২৫৲। ৬। নথ (নূতন ফ্যাসন) ৭৲—২০। ৭। পারসী মাকড়ী ২০৲—২৫৲। ৮। কাশ্মিরী মাকড়ী ১৫৲—২২৲। ৯। নথের টানা (ক্রাউন ওয়ালা) ১০৲—১৬৲। ১০। নথের টানা (প্রজাপতিওয়ালা) ১২৲—১৫৲। ১১। নথের টানা (নামওয়ালা) ১২৲—১৫৲। ১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০৲—১৫৲। ১৩। করোনেশন ইয়ারিং ১৫৲। ১৪। কলেটওয়ালা নাকছাবি ৫৲। ১৫। জড়োয়া নাকছাবি ৫৲। ১৬। কাণের টাব (ডবল থাকা ও পাথর সেট) ১০৲—৩০৲। ১৭। জড়োয়া টাব ১৫৲—৪০৲। ১৮। বেলকুঁড়ি টাব ৭৲—১২৲। ১৯। হরতন নাকছাবি (পাথর বসান) ২॥০। ২০। নাকছাবি-ইস্কাতন ২॥০। ২১। ঐ চিড়িতন ২॥০। ২২। ঐ রুহিতন ২॥০। ২৩। হরতন নাকছাবি (প্লেন হাই পালিশ) ১॥০। ২৫। রুহিতন নাকছাবি ১॥০। ২৬। চিড়িতন নাকছাবি ১॥০ টাকা।

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দিই। বিনামূল্যে ৩নং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স,

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩য় বর্ষ—২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩২৫

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



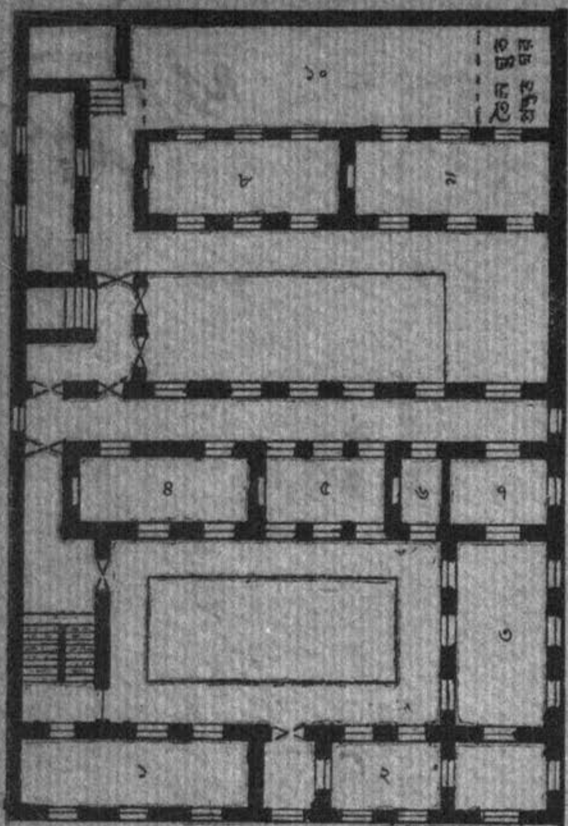
—সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

“অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়”

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

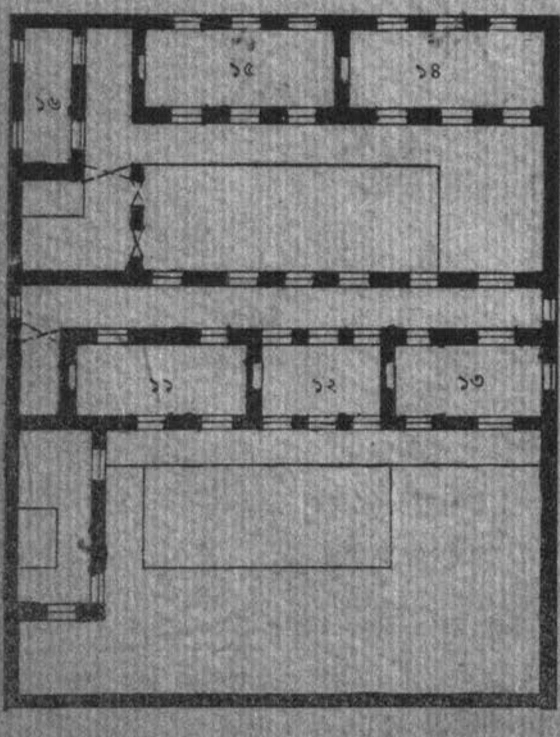
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। মাসিক বেতন ৩৲ প্রবেশ ফিঃ ৫৲ কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,এ, এম,বি, অধ্যক্ষ।

কার্ত্তিকের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদে"র নিয়মাবলী।

"আয়ুর্ব্বেদের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৩৸৵০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয়। কেহ কোনো মাসের 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুবা পুনরায় মূল্য দিয়া সেই সংখ্যা লইতে হইবে।

আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, এজন্য যখনই ইহার গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ষের আশ্বিন হইতে ইহা লইতে হইবে।

কোনো বিষয়ের জন্য পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা সে পত্রের কোনো কার্য্য হয় না।

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।—এক বৎসরের চুক্তিতে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৷৷০ সিকি পৃষ্ঠা ২৸০ এবং অষ্টাংশ পৃষ্ঠা ১।০ টাকা। কভারের বিজ্ঞাপনে প্রতি পেজ ১০৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

বিজয়া।

—:*:—

পূজা ফুরাইল। বিসর্জ্জনের করুণ রাগিণী—উৎসব, আনন্দ ফুরাইয়াছে, জানাইবার জন্য ক্ষীণস্বরে বাজিয়া উঠিল। কর্ম্মকুশল বাঙ্গালী কয়দিনের জন্য অবসর পাইয়া যে শান্তি-সুখ উপলব্ধি করিতেছিল, তাহার পরিসমাপ্তি দেখিয়া আবার কর্ম্ম-জুয়ারে গা' ঢালিয়া দিল। আমরাও আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক পাঠক ও লেখকদিগকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া 'আয়ুর্ব্বেদে'র সেবায় মনোভিনিবেশ করিলাম।

কিন্তু এই আবাহন ও বিসর্জ্জনের ব্যাপারে আমরা কি বুঝিলাম? আশৈশব বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমরা সকলেই তো জানি—এ আনন্দ—এ উৎসব ক্ষণিকের জন্য,—ইহা চিরস্থায়ী নয়,—মাত্র তিনটি দিনের জন্য এই উৎসবের স্রোত প্রবাহিত থাকিয়া তিন দিন পরেই ইহা ফুরাইয়া যাইবে,—এত আশা—এত উৎসাহ—এত আকাঙ্খা—এত কামনা—মাত্র তিন দিন পরেই তো অতীতের গর্ভে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। তবে বাঙ্গালী এই অস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য, সারা বৎসর ধরিয়া একটা অভাবনীয় আকাঙ্খা—একটা অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে কেন? যাহা চিরস্থায়ী নহে,—যাহা আসিয়াই ফুরাইয়া যাইবে—যাহা উদয় হইয়াই বুদ্বুদে মিলাইয়া যাইবে—যাহার আরব্ধ মাত্রেই সমাপ্তি হইবে, তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গসংসার উন্মত্ত হইয়া উঠে কেন?

কিন্তু 'কেন' যে এই উৎসবে—বাঙ্গালীর প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহা সাধক ভিন্ন অন্যে বুঝিবেনা। সৃষ্টি-স্থিতি লয়—এই ত্রিবিধ ব্যাপার লইয়াই তো শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীকে আনিয়া সাধক সেই ত্রিবিধ ব্যাপারেরই রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া থাকেন। যে মৃত্তিকা লইয়া মায়ের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার

ব্যবস্থা করা হয়, সেই মৃত্তিকা—সৃষ্টবস্তুর সর্ব্ব প্রথম। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত লইয়াই তো সৃষ্টির গঠন। জীব-সৃষ্টিতে ক্ষিতি হইতে উদ্ভবের পর, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সাহায্যে তাহার পরিপুষ্টির ব্যবস্থা। বিলয়কালেও ক্ষিতি ভিন্ন অপর সকল গুলির সাহচর্য্যের সঙ্কোচন হইয়া আবার ক্ষিতিতেই তাহার বিলয় সাধন হইয়া থাকে। জগদম্বার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতেও এই সৃষ্টি ও লয়ের কৌশল সুসংবদ্ধ। ভক্ত সাধক ইহাই উপলব্ধি করেন বলিয়া তাঁহার আকাঙ্খা সারা-বৎসর ধরিয়া জাগিয়া উঠে। সাধকের সেই আকাঙ্খা-জাগরণে বিশ্বসংসার এমন একটা অজানা স্রোতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—যাহার ফলে বিশ্ববাসী পূজার অপেক্ষায় উন্মত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

দুরন্ত দশাননের প্রবল প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য শ্রীশ্রীরামচন্দ্র অকালে জগন্মাতার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। রাবণ-নিধন সেই অর্চ্চনার ফল। দুর্ব্বৃত্ত দমনে বিশ্বসংসার সে দিন ভাবোন্মেষে মত্ত-মধুর হইয়া পড়িয়াছিল। বিসর্জ্জনের পরে শূন্যবেদিকা নিরীক্ষণে সাধকের প্রাণ ফাটিয়া যাইলেও এ দিনে যে প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, সম্ভাষণের ব্যবস্থা—তাহাও দুর্ব্বৃত্ত দমনে ভাবোন্মেষ-মত্ততারই ফল সম্ভূত। সুতরাং আজিকার দিনে মাতৃহারা হইলেও সাধক বিশ্ববিজয়ী। মাতৃভক্ত বাঙ্গালী এই জন্যই এ দিনের অপেক্ষায় সারা বৎসর আকুল হইয়া থাকে। এ আকুলতায় যে কত সুখ—তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

জল-সংশোধনে তাম্রের অদ্ভুত শক্তি।

—:*:—

"কাঞ্চনে ভক্ষয়েদন্নং দুগ্ধং রজত ভাজনে।
আয়সে চাপূপং মৎস্যং দধিতক্রে শিলাময়ে॥
রীতি-পাত্রে তিলকল্কং পায়সং শক্তবঃ মধু।
মৃণ্ময়ে শাক-সূপাদীন্ তাম্র পাত্রে জলং
পিবেৎ॥
—পাক-রাঃ

এ দেশের যখন সমৃদ্ধিশালী গৌরবময়ী অবস্থা—তমন এই শ্লোকটী ঋষি রচিত স্বাস্থ্য নীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়—সোণার থালে ভাত খাইলে, রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ পান করিলে, লৌহ-পাত্রে পিষ্টক ও মৎস্য ভক্ষণ করিলে, পাথরের বাটীতে দধি ও ঘোল এবং মৃৎপাত্রে শাক সূপাদি আহার করিলে, শরীরের যে কি উপকার হয়,—ভোজ্য দ্রব্যেরই বা পাত্র বিশেষে কিরূপ রাসায়ণিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, অনেক সময় আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। অনেক সময় মনেও হয়—এ সকল বুঝি প্রাচীন কালের কুসংস্কার! কিন্তু তাম্র-পাত্রে জলপানের বিধি যে খুব ভাল, সে কথা আর অস্বীকার করা চলেনা। কেননা

এই সভ্যতার স্বর্ণযুগে স্বয়ং সাহেবের মুখে আমরা তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাইতেছি।

আমাদের দেশে—পূর্ব্বে তাম্র-পাত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। প্রাচীন ভারতবাসীগণ—তাম্রপাত্রে জল পান করিতেন। বড় বড় তামার কলসীতে পানীয় জল সযত্নে রক্ষিত হইত। তামার কোষাকুশীস্থিত জলে—দেবলোক ও পিতৃলোকের পরিতর্পণ হইত। প্রবীণা গৃহিণীগণ—সন্তানের আরোগ্য বাসনায় জলকুম্ভের মধ্যে দেবতার নামে তাম্রমুদ্রা ডুবাইয়া রাখিতেন। রুগ্ন শিশু সেই জল পান করিত। এ সকল প্রথা এখনও বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন সাহেবেরা বলিতেছেন—তাম্র কর্তৃক অপরিষ্কার জল পরিষ্কার হয়। তাম্র পাত্রে জল রাখিলে—জলস্থিত রোগবীজাণু ধ্বংস হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে—পরিষ্কার তাম্রপাত্রে জল রাখিলে সেই জলস্থিত জীবাণু এবং অপর আনুবীক্ষণিক জীবাণু সহজে নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরিষ্কার তাম্রপাত্রে জল থাকিলে, সেই জলদ্বারা তামার অতি সামান্য অংশ দ্রব হয়। এই দ্রব তাম্রই আনুবীক্ষণিক রোগ বীজাণু নষ্ট করে। শুধু ইহাই নহে। তাম্র জলের দুর্গন্ধ ও বিবর্ণ নষ্ট করে। তাম্র সংস্পর্শে জল স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ বিহীন হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণ বলেন—১০০০০০০ ভাগ জলে, একভাগ সালফেট অফ কপারের দানা দ্রব হইলে—সে জল বীজাণু শূন্য ও সুপেয় হইয়া থাকে। জলের পরিমাণ অনুসারে তন্মধ্যে প্রশস্ত একখণ্ড তাম্রফলক ডুবাইয়া রাখিলেও জলের সমস্ত দোষ দূর হইয়া যায়। এই প্রণালীতে জল পরিষ্কার করা অতি সহজ, যে কোন ব্যক্তি যখন তখন ইহা অনায়াসেই করিতে পারে।

জল মধ্যে যে পরিমাণ জৈবিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, সেই পরিমাণে তাম্রও জলের সহিত দ্রব হয়। এইটি তাম্রের আশ্চর্য্য শক্তি। দ্রব তাম্র জৈবিক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া অদ্রবনীয় পদার্থ রূপে অধঃপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাম্রসংযোগে জল ধাতব পদার্থ বিহীন, নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

লেটান গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের জল পরীক্ষক - যিনি আনুবীক্ষণিক জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিখ্যাত—সেই ডাক্তার Pitchford জল পরিষ্কার করণে তাম্রের শক্তি ভাল রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার পিচ্-ফোর্ড বলেন—১০০০০০ জলে এক ভাগ সাল-ফেট অফ কপার মিশ্রিত হইলেই জলস্থিত সমস্ত আনুবীক্ষণিক জীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়। বীজাণু ধ্বংস করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ জলে আর জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। যে জল টাইফয়েড্-ব্যাসিলাস্ কর্তৃক দূষিত হইয়াছে, সেই জলের ৭৫০০০ ভাগে ১ ভাগ সালফেট অফ্ কপার মিশ্রিত করিলে, ৩ ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে,—ঐ জলে আর টাইফয়েড্ জীবাণু নাই। এক গেলন জলে, ১ গ্রেণ সালফেট অফ্ কপার দেওয়াই নিয়ম। এই উপায়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে জলস্থিত জীবাণু বিনষ্ট করিতে পারা যায়।

খুব পরিষ্কার মাজাঘষা তাম্র পাত্রে—আনু-বীক্ষণিক জীবাণু কুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় জলের দোষে নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। পরে ডাক্তার ওয়াটকিন্‌স—তথাকার জলে সালফেট অফ্ কপার মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা করায়, জল বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং জলজ পীড়ার আশঙ্কাও কমিয়া গিয়াছে।

অতি সামান্য মাত্রায় সাল্‌ফেট অফ্ কপার জলের সহিত দ্রবাবস্থায় থাকিলে, সে জল পান করিলে একটুও অনিষ্ট হয় না। ইহা বৈজ্ঞানিক জগতের একটী পরীক্ষিত সত্য। যে সকল পল্লীগ্রামে—জলের দোষে লোকের নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে, সেখানে বক্ষ্যমান প্রণালীতে তাম্র সংস্পর্শে জলকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এত অল্প খরচে আর কোনও উপায়ে জল নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

এখন সাহেবেরা তাম্রের এই জল সংশোধক গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাম্রের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন—সাহেবের কথায় আমরাও তাম্রের প্রভাব বুঝিয়াছি। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—আমাদের ঋষিগণ কেমন করিয়া যে তাম্রের এই গুণ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন—

ওরে বাছা গৃহে তোর রতনের রাজি।
এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি?

হায়রে! তথাপি আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না! তাম্র স্বয়ং বিষ হইয়াও, দূষিত জলকে অমৃতে পরিণত করিতে পারে—ঋষিযুগের এই মহাসত্য সাহেবদের অনুগ্রহে আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি! আমাদের মত আত্মবিস্মৃত—জাতি জগতে আর আছে কি?

শ্রীলক্ষ্মীকুমার দে, এম্ বি।

শিশুদের যক্ষ্মারোগ।

সহরের এক বড়লোকের বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। রোগী একটী শিশু, তাহার দেহ একেবারে জীর্ণ শীর্ণ। শিশুটী অনেকদিন হইতে ভুগিতেছিল, বলা বাহুল্য তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য ক্রমাগত চিকিৎসক পরিবর্ত্তন চলিতেছিল। বাকী ছিলাম কেবল আমি। আমার পূর্ব্বে অনেক বড় ডাক্তারও দেখিয়াছিলেন। পর্য্যায়ক্রমে কেহ জ্বরের, কেহ যকৃতের কেহ কৃমির, কেহ বা অজীর্ণের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ছেলেটী সুস্থ হয় নাই।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশুকে পরীক্ষা করিলাম। শিশুর অভিভাবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহার রোগ কি?" আমি বলিলাম—"যক্ষ্মা"। বৈঠকখানায় অনেক লোক বসিয়াছিলেন, আমার কথায় তাঁহারা সকলেই যেন বিস্মিত হইলেন। আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটী বাবু জনান্তিকে গৃহস্বামীকে বলিয়া ফেলিলেন—"এত ছোট ছেলের যক্ষ্মা হয়, এই নূতন শুনিলাম। যক্ষ্মারোগের কারণ—ধাতুক্ষয়। এ ছেলের ত শুক্রই জন্মায় নাই, তবে যক্ষ্মা হইল কেমন করিয়া?"

একথায় উত্তর দিবার তখন আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। গৃহস্বামী কিন্তু আমারই উপর শিশুর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলেন। আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে—স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণ ও শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া শিশুর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

৩ মাস পরে শিশুর শরীরে স্বাস্থ্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ৮ মাসে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। গৃহস্বামী অবশ্যই আমার প্রতি প্রীত হইলেন। যাঁহারা বালকের ক্ষয়রোগের কথায় চমকিত হইয়া, আমাকে উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা একদিন আমাকে ধরিয়া বসিলেন—"কবিরাজ! এইবার সত্য করিয়া বল দেখি,—অত ছোটছেলের কি যক্ষ্মা হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস ছিল—শুক্রক্ষয় না ঘটিলে যক্ষ্মা হইতেই পারেনা।" আমি তাঁহাদিগকে যে উত্তর দিয়াছিলাম—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই লিখিতেছি।

বাস্তবিক অনেকেরই বিশ্বাস আছে—খুব ছোট ছেলের যক্ষ্মারোগ হয়না। ডাক্তারী পুস্তকে শিশু-যক্ষ্মার উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদেও—শিশুদিগের যক্ষ্মারোগের যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু যে মতেরই অনুসরণ করা যাউক না, শিশুর যক্ষ্মারোগ হইয়াছে কিনা, তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। খুব যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ না করিলে রোগ ধরা যায় না।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলির গলায় গ্রন্থির মালা প্রায়ই স্ফীত হইয়া থাকে। এই প্রকৃতির শিশুগণকে ডাক্তারেরা Scrofulous tendency সংযুক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যে সকল শিশুর গলদেশে গ্রন্থি স্ফীতি লক্ষিত হয়, তাহারা অতি সহজেই সর্দ্দি ও কাসিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সকল শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল নহে, দেহ ক্ষীণ, মন স্ফূর্ত্তিহীন। ইহাদিগের লালনপালনে অভিভাবকগণ যদি ভাল রকম যত্ন না করেন, তাহা হইলে এই সকল শিশু যক্ষ্মারোগে অনায়াসেই আক্রান্ত হইতে হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর শিশুদের যক্ষারোগের প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। কেননা—ইহাদের রোগ নির্ণয় করা অনেক সময়ই বড় কঠিন হইয়া পড়ে। খুব বিজ্ঞ চিকিৎসকও শিশুদের যক্ষারোগ সহসা ধরিতে পারেন না। ইহার কারণ—যুবক বা কিশোর বয়স্ক মানুষের যক্ষারোগ হইলে, যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়—সে সকল লক্ষণ শিশুর দেহে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কখনও বা অস্পষ্ট ভাবে লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—"Course breathing এবং Dry rhonchuse ও creaking শব্দ—যদি clavcleএর নিম্নে পাওয়া যায়, কিম্বা সেইস্থানে স্পষ্টতর বোধ হয়, তবে বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে, তথায় যক্ষ্মারোগের সূচনা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। কারণ বয়স্ক ব্যক্তিদের ফুসফুসে সাধারণ ভাবে Fubercle পরিব্যপ্ত না হইয়া স্থানিক ব্যাধিরূপেই যক্ষ্মারোগ হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুদের ফুস্‌ফুসে যক্ষ্মা সাধারণ ভাবেই পরিব্যাপ্ত হইয়া দেখা দেয়। শুধু ইহাই নহে —শিশুদের এত সামান্য কারণে এবং এত রকমের কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের সূক্ষ্মতম প্রভেদ হইতে থাকে যে, উপযুক্ত স্থানে উল্লিখিত চিহ্নগুলি একত্রে অনেক সময় পাওয়া যায় না, আবার পাওয়া গেলেও তাহা যে প্রকৃত যক্ষ্মারোগ তাহা স্থিররূপে জানা যায় না।

শিশু প্রকৃতি উত্তেজনাপ্রবণ, উত্তেজনা বশতঃ তাহাদের উভয় পার্শ্বের বক্ষঃ প্রাচীর —ভিন্ন ভিন্ন বেগে পরিচালিত হইতে পারে। সুতরাং একদিকের বক্ষঃপ্রাচীর অন্যদিকের সহিত পৃথক কার্য্য দেখাইলে, জোর করিয়া বলা যায়না যে—তাহার যক্ষ্মাই হইয়াছে।

শিশুদের প্রায়ই রক্তোৎকাস হয় না, অর্থাৎ কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে না।

শিশুরা কাসে খুব কম, এবং থুথু ও ফেলিতে পারে না।

শিশুদের দেহে যক্ষ্মার প্রধান চিহ্ন অতি ঘর্ম্ম ও হেক্‌টিক বোধ—প্রায়ই প্রকাশ পায় না।

শিশুদের যখন যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয়, তখন তাহার বায়ু নলির প্রদাহ (ব্রঙ্কাইডিস) রূপেই দেখা দেয়। ৩।৪ বার উপর্য্যুপরি—ব্রঙ্কাইডিস্ হইয়া তবে যক্ষ্মারূপে প্রকাশ পায়। ফুস্‌ফুসের প্রদাহ কখনও এত বেশী হয় যে—শিশু তাহাতেই মরিয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পুর্ব্বে যেরূপ কাসি হইয়া থাকে, শিশুদের যক্ষ্মার সূত্রপাতে সেইরূপ ধরণের কাসি হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে শিশুদের যক্ষারোগ ধরা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে চিহ্নিতও নহে। তবে ইহা নিশ্চয়—বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহে যক্ষ্মারোগের যে সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়—শিশু শরীরেও তাহা দেখা দিতে পারে।

Course respiration, Prolonged Exairation, interrupted breathing, এইগুলির উপর নির্ভর করিয়া শিশুদের ক্ষয় রোগ নির্দ্ধারণ করা চলে না।

অনেক সময় শিশুদের কণ্ঠস্বরের বিকৃত বুঝা যায় না।

উভয় Scapula মধ্যস্থলে যদি dubness লক্ষিত হয়, তবে তাহা যক্ষার জন্য হইতেপারে, পরন্তু বর্দ্ধিতায়তন Bronchial গ্রন্থির জন্যও হইতে পারে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই টুকু—শেষোক্ত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ ও বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশে resonance পাওয়া যায়।

শিশুর যক্ষারোগের লক্ষণ এইগুলি—

(ক) ঘন ঘন ফুস্‌ফুসের পীড়া বা ব্রঙ্কাই-ডিস হওয়া।

(খ) দৈহিক গুরুত্বের হ্রাস।

(গ) বহুকাল ধরিয়া উদরাময়ে ভোগা।

(ঘ) ২৪ ঘণ্টা ঘুষঘুষে জ্বর।

(ঙ) প্রায়ই বমি করা।

(চ) অগ্নিমান্দ্য।

(ছ) অরুচি।

(জ) শৈত্য সেবনে আসক্তি। (ইহা গাত্র দাহেয় জন্যই হইয়া থাকে।)

(ঝ) ল্যারিঙ্কসে ক্ষতোৎপত্তি।

(ঞ) কৃশতা।

(ট) কখনও শুষ্ক কাসি, কখনও আর্দ্র কাসি।

(ঠ) বক্ষ বিকৃতি (বুক বসিয়া যাওয়া বা বাঁকিয়া যাওয়া) শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বুকের কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান উঠে না।

(ড) স্পর্শ কম্পন। শিশু যখন কথা কহিবে, তখন বুকে হাত দিয়া দেখিলে মনে হইবে—ভিতরে খুব কাঁপিতেছে।

(ঢ) বক্ষ বাদনে—শব্দের নৈমিত্য।

(ণ) ষ্টেথিসকোপ দিয়া শ্রুতি পরীক্ষায় —নানারূপ আগন্তক শব্দ, রোগ বদ্ধমূল হইলে কখনও কটকট শব্দ, কখনও ভুড়ভুড় শব্দ, কখনও ভড় ভর শব্দ—নানারকম শব্দ।

(ত) উগ্র প্রকৃতি।

(থ) চক্ষুদ্বয়ের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য।

(দ) মাঝে মাঝে গ্রন্থি স্ফীতি।

(ধ) জিহ্বার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণের ছোব ধরা।

(ন) মৃত্তিকা ভক্ষণে আগ্রহ।

(প) মূত্রদ্বার মাঝে মাঝে উত্তেজিত হওয়া।

(ফ) সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাব।

(ব) কেশ পাত।

(ভ) পেট ফাঁপা। ইত্যাদি।

কি কারণে শিশু যক্ষ্মাক্রান্ত হইতে পারে?—

কারণ অনেক গুলি। তন্মধ্যে প্রধান কারণ গুলির উল্লেখ করিতেছি।

১। পিতৃবীর্য্য ও মাতৃ রক্তের দোষ। ২। দুষ্ট দুগ্ধ পান। ৩। অতিরিক্ত মিষ্টান্ন ভোজন। ৪। জনাকীর্ণ সহরে বাস। ৫। বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের অভাব। ৬। স্যাঁতানে স্থানে বাস। ৭। সর্ব্বদা কোণে থাকা। ৮। সর্ব্বদা জামাজোড়া গায়ে থাকা। ৯। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। ১০। স্নেহ বহুল দ্রব্যের অতি ভোজন। ১১। ভয় দেখানো। ১২। কাঁদানো। ১৩। শরীরে প্রায়ই ক্ষতোৎপত্তি। ১৪। যক্ষ্মাগ্রস্তা জননীর স্তন্য পান। ১৫। উচ্চ স্থান হইতে পতন।

যে পর্য্যন্ত শিশুর দন্তোদেগামন না হয় – সে পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত।

আমি যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শিশুটীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহাকে কেবল "চ্যবনপ্রাশ" খাইতে দিয়াছিলাম। বাস্তবিক চ্যবনপ্রাশ ক্ষয় নিবারণে অদ্বিতীয় মহৌষধ। তবে তাহা চ্যবনপ্রাশ হওয়া চাই। মুদী পসারীয় দোকানের দুই তিন টাকা সেরের গাদ্য না হয়।

যখন দেখিবেন—শিশুর প্রায়ই সর্দ্দী কাসি লাগিয়া আছে; মাঝে মাঝে গলায় বীচি হইতেছে, টন্‌সিল্ বৃদ্ধির জন্য – শুষ্ক কাসি দেখা দিয়াছে, মধ্যে মধ্যে উদরাময় হইতেছে, অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা আরম্ভ হইয়াছে, শিশু যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে,—আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে ছাগ দুগ্ধের সহিত চ্যবনপ্রাশ খাওয়াইবেন। প্রথমে দুই বেলা ২টী বড় মটরের মত মাত্রায় দিবেন। সপ্তাহান্তে মাত্রা বৃদ্ধি করিবেন। তৃতীয় সপ্তাহেই দেখিতে পাইবেন—শিশুর অত্যন্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে, চতুর্থ সপ্তাহে—তাহার দেহের ওজন বাড়িয়াছে। যে শিশুর প্রকাশ্যে কোন রোগ বুঝা যাইতেছে না, অথচ দিন দিন রোগা হইতেছে, চ্যবনপ্রাশ তাহার একমাত্র মহৌষধ।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন। *

* লেখক ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ভূধর চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের মধ্যমাত্মজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কার্য্যবিৎ। আমরা সাদরে প্রবন্ধটী পত্রস্থ করিলাম। আঃ সং।

উপরোধ রক্ষা।

—:*:—

আমি গলিতদন্ত, লোলিতচর্ম্ম, স্খলিত পদ, পলিতকেশ—বৃদ্ধ; এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ করিয়া "শেষ-খেয়ার" প্রতীক্ষায় নদীর কূলে বসিয়া আছি।

আমার অবস্থা—

"পর পারে উত্তরিতে, পা' দিয়েছি তরণীতে"

কিন্তু একি! "পিছু হ'তে আবার আহ্বান!" শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ ভায়া এখনও আমায় ছাড়িতে চাহেন না! যখনি দেখা হয়, তখনি বলেন—"দাদা! কিছু লিখুন না।" এ অনুরোধ অবহেলা করিবার সাধ্য তো এ বুড়ার নাই। এ আদেশ যে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যার আদেশের মত অলঙ্ঘ্য! তবে আমি করি কি? আমাকে যে লিখিতেই হইবে। আমার লেখার প্রধান অন্তরায়—আমি আজীবন কেবল গল্প-গাথা আর কাব্য লিখিয়াই মরিয়াছি; "আয়ুর্ব্বেদ" কবিরাজী কাগজ—ইহাতে "দর্শন" "বিজ্ঞানে"র আলোচনা হয়; ইহাতে কেবল—"হ-য-ব-র-ল ঋ-ঢ়-ধ-ঘ—ঙ—ভূরি ভূরি শাস্ত্র বচনং!!" এখানে ত আমার দন্তস্ফুট চলিবে না। দন্তই বা আমার কোথায়?

কিন্তু একটা কথা আছে—আমার ভাই ডাক্তার, তবু আমি "নার্ভিকা"র বদলে "মকরধ্বজ" খাই; আমার মুখে কাটলেটের চেয়ে শুক্তানি ভাল লাগে। আমি অনেক কবিরাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া—তাঁহাদের চিকিৎসা-নৈপুণ্য দু' একস্থলে প্রত্যক্ষও করিয়াছি। আমি কবিরাজী কাগজে লিখিবনা কেন? অতএব জ্ঞানদাসের ভাষায়—আমাকে বলিতে হইতেছে—

লিখিব লিখিব সখি! নিশ্চয়ই লিখিব।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমার তৎকালের প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণ যুবার একদিন খুব জ্বর হইয়াছিল। প্রথমে জ্বরটাকে আমরা গ্রাহ্যই করি নাই। কিন্তু ৫ দিন পর্য্যন্ত যখন জ্বর ছাড়িল না, তখন একজন ডাক্তারকে ডাকা হইল, ডাক্তারটী নেটিভ ডাক্তার হইলেও বেশ বিজ্ঞ। তিনি রোগীকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"নিমোনিয়া হইয়াছে।" শুনিয়াত আমাদের চক্ষুস্থির! ডাক্তার প্রথমে একটু সাহস দিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন —সর্দ্দীর লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ৪ ঘণ্টা অন্তর ১০ গ্রেণ মাত্রায় Pobase Iodide" ১ আউন্স জলের সহিত সেব্য। সঙ্গে সঙ্গে Spongio pillne দ্বারা বক্ষঃস্থল বন্ধন। ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত রোগ সমভাবেই রহিল। ডাক্তার বলিলেন—"এ 'লোবার নিমোনিয়া', ইচ্ছা করিলে আর কাহাকেও ডাকিতে পারেন।" সেইদিন অপরাহ্নে স্থানীয় বড় ডাক্তারকে ডাকা হইল। পটাশ আইডাইডে শ্লেষ্মা তরল হয় নাই শুনিয়া তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন। শেষে প্রেসক্রিপসন্ লিখিলেন—*

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড—১৫ গ্রেঃ

স্পিরিট ক্লোরফরম—১৫ মিঃ

* আমার চিরকালের স্বভাব—নোটবুকে প্রেস্‌ক্রপসনের নকল লিখিয়া রাখা—লেখক।

টিংচার ডিজিটেলিস্—৫ „
ব্র্যাণ্ডী————২ ড্রাঃ
জল——————১ ঔন্স

দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে। ইহার সঙ্গে ফ্লানেল জ্যাকেট। পথ্য—দুধসাগু ও স্থপ।

রোগ কিন্তু বাড়িতেই চলিল ডাক্তাররা আসিয়া ঘন ঘন ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কোনদিন লাইকার ষ্ট্রিকনিয়া, ও স্পিরিট ইথারিস্, কোনদিন এল কানাইল্ মিকশ্চার, কোন দিন বা অ্যাসিড মিকশ্চার, কোনদিন বা এফার ভেসেন্স্ মিকশ্চার,—এইরূপ নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল।

২৩ দিনের দিন—ডাক্তারদ্বয় বলিলেন—"জীবনের আর আশা নাই। এখন আপনারা অন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

বুঝুন এইবার গৃহস্থের কি বিপদ। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—ভয়ানক দুর্ব্বল—এইরূপ দুঃসময়ে ডাক্তার জবাব দিলেন!! গ্রামান্তরে আর একজন প্রবীণ ডাক্তার ছিলেন, তিনি ৬৲ টাকার কম রোগীর গৃহে পায়ের ধূলা দিতেন না। দায়ে পড়িয়া তাঁহাকেই ডাকা হইল। তিনিও বড় আশ্বাস দিলেন না। কেবল বলিলেন—এ নিমোনিয়ার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সংযোগ আছে। প্রেস্কৃপসন লেখা হইল—

Re.
কুইনাইন সাল্ফ—২ গ্রেণ,
সাইট্রিক এসিড্—১০ গ্রেণ,
সিরপ সিমপ্লেকস—১ ড্রাঃ
জল————½ ঔন্স।

২ ঘণ্টান্তর সেব্য।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অধিকন্তু রোগীর দেহে আর একটী উপসর্গ দেখা দিল—পেটফাঁপা। ক্রমে রোগীর জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া আসিল।

তা'রপর সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে—মরণকালে বৈদ্যকে স্মরণ! পার্শ্বের গ্রামে এক বৈদ্য ছিলেন, লোকটী বেশ সদাচারী, মিতভাষী এবং বিজ্ঞ। তাঁহাকেই ডাকা হইল। কবিরাজ আসিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী টিপিলেন, পেটটা একবার বাজাইলেন। তা'রপর—আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঘোর সান্নিপাতিক বিকার। বাঁচিবার আশা কম। বলেন তো ঔষধ দি। কিন্তু আরোগ্যের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

আমাদের আগ্রহাতিশয্যে কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিলেন—প্রাতঃকালে "কস্তুরী ভৈরব"। বৈকালে—পিপুলচূর্ণ সহ দশমূল পাচন। রাত্রে—"মকরধ্বজ।" আমরা পথ্যের কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"এতদিন কি পথ্য দিতেছিলেন?" উত্তর দিলাম—"দুগ্ধ ও স্থপ।" কবিরাজ মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! স্থপ দিতেছেন? যাহারা সর্ব্বদা মাংস ব্যবহার করে,—স্থপ তাহাদের পক্ষে সুপথ্য হইতে পারে। এ শাক-ভাত-খেগো বাঙ্গালী—এর পেটে কি স্থপ সহ্য হয়? স্থপ খাইয়াই হয়ত পেটফাঁপা দেখা দিয়াছে। কবিরাজ দুগ্ধ পর্য্যন্ত বারণ করিয়া দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা হইল—মসুর ডালের তরল যূষ। তা'ও—দিনে রেতে ৩ বার মাত্র।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই—যে রোগীর শরীরের বলাধানের জন্য আমরা হিন্দু হইয়াও—প্রত্যহ

দুইটা করিয়া কুক্কুট শাবক সংহার করিতাম, ত্রিসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণ সন্তানকে—মুর্গীর যুষ খাওয়াইতাম,—এতদিন তাহার পার্শ্বপরিবর্ত্তনেরও শক্তি ছিল না,—কুক্কুটবংশ ধ্বংস করিয়াও তাহার শরীরে যে বলটুকু হয় নাই, কবিরাজের এই নিরামিষ মস্থর-ক্বাথে সেই রোগীর দেহে দিন দিন বল বাড়িতে লাগিল। রোগীর পেটফাঁপা কমিল, মলমূত্রের যথারীতি প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল। অতি সহজে অল্প কাসিবা মাত্র—পাটল বর্ণের প্রচুর শ্লেষ্মা উঠিতে লাগিল। কবিরাজের হাতে ১১ দিন থাকিবার পর—রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গেল, গা' ঠাণ্ডা হইল। আমরা ত ভয়েই অস্থির,—কোলাপ্স নহে ত? কবিরাজকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া রোগীর হাত দেখিয়া বলিলেন—"আর ভয় নাই, বিকার কাটিয়া গিয়াছে।"

১৭ দিনের দিন রোগী—বালিস ঠেসান দিয়া বসিতে পারিল। ক্ষুধায় তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—হায়! তথাপি সেই নিষ্ঠুর কবিরাজ—কোন নূতন পথ্যের ব্যবস্থা করিলনা। ৪১ দিন কাটিলে রোগী একটু পল্‌তার ঝোল পাইল। তা'রপর মুগসিদ্ধ, থৈ ও মস্থরডাল, অবশেষে ওজন করিয়া একছটাক পরিমাণ পুরাতন চালের অন্ন। ২ মাস পরে রোগী যখন বেশ বেড়াইতে লাগিল, তখন—মাষকলাই সিদ্ধ তৈল মাখিয়া সর্ব্বৌষধি জলে স্নান। ইহার পূর্ব্বে—আমরা রোগীর গা মুছাইয়া দিবার জন্য অনেকবারই অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কবিরাজ তাহা অনুমোদন করেন নাই। স্নানের কথা বলিলেই বলিতেন—"যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।"

এই রোগী—এখন আমার কাছেই কার্য্য করে। এ ঘটনাটা আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট। ইহার পূর্ব্বে—কবিরাজের ছাগবিষ্ঠা সদৃশ বটিকায় যে নিদারুণ নিমোনিয়ার নিবৃত্তি হইতে পারে—আমার সে ধারণাও ছিল না! এরূপ অনেক ঘটনা আমরা নিত্য দেখিতেছি, তবুও কবিরাজের প্রতি আমাদের ডাক্তারের মত শ্রদ্ধা নাই! আমরা কবিরাজ ডাকি কখন? যখন ডাক্তারের ফিঃ গুণিয়া, মিকশ্চারের মূল্য যোগাইয়া গৃহস্থ নিতান্তই দশাহীন হইয়া পড়িয়াছে,—ভুগিয়া ভুগিয়া রোগী যখন জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আমরা কবিরাজের কাছে উপস্থিত হই, এবং প্রথমেই নিজের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করি! আমার মনে হয়—যদি দিন কতকের জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা ধর্ম্মঘট করিতে পারেন, তাহা হইলে—এ দেশের অসংখ্য জীর্ণ রোগীকে পটলোৎপাটনের জন্য ঝুড়ির অন্বেষণ করিতে হয়। রোগী ও বৈদ্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই—কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমারও উপরোধ রক্ষা হইয়াছে, এখন 'ইতি'।

শ্রীতারক নাথ বিশ্বাস।

তুলসী।

—:*:—

তুলসী হিন্দুর একটী প্রধান অর্চ্চনার বৃক্ষ। যে হিন্দুর গৃহ-প্রাঙ্গনে যত্ন রক্ষিত তুলসী বৃক্ষ নাই, হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নহে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু অপেক্ষা প্রিয়া তুলসীর অধিক সম্মান

করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে জল দান, তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী তলে প্রণাম না করেন—তিনি কখন বৈষ্ণব নহেন। তুলসী কাহারও নিকট অনাদৃত নহেন। পঞ্চ উপাসক সমানভাবে তুলসীর আদর করিয়া থাকেন।

তুলসী বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবলভাবে নিহিত আছে। ইহার কাষ্ঠের মাল্য ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যুৎ বেগ স্থিরভাবে রক্ষিত হয়, সুতরাং উহাতে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়,—সহসা শরীরেও কোন ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ততঃ রোগ প্রতিষেধের জন্য আমি সকলকেই তুলসী মাল্য ধারণ করিতে অনুরোধ করি। তুলসী-কাষ্ঠধারী—সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও সৎপথাবলম্বী হয়। যাঁহারা মাল্য ধারণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা ইহার কাষ্ঠ কোমরে অথবা বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারেন।

তুলসীর রস—জ্বর ও সর্দ্দি নাশক। প্রবল সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে—তুলসীর রস সহ মকরধ্বজ সেবন করাইয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। দুই বেলা খাইতে হয়। কৃষ্ণ তুলসী, শিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস ১ তোলা গরম করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে কফ জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তুলসীর রস শরীরের দূষিত রক্ত শোধন করে। ইহা বাতরক্ত ও গলিত কুষ্ঠ নাশক। কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তের সুস্থ থাকিতে হইলে তুলসী তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রত্যহ তুলসীর রস দুই বেলা সেবন ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্র পান করিলে অনেক স্থলে কুষ্ঠ ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন রোগ বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে—মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়াবাহী বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দ্দন করুন, মশক নিকটে যাইবে না।

যাঁহাদের শরীরে নানাবিধ চর্ম্মরোগ আছে, তাঁহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দ্দন করুন। বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করে।

যিনি দুই বেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, তাঁহার শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জল হইতে থাকে। ইহা একটি কম রসায়ন নহে।

বীর্য্যস্তম্ভে তুলসীর শক্তি অসীম। কিয়ৎ পরিমাণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়। আয়ুর্ব্বেদ কি বলিতেছেন শুনুন,—

শূরনং তুলসী মূলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ
ন মুঞ্চন্তি নরোবীর্য্যা মে কৈকেন ন সংশয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয় হয়, তাহারা সপ্তাহে ২ দিন অল্প মাত্রায় তুলসী মূল সেবন করিবেন, দেহস্থ বিদ্যুৎ সংরক্ষিত হইয়া আর অযথা শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য দেহে বিদ্যুৎ অবিচলিত রাখিতে তুলসীর মত আর বুঝি কাহারও শক্তি নাই।

তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক চতুর গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্ম্মাণকালে মট্‌কার কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাঁধিয়া দেন, সে গৃহে কখন বজ্রাঘাতের ভয় থাকে

না। ইহা বজ্র-রোধক দণ্ড অপেক্ষা গুণশালী। শাস্ত্রকার বলেন,—যাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে তথায় কি বজ্রপাত হয়?

রক্তপিত্ত রোগীকে তুলসী ও কামিনী পাতার রস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-বমন বন্ধ হয়। তুলসী তলের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, তুলসীতলের কেবল মৃত্তিকা খাইয়া অনেকে যে রোগ মুক্ত হন—ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।

শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রস পান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী ঘৃতের সহিত প্রত্যহ দুইখান তুলসী মুল ভক্ষণ করিলে শরীরে আবার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, রোগও আরোগ্য হইবে।

শ্রীবঙ্কুবিহারী সেন গুপ্ত কবিরাজ।

চা পানের অপকারিতা।

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে চাএর প্রচলন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে অনায়াসে ২টী পয়সা ব্যয় করিয়া চা খাইয়া থাকে। কলিকাতার প্রতি রাজপথে অসংখ্য চাএর দোকান বসিয়াছে এবং প্রতি দোকানেই বহু খরিদ্দারের সমাগম হইয়া থাকে। আমার কোন বন্ধু একদিন হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোড, এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের চাএর দোকান গণনা করিয়াছিলেন, গণনায় দোকান ১১০ খানি হইয়াছিল। ইহাতেও অনেক দোকান বাদ পড়িয়াছিল। এই সকল দোকানেই ঘরভাড়া, সরঞ্জামী খরচ প্রভৃতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া বেশ লাভ হইয়া থাকে, নতুবা দোকান উঠিয়া যাইত। এই সমস্ত টাকাই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোক এবং সামান্য ব্যবসায়ী—মুটে, মজুর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি দিয়া থাকে। যাহাদের চা বাগান আছে, তাহারা এবং চাএর বড় বড় ব্যবসায়ীগণ প্রথমতঃ বিনা পয়সায় চাএর প্যাকেট বিতরণ করিতেন, তারপর ক্রমে যখন লোকের নেশা ধরিল, তখন বিতরিত চাএর মূল্য সুদসহ আদায় করিয়া লইলেন। শুধু কলিকাতায় নহে, আমাদের দেশের সকল প্রধান সহরেই এইরূপে চাএর বহুল প্রচলন হইয়াছে। আমি যখন বোম্বাই নগরে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে অসংখ্য ইরাণী দোকান দেখিয়াছিলাম। ঐ সব দোকানে চা বিক্রয় হইত। সে সময়ে কলিকাতায় চাএর দোকান বসে নাই। বর্ত্তমানে বোম্বাই সহরে চা-বিক্রয় আরও বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, চাএর একটু উপকারিতা আছে, তাহাতে শরীর ঝরঝরে রাখে এবং উৎসাহ জাগাইয়া তোলে। বাস্তবিক পক্ষে যদিবা ঐ গুণ চাএর থাকে, তাহা সাময়িক মাত্র এবং যেমন প্রত্যেক সাময়িক এবং কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত উত্তেজনার অবসানে, দ্বিগুণ অবসাদ আসে, চাএর প্রভাবটুকু অন্তর্হিত হইলেও শরীরে সেইরূপ অবসাদ আসিয়া

থাকে। এ কারণ একবার চা ধরিলে তাহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সমস্ত নেশার জিনিষের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, চায়ে Dyspepsia আনয়ন করে। কিছুদিন নিয়মিত চা সেবন করিলে পাকযন্ত্রের পূর্ব্বের তেজ থাকে না, উক্ত যন্ত্রস্থ Gastric juice পাতলা হয় এবং তাহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যারামের সৃষ্টি হইয়া থাকে। চাএর এই কুফল একদিনে অথবা হঠাৎ উপস্থিত হয় না; এ কারণ লোকে মনে করে, ঐ সব ব্যারাম অন্যান্য কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চা পান যে ঐ সব রোগের এক প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা সেবনে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া যায় ও তাহাতে পরিণামে নানাবিধ দুঃসাধ্য ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। যদিবা শীতপ্রধান দেশে চাএর কোন উপযোগিতা থাকে, আমাদের দেশের মত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে চা—বিষের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। বহু লোকে চা পান করিয়া তাহার অনিষ্টকর ফলভোগ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে চাএতে তাঁহাদের অপ্রবৃত্তি হয় নাই। এইটাই চাপানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কুফল। পরের অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া আমরা যাহা করি, তাহার পরিণাম ফল বিবেচনা করি না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?

চা পানের আর একটি অনিষ্টকর ফল আর্থিক ক্ষতি। যে পরিবারের ৪ জন লোক চা পানে অভ্যস্ত, তাহাদের দু'বেলা চা পানে অন্ততঃ।০ আনা ব্যয় হইয়া থাকে অর্থাৎ মাসে প্রায় ৮৲ টাকা ব্যয় হয়। একটি দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসিক ৮৲ টাকা ব্যয় করা সহজ কথা নহে। ফলে তাহাদের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়। এই ভাবে আমাদের দরিদ্র দেশের কত টাকা যে চাএর জন্য ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে।

চা পানের এতগুলি কুফল। আমাদের দেশে জন সাধারণের অবগতির জন্য গৃহে গৃহে চা পানের কুফল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এবং আমাদের দেশের লোকের বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক হিতপথ গ্রহণ করিয়া চা পান একেবারে ত্যাগ করা উচিত।

চা পানের আরও একটি কুফল এই যে, বাড়ীর পুত্র-কন্যাগণ সকলেই চা পানে উৎসাহিত হইয়া থাকে। কোন কোন পিতা মাতা নিজ হাতে স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে চা পান করিতে শিখাইয়া থাকেন। পরিণামে এজন্য তাহাদের সকলেরই নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়।

এই সব কারণে এই অশীতিপর বৃদ্ধের অনুরোধ—দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন এবং বালক বালিকাগণের ভবিষ্যৎ জীবনপথে কণ্টক রোপণ করিবেন না।

চা পান ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করিয়া সকলেই চাএর বিরোধী হন, এই আমার নিবেদন।

শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

—:*:—

(আয়ুর্ব্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত)

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কোন্ সময়ে উৎপত্তি হইল,—কেমন করিয়া—কি জন্য সে চিকিৎসা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইল,—সে প্রবর্ত্তনায় দেশবাসীর কিরূপ উপকার হইল,—সে সব কথা আমি কিছুই বলিব না। শাস্ত্রকুশল সদ্বৈদ্য পরিবৃত আজিকার এই সভায় সে সব কথা বলার আবশ্যকতাও আমি কিছু মনে করি না,—কেননা, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই সে সব কথা অবগত আছেন, সুতরাং সে সব কথার উত্থাপনে আয়ুর্ব্বেদের ইতিবৃত্তেরই পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং সে পুনরাবৃত্তি সুধী সমাজে বিরক্তিরই কারণ হইয়া থাকে।

আমার আজ বলিবার বিষয়—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এখন যে ভাবে দেশের মধ্যে চলিতেছে—ইহাই ঠিক?—না বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া লইয়া, অথচ ঋষিপ্রদর্শিত পন্থা হইতে বিচ্যুত না হইয়া, একটু মার্জ্জিত ভাবে ইহার কতকটা পরিবর্ত্তন করা উচিত? সে মিমাংসা করিতে হইলে এ চিকিৎসা আগে কি ভাবে প্রচলিত ছিল, সেই কথার একটু আলোচনা করিতে হয়॥

যে সময় ইংরাজী সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবাহিত হয় নাই,—ইংরাজী ছাঁচে—ইংরাজী অনুকরণে—ইংরাজী আব্‌হাওয়ায়—ইংরাজী ঢংএ—ইংরাজী রংয়ে,—এক কথায় ইংরাজের চালচলন—অশনবসন,—কথাবার্ত্তা—ভাব ভঙ্গিমা—ধরণ ধারণ—করণ কারণ—ইংরাজের তাবৎ বিষয়েই হিন্দুসন্তান—তথা বাঙ্গালী সন্তান আদৌ অভ্যস্ত হয় নাই,—শিক্ষার জন্যই বল—আর অর্থোপার্জ্জনের জন্যই বল—যৎকালে শ্যামলশস্যসম্ভারপরিমণ্ডিত,—চ্যুতপণশঃ-জম্বু-কপিথ-বিল্ব-বদরী-বিটপি সুসজ্জিত,—শ্বেত—স্বচ্ছ—পুষ্করিণী—দীর্ঘিকা-সম্পদ সম্ভারে সুমণ্ডিত—মুক্ত বায়ু প্রবাহিত—জননী—জন্মভূমি—পল্লীভূমি হইতে পরিবার পোষণের চিন্তায় আকুল হইয়া বাঙ্গালী সন্তানকে সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হয় নাই, সে সময় সর্ব্বাঙ্গ সংসৃত রোগ সকলের—অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, উন্মাদ অপস্মার প্রভৃতির প্রশমনোপায়ের জন্যই হউক,—আর দেহ নিবদ্ধ শল্য উদ্ধারের জন্যই হউক, কিম্বা চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও নাসিকাদি সংশ্রিত ব্যাধি সকলের প্রতীকারের আবশ্যকই হউক—এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এক কথায়, শল্য, শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র—এই অষ্টাঙ্গের চিকিৎসাই সে সময় দেশের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। দ্বিতীয় ধন্বন্তরি সদৃশ ভিষগবর বাভট,—দ্বাপরে পাণ্ডবদিগের চিকিৎসক পদে যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহাকে কুরুক্ষেত্রের

মহাসমরে উপস্থিত থাকিয়া যে আহতদিগের দেহ হইতে শল্যোদ্ধার করিতে হইয়াছিল,—ইহা তো সকলেই অবগত আছেন। শুধু কুরুক্ষেত্রের কথা কেন,—পুরাকালে ভারতীয় নরপতিদিগের মধ্যে সম্মুখসমরে বাণযুদ্ধের প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়—দেশীয় চিকিৎসকগণ সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন এবং আহত যোদ্ধবৃন্দের শরীর হইতে বাণফলকাদি শল্যোদ্ধারণ, রক্তস্রাব নিবারণ, আবশ্যক মত আহত অঙ্গ বিশেষের ছেদন, ক্ষতাদির প্রতীকার—সকল কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতেন।

এখনকার দিনে প্রচার—শরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কার ১৬২৮ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম হার্ভি নামধেয় এক সাহেব করিয়াছিলেন, কিন্তু ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন হার্ভির অস্তিত্ব পৃথিবাসীর একেবারেই অবগতি ছিলনা,—সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল সেই সময়। ভারতের সেই ফল মূলাশী আর্য্যঋষিই রক্তের গতির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। এ কথার প্রমাণের জন্য শ্লোক সমষ্টি উদ্ধৃত করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

গত বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকার ৮ম ও ৯ম সংখ্যায় প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ লেখক বন্ধুবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ 'সার্জ্জন সুশ্রুত' নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসকগণ সেই প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

ফল কথা, এখন আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একমাত্র কায়চিকিৎসা ভিন্ন অস্ত্র চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের সেরূপ ব্যুৎপত্তি নাই। আগে এরূপ ছিল না। সেকালে কায়চিকিৎসা শিক্ষার মত শল্য শালক্য প্রভৃতি চিকিৎসাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে যথারীতি শিক্ষা করিতে হইত। শল্যতন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, শব ব্যবচ্ছেদ না করিলে কোনপ্রকারেই চিকিৎসা কার্য্য শিক্ষা হয় না এবং যিনি শবব্যবচ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি যমদূত সদৃশ। কিন্তু কাল বিপর্য্যয়ে এ সকল পদ্ধতি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে লোপ পাইল,—যবন অধিকারে রাষ্ট্র বিপ্লবে সকল বিষয়ের মত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে অস্ত্র চিকিৎসায় হঠাৎ বিপদ সম্ভাবনা হেতু দণ্ড ভয়ে ও রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে অস্ত্র চিকিৎসা আমাদের মধ্য হইতে একেবারে লোপ পাইল, ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একমাত্র জ্বর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির চিকিৎসা ভিন্ন যে আর কিছুই জানেন না—ইহাই হইল দেশের লোকের ধারণা এবং সেই ধারণার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধারের জন্য—অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য—অসম্পূর্ণ চিকিৎসাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য—আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আস্থা—সকলই ত্যাগ করিলেন।

ফলে যতগুলি কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে—আমার মনে হয়—আমাদের অস্ত্র চিকিৎসায় অনভিজ্ঞতা তাহার প্রধান কারণ। হোমিওপ্যাথিতে অস্ত্র চিকিৎসার প্রচলন নাই—সেই জন্য এখনকার দিনে হোমিওপ্যাথির উপর দেশের

লোকের আগ্রহ যতটাই বৰ্দ্ধিত হউক, ইহা কিন্তু অ্যালোপ্যাথিককে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, সে উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা হোমিওপ্যাথির কথনও আসিবে বলিয়াও আমি মনে করি না।

অ্যালোপ্যাথি যে বৰ্ত্তমান কালে সকল চিকিৎসার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ—অস্ত্র চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা। মৃতদেহে জীবন প্রদান ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর সকলই প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু অস্ত্র চিকিৎসা কেন,—কায় চিকিৎসায়—জ্বর মগ্নে কুইনাইনের আশুকার্য্যকরী ক্ষমতা—সত্য কথা বলিতে গেলে—এখন আমরা যে সকল ঔষধ লইয়া নাড়াচাড়া করি, তাহা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আমাদের 'নাটা'য় জ্বর বন্ধ হয়, ভাঁট পাতার রসে সে কার্য্য সাধিত হয়,—'হরিতালে' কুইনাইনের অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে,—এসব তো কেবল আমাদের বচন মাত্র, —আমরা কি কেহ সে সকল লইয়া কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি! 'নাটা'য় সত্য সত্য কুইনাইনের মত জ্বর বন্ধ হয়—একথা আমি নিজে পল্লীগ্রামে থাকিতে অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সে 'নাটার' ব্যবহার আমি মোটেই করিনা,—আর কেহ করেন কিনা—তাহাও আমি বলিতে পারি না। তবে এটা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—কুইনাইন বা নাটা প্রয়োগের মত রোগীও কবিরাজদিগের হস্তে এখানে কোনো উন্নত গৃহস্থ একেবারেই দিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই আমাদের নাটা ব্যবহারের বড় আবশ্যকও হয় না।

কিন্তু দেশের যে এই রুচি পরিবর্ত্তন,—ইহার প্রধান কারণই আমরা চিকিৎসার সকল অঙ্গ শিক্ষা করিনা। প্রাতঃস্মরণীয় 'গঙ্গাধর' অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানগভীর গবেষণা—পাণ্ডিত্যেই স্ফুরিত হইত—এখনকার বিজ্ঞান বিদ চিকিৎসকদিগের মত Experimental, (চিকিৎসায় স্বকীয় চিকিৎসার উন্নতির জন্য তিনি বেশী প্রয়াস পরায়ণ ছিলেন কিনা, তাহা আমার ততটা জ্ঞান নাই, কিন্তু এটা আমি নিশ্চয় জানি যে, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর অনেকে অ্যালোপ্যাথদিগকে মড়াকাটা-চিকিৎসক বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে, সেই ঘৃণাকুটিল বদ্ধ ধারণাই আমাদের অধঃপতনের কারণ।

আমরা এখন লম্বা চওড়া সাইনবোর্ড আঁটিয়া, যমক অনুপ্রাসে বিজ্ঞাপনের বাহার করিয়া মটর জুড়ি হাঁকাইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের জীবনের সাফল্য সাধন হইতেছে মনে করিয়া থাকি বটে, কিন্তু যথন একটি জীর্ণ জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্য কোন একটি বাড়ীতে উপস্থিত রহিয়াছি, তথন যদি সেই পরিবারের কাহারও ফোড়া কাটিবার আবশ্যক হয়, কিম্বা পোয়াতি খালাস বা delivery করাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাদের সমক্ষেই পাশ্চাত্য চিকিৎসককে আহ্বান করা হইবে—গৃহস্বামী তথন আমাদের ফেলিয়া তাঁহাকে লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িবেন,—ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা—কলঙ্কের কথা—ঘৃণার কথা—উপহাস্য হইবার কথা নহে। আমাদেরই রত্ন আমাদের বুদ্ধির দোষে আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া অন্যের করতলগত

হইয়াছে,—আমরা রত্ন তো হারাইয়াছিই,—তা' ছাড়া সেই রত্ন কুড়াইয়া লইয়া যাঁহারা দেশ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেছি—এটা কি আমাদের পক্ষে বড় গৌরবের কথা ?—এই যুগের এই দুর্গতি দেখিয়া মনে হয়—সুশ্রুত, দিবোদাস বাভট ! একদা বিশ্ববাসীর কল্যাণ-কামনায় তোমরা যেরূপে সমগ্র ধরণী মাতাইয়া বিশ্ব আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিলে, সেইরূপে আর একবার ভারতে অবতীর্ণ হও,—তোমাদের প্রসাদ-লাভে ভারতের সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া আসুক।

প্রাণ খুলিয়া সত্য কথা বলিতে গেলে একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, আমরা এখন দু'য়ের বার হইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য রত্ন হস্তগত করিয়া অধুনা যাঁহারা সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিবার অধিকারী—আমরা তাঁহা-দিগকেও ছাঁটিয়া ফেলিব—নিজেরাও পুনরুন্নত হইবার চেষ্টা করিবনা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর অনেকে হয়ত আমার স্পষ্ট কথায় রাগ করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের অপলাপ না করিলে অনেককেই স্বীকার করিতে হইবে যে, অধুনা আমরা চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিলেও প্রকৃত চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত নহি। তাহার প্রধান কারণ,—আমাদের মধ্যে অনেকে এখন এক একজন পুরা ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু চিকিৎসা কার্য্যটি যে ব্যবসায়ের অন্তর্গত হইতেই পারে না—তাহা তো আর্য্যঋষিমণ্ডলী পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা ঋষি প্রদর্শিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহা-দের উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি.—ইহা কি আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা ?

ব্যবসায় বলিব না তো কি ? এখন কলি-কাতার অলিতে গলিতে অসংখ্য ঔষধালয়। অনেকগুলি চিকিৎসালয় নহে—কেবলই ঔষধালয়—কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে ঔষধ বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়াই অনেক ঔষধালয়ের উদ্দেশ্য। সুতরাং সে সকল ঔষধা-লয়ে পাওয়া যায় না—এমন ঔষধ নাই, কিন্তু তাহার ভিতরের তথ্য উদ্ঘাটন করিলে সে সকল ঔষধের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। এখন আপনারাই বলুন, —যে চিকিৎসার এরূপ পন্থা অবলম্বন করা হয়, সে চিকিৎসায় গৌরব নষ্ট হইবে না তো হইবে কাহার! সুশ্রুতের অস্ত্র এখন বৈদ্য ভুলিয়াছে,—নাপিত তাহা গ্রহণ করিয়াছে,—প্রশস্ত স্থান হইতে প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত গাছ-গাছড়া সংগ্রহ আগে বৈদ্যগণ যাঁহারা নিজের হাতে করিতেন তাহা এখন বেদে'র হাতে পড়িয়াছে,—মসলা কিনিবার সময় ফর্দ্দ পাঠাইয়া বেণের নিকট যাহা পাওয়া গেল, তাহা আর চিনিবার ক্ষমতা নাই—তাহাই অকৃত্রিম জ্ঞানে বৈদ্য কিনিয়া আনিয়া ঔষধে ব্যবহার করিতেছে.—এ অবস্থায় ব্যবস্থা ঠিক হইলেও ঔষধে আর সেরূপ কার্য্য হইবে কেন ? অথচ ঢক্কাধ্বনি করিয়া জানাইব—আমাদের ঔষধ অকৃত্রিম,—আমাদের ঔষধ যথাশাস্ত্র প্রস্তুত—আমাদের ঔষধ ডাকিলে কথা কহিয়া থাকে। এই সকল কারণেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আয়ুর্ব্বে-দীয় চিকিৎসা যবনাধিকারে যাহা অধঃপতিত হইল, তাহা আর মাথা তুলিতে পারিল না।

ধাত্বাদি ভস্ম তো অনেক চিকিৎসকই এখন করিতে রাজি নহেন, সে গুলি এখন জুগি এবং বরিশাল জেলার কায়স্থের হাতে। তাহাদের প্রস্তুত এখনকার দিনের টাকায় দুই

ভরি রসসিন্দূরও অনেক সময় ১৬৲ ২৪৲ ৩২৲ ৮০৲ মূল্যে আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ রূপে কাহারও কাহারও আলমারির শোভা অলঙ্কত করিয়া থাকে। যে ব্যবসায়ে এতটা অধর্ম্ম—সে ব্যবসায়ের উন্নতি ভগবান সহিবেন কেন? ফলকথা, ইংরাজ রাজত্বে আমরা রাজসাহায্য পাইনা বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিতে পারিতে ছেনা—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত হইলেও আমাদের কৃতকার্য্যের ফলেও যে ইহার উন্নতির বিঘ্ন ঘটিতেছে—ইহাও নির্ভেজাল সত্য কথা। ফলে আমাদের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের পক্ষে আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমাদিগকে আবার সেই সত্যনিষ্ঠ—ধর্ম্মপ্রাণ—কর্ম্মকুশল আর্য্য ঋষির যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমরা নিজেরা যাহা হইয়াছি, তাহার আর উপায় নাই,—কিন্তু আমাদের সন্তানগণ অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদের সকল অঙ্গই যাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং শিক্ষালাভের পর তাহারা যাহাতে বিলাসজুয়ারে গা ঢালিয়া আমাদের অনুকরণপ্রিয় না হয়, যাহাতে তাহারা নিজেরা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে পারে—তাহার জন্য কঠোর শপথ প্রদানে তাহাদিগকে অঙ্গীকৃত করিতে হইবে। ডাক্তার দিগকে ঘৃণা করিলে চলিবে না, বিলুপ্ত শল্য ও শালাক্য চিকিৎসা তন্ন তন্ন করিয়া ডাক্তার দিগের নিকটই শিক্ষা করিয়া আমাদের প্রধান অভাবগুলি পূর্ণ করিতে হইবে,—মহর্ষি চরকের কথায়

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদা রোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ।"

এই কথা স্মরণ করিয়া ডাক্তারদিগের সহিত আমাদের সখ্যতা স্থাপন করিতে হইবে,—গোঁড়ামি—ভণ্ডামি—ঘটাপূর্ণ বাক্যের ছটা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে,—তবেই আমাদের মৃতকল্প আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি সম্ভবপর হইবে,—নতুবা ক্রমশঃ আরও ইহার অধঃপতন ঘটিয়া চিরদিনের জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা "যে তিমিরে-সেই তিমিরে"ই থাকিয়া যাইবে,—আমাদের জীবন কোনোরূপে কাটাইয়া যাইলেও আমাদের পুত্রকলত্রগণ এ চিকিৎসা অবলম্বনে যে আর উন্নত হইতে পারিবে না—সে কথা সম্পূর্ণরূপে অবিসম্বাদিত—অতি অপ্রিয় হইলেও খাঁটি সত্য কথা। সমবেত চিকিৎসকমণ্ডলী এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করুন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

আমার আর একটু বলা হইলেই অদ্যকার প্রবন্ধের শেষ করা হয়। সাফল্য-সাধনই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু চিকিৎসার উদ্দেশ্য কেন,—সকল কর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি যে অ্যালোপাথিক চিকিৎসকদিগের নিকট হইতে বিলয় প্রাপ্ত শস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষার কথা বলিয়াছি, চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে, তাহা ভিন্ন আমাদের আদৌ উপায় নাই। গোঁড়া বৈষ্ণবেরা যেমন শক্তিমূর্ত্তি অবলোকনে প্রণাম করা দূরের কথা,—জগজ্জননী—মহামায়া আদ্যাশক্তির প্রসাদ প্রাপ্তিকালে তাঁহারা যেমন 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কথায় "না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ"—বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাদের মধ্যে যাঁহারা গোঁড়া কবিরাজ—তাঁহারা 'মড়াকাটা চিকিৎসক'-দিগের নিকট আমাদের শস্ত্রচিকিৎসা-শিক্ষা গ্রহণে কথনই সম্মতি প্রদান করিবেন

না। কিন্তু ইহা ভিন্ন যে আমাদের গত্যন্তরও নাই,—তাহা কি তাঁহাদের মনে করা উচিত নয়? আমরা ডাক্তারদিগের নিকট Practical শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব, কিন্তু Practical শিক্ষার জন্য আমরা যাহা অভ্যাস করিব—তাহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের তো বহির্ভূত বিষয় নহে। ভগ্নাস্থির সন্ধান, প্রণষ্ট শল্যের উদ্ধার, ব্রণের শোধন, রোপন, উৎসাদন, অবসাদন প্রভৃতি পুরুষচ্ছেষ্ঠা-সুশ্রুত যাহা করিতেন, আধুনিক ডাক্তার মহাশয়েরা তাহাই অবলম্বনে তাঁহাদের শল্যচিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সুশ্রুতের নরদেহতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞানের নাম তাঁহারা দিয়াছেন—অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি! আমাদের কোষে'র নাম তাঁহারা দিয়াছেন—'সেল'। আমাদের 'পললে'র নাম তাঁহারা দিয়াছেন—'প্রটো-প্লাজম।' আমাদের 'অস্থি'র নাম—ডাক্তার-দিগের 'বোন।' ডাক্তারি শাস্ত্রে মানব দেহের অস্থিনির্ণয়ে তাঁহারা বলিয়াছেন,—"মানব দেহে দুই শতের অধিক পৃথক পৃথক অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কিন্তু —এই 'দুই শতের অধিক' বলিয়া বাক্য অসম্পূর্ণ রাখেন নাই,—অস্থির সংখ্যা নির্ণয়ে নরকঙ্কালে ২৪৬ খানি অস্থি বিভক্ত বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অস্থির সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তারি 'প্যারাইটালে'র আমা-দের দেশীয় নাম—'পার্শ্বকপালাস্থি।' ডাক্তারি 'অক্‌সিপিট্যালে'র আমাদের দেশীয় নাম—'পশ্চাৎকপালাস্থি।' ডাক্তারি 'টেম্পোর‍্যালে'র আমাদের দেশীয় নাম—শঙ্খাস্থি। ডাক্তারি—'সুপিরিয়ার ম্যাকসিলারি'র আমাদের নাম 'ঊর্দ্ধ হনস্থি।' ডাক্তারি 'সার্ভাইক্যাল ভাইব্রি'র আমাদের নাম—'গ্রীবাবলম্বী কশেরুকা।' ডাক্তারি 'রিব্‌সে'র আমাদের নাম—'পর্শুকা' বা পঞ্জরাস্থি সকল। ডাক্তারি—'এলবো-জয়েণ্টে'র আমাদের নাম কর্পূর বা 'কফোনি সন্ধি।' ডাক্তারি 'রেডিয়াসে'র আমাদের নাম 'কোদণ্ডাস্থি।' ডাক্তারী 'কার্পাসে'র আমা-দের নাম মণিবন্ধস্থ সন্ধি.—ইত্যাদি। তবে আমাদের সুশ্রুতের সহিত ডাক্তারির সংজ্ঞা-নির্ণয়ে এক আধটুক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যেমন সুশ্রুতের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার, আর ডাক্তারি মতে অস্থি চারি প্রকার। কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলক—সুশ্রুতের মতে অস্থি সকল এই পাঁচভাগে বিভক্ত। আর ডাক্তারি মতে—অস্থিনির্ণয়ে—দীর্ঘাস্থি, খর্ব্বাস্থি, প্রশস্তাস্থি এবং বিবিধাকার অস্থি সকল। সুশ্রুত বলেন,—জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, দন্ত, তালু, শঙ্খ এবং মস্তকে কপাল নামক অস্থি সকল আছে। দন্তগুলিকে রুচক অস্থি বলা যায়। নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষু কোণে তরুণ অস্থি অবস্থিত। এই তরুণ অস্থি সকলকে ইংরাজীতে কার্টিলেজ অর্থাৎ উপাস্থি বলা হয়।' 'বলয়' নামক অস্থি সকল পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে দেখা যায়। অবশিষ্ট সকল স্থানে 'নলক' নামক অস্থি সকল অবস্থিত। সুশ্রুতের তরুণ অস্থি অর্থাৎ ডাক্তারি 'কার্টিলেজ'টিকে পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তারেরা চারি প্রকার অস্থি নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বড় আসিয়া যায় না। ফল কথা আমি বলিতে চাহি—ডাক্তার-দিগের নিকট আমাদের অ্যানাটমী ও সার্জ্জারি শিক্ষা করিলেও তাহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহির্ভূত হইবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অস্থি সমূহের যে সকল নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহর্ষি সুশ্রুতের নামকরণের সহিত

তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। প্রভেদের মধ্যে যা, কেবল—ডাক্তারদের ভাষা ইংরাজী ও আমাদের ভাষা সংস্কৃত।

হিন্দুশাস্ত্র মতে অধ্যাপনার ভার ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যই লইবার অধিকারী। অন্য সম্প্রদায়ের নিকট অধ্যয়ন দূরের কথা, ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর নিকটও হিন্দুর অধ্যয়নের রীতি কোনো কালে ছিল না। কিন্তু এখন তো সে রীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময় সাহেবদিগের নিকট পর্য্যন্তও আমাদিগকে শিক্ষা লইতে হয়। সেটা হইয়াছে কেন?—না ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে সাহেবেরাই অধিক কর্ম্মকুশল। ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হইত কখন?—যখন ব্রাহ্মণেরা নিজেরা সুশিক্ষিত ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যখন সুশিক্ষিত ছিলেন তখনই তাঁহারা সমাজের সকল কর্তৃত্ব হাতে লইয়া ছাত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন। কাল বিপর্য্যয়ে ব্রাহ্মণের সে গর্ব্ব এখন খর্ব্ব হইয়াছে। সমাজবন্ধন আঁটিবার ক্ষমতা এখন দেশের ধনাঢ্য মোড়লের। অখাদ্য—কুখাদ্য—অমিত—অহিত—হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ আহারীয় গ্রহণ ধনাঢ্যের পক্ষে এখনকার দিনে আর অতি গোপনে করিবার বড় প্রয়োজন হয় না,—আপন আলয়ে বাবুর্চি রাখিয়া নিষিদ্ধ মাংস রন্ধন করাইলেও আর সমাজচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে শক্তি লইয়া ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রতিভা ফুটিয়া উঠিত,—সে তেজঃ প্রতিভা যে এখন লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার শাসন দণ্ড আর লোকে মানিবে কেন? এম-এ পাশ করিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত হওয়ার জন্যই বল, আর অতুল ধনের ঐশ্বর্য্য গর্ব্বেই বল—অনেকেই এখন সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। হিন্দুসমাজ নামে আছে, কিন্তু সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা যে এখন খিচুড়িতে পরিণত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

যাক্—যা' বলিতেছিলাম—অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ভিন্ন আর কাহারও অধিকার না থাকিলেও যখন সুশ্রুতের যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন আমাদের অনায়ত্ত বিষয় গুলি আয়ত্ত করিতে হইবে—অন্যজাতির নিকট। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। অস্ত্র চিকিৎসা ডাক্তারদের নিকট আমরা শিক্ষা করিলেও আমরা বেদ বিহিত চিকিৎসাই শিক্ষা লাভ করিব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দেশের পণ্ডিত মণ্ডলীই অথর্ব্ব বেদকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সামবেদেই শারীর বিদ্যা ও শল্য বিদ্যার প্রথম পরিচয় পরিস্ফুট। সেই সকল পণ্ডিতের বিশ্বাস,—বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর ছেদিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম হইতে শারীর বিদ্যার উৎপত্তি। যাহা হউক—অথর্ব্ববেদ হইতেই হউক আর সামবেদ হইতেই হউক—বেদ হইতে যে শারীরবিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে—সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং আমরা অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিলেও বেদ বিহিত চিকিৎসাই শিক্ষা করিব। এখন আমরা জানিনা বলিয়া অন্যের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু সে অপমানের বোঝা আমাদিগকে বেশী দিন বহিতে হইবে না—আমরা জনকয়েক এই বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেই আমরাই আবার ইহার শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আমাদের দ্বারাই ক্রমশঃ সুশ্রুত কালের মত অস্ত্র চিকিৎসার যুগ প্রভূত উন্নত হইয়া পড়িবে।

শেষ কথা—ভেদবুদ্ধি কোনোকালেই সমীচীন নহে, এজন্য ভেদবুদ্ধি কোনো কালে —কোনো বিষয়েই প্রশংসিত হয় নাই। জগতের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—অনিষ্টের মূলোৎপত্তি এই ভেদবুদ্ধির ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। সেই জন্য আমার মনে হয়—ডাক্তারেরা মুখে যাহাই বলুন—আমাদের কালমেঘ—আমাদের অশোক—আমাদের অশ্বগন্ধা—আমাদের বাসক—আমাদের গুলঞ্চ —আমাদের পুনর্ণবা—আমাদের কণ্টকারী—আমাদের মকরধ্বজ প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা যেমন চিকিৎসায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন, —আমরাও সেইরূপ আমাদের যাহা নাই—যে অস্ত্র চিকিৎসা হারাইয়া আজি আমরা চিকিৎসায় সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছি না,—দেশের মধ্যে যে জন্য আমাদের নিন্দা আছে—অখ্যাতি আছে—অপযশের বোঝা যাহার জন্য আমাদিগকে অম্লান বদনে সহ্য করিতে হয়—পক্ষান্তরে যে অস্ত্র চিকিৎসা হারাইয়া অনেক সময় আমরা নিজেকেই অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি,—সেই চিকিৎসা আমাদের সমাজে আবার যাহাতে প্রচলিত হয়,—সুশ্রুতের যুগের মত সেই চিকিৎসা আবার যাহাতে আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে,—ডাক্তারেরা আমাদের ঔষধপ্রয়োগ দেখিয়া যেরূপ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মুহ্যমান হইয়া পড়েন, সেইরূপ আমাদিগকে অস্ত্র চিকিৎসায় সুপণ্ডিত দেখিয়া তাঁহারা আরও যাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন,—অতীতের উদ্ধার করিয়া,—আমাদের লুপ্ত রত্ন ফিরাইয়া আনিয়া আবার যাহাতে আমরা সুপ্ত ভারত জাগাইয়া তুলিতে পারি—আমাদের জ্ঞানবহুলপাণ্ডিত্য দেখিয়া সমগ্র মেদিনী একদিন যেরূপ আমাদিগকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল,—সমগ্র পৃথিবীবাসী আমাদিগের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য অতৃপ্ত আগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় যেরূপ একদিন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে আমরা আবার সেই দিন ফিরাইয়া আনিতে পারি,—সেই অতীত গর্ব্বে আর্য্যসন্তান আবার যাহাতে জাগিয়া উঠিতে পারে, —ধর্ম্ম কর্ম্মের মূর্ত্তহৃদয় মহামহিম মহিমান্বিত বৈদ্যজাতি আবার যাহাতে বৈদ্যনামের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হয়—আসুন সমবেত বৈদ্যমণ্ডলী—আমরা তাহারই জন্য কৃতসংকল্প হই। আমাদের এই বয়সে আর শিক্ষালাভের উপায় না থাকিলেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে আমাদের আর্য্য ঋষির অনুমোদিত —বেদ বিহিত সকল প্রকার সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া আমাদের লুপ্তকীর্ত্তির পুনঃ প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হই। বৈদ্য চিকিৎসক মাত্রের এখন ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য এবং আমি এই জন্যই এত কথা বলিলাম।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

বংশ রক্ষায় কর্ত্তব্য অবধারণ।

(প্রাপ্ত)

মহাশয়গণ, শ্রাবণের "আয়ুর্ব্বেদ" সংখ্যায় "কাজের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে "বালক রক্ষা," "ব্যাধির কারণ" "অকাল মৃত্যু" "ছাত্র জীবনে

ব্রহ্মচর্য্য" ও "প্রতীকারের উপায়" পাঠ করিয়া মনে বড়ই শঙ্কা ও চিন্তার উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে মনে কয়েকটি কথার উদয় হইল ও আপনাদের লিখিতে ইচ্ছা হইল। যদি এই কথা গুলি আপনাদের রোচক হয় ও ইচ্ছা হয় তবে পত্রে প্রকাশিত করিতে পারেন, নতুবা ফেলিয়া দিবেন।

সন্তান—বিশেষ পুত্র সন্তান না হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মনে কষ্ট হয় এবং যাহাতে উহা লাভ হয় তাহার জন্য অনেকে দেবতা,সাধু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটি সন্তান—বিশেষ পুত্র লাভ হইলে বড়ই আনন্দিত হন। আবার যাঁহাদের এমনই সময়ে পুত্র লাভ হয়, তাঁহারা পুত্র মুখ দেখিয়া আনন্দিত হন আর কন্যা হইলে প্রথমতঃ মনোকষ্ট ভোগ করিয়া পরে মায়াতে মোহিত হইয়া কন্যাতেই প্রীতি লাভ করেন। কিন্তু এই পুত্র বা কন্যা লাভ করা পর্য্যন্তই আগ্রহ। কিসে পুত্র বা কন্যা গুণবান্ বা গুণবতী,—সুস্থ ও সবল হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতের মঙ্গল করিবে—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। কেহ বা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যাপৃত থাকায় সময় না পাইয়া, কেহ বা আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া, আর যাঁহারা অর্থশালী তাঁহারা শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া—বালক-বালিকার সৎশিক্ষা, চরিত্র গঠন ও সুস্থ রাখা বিষয়ের মধ্যে—কিছু তিরস্কার বা প্রহার ছাড়া সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। পুত্র কন্যারাও পিতা মাতার স্বভাব বা প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই স্রোতে ভাসিতে থাকে। এইরূপে দেশের অবস্থা ক্রমে বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলে দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর উপেক্ষা করিবার সময় নাই। সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টপাত করা আবশ্যক হইয়াছে ও বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে আমাদের বংশা-বলী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে লোপ না পায়—তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও সত্বর প্রতীকারের উপায় করার প্রয়োজন। ছেলেরা যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয় তদ্বিষয়ে সত্বর দেখিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা যত-টুকু সময় কাটাই, তাহা অপেক্ষা যদি অনেক কম সময়ও এই বিষয়ে প্রদান করি, তাহা হইলে দেশের মহৎ উপকার হয়। এখন রাজনৈতিক বিষয়ে চীৎকার করিবার পূর্ব্বে বালক বালিকা রক্ষার উপায় করিবার জন্য আমি দেশবাসীকে অনু-রোধ করিতেছি। আমি দেশ বিদেশে হোমরুলের বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমার নিজের গৃহে সেই গৃহ শাসনের অভাব। আগে আমরা সুস্থ, সবল ও নীরোগ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করি, তাহার পর রাজদত্ত অধিকার প্রসারিত করিয়া সুখে থাকিবার চেষ্টা করিব। সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি যে, বালক রক্ষা আমাদের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য কিনা! কেবল সন্তান জন্মিলে হইল না। সেই সন্তান সদ্‌গুণান্বিত, শান্ত-শিষ্ট-ধার্ম্মিক-নীরোগ-সবল ও দীর্ঘজীবী কিসে হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত কিনা? এ বিষয়ে পিতা মাতা উভয়েই উদাসীন। পিতা মাতার ব্রহ্মচর্য্য নাই—চিত্ত সংযম নাই—ধর্ম্ম প্রভাব নাই—আহার শুদ্ধি নাই—বলিতে গেলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে যে গুণগুলির আবশ্যক, তাহার কিছুই নাই—সন্তানে তাহা বর্ত্তিবে কিরূপে? আহার শুদ্ধি না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর

হইবার উপায় নাই। ধর্ম্মঅর্থে—যিনি ধরিয়া রাখেন অর্থাৎ ইহকালে সাংসারিক অভাব হইতে মুক্ত করিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন করেন ও মৃত্যুর পর পথপ্রদর্শক হইয়া সেই রমণীয় দর্শনকে দর্শন করান। ফলে ধর্ম্মহীন আমরাই হইয়াছি,—পুত্রদের দোষ দিলে কি হইবে? কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন "তোমরা সকলেই পুত্র চাও, কিন্তু কেহ শ্রীভগবানের মত পুত্র চাও না। কামজ সন্তানে কি উপকার হইবে। সেইজন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা করি যে, তোমরা শ্রীভগবানের মত পুত্র চাও, মা জগদম্বার মত কন্যা চাও-তবে তোমাদেরও দুঃখ দূর হইবে. জগতেরও দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু শ্রীভগবানের মত পুত্র-মা জগদম্বার মত কন্যা চাহিতে হইলে সেই রূপ শুচি শুদ্ধভাবে জীবন কাটাইতে হইবে-যেমন দেবকী-বসুদেব, যেমন কৌশল্যা-দশরথ, যেমন মেনকা, হিমালয় কাটাইতেন।" পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ভূদেব বাবুও এই কথা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থ দম্পতি এই রূপ ভাবে শুদ্ধাচারে চিত্ত সংযম লইয়া থাকিবেন যেন শ্রীভগবান তাঁহার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এখন আমরা যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় নাই—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হই ও অন্যকে সাবধান করাই—ইহাই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

উপস্থিত আমাদের কি করা উচিত? প্রথমে যাহাতে আমাদের বালকগণ পুষ্টিকর সাত্ত্বিক আহার পায় তাহা করিতে হইবে। আমরা যাহাদের হাতের রান্না খাই, তাহাদের প্রকৃতি আমাদের উপর সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে, সেইজন্য রসুইয়া বামুনের হাতে বা হোটেল প্রভৃতিতে খাওয়া যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া নিজ মাতার হস্তের রান্না খাওয়া উচিত। প্রত্যেক মাতা, আপন সন্তানকে যতটুকু পারেন, নিজের হাতে খাওয়াইবেন এবং সেই রান্না যাহাতে এমন শুদ্ধভাবে হয় যে, যিনি যাঁহার আদিষ্ট দেবতা তাঁহাকে বা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আজকাল পিতামাতা সন্তানকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দেখিতে বড় ভালবাসেন, তাহাতে বিলাসিতা আসিয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, যদি বালককে ৫৲ টাকা দামের বুট জুতার পরিবর্ত্তে ১৲ ১৷৹ দামের চটি জুতা কিনিয়া দিয়া, যে টাকা বাঁচিবে—তাহাতে বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ ও ফল খাওয়ান, তবে সন্তানের মহোপকার করা হয়। বৃথা মাংস, বাসি মাছ একবারে ত্যাগ করান উচিত, দ্বিতীয় উপায় ব্যায়াম,—প্রত্যেক বালককে ডন্, উঠ্‌বস্ করা, আসন করা, ডম্বল দ্বারা বা ছোট হালকা মুগুর দিয়া ব্যায়াম করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ফুটবল্ প্রভৃতি খেলায় পয়সার অনর্থক খরচও ছেলেদের একটা খেলার নেশা জন্মাইয়া দিয়া খেলা যে শরীরের উপকারের জন্য তাহা ভুলাইয়া দেওয়া হয়। তা' ছাড়া ঐ সব খেলায় যেরূপ পরিশ্রম হয় তাহার উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার যোগাইতেও আমরা পারি না। উহাতে খরচ বেশী হয়। যাহাতে খরচ কম হয়—সেইরূপ ব্যায়াম শিক্ষা করানই আবশ্যক। প্রাণায়াম অল্পে অল্পে শিখাইতে পারিলে ভাল হয়। বালক ব্যায়ামে প্রত্যহ বুঝিবে যে, শরীরের উপকার হইতেছে। তৃতীয়—সর্ব্বব্যাধি নিবারণের ঔষধ "রাম" রসায়ণ। সন্ধ্যায় ও শয়নকালে অন্ততঃ বালকগণ, পিতা-মাতা-ভাই-ভগ্নী সকলে মিলিয়া যে পরিবারের

যে ধর্ম্ম বা যে দেবতার উপাসনা করেন, তাহা চিন্তা করা নিতান্ত আবশ্যক। সংসার অজ্ঞানের মূল, জ্ঞান অর্জ্জন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আত্মাকে জানা ও দর্শন করা ও তাহাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল করিলে বালকগণ সৎ হইবে, দয়াবান্ হইবে ও যে অক্ষর সেই ভগবানের পরিচায়ক, তাহাতে অশ্লীলতা লিখিয়া নিজের হস্ত দূষিত করিবে না। ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, বি, এল উকীল।

ডাক্তারের আত্মকথা।

—:*:—

আমি যখন ডাক্তারী ডিগ্রি লইয়া বাহির হইলাম, তখন হৃদয়ের আশা পর্ব্বতাপেক্ষা উচ্চ—মনের অহঙ্কার সাগর অপেক্ষা বিস্ফারিত এবং গর্ব্ব-তরঙ্গে তাহা নিয়ত আন্দোলিত। মনের আনন্দে আটখানা—সদাই ভাবিতাম যে, আমি যাহা শিখিয়াছি, ইহা অপেক্ষা জগতে আর কোন চিকিৎসাশাস্ত্র বা উপদেশ উৎকৃষ্ট নাই। আর আমি যতদূর বুঝিয়া যেমন তেজের সহিত পাশ করিয়াছি, তাহা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। ফলতঃ আমি একটা খুব জাঁহাদার? এরূপ বিশ্বাস একা আমারই মনে যে হইত তাহা নহে। আমি আমার সমপাঠিদিগের সহিত আলাপেও বুঝিতাম যে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই আমার ন্যায় ধারণা বদ্ধমূল।

ক্রমে এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। একদা আমাদের পল্লীগ্রামের দ্বারকানাথ কবিরাজ মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিলেন। বলিলেন, "ওহে বাপু? তোমরা ত ডাক্তারী পাস করিয়াছ; আচ্ছা সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ কি বলিতে পার?" আমি প্রথমতঃ কতকক্ষণ অবাক হইয়া রহিলাম। পরে বারম্বার উত্তেজনা করায় ধুঁয়াইয়া ধিয়াইয়া আমার প্রাক্‌টিস অব মেডিসিনে টাইফয়েড় জ্বরের যে যে লক্ষণ পড়িয়াছিলাম, তাহারই দুই-চারটা যতদূর স্মরণ হইল, বলিলাম। কবিরাজ মহাশয় "হুঁ" এই শব্দ করিয়া ঘৃণা ব্যঞ্জকভাবে এমনই অঙ্গভঙ্গী করিলেন, যাহাতে ডাক্তারী পাস করা ব্যাপার যে অতি তুচ্ছ, এমনকি—কিছুই নহে—এইরূপ ভাব প্রকাশিত হইল। তদ্দর্শনে যদিও আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলাম বটে, তথাপি অহঙ্কারী আমি—নির্লজ্জ আমি—অর্ব্বাচীন আমি—তাঁহার সহিত অজ্ঞতাপূর্ণ তর্কাদি করিতে ছাড়িলাম না। অবশেষে আমার অনুসন্ধিৎসা বশতঃই হউক, বা যে কারণেই হউক, তাঁহার বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিলাম যে,—"আপনি সন্নিপাত জ্বরের কি লক্ষণ অবগত আছেন?' তখন তিনি নিতান্ত মদগর্ব্বিত ভাবে এবং বিদ্রূপাত্মক স্বরে নিদানস্থিত দিব্য পদ্য শ্লোক আবৃত্তি দ্বারা সন্নিপাতের আদ্যন্ত

লক্ষণগুলি বলিয়া যেন ডাক্তারী চিকিৎসা প্রণালীকে এবং তাহার অর্ব্বাচীনতাকে ও শুধু জটিল গন্থছন্দযুক্ত ভাষায় চিকিৎশাস্ত্র প্রণয়ন-প্রথাকে শত ধিক্কার দিলেন। তচ্ছ্রবনে আমি লজ্জা, ক্ষোভ, দুঃখ এবং অপমান বোধ করিয়া এবং পাসকরা ব্যাপারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তৎপর দিবসই মাধব করের কৃত "নিদান" সংগ্রহ করিয়া পড়া আরম্ভ করিলাম।* সংস্কৃত শিক্ষা করি নাই বলিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে বঙ্গানুবাদ পড়িতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে কতক কতক সংস্কৃত বচনও মুখস্থ করিয়াছিলাম। উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে গিয়া বুঝিলাম যে, আমার পাসের দ্বারা শিক্ষার কিছুই হয় নাই।

অনন্তর বর্ষাকালে যখন দেশমধ্যে জ্বররোগ অত্যন্ত বিক্রমের সহিত প্রাদুর্ভূত হইল, তখন আমিও বিস্তর রোগী পাইতে লাগিলাম। "ফিবার মিকশ্চার ও কুইনিন মিকশ্চার" ঔষধ আর দুধসাগু পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিতে থাকিলাম। তাহাতে পিত্তজ্বরগুলি কিছু-দিনের জন্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু শ্লেষ্মার লেশ থাকিলে সে জ্বর আর কিছুতেই যাইতে চাহে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরের উপরে কাস, বুকের বেদনা, গলা বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ জুটিতে লাগিল। লোকে আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া কেহবা কেহবা কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইখানে প্রকাশ থাকে যে, আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এলোপ্যাথগণ যেমন সকল সময়েই এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া কলেরার সময় হোমিওপ্যাথি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় অজ্ঞতার পরিচয় দেন, আমিও তেমনি সকল চিকিৎসা হোমিও-প্যাথিতে করিয়া তৎকালে জ্বর চিকিৎসাটা এ্যালোপ্যাথিতে করিতে যাইয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতাম।—ফলতঃ উক্তপ্রকার ঘটনা অনেকস্থলেই সংঘটিত হওয়া দেখিয়া মনে মনে বড়ই আত্মক্রটি অনুভব হইতে লাগিল। ইহা শুধু আমার একার চিকিৎসায় নহে, আমার সমপাঠীগণ এবং অধ্যাপক স্থানীয়গণ প্রায় অধিকাংশই বিজ্বরে কুইনাইন দ্বারা জ্বর চিকিৎসায় ব্রতী হওয়ায়,—দেশ মধ্যে ইহা স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইয়া পড়িল যে, হোমিও-প্যাথিকে জ্বর চিকিৎসা হয় না। এজন্য যে কলেরা রোগ হোমিওপ্যাথির একচেটিয়া ছিল, একটু জ্বর সংশ্রব থাকিলে উহা আর হোমিও-পাথির আয়ত্ত নহে মনে করিয়া লোকে এলো-প্যাথির আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে কয়েকবৎসর কাটিয়া গেল।

এতদ্দেশে জ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রোগ। তাহার চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য—হইলে আর পসার, প্রতিপত্তি কি করিয়া থাকিবে? কাজেই আমি জনসমাজে দিবাভাগের চন্দ্রমাবৎ হীনপ্রভ হইয়া রহিলাম। ক্রমে অন্যান্য স্থানের হোমিওপ্যাথগণের সংবাদ লইয়া জানিলাম যে,—"সব রশুনের একই স্বাদ।" সকল স্থান হইতেই সৌরভ বাহির হইয়াছে যে,—হোমিওপ্যাথিতে জ্বর চিকিৎসা হয় না।" বড়ই আক্ষেপ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, জ্বরের এত পুস্তক, এত গবেষনা পূর্ণ লক্ষণ অবধারণ, এত সময়ানুসারে দোষাদি বিচারানুসারে চিকিৎসার ইঙ্গিত, ইহা কি সবই ফাঁকি? না, কখনই তাহা হইতে পারেনা। অবশ্যই এখানে আত্মক্রটি আছে। এইরূপে বহু চিন্তা করিয়া—বারম্বার জ্বর চিকিৎসা পুস্তক অধ্যয়ন ও বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক ঔষধ

নির্ব্বাচন দ্বারা জ্বর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দেখি যে,—হোমিওপ্যাথির মত জ্বর চিকিৎসার সুন্দর ঔষধ জগতে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা উপযুক্ত ঔষধের একটি মাত্র মাত্রা সেবনেই অতি তীব্রজ্বর—দশ পনের মিনিট মধ্যে ঘর্ম্ম হইয়া পরিত্যাগ হয় এবং পুনরাগত হয় না। ইহা যদি দশটা স্থলে হয় তবে একশত স্থলে হইবে না কেন? যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই ঔষধ নির্ব্বাচনের ক্রটি আছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ উক্তরূপে প্রত্যক্ষ সুফল দেখিয়া পরম আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তখন "হোমিওপ্যাথিতে জ্বর সারে না" এই ভ্রম বিদূরিত হইল। যেথানে সারেনা সেইখানেই নিজের ক্রটি বুঝিয়া বিশেষ চেষ্টা পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া দেখিতাম, তৎপরে সহজে আরোগ্যও হইত। কিন্তু শ্লেষ্মা সংযুক্ত জ্বর গুলি উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে বেশ ছাড়িত বটে, কিন্তু আবার হইত ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইত। ক্রমশঃ ইহার কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী রহিলাম। কিছুতেই কিছু ঠিক করিতে না পারায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

আমার সহিত একজন খ্যাতনামা সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের বন্ধুতা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠে। তাহার বিশেষ কারণ আমার আয়ুর্ব্বেদপ্রিয়তা ও নিদানাদি পাঠ। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই - চিকিৎসা বিষয়ক আলাপেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। সেই প্রসঙ্গে একদা তাঁহার মুখে শুনিলাম যে,—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে
নতু পথ্য বিহীনানাম ভেষজানাং শতৈরপি।

অর্থাৎ বিনা ঔষধে শুধু পথ্যেই রোগ নিরাময় হয়। কিন্তু পথ্য বিহীন শত শত ঔষধ প্রয়োগেও কোনো ফল ফলিতে পারে না।

আবার তিনি আর একদিন ডাক্তার দিগের তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পথ্যের ব্যবস্থা করা দেখিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিলেন যে—"পথ্যের অব্যবস্থাই ডাক্তারী চিকিৎসার সবিশেষ অনভিজ্ঞতা। যেহেতু ডাক্তারী চিকিৎসায় লোকসকল উক্ত কারণেই চিররুগ্ন হইয়া পড়ে, কারণ বহু পরীক্ষিত ঋষিবাক্যে আছে :—

"জীর্ণজ্বরে কফক্ষীণে ক্ষীরোস্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং॥

অর্থাৎ যেথানে শ্লেষ্মা ক্ষয় প্রাপ্ত অথচ জীর্ণ জ্বর (ঘুসঘুসে প্রাচীন জ্বর) হইতেছে; সেইখানে দুগ্ধ পথ্য দিলে উহা অমৃত সম ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই কাজ করে। আর উহা (দুগ্ধ) যদি তরুণ জ্বরে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিষের ন্যায় মানবগণকে হনন করিয়া থাকে।

বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত বচন প্রমাণ শ্রবণে স্পষ্টই বুঝিলাম যে, তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পথ্য দেওয়া আমার অভ্যাস থাকাতেই জ্বর চিকিৎসা ক্ষেত্রে সচরাচর কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বাস্তবিকই প্রাগুক্ত অকাট্য ঋষি বাক্যাবলম্বনে রোগীকে উপযুক্ত সুপথ্যে রাখিলে বিনা ঔষধেও অত্যল্প কালেই জ্বরাদি পীড়া আরাম হইতে পারে। এইরূপ আলাপ প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাগণ "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোর্জনং" বলিয়াছেন, অর্থাৎ জ্বরের প্রথম ভাগে (আমাবস্থায়) অনশন এবং জ্বর পরিত্যাগান্তে—লঘুপথ্য—তাহাও দুগ্ধাদি গুরু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক পথ্য বর্জ্জিত করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। তার পর নবজ্বরের অষ্টাহ কাল

কোনপ্রকার ঔষধ দিবার বিধিই প্রদান করেন নাই। কেননা রোগীর স্বাভাবিক রোগের আরোগ্য কারী শক্তি (Vismeditetrix matury) ঔষধ কর্তৃক দুর্ব্বল না হয়। অষ্টাহেও যদি স্বভাবে জ্বর আরাম করিতে অক্ষম হয়, তবে মৃদুবীর্য্য ঔষধাদির ব্যবস্থা তাহাও অত্যল্প মাত্রায় দিবসে—জোর দুইবার (এখনকার মত এক বা দু ঘণ্টান্তর নহে) ব্যবহার করাইয়া জ্বর আরাম করিয়া দিতেন। তাহাতে স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি অক্ষুন্ন থাকিত বলিয়াই লোকে একবার জ্বর হইতে সারিতে পারিলে আর দশ পনর বৎসরের মধ্যে জ্বরে পড়িত না। অধুনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে (অর্থাৎ অষ্টাহ জ্বরের ভোগান্তে) প্রযুক্ত হয়, তাহাতে উক্তরূপে সুদীর্ঘকাল নীরোগ থাকিতে দেখা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অতি মাত্রায় অসময়ে ও অযথা ঔষধ প্রযুক্ত হওয়ায় লোকের প্রকৃতি এখন এতই দুর্ব্বল হইয়াছে.--স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি এমনি হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, কেহই দুইদিন কালও অনশনে থাকিতে সহিষ্ণু নহে, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে দুই দিনের তীব্রজ্বর সহ্য করিবার উপযোগী নহে। অনেক স্থলে দুই একদিনের জ্বরেই লীলা সম্বরণ করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয় যে, অতিরিক্ত ঔষধ অযথা বহুদিন সেবন করিতে করিতে তাহাদিগের স্বাভাবিক অরোগ্যকারী শক্তি এতই নষ্ট হইয়াছে যে, সামান্য জ্বরবেগ মাত্রেই ইন্দ্রিয় সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সে যেন মরিয়াই থাকে, কেবল ঐ জ্বরটুকু উপলক্ষ্য হইলেই জীবন শেষ হয়। তবে শাস্ত্রাদিতে যে অভিন্যাস জ্বর প্রভৃতি হঠাৎ মৃত্যুজনক কতিপয় রোগের কথা উক্ত আছে, সে সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত বচন প্রমাণে আমার মনোমধ্যে আর একটী চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম যে পথ্য উপযুক্ত হইলে বিনা ঔষধেই রোগ শান্তি হইতে পারে, সেই জন্য পথ্য ব্যবহার প্রণালী সর্ব্বাগ্রে বিশেষ করিয়া শিক্ষা করার দরকার। তজ্জন্য পথ্য শাস্ত্র অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া ভগ্নমনোরথ হইলাম কারণ কেবল পথ্য বিষয়ের প্রকৃত পুস্তক কবিরাজী এ্যালোপ্যাথী কোন শাস্ত্রেই নাই।* কবিরাজী শাস্ত্রে রোগ হইলে তাহার দেশীয় পথ্যাপথ্য সম্বন্ধীয় যে কয়েক খানি পুস্তক দেখা যায়, তাহাতে অনাগত প্রতিষেধ বিষয়ের কোন উক্তি নাই। তারপর এ্যালোপ্যাথি মতেও বিদেশীয় Beef tea, Beef juce, cheaken broth প্রভৃতি অস্বাভাবিক অযৌক্তিক যে সকল পথ্য অতি সামান্যভাবে লিখিত আছে, তাহাও দেশবাসীর পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। হোমিওপ্যাথী তাহারই নকল, কুপথ্যের কথাত উল্লেখই নাই।

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

* আয়ুর্ব্বেদে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা খুব ভালরূপই আছে। লেখক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আং সং।

ওয়ার ফিভার।

—:*:—

ওয়ার ফিভার বা সমর জ্বর আমাদের দেশে আমদানী হইলেও তাহার স্বতন্ত্র নাম আমদানী হয় নাই। সমরে যেমন অধিকাংশ মানুষেরই প্রাণনাশ হওয়া সম্ভাবনা, কিন্তু সমর জ্বরে প্রাণনাশের সম্ভাবনা নাই।* "যাহা হউক এ জ্বরের নাম বিংশ শতাব্দীর জ্বর" নাম দিয়াই আমরা খালাস হইতে পারিতাম, কিন্তু বিংশ শতাব্দীরও যে এখন অনেক দিন বাঁকী আছে। আর কতিপয় বৎসর পরে হয়ত বর্ত্তমান ওয়ার ফিভারকে একটা নব প্রতিষ্ঠিত পরাক্রান্ত জ্বর আসিয়া পরাস্ত করিয়া দিবে। সুতরাং একটা সঠিক একটানা নাম ওয়ার ফিভারের হইতে পারে না। আমরাও ইহাকে তাই বলিয়াই সম্বোধন করিব।

সমর জ্বর কেমন করিয়া আসে, কিরূপে কয়দিন মানুষের দেহে বাসা গাড়িয়া বসে, কি করিয়াই বা উৎপাত করে, তাহা জানা দরকার। এক একবার এক এক সময়, এক একটা ব্যারাম আসিয়া প্রচণ্ড তুফানের মত দেশের মানুষ গুলাকে ছন্নছাড়া করিয়া দেয়। আমাদের স্মরণ আছে—একবার বাঙ্গালাতে কালাজ্বর আসিয়া বিধ্বস্ত করিল, তা'রপর আসিল ডেঙ্গুজ্বর। ডেঙ্গুর পর আসিল—ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ম্যালেরিয়ায় যত মড়ক—তত আর কিছুতেই হয় নাই। ম্যালেরিয়া যে দিকে পদার্পণ করিয়াছে—তথায় সে বিজয়ী সেনার ন্যায় দেশকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তারপর আসিল—ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইহার পর আসিল সর্ব্বজয়ী প্লেগ। ইহাও এক প্রকার জ্বরবিশেষ। প্লেগের জীবনচরিত সকলেরই জানা আছে বলিয়া আর কিছু বলিলাম না।

এই যে সমর জ্বর আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইহা অতিরিক্ত সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু জ্বর যেমন সংক্রামক—ইহা ততোধিক। প্রথমতঃ এই জ্বরের আদি বা জন্মস্থান ইয়ুরোপ, অর্থাৎ যেখানে যুদ্ধের প্রভাব—সেইখান হইতেই আসিয়াছে বলিয়া ইহার নাম ওয়ার ফিভার বা সমর জ্বর। যুদ্ধস্থলে কামানের গোলা হইতে দূষিত বাষ্প বাহির হইয়া যুদ্ধস্থানের চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে। জাহাজে প্রথমতঃ বোম্বাই, পরে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। সুতরাং আমিও ইহার জীবন চরিত ও চৌহদ্দি বর্ণনায় সমর্থ হইতেছি।

* সমর জ্বরে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে, এ প্রবন্ধ লেখক যে সময় ইহা লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সে সময় এজ্বরে মৃত্যুর কথা বড় শুনা যাইত না, যে সময় কলিকাতায় প্রথম এই জ্বরের আমদানি হয়, এ প্রবন্ধ সেই সময়ের লেখা। কিন্তু তাহার পর এই জ্বর এক্ষণে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিণামে নিউমোনিয়া হওয়ায় ইহা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই ভীষণ মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, ভারতের সর্ব্বত্রই এই জ্বরের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এই জ্বরের আক্রমণ সংপ্রতি পূর্ণভাবে প্রকটিত। আঃ সং।

বোধ হয় ইহাতে সাধারণের উপকার হইবে।

সমর জ্বর বা ডেঙ্গুজ্বর সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালায় আসে কলিকাতায়। কলিকাতার অবস্থা অবর্ণনীয়। সে ছুরবস্থার কথা অনেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা ব্যতীত সংবাদ পত্র পাঠকেরাও বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই জ্বরটা একটা অদ্ভূত প্রকৃতির. জ্বরটা আসিবার আগে কিছু অনুভব করা যায় না। হাত, পা, মাথা বেদনা হয়; সর্দ্দিভাব দেখা যায়। তাহ্মপরই জ্বর। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ গা বেদনা। এই বেদনা সংযুক্ত জ্বর তিন দিনই প্রবল থাকে. তারপর কমিতে থাকে। ৪।৫ দিনের বেশী জ্বর ও বেদনার উৎপাত থাকে না। তারপর হয় অতিশয় দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগীকে কাবু করিয়া বসে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় বড় বেশী ঘুম হইতে থাকে, জ্বরের প্রাবল্য কমিলে নিদ্রাল্পতা ঘটিতে থাকে এবং ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা বাড়িতে থাকে। কফ কাশের উপদ্রবে অনেকের গলা, বুক ও পেটে বেদনা হয় কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ বুঝিতে হইবে না।

জ্বরটা আসিবার আগে শরীরটাকে খুব হালকা করা প্রয়োজন, যাহাতে সর্দ্দি লাগিতে না পারে সেই আয়োজন করিতে পারিলে জ্বর ও বেদনা হইলেও ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে পারে না। জ্বর ও বেদনা হইলেও শরীরটাকে হালকা রাখিতে হইবে। অত্রাবস্থায় লঙ্ঘন—উত্তম ঔষধ। সাগু ও খই ব্যতীত অন্য পথ্য বিধেয় নহে। দুই দিন জ্বরের পর রুটী ব্যবস্থা হয়। জ্বরের উত্তাপ চারি ডিগ্রীর অধিক হইতে দেখা যায় না। কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা ও বেদনা অত্যধিক প্রকারে আক্রমণ করে। রাত্রে প্রলাপ, মুখ শোষ, হাত, [illegible] জ্বালা, মাথা বেদনা এই জ্বরের অঙ্গ বিশে[illegible] কিছু দিন হইল "হিতবাদী" পত্রিকায় মুন চ[illegible] ইউসিলেপটাস্ অয়েল ব্যবহারের উ[illegible] কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন [illegible] অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে ইউসিলেপ[illegible] অয়েল রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে ব্যবহার ক[illegible] উপকার হইতে পারে, কিন্তু রোগাক্র[illegible] ব্যক্তির পক্ষে বিষতুল্য। ইহা ব্যব[illegible] করিলে তদবস্থায় রোগীর মস্তিষ্ক ভয়া[illegible] রকমে উত্তেজিত ও আক্রান্ত হয়। তা[illegible] পর রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। অবস্থা[illegible] রোগীর আত্মীয়গণের চিন্তা করিবার ক[illegible] নাই। দুই দিন পরেই শরীরটা ঝরঝ[illegible] তরতরে হইলেই প্রলাপটা দূর হইবে। ত[illegible] পর ক্রমশঃ জ্বর ও বেদনা কমিয়া [illegible] চারি দিন পর্য্যন্ত কাহারো কাহারো পাঁচ [illegible] দিন থাকিতেও দেখা যায়। জ্বর ও বেদ[illegible] দূরীভূত হইলে রুটী বা খিচুড়ী পথ্য বিধে[illegible] কফ ও বেদনা কম থাকিলে দুধট[illegible] দেওয়া যাইতে পারে। জ্বর ও বেদনা প্র[illegible] থাকাবস্থায় দুধ কোন প্রকারেই ব্যব[illegible] নহে। কফ যখন নাক দিয়া জলের [illegible] পড়িতে থাকে, তখন দুধ বিষতুল্য। ক[illegible] যখন গলা দিয়া ঘন হইয়া বাহির হইতে থা[illegible] তখন দুগ্ধ অপথ্য নহে। কিন্তু গরম দু[illegible] বিধেয়। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা কর[illegible] কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া একটা উপসর্গ। চারি [illegible] দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এরূপবস্থায় জ[illegible] পর কোন প্রকার কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔ[illegible] ব্যবস্থা করা উচিত, রীতিমত আহারা[illegible] করিলেও কোষ্ঠ শুদ্ধি ও প্রস্রাব হইয়া থাকে[illegible]

এই ব্যারামের আর একটা উপসর্গ [illegible]

যে, রোগীর দাস্ত ও প্রস্রাব এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তবে গ্রহণী ও বহুমূত্র রোগীর পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। খুব গরম ভাবে থাকিলেই এই ব্যারামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, অথবা রোগ হইলেও তাহার উৎপাতটা তেমন হয় না। জ্বর আক্রমণের সময় পিপাসা ও দাহ খুব বৃদ্ধি হয়, কোন কোন ব্যক্তি বরফ, সোডা, লেমনেড্ প্রভৃতি শৈত্য ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহার মন্দ ফল বড় ভীষণ ভাবে উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি মারাত্মক না হইলেও অত্যাচারের নিদর্শন স্বরূপ নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া মারাত্মক হইয়া পড়ে। এই সব রোগীকেই এই জ্বরে মারা যাইতে দেখা যায়। এই জ্বরের প্রথম ও মধ্য ভাবে সুপক্ক আনারস সুপথ্য কিন্তু অন্ন অম্ল বিষতুল্য, লেবুটাও সুপথ্য বটে।

জ্বর ও বেদনা সারিয়া গেলে অন্ন পথ্য প্রয়োজন। তাহার পর রীতিমত স্নান, আহারাদি করিয়া শরীরটাকে শোধরাইয়া লইতে হইবে। এই সময়ে বলকর ঔষধ ব্যবহার করিলে সহজেই পুনর্ব্বল সংগ্রহ হইতে পারে। যাহাদের পেঁয়াজ খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহারা তেলে-ভাজা পেঁয়াজ গরম গরম খাইলে কফ ও বেদনা হইতে উপশম বোধ করিতে পারেন। সর্ব্বোপরি সাবধান থাকাই ইহাতে ব্রহ্ম ঔষধ।

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মজুমদার।
শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

প্রদর রোগ চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত)

—:*:—

কুশের মূল চালের জলে,
প্রদর সারে বেটে খেলে।

হরিণের রক্ত, মধু, চিনি,
খেলে প্রদর সারে জানি।

অশোক ছাল দুই ভরি,
দুধ নাও আট গুণ করি,
জল নাও দুধের চারি গুণ
পাক ক'রে রাখ দুধ টুকুন।
দিন কতক খাওগে এই ক্বাথ,
প্রদর রোগ হ'বে নিপাত।

যজ্ঞ ডুমুরের রস মধুর সহ
প্রদর হ'লে খেতে কহ।

দুধে বেটে বেড়েলা মূলে
খাও গে প্রদর রোগ হ'লে।

কুলের গুঁড়ো গুড়ের সহ
প্রদর রোগে খেতে দেহ।

গুড় দিয়ে খাও কলার গুঁড়,
প্রদর রোগে উপকার বড়।

দুধ, ঘি আর লাক্ষাচুর,
প্রদর রোগ করে দূর।

রোড়া মূলের ছাল, চিনি, মধু
কিম্বা আমলকীর বীচির শাঁস শুধু,
জলে বেটে দাও মধু, চিনি,
প্রদরে খাও উপকার জানি।

ধাইফুলের কি আমলার গুঁড়,
মধুর সহিত সেবন কর।
কাকজঙ্ঘা কি কাপাস মূলে
বেটে খাওগে চালের জলে
পাণ্ডু প্রদর হয় গো যাদের
এ দু'টী যোগে উপকার তাদের

বাসকমূলের ছাল, দারু হরিদ্রা, মুথা,
রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, ভেলা চিরাতা,
সাড়ে সাতাশ কুঁচ এক একটি নিয়ে—
আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,
আধপোয়া থাকৃতে নামিয়ে নাও
মধু দিয়ে এই ক্বাথ খাও।
সব রকম প্রদর এতে সারে,
'দার্ব্বাদি নাম কয় এরে।

রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, বাসক, মুথা,
আকন্দমূল, রসাঞ্জন, দারু হরিদ্রা,
চিরাতা,
সিকিভরি এক একটি নিয়ে
আধ সের জলে ক্বাথ করিয়ে,
মধু দিয়ে খাও প্রদর হ'লে,
শিগ্‌গির এতে সুফল ফলে।

ভূঁইআমলাচূর, চালের জল
প্রদরে খেলে বড় ফল।

দু'তোলা যষ্টীমধু, দু'তোলা চিনি
চা'ল ধোয়া জলে খেলে উপকার
জানি।
শরপুঙ্খ—চালনি জলে বেটে
রক্তস্রাবে খাও গে বেটে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

গার্হস্থ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।*

—:*:—

চষিপোকায়।—হাতের তালুতে কি আঙ্গুলে চষিপোকা হইলে প্রাতে মুখে জল না দিয়া তেলাকুচার পাতা হাতে রগড়াইলে ঐ পাতার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বাহির হইয়া রোগ আরোগ্য থাকে।

আঙ্গুল হারায়।—ছোট গোয়ালিয়া লতার পাতার সরু ডগা বাটীয়া প্রলেপ দিলে ৩।৪ দিবসে ঘা ভাল হয়।

গলায় বিচি আওড়াইলে।—কাল‌জীরা ২ তোলা, রক্তচন্দন ঘসা ২ তোলা,

আফিং ৵০ দুই আনা, মনসা সিজের পাতার রস দিয়া বাটীয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

আধ্ কপালে।—যে রগে বেদনা হইবে গামছা পাকাইয়া সে রগ কষিয়া বান্ধিলে উহা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়।

কাসায়।—বাসক পাতার রস আধ পোয়া, ভাল মধু আধপোয়া একত্র করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। ইহা সেবনের পর যদি গা বমি বমি করে—তবে খানিকটা মিছরি খাইতে দিবে।

শিশুর শয্যা মূত্রে।—শনি কিম্বা মঙ্গলবারের ভোরের বেলায় একটা বাঁশের আগা ধরিয়া বালককে বাঁশগাছের মাথায় প্রস্রাব করাইবে, ইহাতে ঐ রোগ ভাল হইবে।

চক্ষু উঠায়।—নারিকেলের ফুল ১টা চোণায় বাটীয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

স্ত্রীজাতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি।—ভূমি কুষ্মাণ্ডের গুঁড়া আধ তোলা, আতপ চাউলের গুঁড়া আধতোলা খানিকটা দুগ্ধে গুলিয়া ৭ দিন খাইলে স্ত্রীলোকের স্তন্যে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

চুলকণায়।—গায়ের কোনো স্থানে চুলকণার মত বাহির হইলে কিম্বা চুলকাইয়া দাগড়া দাগড়া হইলে, পুরাণ তেঁতুলের মজ্জা সেই স্থানে মাখাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে ২।৩ দিন এইরূপ করিলেই উহা ভাল হইবে।

অম্লশূলে।—ধান্যের গুঁড়া ১ তোলা চা খড়ির গুঁড়া ১ তোলা কাটান'টে শাকের শিকড় ১ তোলা উত্তমরূপে একত্র বাটীয়া গরম রুটীতে মাখাইয়া তাহার পর আবার একটু চা খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া প্রাতঃকালে কয়েকদিন খাইলে অম্লজনিত শূল বেদনার উপশম হয়।

ক্রিমি শূলে।—ক্রিমি জনিত শূল হইলে আধপোয়া ছাতিমের মূলের রস আধ ছটাক চুণের জল একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার হয়

অজীর্ণজনিত পেট ফাঁপা।—জাঙ্গীহরীতকী কাটখোলায় ভাজিয়া, কাল লবণের সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে ২।৩ দিন খাইলে অজীর্ণ জন্য পেটফাঁপা আরোগ্য হয় জাঙ্গীহরীতকীর পরিমাণ প্রত্যহ একটি এবং লবণের পরিমাণ চারি আনা।

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত।

---

* আমার পিতামহ স্বর্গীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় কলিকাতা ইটালির একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। আমি গার্হস্থ মুষ্টিযোগ যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহারই স্বহস্তে লিখিত জীর্ণ খাতা হইতে সংগৃহীত। লেখক।

ধর্ম্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা।

কতকটা এই বিষয় লইয়াই একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধ আশ্বিন মাসের 'আয়ুর্ব্বেদে' বাহির হইয়া গিয়াছে। তথাপি এই একই বিষয়ে আমার আরো একটা প্রবন্ধ লিখিবার কারণ—আমার মনে হয়, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রদ্ধেয় লেখকের প্রবন্ধটী সুন্দর ও সুসজ্জিত হইয়া থাকিলেও যেন সর্ব্বব্যাপক হইয়া উঠে নাই। সম্ভবতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণভাবে লেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আমি কিন্তু এই বিষয়টা একটু বিশদ্ভাবে বলিতে চাই। কারণ আমার মনে হয় এইরূপ বিষয় একটু বিশদভাবে বলিবারই আজ সময় আসিয়াছে। অতএব পূর্ব্বর্ত্তী লেখকের নিকট বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত ঋণী রহিয়া তাঁহারই উৎকীর্ণ মার্গে অগ্রসর হইব। বিষয়ের মৌলিকতার জন্য যশঃ ও খ্যাতি তাঁহারই রহিল, বিস্তৃতাবতারণার দোষ ও ক্ষতি আমিই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

বারংবার আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "শরীর মাদ্যং" হিন্দুধর্ম্মচর্য্যার মূল সত্য। এবং এই মূল সত্যের নিদান বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদও একটি ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাও একটী বেদ। হিন্দু অতিবড় মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিল—সে শরীর মনের প্রগাঢ় সম্বন্ধটা খুবই বুঝিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—ধর্ম্মরাজ্যের মনই নেতা, কিন্তু শরীর যখন মনের পোষক, আবাস, কর্ম্মপথে সহায়, তখন শরীরকে আগে রক্ষা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের সঙ্গে অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মাচর্য্যায় একই অচ্ছেদ্য সূত্রে চির-কাল গ্রথিত। এই যত সব অনুষ্ঠান তলাইয়া বুঝিলে ঐগুলিই শরীরোন্নতির সহায়। এই উন্নত শরীরই পরে উন্নত মনের স্রষ্টা। প্রত্যক্ষ ভাবে কতকগুলি অনুষ্ঠান শরীরের হানিকর মনে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষণিক চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হয় যে, এই সাময়িক হানিই পরিণামের স্থায়ী স্বাস্থ্যের কারণ। একাদশীর উপবাস সাময়িক কিঞ্চিৎ ক্লেশ আনয়ন করিলেও পরে কফহীন সুস্থদেহ ও ধারণাশীল মন প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করে। বাস্তবিক পক্ষে জগতের সর্ব্ববিধ সফলতাই বুঝি সাময়িক হানি দ্বারা উপার্জ্জিত। ছাত্র জীবনের কঠোর শ্রম পরিণামের চিরসুখী জ্ঞানময় মনের জনক। ব্যায়াম সাময়িক শ্রান্তিদান ও স্বেদস্রাব করাইয়াই পরে বলিষ্ঠ দেহ প্রদান করে। অতএব হিন্দুর কঠোর তপস্যাকে তথাকথিত সুসভ্যজাতির আদর্শানুসারে—damn your penance বলিয়া উপেক্ষিত করা আদৌ ভব্যতার, অন্ততঃ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

আদি হিন্দুর সমস্ত জীবন স্থূলতঃ দুইটী প্রয়াসকে বক্ষে ধরিয়াই কৃতার্থ হইয়াছিল। একটী ধর্ম্ম আর একটী তৎসঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত স্বাস্থ্যরক্ষার কারণভূত অনুষ্ঠান। একটী মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্যটী ঐ মুখ্যটাকে লাভ করিবার জন্য গৌণ হইয়াই বরণীয় হইল। বাস্তবিকই গৌণ অনেক সময় গৌণ হইয়াই যেন মুখ্যকেও ছাপাইয়া উঠে। ইহারই অর্থ বোধ হয় ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বড়। লক্ষণ-

হনুমান—রামকেও বুঝি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। লক্ষণ ও হনুমান না হইলে বুঝি রামায়ণের রামত্ব বজায় থাকিত না। অনুষ্ঠান ও স্বাস্থ্যরক্ষা না থাকিলেও হিন্দু বুঝি ধর্ম্মগুরুর মণিময় রুদ্রাক্ষহার গলদেশে ধারণ করিয়া মানবেতিহাসে 'বর্য্য' বা মহর্ষি আখ্যা লাভ করিতে পারিত না।

স্বাস্থ্যকে অগ্রে রাখিয়া সাধনা করিবার পথে হিন্দু চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের সৃষ্টি করিল। মনে রাখা উচিত যেমন সব জিনিষেরই একটা ভিতর পিঠ বাহির পিঠ, একটা পোষাকী আট পৌরে ভাব আছে, ধর্ম্মেরও তাই। ধর্ম্মও, আট পৌরে ও পোষাকী হিসাবে, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুই প্রকার। সামাজিক ধর্ম্ম সেইটা—যা রাজ্য রক্ষা করে, দেশকে বাঁচায়, মানব জাতিকে নৈতিক অধঃপতন হইতে মুক্ত করে। আর গভীরতর সূক্ষ্মতর যে আধ্যাত্মিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তা মানবের মনকে উন্নত করে, তাহাকে গড়িয়া তোলে, বিভিন্নের মধ্যে এক কে বোঝায়, মানবের সসীম জীবাত্মাকে অসীম পরমাত্মার সহিত যুক্ত করে। সকল মানবই কিছু আধ্যাত্মিকতার অধিকারী নহে কারণ সকল মানবই কিছু ভুয়োদর্শন বা সূক্ষ্মানুভবের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেনা। বস্তুতঃ সামাজিক ধর্ম্ম,—শাসনের ধর্ম্ম—রক্ষার ধর্ম্ম না থাকিলে সাধারণ অল্পবুদ্ধি মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।

আমরা ক্রমশঃ এই সামাজিক চাতুর্ব্বর্ণ্য ও আধ্যাত্মিক চাতুরাশ্রম ধর্ম্মপালনের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুষ্ঠান গুলির আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য বিষয়টী অত্যন্ত বড়, ও স্থান অপ্রচুর বলিয়া বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে আর কিছু না হউক—সমস্ত বিষয়টার একটা সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র মানচিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইতে আপত্তি কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সামাজিক ধর্ম্ম—শাসনের ধর্ম্ম, দেশও সমাজ রক্ষার ধর্ম্ম। এই শাসন ও রক্ষাকল্পে অন্ততঃ চারিটী জিনিস্ চাই—চাই কর্ম্মনেতা, চাই কর্ম্মচারী, চাই সেবক। এই উপদেষ্টাই জ্ঞান গুরু ব্রাহ্মণ, এই কর্ম্মনেতাই ভীমবল যুদ্ধকৌশলী শাসনক্ষম রাজা—ক্ষত্রিয়, এই কর্ম্মচারীই বাণিজ্যকুশল বৈশ্য, এই সেবকই শূদ্র। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক, তিনি জ্ঞানদান দ্বারা সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করেন। তাঁহারই উপদেশে চালিত হইয়া রাজার রজত্ব ও ভীমগুণ জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্থৈর্য্য ও কান্ত গুণ লাভ করে ও সুখশাসনের কারণ হয়। ব্রাহ্মণের জ্ঞানলাভ—ধর্ম্ম, জ্ঞানদান তাঁহার অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানই সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য বিধান করে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—রাজত্ব শাসন অর্থাৎ যুদ্ধ, দেশরক্ষা বা প্রজাপালন তাহার অনুষ্ঠান। এই দেশ রক্ষার মধ্যেই সামাজিক সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যরক্ষা নিহিত আছে। ক্ষত্রিয়ই তাহা হইলে সাক্ষাৎভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করেন একেবারে কর্ম্মের মধ্য দিয়া। ব্রাহ্মণ করেন একটু পরোক্ষভাবে জ্ঞানের মধ্য দিয়া। এই জ্ঞানই কর্ম্মপথে আত্মপ্রকাশ করে, এই জ্ঞানই কর্ম্মকে বল প্রদান করে। ব্রাহ্মণের স্বাস্থ্যরক্ষায় পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি ক্ষত্রিয়েরও পূজ্য। কেননা ক্ষত্রিয় নিজেই শাসন নীতির জ্ঞানের জন্য ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী। এই কর্ম্মনেতার—এই শাসন কর্ত্তার—এই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য সৌকার্য্যার্থ বৈশ্য কর্ম্মচারী রূপে অবতীর্ণ তিনি যোগান ইন্ধন। এই ইন্ধনের সাহায্যে

ক্ষত্রিয় উপযুক্ত শাসনকটাহে দেশের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য প্রস্তুত করেন। বৈশ্যের শিল্পবাণিজ্য দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়স্বরূপ খাদ্য ও ধনের সৃষ্টি করে। আর শূদ্র করে একটী ছোট অথচ সবার অপেক্ষা উদার কাজ। সে কর্ম্মক্লান্ত উপরোক্ত তিন জাতির মুখখানি স্নেহাঞ্চলে মুছাইয়া দেয়। সেবার দ্বারা তাহাদের সর্ব্ববিধ ক্লেশের অপনোদন করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলে। শূদ্রের কাজ কদাপি নিন্দনীয় নহে। তার কাজ মায়ের কাজ, কন্যার কাজ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাজ। এ কাজের স্মৃতি—কৃতজ্ঞতা জড়িত, অশ্রু ইহার স্বভাব, স্নেহ ইহার প্রাণ, সেবা ইহার ব্রত বা আজন্ম সাধনা।

সমাজকে যদি একটী মানুষ ধরিয়া লই, তবে দেখিব সে কতকগুলি শরীররক্ষক ও ডাক্তার কর্ত্তৃক পরিবৃত। ব্রাহ্মণ তাহার মস্তক ও তৎসঙ্গে তাহার মন রক্ষা করিতেছে, বৈশ্য তার উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহার শারীরিক বলের ও তৎসঙ্গে তাহার মানসিক তেজের সৃষ্টি করিতেছে—এই মানসিক তেজের বলেই সে কত গভীর চিন্তা করে, কত সুখদুঃখের সমরে জয়ী হয়, কত শত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। শূদ্র তাহার কর্ম্মক্লান্ত দেহটীকে মাজিয়া ঘষিয়া, স্নান করাইয়া সুস্থ রাখে। আর ক্ষত্রিয় সর্ব্বোপরি তাহার body guardএর মত; শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের মত, তাহার সমস্তটা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। দেখিতেছে সে কি খায়, কি ভাবে, কিরূপ তাহার স্বাস্থ্য, অন্যে তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। এইরূপ যত্নে লালিত হইয়া সমাজ ক্রমশঃ একটী সুস্থশরীর জ্ঞানী মানুষের আদর্শে গড়িয়া উঠিত।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষায় নিযুক্ত এই চারিটী বর্ণের এক একটা বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম ছিল ও এক একটা বিশেষ কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান তাহাদের সাধন করিতে হইত। এই জন্য চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ হইলেন, বাণিজ্যকুশলী বৈশ্য ও সেবাব্রতী শূদ্র হইলেন। ভগবানও এই কথাই গীতায় প্রকাশ করিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

এইবার চতুরাশ্রমের কথা। ব্রাহ্মণ জ্ঞানগুরু ও চিন্তাশীল, অপর তিনবর্ণ মানসিক বলে তাঁহার অপেক্ষা অনেক ন্যূন? সুতরাং আধ্যাত্মিকতার ধারণায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। ব্রাহ্মণ এই আধ্যাত্মিকতাকেই আজীবন বরণ করিয়াছেন—অসীমকে, অনন্তকে, ব্রহ্মকে জানাই তাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার সার্থকতা। তাই ব্রাহ্মণের আজীবন প্রয়াস, নিজেকে এই ব্রহ্মোপাসনার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা। তাই শরীরকে অগ্রে রাখিয়া সাধনার পথে এবার তিনি চতুরাশ্রমের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রচর্চ্চা ইহার ধর্ম্ম এবং বীর্য্যরক্ষা ইহার অনুষ্ঠান। এ উপার্জ্জনের আহরণের কাল। এ সময় বীর্য্য ধারণ করিয়া বলের আহরণ করিতে হইবে এবং এই বল ও এই ওজঃ যে সুস্থ ও মেধাবীগণকে সৃষ্টি করিবে, তাহাকে শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য। এই আশ্রম practical আশ্রম॥ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কাল্পনিক (theoretical) জ্ঞান এখানে বাস্তবের মাঝে পরীক্ষিত হইবে। উপদেশ এখানে উদাহরণ দেখাইবে। সৃষ্টি প্রবাহরক্ষণের মধ্য দিয়াও কেমনে

ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে; স্ত্রী-প্রেম, সন্তান-স্নেহ, ভক্তি প্রীতির দ্বন্দ্বের মধ্যেও কেমনে নির্লিপ্ত শাস্ত্রজ্ঞ মন জ্ঞানের প্রদীপ রাখিয়া সজাগভাবে জনকঋষির মত ভগবদ্ধারণায় অগ্রসর হইতে পারে; প্রেমই কেমনে ধীরে ধীরে মানবকে মুক্তিমার্গে পৌঁছাইয়া দেয় এ সেই শিক্ষার আশ্রম। তৃতীয় আশ্রমে কর্ম্মক্লান্ত কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনে আত্ম প্রসাদপ্রাপ্ত মন এবার সংসারের জনেক কাজের অবসানে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিজনে ভগবৎস্বরূপ নির্ণয় করিতেছে। বনের নির্ম্মল বাতাস; আসন্ন সমুদ্রসমীর, প্রভাতের অবাধ সহজ খগ-কূতি, সুপ্রস্ফুটিত কুসুমসুরভি বৃদ্ধের দেহবল ও মনের প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। বানপ্রস্থাশ্রমী ক্রমশঃ নিজেকে ঈশ্বরের নিকটতর এবং অনুরূপ করিয়া গড়িতেছে। সর্ব্বশেষ আশ্রম কি উদাত্ত! কি গম্ভীর, কি মহিমময়! সর্ব্বত্যাগী যতি, ভগবজ্জ্যোতিঃ লাভ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আজন্ম শরীররক্ষা মনের উন্নতিসাধন চেষ্টা সফল হইতে বসিয়াছে—সে মুক্তির সোপানে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নিজেকে জানিয়াছে 'ব্রহ্মোহহং' এবং ব্রহ্মাকে জানিয়া বলিতেছে—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয় শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা,
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে।

ঈশ্বরও যেন প্রসন্ন হইয়া তাহার সফল সাধনাকে পদে স্থান দিয়াছেন। তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার আজন্ম ভক্তি, তাহার পুত্রকলত্রের প্রতি আসক্তিরহিতভাবে বিজন সাধনা তাহাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির, মুক্তির সম্পূর্ণ যোগ্য করিয়াছে।

স্বাস্থ্যে ও ধর্ম্মে এইরূপ সামঞ্জস্য আর কোনো জাতির ভাগ্য সমুজ্জ্বল করে নাই। হিন্দু সনাতন-ধর্ম্ম জগতে অতুল কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এত বড় মানসিক অনুশীলন ক্ষণেকের তরে ও স্বাস্থ্যকে এতটা উচ্চাসন না দিলে মানসিক এতটা উন্নতির সম্ভাবনা ও সুযোগ ঘটিত না। কেন না শরীর বলের সাহায্যেই মন কার্য্য করিয়া থাকে।

আমার আসল কথা ত প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তবু বুঝি বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি নাই—এমন আশঙ্কা হইতেছে! মনে হয় এত অল্পস্থানে অতবড় বিষয়টা চাপিয়া ঠাসিয়া ভরিতে যাইয়া তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্যক রক্ষা করিতে পারি নাই। কেবল theoryটাই যেন বলা হইয়াছে, কিন্তু উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী সরল করিতে পারি নাই। এবার তাই হিন্দুর নিত্য কার্য্যকলাপের মধ্য হইতে কয়েকটী উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া আমার বক্তব্যকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণের দিনচর্য্যা একটী অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম। ত্রিসন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়। এই আহ্নিক ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্য-রক্ষা কি সুসংশ্লিষ্ট! ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ ইংরাজী Early rising এর পূর্ণ সমর্থন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান নিরাময় দেহ প্রদান করে।

প্রভাতে মধুর ভ্রমরগুঞ্জন শ্রবণ করিতে করিতে সুরভিকুসুম চয়নে যুগপৎ সুস্থদেহ ও প্রফুল্ল মন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রভাতের নানা বিহগকূজন যখন স্বপোক্ষিতা নিস্তব্ধ ধরণীকে শব্দিত করিয়া তোলে, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে নদীর বুকের উপর দিয়া সূর্য্যের নিকট আহ্বান প্রেরণ করে, মন কি তখন আনন্দাতিশয্যে নৃত্য

করিয়া উঠে না? একটা সুদূরের প্রেরণা কি ব্রাহ্মণের বুকে আসিয়া মধুরে বাজিতে থাকে না? এই বিজনে প্রকৃতির নগ্নকোলে এমন পাষণ্ড কে আছে যে—ঈশ্বরকে ক্ষণেকের জন্যও স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে? তারপর তীর্থমূলে বসিয়া বেদগান করিতে করিতে যখন ব্রাহ্মণ দেখে—গরিমময় সূর্য্য সুনীল আকাশের পূর্ব্বভাগে রক্তিমরাগে ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে, আর এদিকে পাদমূলে কুলু কুলুস্বরে নদী যেন তারই উদাত্ত সঙ্গীতের সহিত তাল রাখিয়া বাজাইতে বাজাইতে কোন্ অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন পূজার আর কি বাকী? মন্ত্রোচ্চারণ তখন নিয়মরক্ষা মাত্র। প্রফুল্ল মন, পুলকিত শরীর তখন আপনাআপনি বালরবির গরিমার তলে ঢলিয়া পড়ে, হাতের ফুল পরম পিতার চরণে একটী দিনের একান্ত পূজার নিদর্শনস্বরূপ লাগিয়া থাকিবার জন্য আপনাআপনি খসিয়া পড়িয়া সলিলে ভাসিয়া চলে।

তারপর সন্ধ্যার অনুষ্ঠানগুলি সমস্তই স্বাস্থ্যরক্ষার নিতান্ত অনুকূল। আচমন সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার গুলিকে জলসেচন দ্বারা স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিয়া লয়; রাত্রির, মধ্যাহ্নের ও দিবাবসানের পাপানুশোচনা মনের কলুষনাশ করে, ত্রিমূর্ত্তি গায়ত্রীর আহ্বান আত্মাকে স্থির করিয়া দেয়। এইরূপ ভক্তিভরে একই দিনের মধ্যে তিন তিনবার সন্ধ্যোপাসনায় নিরত হইলে আর কি মন পাপ-প্রবল হইয়া স্বাস্থ্যহানি করিতে পারে?

তারপর হিন্দুর তিথিচর্য্যার সহিত ও স্বাস্থ্যের কি সুন্দর সম্বন্ধ! অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যখন রসের, শৈত্যের পূর্ণাবির্ভাব হয়, তখন রসক্ষয়ের জন্য হয় উপবাস দাও, নয় অন্ততঃ নিশিপালন কর। এইরূপ মাসের মধ্যে তিথিবিশেষে, পর্ব্ববিশেষে, ব্রত নিয়মকে উপলক্ষ্য করিয়া দুই চারিটা দিন উপবাস করিলে বা নিরামিষাহারী হইয়া অর্দ্ধাশনে সংযম অবলম্বন করিয়া থাকিলে বৎসরভোর, জীবন ভোর—সুস্থশরীরে ধর্ম্মাচরণ করিতে পাইবে। অতি লোভ অমিতাহার, অবৈধাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, তাই মহাপাপের দোহাই দিয়া শাস্ত্র এগুলি বর্জ্জন করিয়াছে। সময়ভেদে আহারের ভেদাভেদ, আচারের বিভিন্নতা অত্যন্ত সমীচীন, তাই শৈত্যকালে শুষ্ক বা উষ্ণদ্রব্য, গ্রীষ্মকালে স্নিগ্ধও শীতলদ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ভাদ্রমাসের বুড়া লাউ মাঘমাসের মূলা ভক্ষণ করা কেন শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ, বোধ হয় এবার তাহা সহজবোধ্য। বারবিশেষে মৎস্য মাংস ও স্ত্রীসম্ভোগ ইত্যাদি এই নীতি-অনুসারেই বর্জ্জনীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার এই সব আচরণ যে প্রায়শঃই মহাপাপের দোহাই দিয়া শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কারণ হিন্দু চির চির-কাল ধর্ম্মভীরু। প্রাণকে সতত মূল্যবান মনে করে না—যত মূল্যবান তার ধর্ম্মকে মনে করে। ধর্ম্মের দুয়ারে চিরকাল সে আত্মবলিদান দিয়া আসিয়াছে। যে কার্য্যেই যখন ধর্ম্মের হানির সম্ভাবনা হইয়াছে সেইখানেই তখন হিন্দু অবনত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মহাপাপের সম্ভাবনার ইঙ্গিতে হিন্দু এই সমস্ত বিধি-নিষেধকে এতকাল মানিয়া চলিয়াছে। আজ যদি সে বিদ্রোহী হইয়া থাকে, তাহা পরশিক্ষা, পরধর্ম্মের অনুকরণে। হিন্দু যদি কোন দিন আপনা দেখিতে শিখে, তবে বুঝিবে এ বিধি-নিষেধ মহাপাপের ভয়েই হউক বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুরোধেই হউক মানিয়া চলাই

তাহার পক্ষে হিতকর, নতুবা স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আজিকার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের যুগে দুগ্ধের সহিত লবণ ভক্ষণ বা কাংসপাত্রে অন্নভোজন যে মাত্রেও মহাপাপের সঙ্গে সংযুক্ত এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহে না, কিন্তু অমৃততুল্য, দুগ্ধ—লবণপ্রয়োগে যে গুণহীন ও বিষাক্ত হয়, কাংসপাত্রে অন্ন রাখিলে যে নীলবর্ণ বিষাক্ত একপ্রকার লবণের উদ্ভব হয়—একথা আধুনিক বিজ্ঞান নিজেই মানিয়া লইয়াছে। কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষফল আবার বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে শুদ্ধ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকের বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব কেন গঙ্গার শুদ্ধ মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিত—তাহা মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া কুস্তি করিয়া সুস্থ দেহপ্রাপ্ত মানুষকে দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। হিন্দুর সমস্ত বিধি-নিষেধ আমি জানিও না,:আর জানারও বোধ হয় এক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তবে যাহা জানি, তাহা দেখিয়া আমার সেই পূর্ব্ব বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে যে 'শরীরমাদ্যং' হিন্দুধর্ম্মচর্য্যার মূল সত্য।—হিন্দুর আচার পদ্ধতিকে উপেক্ষার হাসিতে উড়াইয়া দেওয়া কোনোক্রমেই বিবেচনার কাজ নহে। হইতে পারে (যেমন সর্ব্বত্র হয়) কালক্রমে অনেক অমূলক বিধি-নিষেধ ব্যক্তি বিশেষের কারসাজিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ না জানা পর্য্যন্ত কোনো বিধিরই লঙ্ঘন বা অন্ততঃ উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ এ কথা সত্য যে সেকালের হিন্দু চরমবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বল প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ তার অধঃপতিত বংশধর অজ্ঞতার অন্ধকূপ হইতে তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে প্রায়শঃই অক্ষম। হয়ত তাহার বিচারে আজ যাহা বর্জ্জনীয় বলিয়া ধার্য্য হইবে—হিন্দুর হয়ত তাহাই একটা মহিমাময় আবিষ্কার ছিল। আজ তাই হিন্দুর বংশধরকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তাহার উচিত আজ তার অতীত গৌরবকে বিশ্বাস করিয়া চলা—কারণ যজ্ঞের বিশ্বাসই মুক্তির উপায়; আজ তার উচিত—তার অতীত গৌরবকে, পোষণ করা—তার পক্ষপাত করা। তাহা হইলেই আজ তার পূর্ব্ব পুরুষকে উপযুক্ত সম্মান করা হইবে। আমি যাহা বুঝি না, তাহাই যে মিথ্যা অজ্ঞতাসূচকধারণা—আজ যেন হিন্দুর পুত্র বক্ষে আর পোষণ না করে।

শেষ কথা, আমাদের যাহা ছিল তাহা যেন আমরা আশঙ্কায় না ঢাকিয়া জগতের প্রদর্শনীতে যাচাই হইবার জন্য খুলিয়া রাখি। আমার বিশ্বাস, হিন্দুর অতীত আজিও কোনো সভ্য জাতির গরিমার নিকট হীনতার আশঙ্কায় মাথা হেট করিবে না। হিন্দুর এই ধর্ম্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসে সুনিশ্চিত একটা নূতনত্ব। এ নূতনত্ব অনুভব করিতে, সমীকরণ করিতে পারে নাই বলিয়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি হিন্দুর অনুষ্ঠানকে useless penance বলিয়া নিন্দা করিতেছে। আজ যখন নূতন করিয়া জাগরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে তখন আমরা দেখাইতে চাই—বুঝাইতে চাই যে হিন্দুকে বাহিরের জাতি তোমরা বোঝ নাই, জান নাই। হিন্দু তোমাদিগকে ঢের দিয়াছে। হিন্দু তোমাকে দিয়াছে—তার বিজ্ঞান, তার চিকিৎসা, তার দর্শন। হিন্দুর ব্রাহ্মণকে তোমরা consevative বলিয়া নিন্দা করিয়া নিরয়গামী হইও না। যে হিন্দুব্রাহ্মণ গীতার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে বিশ্ববাসীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়াছে, যে হিন্দু চাতুর্ব্বর্ণ্য

ধর্ম্মের দ্বারা বিশ্বমানবকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সামাজিক ধর্ম্মরক্ষার উৎকৃষ্ট পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে, যে হিন্দু চতুরাশ্রমের ধর্ম্মে জ্ঞানার্জ্জনের নামে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া কেমন করিয়া ব্রহ্মের পরিপূর্ণ অনুভূতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে হয়—তাহা শিখাইয়া দিয়া জগৎবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে,—

"যে দিয়াছে বেদ, যে দেছে পুরাণ অমর
কাব্য কথা
যে নামায়ে আনি' স্বরগের বাণী
হরিয়াছে শোক ব্যথা।"

তাহাকে তোমরা নিন্দা করিও না। তাহাকে তোমরা সকলে স্বীকার কর, তাহাকে বরণ কর, তাহাকে প্রণাম কর, আর তাহারই বংশ ধরকে তাহার অতীত মহিমোজ্জ্বল আদর্শকে পুনরুদ্ধার করিবার উৎসাহ দিতে দিতে বল—

ব্রাহ্মণদেব ব্রাহ্মণগুরু, পতিতের তুমি প্রাণ,
সম্রাট তুমি ধর্ম্মরাজ্যে, ভারতের তুমি প্রাণ,
* * * * *
নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব, ধন্য ভারতভূমি
ধন্য আমার জীবন জন্ম তব পদরেণু চুমি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ.

বিবিধ সংবাদ।

—:*:—

গোয়ালিয়ার যাত্রা।—সিন্ধিয়ার রাজমাতার চিকিৎসার জন্য 'আয়ুর্ব্বেদে'র অন্যতর সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ, এম বি গত ২২শে আগষ্ট গোয়ালিয়ার যাত্রা করিয়াছেন। গত বৎসর এমনি সময় তাঁহাকে ইন্দোরের মহারাণীর চিকিৎসার জন্য ইন্দোর যাইতে হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—গত ১৬ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৭টার সময় কলিকাতা ৩নং কুমার টুলীতে "আয়ুর্ব্বেদ সভার" ৮ম বার্ষিক তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক রচিত প্রথমে একখানি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তাহার পর ঐ সঙ্গীত রচয়িতা কর্ত্তৃকই "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" নামক একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। ঐ প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায় বি,এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ ঐ প্রবন্ধ অবলম্বনে বক্তৃতা করিয়া উহার সমর্থন করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ কাব্যতীর্থ ও সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়দ্বয়—যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধের প্রতিকূল হইয়া-

ছিল। সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে অন্য অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন।

সর্ব্বনেশে কৃমিরোগ।—ইংরাজী 'হুকওয়ার্ম' রোগে অর্থাৎ সর্ব্বনেশে কৃমিরোগে এ দেশের ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে সেনিটারি বোর্ড অর্থাৎ স্বাস্থ্য সংরক্ষিণী সমিতির সভাপতি মিঃ ষ্টিভেন্সন্ মুরকে একখানি পত্র লিখিয়া এই ভীষণ ব্যাধির প্রতীকার প্রার্থী হইয়াছেন। আমরা লাট সাহেবকে এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

মৃত্যু তালিকা।—১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে সর্প দংশনে মৃত্যু ২৪০০০, ব্যাঘ্র আক্রমণে ১০০০, চিতাবাঘ দ্বারা ৩৮০, নেকড়ে ও ভালুকের আক্রমণে ২৩০, হস্তী ও তরক্ষুর আক্রমণে ৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

নূতন জ্বর।—নূতন জর বা সমর জ্বরে সমগ্র পৃথিবীর যে কি ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের সকল স্থানেই এই জ্বরের পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত। গত ১২ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এই রোগে কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ১২১ জন কিন্তু তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে মরিয়াছিল মাত্র ৪৫ জন। বঙ্গদেশের বাহিরেও এই রোগের আক্রমণে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু কবলিত হইতেছে। হাজারিবাগ, রাঁচি, নাগপুর, করাচি, মান্দ্রাজ, দার্জিলিং প্রভৃতি নগরও এই জ্বরের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইতে বসিয়াছে। জানি না, কতদিনে দেশ হইতে এই ভীষণ প্রাণহানিকর জ্বরের অবসান হইবে।

গ্রাহক দিগের প্রতি নিবেদন।

"আয়ুর্ব্বেদে"র ৩য় বর্ষ চলিতে থাকিল। প্রতি বর্ষের প্রথমেই মূল্য দেওয়ার নিয়ম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও অনেকের নিকট ২য় বর্ষের মূল্য বাকী রহিয়াছে। যাঁহাদের নিকট এখনও মূল্য পাওয়া যায় নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া অতি সত্বর মনিঅর্ডার যোগে আপনাপন দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। নতুবা আগামী মাসে আমরা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃতে কাগজ প্রেরণ করিব।

যে সমস্ত সহৃদয় গ্রাহক অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য প্রদান করেন, কৃপা পূর্ব্বক তাঁহারাও সত্বর ৩য় বর্ষের অগ্রিম মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। বর্ত্তমান কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিনে পত্রিকা চালান যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। গ্রাহকবৃন্দের অনুকম্পার উপরেই পত্রিকার জীবন। আমাদের গ্রাহকগণ একথা মনে রাখেন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

পুরাতন 'আয়ুর্ব্বেদ'।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজের লাইব্রেরী বিভাগে 'আয়ুর্ব্বেদে'র ১ম ও ২য় বর্ষের কয়েক সেট 'আয়ুর্ব্বেদ' বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। মূল্য প্রত্যেক বর্ষ ৩৲ টাকা। দুই বর্ষ একত্র লইলে ডাক খরচ লাগে না। শীঘ্র পত্র লিখুন, বিলম্ব করিলে ফুরাইয়া যাইবে।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত ও

৩য় বর্ষ—৩য় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

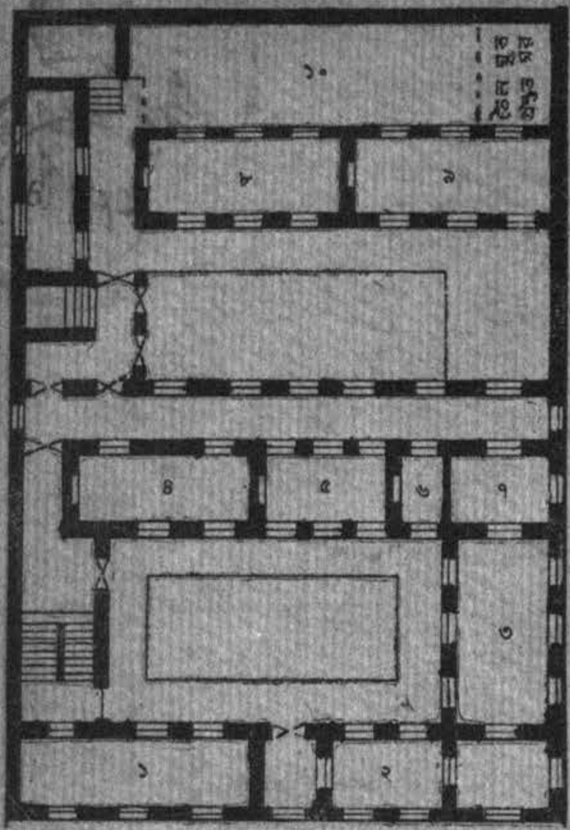


সম্পাদক—
কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৴০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

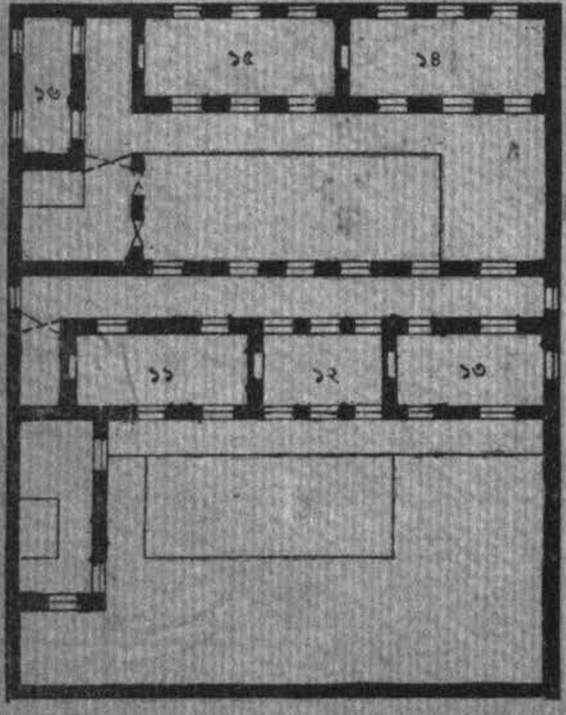
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

গ্রাহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

"আয়ুর্ব্বেদে"র তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে কিন্তু এখনো অনেকের নিকট ২য় বর্ষের মূল্য বাকী। সেইজন্য মফঃস্বলের গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃ করিয়া এবং কলিকাতার গ্রাহকদিগের নিকট বিল পাঠাইয়া ২য় বর্ষের মূল্য প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করিতেছি। সকলেই কৃপাপূর্ব্বক ভিঃ পিঃ প্যাকেট বা বিল গ্রহণ করিয়া ২য় বর্ষের মূল্য প্রদান করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা। যাঁহাদের নামে এখনো ভিঃ পিঃ পাঠান হয় নাই, তাঁহাদের নামে আগামী ৭ই পৌষের মধ্যে পৌষ মাসের "আয়ুর্ব্বেদ" ভিঃ পিঃ করা হইবে। যাঁহারা ভিঃ পিঃতে মূল্য দেওয়ার পরিবর্ত্তে মণিঅর্ডারে মূল্য পাঠান সুবিধাজনক মনে করেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ৭ই পৌষের পূর্ব্বে যাহাতে আমরা মণিঅর্ডার পাই তাহার বন্দোবস্ত করেন, ইহাই অনুরোধ।

যে সমস্ত সহৃদয় গ্রাহক প্রতি বর্ষে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অগ্রিম মূল্য এখনো পাওয়া যায় নাই, কৃপাপূর্ব্বক তাঁহারাও তৃতীয় বর্ষের মূল্য ৩।৵০ সত্বর মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করেন—এজন্যও তাঁহাদের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ "আয়ুর্ব্বেদ।"

অগ্রহায়ণের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদে"র নিয়মাবলী।

"আয়ুর্ব্বেদের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৩।৵০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয়। কেহ কোনো মাসের 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুবা পুনরায় মূল্য দিয়া সেই সংখ্যা লইতে হইবে।

আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, এজন্য যখনই ইহার গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ষের আশ্বিন হইতে ইহা লইতে হইবে।

কোনো বিষয়ের জন্য পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা সে পত্রের কোনো কার্য্য হয় না।

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়া হয় না।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

অজীর্ণে বাঙ্গালী।—অজীর্ণে বাঙ্গালা দেশের লোক যত ভুগিয়া থাকে, এমন আর কোন দেশের নহে। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা দেশে শত করা ৭৫ জন পুরুষ ও মহিলা অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। আজকাল যে রাজযক্ষ্মা বা থাইসিসে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, একটু তলাইয়া দেখিলে এই অজীর্ণ রোগই তাহার কারণ।

* * * *

অজীর্ণের নিদান।—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—অধিক জলপান, বিষম ভোজন (অল্প ভোজন, বহু ভোজন ও অসময়ে ভোজন), মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ—এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে অধিক জলপান এবং রাত্রি জাগরণেই সহর বাসীর অজীর্ণ বর্দ্ধিত হইতেছে। চা এবং সোডা-লেমোনেডের কল্যাণে কলিকাতায় অধিক জলপান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। আর রাত্রি জাগরণ,—তাহার আয়োজনও নানাপ্রকারে। এ অবস্থায় বাঙ্গালায় অজীর্ণ বৃদ্ধির যথেষ্ট কারণই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

* * * *

ছাত্র জীবনে অজীর্ণ-বাহুল্য।—অজীর্ণ বাহুল্যের প্রধান স্থান কলিকাতা এবং অজীর্ণপ্রবণপুরুষদিগের মধ্যে কলিকাতা প্রবাসী মফঃস্বলের ছাত্রগণের সংখ্যাধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনে এই অজীর্ণের সঞ্চার মাত্র আরম্ভ হইয়া, কর্ম্মময় জীবনে উহার পূর্ণ প্রভাব যখন প্রকটিত হয়, তখন উহা একেবারে দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। এই ছাত্রজীবনে অজীর্ণবাহুল্যের প্রধান কারণ—চা, সোডা, লেমোনেড প্রভৃতি পানীয়ের অত্যধিক ব্যবহার। ইহা ভিন্ন আর একটী কারণে ছাত্রজীবনে অজীর্ণ বাহুল্য ঘটিতেছে—সেটি ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। সে

কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। বাস্তবিক স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়েই সংযমী হওয়া একান্ত আবশ্যক! সকল রোগের কারণই সংযমের অভাব।

* * * *

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের কথা তুলিলে অনেক কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে—বাঙ্গালীর প্রাতঃকৃত্যের কথা, পূজা আহ্নিকের কথা, স্নান-ভোজনের ব্যবস্থা, শিক্ষা বা কর্ম্মকালের সময় নির্দ্দেশ—সকল বিষয়েই যে একটা স্বাস্থ্যরক্ষার শৃঙ্খলা সুসংবদ্ধ ছিল,—বাঙ্গালী এখন তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিবাহ সেকালে অল্প বয়সেই হইত, কিন্তু তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলনকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সে ব্যবস্থা তো একেবারেই অন্তর্হিত। সুকুমারমতি ছাত্রজীবনে সেকালে ধাতুক্ষয়জনিত, পাপসংস্পর্শের কোনো কারণই উপস্থিত হইত না, এখন চৌদ্দ বৎসরের একটি বালকের মুখের প্রতি চাহিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাহার চক্ষুপ্রান্তে কালিমা পড়িয়াছে, গণ্ডস্থলে ব্রণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, গলার স্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর শিক্ষা-মন্দিরে রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়নের ব্যবস্থা! আমাদের দেশের অবস্থা শোচনীয় হইবে না কেন?

* * * *

আহার ও স্বাস্থ্য।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পবিত্র আহার্য্যের একান্ত প্রয়োজন—একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পবিত্র আহারে যে চিত্তশুদ্ধি হয়—স্বাস্থ্যরক্ষা তাহারই ফলসম্ভূত। সেকালের বাঙ্গালী অজীর্ণরোগগ্রস্ত ছিল না—দৌর্ব্বল্যের নাম তাহারা জানিত না—এখনকার মত এক পোয়া পথ যাইবার জন্য তাহাদিগের যে ট্রাম-অশ্বযান-মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হইত না,—পুষ্টিকর আহার্য্যভক্ষণই তাহার প্রধান কারণ। অনেক কারণে দেশ হইতে সে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে। ফলে নানাকারণে দেশের যে বড় দুর্দ্দিন ঘটিয়াছে—ইহা খাটি সত্য কথা।

* * * *

দুগ্ধ ও ঘৃত।—দুগ্ধ ও ঘৃত বাঙ্গালীর সর্ব্ব প্রধান আহারীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখন সে দুইটির প্রচলনই—বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে কালের বাঙ্গালী প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া বল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে চায়ের প্রচলন হইয়াছে—দুগ্ধপানে বায়ু পিত্ত কফের প্রশমন হয়, সদ্যঃ শুক্র সঞ্চয় হয়, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহা সকল প্রাণীর সাত্ম্য, বৃংহণ, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, বয়ঃসংস্থাপক, আয়ুষ্য, দেহস্থ পদার্থ সকলের সংশ্লেষকারক ও রসায়ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর এখন দুগ্ধের মত অমৃতে অরুচি। বাঙ্গালী অজীর্ণগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণাঙ্গ হইবে না তো হইবে কাহারা?

* * * *

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।—প্রকৃতই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। শিশু জীবন হইতেই পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর যে স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে, যৌবনে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার আর পুনরুদ্ধার ঘটিতেছে না। উন্মার্গগামী বাঙ্গালী যতদিন না আবার পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইবে,—পানে-ভোজনে ক্রিয়ায়-পরিহাসে—কর্ম্মে-বিশ্রামে—জীবন যাত্রা

নির্ব্বাহের সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী আবার সেকালের মত চলিতে না শিখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধান কিছুতেই হইবে না। এক কথায় বাঙ্গালীকে সকল বিষয়েই আবার সাবেক চালে চলিতে হইবে সাবেক পদ্ধতিতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য সংযমী হইতে হইবে—কুসুমসুকুমার-বাল্যজীবন যাহাতে কীটদংষ্ট না হয়—তাহার প্রতি সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—তবেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যসুখ আবার ফিরিয়া আসিবে, নতুবা সহস্র সহস্র ঔষধ সেবন কর—তাহাতে কিছুই সুফল লাভ ঘটিবে না।

* * * *

ঔষধে আরোগ্য।—ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না,—রোগ আরোগ্য হয়—নিয়মে। ঔষধ—রোগ হইলে উপদ্রব সকলের প্রতীকার করে মাত্র। এখনকার দিনে নানা-কারণে বাঙ্গালীর শরীর যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাতে সেই ক্ষয়ের মূল কারণ দূর না করিয়া ঔষধের দ্বারা উপদ্রব দূর করিয়া কয়দিন তাহাকে জীবিত রাখা যাইতে পারে। অনেক সময় অজীর্ণ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত অনেক উৎকট রোগী এই জন্যই নানাপ্রকার ঔষধ সেবনেও বিফলমনোরথ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

"ব্যাধেস্তত্বঃ পরিজ্ঞানং বেদনায়শ্চ নিগ্রহ এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ু সঃ।"

অর্থাৎ ব্যাধির উপদ্রব দূর করাই বৈদ্যের কার্য্য,—বৈদ্য কখন আয়ুর প্রভু হইতে পারেন না। এ অবস্থায় এখনকার দিনে বাঙ্গালী যে নিজ কৃতকর্ম্মের ফলে আয়ুক্ষয় করিতেছে, বৈদ্য তাহার প্রতীকার করিবেন কি?

* * * *

কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।—যাহা হউক আমাদের এখন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের সময় আসিয়াছে। ব্যাধি উপস্থিত হইলে ব্যাধি প্রশমনে সচেষ্ট হওয়া অপেক্ষা যাহাতে ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে না হয়, আমাদিগকে এখন তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও ইহাই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে সদাচারবিধি প্রবর্ত্তিত। প্রত্যেক বাঙ্গালী-অভিভাবক এ সকল কথা মনে রাখুন,—এ সব কথা মনে রাখিয়া নিজেরা সংযম ব্রত অবলম্বন করুন, তবেই বাঙ্গালীবংশধরগণ সংযম শিক্ষালাভ করিয়া নীরোগ ও দীর্ঘজীবনলাভে সমর্থ হইবে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আয়ুর্ব্বেদে—খণ্ডপ্রলয়।*

—:*:—

সে একদিন ছিল—যেদিন সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-পুরাণ-শিল্প-বিজ্ঞান-চিকিৎসা-জ্যোতিষ—সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ সমুন্নত হইয়া সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকারে গর্ব্ব

* কলিকাতা-আয়ুর্ব্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত। তারিখ ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২৫।

প্রকাশ করিতে পারিত। সে একদিন ছিল—যে দিন ব্যাস-বাল্মিকীর সাহিত্য-রচনায় চমৎকৃত হইয়া বিদ্বদ্‌মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহাদের বাক্যসুধা পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। সে একদিন ছিল—যে দিন মনু পরাশর দেশরক্ষার জন্য—দেশ মাতৃকার সন্তান-সন্ততিগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুমধুর শ্লোকগ্রন্থনে যে সব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশ্য প্রতিপাল্য মনে করিয়া ভারতের তাবৎ অধিবাসীই সে সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার জন্য প্রস্তুত হইত। সে এক দিন ছিল—যে দিন ভারতে এখনকার মত শিল্পশিক্ষার জন্য কোনো বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অথচ বিশ্বকর্ম্মার মত শিল্পনিপুণ-পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ আজিও সমগ্র জগতকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে। বিজ্ঞানের কিরূপ চর্চ্চা ছিল—ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-সংবাদেই তাহা সুপ্রকট। আর চিকিৎসা—তাহার উন্নতি ভারতে যেরূপ হইয়াছিল, সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেরূপ আর কোনো দেশে কখন হইবে কিনা সন্দেহ।

আমি গত মাসের অধিবেশনে "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম,—এক সময়ে সমুন্নত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অধুনা যেরূপ অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার পুনরুন্নতির পন্থা-নির্দ্দেশ করাই সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা সে প্রবন্ধের পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু যাঁহারা তাহার প্রতিকুলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তরে আমার কিছু বলিবার আছে,—আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়েই সে সকল কথার উত্তর দেওয়া হইবে।

প্রথম কথা—'আমাদের ছিল সব'—এ কথার পৌনঃপুনিক আবৃত্তি আশৈশব সকলেই শুনিয়া আসিতেছি, সুতরাং আমাদের 'সকলই ছিল'—ইহা সত্য, কিন্তু 'ছিল' বলিয়া যাহা গিয়াছে—তাহার কি পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য নহে? বায়ু পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া, আমরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আস্ফালন করিলেই কি আমাদের লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কীর্ত্তিকলাপ আবার আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারিব? জানি,—বায়ুর প্রকৃতি, পিত্তের গতিনির্দ্দেশ এবং কফের স্থিতিস্থাপনে জ্ঞান থাকিলে চিকিৎসায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই নাড়ীজ্ঞানে সিদ্ধি লাভ একেবারে যে কাহারও নাই—এরূপ কথা আমি বলিতেছি না,—কিন্তু সকলের আছে কি না—তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সে একদিন ছিল,—যে দিন সাহিত্যদর্শনাদির মত চিকিৎসা বিজ্ঞানও একটা যুগ-প্রলয় উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারই ফলে সেকালের চিকিৎসকদিগের অনেকে সুস্থব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, ছয় মাস পূর্ব্বে তাহার অন্তিমের কথা বলিয়া দিতেন। খুব বেশী দিনের কথায় কাজ নাই—আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বেও নাড়ীজ্ঞানে সিদ্ধিলাভের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন দেখি—এখন সে নাড়ীজ্ঞান কয়জনের আছে? বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া মুখে বড়াই করিলেই চলিবেনা, মৃত্যু-রোগ-পীড়িতের আয়ুষ্কাল কতক্ষণ পরে অস্তমিত হইবে,—এ কথা

কি এখনকার কবিরাজ নামধারী সকল চিকিৎসকই মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? বায়ু-পিত্ত-কফ-নির্ণয়ে যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহার নিকটে মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং অধুনা আমরা অনেকেই যখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সকলই আছে বলিয়া আমাদের বৃথা আস্ফালন করা কর্ত্তব্য কি? রন্ধনব্যবসায়ীর মত হীন কর্ম্মে নিরত কোনো ব্রাহ্মণের উর্দ্ধতন তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ চতুর্ব্বেদবিশারদ ছিলেন বলিয়া তাহার আভিজাত্যের গর্ব্ব-প্রকাশ যেমন বাতুলতার পরিচায়ক, অধুনা অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অবস্থাও যে তদ্রূপ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ফলে এই অবস্থান্তরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতির যে বিঘ্ন ঘটিতেছে—তাহার দূরীকরণ নির্দ্দেশই এক কথায় আমার বক্তব্য।

চিকিৎসা যে মতেই করা হউক, শারীর তত্ত্বে জ্ঞান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। যেমন বর্ণ পরিচয়ে জ্ঞান না থাকিলে কোনো পুস্তকই অধ্যয়ন করা চলে না, সেইরূপ শারীর যন্ত্রগুলির অনভিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন না। তবে শারীরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের ঔষধেও রোগ-বিশেষে যে সুফল পাওয়া যায়, তাহার জন্য আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ নাই, কেননা সেটি পল্লীগ্রামের কোনো কোনো মহিলা যেরূপ দু' চারটি মুষ্টিযোগে কখনো কখনো কোনো কোনো রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন,—সত্য কথা বলিতে গেলে তাহারই অনুরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুচিকিৎসক মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। যে, রোগ অনেক সময় বিনা চিকিৎসাতেও আরোগ্য হইয়া থাকে,—হোমিওপ্যাথি তো এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রচারিত। এরূপ অবস্থায় আমি চিকিৎসার সকল বিষয় শিক্ষালাভ করি নাই—অথচ আমার ঔষধে অনেক রোগ আরোগ্য হইতেছে বলিয়া আমার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। গর্ব্ব করিবার তো কিছুই নাই, বরং যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি—তাহাতে সম্যক জ্ঞানলাভ করি নাই বলিয়া দুঃখ করিবার আছে। আমার বক্তব্য—এক কথায় সেই দুঃখ প্রকাশ। আমি নিজে ইহার জন্য সন্তপ্ত এবং আমার ন্যায় চিকিৎসকগণও যাহাতে এজন্য সন্তপ্ত হন—ইহার ব্যবস্থাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

গত অধিবেশনে কথা উঠিয়াছিল—"শল্য চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত হইলেও এখনও সে শিক্ষার সময় আমাদের আসে নাই,—কায়চিকিৎসায় সম্যক সিদ্ধিলাভের পর—অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর গত হইলে আমাদের সে শিক্ষা লাভের সময় আসিবে।" কিন্তু এ কথার অর্থ ও আমি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। মহাত্মা সুশ্রুত যখন ধন্বন্তরির অবতার দিবোদাসের নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন কি কায়চিকিৎসা শিক্ষা করেন নাই? সুশ্রুত সংহিতায় শারীর বিদ্যা, শারীর তত্ত্ব, নিদান, শল্যতন্ত্র, ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, অস্ত্রবিধি, অগদ, কৌমারভৃত্য, শস্ত্রসাধ্য চিকিৎসা, ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান, ব্যক্রান্তি, ভৈষজ্য বিধান, ভূতবিদ্যা, রসায়ন—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিষয়েরই তো পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বস্পর্শী—গভীরতা, বিজ্ঞানের বাস্তব রহস্য—সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ে সুপ্রকট। সুশ্রুত-কি অস্ত্রচিকিৎসা—কি কায়চিকিৎসা—চিকিৎসার

সকল অঙ্গেই সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া তবে চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমরা আজি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি। সুতরাং সেই দুর্গতি দূর করিতে হইলে,—আমরা যাহা ছিলাম, আবার তাহা হইতে হইলে—আমাদিগকে কায়চিকিৎসার মত শল্য চিকিৎসা একান্তই শিক্ষা করিতে হইবে, আমাদের লুপ্তরত্ন ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমাদের জ্ঞানগভীরগবেষণা তবেই লোকলোচনে আবার ফুটিয়া উঠিবে,—নতুবা এ চিকিৎসার অবনতি যাহা হইয়াছে, তাহাপেক্ষা আরও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

সেদিন আর একটি কথা উঠিয়াছিল—"যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে যাঁহারা তাহা শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে এবং তাঁহাদিগকে কায়চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে না।" এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যদি এ কথা না বলিতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমি কোনো উত্তর দানেই ইচ্ছুক হইতাম না, কিন্তু যিনি একথা বলিয়াছেন, তিনি এখনকারদিনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের শিরোভূষণ—আমাদের মাথার মণি, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা চলে না।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান ধন্বন্তরি। এইজন্য সুশ্রুত সংহিতাকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনেকে প্রচার করেন। ইঁহাদের মতে চরকসংহিতা আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু পুরাণে আমরা দেখিতে পাই—

তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেব ধন্বন্তরি স্তদা।
কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রণাশনঃ।
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহসভিষগজিতং।
তমষ্টধা পুনর্ব্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥

অর্থাৎ কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সেই আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন।

এই পৌরাণিক কথা মানিতে হইলে আত্রেয় সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরি সম্প্রদায় এক হইয়া যায় না কি? সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিলে সেই চিকিৎসকগণকে কায়চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে না কেন—ইহা তো আমার মাথায় আসিল না। যদি বলেন, মেডিকেল কলেজ হইতে যাহারা উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—তাঁহারা কেহ কায় চিকিৎসায়, কেহ বা শস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোনো সার্জ্জন যদি ফিজিসয়নের কার্য্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যে তাহা করিতে দেওয়া হইবে না, বা তিনি তাহা জানেন না,—এমন কথা তো কখনো শুনি নাই। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ শূল রোগের চিকিৎসায় বিখ্যাত, কাহারও বা তৈল-ঘৃতে পাগলের চিকিৎসায় অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়,—কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শূলরোগ আরোগ্যকারী বা উন্মাদরোগ নিবারক চিকিৎসক যে অন্য চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না—এমন কথা কিছু আছে কি? অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রধান অঙ্গ—শল্য চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করিয়া যদি কেহ শল্য চিকিৎসায় ফুটিয়া উঠিতে পারেন,—তাহা হইলেও তো আয়ুর্ব্বেদের অতীত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎ

সকগণ পূর্ব্ব-কীর্ত্তি ফিরাইয়া আনিয়া এখনকার শারীরতত্ত্ববিদগণের নিকট সগৌরবে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে, শুধু বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে না,—সত্য সত্য তাহাদের দ্বারা জগতের আবার হিতসাধন হইবে।

আর একটা কথা—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ইংরাজ এখন এদেশী সৈন্য লইতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা পদাতিক দলে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা যদি বলে—আমরা আমাদের দেশীয় প্রথায় সড়্কি বল্লমের চালনা করিব কিন্তু অসি চালনা করিব না—তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হয়—তাহা কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে? বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া আমরা শুধু কায়চিকিৎসা লইয়া থাকিব—আমরা যদি ইহাই বলিয়া বসিয়া থাকি—তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কথিত পদাতিক সৈন্যের মত হইবে না কি? যিনি রন্ধন করিতে জানেন, তিনি আহারীয়ের কতক দ্রব্য রন্ধন করিতে পারেন, আর কতক দ্রব্য রন্ধন করিতে পারেন না—তাঁহাকে পাকা রাঁধুনি বলা যায় না। পুরোহিত, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় ষষ্ঠী-মাকাল হইতে দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মে অধিকারী না হইলে তাঁহাকে প্রকৃত পুরোহিত বলিতে পারা যায় না। গুরু, পুরোহিত এবং চিকিৎসক একদা হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারে যে সমর্থ ছিলেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সকল কর্ম্মে কুশলতা লাভে সিদ্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। গুরু, পুরোহিত এবং চিকিৎসকের উন্নতিতেই এক সময় এদেশ উন্নত হইয়াছিল,—এখন এই ত্রিবিধ ব্যবসায়ীরই অধঃপতনে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক নিজেদের কথা বলিতে গিয়া অপরের কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আর্য্যচিকিৎসকদিগের পুনরুন্নতি করিতে হইলে অস্ত্রচিকিৎসায় আবার আমাদিগকে অধিকার লাভ করিতে লইবে,—সুশ্রুতের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমরাই কায়চিকিৎসার জন্য নাড়ী দেখিয়া বায়ু-পিত্ত-কফের নির্ণয় করিব—আমরাই ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রসবকাল উপস্থিত হইলে প্রসববাধা দূর করিতে সমর্থ হইব, আমরাই শারীরতত্ত্বে সম্যক অধিকার লাভ করিয়া, প্রয়োজন হইলে ফোড়া কাটিবার জন্য অস্ত্র চালনা করিব—এ সকল ব্যবস্থা যতদিন না হইতেছে—ততদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া বড়াই করিতে সক্ষম হইব না—ইহা সুনিশ্চিত—নির্ভাজ সত্য কথা।

কিন্তু কথা হইতেছে—আমরা অস্ত্রচিকিৎসা ভুলিয়া গিয়াছি, এখন তাহা শিখিতে হইলে গুরুকরণ কাহাকে করা হইবে? গত অধিবেশনে আমি ইহার নিরাকরণ করিয়া এখনকার দিনে শারীরতত্ত্বে যাঁহারা অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা শিক্ষা করা উচিত—এইকথা বলায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন,—তাঁহাদের পুত্রকলত্রদিগকে এখন হইতে তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে নিরত হউন। কেন না, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সকল প্রকার শিক্ষা লাভই ব্রাহ্মণের নিকট করা কর্ত্তব্য। ইংরাজ অধিকারে দেশের সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তনের সহিত শিক্ষাগার গুলিতেও কেবল ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা অন্তর্হিত হইয়া

একাকার চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের অপত্যগণ শুদ্র অধ্যাপকের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে—ইহা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই নিন্দার —তথা প্রত্যবায়ভাগী হইবার কথা। কিন্তু তাহা যখন আমরা চালাইতে কুণ্ঠিত হইতেছি না,—তখন ব্যবসায়ের পরিচালন কার্য্যে যাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—তাহা শিখিবার জন্য—এখনকার শল্যতন্ত্রবিদ্‌গণ পরদেশীয় চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা করিতে হানি কি? পর দেশীয় চিকিৎসায় ও আর্য্য চিকিৎসায় যে বড় বেশী পার্থক্য নাই—পক্ষান্তরে আর্য্য চিকিৎসা হইতেই যে সমস্ত চিকিৎসার উৎপত্তি হইয়াছে—এ সব কথা গত প্রবন্ধে আমি বিশেষভাবে বুঝাইয়াছি। যাহা হউক অস্ত্র চিকিৎসা-শিক্ষার জন্য আমাদিগকে অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, শল্যতন্ত্রবিদগণের নিকট হইতে লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিতে হইবে, তাহার পরে আমরা নিজেরা শিখিয়া, আচার্য্য হইয়া,আমাদের বংশধরদিগকে ইহার শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

পুরাকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে শল্য চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রমাণ। চব্বিশ প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র, কুড়ি প্রকার নাড়ী যন্ত্র, আটাশ প্রকার শলাকা যন্ত্র, পঁচিশ প্রকার উপযন্ত্রের বিবরণ, ক্রিয়া ও প্রতিকৃতির প্রকটন করিয়া, ছেদন, ভেদন, লেখন বিস্রাবন, ব্যধন, আহরণ, এষণ ও সীবন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মণ্ডলাগ্র, বৃদ্ধিপত্র, করপত্র, প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অস্ত্রের বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়া, তাহার পর উহার প্রচার কামনায় বৈদ্যবিচারে তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"শস্ত্রক্রিয়া ও স্নেহাদি ঔষধ প্রয়োগে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, সে চিকিৎসার লোভবশতঃ রোগীর প্রাণনাশ করে। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসক হইতে গেলে শস্ত্র ও কায়চিকিৎসা—উভয় বিষয়েই পারদর্শী হওয়া কর্ত্তব্য।" আমরা বিশ্বামিত্র-পুত্র-আচার্য্য-সুশ্রুতের সে কথা এখন ভুলিয়া যাইতেছি কেন? সেই অমূল্য উপদেশ ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই আয়ুর্ব্বেদে খণ্ড প্রলয় হয় নাই কি? বিদেশীয় চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ নহে,—উহার মতস্থৈর্য্যও অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই,—ঐ চিকিৎসায় আজি যাহা উৎকৃষ্ট, কালি তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা তাহা নহে,—ইহার চিকিৎসা-প্রণালী যেভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর পরিবর্ত্তন করিবার কখনো দরকার হয় না,—পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাও বুঝি কাহারও নাই,—সেইজন্য এই চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত,—এ চিকিৎসা-প্রণালী যে ভাবে প্রণীত হইয়াছে. তাহা সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিবার অধিকারী, কিন্তু শল্য চিকিৎসা লুপ্ত হওয়ায় এ চিকিৎসায় যে খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে এ চিকিৎসাব্যবসায়ীগণ এখনকার দিনের শল্য তন্ত্রবিদ্‌গণের নিকট লজ্জিত। সেইজন্য আমার বক্তব্য—আসুন আমরা ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করি। ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া—দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের মঙ্গলের জন্য—সমাজের কল্যাণের জন্য—বৈদ্য চিকিৎসার কলঙ্ক-কালিকা অপনয়নের জন্য—চিকিৎসার সকল অঙ্গের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক দেশে আবার চরক-সুশ্রুতের যুগ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করি। ভেদবুদ্ধি কোনো

কালেই—কোনো বিষয়েই কর্ত্তব্য নহে,—বিশেষ জীবন-মরণের দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে—চিকিৎসা বৃত্তিতে তো একেবারেই কর্ত্তব্য নহে, —সুতরাং আসুন, আমরা বিদ্বেষপ্রণোদিত-ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন সলিলে নিমজ্জিত করিয়া খণ্ড প্রলয় হইতে সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধারে যত্নপর হই,—আমরাই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সকল অঙ্গের শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়া দেশবরেণ্য চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হই,—আমাদের দেখিয়া সমগ্র জগত আবার স্তম্ভিত হউক, আমাদের পদ রেণু-সংস্পর্শে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্ত বিশ্ববাসী আবার ব্যগ্র হইয়া উঠুক। আমার আয়ুর্ব্বেদ! তোমার এক একটি শ্লোকের যশঃসুরভি দিগ্বধূগণ বহন করিয়া বিশ্ব সংসারের সমগ্র প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্নপর হউক! আমার আয়ুর্ব্বেদ! তোমার অনুরক্ত সন্তান মণ্ডলীর সুমতি প্রদান কর,—তোমার লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়া—তোমার অষ্টাঙ্গ শিক্ষার পরিসমাপ্তি করিয়া—তোমার কৃতি পুত্রগণ তোমারই চরণে যাহাতে অঞ্জলী প্রদান করিতে পারে,—আমার আয়ুর্ব্বেদ! আবার সেই ব্যবস্থা কর! দেশভক্ত বৈদ্যসন্তান আবার জাগিয়া উঠুক,—সে জাগরণে সুরলোক হইতে দেবনির্ম্মাল্য তাহাদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হউক,—কীর্ত্তি-কলাপে তোমার শিষ্যমণ্ডলী অন্যের নিকট অপরাজেয়—অক্ষয়-অমর বলিয়া কথিত হউক —ইহাই তোমার চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমার জীবনে ইহা ভিন্ন আর অন্য কামনা নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

বালক রক্ষা।

আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমশঃ যেরূপ দুর্ব্বল হীনতেজ, খর্ব্বাকৃতি, রুগ্ন ও মেধাহীন হইয়া আসিতেছে, বোধহয় এরূপ দ্রুত অবনতি এক ভারতবর্ষ—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ হইতেছে না। এইরূপ অনুপাতে চলিলে আমাদের বংশ যে অচিরে লোপ পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিলে আর চিন্তার কূলকিনারা পাওয়া যায় না ও ইহার ভবিষ্যৎ ফল বড়ই ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। এখন নিজেদের দেহরক্ষা যেমন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, সেইরূপ আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে ক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা করাও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আমরা এবিষয়ে তত তৎপর না হইয়া বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া সংসারের সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত ও লালায়িত থাকিয়া এ বিষয়ে এক রকম উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। সংসারের তাড়নায় অবশ্য আমাদের এ চেষ্টার অনেক অন্তরায় রহিয়াছে—কিন্তু যতটুকু করিতে পারি, ততটুকু করি না কেন? যাহা হউক এখন দেখা যাউক এ বিষয়ে আমরা

চেষ্টা করিয়া কতটুকু করিতে পারি। যতটুকু আমাদের করায়ত্ত, ততটুকু অবধারণ করিয়া আমরা যেন কাল বিলম্ব না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

ছেলেদের সৎপথে আনিবার জন্য এখনকার দিনে অনেক সভা সমিতি, অনেক বক্তৃতা, অনেক পত্রিকা প্রকাশ, অনেক উপদেশ দেওয়া হইতেছে, অথচ তাহাতে কাজ হইতেছে না কেন; ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহার মূলে ধর্ম্ম ও সত্য নাই, তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে না। আমাদের পুত্রকন্যাগণকে উন্নত করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে উন্নত হইতে হইবে। আমাদিগকে স্বয়ং ধর্ম্ম ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা আমাদের পুত্রকন্যাগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। কোন এক সাধুর নিকট—একটি কাশরোগগ্রস্থ ব্যক্তি কোন দূর গ্রাম হইতে আসিয়া কাশরোগের ঔষধ প্রার্থনা করে। সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এই ব্যক্তি বড় মিষ্টদ্রব্য প্রিয় ও সেইজন্য বেশী পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে। তাহার পর তিনি তাহাকে তাহার পর দিন আসিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি অতিকষ্টে দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাঁহার নিকট আসিল। সে দিনও তিনি তাহাকে বলিলেন—"কাল আসিও।" সে ব্যক্তি তৃতীয় দিন আসিয়া আবার সেইরূপ উত্তর পাইয়া কিছু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কাশের যন্ত্রণার উপশমের লোভ হেতু ও সাধুর ঔষধের গুণ বহুলোক মুখে শুনিয়া তাঁহার ব্যবস্থা ও ঔষধে দৃঢ় বিশ্বাস হেতু আবার চতুর্থ দিনেও অতি কষ্টে আসিল। তখন সাধু তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা যতদিন তোমার কাশ রোগ একবারে ভাল না হয় এবং একবারে ভাল হওয়ার কিছু দিন পর পর্য্যন্তও সর্ব্বপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া ত্যাগ করিবে।" সে লোকটি শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—"বাবা এই যদি আপনার ব্যবস্থা ও ঔষধ হয়, তাহা হইলে প্রথম দিন বলিয়া দেন নাই কেন?" সাধু বলিলেন—"বাবা, আমার বাক্যের প্রভাব আনিবার জন্য আমাকে এই কয় দিন মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং যে পর্য্যন্ত না উহা খাওয়ার ইচ্ছা একবারে আমার মন হইতে অপসৃত হইয়াছে—ততদিন তোমাকে উহা ত্যাগের উপদেশ দিই নাই। আমি যখন স্বয়ং মনে মনে উহাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন তাহার প্রভাব তোমাতে অর্পণ করিতে পারিব জানিয়া অদ্য তোমাকে বলিলাম। যাও—মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া উপস্থিত ত্যাগ কর, তোমার কাশরোগ ভাল হইবে।" সেই ব্যক্তি আনন্দে সাধুর বাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ করিল এবং রোগ হইতে মুক্ত হইল। ইহার দ্বারা আমরা কি শিখিলাম? প্রথম—ভোগে রোগ উপস্থিত হয়। কোন দ্রব্য অপরিমিত ভাবে ভোগ করিলে তাহাতে রোগ হয় এবং সেই ভোগের লালসা ত্যাগ করিতে না পারার জন্য সেই রোগ ভোগ করিতে হয় এবং রোগও ভোগের দ্বারা এবং সুপথ্য গ্রহণ, কুপথ্য ত্যাগ, তিক্ত ঔষধাদি ভক্ষণ ও অন্যান্য অনেক প্রকার সংযমের দ্বারা দূরীভূত হয়। সংসারে বাহিরে সুখ নাই, ভিতরে সুখ। সুখের সময় তাহাতে আসক্ত না হওয়া এবং দুঃখের সময় তাহাতে বিরক্ত না হইয়াই ভিতরের আসল সুখ

পাইবার পথ। দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে—আদর্শ। যিনি যে বিষয়ে উপদেশ দিবেন, তিনি সেই পথাবলম্বী স্বয়ং হইবেন। তাহা না হইলে সেই উপদেশে কোন ফল হয় না। আমি নস্য ব্যবহার বা তামাক খাওয়া বা চুরুট-সিগারেট-খাওয়ায় অভ্যস্ত—আমার পুত্রের কাছে তাহাই করিতেছি—অথচ পুত্র অল্প বয়সে বিড়ি বা সিগারেট পান করিতেছে দেখিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলাম বা মারিলাম, কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ ফল হইল না। কেননা, ভয়ে হয়ত সে আগেকার মত বিড়ি সিগারেট্ পানকরিল না, কিন্তু সুযোগ পাইলে সে কখনই তাহা হইতে বিরত থাকিবে না, অধিকন্তু তাহা গোপন করিবার জন্য তাহার সঙ্গে আর একটা পাপের সৃষ্টি করিবে অর্থাৎ আমি জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিবে। আমি তাহাকে যদি হাজার বার শিক্ষা দিয়া বলি—"বাবা নস্য লইলে তাহাতে যে নিকটিন্ বিষ আছে, তাহাতে মস্তিষ্ক—যাহা আমাদের জ্ঞানের আধার অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অনুভব, স্মরণ, চিন্তন, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্য করি, তাহার ক্রিয়া ক্রমশঃ নষ্ট ও হীনবল হইয়া আসিবে,—তাহাতেও সে তাহা হইতে বিরত হইবে না। এইরূপ যদি অল্প বয়সে বিড়ি সিগারেট-পান করিলে বা পানের সহিত দোক্তা খাইলে (যাহা আজকাল স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের মধ্যে একটা ভয়ানক বিষ হইলেও অতি আদরের ও উপ.দেয় খাদ্য বা পানের মশলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে) শরীর নষ্ট করে বলিয়া উপদেশ দিই বা ঐ সব ব্যবহার দ্বারা উদরের ও বুকের মধ্যের যন্ত্র সকল কি প্রকার বিকৃত ও ক্রিয়াহীন হয়—চিকিৎসা পুস্তক বা ছবি হইতে দেখাইয়া দিই, অথচ আমি যদি স্বয়ং নস্য লই, তামাক বা সিগারেট ব্যবহার করি ও আমার স্ত্রী পানের সহিত দোক্তা ব্যবহার করেন অথচ আমরা আমাদের পুত্রের নিকট ইহার কারণ দেখাইয়া বলি যে, আমাদের বয়স হইয়াছে—আমাদের অনিষ্ট করিবে না, কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের পুত্রগণ উহা হইতে বিরত হইবে না। আজ কাল তামাক কোথাও নস্যরূপে, কোথাও বিড়িরূপে, কোথাও সিগারেট-রূপে, কোথাও দোক্তারূপে, ব্যবহৃত হইয়া শরীরের ও সমাজের কি ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে, তাহা চিকিৎসকগণ বেশ বুঝিতে পারেন। আর চিকিৎসগণই বা বুঝিয়া কি করিবেন, অনেক চিকিৎসককে তামাকের ভীষণ অনিষ্ট করিবার কথা বলিতে শুনিয়াছি অথচ তাঁহাকেই পানের সঙ্গে দোক্তা খাইতে দেখিয়াছি। অজ্ঞ লোকেরা এই সকল দেখিয়া উহাতে আরও রত হয়, তাহাতে যাঁহারা উহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াও উহা ত্যাগ করেন না—তাঁহারা প্রকৃতই সমাজের অনিষ্ট করিয়া পাপ পঙ্কে লিপ্ত হন। এ বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে ও কেবল কথায় বা তিরস্কারে চলিবে না, আমাদিগকে উহা একবারে ত্যাগ করিয়া তবে উপদেশ দিলে ফল হইবে। সাধুর বাক্যে লোকে বিশ্বাস করে কেন? কারণ তিনি ত্যাগী, নিজের সুখ-দুঃখের দিকে না দেখিয়া পরের দুঃখের দিকে সাধুগণের দৃষ্টি ও নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্যের দুঃখ বিমোচন করা তাঁহাদিগের কার্য্য। শুধু সাধুর প্রভাব থাকিলেই হইবে না, সাধুগত প্রাণ ব্যক্তিগণের সেই প্রভাবে বিশ্বাসও থাকা চাই। তবে এই বিশ্বাসের মূলকারণ হইতেছে—সাধুর

নিজের কার্য্যের উদাহরণ বা আদর্শ বা ত্যাগ ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন। ধর্ম্মই আমাদিগকে ধারণ করে,—সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, সেইজন্য এ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা না মানিয়া থাকা চলে না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন—অন্যান্য লোকেও তাহাই করিয়া থাকে, তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন অন্য লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদোবতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রীভগবানের কার্য্য না থাকিলেও তিনি স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছেন। তাই আমাদিগকে যখন আমাদের পুত্র কন্যারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে বা জানে, তখন আমাদিগকেও সাধুর জীবন বা ব্রতগ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া আমরা বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়াছি, কামনার পূর্ণ আধার হইয়া বসিয়াছি, একটু কষ্ট সহ করিতে পারি না, একটু জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি না, একটু দয়া দেখাইতে পারি না, একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি না, একটু মন খুলিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে পারি না, এরূপ অবস্থায় আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে কি করিয়া ভাল করিতে পারিব? যাহা হউক যাহা হইয়াছে তাহা লইয়া এখন আর বাদানুবাদ বা দোষ দর্শনের সময় নাই,—যিনি যতটুকু পারেন, এরূপ যথার্থ গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত হইয়া নিজ পরিবারের মধ্যে সাধু বা রাজা বা রক্ষাকর্ত্তা হইয়া ইহার উপায় বিধান করিতে হইবে, এখনকার দিনে ইহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এবং ইহা ভিন্ন যে দেশ রক্ষার অন্য উপায় নাই ইহা সুনিশ্চিত,—খাঁটি সত্য কথা।

পূর্ব্বে গুরুগৃহে বাস করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ সংযত দেহ, নির্ম্মল চিত্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ হইলে গুরু তাহাকে গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত মনে করিয়া গৃহস্থাশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন এবং তখনই দার পরিগ্রহাদি হইত। এখন সে দিন নাই। বাল্যকালে আমরা সে শিক্ষা পাই নাই, এক্ষণে কিন্তু সময়ের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে এই বয়সেও গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া, আমরা ঠেকিয়া যে টুকু শিখিয়াছি, তাহাই বড় মূল্যবান। আসুন তাহাই লইয়া ও শাস্ত্রের উদাহরণ লইয়া আমরা এক্ষণে কার্য্য করি। একজন সাধু আমাকে বলেন "বাবা আমরা ভাতমারা সন্ন্যাসী অনেক আছি, আমাদের দ্বারা বিশেষ কিছু হইতেছেনা, কতকগুলি ভাত দেওয়া সন্ন্যাসী তৈয়ার না করিতে পারিলে সমাজের উন্নতির উপায় নাই"। সাধুর সেই কথায় আমাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এক্ষণে "ভাত দেওয়া সন্ন্যাসী" হইতে হইবে।

আমাদের প্রধান শত্রু কাম ও ক্রোধ, তন্মধ্যে কামই সর্ব্ব প্রধান, কারণ কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উপত্তির হেতু হয়। এই কামকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে দমন করিতে হইবে। কিন্তু ইহার এমন প্রভাব যে কোন কৌশলে বা বলে ইহাকে পরাস্ত করা যায় না। যেমন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র 'ভূতে'র সংহর্ত্তা বলিয়া রাম নাম করিলে ভূত পালায়, তেমনি যিনি কামের সংহর্ত্তা বা সম্মোহয়িতা, তাঁহার নাম লইলে কাম পলায়ন করেন বা পরাস্ত হন। কামের প্রভাব বিষয়ে শ্রীভগবানের ত্রিমূর্ত্তিই উদাহরণ।

ব্রহ্মের অঙ্গ ও প্রকাশ, বেদের বক্তা ব্রহ্মা প্রথমে পঞ্চানন ছিলেন, তিনি কামকে সৃষ্টি করিয়া তাহার ক্ষমতা কিরূপ হইয়াছে—পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজের উপরেই পরীক্ষায় দেখিলেন যে, যেমন তাঁহার মনে কামের প্রভাব আসিল—অমনি তিনি নিজ মানস কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, হইবামাত্র সেই ভাব তাঁহার পবিত্র দেহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পঞ্চম মস্তকটি উড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি লোককে এই শিক্ষা দিলেন যে "বাবা আমার পাঁচটা মাথার একটা উড়িয়া গেল, তাহাতে বড় ক্ষতি হইল না, কিন্তু বাবা, তোমাদের একটা মাথায় যদি কামের প্রভাব আসিতে দাও —তাহা হইলে সেই একটী মস্তক উড়িয়া গেলে তোমার আর কি থাকিবে? অতএব সাবধান হও। শিব যখন ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন—তখন দেবতারা নিজকার্য্য উদ্ধার অর্থাৎ তারকাসুর বধের জন্য মহাদেবের ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা তাঁহার বধের জন্য তাঁহাকে উমার সহিত বিবাহ দিবার জন্য কামকে পাঠাইয়া ছিলেন। এখানে কাম—ব্রহ্মার প্রতি স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া, নিজ বলের গর্ব্বে ব্রহ্মার শাপের কথা ভুলিয়া যোগীন্দ্র মহাদেবের নিকট স্বীয় প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

"হরন্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যঃ তাহার পরেই আত্মসংযম করিয়া জ্ঞানপত্র অর্থাৎ তৃতীয় নেত্র দ্বারা "ভস্মাবশেষং মদনং চকার"। মহাদেব একটু অসাবধান হওয়াতে যে কিরূপে কাম আক্রমণ করিতে পারে—তাহার উদাহরণ দিয়া—পুনরায় সংযম বায়ু বিক্ষোভিত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কামকে নষ্ট করিয়া তবে বিবাহ করিলেন ইহার দ্বারা মহাদেব জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে, বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কামকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করিতে হইবে। আজকাল বিবাহ কেবল সুখের লালসায় প্রণোদিত। ফলে তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমের সম্পূর্ণ অভাব। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কামকে মোহন করিয়া তাহার প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া তবে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রী লইয়া আমরা সংসারে কেবল সুখেরই কল্পনা করি। স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী—একথা এখন একেবারেই কাহার কল্পনাতেও আসেনা। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনঃ। এখন বিবাহ যে পরকালে প্রেতদেহের কষ্টের লাঘবের জন্য—তাহা কেহ ভাবেননা। যতক্ষণ আমাদের এই দেহে দেহী বাস করিতেছেন, ততক্ষণই সেই পুরুষ জীবাত্মা কর্ম্মক্ষম, ততক্ষণ তিনি নিজের সুখ দুঃখ গাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু সেই জীবাত্মা বিদেহ হইলে, কর্ম্ম করিতে না পারায় গতিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রেত অবস্থায় দুঃখ ভোগ করেন, সেই জন্য সেই সময়ের পিপাসা নিবারণ—পুত্র দত্ত তর্পণ কালে এবং ক্ষুধা নিবারণ—পুত্র দত্ত পিণ্ড দ্বারা হয় এবং উপনিষদাদি সৎগ্রন্থ পাঠে সেই পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিলাভ হয়। পুত্রের ইহাই প্রধান কার্য্য। তা' এখনকার পুত্রের সে শ্রদ্ধা নাই বলিয়া যথার্থ শ্রাদ্ধ হয় না এবং পরলোকে পিতামাতার কোন উপকার হয় না। পশুপক্ষী কোন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান পালন করে না, কিন্তু মনুষ্য লোভ এবং প্রত্যুপকারের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্র কামনা ও পালন করে, কিন্তু যদি সেই পুত্র হইতে এই আশাপূরণ না হয়—তবে পুত্রে ফল

কি? আমরা যদি কেবল স্বার্থ ভাবিয়া পুত্র কামনা করি ও পুত্র প্রাপ্ত হই—তাহা হইলেও নিজের হিতের জন্যও যাহাতে সেই পুত্র সৎপুত্র হয় তাহা দেখা কি উচিত নয়?—পুত্র সুস্থ, সবল, নীরোগ, ধার্ম্মিক, দয়াবান্ এবং ঈশ্বরপরায়ণ হইলেই পিতামাতার সুখ ও সমাজের সুখ, নতুবা কেবল দুঃখময়। আজ কাল পুত্রের দ্বারা পিতামাতার কষ্ট বই সুখ হয় না, তাহার কারণ পিতামাতার দোষ। সন্তান রুগ্ন হয়—তাহাও পিতামাতার দোষ। কেননা, পিতামাতা ঐশ্বর্য্য বিলাসের মধ্যে খালি মগ্ন থাকেন বলিয়া সদ্‌গুণান্বিত পুত্র লাভ এখনকার দিনে আর দেখা যায়না।

মহামনা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ—দিলীপ রাজা পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম করিয়া পাপার্জ্জনে শাপগ্রস্ত বলিয়া পুত্র লাভ করিতে পারিতেছেন না ও বংশলোপ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাজাকে বনে গোচারণ পূর্ব্বক—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে স্বাত্বিক গুণের বৃদ্ধির জন্য সুরভি কন্যার সেবা করিতে বলিলেন। সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—বিলাসের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক ভাবে থাকিয়া—পুত্র হইলে সেই পুত্র অষ্ট-সুরেন্দ্রগুণযুক্ত হইয়া—প্রজাপালক ও প্রজারঞ্জক ও যথার্থ রাজা হইতে পারিবেনা বলিয়া, বশিষ্ঠ রাজাকে সপত্নিক বনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া গোচারণের ব্যবস্থা করিলেন। ভাবিয়া দেখা যাক—কোথায় সেই একাধিপত্য রাজ্যেশ্বরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগের মধ্যে দিন কাটাইতেন—আর কোথায় তিনি বন্য লতা প্রতানদ্বারা কেশ বন্ধন করিয়া সামান্য বেশে তূণীর ও ধনু ধারণ করিয়া মুনিহোমধেনু রক্ষা করিতেছেন। সমস্ত দিন গোচারণ করিয়া বন্য ফলমূল খাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া সেই গাভীর দুগ্ধ পান পূর্ব্বক সংযতচিত্তে—সাম্রাজ্ঞী সুদক্ষিণার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রির শেষ প্রহরে মুনিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে—শুদ্ধ স্বস্বভাবে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে শয্যা হইতে উভয়েই গাত্রোত্থান করিতেন। আর আজকাল কি স্বামী—কি স্ত্রী—কাহারও সূর্য্য উদয় না হইলে ঘুম ভাঙ্গেনা। তাহার পর—ঘুম ভাঙ্গার পর শ্রীভগবানের নাম পর্য্যন্ত লওয়া নাই—চা প্রভৃতি উত্তেজক অনিষ্ট কর পানীয়ের চেষ্টা। কোথায় সেই রঘুর মত পুত্র—আর কোথায় এখনকার পিতামাতার চিরব্যাপি কষ্টদায়ক পুত্র।

রাজা দিলীপ এই প্রকারে দীর্ঘকাল আচরণ করার পর, তাঁহার যথার্থ ত্যাগ ধর্ম্ম আসিয়াছে—যথার্থ রক্ষা ধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আসিয়াছে কিনা—তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পরীক্ষা হইল, রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বরের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া বর চাহিলেন কি—"বংশস্য কর্ত্তার মনন্তকীর্ত্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে" এমন পুত্র যিনি অনন্তকীর্ত্তি হইবেন ও বংশের কর্ত্তা হইবেন। তাহার পর সর্ব্ব-সুলক্ষণ—পঞ্চতুঙ্গগ্রহ দ্বারা সুচিতভাগ সম্পদ্ পুত্র রঘুকে লাভ করিলেন। গোসেবা দ্বারা যে আমাদের কত উপকার হয়—তাহা আমরা জানিনা। টাট্‌কা গোমূত্র ও গোময়ের ঘ্রাণে বহুবিধি রোগ নষ্ট হয় এবং উহা দ্বারা রোগের বীজানুধ্বংস হয়। চরকে আছে—যে দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করিলে গোরুর পালের মধ্যে থাকিতে ও আমলকী ভক্ষণ করিতে হয়। এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি যে, একজন জমীদারের এক পুত্রের আয়ু কয়েক বৎসর মাত্রছিল—দৈবজ্ঞগণ কোষ্ঠি বিচার করিয়া

দেখেন। সাধুর আদেশে সেই পুত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে গোসেবায় লাগান হয়, তাহাতে সেই পুত্র সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু লাভ করে। আমাদের দেশে এক বড়লোকের কোন কঠিন ব্যাধি হয়। রোগের যাতনায় ৺বৈদ্যনাথে হত্যা দেওয়ায় স্বপ্ন হয়—গোসেবাও গোচিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় গোচিকিৎসা করিলে ব্যাধি আরোগ্য হইবে। তিনি তাহাই করিতেছেন এবং নীরোগ হইয়া—সুখে কালযাপন করিতেছেন। আজকালকার দিনে আমাদের প্রধান খাদ্য ঘৃত-দুগ্ধ বেশী মূল্য দিলেও বিশুদ্ধ পাইবার উপায় নাই ; কিন্তু গাভী পোষণ ও তাহার যত্ন করিলে উহা পাওয়া যায় এবং তদ্দারা বহু উপকার লাভ হয় ; আমরা তাহা করি না বলিয়াই—আমাদের এত দুঃখ। যাক্ এই প্রসঙ্গে কিছু গোসেবার কথা বলা গেল।

যাহা হউক সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক পিতামাতাকে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সাবধান, সতর্ক, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর পরায়ণ হইতে হইবে। তাঁহাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর সন্তানের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নির্ভর করিতেছে একথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে এত কথা বলিতে হইল। বালকের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হইবার পূর্ব্ব হইতেই পিতামাতাকে সুস্থ, সবল ও পবিত্র দেহ ও শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। এই হইল বালকরক্ষার মূলস্বরূপ, এবং এইজন্য এই বিষয়টি এত দীর্ঘ ভাবে বলা হইল। সম্পাদক মহাশয় কৃপা করিলে আবার ইহার পরের কি কি কর্ত্তব্য যথাজ্ঞান বলিবার চেষ্টা করিব। সন্তান গর্ভে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই পিতামাতাকে সত্য, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। তজ্জন্য যথাসাধ্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারনার সাধনা করিতে হইবে ও সদ্‌গুরুর আদেশানুসারে জপপরায়ণ হইতে হইবে। কাতর হইয়া জগতের দুঃখ ও বিপদের দুঃখ বিমোচনের জন্য শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, যখন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি হইবে—তখনই আমি মানব দেহে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশও ধর্ম্মের পরিত্রাণ করিব। তাঁহার সৃষ্টিরক্ষা—তাঁহাকেই করিতে হইবে ও ধর্ম্মরক্ষা না করিলে সৃষ্টি থাকিবে না। কিন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া জানাইতে হইবে যে—"প্রভু তোমার শ্রীমুখের বাণী স্মরণ কর, আর আমাদের দুঃখ সহ্য হয় না,—এস—এস - অবতীর্ণ হও।" পূর্ব্বে ধরাদেবী কান্দিয়া শ্রীভগবানের কাছে গিয়া নিজ দুঃখ জানাইতেন, আমরাও ধরাবাসী সকলে আজ তাঁহাকে জানাই—ভগবান, এস - এস—তোমার সৃষ্টি যায়—আমাদের দুঃখ আর সহ্য হয় না, রক্ষা কর।" দশরথ-কৌশল্যা অপুত্রক হেতু পরশুরামের অত্যাচারের জন্য কান্দিয়া শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে ডাকিয়াছিলেন এবং সেই ডাকার সাহায্যার্থে বলী—বশিষ্ঠকে ডাকিয়াছিলেন। তিনিও দশরথকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞানহীন জিতেন্দ্রিয় মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে ডাকিয়া—যজ্ঞ করিয়া—তবে সর্ব্বগুণাধার শ্রীভগবান শ্রীরামকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। দেবকী-বসুদেব কংসের অত্যাচারে সকল লোককে কাতর ও বিষণ্ন দেখিয়া ও নিজে কঠোর কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া একমনে

প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি ছয়টি পুত্র কংস কর্ত্তৃক হত হওয়ায় পুত্রশোকে কাতর হইয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়া ছিলেন। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের অবস্থায় কাম ছিল না, তাঁহাদের আহ্বানে কামনা ছিল বটে, কিন্তু তাহা দমিত, শমিত কাম বা জিতকাম, সে কাম কেবল শ্রীভগবানের দিকে প্রযুক্ত কাম, সে কাম তখন ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের ও এই দুর্দ্দিনে জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য—সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সামঞ্জস্য করিবার জন্য সেই কামকে দমন করিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে। সেই কামকে দমন করিতে হইলে মায়াকে আগে দমন করিতে হইবে; কারণ কামের মূল মায়া। আবার মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

যেমন মৎস্য ধীবরের জাল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ধীবরের পদদ্বয়ের কাছে কাছে থাকিলে তাহার জাল-বিস্তৃতি হইতে রক্ষা পায়, আমরাও সেইরূপ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণ লইলে তাঁহার দৈবী স্বত্ব-রজ-তম ত্রিগুণময়ী দৃঢ় মায়ারজ্জুর বন্ধন হইতে রক্ষা পাইব। তাহা হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িলে কিন্তু চলিবে না, যেমন মা দেবকী অনবরত পুত্র শোকের মধ্যে শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, তেমনি কাম দমনের প্রধান উপায় মৃত্যুচিন্তা অর্থাৎ আমাকে মরিতে হইবে অন্যের মৃত্যু বিকার হইয়াছে—তাহা ভাবিয়া মনকে কাঁদাইয়া শুদ্ধ করিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে তবেই কাম দমন হইবে।—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা
জহিশত্রু মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্

আমাদিগকে মহাবাহু অর্থাৎ বলশালী অর্জ্জুনের মত সুধীর ধীর হইতে হইবে। শরীরে বল না হইলে কামরিপুকে জয় করা চলিবে না, সেই জন্য সাত্বিক আহার ও ব্যায়াম দ্বারা সুস্থ ও সবল হইতে হইবে। আসন ও প্রাণায়ামের মত শরীরের বায়ু ও মন স্থির করা ভিন্ন আর কোন ব্যায়াম নাই। তাহার পূর্ব্বে কিছু যম নিয়ম ও নাড়ীশুদ্ধি শিক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর মনকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরে যাইতে না দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া অনুলোম গতিতে ভিতরে অর্থাৎ নিজের স্থানে আনিয়া তথা হইতে বুদ্ধিতে লইয়া গিয়া, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া তথায় লয় করিবে অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া সেই দুর্ণিবার শত্রু কামকে দমন করিতে হইবে। আত্মাকে জানিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, তাহার জন্য বল সঞ্চয় আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণ না করিলে উহা হয় না। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারিলে কামকে জয় করিতে পারা যাইবে, নতুবা নয়। ফলে এই ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারিলে তবে শ্রীভগবানকে ডাকিলে তাঁহাকে বা মা পার্ব্বতীকে কন্যারূপে ডাকিলে তাহাতে যদি তাঁহাদিগকে না পাইতে পারা যায় তাহা হইলেও তত্তুল্য পুত্র বা কন্যা লাভ করিয়া বংশরক্ষা ও অনন্তকীর্ত্তি যুক্ত হইতে। দিলীপরাজা কেন বংশস্তকর্ত্তারমনন্তকীর্ত্তিম্—তনয় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, এইবার বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্ম না আসিলে শ্রীভগবান আসেন না। শ্রীভগবানের আসার পূর্ব্বে হইতে দেবতাগণের আসা আবশ্যক। আমরা যদি যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি

স্বচয়ঃ পারা যাইবে ভাবিয়া যদি দেবতা না হই, —তবে দেবতারা কেন আসিবেন? আর দেবতারা না আসিলে শ্রীভগবানও আসিবেন না। মা জগদম্বাকে ডাকিতে হইলে তবে তিনি "উমন্নারমক্ সার্দ্ধন্" আসিবেন। যুধিষ্ঠিররূপে ধর্ম্ম, ভীমসেনরূপে মহাবল পবন, পার্থরূপে ইন্দ্রের গুণসমষ্টি, নকুলসহদেবরূপে চিকিৎসক ও দৈবজ্ঞ এক ইন্দ্রের এই পঞ্চ অংশ ও ভক্তিমতি শচীই যাজ্ঞসেনীরূপে আসিয়া তবে সেই ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তিরজ্জুতে বান্ধিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্ম,বল, রূপ ও গুণের সমন্বয়,—জ্ঞান ও ভক্তি না আসিলে শ্রীভগবান আসিবেন কেন? যাহা হউক তিনি আর না আসিলে চলিবে না। কংসের আদেশানুসারে নিয়োজিত পূতনা প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ তিনিই করিয়াছিলেন, আবার তিনি আসিয়া আমাদের বালকগণকে অকালমৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় বি, এল, উকীল

যক্ষ্মা রোগ ও তাহার চিকিৎসা।

—:*:—

(লক্ষণ।)

রোগ—কঠিন! রোগের চিকিৎসা কঠিন! রোগ হইতে মুক্তি লাভ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন! রোগের এই ভীষণত্ব দেখিয়া সাধারণেরই ধারণা হইয়া গিয়াছে—যক্ষ্মারোগ হইলে মানুষের আর পরিত্রাণ নাই, এ রোগ শিবের অসাধ্য। কিন্তু লোকের মনে এরূপ ভ্রান্তধারণা থাকা ভাল নহে। প্রথম হইতে যত্ন লইতে পারিলে —ক্ষয় রোগ নিশ্চয় ভাল হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা এই,—প্রথম হইতে রোগটাকে ধরা বড় শক্ত কথা। কেননা আদি অবস্থায় রোগীর দেহে রোগের প্রধান লক্ষণগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগী হয়ত চিকিৎসককে তাহার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা দৌর্ব্বল্যের কথা মাত্র জানায়, কেহবা দুই একবার শুষ্ক কাসির অস্তিত্ব স্বীকার করে। চিকিৎসক অজীর্ণের লক্ষণ বুঝিয়া হজমশক্তি বাড়াইবার ঔষধ দেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত তাহার দেহে যক্ষ্মারোগের বহু উপসর্গ আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন তাহার বক্ষঃপ্রদেশ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক দেখেন —রোগ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে! এতদিন যক্ষ্মা রোগকে অজীর্ণ মনে করিয়া তিনি বৃথা চিকিৎসা করিয়াছেন!

যাহাতে আদি অবস্থায় যক্ষ্মারোগ ধরিতে পারা যায়, এ প্রবন্ধে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যক্ষ্মা রোগের প্রধান লক্ষণ চারিটী ; যথা,—

১। কাসি,

২। শরীর কৃশ হওয়া,

৩। রক্ত ওঠা,

৪র্থ। জ্বর।

কাসি।—প্রথমাবস্থায় কাসি অতি সামান্য থাকে। কখনও বা প্রাতে কখনও বা রাত্রে একটু কষ্ট দেয় মাত্র। দিনে কাসি

প্রায়ই থাকে না। কফ প্রায়ই নির্গত হয় না, যদি হয়—তবে চট্‌চটে ও হরিদ্রাভ। কিন্তু যেদিন আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে, সেদিন কাসি কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে, কফে বিশেষ কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

শরীর কৃশ হওয়া।—অনেক রোগেই শরীর কৃশ হইয়া থাকে, অজীর্ণে প্রায়ই শরীর কৃশ হয়। কিন্তু যক্ষ্মারোগে শরীর উত্তরোত্তর কৃশ হইয়া পড়ে। অন্যরোগে এমন দৈনন্দিন কৃশতা পরিলক্ষিত হয় না।

রক্ত ওঠা।—আদি অবস্থায় প্রায়ই রক্ত ওঠেনা। রোগ যখন বদ্ধমূল হইয়াছে—ফুস্‌ফুস্ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে—সেই সময় ইহা দেখা দেয়। তবে কাহারো কাহারো প্রথমেই রক্ত উঠিতে থাকে। যে রক্ত বাহির হয়, তাহার পরিমাণ অল্প। ফুস্‌ফুস্ পরীক্ষা করিলে কেবল Moiscrales, পাওয়া যায়—রক্ত নির্গমনের স্থান ঠিক করিতে পারা যায় না। এই রক্ত—সূক্ষ্মশিরা হইতে বাহির হইয়া থাকে। সুতরাং অধিক বা মারাত্মক হইবার আশঙ্কা নাই।

জ্বর।—প্রায়ই থাকে। কখনও নাও থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি লক্ষণের সহিত যদি এই জ্বর বর্ত্তমান থাকে, তবে রোগকে যক্ষ্মা বলিয়া অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়। প্রথমে এই জ্বর সামান্য ভাবেই দেখা দেয়। বৈকালে একটু হয়, রাত্রে ছাড়িয়া যায়। সকালে কিছুই থাকে না। এরূপ জ্বরকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তখনি সন্দেহ করা উচিত।

এইরূপে ধীরে ধীরে—এই মহারোগের সূত্রপাত হয়। তাহার পর ব্যাধি যেমন প্রবল হইতে থাকে, লক্ষণগুলিও তত স্পষ্টতর হইতে থাকে। এই জন্য চিকিৎসকগণ—এই রোগকে তিনস্তরে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম স্তর—টিউবারকুল অধিষ্ঠান।

দ্বিতীয় স্তর—Consolidation.

তৃতীয় স্তর—ফুসফুসাংশ কোমল ও গলিত হওন।

প্রথম স্তর।—টিউবার্ক্ল ফুস্‌ফুসের একাংশ আক্রমণ করে। ইহা ভিতরের ব্যাপার। বাহিরের লক্ষণ—বক্ষঃস্থলের সম্মুখ ভাগ কিছু চেপ্টা বলিয়া বোধ হইবে। অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে শব্দ অপেক্ষাকৃত কম মনে হইবে। রোগীর নিশ্বাস মৃদু এবং প্রশ্বাস অধিকক্ষণ স্থায়ী (Prolonged) হইবে।

দ্বিতীয় স্তরে।—ফুস্‌ফুসের আক্রান্ত স্থান ঘন হইয়া আসে—ইহা প্রায় ফুস্‌ফুসের (apex) শীর্ষদেশে ক্লাভিকেলের নীচে হইয়া থাকে। বাহির হইলে দেখা যায়—নিশ্বাস লইবার সময় রোগীর বক্ষঃস্থল সমান ভাবে স্ফীত হইতেছে না, একদিক চেপ্টা হইতেছে। রোগী স্থানীয় বেদনা অনুভব করিতেছে। অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে dulness অর্থাৎ স্পষ্ট কম আওয়াজ পাওয়া যায়। যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে নিশ্বাসের শব্দ রক্ষণ ও ফুৎকারবৎ (belowing) বোধ হয়, এবং রোগী শব্দ করিলে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। ২।১টী রাল্‌স পাওয়া যায়, কখনওবা ফুস্ ফুস্ বেষ্টক অর্থাৎ প্লুরায় ঘর্ষণ অনুভূতি হয়।

তৃতীয় স্তরে।—ফুস্‌ফুস্ নরম ও গলিত হয়, তাহাতে কোটর (cavity) উৎপন্ন হয়। ইহা তরল হইয়া কাসির সঙ্গে নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ (ক) নিশ্বাস ফেলিবার সময় কট্‌কট্ শব্দ (cruck sing sound) পাওয়া যায়। চট্‌চটে শ্লেষ্মার মধ্য দিয়া বায়ুর গতি হয় বলিয়াই

ঐরূপ শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। (খ) ময়েষ্ট রাল। (গ) কষ্টদায়ক কাসি। (ঘ) উত্তরোত্তর শরীর শীর্ণ হয়। (ঙ) উদরাময় দেখা দেয়। (চ) অঙ্গুলীর দ্বারা বক্ষে আঘাত করিলে crucked pol চিনা মাটীর পেয়ালার মত শব্দ হইতে থাকে।

প্রথম স্তরে।—শ্লেষ্মার সহিত টিউবার কুল্ বেসিলাস্ (ক্ষয় বীজাণু) প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

ব্রঙ্কোনিমোনিয়ার সহিত যক্ষ্মারোগের ভুল হইতে পারে। কেবল প্রভেদ এই—ব্রঙ্কো নিমোনিয়া প্রায় ফুস্ফুসের এপেক্সে হয় না। কিন্তু যদি gumma হয়, তবে ধরা বড় শক্ত। গামা হইলে—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বিকৃত শব্দ থাকে না। অধিকন্তু বেদনা থাকে না, রালস্ থাকে না, কাসি থাকে না, জরও থাকে না। রোগী কৃশ হইয়াও পড়ে না। কিন্তু তথাপি গামা নির্ণয় করা বড় কঠিন।

চিকিৎসা।

পরিপাক শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল শব্দে—অন্ততঃ ২।৩ বৎসর বুঝিতে হইবে। রোগীর অবস্থা যখন প্রথম স্তরে থাকে, তখন হইতে সাবধানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইলে রোগ নিশ্চয়ই ভাল হয়। দ্বিতীয় স্তরের অবস্থাতেও—যত্ন লইতে পারিলে রোগী ভাল হইতে পারে। কিন্তু রোগ তৃতীয়স্তরে পৌছিলে আর আরোগ্যের আশা থাকে না।

রোগীকে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। মন হইতে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর করিতে হইবে। বাটীর বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও অঙ্গ চালনা একান্ত প্রয়োজন। আহার—সহজ পাচ্য, যেন গুরুতর না হয়। শরীর আবৃত থাকিবে, তবে ফ্লানেল ব্যবহার করা এদেশে সহ্য হয় না, ইহার দ্বারা বহুস্থলে কুফল ফলিতে দেখা যায়।

চিকিৎসককে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে—রোগীর পরিপাক শক্তি যেন অব্যাহত থাকে। নতুবা ঔষধ প্রয়োগ বৃথা। কেননা, কড্ লিভার অয়েল বা মল্ট্ এক্সট্র্যাক্ট প্রভৃতি পুষ্টিকর ঔষধ—পরিপাক শক্তি না থাকিলে, দেওয়া চলে না।

জ্বর।

যক্ষ্মায় জর থাকেই। এই জর দুইটী কারণে হইয়া থাকে। (ক) ব্যাধি ক্রমে ক্রমে ফুস্ফুসের অধিক স্থান আক্রমণ করে। (খ) ফুস্ফুসের আক্রান্ত ভাগ নরম ও গলিত হওয়ায় তাহা রক্তের সহিত সঞ্চরণ করে।

যখন রোগের প্রবল (Acute) অবস্থা—তখন জর অবিচ্ছেদে অর্থাৎ রেমিটেণ্ট ভাবে থাকে, প্রাতঃকালে জরবেগ কিছু কম, অপরাহ্নে পুনর্বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ অল্প হইলে জরও সবিচ্ছেদ হইয়া থাকে; সকালে ছাড়ে, অপরাহ্নে কিছু বাড়ে। এই উভয় অবস্থার চিকিৎসাও স্বতন্ত্র।

ঘর্ম্ম।

রাত্রে ঘর্ম্ম—এ রোগের একটী উল্লেখ যোগ্য উপসর্গ। ইহাতে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রাত্রে শয়নকালে রোগীকে কিছু খাইতে দিলে, ঘাম কম হয়, রোগীও তত দুর্ব্বল হয় না। অন্য কিছু না খাওয়াইয়া একটু সুরুয়া খাওয়ান সব চেয়ে ভাল। ইহাতে

প্রবৃত্তি না হইলে—টাট্‌কা দুগ্ধ পান করা উচিত।

রক্ত উঠা।

যক্ষ্মারোগে সকল রোগীর রক্ত ওঠেনা, তবে অনেকেরই ওঠে। এইটা বড় আশঙ্কাজনক উপসর্গ। ইহাতে রোগীর আত্মীয়-স্বজন যেমন উদ্বিগ্ন হ'ন, রোগীও তেমনি ভীত হইয়া পড়ে। আত্মীয়গণ চিকিৎসককে—রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র ভাবে অনুরোধ করেন। চিকিৎসকও উহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ করা ভাল নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা ভূয়ো ভূয়ো করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। ডাক্তারী-বিজ্ঞানেও বলে—প্রথমেই রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আবশ্যক নাই। যদি রোগের প্রারম্ভেই রক্ত উঠিতে থাকে, তাহা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং কতকটা রক্ত উঠিয়া গেলে, রক্তাধিক্য বশতঃ স্থানীয় যে congestion ও tension হয়,—তাহা দূঢ় হয় এবং অপকারের পরিবর্ত্তে রোগীর যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক (natural) ক্রিয়া মাত্র। আমরা ব্রিষ্টার বসাইয়া, কবিরাজ মহাশয়েরা জোঁক লাগাইয়া—যে কাজ করি ও করেন, রক্ত ওঠার জন্য সে কাজ আপনাআপনিই হইয়া যায়। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—রক্ত ওঠার পর কিছুদিন রোগ আর বাড়ে না। কিন্তু যদি রক্ত ওঠার পরিমাণ বড় বেশী হয়,—সে রক্ত সত্বর বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, হয়ত বা তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। রোগের প্রবল অবস্থায় রক্ত উঠিলে—তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে—রোগীর ফুস্‌ফুসে কোটর (cavity) হইয়াছে এবং বৃহৎ urtery গুলি হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্র কুমার দে (ক্যাম্বেল হস্‌পিট্যালের ভূতপূর্ব্ব হাউস্‌ সার্জ্জন।)

শিশুর খাদ্য-বিচার।

—:*:—

প্রথম পক্ষের পত্নীর মৃত্যুর পর দুইটী অপোগণ্ড শিশুকে পালন করিবার জন্য আমাকে শিশুর খাদ্যের বিচার করিতে হইয়াছিল। সেই সময় যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। যাঁহারা আমার মত অবস্থায় পড়িয়া—শিশু পালনে বিব্রত, এ প্রবন্ধে হয় ত তাঁহাদের কিছু উপকার হইতে পারে।

"শিশু" বলিতে, জন্মাবধি ৬ মাস বয়সের—ছেলেই আমি বুঝি। এ হেন শিশুর শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিতে হইলে কিরূপে খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে—এ রহস্য সকলেরই

জানা উচিত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য" সম্বন্ধে—একটী উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার ভরসা হয় না, তিনি এ প্রবন্ধটী শেষ করিতে পারিবেন। অনেক কাগজেই তাঁহাকে জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটাই শেষ করিতে দেখি নাই। এ কথার একমাত্র প্রমাণ—এই 'আয়ুর্ব্বেদে' প্রকাশিত "জর" নামক প্রবন্ধ। এমন অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী—অসীম শক্তিধর ভাই আমার শেষ করিতে পারিলেন না। ইহা "আয়ুর্ব্বেদের" পাঠক বর্গের দুর্ভাগ্য। "আয়ুর্ব্বেদে' এমন সুন্দর প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত একটাও বাহির হয় নাই, বোধ হয় হইবেও না। "আমাদের দেশের খাদ্য" প্রবন্ধও শেষ হইবে না। এ বিষয়ে আমি ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারি।

যাহাহউক, "আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য" প্রবন্ধে প্রথমেই শিশু খাদ্যের বিচার করা উচিত ছিল। ব্রজবল্লভ তাহা করেন নাই। কাজেই প্রবন্ধটী "অঙ্গহীন" হইয়া পড়িয়াছে।

শিশুর—শিশু অবস্থাতে দৈহিক উত্তাপ রক্ষা করা—অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু কাজটা বড় শক্ত। আমি সেই কথাটাই বুঝাইব।

Caloric value ইংরাজী কথায় বাঙ্গালা প্রতিশব্দ—"তাপ বৰ্দ্ধ বা শক্তি।" এক Kilogrumme (=২ পাউণ্ড ¼ উন্স প্রায় এক সের) জলের ১ ডিগ্রী (সেণ্টিগ্রেড) উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে যে উষ্ণতার আবশ্যক হয়, তাহাকেই ১ caloric বা ১ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি বলে। ১গ্রাম চর্ব্বি হইতে ৯·৩ ভাগ তাপ বৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। 1 gıamme =154 gruirs, ১ গ্রাম carboly drate (তেজবৰ্দ্ধক শ্বেতসার) ও ১ গ্রাম Proteid (মাংস বৰ্দ্ধক) উভয় হইতেই ৪·১ তাপ বৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। যে জননী স্বাস্থ্যবতী, তাঁহার ১০০ গ্রাম স্তন দুগ্ধ হইতে ৬১ ভাগ; এবং ভগ্নস্বাস্থ্য মাতার দুগ্ধ হইতে ৩৬ ভাগ তাপবৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া গিয়া থাকে। আবার স্থূলাঙ্গী বিলাসিনীর স্তন দুগ্ধে ১০০ গ্রামে ৩০ ভাগ তাপবৰ্দ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। ইহাই সাধারণ হিসাব। এক্ষণে মানবী, ছাগী, গাভী ও গর্দ্দভীর দুগ্ধ তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

	বাজার দুগ্ধ	১০০ গ্রামে তাপবৰ্দ্ধক শক্তির অনুপাত	প্রটেড অংশ	শর্করা অংশ	বসার অংশ
মানবী	সুস্থা মাতার	৬১ —	১ —	৭ —	— ৪
	দুর্ব্বল মাতার	৩৬ —	২·৫ —	৪ —	— ২
	বিলাসিনীর	৯০ —	৩·৫ —	৭·৫ —	— ৫
	গাভীর—	৬৮ —	৩·৩ —	৪·৫ —	— ৩·৮৮
	ছাগীর—	৮০ —	৪ —	৫ —	— ৪·৮
	গৰ্দ্দভীর—	৫০ —	২ —	৬ —	— ১·৬

উল্লিখিত তালিকাটী দেখিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন ; গর্দ্দভীর দুগ্ধে বসার ভাগ অত্যন্ত কম, সুতরাং ঐ দুগ্ধ শিশুর খাদ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু যদি ঐ দুগ্ধের ১০০ গ্রামে ২ চা চামচ পূর্ণ মাখন সংযোগ করা যায়, তবে উহার তাপবর্দ্ধক শক্তি ৫৯ ভাগে দাঁড়ায়। তখন ঐ দুগ্ধ—সুস্থা জননীর স্তন্য দুগ্ধের সমান হইয়া থকে।

মাতৃহীন শিশুকে ফিডিং বোতলের সাহায্যে পালন করিয়া দেখিয়াছি ১০০ cubic centimetre (৩½ আউন্স খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে) ৪০ ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি না থাকিলে চলে না। এই হিসাবে মাসে মাসে কি পরিমাণ খাদ্যাংশ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহারও একটা তালিকা দিতেছি—

কোন মাসে	প্রোটিড গ্রাম	বসা গ্রাম	শর্করা গ্রাম	১০০ গ্রাম করা তাপ বর্দ্ধক শক্তি	নাইট্রোজেন ও নন নাইট্রোজেন উভয়ের অনুপাত
১ম	২·৩	৪·৫	৬·৬	৫০	১:৫
২য়	৩·১	৩·৬	৮·৩	৩০	১:৩৭
৩য়	২·৮	৩·৩	৯·৯	৩৩	১:৪৭
৪র্থ	৪·২	৪·৮	১১·৮	৪৪	১:৪
৭ম	৩·০	৫·৩	৭·৭	৩৩	১:৪·৩

এই দ্বিতীয় তালিকাটী বোধ হয় সাধারণের বোধগম্য হইবে না। সেইজন্য নিম্নে একটা মোটামুটি হিসাব দিলাম ;—

আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি গোদুগ্ধের চেয়ে স্তনদুগ্ধে শিশুর অধিক পোষণ হইয়া থাকে। প্রোটিডের কথা

কত বয়সে	কতবার খাওয়াইবে	প্রতিবারে কতখানি যাইবে গ্র্যাম্	প্রতিবারে কতখানি যাইবে ঔন্স	২৪ ঘণ্টায় খাদ্যে কতভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি
১ম সপ্তাহ	১০	৩০	১	১৮০
১ মাস	৯	৪৫	১½	২৪০
২য় „	৮	৮৫	৩	৪০০
৪র্থ „	৭	১২০	৪	৫০০
৬ষ্ঠ „	৬	১৭০	৬	৬০০

ধরা যাক্। গাভী দুগ্ধে প্রতিপালিত শিশু শরীরের মধ্যে বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। পারে না—অতিরিক্ত প্রোটিড্ ভোজনের জন্য। অতিরিক্ত মাত্রায় প্রোটিড্ ভোজনে উদরাময়, পেট্ কামড়ানি, এবং অন্ত্রে বায়ুর প্রকোপ উপস্থিত হইয়া থাকে। মাতৃ দুগ্ধ পানের দেড় ঘণ্টা পরে যে শিশুর পাকস্থলী শূন্য দেখা গিয়াছে, সেই শিশুরই পাকস্থলীতে ২॥০ ঘণ্টা পরেও গোদুগ্ধ পাওয়া গিয়াছে। মাতৃস্তন্যপায়ী বালকের মলে রিএক্সন (acid) অম্ল এবং গোদুগ্ধ পালিত বালকের বিষ্ঠায় রি অ্যাকসান ক্ষার (alkaline) থাকিবার কথা। কিন্তু গোদুগ্ধ পালিত বহু শিশুর বিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে—তাহা ক্ষার না হইয়া অম্ল হইয়াছে। অর্থাৎ সে সকল শিশুর উদরে —গোদুগ্ধ সম্পূর্ণ পরিপাক হয় নাই।

এইবার সর্কিয়া ষ্টার্চ্চের কথা ধরি। শতকরা ৭ ভাগের বেশী ষ্টার্চ্চ শিশুখাদ্যে থাকা ভাল নহে। থাকিলে বালক মোটা হইয়া পড়ে এবং অচিরেই rickes গ্রস্ত হয়। তাহার উদরাময় ও দেখা দেয়—মল অম্লযুক্ত, বর্ণ হরিৎ। fat এর অংশ বেশী হইলে উদরাময় অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ উদরাময়ের শিশুর মল কখনও কখনও সাবান গোলার মত, কখনও চর্ব্বী মিশ্রিতের ন্যায় হইয়া থাকে।

অনেক শিশুই সচরাচর গোদুগ্ধ পান করিয়া থাকে—বিশেষতঃ যে সকল শিশু উপযুক্ত মাত্রায় মাতৃস্তন্য পায় না। অনেকে বলেন—এইরূপ শিশুকে গোদুগ্ধ ৫০০ হইতে ৭০০ গ্রাম পর্য্যন্ত দেওয়া চলে। কিন্তু তাহাতে সম্যক তাপ রক্ষা হয় বটে, তথাপি তাহাতে এত বেশী প্রোটিড্ এবং এত কম দুগ্ধ শর্করা আছে যে, শিশুর পক্ষে তাহা ঠিক্ উপযোগী নহে।

এইজন্য অনেকে গোদুগ্ধকে কৃত্রিম উপায়ে স্তন দুগ্ধের মত করিবার উপদেশ দেন। কেন না, তাহা হইলে গোদুগ্ধ মাতৃস্তন্যের মত লঘুপাচ্য হইতে পারে। ইহা দুই উপায়ে হইতে পারে, (ক) গোদুগ্ধের নবনী উঠাইয়া লইয়া, এবং casein ফিলটার করিয়া তাহাতে দুগ্ধ শর্করা মিশান। (খ) নবনী ৫ ঔন্স, চূণের জল ১ ঔন্স, জল ১৪ ঔন্স, দুগ্ধশর্করা ১ ঔন্স। একত্রে মিশান। ইহাতে কৃত্রিম স্তনদুগ্ধ প্রস্তুত হয়।

সদ্যজাত, পীড়িত, দুর্ব্বল, এবং উদরাময় গ্রস্ত শিশুকে whey হোয়ে বা ছানার জল খাওয়ান খুব ভাল। হোয়ে খাওয়াইলে বার্লি খাওয়াইবার প্রয়োজন হয় না। আমি নিজের শিশুকে খাওয়াইবার জন্য—১ পাঁইট wheyতে ২—৪ গ্রেণ বাই কর্ব্বলেট অফ্ সোডা এবং ৩ ড্রাম দুগ্ধ শর্করা মিশাইয়া দেখিয়াছি—ইহাতে ঐ খাদ্যের ৪০ ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি জন্মিয়াছে।

জলমিশ্রিত দুগ্ধ। ১ ভাগ দুগ্ধে ১ ভাগ জল মিশাইলে তাহার তাপরক্ষণ শক্তি ৩৪ ভাগে দাঁড়ায়।

শিশুর পরিপাক শক্তি স্বভাবতঃই কম। এইজন্য উদরাময়গ্রস্ত বা দুর্ব্বল শিশুকে খাওয়াইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা—Predigested milk ব্যবস্থা করেন। আমি এইরূপ দুগ্ধের নাম দিয়াছি—কৃতজীর্ণ দুগ্ধ। নিম্নলিখিত নিয়মে এই কৃতজীর্ণ দুগ্ধ প্রস্তুত হয়—

(১) দুগ্ধ—২ ঔন্স, জল ২ ঔন্স, নবনীত ¼ ঔন্স, ফেরার চাইল্ডের মিল্ক পাউডার—১ চামচ। একত্র মিশাইয়া এই মিশ্রিত পদার্থ ১১৪ ফাঃ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া, ৫।৬ মিনিট

রাখিয়া, শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ইহার তাপ রক্ষণ শক্তি ৭৭ ভাগ।

(২) দুগ্ধ ১ পাঁইট, লইকর প্যান ক্রিয়েটিস ১ ড্রাম, সোডি বাই কার্ব ২০ গ্রেণ। প্রথমে দুগ্ধকে ৪ চামচ চূণের জল মিশাইয়া ১৪০ ফাঃ পর্য্যন্ত উত্তাপ দাও, পরে প্যান ক্রিয়াটিস্ সোডা তাহাতে মিশাইয়া সাধারণ উত্তাপে ৩ ঘণ্টা রাখ। এইরূপে এই দুগ্ধ—শিশু খাদ্যের উপযোগী হইবে। কিন্তু যখনই খাওয়াইবে, গরম করিয়া লইবে।

(৩) ২ ঔন্স টাট্‌কা কাঁচা দুগ্ধ একটী শিশির মধ্যে পূরিয়া, তাহাতে ফেরার চাইল্ডের মিল্ক পাউডার ১ ড্রাম দিয়া, শিশিটী ২০ মিনিট গরম জলে রাখ। পরে এই দুগ্ধ শিশুকে খাওয়াও। খাওয়াইবার পূর্ব্বে নিজে চাখিয়া দেখিবে, তিক্তাস্বাদ হইয়াছে কি না? যদি তিক্ত হইয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ ঐ শিশিটী বরফ জলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইবে। ইহাতে তিক্ততা দূর হয়। Fair child's Peptonising powder এ প্যান্‌ক্রিয়েসন, সোডি বাই কার্ব, এবং মিল্ক সুগার আছে।

বিলাতে এবং এদেশে আজকাল কন্‌ডেন্স মিল্ক বা জমান দুগ্ধ শিশুখাদ্য রূপে ব্যবহার হইতেছে। এদেশের শিশুর পক্ষে জমান দুগ্ধ উপযোগী নহে। কারণ জমান দুগ্ধে—নবনীর ভাগ কম, এবং শর্করার ভাগ বড় বেশী। জমান দুগ্ধ খাইলে কোন কোন শিশু হৃষ্টপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে পুষ্টতা অন্তঃসার শূন্য। বিলাতে জমাট দুগ্ধসেবী শিশুরা পূর্ব্বেই rickets গ্রস্ত হয়, আমাদের দেশের শিশুরা পেট রোগা হয়। বিশেষতঃ জমানদুগ্ধ বিক্রয়কারীরা ১ ভাগ দুগ্ধে ৭ ভাগ জল মিশাইতে বলেন—ইহা সমীচীন বোধ হয় না। অন্ততঃ ২৪ ভাগ জল মিশাইলে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ নবনীত সংযোগ করিতে পারিলে—উপরে উত্তাপ রক্ষণ শক্তি ৫৩ ভাগে দাঁড়ায়।

দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুকে শ্বেতসারময় খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। তবে যদি নিতান্তই দিতে হয়, তাহা হইলে কোন ঔষধ পদার্থ দ্বারা ঐ শ্বেতসারকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

কতকগুলি দুগ্ধবহুল শিশুখাদ্য।—

অ্যানেনকরিজ ফুড্। নং ১। ৪ মাসের শিশুকে খাওয়ান চলে। তাহার অধিক বয়স হইলে এই খাদ্যের ২নং ব্যবহার্য্য। এই ফুড প্রস্তুতকারীদের মতে—এই খাদ্যে ৬৮ ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি আছে, কিন্তু যদি এই ফুড পূর্ণ ১ টেবিল চামচ না লইয়া, ½ চামচ লইয়া ৩ ঔন্স জল ও ২ চামচ নবনী মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে ৬০ ভাগ তাপরক্ষণ শক্তি জন্মে এবং ইহা মাতৃস্তন্যের অনেকটা সমকক্ষ হইতে পারে। ২ নং এই খাদ্যের তাপরক্ষণ শক্তি—৮৬ ভাগ।

হর্লিকস্ মলটেড্ মিল্ক। তাপরক্ষণ শক্তি ৪২ ভাগ। যদি ইহাতে ১ টেবিল চামচে নবনী মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তাপরক্ষণ শক্তি ৬০ ভাগ জন্মে।

মেলিন্স ফুড। ৩ মাসের কম বয়সের শিশুর খাদ্যে ৪৫ ভাগ এবং তদূর্দ্ধ বয়সের খাদ্যে ৭০ ভাগ তাপরক্ষণ শক্তি আছে।

বেঞ্জার্স ফুড। তাপরক্ষণ শক্তি ৫৬ ভাগ। ½ কাঁচ্চা নবনী মিশাইলে তাপরক্ষণ শক্তি ৬৫ ভাগ হয়।

শিশুদের বড় বড় বিলাতী খাদ্যের কথা লিখিলাম। দুঃখের বিষয়—আমাদের দেশের একটা খাদ্যেরও নাম করিতে পারিলাম না। এদেশে ত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, ডাক্তার

আছেন, কবিরাজ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি একটা শিশুখাদ্য আবিষ্কার করিতে পারেন না? বিলাতী খাদ্য যে সকল সময় আমাদের শিশুদের উপযোগী হয় না,—একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। অথচ এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে—শিশুর জন্য একটা খাদ্য প্রস্তুত হইল না। ইহার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর আছে কি?

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম্ এ,

মানব জন্মের কথা।

—:*:—

অনন্তর গর্ভের জীবনোপায়ের নিয়ম কথিত হইয়াছে।

গর্ভিণী স্ত্রীর বাহিনা নারী, গর্ভস্থ সন্তানের নাভি নারীর সহিত সংঘর্ষ থাকে বলিয়া নিয়ত গর্ভধারিণীর আহারাদির দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বর্দ্ধিত হয়। মাতার নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা-প্রকৃতি অনুসারে গর্ভস্থ সন্তান নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গর্ভিণীর নিশ্বাসাদি যখন যে ক্রিয়া করে, সন্তানও গর্ভে থাকিয়া তৎতৎকালে সেই সেই ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়।

গর্ভস্থ সন্তানের নাভিমণ্ডল তেজের আবাস ভূমি, তদ্বারা বায়ুচালিত হয়, এই নিমিত্ত গর্ভস্থ শিশুর দেহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং উক্ত বায়ু—উষ্মার সহযোগে শরীরের উর্দ্ধ তির্য্যক ও অধোভাগে এবং স্রোতাদির যে যে স্থানে প্রসারিত হয়—গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই স্থান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকারের নাভি হইতে দৈহিক যাবতীয় স্রোত (Avarta and artary) সমূহ প্রস্তুত আরম্ভ হওয়া প্রযুক্ত নাভি হইতেই মানব দেহে রক্তসঞ্চালন কার্য্য যাবজ্জীবন চলিয়া থাকে। এই নিমিত্তই নাভিকে দেহস্থ যাবতীয় শিরা ও ধমনীর মূল স্থান বলা হইয়াছে।

মানবগণের দৃষ্টি (নেত্রমণি) ও রোমকূপ কখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উহারা নিশ্চিত একভাবেই থাকে—ইহাই ভগবান ধন্বন্তরির অভিমত।

মনুষ্যের শরীর ক্ষীণতর হইলেও নখ ও চুল এতদুভয় বস্তু প্রাকৃতিক স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মন ও দেহ চেতনার আশ্রয়। কেশ, রোম, নখাগ্র অন্তরস্থ মল ও দ্রব্যগুণ ইহারা অচেতন।*

গর্ভস্থ সন্তানের পুরীষ ও মূত্র উৎসর্গ না হওয়ার কারণ এই যে, বায়ুর অল্পতা এবং পাকাশয়গত বস্তুর অত্যল্পযোগ হেতু উহা হইতে পারে না। অতঃপর গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু কর্ত্তৃক আবৃত এবং কণ্ঠদেশ কফ পূর্ণ থাকে—এজন্য বায়ুর পথ প্রতিরোধ হেতু গর্ভস্থ শিশু রোদনাদি করিতে পারে না।

* আধুনিক পাশ্চাত্য মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বসু যে সমুদয় পদার্থেরই জীবন থাকা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা মৃতদেহেরও জীবন থাকার ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। —লেখক।

গর্ভধারণের দিবস হইতে গর্ভিণী হৃষ্টচিত্ত, শোভন অলঙ্কার সমূহে ভূষিতা ও সদাচারী হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করতঃ গুরু এবং ব্রাহ্মণগণের পূজানিরত থাকিবেন এবং প্রত্যহ সুমধুর রসযুক্ত স্নিগ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, তরল, লঘু, ও অগ্নিদীপ্তিকারক আহার্য্যসামগ্রী ভোজন তৎপর হইবেন। তৎকালে ব্যায়াম, উপবাস মৈথুন, অতিশয় সন্তর্পণ ক্রিয়া, রাত্রি জাগরণ শোক, অশ্বাদিযানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, মল ও মূত্রাদির বেগধারণ এবং বিপর্য্যস্ত ভাবে অবস্থান এই সমুদয় গর্ভিণী স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করিবেন। কারণ দোষ কিম্বা অভিঘাতজনিত যে যে অংশ গর্ভিণীর শরীরে পীড়িত হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই অংশ পীড়িত হইয়া থাকে।

মলিনবেশবিশিষ্টা,—বিকটাকৃতিযুক্তা কিম্বা অঙ্গহীনা, এবম্ভূতা কোন স্ত্রীকে গর্ভবতী নারী কদাচ স্পর্শ করিবেন না। এবং দুর্গন্ধ গ্রহণ কিম্বা অপ্রিয় ভোজন প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। কলহ বা পরনিন্দাদি ও গৃহের বহির্দ্দেশে গমনাগমন বা জনশূন্য গৃহাদিতে গমন এবং ক্রোধ প্রভৃতি কার্য্য গর্ভিণীগণ মনোযোগ সহকারে পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভিণী স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবেন না,—কেননা তদ্দ্বারা গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং অত্যন্ত তৈল মর্দ্দন বা অধিক উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন বা ঘর্ষণ কদাচ করিবেন না। কঠিন শয্যাতে কিম্বা অত্যন্ত উচ্চ স্থানে শয়ন বা অবস্থান করিবেন না; গর্ভিণী অতি যত্ন সহকারে উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালম করিবেন। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিরোগ দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিমান, বলিষ্ট, সুন্দর এবং মেধাবী সুসন্তান লাভ করিতে পারিবেন।

সূতিকা গৃহ কিরূপ করা উচিত ?

—দার্ঘে আট হাত প্রস্থে চারিহাত এবং পূর্ব্বদ্বার বা উত্তর দ্বার বিশিষ্ট করিয়া সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। এতদ্দেশে নিতান্ত সেঁতসেঁতে স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন একটিমাত্র ক্ষুদ্রতম দ্বার বিশিষ্ট যে সূতিকা গৃহনির্ম্মাণের প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা অতীব অনিষ্টকর। কারণ তদ্রূপ ক্ষুদ্র গৃহে বায়ু সঞ্চালিত হইতে না পারায় মেঝেটি সমধিক আদ্র অবস্থা যুক্ত হয় বলিয়া প্রসূতি ও নবজাত শিশুর অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি হইতে পারে, অনেক সময় এতাদৃশ অবস্থায়* সূতিকা গৃহেই শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কার, ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্লেষ্মাঘটিত রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

এক্ষণে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর লক্ষণ বলা হইতেছে। যখন গর্ভবতীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন বিমুক্ত হয় এবং নিতম্বের সম্মুখভাগে বেদনা উপস্থিত হয়, মুহুর্মুহুঃ কটি ও পৃষ্টদেশে তীব্রতর বেদনা হয়, মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হয়, তখনি তাহাকে আসন্ন প্রসবা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝিতে পারিলেই গর্ভিণীর গাত্রে তৈল মর্দ্দন করাইয়া উষ্ণ জলদ্বারা স্নান করাইতে হয়। এই সময় সুশিক্ষিতা প্রসবকারিণী অভিজ্ঞ ধাত্রী ও চারিজন পরিচারিকার আবশ্যক। ঐ চারিজন পরিচারিকার মধ্যে এক জন গর্ভিণীর প্রসব দ্বারের চারিদিকে তৈল মর্দ্দন করিয়া মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিবে। এই সময় যখন ভগবানের প্রাকৃতিক বিধানানুসারে মলমূত্র বেগের ন্যায় আপনা আপনি প্রসবের বেগ উপস্থিত হইবে, তখন সেই পরিচারিকা সুমিষ্ট কথায় গর্ভিণীকে বলিবে "হে সৌভাগ্যবতী, এক্ষণে কুন্থন কর।" অনন্তর তদ্রূপ প্রাকৃতিক বেগ প্রাপ্তা গর্ভিণী সাধ্যমত কুন্থন করিতে থাকিবে। কিন্তু স্বাভাবিক

বেগ না আসিলে অথবা বেগ আসিয়া নিবৃত্ত হইয়া গেলে কদাচ কুন্থন করিবে না। প্রথমতঃ অল্প অল্প—তৎপরে যেমন বেগ আসে তাদৃশ অধিক বলের সহিত কুন্থন করিতে থাকিবে। সন্তান-যোনির দ্বারদেশ প্রাপ্ত হইলে যে পর্য্যন্ত জরায়ু হইতে শিশু ভূমিষ্ঠ না হইবে, তাবৎকাল স্বকীয় শক্তি অনুসারে গাঢ়তর কুন্থন করিতে থাকিবে।

ফলতঃ স্বাভাবিক বেদনার সহিত বেগ উপস্থিত না হইলে কদাচ কুন্থন করিবে না। ধাত্রী যদি ভ্রম বশতঃ গর্ভিণীকে অকালে কুন্থন করিতে অনুরোধ করে, তাহা কথনই প্রতি পালনীয় হইবে না। প্রসব বেদনা ঠিক না হইতে কুন্থন করিলে, শিশু মূক, বধির, কুব্জ, শ্বাশ, কাশ রোগযুক্ত এবং শিথিল দেহ যুক্ত হয়। তজ্জন্য কুন্থন বিষয়ে সদুপদেশ সমূহ যত্নসহকারে প্রতি পালনীয়।

অনন্তর বালকের জন্ম হইলে বালক এবং গর্ভিণীকে যথোপযুক্ত বিধানে সুস্থ করিয়া যথা বিধি স্ত্রীআচার এবং কুলাচার যাহা যাহা পূর্ব্ব কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তৎসমূদয় নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

উক্ত প্রকার কার্য্য সকল অবগত থাকা গৃহস্থ মাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। অধুনা তাহা অজ্ঞাত থাকার জন্যই অনেক গর্ভিণীকে বিপন্না হইয়া ডাক্তার প্রভৃতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হয়।

ডাঃ শ্রীনলিনীমাথ মজুমদার।

বনৌষধি।

—:*:—

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বনৌষধির বিষয়ে আলোচনা করিব। আমাদিগের সাংসারিক ব্যয় মধ্যে ডাক্তার বৈদ্যের খরচ একটা প্রধান খরচের মধ্যে ধর্ত্তাব্য।

নিত্যই আমাদিগের গৃহে রোগ বর্ত্তমান, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই রোগ ক্লিষ্ট। একটু অসুস্থ হইলেই চিকিৎসকের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু আমাদিগের গৃহ প্রাঙ্গনে, বাড়ীর বাগানে—নানাস্থানে যে অযত্নে রক্ষিত কত শত প্রকার রোগনাশক ঔষধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার গুণ গ্রহণ করিতে আমরা অবসর পাই না, চেষ্টাও করি না, আমাদিগের প্রবৃত্তিও হয় না।

পরন্তু প্রকৃতি দেবী—বিনামূল্যে যে সমস্ত বনৌষধি আমাদিগের জন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন—আমাদিগের অজ্ঞানতা নিবন্ধন সেই সমস্ত ঔষধি রূপান্তরিত ভাবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ক্রয় করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি। উদাহরণ স্থলে দেখাইব—যে বাসক পত্র নানা স্থানে এমন কি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, যাহার স্বরস পান করিলে সামান্য কাসি হইতে দুঃসাধ্য ক্ষয়কাসিও আরোগ্য হইতে পারে—যাহা সংগ্রহ করিতে একটী পয়সা মাত্র ব্যয় নাই, যাহার টাট্কা রস বিশেষ ফলপ্রদ,—সেই বাসক রস ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন নামে রূপান্তরিত হইয়া পর্য্যুসিত ভাবে একখানি

চক্‌চকে লেবেল আঁটা শিশিতে সুসজ্জিত হইয়া আমাদিগের হস্তগত হইতেছে! আর আমরা হাসিমুখে তাহাই গ্রহণ করিতেছি।

যাহা হউক আমরা এই বনৌষধি প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে বহুবিধ বনৌষধির রোগ নিবারণ শক্তি প্রকাশ করিব, পল্লীবাসী গৃহস্থ পরিবার বর্গের ইহা দ্বারা যে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ যাহার দৃষ্টাও দেখাইলাম তাহারই শক্তি বর্ণনা করিব।

বাসক।—সামান্য কাসি, ক্ষয়কাসি শ্বাসকাসি ও রক্তপিত্ত রোগে বাসক একটী মহৌষধি, আয়ুর্ব্বেদে বাসক সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

যথা—

"বাসায়াং বিদ্যমানায়াং,
আশায়াং জীবিতস্য চ
রক্ত-পিত্তী ক্ষয়ী কাসী
কিমর্থ মবসীদতি ?"

বাসক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় কাসি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেন অবসাদ প্রাপ্ত হয় ?

উক্ত শ্লোকে বাসকের যেরূপ শক্তি উল্লেখ করা হইল, তাহাতে বাসক যে উক্ত ব্যাধি সমূহের একটী মহৌষধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাসক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং পাচন, কল্ক, অরিষ্ট, অবলেহ প্রভৃতি রূপেও ব্যবহার্য্য। যাহারা পুরাতন কাসি. হাঁপ কাসি ও ক্ষয়কাসিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ ছটাক বাসকের টাট্‌কা রস—রসের অর্দ্ধ পরিমাণ বিশুদ্ধ মধু ও কিঞ্চিত ইক্ষুচিনী সংমিশ্রণে সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অন্ততঃ রীতিমত একমাস পর্য্যন্ত সেবন করিতে হইবে।

বাসকের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও শাখা সমস্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাসক পুষ্পের মধু কাসি রোগে বিশেষ উপকারী,—বাসক বনে—কোন কোন সময়—এই মধুচক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ মধু চক্রের আয়তন ক্ষুদ্র, এই হেতু মধুও অল্প প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাসক যে কেবল রক্ত পিত্ত ও ক্ষয়কাসির মহৌষধ তাহা নহে—

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে বাসক।—বাসক পত্রের অর্দ্ধ ছটাক পরিমিত স্বরস শর্করা ও মধু সংযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জর উপশম হইয়া থাকে।

জীর্ণ জ্বরে বাসক।—বাসক কাথে যথারীতি ঘৃত পক্ক করিয়া তাহা পান করিলে বহুকালের জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠে বাসক।—কচি বাসক পত্র গো মূত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠে লেপন করিলে কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হইয়া থাকে।

বিচর্চ্চিকায় বাসক।—বিচর্চ্চিকা রোগে বাসক পত্র বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিলে সপ্ত দিবসের মধ্যে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

সুখ প্রসবে বাসক।—বাসকমূল কটিদেশে সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া দিলে এবং ঐ পত্র পেষণ করিয়া বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে অনতিবিলম্বে সুপ্রসব হইয়া থাকে।

অর্শ-রোগে বাসক।—কফজ অর্শের বলিতে বাসক পত্র কুচি কুচি করিয়া তাহা পোট্‌লী বদ্ধকরতঃ কাষ্ঠ-অগ্নি-সন্তাপে উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে অর্শের উপশম হইয়া থাকে।

বসন্ত রোগে বাসক।—বাসকের স্বরস মধুর সংযোগে কফ প্রধান বসন্ত রোগে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শ্বাস রোগে বাসক।—বাসকের শাখা পত্র শুষ্ক করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে কাটিয়া লইবে, এবং হরীতকী সমভাগ গ্রহণ করত কলিকাতে সাজিয়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা শুষ্ক হুঁকায় তামাকের ন্যায় টানিয়া ধূম অধকঃরণ করিলে শ্বাস কাসে বিশেষ উপকার দর্শে।

কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

শিশু চিকিৎসা।

—:*:—

উদরাময়।

শিশুদের উদরাময় অর্থাৎ ,অতিসার হইলে, প্রথমেই দুগ্ধ বন্ধ করা উচিত। কেননা অতিসারে দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত বিষাক্ত পদার্থ পরিচালিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। পরিপাক প্রণালীতে দুগ্ধে রোগের বীজাণু পরিপুষ্ট হয়, বংশ বৃদ্ধিও করে।

পীড়ার প্রথবাবস্থায় পাকস্থলীতে দুগ্ধ পরিপাক হয়না। এ সময় যাহাতে পরিপাক প্রণালী পরিষ্কার হইয়া যায়, এরূপ উপায় করা উচিত।

শুধু দুগ্ধ কেন, রোগের তরুণ অবস্থায়—সমস্ত খাদ্যই বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল সিদ্ধকরা জল কিম্বা বার্লিওয়াটার খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ পথ্যের উপর ২।১ দিন নির্ভর করা চাই।

অনেক স্থলে দেখা যায়,—এইরূপ পথ্যের উপর শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকগণ বড় আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা ভাবেন—ছেলে কেবলমাত্র একটু জল বা জলবার্লি খাইয়া কেমন করিয়া বাচিবে? তাই তাঁহারা শিশুকে অন্য কোন রকম পথ্য দেওয়া চলে কিনা, বারম্বার তাহা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন। পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে—চিকিৎসকও হয়ত শিশুকে অন্যরূপ পথ্য দিতে বাধ্য হন। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসকের কর্ত্তব্য—তাহার অভিভাবককে বুঝানো, শিশুর এখন অন্য খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি নাই, তাহার পরিপাক প্রণালীতে অন্য পথ্য আদৌ শোষিত হইবে না। এই সময় শিশুর অভিভাবকগণকে শিশুর মল দেখাইয়া দিয়া বলা উচিত—এখন দুগ্ধাদি পান করিতে দিলে—তাহা হজম হইবে না, পীত দুগ্ধ সমস্তই অন্ত্র হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

তরল ভেদ হইতে থাকিলে, পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হয়। এরূপ অবস্থায় শিশুকে বারম্বার জলপান করিতে দেওয়া উচিত। তবে একেবারে অধিক মাত্রায় জল না দিয়া এক ঘণ্টা, আধঘণ্টা, কিম্বা ১৫ মিনিট অন্তর, আধ তোলা পরিমাণে জল পান করিতে দিতে হয়। জল বেশী দিলে—শিশু বমি করিতে পারে।

অনেক ডাক্তার সমস্ত দিনে এক পোয়া জলের সহিত ১ ড্রাম ব্রাণ্ডী মিশাইয়া পান করাইতে বলেন।

কোন শিশুর চব্বিশ ঘণ্টার পর, কাহারও বা ৪৮ ঘণ্টার পর, পরিপাক-প্রণালী পুনরায় পরিশোধণ শক্তি লাভ করে। অন্ত্রমণ্ডলও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায়। এই সময়—একপোয়া বার্লিওয়াটারের সঙ্গে আধ আউন্স ডিমের অণ্ডলাল মিশাইয়া শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। দেশীয় প্রথানুসারে—চিঁড়া ধোয়া জলের সহিত অণ্ডলাল মিশ্রিত করিয়া তাহাও খাওয়ান চলে. এই পথ্য দিবসে ২ ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রে ৪ ঘণ্টান্তর অল্প অল্প দিতে হইবে। এই ভাবের পথ্য দু'এক দিন দিয়া যখন দেখিবে—অতিসারের লক্ষণ তিরোহিত হইয়াছে বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন অন্য পথ্য দিতে পার।

অতিসারের লক্ষণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে, প্রথমে ছানার জল, পরে প্রেপ্টোনাইজ করিয়া, তাহার পর চুণের জল মিশাইয়া গোদুগ্ধ সহ পান করিতে দিবে। এইরূপ নিয়মে পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে,—বিনা ঔষধেও রোগ সারিতে পারে।

ঔষধের মধ্যে এমন ঔষধ প্রথমে ব্যবস্থা করিবে—যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া অন্ত্র পরিষ্কার হইয়া যায়। এরণ্ড তৈলের এই গুণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু বমনোদ্বেগ বেশী থাকিলে, এরণ্ড তৈলের পরিবর্ত্তে পারদ ঘটিত ঔষধ দেওয়া ভাল। তরুণ লক্ষণ অন্তর্হিত হইলে অর্থাৎ ঘন ঘন মলত্যাগের প্রবৃত্তি প্রশমিত হইলে—অবসাদক ঔষধ দেওয়া উচিত।

আক্ষেপ।

আক্ষেপ কিছু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে, শিশুকে প্রথমেই গরম জলে নিমজ্জিত করিবে। অথবা একসের গরম জলে একতোলা সর্ষপ চুর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এই জলে গামছা ভিজাইয়া তাহার দ্বারা শিশুর অঙ্গ আঁবৃত করিবে। এই ভাবে ১০।১৫ মিনিট রাখিতে হইবে।

ইহাতেও যদি আক্ষেপ নিবারিত না হয়, কিম্বা ক্ষণস্থায়ীভাবে নিবারিত হইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে—অবসাদক ঔষধের প্রয়োজন। শিশুর প্রকৃতি ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া—এইরূপ ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। ডাক্তারী মতে—কোরোফরম ক্লোরাল হাইড্রেট—এমন কি মর্ফিয়া পর্য্যন্ত আক্ষেপ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

দন্তোদ্গম।

দন্তোদ্গম সময়ে শিশুদের নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে এ সময় শিশুর কোন অসুখ না হইতে পারে—প্রথম হইতে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। খাদ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে—অতিসার, উদরের যন্ত্রণা ও আধ্মান প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই পীড়ায় এরণ্ড তৈল ও রিয়াই (রেউচিনী) উৎকৃষ্ট ঔষধ। †

---

* কুমারিয়া লতা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে তৎক্ষনাৎ আক্ষেপ নিবারিত হয়। আয়ুর্ব্বেদে—আক্ষেপ নিবারক বহুযোগ উল্লিখিত হইয়াছে। পৃথক প্রবন্ধে আমরা তাহা লিখিব।—আঃ সং

† ছুছুন্দরী শুষ্ক দশনঃ শুদোষ্টঃ বিম্বোষ্টি। কণ্ঠস্থ বসনে নিবদ্ধ।
দন্তোদ্ভরাং বালকং রুজং জ্বরঞ্চ ঐকাহিকঃ হন্তি কুচ ভার নম্রে।

ছুঁচার দাঁত এবং ঠোঁট রৌদ্রে শুকাইয়া কাপড়ের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলে, দন্তোদ্গম কালীন সকল ব্যাধি নষ্ট হয়।—আঃ সং।

পেটের বেদনা খুব বেশী হইলে অল্প মাত্রায় আফিং প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অনেকেই বিশেষতঃ কবিরাজ মহাশয়েরা—আফিং দিতে আপত্তি করিতে পারেন। তবে আফিং দিতে হইলে খুব সাবধান হইয়া দিতে হইবে। যেন মাত্রা বেশী না হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ আফিং দেওয়াও উচিত নহে। এক ফোঁটা আফিমের আরক (টিঞ্চার ওপিয়াই) দিলে যথেষ্ট। তন্দ্রাভাব দুর না হওয়া পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয়বার আফিং দিবেনা। আফিং খাইলে শিশুর চক্ষু যেন জড়াইয়া আসে, নিদ্রাকালীন ভাব উপস্থিত হয়, ইহাকেই তন্দ্রাভাব বলে। তন্দ্রাভাব—অর্থাৎ ঝিমানো। যতক্ষণ এই ঝিমানো, বা নেশার ভাব দূর না হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় মাত্রা আফিং প্রয়োগ করিতে নাই, এটুকু স্মরণ রাখিবে। শিশু অনিদ্রাগ্রস্ত এবং অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে—ডাক্তারী মতে "ব্রোমাইড" প্রয়োগ করিতে হয়।

দন্তোদ্ভব কালের পেটের অসুখ সহসা বন্ধ করিবে না; এ সময় পেটের অসুখ হওয়া বরং ভাল, তাহাতে আর আক্ষেপের (রস তড়কা) ভয় থাকেনা। যে সকল শিশুর দাঁত উঠিবার সময় পেটের অসুখ না হয়, তাহাদের রসতড়্কা হইতে পারে। অতএব দাঁত উঠিবার সময় মল যাহাতে পরিষ্কার থাকে—তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা চাই।

দাঁত উঠিবায় সময়—ছেলেরা যা' তা' মুখে দেয়। ইহাতে অনেক রোগের বীজাণু তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে। শিশু বেশী মৃত্তিকা মুখে দিলে—ঐ মৃত্তিকা উদরস্থ হইয়া যকৃতের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, মাটির সঙ্গে ক্রিমি বীজাণুও উদর গহ্বরে আশ্রয় লাভ করে।

এ সময় দাঁতের মাড়ী শোণিত পূর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়। সোহাগার খৈ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া দন্তমাড়িতে প্রলেপ দিলে—বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে। আমেরিকায় এক দন্ত চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায়—একজন বড় ডাক্তার লিখিয়াছেন—"দন্তোদ্গম সময়ে দাঁতের মাড়ি কাটিয়া দিলে অনেক ছেলে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। দন্তোদ্গমকালীন বেদনা হইতে আক্ষেপের উৎপত্তি প্রায়ই হইয়া থাকে।" এ যুক্তি কিন্তু সমীচিন বলিয়া মনে হয় না। শিশুর আক্ষেপ হয়—পরিপাক প্রণালীর দোষে। মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহের জন্য টিউবার কিউলোসিসের জন্য, নিমোনিয়া হইবার প্রারম্ভে শিশুর শরীরে আক্ষেপের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। দাঁতের মাড়ী কাটিয়া দিলে—আক্ষেপ নিবারিত হয় না। তবে শোণিত স্রাব হওয়ায় স্থানিক বেদনা কমিয়া যায় বটে।

কেবল একটু রক্তস্রাব হইতে পারে—এইরূপ ভাবে দাঁতের মাড়ি কাটিয়া দিলে মন্দ হয় না। গভীরভাবে কর্ত্তন করা একেবারেই অনুচিত। মাড়ি শোণিত পূর্ণ বোধ না হইলে অথবা শিশু বেদনার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিলে, কথনই দাঁতের মাড়ি চিরিয়া দিবেনা।

আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহিণীগণ—শিশুর দন্তোদ্গমের বিলম্ব দেখিলে—ধান্যের দ্বারা মাড়ি সামান্য বিদ্ধ করিয়া দিতেন। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া শিশু সুস্থতা লাভ করিত। মাড়ি শোণিত পূর্ণ হইয়া—তাহাকে আর কষ্ট দিতে পারিত না।

স্তন্যের দোষ।

মাতৃস্তন্যের দোষে শিশুর অনেক রোগ হইতে পারে। তাহার মধ্যে পরিপোষণের

ব্যাঘাত—সর্ব্ব প্রধান। কোন কোন প্রসূতির স্তনের দুগ্ধে এমন কোন রাসায়নিক বিশেষত্ব থাকে যে, সে স্তন্য পান করিলে শিশুর হজম হয় না। অথচ এইরূপ স্তন্যের মেদের অংশ অল্প থাকায়—শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে. কিন্তু সেরূপ শীর্ণ শিশুকে পরীক্ষা করিলে, বিশেষ রোগ ধরিতেও পারা যায় না। শিশু সর্ব্বদা কাঁদে, নিয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে,বাহ্যে ভাল হয় না। যাহা হয় তাহাও অত্যন্ত কঠিন। বিলাতে এইরূপ মেদবর্জ্জিতস্তন্যে ক্রিম মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়াইবার প্রথা আছে। আমাদের দেশের শিশুকে এরূপ অবস্থায় বার্লিসহ ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ * খাওয়ান ভাল। ইহা মাত্র দুইবার খাওয়াইতে হইবে। বাকী সময় মাতার স্তন্যপান করিবে।

প্রসূতি-স্তন্যে দুগ্ধ শর্করার অল্পতা হইলে, সে স্তন্য পানেও শিশু শীর্ণ হইয়া পড়ে। এরূপ শিশুকে একটু করিয়া চিনী খাওয়ান উচিত।

কোন কোন প্রসূতির স্তন্য পান করিলে শিশুর পেটের কামড়ানি ও ভেদ হইয়া থাকে। শিশুর মলে ছানার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রসূতিকে ক্ষার ঔষধ খাইতে দিলে, তাহার স্তন্য সংশোধিত হয়। ডাক্তারী মতে এরূপ প্রসূতিকে—সোডিবাইকার্ব্ব এবং সোডা এবং সোডা সাইট্রাস খাওয়ানর ব্যবস্থা আছে। কবিরাজী মতে – শঙ্খ ভস্ম ও মৌরীচূর্ণ খাইলে প্রসূতির স্তন দুগ্ধ বিশুদ্ধ হয়।

নিদ্রিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্নদর্শন।

অতি অল্প সংখ্যক বালকেরই এ রোগ হইয়া থাকে। ইহার ঔষধ—অবসাদক। যথা এন্টপাইরিন,—প্রভৃতি। বৈদ্য মতে তেলাকুচার পাতার রস চিনী সহ পান করাইলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

শয্যামূত্র।

পেটে কৃমি থাকিলে প্রায়ই এ লক্ষণ উপস্থিত হয়। বেলেডোনা ও আফিং ইহার ঔষধ। উভয় ঔষধ অল্পমাত্রায় আরম্ভ করা উচিত। তেলাকুচার পাতার রস, চাউল ভাজার গুঁড়া, জটামাংসীর কাথ প্রভৃতি প্রয়োগে--এ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

সিঃ হসপিট্যাল হইতে অবসর প্রাপ্ত
ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত।

পঞ্চকর্ম্ম।

—:*:—

ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ।

ডাক্তার। আসুন কবিরাজ মহাশয়, ভাল আছেন ত?

কবিরাজ। এক রকম মন্দ নয়, আপনার খবর কি?

ডাক্তার। শারীরিক ভালই বটে, কিন্তু বাজার বড় মন্দা। রোগীপত্তর খুব কম।

ক। র'ক্ষে করুন মশায়, বার মাস সমান টানে লোকে যদি রোগ ভোগ করে, তা,

* এরূপ অবস্থায় গব্য দুগ্ধে শালপানি মিশাইয়া চিনি সহ সিদ্ধ করিয়া শিশুকে খাইতে দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।—আঃ সং।

হলে শেষে যে একেবারেই রোগী পাবেন না।

ডাঃ। তা তো বল্‌ছেন, কিন্তু মনে ক'রে দেখুন দেখি খরচাটা কি। বাড়ী ভাড়া, লোক জন-সহিস-কোচমানের মাইনে, ঘোঁড়ার খোরাক, ইলেকট্রিক আলো, পাখায় বিল—এগুলো ত মাস গেলেই গুণতে হবে। আপনারাও তো ক্রমে খরচা বাড়িয়ে তুলেছেন।

ক। মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা—আপনারা হ'লেন মহাজন,—যে পথে আপনারা যা'বেন, আমরাও সেই পথে চলিছি।

ডাঃ। পূর্ব্বে আপনাদের তো এ রকম চাল ছিল না?

ক। কিছুমাত্র না। আয়ুর্ব্বেদের স্রষ্টা যাঁ'রা—তাঁ'রা গাছের বাকল প'রতেন। তার পর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যাঁরা জীবের স্বাস্থ্যবিধান এবং প্রাণরক্ষা রূপ মহাব্রত অবলম্বন ক'রতেন, তাঁ'রা মোটা চাদর কাপড় আর চটী জুতো হ'লেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যেমন দেখচেন—আগেকার কবিরাজেরা ঠিক সেই রকম একেবারে বিলাসিতা বর্জ্জিত ছিলেন। তাছাড়া শাস্ত্রচর্চ্চায় ও চিন্তায় তাঁরা এত নিমগ্ন থাকতেন যে, বিষয়বুদ্ধি তাঁদের কিছুমাত্র ছিল না—টাকা, মোহরের প্রভেদ জানতেন না।

ডাঃ। বলেন কি!

ক। বলি সত্য কথা। এই কিছু দিন পূর্ব্বের ঘটনা শুনুন। দর্প নারায়ণ ব'লে এক জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে মহিষাদলের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হন। যা'বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী ব'লে দেন যে, তিনি যেন হলদে টাকা চান। কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় রোগী আরোগ্য লাভ করিলে বিদায়ের সময় তিনি রাজার নিকট হলদে টাকা চাহিলেন, রাজাও দাওয়ানকে যথেষ্ট মোহর পুরস্কার দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দাওয়ান দেখিলেন যে, কবিরাজ নিতান্ত বোকা। তিনি টাকায় হলুদ মাখাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে দিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং কর্ম্মচারী সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহিণীকে টাকা দিয়া মহা আনন্দে বলিলেন,—'এই দেখ গৃহিণী, হলদে টাকা এনেছি।' গৃহিণী দেখিয়া ভাবিলেন যে, উহা কখনই রাজার কার্য্য নহে। কোন দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারী এরূপ করিয়াছে, তিনি সমাগত কর্ম্মচারী এবং প্রহরীদিগকে রাজার নিকটে একখানি পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা—ইহা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কার্য্য এবং রাজার নিকট পত্র লইয়া গেলে তাহাদের চাকরী থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়া পত্র লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। কেবল এক-জন পালকী-বেহারা কবিরাজ মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খাই, চাকরী যায়—অন্যত্র চাকরী করিব, আমি পত্র লইয়া যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়া হইল। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাজ, এরূপ লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। রাজা পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট কর্ম্ম-চারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন।

ডাঃ। একি গল্প না সত্য কবিরাজ মশায়?

ক। এখন গল্প ব'লেই মনে হয়, কিন্তু সত্য সেকালের কবিরাজদের বিষয় বুদ্ধি মোটেই ছিলনা। টাকা সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একবার জনৈক

কবিরাজ কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হন। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, রাজা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি চান? কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বে হাতী দেখেন নাই, এখানে হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল, তিনি রাজাকে একটা হাতী দেখাইয়া বলিলেন—আমি এইটে নেব। রাজা হাতী পুরস্কার দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ-গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ? কবিরাজ সানন্দে হাতী দেখাইয়া বলিলেন, আমি এইটে চেয়ে এনেছি। তখন গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—আঃ আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন, কি হল? কবিরাজ-গৃহিণী বলিলেন, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই বলিয়া প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন। গজরাজও মহা আনন্দে সেই ধান্য ও চাউলের স্তূপ উদরসাৎ করিল। গজরাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় অবাক। তখনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পত্র লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। আমাকে একটা রাক্ষস দিয়াছেন। রাজা কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং বিষয়বুদ্ধির হীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ দিয়া পাঠাইলেন।

ডাঃ। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যাঁ'রা এত বিষয়-বুদ্ধিহীন,—তা'রা পণ্ডিত হ'য়ে কি করে?

ক। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। পাশ্চাত্য দেশের গালিলিও, সক্রেটিস প্রভৃতিও এইরূপ ছিলেন। নিউটন এত চিন্তামগ্ন থাকিতেন যে, আহার ক'রতে ভুলে যেতেন। প্রকৃত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিলাসিতা ও অর্থচিন্তার বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। কবিরাজগণ যত বিলাসী ও অর্থপ্রিয় হ'তে লাগলেন, ততই তাঁদের পাণ্ডিত্য ক'মে আসতে লাগল্। ফলে আয়ুর্ব্বেদের ক্রমশঃ অবনতি ঘ'টলো। এখন এমন হয়েছে যে—একটা ফোড়া কাটতে হ'লে—কি পিচকারি দিয়ে বাহ্যে করা'তে হ'লে আপনাদের দ্বারস্থ হতে হয়।

ডাঃ। পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করান আগে ছিল নাকি?

ক। (হাসিয়া) এখন তাই মনে হয় বটে, কিন্তু পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করাবার যে সুন্দর নিয়ম আয়ুর্ব্বেদে ছিল, আপনাদের শাস্ত্রে তার সিকির সিকিও নেই।

ডাঃ। বলেন কি?

ক। বলি ঠিক। কেবল বাহ্যে করাবার জন্য পিচকারী দেওয়া নয়, পিচকারী দিয়ে অনেক রোগের চিকিৎসাও হ'ত।

ডাঃ। অবাক কল্লেন আপনি! রেক্‌ট্যাল ফিডিং (Rectal feeding) কবিরাজীতে ছিল নাকি?

ক। ছিল বৈ কি। এক বস্তিকেই শাস্ত্রে অর্দ্ধেক চিকিৎসা—মতান্তরে সম্পূর্ণ চিকিৎসা বলা হ'য়েছে।

ডাঃ। বস্তিটা কি?

ক। মলদ্বারে পিচকারী দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করার নাম বস্তিপ্রয়োগ। আর মূত্রদ্বার পথে ঔষধ প্রয়োগ করার নাম উত্তর বস্তি।

ডাঃ। আপনি আমার কৌতূহলী ক'রে তুল্লেন দেখছি। তা' যখন ক'রে তুলেছেন,—তখন সব শোনাতে হবে আপনাকে।

ক। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তা' হ'লে পঞ্চকর্ম্ম সবই শুনতে হয়।

ডাঃ। হাঁ হাঁ পঞ্চকর্ম্ম ব'লে একটা প্রবন্ধ প্রথম বছরের আয়ুর্ব্বেদে বেরিয়ে ছিল বটে। কিন্তু তা'তে কেবল স্বেদের কথাই লেখা ছিল।

ক। স্বেদ—পঞ্চ কর্ম্মের মধ্যে নয়, ওটাকে প্রাককর্ম্ম বলে। পঞ্চকর্ম্মের পূর্ব্বে প্রথমে স্নেহ পান করিয়ে স্বেদ দিতে হয়, তা'রপর পঞ্চ কর্ম্ম ক'রতে হয়।

ডাঃ। স্নেহ পান কি ?

ক। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। আবার ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা-ভেদে স্নেহ চারি প্রকার। স্থাবরস্নেহের মধ্যে তিল তৈল ও জঙ্গম স্নেহের মধ্যে ঘৃতই প্রধান। পঞ্চকর্ম্ম ক'রবার পূর্ব্বে প্রথমে রোগীকে স্নেহ পান ক'রাতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ পানের নিয়ম কি ?

ক। নিয়ম নানারূপ আছে, ক্রমশঃ বল'ছি। পূর্ব্বে যে চা'র প্রকার স্নেহের কথা ব'লেছি, তার মধ্যে পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত, বাত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত ঘৃত এবং কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার চূর্ণ সংযুক্ত ঘৃত প্রশস্ত। আর বুদ্ধি, স্মৃতি ও মেধা প্রার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে ঘৃতই প্রশস্ত। গ্রন্থি (এই রোগে শরীরে গোলাকার গাঁইটের মত হয়) রোগ ও নালী ঘা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, ক্রিমিরোগী, শ্লেষ্মরোগী, মেদোরোগী, বায়ুরোগী, এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তার জন্য তৈল প্রয়োগ ক'রতে হয়। প্রবল বায়ু, রৌদ্র পথ পর্য্যটন, ভারবহন, স্ত্রী সংসর্গ ও ব্যায়াম বশতঃ ক্ষীণ ধাতু ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং রুক্ষ ক্লেশ সহ, অত্যগ্নি বিশিষ্ট এবং বায়ু কর্ত্তৃক রুদ্ধ স্রোত ব্যক্তিগণের পক্ষে বসা ও মজ্জা হিতকর। সন্ধি, অস্থি, মর্ম্মপ্রকোষ্ঠে বেদনা থাকিলে এবং দগ্ধ আহত, ভ্রষ্টযোনি, কর্ণ ও মস্তকে যন্ত্রণাযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষের একমাত্র বসা (চর্ব্বি) হিতকর।

ডাঃ। স্নেহ কি সকলকেই পান করান যেতে পারে ?

ক। না, তা' যায় না। এক নিয়ম কি সকলের পক্ষে খাটে ? যাহাদের স্বেদ দিতে হবে—বা যা'দের শরীর বমন-বিরেচনের দ্বারা শোষণ ক'রতে হ'বে—তা'দের পক্ষে, মদ্য, স্ত্রী ও ব্যায়ামাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল কৃশ, রুক্ষ, অল্পরক্ত, অল্প শুক্র, বায়ু পীড়িত, পুরাতন অভিষ্যন্দ নামক নেত্র রোগ, তিমির নামক নেত্ররোগ, দুঃসাধ্য রোগ গ্রস্ত এবং জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষে স্নেহ পান হিতকর। আর মন্দাগ্নি বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নি বিশিষ্ট, অতি স্থূল, অতি দুর্ব্বল, তৃষ্ণা ও মত্ত দ্বারা পীড়িত এবং উরুস্তম্ভ, অতিসার, গলরোগ বিষরোগ, উদররোগ, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্নেহ প্রয়োগের অযোগ্য। যে সকল স্ত্রী অকালে প্রসূতা হয়, তাহারাও স্নেহ পানের অযোগ্য।

ডাঃ। স্নেহ পান সম্বন্ধে আর কি নিয়ম আছে ?

ক। নিয়ম অনেক আছে, তবে মোটামুটি এই। আর ঘৃত পানের পর উষ্ণ জল, তৈল পানের পর যূষ এবং বসা ও মজ্জা পানের পর মণ্ড পান করিতে দিবার বিধি আছে, কিন্তু সকল প্রকার স্নেহ পান ক'রে গরম জল খাওয়া চলে, তবে রোগভেদে ভেলার তেল, চাল মুগরার তেল পান ক'রে ঠাণ্ডা জল খেতে হয়।

ডাঃ। ভেলার তেল খেতে হয় নাকি?

ক। সে রোগ ভেদে,—পঞ্চ কর্ম্মের প্রাক্ কর্ম্মে নয়। সে কথা পরে ব'লব। স্নেহ পান সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা আছে—প্রথমে বলি। স্নেহ পান ক'রে দুটি উপসর্গ ঘ'টতে পারে,—এক পিপাসা, দ্বিতীয় স্নেহ জীর্ণ না হওয়া। স্নেহ পান ক'রে পিপাসা হ'লে গরম জল পান ক'রতে দিতে হয়। তাতে যদি পিপাসার শান্তি না হয়, তা' হলে প্রচুর পরিমাণে গরম জল পান করিয়ে বমি করা'তে হয়। এতে স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত হ'য়ে পিপাসার শান্তি হয়। যদি স্নেহপদার্থ জীর্ণ না হ'য়ে থাকে, তা' হলেও গরম জল পান করিয়ে বমি করা'তে হয়। পরে কোষ্ঠ লঘু হ'লে পুনরায় স্নেহ পান করা'তে হয়। স্নেহ জীর্ণ হ'য়েছে কিনা—সন্দেহ হ'লে গরম জল পান করা উচিত। এতে স্নেহ জীর্ণ হয় এবং উদ্গার বিশুদ্ধ ও অন্নে রুচি হ'য়ে থাকে।

ডাঃ। এইবার ভেলার তেল পান করা ব্যাপারটা কি বলুন।

ক। পূর্ব্বেই ব'লেছি, যে স্নেহপানের কথা বলেছি সেটা প্রাক্ কর্ম্মের জন্য। এ ছাড়া নানা রোগে স্নেহপান করার বিধি আছে। সুশ্রুত ব'লেছেন—বহুরোগ স্নেহসাধ্য। পান, অনুবাসন, শিরোবস্তি (মাথার উপর চামড়ার ঠুলি রাখিয়া তাহা তৈলপূর্ণ করা) মস্তিষ্ক তর্পণ, উত্তর বস্তি, নস্য, কর্ণ পূরণ, অভ্যঙ্গ ও ভোজন কার্য্যে স্নেহ প্রয়োগ করিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে কেবল কয়েকটীর নাম মাত্র বলা যাইতেছে। যথা, বিরেচক স্নেহ, বমনকারক স্নেহ, শিরো বিরেচক স্নেহ, দুষ্ট ব্রণনাশক স্নেহ, মহাব্যাধি বিনাশক স্নেহ, মূত্ররোধনাশক স্নেহ, শর্করা ও অশ্মরী (পাথরী) নাশক স্নেহ, প্রমেহনাশক স্নেহ, পিত্ত সংসৃষ্ট বায়ুনাশক স্নেহ, ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ কারক স্নেহ, ক্ষতস্থান পাণ্ডুবর্ণকারক স্নেহ, দদ্রু কিটিম নাশক স্নেহ, ইত্যাদি। কুষ্ঠ রোগে চাল মুগরা এবং ভেলার তেল পান করিবার বিধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

ডাঃ। তাই ত ব্যাপার ত বড় সোজা নয়!

ক। ব্যাপার আরও অনেক আছে, ক্রমশঃ শুনুন। এইত গেল স্নেহ পান। স্নেহ পানের পরেই স্বেদ দিতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে যে স্নেহ পানের কথা ব'ল্লেন, তা'দের কি পরে স্বেদ, বমন, বিরেচন নিষিদ্ধ।

ক। না নিষিদ্ধ কেন? স্নেহপান, স্বেদ, বমন, বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা সংশোধন অনেক রোগে ক'রতে হয়। কিন্তু বিস্তারিত ভাবে সে সব কথা ব'লতে গেলে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদই ব'লতে হয়। সেইজন্য আমি সাধারণ ভাবে পঞ্চকর্ম্মের কথা ব'লছি।

ডাঃ। সাধারণ ভাবে কি?

ক। এই মনে করুন—সুস্থ শরীরে প্রথমে পঞ্চ কর্ম্ম ক'রে তারপর, রসায়ন—বাজীকরণ ঔষধ সেবন ক'রতে হয়। তবে এভাবে বলতে গেলেও অনেক রোগের কথা আপনি এসে পড়বে। কেন না, যা'দের বমন-বিরেচন করা'তে হয়—সে কথাত বল'তে হবে।

ডাঃ। আচ্ছা, স্নেহপানের কথা ত শুনলাম। স্নেহ পানের পর স্বেদ। তা' স্বেদের কথা প্রথম বছরের আয়ুর্ব্বেদে প'ড়েছিলাম। এই গেল আপনার প্রাক্ কর্ম্ম, এখন পঞ্চকর্ম্মের কথা বলুন।

ক। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের পর প্রথমেই বমন করা'তে হয়। যে দিন বমন করা'তে হবে, তা'র পূর্ব্বদিন রোগীকে মৎস্য, মাংস. তিল প্রভৃতি কফের উৎক্লেশকর পথ্য ভোজন করিতে দিবে।

ডাঃ। তা'র মানে কি ?

ক। তার মানে এই যে, ঐরূপ না ক'রলে বমন কষ্টকর হ'য়ে পড়ে।

ডাঃ। আচ্ছা তার পর ?

ক। তা'রপর দিন রোগীকে জানুতুল্য উচ্চ আসনে বসিয়ে প্রাতঃকালে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার রোগভেদে বমনকারক ঔষধেরও ভেদ আছে।

ডাঃ। সে কি রকম ?

ক। ব'লতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে, যা' হোক বলি শুনুন, কিন্তু তা বলবার আগে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। একবার আমার এক জন ডাক্তার-কবিরাজ বন্ধু ব'লেছিলেন, ওহে জোলাপের একটা কিছুই ঠিক পাই না, এক জনকে যে মাত্রায় দিই—তার কিছুই হয় না, সেই মাত্রায় অন্য লোককে দিলে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, আবার অপর একজনের সেই মাত্রায় অতিরিক্ত দাস্ত হয়।

ডাঃ। আপনি কি উত্তর করলেন ?

ক। আমি বললাম, দেখ হে সেটা জোলাপের দোষ নয়. এক রকম জোলাপ যদি সকল রোগে আর সকলের শরীরে সমানভাবে কাজ করতো, তা হ'লে আত্রেয় ঋষি কষ্টস্বীকার ক'রে ছয় শত জোলাপের উল্লেখ করতেন না।

ডাঃ।—বলেন কি ছয় শত রকম জোলাপ!

ক।—সেটাও কেবল দিগদর্শন মাত্র। চিকিৎসক ইচ্ছা ক'রলে আরও ছয়শত কোন্ না কল্পনা ক'রে নিতে পারেন।

ডাঃ। আপনার সংসর্গে আয়ুর্ব্বেদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে উঠছে। আগে আমি আয়ুর্ব্বেদকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতাম।

ক।—অনেকেরই তাই হয়। ভিতরে কি আছে না দেখে ঘৃণা করাটা অনেকেরই স্বভাব। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা ক'রলে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই আয়ুর্ব্বেদকে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারবেন না। অনেক অনেক মার্কিন, জার্ম্মান ইংরাজ এবং ফরাসী পণ্ডিত শতমুখে আয়ুর্ব্বেদের সুখ্যাতি ক'রেছেন।

ডাঃ। কিন্তু একটা কথা বলি কবিরাজ মশায়, কিছু মনে ক'রবেন না। আয়ুর্ব্বেদের উপর ভক্তি যতই বেড়ে যাচ্ছে, আপনাদের উপর ততই অশ্রদ্ধা হচ্ছে। কি জিনিসটাকে আপনারা কি ক'রে তুলেছেন।

ক। আপনি যদি কাণ দুটো ম'লে দিয়ে দু'গালে দু'টো চড় মেরে এ কথা ব'লতেন, তা হ'লেও রাগ বা দুঃখ হতো না। ত্রুটি কেবল শুধু আমাদের একলার নয়, আমরা পুরুষানুক্রমে দোষী। একথা যখন মনে করি. তখন আপনা আপনি গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হয়।

ডাঃ। যাক এখন আপনি রোগভেদে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। ব'লছি, আর একটু ব'লে নিই, দাঁড়ান। আমাদের দোষত স্বীকার করলাম। কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে অনেকে আয়ুর্ব্বেদ না জেনে বা জেনেও ইচ্ছাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। আপনিও তা'র একজন ছিলেন।

ডাঃ। আমাদের অনেকের এই দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি। কিন্তু অনেকে আয়ুর্ব্বেদে শাস্ত্রকে খুব ভক্তির চক্ষে দেখেন—একথাও মানতে হ'বে।

ক। নিশ্চয়, আর এর জন্যে তাঁদের কাছে যে আমরা কতদূর কৃতজ্ঞ—তা' ব'লে বোঝাবার নয়।

ডাঃ। থাক সে কথা, আপনি এখন যা' ব'লছিলেন, বলুন।

ক। হাঁ বলছি। ঘোষার ফল ও পুষ্প জ্বর, খাস, হিক্কারোগে, তিত্‌লাউ কাস, শ্বাস, কফজ বমি, পিপাসা, কফজরোগ ও মূর্চ্ছারোগে, ঘোসার পুষ্প, ফল ও পল্লব বিষদুষ্টি, গুল্ম, উদর, কাস, বাতশ্লেষ্মজ রোগ, কণ্ঠগত ও মুখগত, কফদুষ্টি, কফজনিত রোগ এবং কষ্টসাধ্য ও বহুদিনস্থায়ী রোগে, কুড়্চি হৃদ্রোগ বাতরক্ত ও বিসর্প রোগে, শ্বেত পুষ্প কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, গুল্ম ও সংযোগ বিষজাত রোগে এবং মদন ফল অধিকাংশ রোগে বমন কার্য্যের জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমি আপনাকে নিতান্ত সংক্ষেপে বলিলাম, বমনকারক বহুবিধ দ্রব্য আছে এবং প্রত্যেকের প্রয়োগ-কল্পনাও নানাপ্রকারে করা যাইতে পারে। এক তিতলাউয়ের ৪৫টী যোগ কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে আটটী দুগ্ধ সহ; সুরাখণ্ড সহ ১টী, দধিমণ্ড সহ একটী, তক্র সহ একটী, যাহাতে আঘ্রান লইলে দাস্ত হয়—এরূপ অবস্থার রোগে একটী মাংস যোগে একটী, তৈল যোগে একটী, বর্দ্ধমান (ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা) ও আসব যোগে ছয়টী, ঘৃত সহ একটী, যষ্টিমধু প্রভৃতির কাথ সহ নয়টী, বর্ত্তি ক্রিয়ার জন্য আটটী, লেহযোগে পাঁচটী, মন্থ (জলে গোলা ছাতু) যোগে একটী ও মাংস রস যোগে একটী প্রয়োগ করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বমন কারক দ্রব্যেরই এইরূপ বিবিধ কল্পনা করা হইয়াছে।

ডাঃ।—এযে বিরাট ব্যাপার দেখছি। ইচ্ছে হ'চ্চে যে, আয়ুর্ব্বেদ আগাগোড়া পড়ে ফেলি।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ সংবাদ।

—:*:—

কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী।—গত ১০ই কার্ত্তিক ৺কাশীধামে বাঙ্গালীটোলা স্কুল গৃহে "কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী"র ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই আদেশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নায়ক মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন করেন। "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধ এবং "ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা" নামক বাঙ্গালা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। আমরা ইহার বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম—লুপ্ত প্রায় শল্য ও রসায়ন শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধন করাও সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সে সাধু, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী।—কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেক স্থানেও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী এ জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মফঃস্বলের অনেক স্থলে আদৌ সুচিকিৎ-

সক মিলিতেছেনা। কলিকাতার স্কুল কলেজ গুলি শারদীয়া পূজার অবকাশের পর দু'বার বন্ধ হইয়াছে। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ও এই উপলক্ষে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই।

কলিকাতায় মড়ক।—কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কিরূপ লোকক্ষয় হইতেছে এক সপ্তাহের হিসাব হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে। নবেম্বর মাসে ১১ই ৭৬, ১২ই ৭০, ১৩ই ৬১, ১৪ই ৬২, ১৫ই ৫৯, ১৬ই ৫৯, ১৭ই ৫১ জন এই মহামারীর প্রকোপে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।

সিন্ধিয়ার রাজমাতা।—আমাদের পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন,—সিন্ধিয়ার রাজমাতা উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতেছেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ এম-বি অতি শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—গত ২৯শে কার্ত্তিক কুমারটুলী গঙ্গাপ্রসাদভবনে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন "বৈদ্যক চিকিৎসার উন্নতি সাধন" এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন "আয়ুর্ব্বেদে—খণ্ডপ্রলয়' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ২য় প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পূর্ব্বে স্থায়ী সভাপতি মহাশয় ঐ প্রবন্ধ পাঠের সময় পর্য্যন্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করেন। ২য় প্রবন্ধটি শল্য চিকিৎসার অভাবে অষ্টাঙ্গ অয়ুর্ব্বেদের অংশ অর্থাৎ খণ্ড সকল যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাই অবলম্বনে লিখিত, সেই সঙ্গে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের পঠিত প্রবন্ধের সমালোচনা সম্বন্ধেও যে সকল কথা বলা আবশ্যক, তাহারও উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। "বৈদ্যক চিকিৎসার উন্নতি সাধন" প্রবন্ধেও শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায় B.A. কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার মহাশয়গণ এই উপলক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বড়ই যুক্তিপূর্ণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ও এ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি "আয়ুর্ব্বেদে খণ্ড প্রলয়" নামকরণের জন্য যে সকল কথা—বলিয়াছিলেন এবং ঐ প্রবন্ধে কলিকাতার কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 'ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া উচিত ছিলনা'—প্রভৃতি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইয়াছি। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধের নামকরণ "আয়ুর্ব্বেদে খণ্ডপ্রলয়" হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ হইলেও 'খণ্ড' শব্দের অর্থ 'অংশ' করিলে নামকরণ কথনই অসঙ্গত হয় নাই। তাহার পর কবিরাজ শরচ্চন্দ্র কি বলিতে চাহেন যে, এ সভার প্রত্যেক সভ্যই কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগুলি যাহা বলিবেন, তাহাই অবনত শিরে মানিয়া চলিবেন! যদি ইহাই সভার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোনো আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ সভায় সভ্য নাম লিখাইতে রাজি হইবেন না। শরচ্চন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, কিন্তু ওরূপ অসঙ্গত কথা বলিয়া তিনি বাস্তবিকই আমাদের মনে একটা আতঙ্ক সঞ্চারের সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ সভার উদ্দেশ্য।—এই সভার উদ্দেশ্যের প্রথমেই লিখিত আছে—'বিবিধ উপায়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র-প্রসার, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতি সাধন এবং সর্ব্বত্র নানারূপে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার গৌরব ঘোষণা এই সভার উদ্দেশ্য।" ইহারপর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণে লিখিত আছে '(খ) উদ্দেশ্যের অনুকূল বিষয় সমূহের আলোচনা।' এ অবস্থায় 'আয়ুর্ব্বেদে খণ্ডপ্রলয়" শীর্ষক প্রবন্ধ উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে নহে—ইহা শরচ্চন্দ্রের মনে করা উচিত, কেননা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রসার যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন সেই উদ্দেশ্যের অনুকূলে যিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহাকে উহা পাঠ করিতে দেওয়া উচিত ছিলনা—এ কথা বলায় সত্য সত্যই প্রবন্ধ পাঠকের মর্য্যাদার হানি করা হইয়াছে কিনা এবং তাহার ফলে এখন হইতে যাঁহারা কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারিবেন না,—তাঁহাদের আর এ সভায় প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত কিনা—সে সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয়।

প্রবন্ধ প্রেরণের কথা।—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে যে 'আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজীর গোঁড়ামি প্রবন্ধ হয় নাই। ইহার পর তিনি যখন আবার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে উত্তর আসিল,—তিনি বর্ত্তমান অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলেন—তাঁহাকে প্রবন্ধ পাঠের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে প্রবন্ধ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কবিরাজ সত্যচরণ ইহার উত্তর দিলেন, তিনি এরূপ সর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। সে পত্রের আর উত্তর আসিল না। ছাপান কার্ডে তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইবে বলিয়া পরদিনই উত্তর আসিল। যথাসময়ে প্রবন্ধও পাঠ করা হইল। ঐ প্রবন্ধে ১ম দিনের পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সমালোচনার যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে—কবিরাজ সত্যচরণ পত্র লিখিবার সময় সে সকল কথা জানাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তখনই তাঁহারা আপত্তি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও করা উচিত নহে এবং সেই জন্যই তাঁহারা আপত্তি করেন নাই বলিয়া আমরা মনে করি। আর নিয়মাবলীতে যদিও 'প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে তাহা বা বিশেষ আলোচনার সূচনা পাঠানর কথা যাহা, নিয়ম বদ্ধ আছে, কিন্তু তাহার সহিত কোনো আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞানব্যক্তিই একমত হইবেন না। অচিরে ঐ নিয়মটি তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত।

সভাপতির মন্তব্য।—স্থায়ী সভাপতি মহাশয় সে দিন সভাপতি বদল করিয়া বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম—তিনি শল্য চিকিৎসার বিরোধী কোনোকালেই নহেন, বরং শল্য চিকিৎসা শিক্ষা না করিলে, কাহারও সুচিকিৎসক হইবার অধিকার থাকেনা, তবে কায় চিকিৎসার যে সকল গলদ চলিতেছে, আগে সেই সকল দূর করা কর্ত্তব্য। প্রবন্ধপাঠক প্রথমদিনের প্রবন্ধে কায় চিকিৎসার যে সকল গলদের কথা বলিয়াছিলেন,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সে সম্বন্ধে বলেন, "আমি এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিতে পারি, কিন্তু এখানে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী ভিন্ন অনেক বিষয়ী লোকও রহিয়াছেন, তাই

"ভয়ে ভয়ে বলি—কি বলিব আর,
তা'না হ'লে শুনাতাম বীণার ঝঙ্কার।"

ফলে আমরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য এ প্রবন্ধ পাঠ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। ঐ প্রবন্ধ বর্ত্তমান সংখ্যার স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৩য় বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
পৌষ, ১৩২৫

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



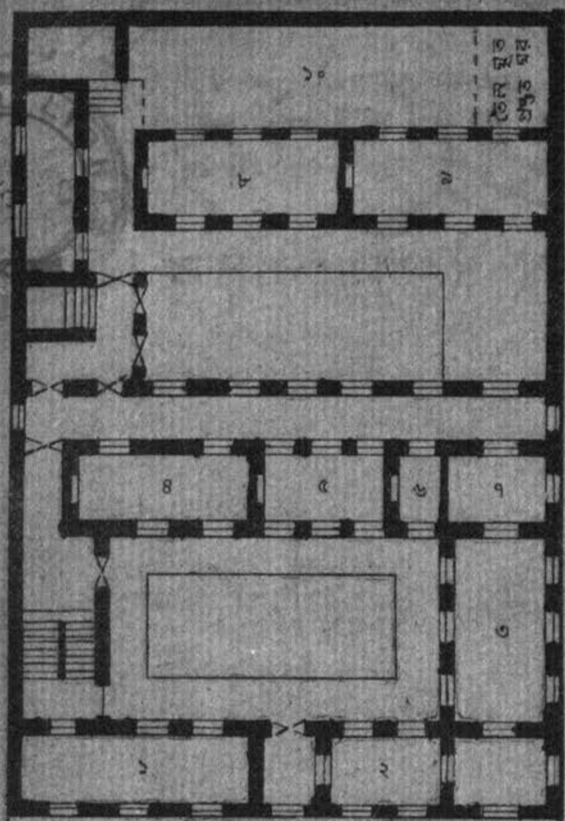
সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

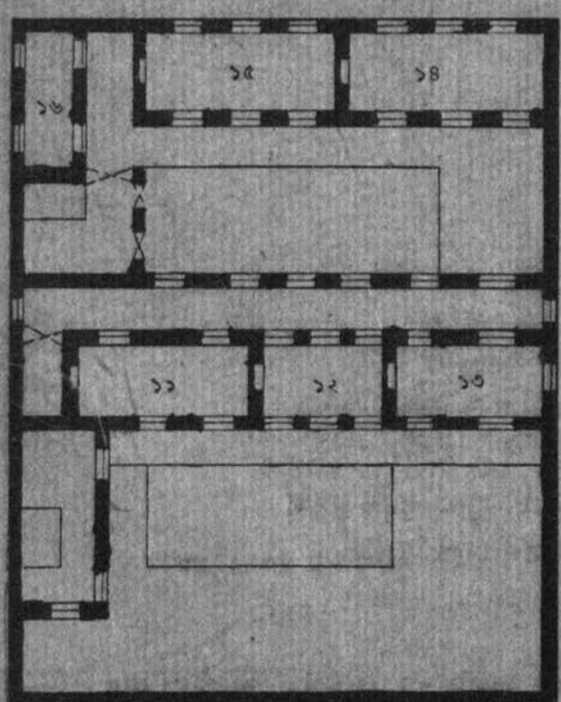
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

গ্রাহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

“আয়ুর্ব্বেদে”র তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে কিন্তু এখনো অনেকের নিকট ২য় বর্ষের মূল্য বাকী। সেইজন্য মফঃস্বলের গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃ করিয়া এবং কলিকাতার গ্রাহকদিগের নিকট বিল পাঠাইয়া ২য় বর্ষের মূল্য প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করিতেছি। সকলেই কৃপাপূর্ব্বক ভিঃ পিঃ প্যাকেট বা বিল গ্রহণ করিয়া ২য় বর্ষের মূল্য প্রদান করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা। যাঁহাদের নামে এখনো ভিঃ পিঃ পাঠান হয় নাই, তাঁহাদের নামে আগামী ৭ই পৌষের মধ্যে পৌষ মাসের “আয়ুর্ব্বেদ” ভিঃ পিঃ করা হইবে। যাঁহারা ভিঃ পিঃতে মূল্য দেওয়ার পরিবর্ত্তে মণিঅর্ডারে মূল্য পাঠান সুবিধাজনক মনে করেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ৭ই পৌষের পূর্ব্বে যাহাতে আমরা মণিঅর্ডার পাই তাহার বন্দোবস্ত করেন, ইহাই অনুরোধ।

যে সমস্ত সহৃদয় গ্রাহক প্রতি বর্ষে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অগ্রিম মূল্য এখনো পাওয়া যায় নাই, কৃপাপূর্ব্বক তাঁহারাও তৃতীয় বর্ষের মূল্য ৩।৵০ সত্বর মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করেন—এজন্যও তাঁহাদের করুণ দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ “আয়ুর্ব্বেদ।”

পৌষের সূচী।

“আয়ুর্ব্বেদে”র নিয়মাবলী।

“আয়ুর্ব্বেদের” অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৩।৵০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয়। কেহ কোনো মাসের ‘কাগজ’ না পাইলে সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুবা পুনরায় মূল্য দিয়া সেই সংখ্যা লইতে হইবে।

আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, এজন্য যখনই ইহার গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ষের আশ্বিন হইতে ইহা লইতে হইবে।

কোনো বিষয়ের জন্য পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা সে পত্রের কোনো কার্য্য হয় না।

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।—এক বৎসরের চুক্তিতে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪।০ সিকি পৃষ্ঠা ২৸০ এবং অষ্টাংশ পৃষ্ঠা ১।০ টাকা। কভারের বিজ্ঞাপনে প্রতি পেজ ১০৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৫—পৌষ। ৪র্থ সংখ্যা।

কাজের কথা।

স্বাস্থ্যরক্ষা।—স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিলে ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, আর মোক্ষের কথাই বল—কিছুই লাভ করিবার উপায় নাই। আর্য্যঋষিগণ এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে—নীরোগ ও সুস্থ দেহে যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়—আমাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়াই তাহার বিধি সকল প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। সে সকল বিধি এখন আমরা আর মানিয়া চলিনা। ফলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই যে এক্ষণে এত রোগজীর্ণ—তাহার প্রধান কারণই তাহাই।

* * *

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের বাঙ্গালী এখনকার মত বিলাসিতার ধার মোটেই ধারিত না। বিলাসি হইবার উপায়ও তখনকার দিনে বুঝি বাঙ্গালীর এতটা ছিল না। তাহার কারণ—সেকালের অধিকাংশ বাঙ্গালীই আশৈশব মরণ পর্য্যন্ত পল্লী-জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া সহরের সম্পদ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় নাই। চাকরি তখন-কার দিনে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই করিতে হইত না, ফলে অধিকাংশ—বাঙ্গালী সন্তান সেকালে ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভরা গাভীর দুগ্ধে উদরপূর্ত্তি করিয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেন।

* * *

একালের কথা।—একালের বাঙ্গালীর সে সকল ব্যবস্থা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভরা গাভীর ব্যবস্থা করিতে একালেও যাঁহারা সমর্থ, সহর বাসের স্পৃহা বলবতী হওয়া তাঁহারাও সে সকল বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ফলে এখনকার

দিনে 'চাকরি'ই হইয়াছে অনেকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়। কিন্তু সত্য কথা কহিতে গেলে—সে চাকরিলব্ধঅর্থে সহরে থাকিয়া সেকালের মত স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর, স্বাস্থ্য হানির ইহাও একটা কারণ।

* * *

দৈনন্দিন কর্ম্ম।—সেকালের বাঙ্গালী যখন চাকরী করিতে জানিতনা,—তখন তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম যে ভাবে নির্ব্বাহিত হইত, এখন তাহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, সর্ব্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া সে প্রাতঃস্নান, সে পূজা আহ্নিকে চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা, শাস্ত্র-পুরাণাদির আলোচনায় সেকালের মত বৈকালিক সময় ক্ষেপণ, সন্ধ্যার পর মজলিস্ বসাইয়া কিছুক্ষণ গীতবাদ্যে আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা—একালে সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। সে সকল করিবার সময়ও এখন কাহারও নাই, সে প্রবৃত্তিও এখন লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি হইবে না তো হইবে কাহার?

* * °

বিলাসিতায় স্বাস্থ্যহানি।—সে সকল ব্যবস্থা তো বাঙ্গালীর নিকট হইতে লোপ পাইয়াছেই—তা' ছাড়া বাঙ্গালী এখন সর্ব্ব প্রকারেই ঘোর বিলাসি হইয়া পড়িয়াছে। আগেকার বাঙ্গালী দশক্রোশ পথ চলিতেও কষ্ট বোধ করিতেন না, এখনকার বাঙ্গালীর এক পোয়া পথ চলিবারও ক্ষমতা নাই। যাঁহারা সহরে থাকেন, তাঁহাদের অর্দ্ধপোয়া যাইতে হইলেও ট্রামের দরকার। আগেকার মত সে তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থাও এখন অনেকের নিকটই যেন ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে। সাবান এখন 'বাবু' দের তৈলের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেকালের 'কেওরা' 'আতরে' এখন আর কাহারও মন উঠে না, নানারূপ বিলাতী 'সেন্টে' তাহার স্থান পূর্ণ হইয়াছে। তামাকের ব্যবহারটা একেবারে উঠিয়া না যাইলেও 'সিগারেটের' চলন—তামাক অপেক্ষা দশগুণ—দশগুণ বলিলেও বোধ হয় কম হয়—বিশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আর চা, সোডা—লেমোনেডের কথা তো আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। ফলে বাঙ্গালী—পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অর্থের মুখ অধিক দেখিলেও সাবেক পদ্ধতি ছাড়িয়া বাঙ্গালী এখন যে সকল পদ্ধতিতে চলিতে শিখিয়াছে, তাহাই তাহার স্বাস্থ্যহানির কারণ।

* * *

মহিলাদিগের কথা।—শুধু পুরুষদিগের কথা নহে—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী-মহিলাগণেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। অনেক স্থলে তাহারও প্রধান কারণ—তাঁহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। অনেক 'বাবু'ই এখন অর্দ্ধাঙ্গিনীদিগকে 'বিবি' করিয়া তুলিতে চাহেন। ফলে অনেক সংসারেই এখন উড়িয়া বা বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের 'বামুনঠাকুর' ঢুকিয়াছে। ঝি-চাকরেরও অভাব নাই। কাজেই সেকালের মত মহিলাদিগকে ভোরে উঠিয়া ছড়া ঝাঁট দিয়া, আঙ্গিনা পরিষ্কার করিয়া, থালা-বাসন মাজিয়া আর রন্ধনাদির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না। কাজেই 'বাবু' দিগের মত বাঙ্গালী 'বিবিরাও' এখন শারীরিক পরিশ্রম একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাবুরা চাকরির জন্য—মানসিক শ্রম করেন, আর 'বিবিরা' নাটক—নবেল

পাঠে তাঁহাদের সে শ্রমের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। কাজেই বাঙ্গালী এখনকার দিনে এত হিষ্টিরিয়ারোগাক্রান্ত। আজকাল প্রসব করাইবার জন্যও এত যে ধাত্রীবিশারদ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়—তাহার কারণও ইহাই। বাঙ্গালী এ সকল কবে বুঝিবে ?

* * *

দেশের ভবিষ্যৎ।—ফলে দেশের অবস্থা ক্রমেই যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। নানারূপ রোগ-তাড়নে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলাদিগের দেহ যেরূপ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আত্মরক্ষার জন্য চিন্তাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। শারীরিক শ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা যেএকেবারেই অসম্ভব, বিলাসি—বাঙ্গালীগণ এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করুন। বুঝিয়া সংসার পরিচালনার প্রত্যেক বিষয়েই পর মুখাপেক্ষী না হইয়া, নিজেরা কর্ম্মঠ হইতে চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদিগকেও কর্ম্মনিরতা করিতে প্রয়াসপরায়ণ হউন,—তবেই আবার বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলাগণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভবপর হইবে, নতুবা দেশের ভবিষ্যৎ যে ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব।

বৈদ্য চিকিৎসার–সাফল্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমাদের তখন পূর্ণ যৌবন। মনে পূর্ণ সাধ, প্রাণে পূর্ণ শান্তি, সংসারে পূর্ণ সুখ। হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাপিল—একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতে হইবে। রাধাজীবন তখন নূতন কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র—সেই কবিতা "সাধারণীতে" ও "নবজীবনে" ছাপিতেছেন! স্বভাবকবি বলিয়া সাহিত্যিক সমাজে তাহার একটু আদর ও বাড়িয়াছে! কাজেই আমরা তাহাকে আমাদের কাগজে লিখিবার জন্য ধরিলাম। সে আরও কতকগুলি লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে—মাতৃভাষার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

বন্ধুবর *** বাবু তখন ছোট গল্প লেখেন। যৌবনে বিপত্নীক হইয়া তাঁহার হৃদয় সঞ্চিত প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল। সেই প্রেম তাঁহার গল্পগুলিকে বেশ রসাল ও মধুর করিয়া তুলিত। তাঁহাকে দিয়া আমাদের কাগজে গল্প লিখাইতে হইবে। এই শুভ কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, রাধাজীবন আমি ও অম্বিকাদাদা বন্ধুবরের

বাসায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার ভৃত্যের মুখে শুনিলাম—বন্ধুবর অনেকদিন হইতেই শয্যাগত। তাঁহায় নীচে নামিবার শক্তি নাই। আমরা সংবাদ দিয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম—একটী ক্ষুদ্র কক্ষে—এক মলিন শয্যার উপর বন্ধু শুইয়া আছেন। তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়ের গ্রন্থিতে ফ্লানেল জড়ান। বন্ধু অতিকষ্টে আমাদের বসিতে বলিলেন। আমরা যে উদ্দেশে গিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গিয়া, বন্ধুর রোগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

বন্ধু কোন কথা গোপন করিলেননা। অকালে পত্নী-বিয়োগ, পত্নীর প্রতি অগাধ ভালবাসার খাতিরে পুনর্বিবাহের অস্বীকার; তাহার পর সঙ্গদোষে পদস্খলন, সর্ব্বশেষে চরিত্রহীনতার প্রতিফল এই নিদারুণ সন্ধিবাত রোগে—উত্থান শক্তি রহিত। দুঃখের কথা, রোগের কথা, প্রাণের ব্যথা, বলিতে বলিতে বন্ধুর চক্ষু দু'টী সজল হইয়া উঠিল।

এই সময় একজন ডাক্তার সেইগৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলাম—দুই মাস ধরিয়া ইনিই বন্ধুর চিকিৎসা করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এমন সুচিকিৎসকের হাতে পড়িয়াও বাতের যন্ত্রণা একদিনের জন্যও কমে নাই। ডাক্তার বাবু প্রেস্কৃপসন লিখিয়া দিয়া যথারীতি ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন।

বন্ধুর কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে আর একজন ডাক্তারকে ডাকিবার উপদেশ দিলাম। চীৎপুর রোডের উপর একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, তাঁহারই নাম করিলাম। বন্ধু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—"উঁহাকেও দেখান হইয়াছে। ডাক্তারী চিকিৎসার হদ্দমুদ্দ করিয়াছি। কেবল সামর্থ্যে কুলাইবেনা বলিয়া সাহেব ডাক্তার ডাকি নাই। বড় বড় বিলাতী পেটেন্ট ঔষধ ও মালিশ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছি। কোন কোন ঔষধে সাময়িক উপকারও পাইয়াছি, রোগ কিন্তু সারে নাই। বেদনা, যন্ত্রণা, জ্বর,—এই সাত-মাস সমভাবেই রহিয়াছে।" এই বলিয়া বন্ধু তাঁহার মাকে ডাকিয়া একটী ছোট বাক্স আনিতে বলিলেন ঐ বাক্স উদ্ঘাটিত হইলে আমরা দেখিলাম—উহা প্রেস্কৃপসনে পূর্ণ!!

বন্ধুকে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা করিয়া-ছিলেন, তৎকালে তাঁহারা প্রত্যেকেই জন-সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গাউট ও সন্ধিবাতের—বড় বড় ঔষধ—কার্ব্বনেট অফ গোয়েকাল, পটাসিয়ম আইওডাইড, নক্সভমিকা, কম্পাউণ্ড গ্লাই-সিকো ফস্ফেট, আর্সেনিক, আয়রণ,—সমস্তই প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিছুতেই কিছু হয় নাই।

ডাক্তারের প্রেস্কৃপসন দেখিয়া, আমরা প্রযুজ্য ঔষধের নাম গুলি জানিতে পারিলাম। মনে মনে বুঝিলাম—এ বাত ভাল হইবার নহে। শুধু ঔষধ সেবন কেন, লোকের পরামর্শেই বন্ধু নাকি দিনকতক আফিম্ এবং মেডিসিন্ ডোজে মদ্য অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাতেও যন্ত্রণার হ্রাস হয় নাই। শেষে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনিই বন্ধুকে বদভ্যাস হইতে মুক্ত করিয়াছেন। শেষোক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থা মত—বন্ধু দুইমাস ধরিয়া সালসা সেবন করিতেছেন, কিন্তু ভাগ্য দোষে,—বাঁধাসালসাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

রাধাজীবন আগাগোড়া সব কথা শুনিতে-ছিল এবং বন্ধুর রুগ্ন শরীরের পানে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে সহসা বলিয়া উঠিল—

"একবার কবিরাজ দেখাইলে হয় না? বন্ধুর বৃদ্ধা মাতা—এ কথায় সর্ব্বপ্রথম সায় দিলেন। আমরাও ভাবিলাম—মন্দ কি? একটু রকম ফের হইবে এ বাঙ্গালীর বিদ্‌ঘুটে বাত—বাঙ্গালা ঔষধেরই দরকার।

সে'দিনের মত আমরা বিদায় লইলাম। পথে পরামর্শ হইল—রাধাজীবন নিজে কবিরাজ লইয়া আসিবে। আমি ও অম্বিকা, বন্ধুর বাটীতে অপেক্ষা করিব। সময়—অপরাহ্ন।

পরদিন আমাদের যাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু আমরা গিয়া দেখিলাম—রাধাজীবন তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। সে কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আসিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া আমাদের বড়ই ভক্তি হইল। দীপ্ত গৌরবর্ণ—সুন্দর চেহারা। যেন ঋষিযুগের মানুষ। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

কবিরাজ মহাশয় রোগীকে ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে যেন মহা-অপরাধীর প্রতি উকীলের জেরা! এই সুযোগে রাধাজীবন বলিল—"ইনিই এখন কলিকাতার বড় কবিরাজ; আমার পিতার পরম বন্ধু; নাম লোকনাথ মল্লিক, পাতিলপাড়ায় নিবাস; এক্ষণে ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেনে বাড়ী করিয়াছেন।"

কবিরাজ মহাশয় উঠিলেন, রোগীর অবস্থা দেখিয়া, রাধাজীবনের মুখে রোগীর দারিদ্র্যের পরিচয় পাইয়া ভিজিটও লইলেন না। পরদিন ঔষধ আনিবার উপদেশ দিয়া কবিরাজ পাল্কীতে চড়িলেন।

যথাসময়ে ঔষধ আসিল। রোগী লবণ-জল বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবন আরম্ভ করিল। এবং ৪ দিন অন্তর রেড়ির তৈল ও গোমূত্র একত্র মিশাইয়া পান করিতে লাগিল। ঔষধ—একখণ্ড শালপত্রে মোড়া ছিল। তাহার বর্ণ—ঘোর কাল, হিংএর উগ্রগন্ধ। শুনিলাম—ঔষধটীর নাম "রসোন পিণ্ড।" কিন্তু আশ্চর্য্য তাহার শক্তি—১২ দিনের পর বন্ধুর সন্ধির অমন বেদনা যেন মন্ত্রবলে উড়িয়া গেল। একমাসের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। সামান্য "রসোন পিণ্ড" তাঁহাকে নব জীবন দান করিল। বন্ধু অনুতাপ করিতে লাগিলেন—হায়! নিজের ঘরে এমন সহজলভ্য মহৌষধ থাকিতে—বৃথা চিকিৎসায় কত টাকাই তিনি নষ্ট করিয়াছেন।

এ ঘটনা—আমার কল্পনাপ্রসূত আখ্যায়িকা নহে। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট, বাস্তব ঘটনা। অম্বিকা মরিয়াছে, রাধাজীবনও কালস্রোতে ভাসিয়াছে, বন্ধুবর এখনও জীবিত থাকিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন। আর কবিরাজী চিকিৎসার এই অপূর্ব্ব সাফল্যের একমাত্র সাক্ষী হইয়া, এখনও আমি আমার সত্তা অনুভব করিতেছি।

রসুনপিণ্ডী খাইয়া বন্ধু আমার নবজীবন,—নব যৌবন লাভ করিয়াছেন; আবার তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা—নূতন বধূর ক্রোড়শোভা করিয়াছে। সর্ব্বকণিষ্ঠ পুত্রটী গতবারে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

অস্ত্রোপচার।

অবতরণিকা।

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে অস্ত্র চিকিৎসা শিখাইবার উদ্যোগ এ পর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তাই যে দিন আমার অনুজতুল্য শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ রায়ের মুখে কলিকাতায় 'আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিলাম, সে দিন আমার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আমি অনেক দিন হইতে হাসপাতালে কার্য্য করিয়াছি,—আমাকে অনেক রোগীর অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে। এখন চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ীতে বসিয়া আছি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছি। আমিত 'কম্‌লী' ছাড়িয়াছি, কিন্তু "কমলী" তো আমাকে ছাড়ে না। এখনও কোথাও অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইলে—লোকে আমাকে ডাকিতে আসে। বৃদ্ধবয়সেও আমার কপালে অবসর-সুখ নাই!

সেদিন একটী ক্যান্‌সার রোগীর চিকিৎসার জন্য হুগলীর এক ভদ্রলোকের বাটীতে আহূত হই। সেখানে বৈদ্যশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ব্রজবল্লভ ভায়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ব্রজবল্লভ ভায়া আমাকে বলেন—"দাদা! আমাদের আয়ুর্ব্বেদ কলেজের মাসিক পত্র "আয়ুর্ব্বেদে" আপনাকে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।" ভায়ার কাছে প্রতিশ্রুত হইলাম—'লিখিব।' আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বসিয়াছি। আমার মত লোকের অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধে যদি আয়ুর্ব্বেদপাঠার্থী কোন ছাত্রের কিছু উপকার হয়, আমার লেখনি সার্থক হইবে।

সংজ্ঞাহারক ঔষধ এবং তাহার প্রয়োগের পরবর্ত্তী ফল।

ভগবান সুশ্রুতের সময়ে এবং তাহার পরবর্ত্তীকালে—এদেশের বৈদ্য-সমাজে অস্ত্র চিকিৎসার প্রচলন ছিল। সে কালের বৈদ্যগণ যে সকল যন্ত্র ও শস্ত্র ব্যবহার করিতেন, এখনকার উন্নত শল্যতন্ত্রেও সে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে এখনকার অস্ত্র-শস্ত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক নূতন অস্ত্রও বাহির হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই —সেকালের ঋষি-বৈদ্যগণ যে যে রোগে অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন, একালের বড় বড় সার্জ্জনেরাও প্রায় সেই সেই রোগে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদের "শল্য তন্ত্র" পাঠে জানা যায় —সেকালের বৈদ্যগণ পূর্ব্বে—রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীকে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। পরে অস্ত্র প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে—"সংজ্ঞাহারিনী" ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া রোগীর চৈতন্য লোপ করিতেন। এই শ্রেণীর ঔষধের নাম ছিল "সম্মোহিনী।" শেষে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া গেলে—"সঞ্জীবনী" ঔষধ প্রয়োগ ফলে —অস্ত্রোপচারের পর রোগীর দেহ গ্লানিশূন্য

হইত, কোনও আগন্তুক উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারিতনা। 'ভোজ প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থে—এই সকল বিবরণ জানা যায়। যাঁহারা জানিতে চাহেন, পড়িয়া দেখিবেন। আমি বেশী কথা বলিব না। আমি কেবল বলিতে চাই—এখনকার আয়ুর্ব্বেদপাঠার্থীগণ যদি অস্ত্র চিকিৎসা শিখিতে চাহেন, তবে তাঁহারা সে কালের সেই "সম্মোহনী" ও "সঞ্জীবনী" বুঝিবার চেষ্টা করুন। উহা যে কিরূপ ঔষধ ছিল আমার মত লোকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবে না। কিন্তু কবিরাজগণ এতদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে, দেশের একটী মহা অভাব দূরীভূত হইতে পারে।

ক্লোরোফরম।

এখনকার ডাক্তারী "সম্মোহনীর" নাম "ক্লোরোফরম্"। বড় বড় অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে—আমরা ক্লোরোফরমের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ক্লোরোফরম" প্রয়োগ—নিরাপদ নহে। অনেক ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা রোগীর দেহে মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন কি ক্লোরোফরম-প্রয়োগের দূরবর্ত্তী ফলে—অনেক রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম—কবিরাজ মহাশয়গণ যদি প্রাচীন কালের "সম্মোহনী" ও "সঞ্জীবনী" ঔষধের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারেন, বড়ই ভাল হয়।

বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল রোগীর দেহে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলে, বিপদের সম্ভাবনা অধিক। অথচ যেখানে দেখা যায়, ক্লোরোফরম-প্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সেখানে রোগীকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়—অনেক সময় এমন রোগীও পাওয়া যায়—তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে অস্ত্রোপচারের আবশ্যক। এরূপ রোগীকে আগে থেকে প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে কি? এমন অবস্থায় অর্থাৎ রোগীকে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় না পাইলে—ক্লোরোফরমের গৌণ ফলে—রোগীর বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

আগে থেকে রোগীকে প্রস্তুত না করিয়া লইলে, ক্লোরোফরম-প্রয়োগে রোগীর বড়ই যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ক্লোরোফরমের যন্ত্রণা, অস্ত্র প্রয়োগের যন্ত্রণা উভয়ে একত্র হইয়া রোগীকে কাতর ও বিপন্ন করিয়া তোলে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি—যে স্থলে অধিক সময়-ব্যাপী ক্লোরোফরমের প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে, সেই স্থলেই রোগীর বিপদ ঘটিয়াছে। ক্লোরোফরম প্রয়োগে রোগীর দেহে কি কি মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে, একে একে তাহা দেখাইতেছি।

(ক) বমন।

বমন।—ক্লোরোফরমের প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রোপচার করিলে, সংজ্ঞালাভের পূর্ব্বে রোগীর বমন উপস্থিত হয়। এই বমনে শ্লেষ্মা ও পিত্ত মিশ্রিত থাকে। কিছুক্ষণ পরে কাহারও কাহারও বমি আপনা আপনি বন্ধ হয়, কাহারও বমি ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত থাকে। এমনও দেখিয়াছি—অনবরত বমি করিয়া রোগী বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অধিকন্তু পুষ্টিকর পথ্য পরিপাক না পাওয়ায় রোগী ক্রমে জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

যাঁহারা ক্লোরোফরমের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিবেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত—রোগী সংজ্ঞালাভ করার পর যেন উঠিয়া না বসে, এমন কি শয্যা বা বস্ত্র পরি-

বর্ত্তনের সময় তাহার শরীরে যেন ঝাঁকানী না লাগে। রোগী সুস্থিরভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে—বমনোদ্বেগ নিবারিত হইতে পারে।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে সাহেব ডাক্তারের সাহায্যকারী ছিলাম—তিনি সংজ্ঞা-হরণের জন্য 'ইথর' প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইথরের বাষ্প পাকস্থালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পথে বহির্গত হওয়ায় তথায় উত্তেজনা উপস্থিত হয়, এইজন্য বেশী বমি হইয়া থাকে। আবার ক্লোরোফরম পাকস্থলী পথে না যাইলেও,—ইহার দ্বারা প্রবল বমন হইতে পারে। ফলে আমার মনে হয়—স্নায়ুকেন্দ্রের উপর সংজ্ঞাহারক ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ—এই বমনোদ্বেগের একমাত্র কারণ। তবে 'ইথর বা' ক্লোরফরম যাহাই প্রয়োগ করা হউক না কেন, মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার কিয়দংশ যে পেটের ভিতর গিয়া বমনোদ্বেগ উপস্থিত করে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পাকস্থালীর প্রদাহ না হইলে বমি হয় না, এই জন্যই বোধ হয় প্রবীনাচার্য্যগণ অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে—রোগীকে পঞ্চপল্লবের কল্ক, উশীর-কষায় বা গুড়ুচীর কাথ পান করাইতেন। আমরা একালের ডাক্তার—আমরা রোগীর পাকস্থালীস্থিত উত্তেজক পদার্থ তরল করিবার জন্য—ক্লোরোফরম করিবার পূর্ব্বে রোগীকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াই। ইহাতে রোগীর কতকটা উপকার হয়।

অস্ত্রোপচারের ফলে পাকস্থালীতে রক্ত প্রবিষ্ট হইলেও, সেই রক্তের উত্তেজনায় রোগীর বমন হইতে পারে। কিন্তু রোগী বয়স্ক হইলে, বমন খুব কম হয়। কখনওবা ইউরিয়ার জন্য রোগীর শরীর বিষাক্ত হইয়া বমন উপস্থিত করে।

ক্লোরোফরম-প্রয়োগ করিয়া রোগীকে দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইলে, তাহার পাকস্থালী-স্থিত পদার্থ অতি সহজে ডিউডিনমে প্রবেশ করে. কাজেই আর উত্তেজনা উপস্থিত হইতে পারে না,:বমিও বন্ধ হইয়া যায়। রোগীকে সম্পূর্ণ চিৎ করিয়া না শোয়াইয়া অর্দ্ধশায়িতা-বস্থায় রাখিলেও—বমন বন্ধ হইতে পারে। দুগ্ধাদি তরল পদার্থ পান করিবামাত্র যদি রোগীর বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়, তবে তাহা না দেওয়াই উত্তম।

যে রোগীর বমন আরম্ভ হইয়াছে, অথচ সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইবে এবং তাহার মাথা একপার্শ্বে এমন ভাবে নীচু করিয়া রাখিবে, যেন বান্ত পদার্থ—মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া যায়। মুখ উচু করিয়া রাখিলে, যদি বমন হয়, তবে বান্ত পদার্থ দ্বারা খাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। আমি ২।৩টী রোগীকে এইরূপে মরিতে দেখিয়াছি।

বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে—অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে—পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা শরীরকে সংশোধন করিয়া লওয়া। ইহার তুল্য নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর হইতে পারেনা। এমন অস্ত্রোপচার আছে—যাহাতে রোগীর বমি হইলেই বিপদের সম্ভাবনা। ডাক্তারী মতে এইরূপ অস্ত্রোপচারের পরে, রোগীর পাকস্থালী গরম জলের ডুস্ দিয়া ধুইয়া দিতে হয়, কিন্তু পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা সংশুদ্ধ দেহে এইরূপ ডুস্ দিবার প্রয়োজনই হয় না।

সংজ্ঞানাশক ঔষধের প্রভাব কমিয়া আসিলে অর্থাৎ রোগীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে

যদি বমন হয় তবে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া গুলি করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(ক) এক গেলাস গরম জল পান।

(খ) ২টী বড় এলাচ বাটিয়া একপোয়া জলে গুলিয়া পান।

(গ) ভাজা মুগ ৫ ভরি, /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান।

(ঘ) কমলালেবুর শুষ্ক খোসা অর্দ্ধ-তোলা, আধসের গরম জলে আধঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল পান।

(ঙ) ২৫ গ্রেন বাইকার্ব্বনেটঅফ পটাশ একপোয়া গরম জলে গুলিয়া পান।

(চ) ৩ মিনিম টিংচার আইওডিন এক পোয়া ঠাণ্ডা জলের সহিত পান।

(ছ) গাঢ় করিয়া কাফী ১ পেয়ালা পান।

(জ) শ্যাম্পেন নামক মদ্য পান।

(ঝ) ২ গ্রেন অ্যাসিটি-নিলিড—আধ ঘণ্টান্তর সেবন—এইরূপ ৪ বার।

(ঞ) মধুর সহিত ৵০ আনা পরিমাণ হরীতকী চূর্ণ লেহন।

(ট) পূর্ব্বদিন প্রস্তুত করা গুলঞ্চের ক্বাথ পান।

(ঠ) আতপ চালের চেলুনী সহ শ্বেত চন্দনের কল্ক পান।

(ড) আমলকীর রস ২ তোলা মাত্রায় পান।

পূর্ব্বোক্ত যোগ গুলি মৎ কর্ত্তৃক বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। ডাক্তারী পুস্তকে বমন নিবারক আরও কতিপয় ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। ডাইলুট হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ।

২। মুস্ক পথে বা অধস্ত্বারিক প্রণালীতে মর্ফিয়া প্রয়োগ।

৩। রোগী স্নায়রিক ধাতু প্রকৃতির হইলে পটাশ ব্রোমাইড প্রয়োগ। ব্রোমাইড্ দুই উপায়ে দেওয়া যায়, মলদ্বারে মুস্ক পথে। ২০ গ্রেণ ব্রোমাইড্ ২ উন্স জলে গুলিয়া পিচ-কারীর সাহায্যে মলদ্বারে প্রয়োগ করিতে হয়। ১০ গ্রেণ ব্রোমাইড্ জিহ্বার তলায় রাখিয়া দিতে হয়।

সাহেব ডাক্তারের মধ্যে ২।১ জনকে এই বমন নিবারণের জন্য—রোগীর পেটে (পাক-স্থালী প্রদেশে গরম জলে সিক্ত ফ্লানেলের পুনঃ পুনঃ ফোমেণ্টেসন্ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি।

অত্যুগ্র পিপারমেণ্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় কিঞ্চিৎ চিনীর সহিত মিশাইয়া রোগীকে চুষিয়া খাইতে দিলেও বমি নিবারিত হইতে পারে। অম্লজানবাষ্প পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলেও প্রবল বমি থামিতে পারে।

অনেক দিন ধরিয়া রোগীর বমি হইতে থাকিলে, বমনের বেগে পেশীতে আঘাত লাগে, রোগী তাহাতে বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ করে। এই বেদনা অতি কষ্টপ্রদ। অনেক সময় মনে হয়—বুঝিবা রোগীর প্লুরিসি হইয়াছে।

(খ) ফুসফুসের পীড়া।

ক্লোরোফরম বা ইথর প্রয়োগে—রোগী ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইতে পারে। ক্লোরোফরমের চেয়ে ইথরেই ইহার অধিক সম্ভাবনা। ফুস্-ফুস্ আক্রান্ত হইলে ব্রঙ্কাইডিস্ দেখা দেয়। রোগী মন্দ প্রকৃতির হইলে সেই ব্রঙ্কাইডিস্ ক্রমে নিমোনিয়ার আকার ধরিয়া তাহার জীবিতকাল সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। এই

নিমোনিয়াকে ইংরাজীতে—"পোষ্ট অপারেটিভ নিমোনিয়া বলে।"

বস্তি ও উদর গহ্বরে অস্ত্রোপচারের পর—এইরূপ নিমোনিয়া হইতে পারে। ক্লোরোফরম করিয়া অস্ত্রোপচার অন্তে, রোগীর দেহে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেও—ইহা হইতে পারে। অতএব যাহাতে ফুস্‌ফুসের ইনফার্কসন না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। নিমোনিয়া হইলে নিমোনিয়ার চিকিৎসা করিবে। বৈদ্যমতে—বাসক, কণ্টকারি, যষ্টিমধু, কুড়, কটফল, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গ ও বামনহাটীর পাচন—নিমোনিয়ায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(গ) মূত্র যন্ত্রের রোগ।

ক্লোরোফরম প্রয়োগের পর অস্ত্রোপচার শেষে—রোগীর মূত্রযন্ত্র আক্রান্ত হইতে পারে। প্রথমে ইহা এলবুমিনুরিয়ার আকারে দেখা দেয়। অস্ত্রোপচারের পর রোগী ক্ষণ কালের জন্য চেতনা লাভ করিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আর তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসেনা। এই অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। লোকে মনে করে—অস্ত্রোপচারের ফলেই বুঝি রোগী মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। এই অজ্ঞানতার নাম—"ইউরিমিক কোমা।" এইরূপ অবস্থায় মৃতরোগীর শবচ্ছেদ করিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া দেখা গিয়াছে। এ রোগের ফলপ্রদ ঔষধ অদ্যাবধি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। কবিরাজী বিজ্ঞানে ইহার ঔষধ আছে কিনা, আমি জানি না।

অতএব ক্লোরোফরম প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে—রোগীর মূত্র পরীক্ষা করা উচিত।

অস্ত্রোপচারের পর অবসন্নতা বা সংজ্ঞাহীনতা অধিকক্ষণ স্থায়ী দেখিলে, ঘর্ম্মকারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। শিরা মধ্যে লবণ দ্রব্য প্রয়োগও ভাল। কোমল রবারের নলের সাহায্যে—রোগীর মলদ্বারে—ঈষদুষ্ণ জলের লবণ দ্রব ১ পাইট মাত্রায় ধীরে ধীরে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথম বারে ফল না পাইলে ৩ ঘণ্টা পরে আবার দিতে হয়। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হইতে পারে।

(ঘ) পাণ্ডু।

ক্লোরোফরমের পর অনেক সময় রোগীর জণ্ডিস্ (কামলা-পাণ্ডু) রোগ দেখা দিতে পারে। ইহার কবিরাজী ঔষধ—নবায়স লৌহ, ফল ত্রিকাদি পাচন" বা দারু—হরিদ্রার কাথ।

(ঙ) উন্মত্ততা।

রোগীর পূর্ব্বে কখনও উন্মাদ রোগ হইয়া থাকিলে, ক্লোরোফরম—প্রয়োগে আবার তাহা দেখা দিতে পারে। অত্যন্ত বায়ু প্রকৃতির লোকেরও উন্মত্ততা আসিতে পারে। ইহার চিকিৎসা—আশ্বাস ও স্নিগ্ধ তৈল।

(ঙ) অচৈতন্যতা।

বহুমূত্ররোগীর শরীরে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলে, তাহার ডাইবিটিক কোমা" হইতে পারে। এ রোগ অসাধ্য। তবে অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিলে উপকার হইতে পারে।

(চ) পক্ষাঘাত।

ক্লোরোফরম-প্রয়োগের পর রোগীর পক্ষাঘাত হইতে পারে। রক্তাধিক্যজনিত আক্ষেপের ফলেই ইহা দেখা দেয়। চিকিৎসা—সাধারণ পক্ষাঘাতের।

(ছ) রক্ত বমন।

ক্লোরোফমের পর অন্ত্রে অস্ত্রোপচার করিলে ২।১ জনের রক্ত বমন হইয়া থাকে। এ ঘটনা

কিন্তু বিরল। ছাগদুগ্ধ ও যজ্ঞডুমুরের রস পান—ইহার প্রতিষেধক।

(জ) রক্তোৎকাস।

রোগীর যদি ফুস্‌ফুসের ক্ষয়রোগ থাকে, তবে ক্লোরোফরমের পর—কাসির সহিত রক্ত উঠিতে পারে। বাসকপাতার রস, মধু ও লাক্ষাচূর্ণ—একসঙ্গে চাটিয়া খেলে ইহা নিবারিত হইয়া থাকে।

(ঝ) হিক্কা।

ক্লোরোফরমের পর রোগীর হিক্কাও উপস্থিত হইতে পারে। এ হিক্কা সহজে বন্ধ হয় না। জিহ্বা টানিয়া ধরিলে বন্ধ হইতে পারে। বৈদ্যমতের হিক্কানাশক মুষ্টিযোগ গুলি পরীক্ষা করিলে উপকারের সম্ভাবনা। যেমন স্তনদুগ্ধে রক্ত চন্দন ঘষিয়া সেবন।

ক্লোরোফরম বা ইথর প্রয়োগ করিলে কত রকম বিপদ ঘটিতে পারে, আমি তাহার কতকটা দেখাইলাম। অথচ অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে এই শ্রেণীর সংজ্ঞাহারক ঔষধ ব্যবহার করাও চাই। সেই জন্য আমার অনুরোধ—প্রাচীন শল্যতন্ত্রে যে "সম্মোহনী" ঔষধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কবিরাজ মহাশয়েরা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলে তাঁহাদের শল্যতন্ত্র আবার বাঁচিয়া ওঠে।

ক্লোরোফরমজনিত উপসর্গ গুলিয় যথনই আমি চিকিৎসা করিয়াছি, তখনই কবিরাজী মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়াছি, অনেক ক্ষেত্রে বেশ ফলও পাইয়াছি। তাই আমার জানিতে ইচ্ছা হয়—"সম্মোহনী ঔষধটী কি? হায় ঋষি! তোমরা ত অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে, সংজ্ঞাহারিণী "সম্মোহনীর" আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলে, আমরা তাহার নামও ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমাদের এমনি কৃতজ্ঞ সন্তান!

সে'দিন এক ইংরাজী নবিশের বাঙ্গালা প্রবন্ধে পড়িতেছিলাম—শল্যতন্ত্রের "সম্মোহনী" ঔষধ আর কিছুই নহে—"গঞ্জিকা"। বিলাতী শিক্ষার স্পর্দ্ধা লইয়া ঋষিপ্রতিভার অপূর্ব্ব সমালোচনা! কোথায় তুমি মহর্ষি সুশ্রুত! আর একবার—এই দেশাত্মবোধের মাঝে ফিরিয়া এস,—আমাদের মত পিতৃ পরিচয় বিস্মৃত অজ্ঞকে একবার "সম্মোহনী" ও "সঞ্জীবনীর" স্বরূপ চিনাইয়া দাও, শল্যতন্ত্রের সম্মান রক্ষা কর।

আয়ুর্ব্বেদের প্রত্নতত্ত্ব লইয়া বিচার করিতে পারেন,—শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ ভায়া। কিন্তু তিনি পেটের দায়ে বিব্রত,—স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার তাঁহার সময় কৈ? বাঙ্গালার সর্ব্বত্র—সাইন বোর্ডে—বৃহদক্ষরে নাম লেখা অনেক কবিরাজ দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি এই "সম্মোহিনী"র স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না? তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ফল কি কেবল—'সস্তায় চ্যবনপ্রাশ' বিক্রয় করা?

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য।
(অবসর প্রাপ্ত—অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন)

বর্ত্তমান জনপদ্বিধ্বংসী রোগের কারণ ও নিরাকরণ-উপায়।

——:*:——

কি সঙ্কট সময় আসিয়াছে; মৃত্যু নিজ করাল ছায়া বিস্তার করিয়া হুহুঙ্কারে অসংখ্য নরনারী, বালক-বালিকা, শিশু-বৃদ্ধকে কাল-কবলিত করিতেছে। সকলেই শঙ্কিত। শোকের নিদারুণ ধ্বনি দেশ প্লাবিত করিতেছে। এই সময় অনেক স্থানে চিকিৎসক নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, এমন কি অনেক স্থানে রোগীর দেহে শীত নিবারণের সামান্য বস্ত্র নাই। দেশের ধনী,—বিলাসী—বড় লোকদের বলি, একবার পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসুন, যে, কি ভীষণ অবস্থা। বিশাল বিস্তার্ণ মাঠ—সব জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। যেখানে দশহাজার মন ধান্য হইত, সেখানে দশ মন ধান্য নাই। গত বৎসরের যৎসামান্য যাহা ছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে, তাহার পর উপায় কি হইবে ভাবিয়া পল্লীবাসী কূল-কিনারা পাইতেছেনা। দেহে জীর্ণ বস্ত্র শতছিদ্রে শীতের প্রকোপ আরও বাড়াইয়া দিতেছে। যেমন তুষানলে দগ্ধ হইলে বহুবিলম্বে বহুকষ্টে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, তদ্রূপ তাহাদের মৃত্যু ভয়ানক কষ্টে হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল পল্লীবাসিগণ তাহাদের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা শস্য উৎপন্ন করিয়া সহরের লোককে খাওয়াইতেছে। শস্য কিছু সহরে হয়না; সবই পল্লীগ্রাম হইতে আইসে। কিন্তু একদিকে এই ভীষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য, অন্যদিকে সহরে যথাপূর্ব্ব বিলাস স্রোত! সেই বেশ-ভূষা—সেই বিন্যাস—সেই চুরুট চা পান—সেই মোটর গাড়ি—সেই চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্য গীতাদি শ্রবণ-দর্শন,—সেই সকল বিলাসের কিছু কি কমিয়াছে? এই কি আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান? সহরের বিলাসী বাবুরা ভাবেন না কি যে, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্য-ফল ভোগ করিতেছেন যেমন কামনাপূর্ণ ব্যক্তি ইষ্টজনক কার্য্যের দ্বারা স্বর্গভোগ করেন এবং "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং জায়ন্তে",—যেমন সঞ্চিত অর্থ ব্যয়কারী ব্যক্তি সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া দু'হাতে ব্যয় করিয়া আবার ভিখারী হয়—সেইরূপ তাঁহারা কি ভাবেন না যে, তাঁহারাও ক্ষীণপুণ্য হইলে এবং আর পুণ্য সঞ্চয় না করিলে ঐরূপ দারিদ্র্যের দুর্দ্দশায় পতিত হইবেন। যদি তাঁহাদের এই ভাবনায় চৈতন্য হয় তবে তাঁহারা আবার সুখভোগের অর্থাৎ যাহাকে দুঃখমিশ্রিত সংসার সুখ বলে, শ্রুতি যাহাকে "প্রেয়" বলেন, তাহার জন্য পুণ্য অর্জ্জন করিতে থাকুন। দয়াময় জগদীশ্বরের দয়াগুণকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের দারিদ্র্যমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়া অন্নবস্ত্র-ঔষধ-পথ্য ও চিকিৎসকের সাহায্য দানে আপনাদিগকেও ব্যাধির করাল আক্রমণের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করুন। পল্লীগ্রামে যেমন লোক কষ্টের দারুণ ব্যথায় মরিতেছে, সহরের লোকও সেইরূপ ভীষণ ভীষণ রোগের আক্রমণে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে মরিতেছেন, আর

যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা কেহ শোক করিতেছেন, কেহ আত্মীয়-স্বজন বা নিজের ঐ ভীষণ ব্যাধি হইতে পারে সেই আশঙ্কায় নানাবিধ উপায় অবলম্বন ও ঔষধাদি সেবন করিতেছেন। দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি নানাবিধ ভীষণ ব্যাধি লোক সকলকে অকালে অকস্মাৎ গ্রাস করিতেছিল, কিন্তু বিধাতা ঐ সকল ভীষণ ব্যাধি দ্বারা লোক সংহার কার্য্য পর্য্যাপ্ত না ভাবিয়া ভীষণ যুদ্ধ লাগাইয়াছিলেন এবং সেই ভীষণ লোমহর্ষণ কর যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই এই নূতন ব্যাধি—যাহাকে একপ্রকার প্লেগ বলা যাইতে পারে এবং যাহাকে আজকাল লোকে "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" বা কফজ্বর বলিতেছেন, তাহার সৃষ্টি করিয়া সংহার কর্ত্তা শিব জগতের শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় কার্য্য করিতেছেন।

কেহ বলিবেন যে, শিব মহা অমঙ্গলময় দুঃখ শোকদায়ক সংহার কার্য্য করিয়া কিরূপে মঙ্গলময় হইলেন? সন্তান দুষ্ট প্রকৃতি হইলে নানাপ্রকার অশান্তিকর কার্য্য করিলে, পারিবারিক শান্তিরক্ষা ও বালকের স্বভাব সংশোধন দ্বারা পিতামাতা তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য কারুণ্যত্যাগ করিয়া তাড়ন-পীড়ন করেন। কৃষক যেমন প্রয়োজনীয় গাছকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগাছা উন্মূলন করিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ সেই দয়াময় জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্টি-প্রবাহ ও প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষার নিমিত্ত সৃষ্টি ও স্থিতিকার্য্যে নিরত থাকিয়াও বিপথগামী ও তাঁহার সৃষ্টির ও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল-গামীকে নষ্ট করিয়া শিবরূপেতে লয়কার্য্য করিয়া জগতের মঙ্গল করিতেছেন। যাহারা তাঁহার সৃষ্টির অনুকূলে কার্য্য করিতেছে—তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্‌ ধাতুর সাফল্য দ্বারা যত্নবান্ কৃষকের ন্যায় শিবরূপে আগাছা নিড়াইতেছেন। এখন এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যাহাতে আমরা আগাছা না হইয়া—দুষ্কৃতিবান্ না হইয়া, ধর্ম্মপরায়ণ ও ভগবদ্‌-ভক্ত হইয়া, দয়া দাক্ষিণ্য-ক্ষমা শৌচ-সত্য প্রভৃতি দৈবীসম্পদ সকল গ্রহণ ও অভ্যাস করিয়া তাহার 'কাজের গাছে' পরিণত হইতে পারি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। রাজা যেমন অপ-রাধীর দণ্ডবিধান করিয়া অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন ও অন্যের অপরাধ করায় দণ্ডের ভয় সঞ্চার করিয়া দণ্ডনীতি দ্বারা নিজ রাজ্যের সুশাসন করেন, সেইরূপ সেই রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের রক্ষা ও সুশাসন জন্য দণ্ডনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক রোগ-শোক-মৃত্যু প্রভৃতি কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা কঠোর পাপীর শুদ্ধি ও অল্পপাপীর মনে ভয়-সঞ্চার দ্বারা শুদ্ধিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে একলা এইরূপ ভাবে শুদ্ধি কার্য্য করিতে না দিয়া, আমরা সকলে যদি শুদ্ধচিত্ত হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্য করা রূপ মহৎকর্ম্ম ও আত্মরক্ষা—উভয় কার্য্যই সম্পাদন করা হয়। দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ধনী, বিলাসি দরিদ্র প্রভৃতি কেহই নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। ইহার উপায় কি—যদি সকলে চিন্তা করেন, তবে নিশ্চয়ই উপায় উদ্ভাবন করিয়া সকলে সুখে—সুস্থশরীরে সেই শান্তিময় শ্রীহরিকে সদা সর্ব্বদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হৃদয়পদ্মে চিন্তা করিতে করিতে—তাঁহারই যত প্রিয়কার্য্য সমস্ত সম্পাদন করিতে করিতে, ইহকালে ভোগ ও পরকালে সেই পরম রমনীয় দর্শনকে দর্শন করিবার অধিকারী হইয়া পূর্ণ আয়ুস্কাল ভোগ করিয়া, মৃত্যুরূপী

শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সেই মৃত্যু দ্বার দিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অমৃত মূর্ত্তিকে প্রাপ্ত হইয়া, নরজন্ম সার্থক করিতে পারেন। এখন দেখা যাউক, এই উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া কি করা উচিত? ভাবিয়া দেখিলে জ্ঞান হইবে যে, এই সকল কষ্টের মূল কারণ কি? উপস্থিত এই জগদ্বিধ্বংসী মহামারীর মূল কি? সকল শাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রোগের পর পর কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে সর্ব্বনিম্নমূলে দেখিলেন "তস্যাপি মূলমধর্ম্ম" সকল ব্যাধির মূল অধর্ম্ম। কোথাও আমাদিগকে নিজের অধর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হইতেছে ও এইটাই বেশীর ভাগ, কোথাও আমরা যাহার সঙ্গে থাকি বা যাহাদের সঙ্গে একদেশে থাকিয়া সেই দেশোৎপন্ন সুখ ভোগ করি, তাহাদের পাপ-রাশি দ্বারা কলুষিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধির হাতে পড়ি। আজকালকার বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, নানাপ্রকার রোগের বীজাণু অতি সূক্ষ্মভাবে সকলের অলক্ষিতে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান আছে। কোথাও এই বীজাণু বেশী পরিমাণে আছে, কোথাও অল্প পরিমাণে আছে, কোথাও নাই। কোন ব্যক্তির রোগ-প্রবণতা এত বেশী যে, কোন ব্যক্তির কোন ব্যাধির বীজাণু নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বা খাদ্য-পানীয় দ্রব্য দ্বারা বা ক্ষতাদি দ্বারা রক্তে সংযোগ দ্বারা বা রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শ দ্বারা সেই রোগাক্রান্ত হইতে হয়। কেহবা এই সকল কারণ বিদ্যমান্ থাকা স্বত্বেও রোগাক্রান্ত হননা। রোগের কারণ—রোগের বীজাণুই কেবল যে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান আছে—তাহা নহে, উহা জলে এবং মৃত্তিকাতেও বিদ্যমান আছে। যক্ষা-বসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজাণু বায়ুমণ্ডলে ভাসমান্, ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু জলে মিশ্রিত থাকে এবং প্লেগ ইত্যাদি রোগের বীজাণু পৃথিবীতে মৃত্তিকার অনুস্যূত। মহামুনি ত্রিকালদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিয়াছেন, "মনুষ্যের পাপ প্রথমে বায়ুকে, পরে জলকে ও অবশেষে পৃথিবীকে দূষিত করিয়া নানাপ্রকার ব্যাধি—এমন কি মহামারী পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে।" আজকাল দেশে যজ্ঞ একরকম উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যহ গব্যঘৃত দ্বারা যজ্ঞ হইত। এখন বিশুদ্ধ গব্যঘৃত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিয়া ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, "একটু গব্যঘৃত খাইতে পাইনা, তা' হোম কি প্রকারে করিব?" অহোরাত্র গায়ত্রী জপ না করিলে, তিনদিন সন্ধ্যাবন্দনা না করিলে এবং দ্বাদশ দিন হোম না করিলে ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। একথা আধুনিক ব্রাহ্মণগণ একবারে ভুলিয়া গিয়া, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া, নানা কুসঙ্গে মিশিয়া ভারতীয় মনুষ্য সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া—সমস্ত সমাজকে দূষিত করিতেছেন। মস্তকে যে প্রকার দূষিত জল ঢালা যায়, সেই দূষিত জল উর্দ্ধ অঙ্গ ধৌত করিয়া তত্রত্য মলা গ্রহণ করিয়া আরও দূষিত হইয়া অধঃ শরীরকে বিশেষভাবে দূষিত করে। আমাদের আজ সেই দশা হইয়াছে! সমাজের নেতা ও শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হওয়ায় ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করায় অন্যান্য বর্ণও পতিত হওয়ায় পাপের স্রোতও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। পূর্ব্বে সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ অরণ্যবাসী হইয়াও গাভীপালন করিতেন ও গাভীদুগ্ধ পান ও ঘৃত-ভোজন ও ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের ধ্যানে নিরত থাকিয়া স্বাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা ও নিজ আশ্রমকে

বেদধ্বনি নিনাদিত করিয়া, নিজেরা সুস্থ শরীরে থাকিতেন ও বায়ু, জল ও পৃথিবীতে পবিত্র রাখিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেন। এখনো আমরা যতটুকু বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত খাইতে পাই, তাহাতে যদি হোম করি, তাহা হইলে সেই হোমের ঘৃতাহুতির সুগন্ধে মনকে আমোদিত ও প্রফুল্ল করিয়া বহুগুণ ফল প্রদান করিতে পারে। ইহাতে যে কেবল আমাদের উপকারেরই সম্ভাবনা, তাহা নহে, সেই হোমদ্বারা দেবতারা তৃপ্ত হন, গৃহ পবিত্র ও বায়ু বিশুদ্ধ হয় ও যত দূর সেই হোম-ধূম বিস্তৃত হয়—ততদূর প্রতিবেশীদেরও কল্যাণ করে এবং সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া ফেলে। দেশ হইতে সেই মহান্ হিতকর হোমকার্য্য উঠিয়া গিয়াছে, সেই বেদধ্বনি উঠিয়া গিয়াছে, সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ উঠিয়া গিয়াছে, তাহার উপর মনুষ্যের নানাপ্রকার পাপ বাড়িতেছে, তাই দেশে এই মহামারী। আমাদের চেষ্টা নাই, কাজেই নানাপ্রকার ওজর ও আপত্তি দ্বারা আমরা এখনকার দিনে হোম অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু চেষ্টা করিলে এখনও অধিকাংশ গৃহস্থ গাভী পালন করিতে পারেন এবং টাট্‌কা গোময়ে ও গোমূত্রের গন্ধে গৃহকে পবিত্র রাখিতে পারেন ও গব্যদুগ্ধ পান দ্বারা নিজ ও পরিবারবর্গের সকলের বল ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন ও গব্য ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া নিজের ও জগতের অকল্যাণ নিবারণ করিতে পারেন। যাঁহারা মন, ইন্দ্রিয় এবং আত্মাকে সংযত পূর্ব্বক যোগের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন, স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে তাঁহাদের অপ্রাপ্য বা অগম্য কিছুই থাকে না। সামান্য পিপীলিকা সর্ব্বদা উদ্যোগী বলিয়া গমন করিতে করিতে সহস্র ক্রোশ পথ যাইতে পারে, কিন্তু বেগগামী পক্ষিরাজ গরুড় অনুপযুক্ত হইলে এক পা' ও যাইতে সমর্থ হয় না। মার্কণ্ডের পুরাণে আছে—

নাগ্নাবহরণঞ্চৈব ক্রতুভাবশ্চ লক্ষ্যতে।
ন বাপ্যায়ণ মস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে॥
বয়মাপ্যায়িতা মর্ত্ত্যৈ যজ্ঞ-ভাগৈ র্যথোচিতম্।
বৃষ্ট্যা তানন্বু গৃহ্লীমো মর্ত্ত্যান্ শস্যাদি সিদ্ধয়ে॥
নিষ্পাদিতা স্বোষধীষু মর্ত্ত্যা যজ্ঞৈ র্যজন্তি নঃ।
তেষাং বয়ং প্রযচ্ছাম কামান্ যজ্ঞাদি পূজিতাঃ॥
অধোহি-বর্ষাম বয়ং মর্ত্ত্যাশ্চোর্দ্ধ প্রবর্ষিণঃ।
তোয় বর্ষেণ হি বয়ং হবির্বর্ষেণ মানবাঃ॥
যে নাস্মাকং প্রযচ্ছন্তি নিত্য নৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
ক্রতুভাগং দুরাত্মানঃ স্বয়ঞ্চাশ্নন্তি লোলুপাঃ॥
বিনাশায় বয়ং তেষাং তোয় সূর্য্যাগ্নি মারুতান্।
ক্ষিতিঞ্চ সন্দূষয়ামঃ পাপানামপকারিণাম॥
দুষ্ট তোয়াদি ভোগেন তেষাং দুষ্কৃত কর্ম্মিণাম।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে মরণায় সুদারুণাঃ॥

অর্থাৎ অগ্নিচরণ হইতেছেনা, যজ্ঞ সকলের অভাব লক্ষিত হইতেছে। হোম ভিন্ন আমাদেরও অন্য উপায় নাই। মর্ত্ত্যগণ যথোচিত যজ্ঞভাগে আমাদিগকে আপ্যায়িত করে, আমরাও শস্যাদি সিদ্ধির নিমিত্ত বৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। ওষধি সকল নিষ্পাদিত হইলেই মর্ত্ত্যগণ তদ্দারা আমাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে, আমরা ও যজ্ঞাদি দ্বারা পূজিত হইয়া তাহাদিগের অভিলষিত বিষয় সকল সম্পাদন করিয়া থাকি। আমরা অধোদিকে বৃষ্টিদ্বারা বর্ষণ করি, মর্ত্ত্যগণ উর্দ্ধদিকে ঘৃতধারা বর্ষণ করে, যে দুরাত্মারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল আমাদিগের উদ্দেশে অর্পণ করে না এবং লোলুপ হইয়া যজ্ঞভাগ সকল স্বয়ং ভোজন করে, আমরা সেই অপকারী পাপাত্মাদিগের বিনাশের জন্য জল, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু ও পৃথিবীকে দূষিত করি। দুষ্ট জলাদি উপভোগ

দ্বারা সেই দুষ্কর্ম্মাদিগের বিনাশসূচক দারুণ উপসর্গ সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এক হোম দ্বারা কত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই হোমের সাধনভূত হোমধেনু রক্ষা না করিলে আমাদের আর উপায় নাই। ঘৃতাহুতির সদ্‌গন্ধে ব্যাধি বিনিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গব্য ঘৃতের গুণ আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে :—

গব্যং ঘৃত্যং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদু পাকরসং শীতং বাতপিত্ত কফাপহম্॥
মেধা লাবণ্য কান্ত্যোজ স্তেজো বৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মী পাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্র মায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥

গব্যঘৃত চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুভজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফাপহারক, মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর. অলক্ষ্মী বিনাশক, পাপহারক রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুস্কর, মঙ্গলজনক. রসায়ন, সুগন্ধি, রুচিকারক এবং মনোজ্ঞ। ইহা ছাড়া অন্য ঘৃতের ন্যায় বুদ্ধিজনক স্বর বর্দ্ধক, স্মৃতিকারক রক্ষোঘ্ন উদাবর্ত্ত, জ্বর উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক। একদ্রব্যে এত গুণ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জিনিষে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে চর্ব্বি ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্য বা অন্য স্নেহপদার্থ সংমিশ্রিত হয়, তবে বিষক্ষয় না করিয়া বিষেরই কার্য্য করে। ঘৃতের ও তৈলের একটী বিশেষ গুণ এই যে, উহা যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে—তাহার বীর্য্য ও প্রভাব গ্রহণ করিয়া তাহার প্রভাব সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করে। এই জন্য কবিরাজী ঘৃত ও তৈল যে যে দ্রব্যে পাক করা হয়, তাহা তাহার সহিত সংমিশ্রিত না থাকিলেও তাহার গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রিয়া দেহে প্রকাশ করে।

হোমের বিষয় শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্তিষ্ট কাম ধুক্॥
দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈ র্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যে ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥

* * *

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি॥"

এই যজ্ঞ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের ঋষিরা বলিয়াছেন, শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশ এত অধঃপতিত হইয়াছে যে, তাহা কেহ মনে স্থান দিবেন না। তবে যদি কোন বড় ডাক্তার—বিশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, তবে তখনই লোক তাহা মানিয়া চলিবে। আজকাল এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা মহামারী প্রতিষেধের জন্য ইউকিপটাস তৈল, থাইমল তৈল ও মেনথল সর্ব্বদা রুমালে ঘ্রাণ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কেন না উহাদের অনুপরমাণু নাসারন্ধ্রে ও কণ্ঠপ্রদেশে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলে উক্ত রোগের বীজাণু শ্বাস দ্বারা বা আহার্য্য দ্বারা খাইলে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি ইহাই হয়, তবে বিশুদ্ধ

ঘৃত—বিশেষ গব্যঘৃত বিষদোষনাশক ও অত্যন্ত তেজস্কর হইয়া পবিত্র মন্ত্রযোগে অগ্নিমুখে দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া, অতিশয় বীর্য্যবান্ হইয়া, পাপনষ্ট পূর্ব্বক রোগের বীজাণু সকলের সমূলে বিনষ্ট করিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে কি? আর যেমন প্রত্যহ আহার্য্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা আবশ্যক, তেমনি যাঁহারা আমাদের আহার্য্য জোগাইতেছেন, তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাদের আহার্য্য এই ঘৃতাহুতি না দেওয়া কি আমাদের চৌরের মত কার্য্য—মহাপাপের কার্য্য নয়? এই পাপ ছাড়া জগতে আরও কত মহা মহা পাপ হইতেছে; মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চুরি, জাল, জুয়াচুরি, দস্যুতা হিংসা, পশুবলবৃদ্ধি বা জিহ্বার তৃপ্তিসাধন জন্য অসংখ্য প্রাণীর নির্দ্দয়ভাবে সংহার, ইন্দ্রিয়-সেবার জন্য—ভোগ বিলাসের জন্য দুর্ব্বলকে পীড়ন, পরস্ত্রীগমন, মনে মনে অন্য স্ত্রীকে মাতা না ভাবিয়া ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া কামভাবের বিস্তার দ্বারা জগদম্বার স্ত্রীমূর্ত্তির অবমাননা ইত্যাদি কত পাপের কথা বলিব! এই রাশি রাশি পাপ এক দিকে, আর অন্যদিকে ধর্ম্মচর্চ্চা নাই, কাজেই বসুন্ধরা ভীষণ পাপভারে পীড়িতা! পূর্ব্বকালে এইরূপ বসুন্ধরা পাপ অত্যাচারাদি প্রপীড়িতা হইলে ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করিতেন, অর্থাৎ জগতের সকল লোক প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিত ও ইহা বলিয়া গাহিত যে "ধরমের গ্লানি আসিবে আপনি শ্রীমুখেতে বলেছিলে, আজ অকূলে আকুল, ডাকে জীব কুল, ও কোলে নাওহে তুলে" এখন আর সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেনা, তাই তিনিও আসিতেছেন না, কিন্তু বসুধার ভার হরণের জন্য কতকগুলি ভীষণ ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া সংহার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার স্তব-স্তুতি-প্রণাম ইত্যাদি যে সকল ঋষিবাক্যে সংস্কৃত ছন্দে বদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে কেবল যে চিত্তশুদ্ধি হয়, হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়—তাহা নয়, সেই পবিত্র শব্দের কীর্ত্তনে, তাঁহার হরি হরাদি নাম উচ্চারণে শব্দব্রহ্মের সাহায্যে পরব্রহ্মকে পাইবার চেষ্টায় বায়ু, জল, পৃথিবী পবিত্র হয় এবং সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়। আমাদের দেশে গৃহস্থের গৃহে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দেবোদ্দেশে ধূপদীপ দান ও শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা ছিল, তাহা প্রায় লোপ পাইল! কিন্তু যেমন একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ বলিলেন, শঙ্খের ধ্বনিতে রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, ধূপের গন্ধে বায়ু শুদ্ধ হয়, অমনি অনেকে ধূপ দেওয়া ও শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সেই শঙ্খ-চক্র গদাপদ্মধারী শ্রীহরির পবিত্র নাম পরিবারের সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা কই করিলেন! শ্রীহরি পূজায় পয়সা খরচ নাই। তিনিই শ্রীমুখে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন:—

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতং মশ্নামি প্রযতাত্মন॥

তাহার পর—

> যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম॥

যা কিছু করি, তাঁহারই কার্য্য করি এবং তাহা তাঁহাকে অর্পণ করি—এই তো তাঁহার পূজা। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল, সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা করি—তাহাতে তাঁহার পূজা হউক। এই ভাবনায় কাজ করিলে পাপ আসিতে পারে না। তাহার পর শ্রীভগবান যে ফুল, ফল, পাতা, জল দ্বারা তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার

পূজা ও হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে ও বায়ু প্রভৃতি পবিত্রযুক্ত হয়। একে দেবতারা আমাদের পাপের জন্য বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবী, সূর্য্য (সূর্য্যের কিরণ) অপবিত্র পূর্ব্বক আমাদের রোগের ও সংহারের ব্যবস্থা করিতেছেন, আমরাও অন্ধ হইয়া, নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া এই সকলকে দূষিত করিতেছি। যে অগ্নিতে নানাপ্রকারসুগন্ধি—সুমিষ্ট পবিত্র দ্রব্য দেবোদ্দেশে পূতঃ হইয়া মহাসৌরভ বিস্তার পূর্ব্বক অগ্নির, সূর্য্যকিরণের বায়ুর দোষ ও রোগের বীজাণু সকল নষ্ট করিত, এখন সেই অগ্নি 'মোটর' চালান তৈলের দুর্গন্ধ-বিস্তারে, অ্যাসিটিলিন্ কোলগ্যাস্ প্রভৃতির দুর্গন্ধময় পদার্থের দহনদ্বারা বায়ুকে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণগণ শ্রীভগবানের বিভূতি বেশী থাকার জন্য অগ্নিকে জড় পদার্থ না ভাবিয়া ভগবানের বিশেষ সত্বায় সত্বান্বিত ভাবিয়া দেবভাবে পূজা করিতেন, সেই নমস্য অগ্নি আজকাল বিড়ি, চুরুট, সিগারেটের-হোমকারী সম্পাদন করিয়া পানা বশিষ্ট বিড়ি ইত্যাদির সহিত সবুট পদদলিত হইতেছেন! একদিন কোন বিখ্যাত উকীল বাবুর বাসায় প্রবেশ করিবার পথের ধারে দেখিলাম যে, রক্তপূঁয মিশ্রিত তুলা অগ্নি দ্বারা অৰ্দ্ধদগ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। ভাবিলাম ও মনে মনে কান্দিলাম যে, হে অগ্নিদেব! কোথায় তোমার দেবভাবে ঘৃতাহুতি দান, আর কোথায় তোমার অমেধ্য হরণ। যাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইলে বায়ু দূষিত করিতে পারেনা তাহাই অবাধে অগ্নিসংযোগে বায়ুতে বিস্তৃতি লাভ পূর্ব্বক আমাদের ইহকাল ও পর কালের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে। এই ত অগ্নির দুর্দ্দশা। সূর্য্য স্বয়ং পবিত্র, কিন্তু আমরা মলাদি সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শ দ্বারা দূষিত করিতেছি। পূর্ব্বে মাঠে মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা ছিল এবং তাহার পর তাহার উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৃত্তিকা চাপা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল, —যাহাতে সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে ইহা বায়ুমধ্যে সঞ্চালিত না হয়। আজকাল কিন্তু সে প্রথা পল্লী গ্রামে লোপ পাইয়াছে ও সহরের ময়লা গুলিও সহরের বাহিরে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডে কোথাও অৰ্দ্ধ প্রোথিত কোথাও প্রোথিত না করিয়াই ফেলা হইতেছে, কোথাও বা নদী-জলে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। আমি একবার শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটে যমুনায় স্নান করিবার সময় জলে বাঙ্গালার চিরপ্রচলিত মতে কুলকুচা করিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া একটি ব্রজবাসী আমার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "এ বাঙ্গালি! তম্ যমুনা মাইপর কুলকুচা কর দিয়া।" হরিদ্বারেও এইরূপ। সেখানে পাণ্ডারা গঙ্গায় দন্তধাবন করিতে দেন না। 'ঘটি'তে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া দূরে মুখ ধুইতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কি ঘোর কুৎসিৎ প্রথা! লিখিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়, পল্লীগ্রামে বঙ্গললনারা যে পুষ্করিণীর জল লইয়া রন্ধন পূর্ব্বক প্রিয় পুত্র ও স্বামী প্রভৃতিকে ভোজন করান, তাহারই জলে মূত্রত্যাগ ও শৌচাদি করেন, ছেলের মলমূত্রসিক্ত বস্ত্র প্রক্ষালনও করেন। অল্প চেষ্টায় এই জঘন্য ও ভয়ানক স্বাস্থ্যহানিকর প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেহই এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। জলকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। জলে ভগবানের বিভূতি খুব বেশী বলিয়া ব্রাহ্মণের সন্ধ্যায় জলের মধ্য দিয়া ভগবানের আরাধনার ব্যবস্থা। জলে পবিত্র হইয়া তাঁহারই উপাসনা—গায়ত্রী জপ ও ধ্যানের

ব্যবস্থা। পুকুরের জলে পুরুষেও কাপড় গামছা কাচা, কুলকুচা করা, মুখ ধোয়া থুঁথু ফেলা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জলকে নানা প্রকারে দূষিত করিয়া সেই জলপানের ফলে স্বল্পমাত্রায় বিষপানে আত্মহত্যার ন্যায় নিজের প্রাণকে অকালে কালকবলে প্রেরণ করিতেছেন। সহরে কলের জল বলিয়া ততটা দূষিত হয় না। কিন্তু যে নল দিয়া জল অনবরত আসে, তাহা শুদ্ধিকর বায়ু বা সূর্য্যকিরণের মুখ দেখেনা ও নলের মধ্যে যে ময়লা জমে, জল আসিবার সময় তাহাও ধৌত হইয়া আসে। তাহার পর নদ নদীর কথা। নদ নদীতে তো আজকাল ময়লাবহারের কার্য্য পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। যে পতিতপাবনী সুরধনী বিষ্ণু পাদোদ্ভবা বলিয়া বিখ্যাত যাঁহার এক বিন্দু জল মৃত্যুকালে মুখে পড়িলে মানব মুক্ত হয় ইহাই শাস্ত্র বাক্য—যাঁহার পবিত্র বায়ু অঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে জীবিত অবস্থায় নিষ্পাপ অর্থাৎ স্বাস্থ্যোন্নতি ও অন্তে স্বর্গভোগের হেতু হয় এবং যাঁহার তীরে দেহ ত্যাগ করিয়া কত কোটী কোটী সাধু, সুধী, জ্ঞানী প্রভৃতি এবং উপস্থিত নিজ কার্য্যের দ্বারা মহাত্মা ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কষ্টকর মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন, সেই সুরধনীর আজ কি অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, গঙ্গাজলে সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, কিন্তু যদি আমরা উহাতে রাশিরাশি ময়লা নিক্ষেপে উঁহাকে অপবিত্র করি. তাহা হইলে আমরা যে অনিষ্টের পথ প্রশস্ত করিব. সে বিষয়ে আর কথা কি? পবিত্র কাশীধামেও সহরের নর্দ্দামার ময়লা গঙ্গায় আনিয়া ফেলা হইতেছে। ইহাতে কি কাশী মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হইতেছে না। আজ কাশীধামে এই মহামারী কি ভয়ানক সংহার কার্য্য অবলম্বন করিয়া আমাদিগের চক্ষু ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। এতেও যদি দেশের লোকের ও স্বাস্থ্যবিভাগের লোকের চৈতন্য না হয়, তবে কি দেশ শ্মশানে পরিণত হইলে তবে চক্ষু ফুটিবে? যা' হবার হইয়াছে এখনও যদি আমরা সাবধানও যত্নপর হই. তবে আমাদের বংশ থাকিবে, নতুবা যেরূপ মহামারী আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যদি উহা শীঘ্র না কমে, তবে যে কি ভীষণ অবস্থা ঘটিবে, তাহা ভাবিবার বিষয় নয় কি? জল কিরূপে দূষিত হইয়া ব্যাধি সৃষ্টি করিতেছে তাহা বলা হইল। ঈশ্বরের কেহ প্রিয় কেহ অপ্রিয় নাই। তাঁহার নিকট সকলেই সমান, তবে যেমন অগ্নির নিকট গেলে শৈত্য নিবারণ ও আলোক পাওয়া যায়, তেমনি ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা পূজা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার প্রিয় হওয়া যায় ও ইহকালে সাংসারিক সুখভোগ করিয়া অন্তে তাঁহাকেই পাওয়া যায়। আমরা না ইহকালের উপায় করিতেছি, না পরকালের ব্যবস্থা করিতেছি। আলস্যে বিলাসে, ব্যসনে, পর নিন্দায় পরচর্চ্চায় খেলায়, মত্ততায় ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ত হইয়া আমরা অতল জলে ডুবিতে যাইতেছি। ভক্তের এই গানটি বড়ই ভাবোন্মেষক।

"হরি বলরে ভাই—নাম বিনে আর ভব পারের
বন্ধু নাই,
হরিনামের মতন কি আছে রতন, করনা যতন
কেন ভাই।
অলসে বিলাসে নিলি না মুখে—বিষয় লালসে
মজিলি সুখে,
বরষে বরষে পলকে পলকে সময় বহিয়া যায়,
(ও নাম) যদি এখনও না বলবি—তবে কি আর
করবি—ঘাটে বসে কাঁদবি ভাই।

কি ছার অসার আমোদে মেতে, সুপথ ছাড়িলি,
ধাইলি কুপথে,
কুসঙ্গে মজিলি ডুবিয়া মরিতে—কুসঙ্গে লইলি ঠাঁই,
যখন সাতারে পড়বি,, পার না পাইবি, হাবু ডুবু
খাইবি ভাই।
না বুঝে না সুঝে যা হয় তা করলি, এখনো ফিরিলে
পাইবে সকলি,
এখনও ডাকিলে শুনিবে কাণ্ডারী—ধরিয়া তুলিবে
নায়।
(ও তুই) আর কত হবি তল, হরিবল হরিবল,
পারের সম্বল কর ভাই।
যত পতিতে তারিতে করুণা করিয়ে মনেতে ভাবিয়ে
হরিনাম আনিয়ে দিয়েছে ঢালিয়ে জগত ভরিয়ে
গৌর আর নিতাই।
তোরা আয় সব ছুটিয়ে, নিয়ে যা লুটিয়ে, এমন
দিন কি পাবি ভাই।"

সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম সমূহের সাধারণতঃ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এই ভগবদুপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা আটটি—

সত্যং শৌচমহিংসা চ অনসূয়া তথা ক্ষমা।
আনৃশংস্যামকার্পণ্যং সন্তোষ স্তাষ্টমে গুণাঃ॥

পত্র পুষ্প পূজার ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্র দেখাইতেছেন। তুলসী পত্র যে কত রোগ ও রোগের বীজাণুনাশক, তাহা "আয়ুর্ব্বেদে" পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে। বিল্বপত্রের রস পান করিলে বহুবিধ রোগ নষ্ট হয়। যে জিনিসের গুণাধিক্য বেশী, সেই জিনিসেই ভগবান বিশেষভাবে আছেন। তুলসী বৃক্ষে নারায়ণের অধিষ্ঠান, বিল্ববৃক্ষে মা জগদম্বা ও শিবের অধিষ্ঠান। পদ্ম যেমন শোভাবিশিষ্ট, তেমনিই সুগন্ধিযুক্ত। জবার শোভা মা জগদম্বার এবং মহেশ ও নারায়ণের পদতলের ন্যায়। অপরাজিতার শোভা মা কালী ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়। এই সব পুষ্পপত্র দ্বারা পূজায় মন আনন্দিত, ভগবচ্চরণে ধ্যান ঘনীভূত এবং চিত্তশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। ইহাও আমরা ছাড়িয়াছি। ডাক্তারেরা বলেন যে, তুলসীর গুণ থাইমলে আছে। অথচ আমরা পয়সা দিয়া থাইমলের ঘ্রাণ লইতেছি, কিন্তু বিনাপয়সায় নারায়ণপাদপদ্মে অর্পিত—রক্তচন্দনচর্চ্চিত তুলসীপত্র ভক্ষণ করিতেছিনা। রক্ত বা শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত বিল্বদল মহাদেব ও মা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছিনা। ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? যে বিল্ববৃক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে "দর্শনং বিল্ববৃক্ষস্য স্পর্শনং পাপনাশনং" সেই বিল্ববৃক্ষ কর্ত্তন করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি!

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

ফলে আমরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া, স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি ও মুক্তিলাভের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ইহাই আমাদের পক্ষে অনিষ্টের প্রধান কারণ।

মৃত্তিকার দোষ নিবারণের প্রতীকার—গোময় লেপন। এখন আমাদের 'কোটা ভিটা' হওয়ার ফলেও তাহাও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে! এখন আমাদের ঘরগুলি পয়সা খরচ করিয়া ফেনাইল দিয়া ধোয়ান হয় ও তাহার দুর্গন্ধ ভোগ করা হয়, অথচ টাট্‌কা গোবর যাহা বিনা পয়সায় লভ্য—তাহার সদ্গন্ধ 'বাবুদে'র ভাল লাগে না।

আমরা আমাদের ঋষিবাক্য না শুনিয়া গোবরকে অবহেলা করিয়াছি। সাহেব ডাক্তার কিন্তু গোবর সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শুনুন। "প্লেগরোগ বিস্তারের সময় গৃহত্যাগ করিতে-

হয় এবং সেই গৃহে আসিবার পূর্ব্বে শুষ্ক গোময়, শুষ্ক নিমপত্র ও গন্ধক একত্র জ্বালাইবে।"

Burn Cowdung and Neem leaves and Sulphur in it.

Sd. W. C. Ross Major, I. M. S.
Sanitary commissioner B+O.

গোমূত্রের গুণ অনেক—ইহা তীক্ষ্ণ. প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্ম-রোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক। ইহা অগ্নি দীপ্তিকারক, মেধাজনক, কৃমি ও কুষ্ঠ-রোগ নাশক। গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নষ্ট হয়। গোময় ১ ভাগ গোমূত্র ২ ভাগ, গোমূত্রের চারিগুণ ঘৃত, ঘৃতের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের আটগুণ দধি গ্রহণ করিবে। এই সকল মিলাইয়া যে পঞ্চগব্য হয়, তাহা মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিয়া নারায়ণের এবং শিবশিবা প্রভৃতির স্নানে দেওয়া হয়, দধি, দুগ্ধ ঘৃত, চিনি মধু এই পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও পানীয় দেওয়া হয়। চন্দনমিশ্রিত জলে স্নান করান হয়। ঐ জল, গঙ্গাজল বা কূপ বা নদীর জল তাম্র-নিৰ্ম্মিত কোষায় থাকিয়া পবিত্র হইয়া—শক্তি-যুক্ত হইয়া দেবতার পাদ্যঅর্ঘ্য স্নান প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। সেই স্নানজল পূজার পাত্রে সংগৃহীত হয় এবং তাহার সহিত সচন্দনতুলসী পত্র, সচন্দন বিল্বপত্র, সচন্দনজবা পুষ্প (যাহার সিক্তজল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই উপকারক) এবং অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্প মধুদ্বারা সংমিশ্রিত হইয়া কি অপার্থিব অমৃত উৎপাদন করে, তাহা আধুনিক সভ্য জগতের 'বাবুরা' ভাবিতে পারেন না। এই স্নানজল বা ভগবানের চরণ ধৌত জলকে ঋষিরা কত রোগের বীজাণু-নাশক ও কত উপকারক বলিয়া—অকাল মৃত্যুহারক বলিয়া এই মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন,—

অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশনম্।
বিষ্ণু পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

এখন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া ইহার উপসংহার করা যাউক। আমি এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা আপনি যে স্থানে আছেন ওখানে ত প্লেগের প্রকোপ খুব, আপনি নিশঙ্কে কি প্রকারে সেখানে থাকেন?" তাহাতে স্বামীপূজ্যপাদ শ্রীযোগানন্দ সরস্বতী লেখেন যে, "ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত থাকায় কোন ভয় বা আশঙ্কা হয় না।"

রোগীর সংসর্গে রোগ হয়। কিন্তু যাঁহারা রোগীর সুশ্রূষা বা চিকিৎসা করেন, তাঁহারা মনে একটা সাত্ত্বিক বল লইয়া কার্য্য করেন বলিয়া সংক্রামক রোগ সকল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। একটা গোরুর কাছে ভয়ে ভয়ে গেলে সে সিং নাড়া দেয়, কিন্তু সাহস করিয়া গেলে সে কিছুই করেনা. অথচ উভয় অবস্থায় যে যায়, তাহার বাহ্যিক আকার একই প্রকার। মনের গতির জন্য এই দুই প্রকার ভাব হয়। রোগও বোধ হয় মনের বল ও শরীরের বল দেখিয়া আক্রমণ করে। বীর্য্যধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যধারণ না হইলে মস্তিষ্ক বলবান হয় না। বুদ্ধিতেজস্কর না হইলে ভগবান বুদ্ধিযোগ দিয়া তাহাতে আত্ম-যোগে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশালী জ্ঞানালোক দ্বারা আমাদের মোহান্ধকার নষ্ট করেন না। পূর্ব্বেও এই বাঙ্গালা দেশ ছিল, কিন্তু এখানে এত ম্যালেরিয়া ছিল না, তাহার কারণ তখন দেশের লোক বায়ু প্রভৃতি পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিত এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তায় নিরত থাকিত। তখন সকল গ্রামেই হরিনাম হইত। এখন

তাহার বদলে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, দাবা, তাস, পাশা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তামাকটা কোনরূপে না কোনরূপে আমাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে। ইহাতে আমরা হীনবল হইয়া নানারোগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছি। এখন এই ভীষণ মহামারীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, তামাক—কি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। বাজারের খাবার ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে গৃহপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন, জলখাবারাদি শ্রীভগবানকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। দেবপূজা করিতে হইবে, হোম করিতে হইবে এবং উপরে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল—তাহার ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ ও গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। হরীতকী প্রত্যহ একটু করিয়া খাওয়া উচিত। শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবার সময় অন্নে ও পানীয় জলে তুলসী পত্র দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপাদোদক পান ও প্রত্যহ পূজা করা এবং বিল্বপত্র ভক্ষণ করা উচিত। প্রাতে পূজার পর বিল্বপত্র এবং জলপানের সময় পূজা পূর্ব্বক তুলসী পত্র দিয়া সেইজল পান করা ও সেই তুলসী পত্র চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করা উচিত। যে গৃহে হোম হইবে—তথায় দ্বাররুদ্ধ করিয়া পরিবারের সকলে কিয়ৎকাল হোমকালীন অবস্থান করা, হোমের তিলক ধারণ করা ও চরণোদক পান করা উচিত, কারণ হরি সকল দেবতাকেই বুঝায়। আর

হরি হরতি পাপানি দুষ্ট চিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্ট দহত্যেব হি পাবকঃ॥

হরিং হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবী জলং।
অন্তর্ম্মলবিনাশায় স্মরেৎ খাদেৎ জপেৎ পীবেন্নরঃ।

সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। বীর্য্যধারণে রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় না। পরম পূজ্যপাদ ৺কৈলাসপতি গোস্বামী স্বামীজি বলিয়াছিলেন,—"বাবা বাঙ্গালা-দেশের মত দেশ নাই,—যদি প্রত্যেক ব্রাহ্মণে ত্রিসন্ধ্যা করে, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গুরুপূজা ও ইষ্টপূজা করে, কিম্বা সকলে না পারিলেও প্রত্যেক গ্রামে কেহ কেহ নিত্য হোম করে, তবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি কোথায় পলাইয়া যায়।" এই সব করার সঙ্গে কিছু ঔষধ ব্যবহারে আত্মরক্ষাকে বড়ই দৃঢ় করে। আমি নিজে ও পরিবারে সকলে ম্যালেরিয়া মিশ্রিত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হই, শ্রীভগবানের কৃপায় সকলে ডাক্তারি ঔষধ সেবন করিয়া ভাল হই, কিন্তু দুর্ব্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি কিছুতেই যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া নিম্নলিখিত পাচনটি সেবন করিয়া সকলেই বিশেষ উপকার পাই। ইহা প্রতিষেধকরূপেও ব্যবহৃত হইলে উপকার বই অপকার করিবে না।

নিমছাল, চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, বাসক, কণ্টকারি, হরীতকী ও আমলা প্রত্যেক ।০ চারি আনা, জল অর্দ্ধসের, পাকশেষ অর্দ্ধ-পোয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রাতে সেব্য।

এখন যেরূপ মহামারী হইতেছে, এইরূপ গৃহে গৃহে পূজাদি হোম ও সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্ত্তন হওয়া অত্যাবশ্যক। নগর সংকীর্ত্তন আরও ভাল।

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং কলেবরম্।
ঔষধং জাহ্নবী-তোয়ং বৈদ্যোনারায়ণোহরিঃ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল।

পৌষ-পার্ব্বণ।

—:*:—

শীতের জড়তা ঠেলি'—   এ উল্লাস কোথা পেলি—
অয়ি! বিষাদিনী—বঙ্গ জননী আমার
কিসের এ আয়োজন ? পূজা আজি কা'র ?
চির অভিশপ্ত দেশে,   সাক্ষাৎ কমলা এসে—
সহসা কি খুলে দিল "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ?"
কোথা' গেল—ক্ষীণ কণ্ঠে দীন-হাহাকার ?

বল কোন্ মহোৎসবে,   মাতিয়াছে আজ সবে,
ঘরে ঘরে কেন হেরি আনন্দ তুফান ?
কি প্রাসাদ—কি কুটীর, সকলই সমান।
গৃহিণীরা ভোরে উঠে,   এনেছে চাউল কুটে,
কোন্ মহাব্রত আজ হ'বে উদ্‌যাপন ?
অতীতের স্মৃতি এ যে ! প্রেমের তর্পণ !

গৃহ-কোণে বঙ্গ বধূ   বুকে স্নেহ, মুখে মধু,
"নবান্নে"—নূতন শস্য, দেবতারে দিয়া,
রেখেছিল শেষ ভাগ যতনে তুলিয়া।
বাহান্ন সপ্তাহ তরে,   কতই আগ্রহ ভরে,
সে সম্বলে "রত্ন ঝাঁপি" ভরিয়া যতনে,
"বাউনী" বাঁধিল বালা খড়ের বন্ধনে।*

তিন দিন গৃহ ছাড়ি'   যেওনা কাহারো বাড়ী"
মমতায় সুমধুর—বধূর শপথ,—
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য দেখ্‌রে জগৎ।

* বাহান্ন (৫২) সপ্তাহে বর্ষ গণনা করিয়া, সম্বৎসরের জন্য পুরাকালের গৃহিণীগণ শস্য সঞ্চয় করিয়া গোলায় বাঁধিয়া রাখিতেন। ইহার নাম ছিল "বাহান্নী", তাহাই অপভ্রংশে "বাউনী বাঁধা" নাম পাইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য পড়িলে পাঠক ইহা সবিস্তারে জানিতে পারিবেন।—লেখক।

পতি-পুত্র-পরিজনে— তুষিতে প্রফুল্ল মনে
অন্তঃপুরে—অবতীর্ণা "অন্নপূর্ণেশ্বরী"—
রাঁধিয়াছে কত খাদ্য বঙ্গের সুন্দরী।

মধুর "মোচার ঘণ্ট" সুধারসে সিক্ত কণ্ঠ,
কোমল 'পালমশাকে' মটরের বড়ী;
রসাল ক'রেছে তা'রে—মিশাল চিঙ্গড়ী।

বিবিধ মসলা যুক্ত— মূলার "মোহন শুক্ত"
ঘন অরহর ডালে—'জীরার ফোড়ন্'।
'কপি' সহ 'কই মাছ'—বিশ্বে অতুলন।

'তিল-পিটুলীর' বড়া ছাঁকা তেলে ভাজা কড়া,
'আমড়ার' "গুড়াম্বল" সুস্বাদু সরস।
ভেটকী মাছের ঝোলে কে না হয় বশ;

ঘৃতে ভাজা তপ্ত লুচী, সদ্য অরুচির রুচি,
আস্কে, চুষী, পাটী-সাপ্টা, পাঁপর, কচুরি,
নূতন "ন'লেন" গুড়ে" মণ্ডার মাধুরী।

রসে মোলায়েম মিঠা, গোলাপী গোকুল পিঠা,
মুগের মগধ লাড়ু, কৃষ্ণ তিলে ছাঁই,
পান্তুয়া, নিখুঁতি, বোঁদে, মালপো মিঠাই।

পায়স—কামিনী চেলে, দেবরাজ খান পেলে,
পূর্ণিমার পূর্ণ শশী—সে 'সরুচিকুলী,'
দেশী মেওয়া, পূর দেওয়া, নানাবিধ 'পুলি'।

হা নিষ্ঠুর! হা নির্ব্বোধ! মাতৃ ধনে তুচ্ছ বোধ?
কেন সে' অখাদ্য খাও, কোন্ অনুরাগে?
এর কাছে, 'কাটলেট' কোর্ম্মা কোথা লাগে?

আর কত দিন ওরে! থাকিবি এ মোহ ঘোরে?
জননী-পীযুষ কিরে, অযত্নের ধন?
এত কি লেগেছে ভাল গোহাড় চর্ব্বণ?

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

ডাক্তারের ডায়েরী।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাত্মা ৺হেমচন্দ্র সেনের নাম কোন্ বাঙ্গালী না শুনিয়াছেন? তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য, আতিথেয়তা, তাঁহার সমদর্শিতা অদ্যাপি প্রবাদের মত পশ্চিমভারতে ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার রোগীগণ তাহাকে ধন্বন্তরির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দিল্লী প্রবাসী কোনও বাঙ্গালীর কাছেই তিনি ভিজিট লইতেন না। তীর্থ-যাত্রী ভদ্রলোকগণের আদর অভ্যর্থনার জন্য—তাঁহার প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার দ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত থাকিত।

চিকিৎসা কার্য্যে—তাঁহার অনন্য সাধারণ "হাত যশ ছিল। তাঁহার অভিমত—নব্য ডাক্তারগণ গুরু উপদেশের মত শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন; হেমবাবু তাঁহার বহু অভিমত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতেন। সেই পুরাতন ডায়েরীতে আমাদের মত লোকের অনেক জিনিষ শিখিবার আছে। "আয়ুর্ব্বেদে" ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত হইবে।

[—সঙ্কলয়িতা।]

উত্তেজনার কার্য্যে ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করা ভ্রম।

"সাধারণ লোকে ব্রাণ্ডীকে উত্তেজক বলিয়াই জানে। তাহাতে তত দোষ ধরি না। কিন্তু অনেক ডাক্তারও যে ব্রাণ্ডীকে উত্তেজক পদার্থ মনে করেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আমি দেখিয়াছি, বেশ নামজাদা ডাক্তার—প্রসূতা নারীকে, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগীকে,—পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে—পোর্ট, সেরী, ব্রাণ্ডী ও ভাইব্রোণা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত—প্লেগাদি মহামারীর প্রকোপ কালে সামান্য সর্দ্দিতে, সহর হইতে পল্লীগ্রামে গমনের সময়ে—পোর্ট, সেরী, ব্রাণ্ডী ও ভাইব্রোণা ব্যবহার করা খুব ভাল। কিন্তু এই ধারণাটী তাঁহাদের মারাত্মক ভ্রম। কেননা ব্রাণ্ডী ক্ষণিক উত্তেজক হইলেও উহা একটী অবসাদক পদার্থ। যেখানে উত্তেজনার আবশ্যক, সেখানে ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

ব্রাণ্ডী পান করিলে, শরীর উষ্ণবোধ এবং দেহে বলাধান বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণ-স্থায়ী। ব্রাণ্ডীপানের পরবর্ত্তী অবসাদ অতি ভয়ঙ্কর। অতএব যেখানে হৃদ্‌পিণ্ডের শক্তি নাশের সম্ভাবনা—সেখানে কখনও ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করিবেনা। ইহাতে কুফল ফলিতে পারে। ব্রাণ্ডীপানের অল্পক্ষণের পর—ত্বাচিক রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, ফলে—হৃদপিণ্ডের রক্ত চাপের হ্রাস হয়, এবং শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া পড়ে। ব্রাণ্ডী বা ব্রাণ্ডীজাতীয় ঔষধ—হৃদপিণ্ডকে কখনই সতেজ অবস্থায় আনিতে পারে না।

বিসুচিকা রোগে—রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হইলে, অনেক চিকিৎসক ব্রাণ্ডীর ব্যবস্থা করেন, যাঁহারা এই ব্যবস্থা করিয়া

থাকেন, আমার বিশ্বাস—তাঁহারা প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া গত্যন্তর বিহীন হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিসূচিকা রোগে—ব্রাণ্ডী কখনও ঔষধরূপে প্রয়োগ করা উচিত নহে।"

ঋতু স্নান।

"আমাদের দেশে—ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ব্যবস্থা আছে। স্মৃতি শাস্ত্রেও এ মত সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক রমণীর ঋতু চারিদিনের ও অধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ—পূর্ণঋতুর অবস্থায়—আর্ত্তব থাকিতে থাকিতে, চতুর্থ দিবসে—শুচি হইবার লোভে স্নান করিয়া, নিজের অমঙ্গল নিজেই ডাকিয়া আনেন। এই সকল নারীর প্রায়ই বাধক বেদনা জন্মিয়া থাকে। "ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান করিবে" শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ, কিন্তু এই চতুর্থ দিবসের অর্থ অনেক নারীই বুঝেন না। তৃতীয় দিবসের মধ্যে যাঁহাদের আর্ত্তব সম্যক স্রাব হইয়া যায়, তাঁহারা ৪র্থ দিবসে স্নান করিবেন। যাঁহাদের ঋতু ৪র্থ দিবসেরও অধিক দিন থাকে,—তাঁহারা ৪র্থ দিবসে স্নান করিলে—কখনই শুচি হইতে পারেন না। ঋতুকালে স্নান—জরায়ু রোগের নিদান। অতএব ঋতু থাকিলে—চতুর্থ দিনে কখনই স্নান করিতে দিবে না।"

মানসিক শ্রমের পর কায়িক শ্রম।

"কতকগুলি লোকের বিশ্বাস অত্যধিক মানসিক শ্রমের পর কায়িক পরিশ্রম করা উচিত। আমাদের দেশের ছাত্রগণ, তাই অধিক পাঠের পর কিয়ৎকালের জন্য অঙ্গচালনা বা ব্যায়াম করিয়া থাকেন। একজন বৈজ্ঞানিককেও বলিতে শুনিয়াছি—এইরূপ ব্যায়ামের দ্বারা, রক্তাধিক্য সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া মস্তিষ্ককে শীতল রাখে। বৈজ্ঞানিক বলেন—তখন শরীরের যে অংশ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তখন সেই কর্ম্মশীলযন্ত্র বিশেষেই রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে সেই যন্ত্রবিশেষ কর্ম্মে রত থাকে, সেই পরিমাণে তজ্জনিত শরীরক্ষয়ও হইতে থাকে। সুতরাং মস্তিষ্ক পরিচালনায় যেমন শরীর ক্ষয় হয়, ব্যায়ামেতেও তদ্রূপ শরীর ক্ষয় হয়, অতএব একটী যন্ত্রের ক্ষয়পূরণের জন্য অপর যন্ত্রকে ব্যবহার করা চলে না। তবে একথা নিশ্চয়, গুরুতর মানসিক পরিশ্রমের পর ব্যায়াম করিলে, শরীর কিছু স্বচ্ছন্দ বোধ হয়।

যাঁহারা গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পাঠাদি মানসিক শ্রমে ও নিযুক্ত হইবেন না। উভয় ব্যাপারই শরীরের অনিষ্ট কর।"

জ্বরের কোন্ অবস্থায় কুইনাইন দিতে হয়?

"কি ডাক্তার, কি গৃহস্থ, উভয়েরই ধারণা—বিজ্বর অবস্থায় অথবা জ্বর নামিবার মুখে কুইনাইন্ প্রয়োগ করা উচিত। আমি কিন্তু এরূপ মতের পক্ষপাতী নহি। জ্বরের কম্পনাবস্থা কাটিয়া গেলেই, কুইনাইন দেওয়া চলে। বিজ্বর অবস্থায় কিম্বা জ্বর নামিবার মুখে কুইনাইন্ দিয়া যে ফল পাওয়া যায়, জ্বরের অতি প্রবল অবস্থায় কুইনাইন দিলে—তা'র চেয়ে অনেক সুফল পাওয়া যায়। ইহা আমার পরীক্ষিত সত্য। আমি ২০ বৎসর ধরিয়া এইভাবে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। যদি ম্যালেরিয়া জ্বর জীবাণুঘটিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাও, তবে কম্পনাবস্থা

কাটিয়া গেলেই—প্রবল জ্বরে নির্ভয়ে কুইনাইন প্রয়োগ করিও। কিন্তু জ্বর ম্যালেরিয়া না হইলে, কুইনাইন দেওয়া ভাল নহে।"

জ্বরের পিপাসা।

"পিপাসা—জ্বরের একটী যন্ত্রণাপ্রদ প্রধান উপসর্গ। পিপাসা নিবারণের জন্য রোগীকে জলপান করিতে দিতে হয়। কবিরাজ মহাশয়েরা জ্বরগ্রস্ত রোগীকে কাঁচা জল পান করিতে দেন না,—তাঁহারা সিদ্ধ করা জল শীতল করিয়া পান করিতে বলেন। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। আমি দুই চারিজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে শীতল জল পানের বিরোধী হইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা রোগীর পিপাসার জন্য—উষ্ণ জলের ব্যবস্থা দেন। এখানে উষ্ণ জল অর্থে luke warm অর্থাৎ কবোষ্ণ (কুসুম কুসুম) বুঝিতে হইবে। আমি এই উষ্ণজল পানের অত্যন্ত বিরোধী, উষ্ণজল পানে রোগীর পিপাসা দূর হয় না, বরং বাড়ে; অধিকন্তু বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়। উষ্ণজল বিস্বাদ,—তাহা পানে রোগীর প্রবৃত্তি বা রুচিও হয় না। একজন বহুদর্শী কবিরাজকে আমি আমার অভিমত জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—গরম জলে রোগীর বমি হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বমিতে অনেক উপকার হইয়া থাকে। বমির সঙ্গে সঙ্গে পাকাশয় ধৌত হইয়া যাওয়ায়—রোগী শান্তি বোধ করে।" আমি কিন্তু আমার রোগীগণকে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিয়া থাকি। অনেকে শ্লেষ্ম-জ্বরে ঠাণ্ডা জল দিতে সাহস করেন না, ভয়—পাছে বুকে সর্দ্দী বসে। ইহা অবশ্যই ভ্রান্তবিশ্বাস। নিমোনিয়া, প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইডিস্ প্রভৃতি রোগেও—ঠাণ্ডা জল পান করিতে দেওয়া যায়। কেননা—জল পানে বুকে সর্দ্দী বসিতেই পারে না। বিশেষতঃ এ সকল রোগ জীবাণু-জাত। জ্বরাবস্থায়—শরীর ক্ষয় জনিত ক্লেদাদি দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা জল পানে সেই সকল ক্লেদ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মূত্র-গ্রন্থির কর্ম্মভার লাঘব করিবার জন্য রোগীকে প্রচুর পরিমাণে মুহুর্মুহুঃ শীতল জল পান করিতে দিবে। শীতল জল পানের আর একটী উপকার—দেহের উত্তাপ কমিয়া যায়।

তথাপি যদি রোগীকে শীতল জল দিতে সাহস না কর, তবে—চায়ের মত অত্যুষ্ণ জল পান করিতে দিও। তাহাতে বরং উপকার পাইবে। কদাচ ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে দিও না।"

নূতন জ্বরে দুগ্ধ পথ্য অনিষ্ট কর।—

"ডাক্তারেরা নূতন জ্বরে দুগ্ধ পান করিতে দেন; কবিরাজী মতে নূতন জ্বরে দুগ্ধ পান—বিষপানের তুল্য, আমি ডাক্তার হইয়াও, এই কবিরাজী মতটীকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি। বাস্তবিক বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—নূতন জ্বরে দুগ্ধ প্রদান করিলে, রোগীর দেহে কফের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে অবস্থায় রোগীকে উপবাস দেওয়ার ব্যবস্থা—সে অবস্থায় দুগ্ধের মত গুরুপাক খাদ্য কখনই দেওয়া উচিত নহে। অল্পদিন জ্বরে ভুগিতে না ভুগিতে আজকাল যে অনেক রোগীর পেটে প্লীহা-যকৃতের আবির্ভাব হইয়া থাকে, নব জ্বরে দুগ্ধপান তাহার একটী কারণ।"

কড্‌লিভারের চেয়ে চ্যবনপ্রাশ ভাল।

"ফুসফুসের ক্ষয়-সূচনায় কড্‌লিভার অয়েল একটী ফলপ্রদ ঔষধ। ঘুষঘুষে জ্বর, তাহার সঙ্গে খুক্ খুক্ কাসি—এরূপ অবস্থায় আমরা কড্‌লিভার বা কড্‌লিভার মিশ্রিত ঔষধের

ব্যবস্থা দিয়া থাকি। কিন্তু কড্‌লিভার যে ক্ষয় নিবারণে সর্ব্বত্র সক্ষম—একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। অনেক ক্ষয়রোগীর কড্‌লিভার সহ হয় না। খাইতে খাইতে উদরাময় দেখা দেয়, যকৃতের ক্রিয়া হ্রাস হইয়া পড়ে, আহারে অরুচি উপস্থিত হয়। রোগীর এরূপ অবস্থা দেখিলে, ডাক্তার কড্‌লিভার বন্ধ করিবার পরামর্শ দেন, তা'রপর পেটের অসুখ সারিলে, আবার কড্‌লিভার খাইতে বলেন। আবার খাইতে খাইতে পেটের অসুখ দেখা দেয়. আবার বন্ধ রাখিবার হুকুম হয়। এইরূপে অনেক রোগীকে মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিতে হয়। আমি এরূপ চিকিৎসার পক্ষপাতী নহি। আমার বিশ্বাস—কড্‌লিভারের পরিবর্ত্তে কবিরাজী "চ্যবনপ্রাশ" ক্ষয়-রোগীকে খাইতে দেওয়া ভাল। চ্যবনপ্রাশ ক্ষয় নিবারক ও উৎকৃষ্ট রসায়ন। আমি নিজে অনেক রোগীকে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহারে উপকৃত হইতে দেখিয়াছি। "চ্যবনপ্রাশে"—উদরাময়ের আশঙ্কা প্রায়ই নাই। অধিকন্তু—উহা সুস্বাদযুক্ত, সুরভি, মুখপ্রিয় এবং ফলপ্রদ। তবে চ্যবনপ্রাশ বিশুদ্ধ ও টাটকা হওয়া চাই। দুঃখের বিষয়—এমন একটা ক্ষয়নিবারক মহৌষধ, দিন দিন তাহাতে কৃত্রিমতার আবির্ভাব হইতেছে। ব্যবসায়ের খাতিরে—অনেকেই চ্যবনপ্রাশ বেচিয়া বড় লোক হইতে চাহিতেছে। অনেক রোগী আবার বিজ্ঞাপনের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া. সামান্য সর্দ্দী কাসীতে পর্য্যন্ত চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে জিনিষে চাহিদা যত বেশী, সে সে জিনিসের নকলও তত বেশী। অতএব চ্যবনপ্রাশ সেবন করিতে হইলে সুপণ্ডিত বৈদ্যের শরণাগত হওয়াই উচিত।"

নূতন ক্ষত—আরংজেব সোর।

"দিল্লীতে—শুধু দিল্লী কেন—জয়পুরেও দেখিয়াছি—লোকের শরীরে একরকম ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্ষতকে স্থানীয় অধি-বাসীগণ "আরংজেব-সোর" বলেন। এই ক্ষত অতি ভয়ানক। ইহাতে পূয-রক্ত বা স্রাব বড় একটা থাকেনা। টক্‌টকে লাল ঘা—ভিতরে অগ্নিদাহের মত অত্যন্ত জ্বালা। ঘা একবার হইলে শুকাইতে চাহেনা, ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। আমি এই "আরংজেব সোরের" অনেক চিকিৎসা করিয়াছি। ডাক্তারি মতে নানারকম লোসন্-মলম প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াছি—কিন্তু কিছুতেই ঘা ভাল করিতে পারি নাই। অথচ আমি একজন প্রসার-প্রতিপত্তিবান্ ডাক্তার বলিয়া অনেক রোগীই এই ঘার চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসিত। কলিকাতায় অবস্থানকালীন একদা বন্ধুবর ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডির সঙ্গে এই ক্ষতরোগের সম্বন্ধে আলোচনা করি। বন্ধুবর—চিরদিন "আয়ুর্ব্বেদের' গোঁড়া। তিনি আমাকে একটা কবিরাজী মলম প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেন। সেই মলমে আমি অনেকগুলি রোগীর "আরংজেব সোর" ভাল করিয়াছি। এই মলম লাগাইবা মাত্র ঘায়ের জ্বালা কমিয়া যায়, ৭।৮ দিনে ঘা শুকায়। মলমটী এই—

গব্য ঘৃত—১ ছটাক,

মোম—১ ছটাক।

একত্রে মৃদু অগ্নিতে মাটীর পাত্রে গলাইতে হয়। উভয় পদার্থ গলিয়া গেলে—পাত্রটী অগ্নি তাপ হইতে নামাইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া মিশাইতে হয়।

অনন্ত মূল চুর্ণ — ৶০।
পল্‌তা চূর্ণ — ৶০।
ডালকরমচার বীজ চূর্ণ — ।০।
নিমপাতা চূর্ণ — ৶০।
নিসিন্দা পাতাচুর্ণ — ৶০।
হাফরমালীর পাতা চূর্ণ — ৶০।
ছোট গোয়ালের পাতা চূর্ণ — ৶০।
পাকা আকন্দ পাতা চূর্ণ — ৶০।

এই মলমে নালী ঘা, এবং সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা—সমস্তই ভাল হয়।

'এই ঘা প্রথমে নাকি সম্রাট আরংজেবের অঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাই ইহার নাম "আরংজেবসোর।'

শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত এল, এম, এস।

ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস।

—:*:—

বিগত আশ্বিন মাসে, আমার এক হিন্দুস্থানী প্রতিবেশীর চক্ষুরোগ হইয়াছিল। আমি তাহাকে লইয়া বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বন্ধুবর—ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ মৈত্রের শরণাগত হইয়াছিলাম।

ডাক্তার মৈত্র সে দিন বড়ই ব্যস্ত। দুই শতেরও অধিক রোগী সে'দিন তাঁহার আতুরাশ্রমে উপস্থিত। মুহূর্ত্তের জন্য এ অভাগা-আগন্তুকের দিকে একটু স্বাগত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ডাক্তার মৈত্র তাঁহার এক ভৃত্যের দ্বারা এক বাক্স 'সিগারেট' ও এক ডিবা তাম্বুল পাঠাইয়া দিলেন; আমি বিজলী-চালিত-পাথায়—অপ্সরার অঞ্চল বাতাসে স্নিগ্ধ হইয়া—সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম।

"গরুড়স্তম্ভের" পার্শ্বদেশ হইতে মহাপ্রভুর জগন্নাথ দেখার মত—আমি কেবল ডাক্তারের দিকে চাহিয়াছিলাম। কনকবেষ্টনী পদ্মরাগ মণির মত, অসংখ্য রোগী ও রোগিণী পরিবৃত হইয়া, আজ তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মহাপ্রকৃতির মাঝে ভবিষ্য সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ন্যায়, তাঁহার দুইজন সাহায্যকারী এক একটী রোগীকে—তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছিল। ডাক্তারের শান্ত-সৌম্য-সুন্দর মুখখানি—অনন্ত চিন্তানুগামিতায়, কৌৎস ঋষির কৌষেয়বাসের মত আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। অসংখ্য রোগী পরীক্ষা করিতে করিতে, এমন পেশী-পুষ্ট কর্ম্ম-কুশল হাত দু'খানি, যেন বিপুল অবসাদে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ক্ষুন্ন দৃষ্টি বহু নর নারীর আর্ত্তকাহিনী শুনিতে শুনিতে কক্ষ মধ্যস্থ পবনও বুঝি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল! আমি ভাবিতেছিলাম—সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য, ভগবান যেমন "একোঽহং বহুস্যামঃ" বলিয়া প্রকৃতির বুকে বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; নশ্বর মানব নয়নের কুহেলী ভেদ করিতে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ কেন এক হইয়া অনেক হউন না! হায় তখন ত আমার

মনে হয় নাই—বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ আজ কর্ম্মরূপী বহিস্ফুরণ!

আমাদের পাড়ায় একজন দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ্মীপূজার দিন—যখন তাঁহাকে বহু যজমানের যাজনা করিতে হইত, অতি সংক্ষেপে দেব-সেবা সারিবার জন্য তিনি কম করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেন। এইরূপে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি পঞ্চাশ ঘরের পূজা শেষ করিয়া ফেলিতেন। সেই পুরোহিতের কথা সহসা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। ডাক্তার মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম—"পুরোহিতের হাতে যেদিন কাজ বেশী থাকে, সে'দিন তিনি কম করিয়া মন্ত্র পড়িয়া থাকেন।" রহস্যভূষণাভাষায় ডাক্তার মৈত্র উত্তর দিলেন—"মন্ত্র কম বলিলে দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন কেন?" বুঝিলাম—রোগ পরীক্ষায় এমন অসীম ধৈর্য্য ও অপূর্ব্ব অধ্যবসায় না থাকিলে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ এত বিরাট ও মহান্ হইতেন না।

ডাক্তারের পরীক্ষা গৃহে, সমাগত অসংখ্য রোগীর মধ্যে অনেকগুলি রমণীও ছিলেন। কেহ বৃদ্ধা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ তরুণী, কেহ কিশোরী। আরও দেখিলাম—ওষ্ঠে ও গণ্ডে গোলাপের লালিমা মাখা দুই চারিটী বালিকা! হায়! ইহারা সকলেই চক্ষুরোগাক্রান্ত!! পরিচয় পাইলাম—ইহাদের মধ্যে অনেকে সহর বাসিনী, অনেকে সুদূর পল্লীগ্রামের কুললক্ষ্মী।

এই সকল রোগীকে ডাক্তার মৈত্র অতি যত্নে ও অতি আগ্রহে পরীক্ষা করিলেন। মধ্যগগনস্পর্শী মার্ত্তণ্ডদেব ক্রমে পশ্চিম দিকে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িলেন। আমাদের মধ্যে একটু বিশ্রম্ভালাপ আরম্ভ হইল। এমন সময় একটী ভদ্রলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটী সুকুমার শিশু। একটীর বয়স ৭ বৎসর, ২য়টি এখনও পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করে নাই। বালকদ্বয়ের পিতা বলিলেন—ছেলে দুটী রাত্রে কিছুই দেখিতে পায় না। ডাক্তার মৈত্র অর্দ্ধ ঘটিকা ব্যাপী পরীক্ষার পর, বালকদ্বয় সম্বন্ধে তদীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন—ইহারা উভয়েই রাতকাণা। ইহাদের নেত্রমণ্ডলের কতকগুলি স্নায়ুবিতান শুকাইয়া গিয়াছে। চিকিৎসায় কোন্ ফল হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।"

এইবার আমার ধারণা হইল—মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে!!

আমরা যখন "ছাত্রবৃত্তি"শ্রেণীর ছাত্র, তখন বাঙ্গালার প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতালপঞ্চবিংশতি" আমাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। পুস্তক খানি হিন্দী "বেতাল পঁচিশী" হইতে ভাষান্তরিত। এখন আর ইহা বিদ্যালয়ে পঠিত হয় না। বই খানি এখন বোধ হয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করিয়া প্রত্নতত্ত্বের সামিল হইয়া পড়িয়াছে! দুঃখের কথা নহে কি? এখনকার ছাত্রেরা বইখানি পড়ুন আর নাই পড়ুন—ইহার গল্পগুলি অনেকেই শুনিয়াছেন। এই সকল গল্পের মধ্যে "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যা বিলাসীর" গল্প সর্ব্বজন বিদিত। তথাপি এ স্থলে সেই গল্পটীর ভাবার্থ আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র "ভোজন বিলাসী"—অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যে কোন দুর্জ্ঞেয় দোষ থাকিলে, অসাধারণ ঘ্রাণ শক্তির বলে—

সে তাহা ধরিতে পারিত। কনিষ্ঠ পুত্র—"শয্যা বিলাসী"। শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলে—তাহার আর নিদ্রা হইত না। উভয় ব্রাহ্মণ সন্তানের এইরূপ বিস্ময়জনক ক্ষমতার কথা শুনিয়া, সে দেশের রাজা—একদা দুই ভ্রাতাকে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিলেন। উভয়ে রাজ-প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইল।

"ভোজন বিলাসী"—তাহার জন্য রাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাচককে নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। "ভোজন-বিলাসী" যথা সময়ে আহার স্থানে উপস্থিত হইল। পাচক সযত্নে প্রস্তুত—চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্ব্বিধ খাদ্য সম্ভার ব্রাহ্মণের সম্মুখে সজ্জিত করিল। কিন্তু "ভোজন বিলাসী" আসনে উপবেশন করিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। অমন দেব-ভোগ্য ভোজ্য বস্তু আহার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

ক্ষণকাল পরে রাজা আসিয়া "ভোজন বিলাসীকে" জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়াছ ত?" ব্রাহ্মণ বিষণ্ণবদনে উত্তর দিল—"না মহারাজ! আমার আহারই হয় নাই, তৃপ্তি ত দূরের কথা!" রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, আহার হয় নাই কেন?" ভোজন বিলাসী বলিল—"মহারাজ সকল খাদ্যের শ্রেষ্ঠ খাদ্য অন্ন, আপনার পাচক যে অন্ন পাককরিয়াছে, সে অন্নে আমি শবদাহের পূতিগন্ধ অনুভব করিয়াছি। কাজেই আমার খাওয়া হয় নাই।"

ব্রাহ্মণকে উন্মাদ মনে করিয়া, রাজা প্রথমে হাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন—যে তণ্ডুলে অন্ন পাক করা হইয়াছিল, সে তণ্ডুল শ্মশান সন্নিহিত কোন ক্ষেত্র জাত ধান্য হইতে উৎপন্ন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নৃপতি তখন সেই "ভোজন বিলাসীর" যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পর্য্যাপ্ত পুরস্কারে প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

এদিকে রাজ প্রসাদের এক মর্ম্মর খচিত কক্ষে পুষ্পিত যৌবনা সুন্দরী বৃন্দেরসেবা-নিপুণ-করপরিচালনায় "শয্যা-বিলাসীর" জন্য দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল শয্যা রচিত হইল। ব্রাহ্মণ সেই শয্যায় নিশা যাপনের অনুমতি পাইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে রাজা সেই শয়ন কক্ষে উপস্থিত। দেখিলেন—"শয্যা বিলাসী" কক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছে! তাহার জাগরণা-রুণ নেত্র ও কেশপাণ্ডুর মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন ব্রাহ্মণ! তোমার ভাল ঘুম হইয়াছে ত?" জড়িত কণ্ঠে "শয্যা বিলাসী উত্তর দিল——"না মহারাজ! আমার আদৌ ঘুম হয় নাই। আপনার এই শয্যার সপ্তম তলে একগাছা চুল আছে, সেই জন্য এই শয্যায় শয়ন করিবামাত্র আমার পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। সারারাত্রি আমি ঘুমাইতে পারি নাই।" শয্যা বিলাসীর কথায় রাজা চমকিত, বিত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিঙ্করীগণ ছুটিয়া আসিল, একে একে শয্যাতল পরীক্ষা করিতে লাগিল। রাজা দেখিয়া অবাক হইলেন—সেই শিরীষপুষ্পপেলব অমল ধবল সুখ শয্যার ঠিক সপ্তম তলে—নারী শিরঃচ্যুত একগাছি কেশ পড়িয়া রহিয়াছে! এই একগাছি কেশের জন্যই—অমন সুন্দর সুখশয্যাও "শয্যা বিলাসীর" পক্ষে বিঘ্নকণ্টকিত হইয়াছে!

বলা বাহুল্য "শয্যা বিলাসীর" ত্বগিন্দ্রিয়ের এইরূপ অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণতার প্রমাণ পাইয়া, রাজা তাহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

গল্পটীতে—একজনের ঘ্রাণ শক্তি এবং অপরের স্পর্শশক্তির যেরূপ আতিশয্য বর্ণিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দির সভ্যযুগে তাহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়—যখন এ গল্পটী আমাদের পড়াইয়া শুনাইয়াছিলেন, আমরা বালক হইলেও—আমাদের মনে হইয়াছিল—"শ্মশান-সন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুলের অন্নে" শবদেহের দুর্গন্ধ অনুভব করা, আর সাতখানা গদীর তলায় একগাছা ক্ষুদ্র চুল থাকায় সারারাত্রি ঘুম না হওয়া—দুই অসম্ভব! মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়—এতদূর তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন হইতেই পারে না। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিই,—কোন্ সুদূর অতীতের ধর্ম্মপুরের নরপাল, তিনিও তো প্রথমে একথা বিশ্বাস করেন নাই। তখনও তাঁহার মুখে হাসি আসিয়াছিল, এখনও আমাদের মুখেও হাসি আসে।

কিন্তু চিন্তার কথা এই—ধর্ম্মপুরের রাজা "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যাবিলাসীর" কথা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই; শেষে যখন উভয় ভ্রাতার নির্দ্দেশ, নানা অনুসন্ধানে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল,—তখন তো রাজা এ ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন! তবে আমরা ইহা বিশ্বাস করি না কেন? ইহার কারণ,—মানবেন্দ্রিয়ের এরূপ তীক্ষ্ণতার উদাহরণ আমাদের মধ্যে আমরা কখনও দেখি নাই। কাজেই গল্পের "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যা-বিলাসীকে" আমাদের পাগল বলিয়াই মনে হয়।

ঠিক্ স্মরণ হয় না—বোধ হয় ১৩০৮ কি ১৩০৯ সালে, আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের কলিকাতার বাসায়, বঙ্কিম মণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্ক স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বাবু "বেতালপঞ্চবিংশতির" কথা উত্থাপন করেন। "ভোজন বিলাসী" ও "শয্যা বিলাসীর" কথায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বলেন—"এ গল্পে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। যে যুগে "বেতাল পঁচিশী"র গল্প রচিত হইয়াছিল, সে যুগের মানুষের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। গল্পের কল্পনাকাণ্ডে, মানুষের প্রকৃত অবস্থার আভাস ইঙ্গিতও থাকিতে পারে। কল্পনা যতই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন,—বাস্তব ঘটনাই তাহার ভিত্তি। আমাদের চেয়ে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ইন্দ্রিয়ের যে তীক্ষ্ণতা অধিক ছিল, ইহা নিশ্চিত।

চন্দ্রনাথ বাবু, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। "বেতালে বহু রহস্য" নামক উপাদেয় প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সভ্যতার প্রসাদেই হউক আর জল বায়ুর বিকৃতি বশেই হউক,—আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে—যুক্তিপূর্ণ কথায়, চন্দ্রনাথ বাবু উক্ত প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—অসভ্যাবস্থায় মানুষের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্য এশিয়ার তাতারদিগের দর্শন শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাহারা বহুদূরস্থিত পদার্থ দেখিতে পায়। কতকগুলি জাতির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এত অধিক, তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যোজনান্তরস্থিত জলাশয়ের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। এসম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তি "বেতালে" বহু রহস্য পড়িয়া দেখিবেন।

বেতাল পঞ্চ বিংশতির আর একটী গল্পে ত্বগিন্দ্রিয়ের ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসাধারণ কোমলতা

বর্ণিত হইয়াছে। এক রাজার তিন মহিষী ছিল। রাজার নাম "ধর্ম্মধ্বজ"। একদা বসন্তকালে তিন মহিষীকে লইয়া তিনি উপবন বিহারে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে, জ্যেষ্ঠা মহিষীকে রাজা একটী ফুটন্ত ফুল প্রেমোপহার দিয়াছিলেন, সেই ফুলটী করচ্যুত হইয়া রাজ্ঞীর বামপদে পতিত হওয়ায় সে কোমল চরণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রের অমৃতকিরণস্পর্শে দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্রের স্থানে স্থানে অগ্নিদগ্ধের মত ফোস্কা উঠিয়াছিল। বহুদূরস্থিত গৃহস্থের গৃহ হইতে আগত উদুখলের ক্ষীণ শব্দ শুনিয়া কনিষ্ঠা রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ ঘটনাও চন্দ্রনাথ বাবু অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। স্নায়ুর অবস্থা বিশেষে এরূপ ঘটিতে পারে। চন্দ্রনাথ বাবুর কোন বন্ধু—সেতারের সুমধুর ঝঙ্কারে—শিরঃপীড়ায় সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। অযোধ্যার মৃত নবাব ওয়াজেদ্‌আলিশাহ অপরাহ্নে জলযোগের সময় ৪ খানি ছানার জিলিপি ও ৪টী ক্ষীরের পান্তুয়া ভক্ষণ করিতেন। তদীয় আদেশানুসারে জিলিপি ভাজা হইয়া গেলে, সেই ঘৃত পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নূতন ঘৃতে পান্তুয়া ভাজা হইত। নবাবের এক নূতন কর্ম্মচারী—ঘৃতের এইরূপ অনর্থক অপচয় নিবারণ করিবার জন্য, জিলিপি ভাজার পর সেই ঘৃতেই পান্তুয়া ভাজিবার হুকুম দেন। যে দিন এইরূপ করা হয়, সেদিন নবাব সাহেব একটী পান্তুয়ার কিয়দংশ মুখে দিয়াই দুর্গন্ধবশতঃ তাহা খাইতে পারেন নাই। নাটোরের মহারাজার মুখে শুনিয়াছি—তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ রাজা আনন্দনাথ রায়, প্রত্যহ তুলা ধুনাইয়া সেই তুলা নূতন খোলে পুরিয়া—তাহার উপর শয়ন করিতেন। বিষয় কর্ম্মোপলক্ষ্যে, একবার তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া, রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে বাস করিতে হয়। তাঁহার দর্জ্জি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। প্রত্যহ নূতন করিয়া তুলা ধুনিয়া নূতন খোলে পূরিয়া গদী প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, রাজা রাধাকান্ত দেব গোপনে দর্জ্জিকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করেন। কাজেই নাটোরেশ্বরকে সে'দিন পূর্ব্বদিনের প্রস্তুত গদীতে শয়ন করিতে হইয়াছিল। সমস্ত নিশি ঘোর অশান্তি ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে আনন্দনাথ তাঁহার দর্জ্জিকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। শেষে রাধাকান্ত দেবের কাছে সকল রহস্য অবগত হইয়া দর্জ্জির অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পে বর্ণিত ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও কোমলতার কথা যখন আমাদের কাছে উপহাসযোগ্য হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও কোমলতা নিতান্তই হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এই হ্রাসের পরিমাণ কিরূপ—তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমাদের নিজের ইন্দ্রিয়ের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি আমরা কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু পরের বেলা তাহা পারি না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ইন্দ্রিয় শক্তি কতদূর প্রবল ছিল, তাহা আমরা জানি না। বেদে-পুরাণে কাব্য-দর্শনে সে শক্তির যে টুকু স্বপ্ন ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি;—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের বল, মস্তিষ্কের প্রতিভা, জীবনের স্পন্দন,—আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এখন তাহার তুলনা করা চলে না। মহাত্মা চন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—"আমাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যেরূপ কমিয়াছে এবং এখনও কমিতেছে, তাহাতে

আমাদের [বাঙ্গালী জাতির] প্রকৃত বিপদ্ ও বিষম ভয় ভাবনার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।”

একথা পাকা বৈজ্ঞানিকের—পাকা বহুদর্শীর কথা! বাস্তবিক আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তির দিন দিন অধঃপতন ঘটিতেছে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে কিরূপ দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া আসিতেছে আমি তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার মৈত্রের বাটীতে আমি এত চক্ষুরোগগ্রস্ত নরনারী এবং বালক বালিকা দেখিয়াছি, যে, সাহস করিয়া বলিতে পারি—পূর্ব্বে এদেশে এত লোকের চক্ষুরোগ হইত না। প্রাচীনভারতে চস্মার প্রচলন ছিল না, সংস্কৃত ভাষায় চস্মার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। প্রবীন সাহিত্যিক দাদা দীননাথ ধরের মুখে শুনিয়াছি—তাঁহার বাল্যকালে তিনি কদাচিৎ কোন বৃদ্ধকে চস্মা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। একথা অশীতি বর্ষের পূর্ব্বের কথা। আমার বাল্যকালে আমিও অধিক লোককে চস্মা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রভাবের সময়—বিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্যের ব্যঞ্জনাস্থলে—অনেকে চস্মার আদর আরম্ভ করেন। কিন্তু এখন যেহাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে—যুবক যুবতীদের চ'ক্ষে কনক বেষ্টনে নানাবর্ণের কাচখণ্ড দেখিতে পাই, ইহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকার বা দৌর্ব্বল্যের জন্যই। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে—বৃদ্ধদের চ'খে চসমা দেখিয়াছি,—যুবক-যুবতী বা বালক-বালিকারা আবার যে চস্মা পরিতে পারে—তখন ইহা কল্পনাও করি নাই। এখন দশ বছরের বালকেও চস্মা পরিয়া স্কুলে যাইতে দেখিতেছি। যে সকল ছাত্র অদ্যাপি চস্মা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ—১৩০৬ সালে মহীশূর প্রদেশের এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া এদেশে আসিয়া 'হিন্দু' 'হেয়ার' প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুলের ছাত্রের নেত্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সে পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে—এদেশের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৬৬ জন চক্ষু রোগগ্রস্ত! আমাদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ইহা উজ্জল দৃষ্টান্ত নহে কি?

এখন আমাদের মধ্যে কেহ দূরে দেখিতে পান না, কেহ নিকটে দেখিতে পান না, কেহ নিকটে-দূরে—কোথাও দেখিতে পান না।

একজন প্রবীন বৈজ্ঞানিক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—“পূর্ব্বে চিকিৎসককে সংযতহইয়া রোগীর আপাদ মস্তক ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর প্রায় সেরূপ দেখিনা। সে অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি, বোধ হয় এখন কমিয়া গিয়াছে। যান্ত্রিক পরীক্ষার প্রচলনে চক্ষুঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে যে, রোগ নির্ণয়ে ও রোগের চিকিৎসায় ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের ব্যবহার যত বাড়িতেছে ইন্দ্রিয় সকল তত স্থূল, ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে মানুষের মঙ্গল কি অমঙ্গল, যথার্থই ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।”

[সাহিত্য সংহিতা তৃতীয় খণ্ড
১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ৬১৪ পৃঃ]

বাস্তবিক—জগতে যত যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িতেছে, ততই মানুষের ইন্দ্রিয়ের শক্তি, তীক্ষ্ণতা কার্য্যকারিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি কমিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস—ডাক্তারের চেয়ে বৈদ্যগণ ভাল রকম নাড়ী

দেখিতে পারেন। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। বৈদ্যশাস্ত্রে উত্তাপ মাপিবার মাপকাটী নাই। কাজেই বৈদ্যগণকে ভাল করিয়া "নাড়ী-জ্ঞানী" হইতে হয়। ডাক্তার ষ্টেথিস্কোপ বসাইয়া হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুপ্‌ফুসের অবস্থা যেরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বৈদ্য তাহা বুঝিতে পারেন। বৈদ্যমতে ভিন্ন ভিন্ন রোগে নাড়ীর গতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। নাড়ীর সর্পগতি, ভেকগতি, জলৌকা গতি, পারাবতগতি,—ডাক্তারগণ হয়ত বিশ্বাসই করিবেন না। যন্ত্রের পরীক্ষায় ত এ সব জানা যায় না। দুঃখের বিষয় স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা কমিয়া যাওয়ায়—আজকাল অনেক বৈদ্যই নাড়ী পরীক্ষায় কৃতিত্ব হারাইতেছেন।

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। কর্ণের বহির্দেশ দেখিয়া, কে বধির কে কম শুনে, তাহা জানা যায় না। আমি কিন্তু কতকগুলি ধনী সন্তানকে 'ইয়ার ট্রম্পেট' ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। য়ুরোপে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন আছে। আমাদের দেশে উহার ব্যবহার এখনও বিরল হইলেও আমাদের শ্রবণ শক্তির যে স্বল্পতা ঘটিয়াছে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অনেকেরই জিহ্বার অবস্থা ভাল নয়। কেহ কেহ অন্নব্যঞ্জনে অধিক লবণ ব্যবহার করেন, কেহ খর ঝাল না হইলে তরকারীর আস্বাদ পান না। একটু সামান্য অম্লরস লেহনে কাহারও জিহ্বায় জাড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের প্রতিকূল জানিয়াও আমরা অধিক মস্‌লা সংযোগে পাচিত ব্যঞ্জন ভিন্ন রুচি পূর্ব্বক আহার করিতে পারি না। অনেক দ্বিজাতির গৃহেও এখন নিষিদ্ধ মাংস, পলাণ্ডু রস, সাদরে ব্যবহৃত হইতেছে।

আমার বেশ মনে পড়ে—বাল্যকালে লুচির নিমন্ত্রণে—লুচি ও চিনি ভিন্ন আর কিছু উপকরণ বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। শূদ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণ বা নবশাখ কেহই তরকারী খাইতেন না। সামান্য শর্করা সংযোগে—অনেকেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লুচি উদরস্থ করিতেন। বড়লোকের বাড়ী হইলে, একটু দধির আয়োজন হইত, তাহাও ভোজনের শেষভাগে পাতে পড়িত। এখনকার ভোজে—লুচির সঙ্গে, শাক, ভাজা, তরকারী, ডাল, চাট্‌নী প্রভৃতির আয়োজন করিতে হয়। ক্রমশঃ দেখিতেছি—চাট্‌নীর সমাবেশ দ্রুততর বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন কর্ম্মকর্ত্তাকে নিমন্ত্রিতের জন্য নানাবিধ চাট্‌নী প্রস্তুত করিতে হয়। জয়পুরাধিপতির ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় সংসার চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ভোজে—আমি ১১ রকম চাট্‌নী ও ৫ রকম সরবতের সমাবেশ দেখিয়াছি। মিষ্টান্নের ভিতরে এখন—খাজা, গজা, দরবেশ, জিলিপি, বঁদে, পান্তুয়া, রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি শোভন সুন্দর বেশে স্থান লাভ করিয়াছে। অম্ল দধি এখন আর ভাল লাগেনা, তাই তাহা শর্করা সংযোগে "চিনিপাতা দধিতে" দাঁড়াইয়াছে। শুধু ইহাই নহে—রসনেন্দ্রিয়ের স্বাদশক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস হওয়ায়—এখনকার ভোজে—পাপর, কচুরী, নিমকী, ডালমুট ভাজার সঙ্গে সঙ্গে—নানাবিধ ফল মূলেরও আয়োজন করিতে হইতেছে। এত উদ্যোগ—এত আয়োজন নহিলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভোক্তার

মুখ বদলান হয় কি? আগেকার ভোক্তারা আহারে বসিয়া মুখ বদলাইবার আবশ্যকতা দেখিতেন না। আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি পূজার মহাষ্টমীর দিন তাঁহার পিতৃদেব রায় গঙ্গাচরণ সরকার—কতকগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে দুই চারিজনের রসনার শক্তি এতদূর তীক্ষ ছিল যে, তাঁহারা চল্লিশ টাকা মণের ও বিয়াল্লিশ টাকা মণের সন্দেশে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিত, তাহাও ধরিতে পারিতেন। আমাদের জিহ্বায় আর পূর্ব্বের মত আস্বাদানুভব হয় না। আমাদের ক্ষুধা, পরিপাক শক্তি দিন দিন কমিতেছে। আমাদের দেশে আর "একমুনে রঘু" "আধমুনে কৈলাস" জন্ম গ্রহণ করে না। নব্যসম্প্রদায় অধিক আহারকে অসভ্যতার চিহ্ন বলেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র পূর্ণ আহারের পর—২৫টী গোলাপভোগ আম খাইতে পারিতেন। ভায়া অজয় চন্দ্র অক্ষয় চন্দ্রের পুত্র সে রসে বঞ্চিত। এখন নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া—আহার্য্যের উপকরণ কোনটা ছুইতে হয়, কোনটা শুকিতে হয় কোনটা বা একটু মুখে দিতে হয়। অম্লরোগের তাড়নায় —মিষ্টান্নভক্ষণ এখন বিভীষিকাবৎ হইয়া উঠিয়াছে। বড়দুঃখেই বঙ্গের বরেণ্য ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় "সামাজিক প্রবন্ধে" লিখিয়াছিলেন—

"ভারতবাসীর খাদ্য-পরিমাণ ন্যূন হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে লোকে যত খাইতে পারিত এখন তত খাইতে পারেনা;—সকল লোকের এইরূপ বিশ্বাস। এখনকার দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, যাঁহারা তাহার দুই একটির হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে. পূর্ব্বে লোক-খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক-খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয়না। প্রসিদ্ধ দেব-সেবা গুলির পূর্ব্বকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল, দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা অল্পপরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।"

২৫৪ পৃষ্ঠা।

আহারের অল্পতায় যে মানুষের শরীরস্থ পেশী, অস্থি, শোণিতাদি উপাদানের বিকৃতি ও অপকর্ষ ঘটিতেছে—ইহাতে সন্দেহ নাই। সারপদার্থের অপচয় ঘটিলে জীবনীশক্তিও কমিয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের অবনতিতে সমস্ত শরীরেরই অবনতি বুঝায়। আমাদের যখন ইন্দ্রিয়েরই অবনতি হইয়াছে, তখন যথার্থই আমরা বিপন্ন। আমাদের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ায়,—ইন্দ্রিয়েশ্বর মনের শক্তিও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমাদের যুবাদের মধ্যেও আর সে সাহস, স্ফূর্ত্তি, তেজঃ দেখিতে পাই না। এই ইন্দ্রিয়ের অবনতিতেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। আমাদের সাহিত্যে সৌন্দর্য্য নাই, সমাজে ঐক্য নাই, বাণিজ্যে উদ্যম নাই,—আমরা জগতের কাছে করুণার পাত্র।

প্রাণের জ্বালায় আমি তো অনেক "হাবড় হাটী" বকিলাম, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা যে নৈহাটী হইতে ভাটপাড়া পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারিনা. দশহাত দূরের বস্তু দেখিতে পাইনা, দুইমুঠা ভাত ও একহাতা ডাল খাইয়া পরিপাক করিতে পারি না,—এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—পূর্ণ জীবনীশক্তি লাভ। পূর্ণ

জীবনীশক্তি না পাইলে, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব। তুমি যত সভা সমিতিকর, ক্রিকেট, ফুটবল খেল, শিল্প প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা কর, লেখাপড়ায় ধুরন্ধরী হও - মনে প্রাণে হিন্দু হইতে না পারিলে, তোমার মত বাঙ্গালীর আর মঙ্গল নাই। জীবনীশক্তি পুনর্লাভের জন্য - তোমাকে "আয়ুর্ব্বেদের" শরণাগত হইতে হইবে। আতিশয্য ও অসঙ্গত হইলেও— "বেতাল পঞ্চবিংশতির" গল্পে একেবারে অবিশ্বাস করিও না। তোমার ইন্দ্রিয়ের শক্তি যে দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিও। ঐ শুন,—তোমাদেরই মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, পরিণত বয়সে দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন,—

"আমরা যে সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা নানা কারণে ঘটিয়াছে। আমরা ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত। তৃষ্ণায় আমরা জল পান না করিয়া বিষপান করি। দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরই শোচনীয় অভাব ঘটিয়াছে। আমরা ভাত পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। অথচ বিলাসিতায় আমরা বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় আমরা অভিভূত; আমাদের মধ্যে দেহনাশক মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা স্ত্রীপুরুষ—মুটেমজুর—শিশু পর্য্যন্ত চা-চুরুটে মজিয়া উঠিতেছি। শুনিয়াছি চা বেশী পান করিলে স্নায়ু দুর্ব্বল হয়, বড় বেশী পান করিলে পক্ষাঘাতে আক্রান্তও হইতে হয়। স্বচ'ক্ষে দেখিয়াছি অনেক চাপায়ীর লিখিতে হাত কাঁপে, লেখা টেড়া বাঁকা হইয়া যায়। সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি অতি গুরুতর কার্য্যে আমরা শাস্ত্রের সমস্ত সুনিয়ম ভঙ্গ করিতেছি। এইরূপ নানাকারণ ঘটিতেছে। সেই সকল কারণ, যতদূর সম্ভব নিরূপণ করিতে হইবে। আমরা জীবন-মরণের সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছি। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য সমস্যায় হাত দিলে, এ সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না; আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে। ভরসার মধ্যে এই—আমরা বড় পবিত্র ঘরের সন্তান। আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিশ্বনাথকে লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিতেন। বিলাসে বৈভবে তাঁহাদের মনঃ ছিল না, পুণ্যে ও পবিত্রতায় তাঁহারা পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন আবার পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইতেছেন। আজিকার ইউরোপ ও আমেরিকা, তাঁহাদের জ্ঞানালোক লাভ করিবার জন্য লালায়িত। ইহাতে বুঝিতে হয়, তাঁহাদের পুণ্যফল ফুরায় নাই। আমরা পতিত, কিন্তু তাঁহাদেরই পুত্র। পিতার পুণ্যফলে পুত্রের প্রথম ও অবিসংবাদী অধিকার। তাই মনে বড় আশা যে, বিশ্বনাথের নিকট ভক্তিভরে অবনত শিরে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে তিনি সেই পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষ দিগের প্রতিষ্ঠিত পুরী রক্ষা করিবেন।"

বঙ্কিমযুগের ঋষির এই পবিত্র ঋক্ মন্ত্র—বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করুক। উপসংহারে ইহাই আমার কামনা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

বিবিধ সংবাদ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সভা।—আগামী জানুয়ারি মাসের শেষভাগে নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সভা দিল্লীতে হইবে স্থির হইয়াছে। সে সময় সেখানে এক প্রদর্শনীও বসিবে। প্রদর্শনীর জন্য ঔষধাদি ও সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধাদি আগামী ২০শে জানুয়ারির মধ্যে পাঠাইবার সময় কর্ত্তৃপক্ষগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

বৈদ্যের পরলোক প্রাপ্তি।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম—কলিকাতা প্রবাসী কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয় গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার নিবাস ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায়।

স্ত্রীজাতির মৃত্যু।—১৯১৭ সালের স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয়ের রিপোর্টে প্রকাশ—কলিকাতা সহরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৪০ জন অধিক। অন্তঃপুর মহিলাদিগের অবরোধ প্রথাই এই মৃত্যুবৃদ্ধির কারণ বলিয়া স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয় তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ কথার সমর্থন করিতে পারিনা,—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবরোধ প্রথা বরাবরই আছে কিন্তু আগেকার মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা বেশী মরিতেন না কেন? সহযোগী "সঞ্জীবনী" এ সম্বন্ধে বাল্যবিবাহের দোষ দিয়াছেন, আমরা তাহারও সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি. কারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাল্য বিবাহও আজ নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস,—আমরা এখন বিলাস জুয়ারে গা ঢালিয়া—দিয়া বাবুগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজেরা তো অকর্ম্মণ্য হইতেছিই, সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদিগকেও শারীরিক শ্রমের হাত হইতে অব্যাহত রাখিয়া মূর্ত্তিমতী বিলাসিনী করিয়া তুলিতেছি। ফলে সেই বিলাস-বাসনার আস্বাদন পাইয়া আমাদিগের মত পুরমহিলারাও যে হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়াছে—পুরুষ অপেক্ষা রমণীজাতির মৃত্যুর আধিক্য তাহারই ফলসম্ভূত।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী।—ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপটা কলিকাতায় কিছু কম পড়িয়াছে। এখন গড়ে প্রাত্যহিক মৃত্যু-সংখ্যা ৫০ জনেরও কম। স্থানে স্থানে এখনো কিন্তু ইহার পূর্ণ প্রকোপ রহিয়াছে।

হুকপোকা নিবারণ কমিটী।—এই পোকার নিবারণ কল্পে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। রাজসাহী সার্কেলের ডেপুটি সেনিটারি কমিশনর মহাশয় এই কমিটির স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতায় দুগ্ধসরবরাহ।কলিকাতার অধিবাসীদিগকে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা করপোরেসন্ একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটীতে প্রস্তাব হইয়াছে—কলিকাতার অধিবাসীদিগকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতে হইলে মিউ-

নিসিপ্যালিটীক গোষ্ঠ স্থাপন করিতে হইবে। কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটী যদি এরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই সহরবাসীর বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়।

সুচিকিৎসকের পরলোক।—গত ৪ঠা পৌষ বৈকালে বেলগেছিয়া মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার আর, জি, কর মহাশয়ের দেহান্তর ঘটিয়াছে। বেলগেছিয়ার মেডিকেল স্কুল স্থাপনে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যে সহজপন্থা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ইনি ভারতে চিরস্মরণীয় থাকিবেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রায় চারিশত চিকিৎসক ও ছাত্র শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত তাঁহার শবদেহের অনুগমন করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ কৃতী বাঙ্গালী দেশহিতৈষীর মৃত্যুতে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিতেছি। ভগবান তাঁহার বিয়োগবিধুর স্বজনের চিত্তে শান্তি দান করুন।

বিগত ১৩ই পৌষ বেলা ১২ ঘটিকার সময় গোয়ালিয়ারের শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" পরিদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাসৌকর্য্যার্থ সংগৃহীত বিবিধদ্রব্যসম্ভার, মহারাজা বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মহারাজ বাহাদুরকে যে অভিনন্দন পত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

স্বস্তি বিবিধবিরুদাবলীবিরাজমানমানোন্নতমহারাজবর্য্য

শ্রীল-শ্রীযুক্ত-লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল্ হিজ্ হাইনেস্

মহারাজা সার মাধব রাও সিন্ধিয়া আলিজা বাহাদুর

জি-সি-এস্-আই, জি-সি-ভি-ও, জি-বি-ই, এ-ডি-সি,

ডি-সি-এল্, এল্-এল্-ডি মহোদয়ানাম্

নিখিলভারতীয়াষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়ে স্বাগতপ্রশস্তিঃ।

মহারাজ!

লোকে গঙ্গাপ্রসাদোদয়ইতি বিদিতঃ শক্তিমান্ শান্তমূর্ত্তি
র্জ্ঞানজ্যোৎস্নাবিকাশক্ষপিত-জনমনোমোহ-গাঢ়ান্ধকারঃ।
রাজেন্দ্রানন্দদায়ী প্রমথগণবৃতো ভূতিমানাশুতোষঃ
শশ্বদ্‌ভব্যং বিধত্তাং শরণগতসুহৃদ্ বিশ্ববিদ্যালয়াত্মা॥

এহেহি ভূপতিলকোজ্জ্বলপুণ্যকীর্ত্তি-
জ্যোৎস্নাবলীধবলিতাখিলভারতেন্দো!
বিদ্যালয়ে নিখিলভারতবৈদ্যবিদ্যা-
সঞ্জীবনায় বিহিতে জয় জীব শশ্বৎ॥

মহারাজা জীজা জয়তি জননী তে জনকজা
পিতা জয়্‌জীরাবোঽভবদমিতেজা রঘুপতিঃ।

তয়োঃ সাক্ষাদাত্মা ত্বমসি বরবীরঃ কুশমদঃ
কৃপাপারাবারো ভুবি বিজয়সে ভারতমণে! ॥
ত্বং সিন্ধিয়াকুলমহোদধিপূর্ণচন্দ্র-
স্ত্বং ভারতীয়বরভূপগণাগ্রগণ্যঃ।
ত্বঃ সর্ব্বদাংভ্যুদয়কৃৎ কৃপয়া প্রজানাং
ত্বং মাধবোভবসি মাধবরাব-মূর্ত্ত্যা ॥
ভূপাল স্বাগতং তে ভবতু বিজয়িনোদৃপ্তসামন্তমৌলি-
ভ্রাজদ্‌বৈদূর্য্যহীরদ্যুতিচয়বিলসৎপাদপীঠামলাঙ্ঘ্রে।
রাজন্তী কল্পকোটীঃ সুরতরুজয়িনী ত্বৎকৃপাকল্পবল্লী
নব্যায়ুর্ব্বেদবিদ্যাপুনরুদয়ফলায়োজ্জিহীতে সমন্তাৎ ॥
যাসীৎ কল্পলতেব ভারতমহীসর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা
যস্যাঃ সংশ্রয়ণাচ্চিকিৎসককুলং জাতং জগন্মণ্ডনম্।
সৌখ্যারোগ্যসুধাবিধানকুশলা যা সর্ব্ববিদ্যাগ্রণী
যস্যা লব্ধজনির্ব্বিরাজতি পরা ভৈষজ্য বিদ্যান্যতঃ।
সাদ্যায়ুর্ব্বেদবিদ্যাপচয়মুপগতা ভূমিপোৎসাহহীনা
দৌর্ভাগ্যাদস্মদীয়াৎ প্রতিদিশমপরৈর্ধিক্কৃতা ত্যক্তলজ্জৈঃ।
নূনং তদ্‌ভাগ্যসম্পৎ পুনরুদয়মিতা যন্নরেন্দ্রাগ্রয়ায়িন্!
আয়ুর্ব্বেদাঙ্গবিদ্যাজ্জনভবনমিদং ভূষয়ন্নাগতোহসি ॥
প্রতীচ্যভৈষজ্যবিদামবজ্ঞয়া।
বিমানিতা ভারতবৈদ্যবিদ্যা।
কৃপাকটাক্ষৈস্তব চেদিয়ং স্যা-
দুজ্জীবিতা তেন বয়ং কৃতার্থাঃ ॥

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৩য় বর্ষ—৫ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩২৫

“শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্”

Reg. No.
C. 865

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



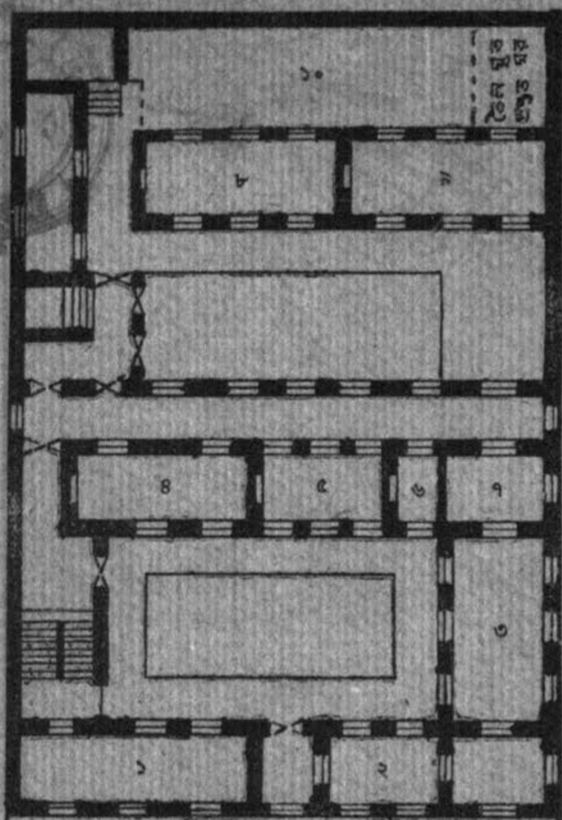
—সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
” শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
” শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

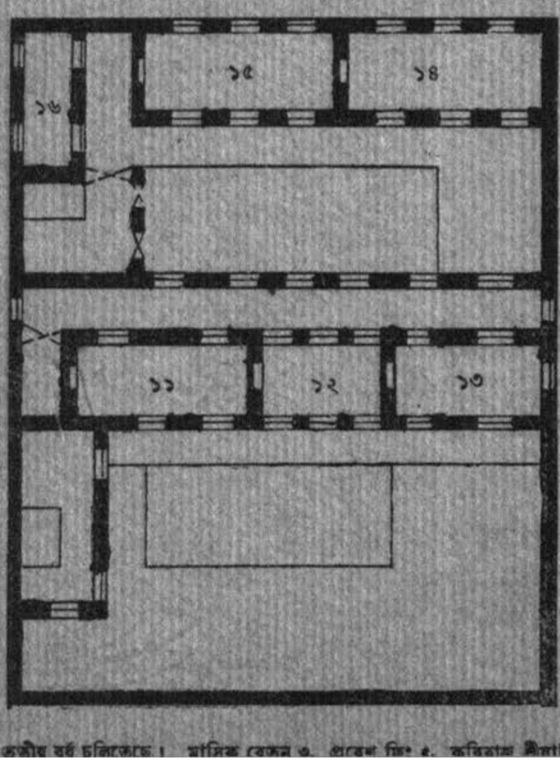
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। মাসিক বেতন ৩, প্রবেশ ফি ৫, কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ এম বি অধ্যক্ষ।

গ্রাহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

"আয়ুর্ব্বেদে"র তৃতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যা চলিতেছে। ইহার বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। অনেকেই কৃপাপূর্ব্বক মণিঅর্ডার প্রেরণে বা ভিঃ পিঃ গ্রহণে মূল্য দিয়া বাধিত করিয়াছেন কিন্তু যাঁহাদের নিকট হইতে এখনো তৃতীয় বর্ষের মূল্য পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদের নামে আমরা ভিঃ পিঃ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারা ভিঃ পিঃ গ্রহণে ইহার বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ প্রদান করেন —ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

গ্রাহকগণই পত্রিকার জীবন। আমাদের সহৃদয় গ্রাহক মণ্ডলীর প্রত্যেকেই এ কথা মনে রাখেন—ইহাও আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। কার্য্যাধ্যক্ষ "আয়ুর্ব্বেদ।"

মাঘের সূচী।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা

কাজের কথা।

চিত্তসংযম।—চিত্তসংযমই যোগশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। "পাতঞ্জল-দর্শনের" প্রথমেই লিখিত হইয়াছে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে দমন করিবার যে শক্তি উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে মানুষ যে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়—সকল শাস্ত্রের মূলতঃ উপদেশ ইহাই।

*   *   *   *

ব্রহ্মচর্য্য।—ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইলে এই চিত্তসংযমের শিক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে দরকার। বাল্যে এ শিক্ষাটা অবশ্য আপনা হইতে আসে না; এজন্য সে কালে যে গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহারই ফলে এ ব্যবস্থা অতি সহজেই সম্পন্ন হইত। এখনকার ছাত্র মণ্ডলীর পক্ষে যেরূপ যথেচ্ছাচারী হইবার ব্যবস্থা অপ্রতিহত, সেকালে তাহা হইবার উপায় ছিল না। সে কালের বালকমণ্ডলীর অভিভাবকগণ হাতেখড়ির পরই তাহার সকল শিক্ষার ভার গুরুর হাতে অর্পণ পূর্ব্বক বালকদিগকে গুর্ব্বাবাসেই অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ছাত্র যত বড় অবস্থাপন্ন ঘরেরই হউক না কেন, গুরু তাহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে উন্নত হইতে পারে—তাহারই প্রয়াসে তাহাকে শ্রমশীল করিয়া তুলিতেন। সেই শ্রমশীলতাই তাহাকে ভবিষ্যৎ সুখের সকল সম্পদ দানে সমর্থ হইত। এখনকার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল কিন্তু এখন গল্প বা উপকথায় পরিণত হইয়াছে।

*   *   *   *

সে কালের শিক্ষা।—গুর্ব্বাবাসে সেকালের শিক্ষার ব্যবস্থাটা বড় সহজ ছিল না,—ছাত্রগণকে কেবল অধ্যয়নে নিরত করিয়াই সে কালের গুরু বা অধ্যাপকগণ কর্ত্তব্য পালন হইল বলিয়া মনে করিতেন না,—

গোপালন,—গোচারণ পর্য্যন্ত সেকালের ছাত্রদিগকে গুর্ব্বাবাসে অবস্থিতির সময় করিতে হইত,—ভিক্ষালব্ধ অন্নে গুরুগৃহে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইত,—তাহার উপর সে ভিক্ষালব্ধ অন্নের যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের থাকিত না, গুরু সেই অন্ন হইতে তাহাদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য যথোপযুক্ত অন্ন প্রদান করিতেন, তবে তাহারা আহার করিতে পাইত। ফলে গুরুগৃহে অবস্থানের সময় এই সকল রীতির প্রবর্ত্তনে চিত্তসংযমের উপায় বাল্যকাল হইতে সহজেই হইয়া যাইত। এখনকার ছাত্রগণ এ সকল কথা ধারণায় আনিতে পারেন কি?

* * * *

দম, দয়া ও দান।—দম, দয়া ও দান—এই তিনটিই সর্ব্বপ্রকার সুখলাভের উপায়। প্রত্যেক ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলে, সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে শিখিলে এবং অবস্থা-স্বরূপ দানে অভ্যস্ত হইলে তাহার তো আর কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না। দান বলিলে যে কেবল অর্থদানই বুঝায়—এরূপ নহে,—কায়িক ও মানসিক শক্তির বিনিময়েও অন্যের শুভ ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাও উৎকৃষ্ট দানের মধ্যে গণ্য। এখনকার দিনে অনেক ব্রাহ্মণের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা হইয়াছে,—অর্থের মুখও ব্রাহ্মণজাতির ভিতর এখনকার দিনে অনেকে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু সেকালে ব্রাহ্মণেরা অর্থের মুখ বড় একটা দেখিতে পাইতেন না,—পর্ণকুটীরই সেকালের ব্রাহ্মণদিগের শীতবাত আতপের কষ্ট অপনয়ন করিত—কিন্তু এই দানের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণেরই মুখনিঃসৃত। ফলে সেকালের ব্রাহ্মণজাতি আশীর্ব্বচনে অন্যান্য জাতিকে যে অমূল্য সম্পদ দান করিতেন, তাহার নিকট ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও হারি মানিত। ফলে 'দম' 'দয়া' ও দানে সে চিত্তশুদ্ধি হয়—শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের ব্যবস্থা তাহার সহিত সুসংবদ্ধ। প্রত্যেক ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়। জিতেন্দ্রিয় হওয়ার অন্যতম নামব্রহ্মচর্য্য পালন এবং ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্য শিক্ষার প্রয়োজন করে না।

* * * *

বিন্দুরক্ষা।—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—"মরণং বিন্দুপাতেন।" অর্থাৎ বীর্য্যক্ষয়ই মরণের কারণ। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি এই জন্য বীর্য্যরক্ষার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। সেকালে ইহারই জন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে পুরুষজাতির—স্ত্রীজাতির সহিত মিলনের ব্যবস্থা ছিলনা। তাহার পর পরিণত বয়সেও যে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা হইত; তাহার মধ্যেও তিথি-নক্ষত্র-পর্ব্বদিন—এ সকল বাছিবার ব্যবস্থা হইত। এখন সে পদ্ধতি একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা তাহারই ফলসম্ভূত। কিন্তু দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের ফলে দেশবাসীর যেরূপ রুচি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে আবার সে কালের বিধি-ব্যবস্থা বাঙ্গালা দেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়াও কঠিন ব্যাপার।

* * * *

দেশরক্ষার উপায়।—দেশরক্ষার উপায় করিতে হইলে আগে দেশের বালকদিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালী বালকই-বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। সেই জন্য বালকরক্ষার চিন্তায় সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ প্রদান প্রত্যেক অভিভাবকের করণীয় বিষয়। শুধু তাহাদিগকে বিদ্যামন্দিরে প্রেরণ

করিয়া,—রাশি রাশি পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া দিয়া—সময়ের অধিকাংশকাল সেই সকল পাঠ্য পুস্তকে তাহারা যাহাতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—তাহাদের কুসুম-কোমল-দেহ যাহাতে অকালে কীটদংষ্ট না হইয়া শরীর ক্ষয়ের কারণ না করিয়া তুলে—সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে আরও একবার বলিয়াছিলাম—গণ্ডস্থলে ব্রণপ্রকাশ, গলার স্বর বিকৃত হওয়া, চক্ষুপ্রান্তে কালিমা চিহ্ন প্রকাশ—পাপ পরিব্যাপ্তির একট নিদর্শন। বালকরক্ষার চেষ্টা করিতে হইলে, প্রত্যেক অভিভাবককে ইহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—বালকগণের নিকট যখনই ঐ সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তখনই তাহাদিগকে অধঃপতনের পথ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাড়নায় অবশ্য ইহার প্রতীকার হইবে না—তাড়নায় বরং কুফল ফলিবারই অধিক সম্ভাবনা। বালকগণ কদর্য্য অভ্যাস নিরত হইতেছে বুঝিতে পারিলে, অভিভাবকগণ তাহাদিগকে যদি নিজের সঙ্গে অধিকাংশ সময় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহার কতকটা প্রতীকারের আশা করা যায়, নতুবা ইহার উপায় বিধান একেবারেই অসম্ভব।

*   *   *   *

আর একটি উপায়।—যে সকল বালক বিশেষ উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছে বুঝা যাইবে, তাহাদের রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাও কতকটা মন্দ ব্যবস্থা নহে। দীর্ঘকাল চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, ধাতুক্ষয় এবং স্বপ্নবিকারগ্রস্ত বহুসংখ্যক ছাত্ররোগীর আমরা চিকিৎসা করিয়াছি। উল্লিখিত দুইটী রোগই অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয়ের ফলসম্ভূত। আমাদের এ সম্বন্ধে যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হইতে বালক রক্ষার প্রধান উপায়ই বিবাহবন্ধনের ব্যবস্থা। বাল্যজীবনে শুক্রক্ষয় আদৌ ভাল নহে, কিন্তু উহা অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক উপায় অপেক্ষা নৈসর্গিক উপায়ে অনেকটা ভাল। সেই জন্য যে সকল বালক একেবারেই অধঃপতনের চরমপন্থাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিলে তাহারা কদর্য্য অভ্যাস হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইতে পারে।

*   *   *   *

অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম।

অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম বড় সহজ নহে—ধাতু এবং স্বপ্নবিকার ভিন্ন দারুণ অজীর্ণ রোগও ইহার ফলসম্ভূত। এই অভ্যাসে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, মস্তিষ্কের বিকার পর্য্যন্ত বটিয়া মানুষকে উন্মাদ করিয়াও তুলিতে পারে। তাহার পর, বিবাহ হইলেও ইহাদের বীর্য্য এরূপ তরল হইয়া যায় যে, তাহার ফলে অনেকেরই সন্তান উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হওয়ায় পুত্রমুখ দেখিবার উপায় থাকে না। কখন বা ঐরূপ বীর্য্যে পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা জন্মিলেও যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের রোগপ্রবণতা এবং অকাল মৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটা প্রধান কারণ। প্রত্যেক অভিভাবক এ সকল কথা বিশেষভাবে গ্রহণ করুন এবং তাহার ফলে বালক রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হউন—ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

*   *   *   *

কলিকাতার ছাত্রাবাস।— মফঃস্বলের অনেক অভিভাবকই কলিকাতার ছাত্রাবাস গুলিতে বালকদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের মনে হয়, এ ব্যবস্থাটাও সমীচীন নহে। নানা প্রকার বিলাস সম্ভারে সুসজ্জিত কলিকাতা সহরে আত্মরক্ষা করা অনেক সময় জ্ঞানগর্ব্ব-পরিণত বয়স্ক পুরুষেরও পক্ষেও অসম্ভব হইয়া পড়ে—তা' চঞ্চলমতি বালকদিগের নিকট তো দূরের কথা। আমরা ছাত্রাবাসে অবস্থিত সকল বালকের কথা বলিতেছিনা, কিন্তু অনেক বালকই যে এইরূপ অভিভাবক শূন্য অবস্থিতির ফলে যথেচ্ছারী ও বিপথগামী হইয়া থাকে, তাহা খাঁটী সত্য কথা। অনেক ছাত্রাবাসেই দেখিতে পাওয়া যায়, তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সাবান তাহার স্থান পূর্ণ করিয়াছে—শুষ্ক ধোঁদলের খোলা দিয়া তাহারা গাত্রমার্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, পরিচ্ছদ পারিপাট্যেও তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ফলে এই বিলাসবাসনায় চিত্তপ্রবৃত্তি সহজেই সুখান্বেষণের প্রয়াস পরায়ণ হয়। আমাদের মনে হয়, মফঃস্বল অপেক্ষা কলিকাতা প্রবাসী ছাত্র-মণ্ডলীর অধিক অধঃপতন এইরূপেই ঘটিয়া থাকে।

* * * *

নাটক, নবেল ও থিয়েটার।— নাটক, নবেল পাঠ এবং থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তিও এই বিলাসিতা হইতে জাগিয়া উঠে। সেবা নিপুণ 'আয়েসা'র সুশ্রূষায় চরমসুখ উপলব্ধি করিয়া 'কুমার জগৎ সিংহে'র মত সেইরূপ রোগ শয্যায় সুশ্রুষা প্রাপ্তির জন্য কাহারও বাসনা জাগিয়া উঠে, কেহ 'কুন্দনন্দিনী'র মাতার আসন্নকালে 'নগেন্দ্রনাথের' মত সাহায্য নিরত হইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন, কেহ 'গোবিন্দলালের' মত 'বারুণী পুষ্করিণী' হইতে জলমগ্ন 'রোহিণীকে' উদ্ধার করিবার কল্পনা আনিয়া কৃতার্থমনা হইয়া থাকেন, কেহবা 'কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে, শুনিয়া 'হেমচন্দ্র' হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। 'প্রতাপ' হইবার সাধ অনেকেরই নাই, কিন্তু 'দেবেন্দ্রনাথের' মত 'হরিদাসী বৈষ্ণবী' হইবার শক্তি অনেকেরই আছে। ফলে নাটক-নবেল পাঠ বা থিয়েটার দেখায় ছাত্রজীবন যে বাস্তবিকই কলুষিত হইয়া থাকে—ইহা সুনিশ্চয়।

* * * *

স্ত্রী-প্রসঙ্গ।—এক কথায় কোনোরূপ স্ত্রী-প্রসঙ্গই ছাত্রজীবনে কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী-প্রসঙ্গের মত পাপের পথ প্রশস্ত করিবার ব্যবস্থা আর কিছুতেই নাই। এইজন্য নাটক-নবেল পাঠ বা থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তি হইতে ছাত্রদিগকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকে স্বধর্ম্মভ্রষ্টও হইতেছে ইহারই ফলে। ছাত্রাবাসগুলি তুলিয়া দেওয়া হউক—এ কথা তো বলিলে চলিবে না—তবে ছাত্রাবাস গুলির কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এ সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইহার অনেকটা প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু তাহার একটা উপায় করিবার জন্য আমাদের দেশের লোক মাথা ঘামাইবেন কি?

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

সমরজ্বর বা নবইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

——:*:——

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"কালঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"—আমিই লোকক্ষয়কারী মহাকাল।" যখন অন্যায় ও অবিচার, ব্যভিচার ও অনাচার, হিংসা ও দ্বেষ সমাজের শিরোভূষণ হয়;—যখন বিলাসিতা ও অলসতা, অখাদ্য ও কুখাদ্য মানবের শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু হয়, তখনই কালরূপী ভগবান মানবকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্ভিক্ষ ও মড়করূপে জনপদ ধ্বংস করিতে থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলেই ইহা পষ্টপ্রতীয়মান হইবে।

শরীর ও মন—আধার ও আধেয়;—উভয়ের সম্পর্ক অতীব নিকট, তাই একের কষ্টে অন্যের কষ্ট, একের পাপে দু'য়ের শাস্তি—একের রোগে উভয়েরই রোগ।

প্লেগ পলাইয়াছে, কলেরা হারি মানিয়াছে, ম্যালেরিয়া মানবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া মৃত্যুসংখ্যা কমাইয়াছে। কিন্তু মানবের বিধিলিপি,—বিলাসিতা, অলসতা, অন্যায় ও অনিয়মের শাস্তি—মৃত্যু—তাই লোকক্ষয়কারী মহাকাল সমর-জ্বর বা নব ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-রূপে মানবজাতির মধ্যে দেখা দিয়াছেন। এবার মহাকালের পূর্ণাবতার—বসন্ত, কলেরা, প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার ন্যায় একদেশব্যাপী অংশাবতার নহে,—সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন অবতার;—তাই এই সমরজ্বর বা নবইন্‌ফ্লুয়েঞ্জারূপী মহামড়ক এক সময়ে পৃথিবীর সমগ্রদেশে, সমগ্রজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে; বিংশ শতাব্দির 'মহাকুরুক্ষেত্রে' যাহা করিতে পারে নাই, বুঝিবা সমরজ্বর বা নবইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা তাহাই সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করিয়া দেয়! আফরিকার বন্যজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহের সুসভ্য জাতি অবধি—কেহই এই ভীষণব্যাধির করালকবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেননা। কত বৈজ্ঞানিক কত গবেষনা করিতেছেন, কত বড়বড় দেশের কত মহামহামনীষি এই ভীষণ মড়কের অবাধগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার অবাধ—অপ্রতিহতগতির প্রতিরোধ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, আগামী বৎসরে এই রোগের মৃত্যুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত পণ্ডিত, কালনা মেডিক্যাল মিশনের প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক সুহৃদ্বর ডাক্তার ভি, ই, এ্যাম্‌বেট ও রেভারেণ্ড ডাক্তার ই, মিউর, এম্, ডি, মহোদয় দ্বয়ের মুখে যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে ডাক্তারীমতে এই নব মড়কের বিশেষ কোন প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে বিশেষ চেষ্টা, গবেষনা ও লেখালেখি চলিতেছে। Dr. Miur এখানকার হাঁসপাতালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীর কফ হইতে

vaccine প্রস্তুত করিয়া Injection দিতেছেন। তাহাতে তিনি আশা করেন, ভাল ফল হইতে পারে। বৈদেশিক জগতে এই নব রোগের চিকিৎসা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে; নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে, বহু সাময়িক ও মাসিক পত্রিকাদিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে;—কিন্তু আমরা—সহস্র-বর্ষ-পূর্ব্বের-ঘৃতসেবনগর্ব্বী আমরা,—আমরা কি করিতেছি? ধন্বন্তরি-শার্ঙ্গধরের বংশধর আমরা—চরক, সুশ্রুত, অগ্নিবেশ, হারীতের-শিষ্য প্রশিষ্য আমরা;—আমরা কি করিতেছি? ঋষিযুগে, নবমড়ক—নবব্যাধির সৃষ্টি হইলে, হিমাচলের কেন্দ্রমূলে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের সভা হইয়া তাহার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ঔষধ সকল আবিষ্কৃত হইয়া, জন সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইত। ঋষিযুগের আয়ুর্ব্বেদ এখন শবে পরিণত হইয়াছে,—সেই গলিত শবের উপর বসিয়া আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবে বলিয়া, হে নবযুগের কর্ম্ম-সাধকগণ, তোমরা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ;—তোমরা কি করিতেছ?

কোন্ অতীতে স্বর্ণময়যুগে—কোন্ জ্ঞান্ ও গরিমায় প্রদীপ্তমঙ্গলমধ্যাহ্নে ত্রিকালদর্শী মহামহর্ষি চরক দূর ভবিষ্যতে নব নব রোগ ও রোগসঙ্করের সৃষ্টি স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞানগবেষণার স্বর্ণার্গল উন্মুক্ত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন;—

"নাস্তি রোগো বিনা দোষৈ যস্মাৎ তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ॥"

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন ছাড়া দোষ নাই;—দোষ ছাড়া রোগ নাই, অতএব দোষ বা রোগ অনুক্ত (সঙ্কর, আগন্তুজ বা নূতন) হইলেও, স্বধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম, দোষ ও দূষ্য বিচার ও গবেষণা করিয়া চিকিৎসা করিবে। কোন্ সুদূর অতীতে অতিদূর ভবিষ্যতের কুহেলিকা-বরণ ছিন্ন করিয়া নব নব রোগের চিকিৎসা প্রণালীর এত-জ্ঞান-গবেষণামূলকযুক্তি—এমন সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে এক আয়ুর্ব্বেদ ছাড়া জগতের অন্য কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে কিনা জানিনা! এই যে নূতন নূতন রোগ সমূহের সৃষ্টি হইতেছে, ইহাতে কি মহামহর্ষি চরকের জ্ঞানগবেষণার ইঙ্গিত মানিয়া চিকিৎসা করিয়া দেখিতেছি কি? *

"আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকা বর্ত্তমান বঙ্গীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর মুখপত্র; নব্য আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ, ভারতগৌরব বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাতত্ত্ববিদ চিকিৎসক মণ্ডলীদ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত। আমি আশা করিয়াছিলাম,—আমাদের নব জাগরণের মঙ্গল পাঁতি "আয়ুর্ব্বেদে" এই নূতনরোগ বিষয়ে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও চিকিৎসা প্রণালী দেখিতে পাইব, কিন্তু শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবধি আমার আশা পূর্ণ হইল না। আমরা মফস্বলবাসী চিকিৎসক; আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অমার্জ্জিত—পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অপরিসর, তাই সহরের যাঁহারা চিকিৎসক, যাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অগাধ ও অপরিমেয়—

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের সকলেই যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তাহা লেখককে কে বলিল? অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই ইহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টা করিতেছেন এবং সে সকল কথা সময় সময় কোনো কোনো সংবাদ পত্রেও বাহির হইতেছে। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে 'চরক' হইতে সংগ্রহ করিয়া "জ্বরের চা" নামক এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং তদ্বারা বহু সংখ্যক রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।—আঃ সং।

যাঁহাদের গৌরবে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব, তাঁহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধজ্ঞান উপদেশ—বিশেষতঃ নূতন কোন রোগের অভ্যুত্থান হইলে তাহা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়। বিন্দুর সমষ্টি সিন্ধু; বিরাট আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘের তুলনায় যদিও আমরা বিন্দু, তথাপি আমাদের সমষ্টি না থাকিলে আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘের অস্তিত্ব বড় একটা থাকে না—আমরা সিদ্ধকাম না হইলে আয়ুর্ব্বেদের সম্মান থাকে না; সহরের ২।৪ জন চিকিৎসক—ব্যক্তিত্ব হিসাবে যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে—আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরবের দিন ফিরাইয়া আনিতে হইলে, সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ পন্থী চিকিৎসকগণকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লব্ধ উপদেশ দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার অতি সহজ হইবে। সহরের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাঁহাদের দরিদ্র পল্লী চিকিৎসক ভ্রাতাদের উন্নতি সাধনে কতদূর কৃপাবান্—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যাইবে!

যাহা হউক যাঁহারা শ্রেষ্ঠ—যাঁহারা নবরোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসামূলক প্রবন্ধ লিখিবার অধিকারী, তাঁহারা যখন এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিলেন না; তখন ভুক্তভোগী আমি—আমার দরিদ্র ভ্রাতাদিগের অসুবিধা স্মরণ করিয়া বিগত কয়েক মাসে "সমরজ্বর বা নবইনফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসায় যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই প্রবন্ধকারে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুধী পাঠক যদি আমার কোন ভ্রম বা বিচ্যুতি ঘটে, দেখাইয়া বাধিত করিবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জার ইতিহাস।—ষোড়শ-শতাব্দিতে প্রথম এই ব্যাধি লোকলোচন গোচরীভূত হয়, তৎপরে, ১৮৩০—৩৩, ১৮৩৬—৩৭, ১৮৪৭-৪৮, ১৮৮৯—৯০, এবং ১৯০৯ সালে এই পাঁচবার ইহার আক্রমণ ও সংক্রামকতা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৯ সালে যে আক্রমণ হইয়াছিল—তাহাতে আক্রমণের বেশ একটা বিধিবদ্ধ তালিকা দেখা যায়; ১৮৮৯ সালের মে মাসে বোখারাতে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ হইয়া, সেপ্‌টেম্বর মাসে মস্কো, অক্টোবর মাসে সেণ্টাপিটাসবর্গ (Petrogard) ও ককেসস্, নভেম্বরের মধ্যভাগে বার্লিন, ডিসেম্বরের মধ্যভাগে লণ্ডন এবং শেষভাগে নিউইয়র্কে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ প্রকাশ পায়; একবৎসরের মধ্যেই ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ সমাধা করে।

রোগের কারণ—পাশ্চাত্য মতে pfeiffers bacillus এই রোগের বীজাণু। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর মুখ ও নাসিকা নিঃসৃত শ্লেষ্মায় ঐ বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র দ্বারা রোগ-বীজাণু মানবশরীরে প্রবেশ করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজাণু কেমন করিয়া কি থেকে জন্ম গ্রহণ করে এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি; তাহার পুরা মিমাংসা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে তাঁহারা এবং সাধারণ চিকিৎসকগণ—সকলেই অনুমান করেন—অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগান, ভেজাল খাদ্য ভোজন, সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করা, আহার বিহারে ও পরিচ্ছদের অমিত আচরণ প্রভৃতি এই রোগ আক্রমণের প্রধান ও প্রথম কারণ।

গতি বিস্তার ও পরিণতি।—সাধারণতঃ এক একটি স্থানে ইহার প্রকোপ বা অবস্থিতি কাল ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ। বিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাইবার বিশেষ কোন আশা থাকে না। যাঁহারা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, গলক্ষত, হাঁপানি, সর্দ্দি, হৃদ্রোগ প্রভৃতি ব্যাধিপীড়িত. তাঁহাদের শরীরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-বীজাণু অতি সহজে অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তারের অবসর ও সুযোগ পায়। বাটিতে একজন আক্রান্ত হইলেই বাটির অন্যান্য সকলেই আক্রান্ত হইতেছে দেখা যায়। প্লেগ, বসন্ত অপেক্ষাও ইহা সংক্রামক ও জনপদ ব্যাপক,—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-রোগী-সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এ বিষ সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে। একবার এইরোগে আক্রান্ত হইলে পুনরায় এই রোগ আক্রমণের খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে এবং এই রোগে পুনরাক্রান্ত হইলে প্রায়ই নিউমোনিয়া হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ১৮৮৯ সালে যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ হইয়াছিল, তাহাতে জর্ম্মন সৈন্যদের মধ্যে ৫৫২৬৩ জন আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৬০ জনের মৃত্যু হয়, জর্ম্মণের সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে ২২৯৭২ জন আক্রান্ত হন, তন্মধ্যে ১৩৩ জনের মৃত্যু হয়; অর্থাৎ সৈনিকদের মধ্যে হাজারকরার ১টির কিছু বেশী এবং সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ১টির কিছু কম লোকের মৃত্যু হয়। পরন্তু এই যে মৃত্যু গুলি হইয়াছিল—তাহার অর্দ্ধেকের উপর মৃত্যু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া জনিত। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া ভীষণ মারাত্মকব্যাধি; বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইনইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়ার কোন প্রতিকারই হইতেছে না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রথম যে আক্রমণ এবার দেখা গিয়াছিল, তাহাতে নিউমোনিয়া হইতে বড় দেখা যায় নাই বা নিউমোনিয়া হইলেও তাহার ২।১টি রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু অধুনা যাহা হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণের পরই তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে নিউমোনিয়া হইয়া পঞ্চম বা অষ্টম দিবসে মৃত্যু হইতেছে। শুনিতেছি স্থানীয় হাঁসপাতালে ১৫০টি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল, বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও তন্মধ্যে প্রায় সকল গুলিরই মৃত্যু হইয়াছে। এবারকার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার গতি ও পরিণতির নির্দ্দেশ বড়ই কঠিন। পূর্ব্বে সর্দ্দি জ্বরই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রধান ও প্রথম লক্ষণ ছিল, এখন নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ ও বিভিন্ন পরিণতি দেখা যাইতেছে;—কেহ উন্মাদ হইতেছে, কেহ প্রাণে মরিতেছে, অল্প সংখ্যক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়ার আক্রান্ত ব্যক্তি অতি কষ্টে বাঁচিয়া উঠিতেছে। কাহারও বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পরিণামে যক্ষ্মা হইতেছে।

রোগের লক্ষণ ও নির্ব্বাচন।—সাধারণতঃ নাসিকা হইতেই এই রোগের আক্রমণ আরম্ভ হয়, নাকে সর্দ্দি দেখা যায়, মাথা ধরে, ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, সর্ব্বাঙ্গে—বিশেষতঃ কোমড়ে অত্যন্ত বেদনা হয়, চক্ষু অল্প লাল, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও চটচটে হয়, তিন বা চারি দিন প্রবল জ্বর থাকিয়া তৎপরে জ্বর ছাড়িয়া যায়, তবে দুর্ব্বলতা অনেক দিন যাবৎ ভোগ করিতে হয়, কাহারও বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা অন্তে টনসিল (আলজীব) বড় হইয়া

ভয়ানক উৎকাসী হয় বা কর্ণে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, ইহাই—ইনফ্লুয়েঞ্জা জরের প্রধান লক্ষণ কিন্তু এবার অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, লক্ষণের কোন স্থিরতা দেখা যাইতেছে না। কাহারও প্রত্যহ ছাড়িয়া ছাড়িয়া জর আসিতে আসিতে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে প্রবল গাত্রদাহ বা পিপাসা প্রকাশ পাওয়া নিউমোনিয়া বা টায়ফডের লক্ষণ দেখা দিতেছে,—কাহারও বা অসহ্য মাথার যাতনা, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রবল জ্বর সত্তে ভীষণ ঘর্ম্ম, কোমড়, গলা ও বুকে ব্যথা—অথচ নাসিকায় শ্লেষ্মা বা সর্দ্দির লেশমাত্র নাই, সহসা ৪।৫ দিনের দিন বুকে শ্লেষ্মা ও শ্বাস কষ্ট প্রকাশ পাইয়াই মৃত্যু হইতেছে। কেহ বা সামান্য সর্দ্দি জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, কাজকর্ম্ম করিতেছে বা গল্প করিতেছে—সহসা উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে বা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই জ্বর নূতন ধরণের। পূর্ব্বে যাহাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিতাম—তাহা নহে। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা সংসৃষ্ট নূতন প্রকারের রোগশঙ্কর; —তাই ইহার নব ইনফ্লুয়েঞ্জা নামকরণ করিলাম।

নব-ইনফ্লুয়েঞ্জার সাধারণতঃ তিনটী শ্রেণী-বিভাগ চলে;—ইহার প্রকোপ ও প্রাধান্য কেন্দ্রও তিনটী যথা;—মস্তিষ্ক, ফুসফুস্ ও বৃহদন্ত্র। নব ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণ করিলেই এই তিনটী স্থানের কিছু না কিছু ব্যতিক্রম হইবে। ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয় এবং দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য হয়াতে থাকে;—ফুসফুস আক্রান্ত হইলে নিউমোনিয়া প্রকাশ পায়, কফ আদৌ নিঃসৃত হয় না, নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১০০—১১২ এবং শ্বাস প্রশ্বাস ও ৫০—৭২ হইয়া থাকে; বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে বিসূচিকা, জরাতিসার বা টায়ফয়েডের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, প্রচুর তরল দাস্ত বা উদরধ্মান, জ্বরের অনিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি, পেটজ্বালা এবং দক্ষিণ তলপেট টিপিলে কঁক্ কঁক্ শব্দ ও নানারূপ উপদ্রব বুঝিতে পারা যায়।

নব-ইনফ্লুয়েঞ্জায় মস্তিষ্ক বা বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে শীঘ্রই রোগী আরোগ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইলে সকল প্রকার চিকিৎসাতেই খুব কম রোগীই রক্ষা পায়। এবার প্রায় শতাধিক ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিমোনিয়া রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ১।২ দিন চিকিৎসাধীনে থাকিয়াই জীবন্ত-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বা আসন্নকালে আসিয়াছিল, কেবল মাত্র আট্‌টি ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীকে আমি চিকিৎসা করিবার সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে শ্রীভগবানের কৃপায়—আয়ুর্ব্বেদের মহিমায় তিনটীর জীবনরক্ষা হইয়াছে।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই "নব-ইনফ্লুয়েঞ্জা' বাতশ্লেষ্ম প্রধান মধ্যপিত্ত সান্নিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত জ্বর বলিয়া অনুমান হয়,—অন্ততঃ আমি তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া চিকিৎসা করিতেছি—এবং চিকিৎসার ফল অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকদের তুলনায় যে মন্দ হইতেছে, তাহা আমার মনে হয় না, সাধারণের অনুমান বরং কিছু ফল ভালই হইতেছে।

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর, মিনিটে নাড়ীগতি ১০৮—১২, শ্বাস প্রশ্বাস ২৫—৩০ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা ভার, কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে প্রথমতঃ দশমূল ক্বাথে অর্দ্ধ

ছটাক এড়ণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া খাওয়াইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া, বাতগজাঙ্কুশ, স্বল্পলক্ষী বিলাস ও বেতাল রস—আদার রস ও সৈন্ধব লবণ, পানেররস এবং আদার রস মধু অনুপানে পর্য্যায়ক্রমে, তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। অত্যন্ত দাহ এবং জল পিপাসা ও ঘর্ম্ম নির্গম থাকিলে অল্প প্রবাল ভস্ম মিশাইয়া যথেষ্ট পমিমাণে ইষদুষ্ণ জল খাইতে দিলে, পিপাসা, দাহ ও ঘর্ম্মের শান্তি হয়। প্রথমাবস্থায় এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে এবং জর বন্ধ হইবার পর কিছুদিন নিয়মিত রূপে ১ রতি মকরধ্বজ এবং ১ রতি স্বল্পলক্ষী বিলাস ও কর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১ মাত্রা প্রত্যহ বৈকালে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিলে এবং প্রাতে আদা ও মিছরি সিদ্ধ করিয়া তৎসহ অল্প লেবুর রস মিশাইয়া চাএর ন্যায় গরম গরম পান করিলে পুনরাক্রমনের বা যে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর উৎকাসিতে সোহাগার খৈ মধুসহ গলার ভিতর লাগাইলে বা চন্দ্রামৃত চুষিয়া খাইলে অল্প সময়েই আরোগ্য হইয়া যায়। শৃঙ্গারাভ্র আদা ও পান সহ চিবাইয়া খাইলেও বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে প্রত্যহ বা ১ দিন অন্তর দশমূল কাথ ও এড়ণ্ডতৈল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার বিধেয় এবং নারদীয় লক্ষীবিলাস পানের রস মধুসহ,—চুতর্ম্মুখ রস—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধুসহ এবং সারস্বত চূর্ণ—উষ্ণ জল সহ সেবন এবং মহাদশমূল তৈল নস্য ও শিরকরোটিতে মর্দ্দন করিলে অচিরে রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমেনিয়াতে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি এবং ফুসফুসের ক্রিয়াকলাপের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ এড়ণ্ডতৈল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া, মহালক্ষীবিলাস রস, কস্তূরীভৈরব (বৃহৎ) ও শৃঙ্গাদিচূর্ণ—কর্পূরচূর্ণ, আদার রস ও মধু, রুদ্রাক্ষ ঘষা ও মধু এবং গরম জল অনুপানে পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। শ্বাসকষ্ট এবং কফ আদৌ নিঃসৃত না হইলে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর শৃঙ্গাদিচূর্ণ—বামুন হাটির উষ্ণ কাথ এবং ২ রতি সোহাগার খৈ অনুপানে সেব্য। হার্টফেলের সম্ভাবনা দেখিলে মকরধ্বজ ২ রতি, কর্পূর ২ রতি, মৃগনাভি ১ রতি, ধুস্তুরবীজচূর্ণ ১ রতি, মিশাইয়া লইয়া অবস্থা বিশেষ ২।৩ বার পানের রস বা তুলসী-পত্র রস সহ সেবন করাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়। বক্ষস্থলে বেদনাদি নিবারণের জন্য মহাদশ-মূলতৈল বা মহাকনকতৈল মালিশে অসাধারণ ফল পাওয়া যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়াতে কর্পূর অসাধারণ ফলপ্রদ মহৌষধ; অনেক সুবিজ্ঞ এ্যালোপাথ চিকিৎসক ইহাতে কর্পূরের তৈল Hypodermic Injection দিয়া থাকেন। নিউমোনিয়া অবস্থায় কাসে বৃহৎশৃঙ্গারাভ্র আদা ও পানসহ চিবাইয়া খাইলেও, কাসের শান্তি হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়াতে আমি যে ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিলাম, ইহা যদি রোগের প্রারম্ভ হইতে উৎকৃষ্ট পথ্যের সহিত প্রযুক্ত হয় এবং চিকিৎসক ধীরভাবে ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, অনেক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে মুথার রস অনুপানে অমৃতার্ণবরস, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ও আনন্দভৈরব—যমানীভাজার গুঁড়া ও মধুসহ এবং সল্লাগ্নিমুখচূর্ণ উষ্ণজল সহ বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়মিত সেবন করাইতে পারিলে অচিরে রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

পথ্যাদি সম্বন্ধে অনেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে জলীয় পথ্য দিতে নিষেধ করেন, তবে, দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দিতে বলেন, কিন্তু আমাদের মতে দুগ্ধ আদৌ দেওয়া উচিত নহে, মুগ বা মসুরের যুষ, পানফল বা শঠীর পালো উৎকৃষ্ট পথ্য। দুগ্ধ যদি একান্তই দিতে হয়—তাহা হইলে শুঁঠ ও পিপুঁলের কল্কসাধিত দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইনফ্লুয়েঞ্জায় পথ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলা সুকঠিন; চিকিৎসক রোগীর অবস্থানুসারে লঘু ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করিবেন।

*　　*　　*

আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত ঔষধরত্নের আধার—অগাধ-অতল-স্পর্শ-অমৃত সিন্ধু। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যে কোন প্রকারের ব্যাধি বা মড়ক হইয়াছে—হইতেছে ও হইবে, তাহার সম্পূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন-চিকিৎসা এক আয়ুর্ব্বেদেই আছে। প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া রত্ন চিনিয়া লইতে পারিলেই হইল। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের শুধু ব্যবসায় নহে—আয়ুর্ব্বেদ আমাদের জন্মজন্মান্তরের সাধনা—আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের গৌরব—আমাদের ইহকালের সর্ব্বস্ব ও পরকালের মোক্ষ, যদি আমাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সেই গৌরবের হ্রাস হয়, তাহা হইলে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের সমস্ত জীবনেও হইবে না।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
(মল্লিক) কবিরত্ন।

পঞ্চকর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

——:*:——

ক।—ভালইতো। তা'তে আপনার চিকিৎসা কার্য্যে অতি বিজ্ঞতা বাড়বে বই কম্‌বে না।

ডাঃ।—কিন্তু দীর্ঘকাল সময় লাগে যে।

ক।—আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির বেশীদিন লাগবে না; তা' ছাড়া আমি সহায়তা করবো। আর একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে পড়লে আপনার উপকার যথেষ্ট হবে।

ডাঃ।—আচ্ছা দেখি কি হয়। এখন আপনি বমন সম্বন্ধে সব কথা বলুন।

ক। বমনের চেষ্টা উপস্থিত হ'লে রোগী আপন হাতের দুটী আঙ্গুল কিম্বা উৎপলের নস্য কণ্ঠ বিবরে প্রবিষ্ট করিয়ে বমি করবে।

ডাঃ।—তা'র মানে কি?

ক।—বমন বেগকে উত্তেজিত করা আর কি! গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করার কথা শোনেননি কি?

ডাঃ। হাঁ ঠিক্ কথা। শুনিছি বৈকি।

ক।—বার বার বমনের বেগ ভা'ল নয়। মধ্যমরূপ বমন হলে প্রথমে কফ, পরে পিত্ত ও পরে বায়ু নিঃসারিত হয় এবং হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ এবং শরীর লঘু হয়।

ডাঃ।—আর অধিক বমন হ'লে কি হয়?

ক। অধিক বমন হ'লে পিপাসা, মোহ, মূর্চ্ছা বায়ুর প্রকোপ, নিদ্রা ও বলের হানি হয়।

ডাঃ।—এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি ?

ক। তা, হ'লে রোগীকে ঘৃত মাখাইয়া শীতল জলে অবগাহন করাতে হয়, আর চিনি মধু ও ছাতু জলে গুলে খাওয়াতে হয়।

ডাঃ। আর যদি বমন ভালরূপ না হয় ?

ক। বমন ভালরূপ না হোলে রোগীর কোষ্ঠ, কণ্ডূ, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের অবিশুদ্ধি এবং শরীরের গুরুতা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ ঘটলে পুনরায় বমন করা'তে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা বমনের পর কিরূপে পথ্য দিবার নিয়ম ?

ক। সম্যক বমন হ'লে সেই দিন সন্ধ্যাকালে বা পরদিন প্রাতঃকালে সুখোষ্ণ জলে স্নান করিয়ে পুরাতন শালি তণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ মণ্ড পান করা'তে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্নকালেও মণ্ড পথ্য। চতুর্থ ভোজনকালে ঐরূপ চাউলের বিলেপী—স্নেহ ও লবণ না দিয়ে অথবা অল্প লবণ ও স্নেহ দিয়ে পান করা'তে হয় এবং গরম জল অনুপান দিতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অন্নকালেও এইরূপ নিয়ম। সপ্তম অন্নকালে শালি তণ্ডুলের অন্ন অল্প সৈন্ধব—স্নেহ ও মুগের যূষের সঙ্গে পথ্য দিতে হয়, গরম জল অনুপান করাতে হয়। অষ্টম অন্ন ভোজন কালেও এইরূপ নিয়ম দশম একাদশ ও দ্বাদশ অন্নকালে লাব, গৌর তিতির প্রভৃতি কোন পক্ষীর মাংস রস উপযুক্ত স্নেহ ও লবণ সংযোগে অন্নের সঙ্গে ভোজন করা'তে হয় এবং উষ্ণ জল অনুপান করা'তে হয়। এই রকম ভাবে সাত দিন থেকে —পরে স্বাভাবিক ভোজন করা নিয়ম।

ডাঃ। আর সব বুঝলাম, কিন্তু বারটা অন্নকালের কথা বল্লেন, তা'হলে ত সাতদিনের বেশী হ'ল। আর অনুপান মানে তো ওষুদের সঙ্গে যা' খায়।

ক। অন্নকাল মানে—যে ব্যক্তি যে সময়ে খায়। তা'লোকেত একবার খায় না, প্রধানতঃ দু'বার খায়। কাজেই সাত দিনে চোদ্দটা অন্নকাল পাওয়া যায়। আর আহারের পরে বা ওষুধ খাবার পরে যাহা পান করা যায় —তাকে অনুপান বলে। অনু মানে পশ্চাতে— আর পান মানে পান করা। কিন্তু ওষুদের সঙ্গে যা'খাওয়া হয়, সেটাকেও অনুপান কথা চলিত হয়ে গেছে।

ডাঃ। আচ্ছা সকল লোককেই কি বমন করান যেতে পারে ?

ক। কোন এক প্রকার ক্রিয়া সকল লোকের প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে না। ক্ষতগ্রস্ত, ক্ষীণ; অতি স্থূল, অতি কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল. পরিশ্রান্ত, ক্ষুধিত. কর্ম্মভারবহন বা পথশ্রমে কাতর, উপবাসী, মৈথুন, অধ্যয়ন, ব্যায়াম ও চিন্তাকারী, কৃশ, গর্ভিণী, সুকুমার, মলবদ্ধ দ্বারা পীড়িত এবং উরুস্তম্ভ, অতিসার, গলরোগ উদররোগ, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্নেহ প্রয়োগের অযোগ্য। যে সকল স্ত্রী অকালে প্রসূত হয়, তাহারাও স্নেহ পানের অযোগ্য।

ডাঃ। স্নেহ পানের আর কি নিয়ম আছে বলুন ?

ক। বর্ষাকালে তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বৈশাখ মাসে বসা ও মজ্জা হিতকর। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির উষ্ণকালে রাত্রিতে এবং শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির শীতকালে মেঘ রহিত দিববাতে স্নেহ পান করা উচিত।

ডাঃ। স্নেহের পরিমাণ কিরূপ ?

ক। অগ্নি প্রবল হইলে আট তোলা, মধ্যবান হইলে ছয় তোলা, আর হীনবল হইলে চার তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়।

ডাঃ। স্নেহ কি একদিন প্রয়োগ করিলেই হয়?

ক। না। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে তিন দিন, মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তিকে চার দিন এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সাত দিন স্নেহ পান করাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। ইহার পর আর পান করান উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে উহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

ডাঃ। স্নেহ প্রয়োগ ঠিকমত হয়েছে কিনা—তা' জানবার উপায় কি?

ক। বায়ুর অনুলোম (অধোগমন), অগ্নির দীপ্তি, মল স্নিগ্ধ ও অকঠিন হওয়া, স্নেহ পানে অনিচ্ছা এবং শরীরের গ্লানি—এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে যে, শরীর সম্যক্ স্নিগ্ধ হয়েছে। আর রুক্ষতা (স্নেহের অল্পতা) ঘটলে বায়ুর উর্দ্ধগতি হয়, অগ্নি মন্দ হয় এবং মল রুক্ষ ও কঠিন হয়। আবার বেশী স্নিগ্ধ হলে শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, তরল মলভেদ এবং নাক-মুখ দিয়া জল পড়া—উপসর্গ ঘটে।

ডাঃ। এ সকল ঘটলে কি করতে হয়?

ক। স্নেহপ্রয়োগ ঠিক হ'লেত কথাই নেই। কম হ'লে তা'কে আবার স্নেহ পান করা'তে হয়। আর বেশী হলে কাঙ্গনী ধানের চাল, যবের ছাতু, তিল প্রভৃতি খাওয়াতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা আপনারা তো এত শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু পূর্ব্বে আপনাদের তো এ রকম চাল ছিল না?

ক। কিছুমাত্র না। আয়ুর্ব্বেদের স্রষ্টা যা'রা—তাঁ'রা গাছের বাকল প'রতেন। তার পর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যাঁরা জীবের স্বাস্থ্যবিধান এবং প্রাণরক্ষারূপ মহাব্রত অবলম্বন ক'রতেন, তাঁ'রা মোটা চাদর-কাপড় আর চটী জুতো হ'লেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এখনও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যেমন দেখচেন—আগেকার কবিরাজেরা ঠিক সেই রকম একেবারে বিলাসিতা বর্জ্জিত ছিলেন। তা' ছাড়া শাস্ত্রচর্চ্চায় ও চিন্তায় তাঁরা এত নিমগ্ন থাকতেন যে, বিষয় বুদ্ধি তাঁদের কিছুমাত্র ছিল না—টাকা, মোহরের প্রভেদ জানতেন না।

ডাঃ। বলেন কি!

ক। বলি সত্য কথা। এই কিছু দিন পূর্ব্বের ঘটনা শুনুন। 'দর্প নারায়ণ' ব'লে এক জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে মহিষাদলের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হ'ন। যা'বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী ব'লে দেন যে তিনি যেন হলদে টাকা চান। কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, বিদায়ের সময় সময় তিনি রাজার নিকট হলদে টাকা চাহিলেন রাজাও দাওয়ানকে যথেষ্ট মোহর পুরস্কার দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দাওয়ান দেখিলেন যে, কবিরাজ নিতান্ত বোকা। তিনি টাকায় হলুদ মাখাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে দিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং কর্ম্মচারী সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহিণীকে টাকা দিয়া মহা আনন্দে বলিলেন,—'এই দেখ গৃহিণী, হলদে টাকা এনেছি।' গৃহিণী দেখিয়া ভাবিলেন যে, উহা কখনই রাজার কার্য্য নহে। কোন দুষ্টবুদ্ধিকর্ম্মচারী এরূপ করিয়াছে। তিনি সমাগত কর্ম্মচারী এবং প্রহরীদিগকে রাজার নিকটে একখানি পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু

তাহারা—ইহা উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারীর কার্য্য এবং রাজার নিকট পত্র লইয়া গেলে তাহাদের চাকরী থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়া পত্র লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। কেবল একজন পালকীবেহারা কবিরাজ মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খাই, চাকরী যায়—অন্যত্র চাকরী করিব. আমি পত্র লইয়া যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়া হইল। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাজ, এরূপ লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। রাজা পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন।

ডাঃ। একি গল্প না সত্য কবিরাজ মশায়?

ক। এখন গল্প ব'লেই মনে হয়, কিন্তু সত্য সে কালের কবিরাজদের বিষয়বুদ্ধি মোটেই ছিলনা। টাকা সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একবার জনৈক কবিরাজ কৃষ্ণনগরের রাজ-বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহূত হন। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, রাজা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি চান? কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বে হাতী দেখেন নাই. এখানে হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়া ছিল, তিনি রাজাকে একটা হাতী দেখাইয়া বলিলেন—আমি এইটে নেব। রাজা—হাতী পুরস্কার দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ-গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ? কবিরাজ সানন্দে হাতী দেখাইয়া বলিলেন, আমি এইটে চেয়ে এনেছি। তখন গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আঃ আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন, কি হল? কবিরাজ-গৃহিণী বলিলেন, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই বলিয়া প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন। গজরাজও মহা আনন্দে সেই ধান্য ও চাউলের স্তূপ উদরসাৎ করিল। গজরাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় অবাক। তখনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পত্র লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। আমাকে একটা রাক্ষস দিয়াছেন। রাজা কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং বিষয়-বুদ্ধির হীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ দিয়া পাঠাইলেন।

ডাঃ। বাস্তবিক সেকালের কবিরাজগণ বিষয়বুদ্ধি হীনই ছিলেন বটে! যাক সে কথা, বমন করার পর কি রকম নিয়ম পালন করতে হয়, সে কথা বলুন।

ক। বমন করার পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, অধিক ভোজন, নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন, অত্যন্ত ভ্রমণ, ক্রোধ, শোক, হিম, রৌদ্র, শিশির, অতিরিক্ত বায়ুসেবন, অতিরিক্ত যানারোহণ, স্ত্রীসহবাস, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ, অহিতকর দ্রব্য ভোজন, অকালে ভোজন বিষমভোজন, মলমূত্রের বেগধারণ বা বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগদান প্রভৃতি পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা ভিন্ন বমন করার পর রোগীর হস্ত, পদ, মুখ ধৌত করাইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবে এবং স্নৈহিক দোষ প্রশমক কোন প্রকার ধূম পান করাইয়া পুনরায় হস্ত পদাদি ধৌত করাইবে এবং বায়ু প্রবাহ শূন্য গৃহে অবস্থান করাইবে।

ডাঃ। ধূমপান বুঝি, তামাক, সিগারেট, বিড়ি?

ক। না, এ ধূমপান তামাক, সিগারেট, বিড়ি নয়। পঞ্চকর্ম্ম বলার সঙ্গে সঙ্গে পরে ধূমপানের কথা ব'লতে হবে।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ পানের পর কি রকম নিয়মে থাকা উচিৎ সে কথাত বল্লেননা।

কঃ। উষ্ণ জলে স্নান, পান ও শৌচাদি কার্য্য করিতে হয়। দিবানিদ্রা, মৈথুন, মল-মূত্র, উদ্গার ও অধোবায়ুর বেগ ধারণ; ব্যায়াম, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, ক্রোধ, শোক, হিম ও আতপ সেবন পরিত্যাগ করা উচিত এবং বায়ু প্রবাহ হীন স্থানে থাকা কর্ত্তব্য।

ডাঃ। আচ্ছা বমনত হ'ল—পঞ্চকর্ম্মের প্রথম কর্ম্ম। তার পর কি ক'রতে হ'বে বলুন।

ক। বমনের পর বিরেচন প্রয়োগ ক'রতে হয়! বমন করার পর পুনরায় রোগীকে পূর্ব্ববৎ নিয়মে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রতে হবে। তা'র পর বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়। ঔষধের সঙ্গে যা খাওয়া হয়, সে'টাকেও অনুপান কথিত হয়ে থাকে?

ডাঃ। তাতো হ'ল কিন্তু যে রকম বল্লেন তাতে ত কাউকে বমন করানই চলেনা দেখছি।

ক। কেন চ'লবে না? এতেই কি সব শেষ হ'ল? পীনস, কুষ্ঠ, নবজ্বর, রাজযক্ষ্মা, কাস; শ্বাস, গলগ্রহ (গলা নাড়িতে না পারা), গলগণ্ড, মেহ, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ; বিসূচিকা, অলসক (বিসূচিকা ভেদ) অধোগ রক্তপিত্ত; মুখ দিয়া শ্লেষ্মা উঠা, অর্শঃ, গা বমি বমি করা, অরুচি, অপরিপাক, অপচী, অপস্মার, উন্মাদ, অতিসার, শোষ পাণ্ডুরোগ, মুখে ক্ষত হওয়া, দুষ্টশূল জনিত রোগ, শ্লেষ্মজনিতরোগ, বিষপান, বিষধর সর্প কর্ত্তৃক দংশন প্রভৃতি রোগে বমন করান হিতকর। শাস্ত্রে বলে যে ক্ষেতের আলি ভাঙ্গা গেলে যেমন ধান্যাদি শুষ্ক ও নষ্ট হয়, বমন দ্বারাই এই সকল রোগও সেইরূপ নষ্ট হইয়া থাকে।

ডাঃ। আচ্ছা বমনের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করার কথা যা, বল্‌ছিলেন, সেটা আবার কি?

ক। পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা শরীর শোধিত হয়, শোধিত অর্থে দোষ রহিত, আমরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জ্ঞানে অজ্ঞানে শরীরের অনিষ্টকর অনেক রূপ ক্রিয়া করি, ফলে শরীরের নানা স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়ে থাকে। সেই দোষ বা অনিষ্টকর পদার্থকে শরীর হ'তে নিঃসৃত করাই শোধন। এখন দেখুন শরীর থেকে দোষ নিঃসৃত করার পথ প্রধানতঃ দুইটী—মুখ এবং মলদ্বার। আমাশয়ে যে দোষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বমন দ্বারা মুখ দিয়ে নির্গত হ'য়ে যায়, আর পক্বাশয়ে যে সমস্ত দোষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বিরেচন দ্বারা মলদ্বার দিয়ে নির্গত হ'য়ে যায়।

ডাঃ। আচ্ছা তা, যদি হয়, তবে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের স্বার্থকথা কি?

ক। বলছি সে কথা। ছেলেবেলা কখন আম চুরি করে খেয়েছেন কি?

ডাঃ। চুরি ক'রে খাওয়া জানি না! তবে আম দেয়েছি আর চুষিকাঠির মত চুষেছি।

ক। তাতো চুষেছেন, কিন্তু তাতে কি চুরি ক'রে খাওয়া হয়নি? শুনুন বলছি, আমের পেছন দিকে অর্থাৎ বোঁটার বিপরীত দিকে একটা ফুটো করতে হয়, আর সেই খানে মুখ দিয়ে চুষে চুষে খেতে হয় এটা জানেন তো?

ডাঃ। তাতে কি হল?

ক। হ'ল এই যে—সেখানে কেবল মুখ দিয়ে চুষলেই আমের রস টুকু পাওয়া যায় না। চোষবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমটা টিপে টিপে সেই ছিদ্রের দিকে আমের রস সঞ্চালন ক'র নিয়ে খেতে হয়। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ঠিক সেই টেপার কাজ করে। দোষ কেবল আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে থাকেনা—তার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানেও থাকে। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের ফলে সেই সমস্ত দোষ আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে এসে জমে এবং তখন বমন বা বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে অতি সহজেই বা'র হ'য়ে যায়।

ডাঃ। তা'ত হল, কিন্তু দু'বার করে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করা কেন?

ক। এত সোজা কথা। প্রথমবার স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকল আমাশয়ে এসে সঞ্চিত হয়। আর বমন দ্বারা সেই সকল দোষ নির্গত হ'য়ে যায় ব'লে শরীরের উর্দ্ধভাগ বিশুদ্ধ হয়। তা'র পরে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকল পক্কাশয়ে এসে জমে, আর বিরেচন দ্বারা সেই দোষ নির্গত ক'রলে অধঃশরীর বিশুদ্ধ হয়।

ডাঃ। সঙ্গত কথা বটে। এখন বিরেচনের বিষয় বলুন।

ক। পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, বিরেচন নানা প্রকার আছে। সংক্ষেপে তা'দের প্রয়োগের ক্ষেত্র ব'লছি। জ্বর, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত ও উদাবর্ত্তরোগে এবং বালক, বৃদ্ধ; ক্ষতরোগগ্রস্ত, ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের পক্ষে সোঁদাল; পাণ্ডুরোগ, উদর, গুল্ম, কুষ্ঠ, দূষিতবিষ, শোষ, মধুমেহ, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগে মনসা সীজের আটা, গুল্ম, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর এবং শ্লেষ্মপ্রধান রোগে এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে দন্তী দ্বারা বিরেচন হিতকর। এতদ্ভিন্ন তেউড়ী, লোধ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিরেচনের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ। এখন বিরেচন প্রয়োগের নিয়ম বলুন?

ক। পূর্ব্বেই ব'লেছি যে বমনের পর পুনরায় স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করা'তে হয়। বালক, বৃদ্ধ, পরিশ্রান্ত ভীত নবজ্বরী, মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি, অধোগরক্তপিত্ত রোগী, মলদ্বারে ক্ষতযুক্ত ব্যক্তি অতিসার রোগী, যাহাদের শরীরে শল্য বিদ্ধ আছে এরূপ ব্যক্তি, ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি গর্ভিণী তৃষ্ণার্ত্ত এবং অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ডাঃ। তবে কিরূপ ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ করা যায়?

ক। কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, ভগন্দর, উদর, অর্শ, ব্রধ্ন, প্লীহা, গুল্ম, অর্ব্বুদ, বিসূচিকা, অলসক, মূত্রাঘাত, ক্রিমিকোষ্ঠ, বিসর্প, পাণ্ডুরোগ, শিরঃশূলঃ, পার্শ্বশূল, উদাবর্ত্ত, নেত্রদাহ, মুখদাহ, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, নাসারোগ, মুখরোগ. কর্ণরোগ, মলদ্বারের পাক, লিঙ্গের পাক, হলীমক (পাণ্ডু রোগ বিশেষ) শ্বাশ, কাস, কামলা, অপচী, অপস্মার উন্মাদ, বাতরক্ত, যোনিদোষ, শুক্রদোষ এবং পিত্তজ রোগে বিরেচন হিতকর।

ডাঃ। আচ্ছা যে রোগ বমনের অযোগ্য—তাহাকে কি বিরেচন করান যায়?

ক। পঞ্চকর্ম্মের সাধারণ সূত্র এই যে, প্রথমে স্নেহ, পরে স্বেদ, পরে বমন প্রয়োগ ক'রে তবে বিরেচন প্রয়োগ ক'রতে হয়, নচেৎ

গ্রহণী দোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ সূত্র এরূপে হ'লেও ভিন্ন ভিন্ন রোগের চিকিৎসায় কখন বমন, কখন বিরেচন, কখন উভয়ই প্রয়োগ করতে হয়, আবার দুর্ব্বল রোগীকে দু'য়ের কোনই প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। উর্দ্ধগরক্তপিত্তে বমন নিষেধ, কিন্তু বিরেচন প্রয়োগ করা যায়। অধোগ রক্তপিত্তে বিরেচন নিষেধ, কিন্তু বমন প্রয়োগ করা যায়।

ডাঃ। আচ্ছা বমন বিরেচনের পূর্ব্বে কি স্নেহও স্বেদ প্রয়োগ করা সর্ব্বত্রই আবশ্যক ?

ক। বলবান রোগী এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহ শোধন ক'রতে হ'লে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রে যথারীতি পঞ্চকর্ম্ম কর'তে হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রোগেরই চিকিৎসার অনেক সময় সেটা শুধু আবশ্যক নয়, পরন্তু অপকারী. নবজ্বরে বমন করা'বার বিধি আছে, কিন্তু নবজ্বরে স্নেহপান নিষিদ্ধ। আবার সন্নিপাত জ্বরে স্বেদ দিবার বিধি আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও স্নেহ দান নিষিদ্ধ।

ডাঃ। এ বড় জটিল ব্যাপার দেখছি ?

ক। বিষম জটিল। একটা উদাহরণ দিয়ে বল'ছি শুনুন। বিষয়টা আরও জটিল ব'লে বোধ হবে। ভগবন আত্রেয়ের নিকট অগ্নিবেশ যখন শিক্ষা করেন, তখন বমন বিরেচন সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সঙ্গে আত্রেয় ব'ললেন, বমন বিরেচন কার্য্যে রোগীর বিপদ উপস্থিত হ'লে তার প্রতিকারের জন্যও অনেক দ্রব্যের আবশ্যক, বিপদ সহসা উপস্থিত হ'লে ক্রয়াশয় নিকটে থাকিলেও তখনি তখনি আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন করা সম্ভবপর নহে, এই জন্য রোগীর যে সকল দ্রব্য আবশ্যক—সেগুলি পূর্ব্বেই সংগ্রহ ক'রে রাখা উচিত।

আত্রেয়ের কথা শুনে অগ্নিবেশ বললেন, ভগবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির প্রথম হতেই এরূপ প্রতিবিধান করা উচিত—যাতে ঔষধ প্রয়োগে নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ বিপত্তি না ঘটে। ঔষধ সম্যক রূপে প্রয়োগ কার্য্য সিদ্ধির এবং অসম্যক প্রয়োগ বিপত্তির কারণ, যদি এরূপ হয় যে সিদ্ধি ও বিপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে ক্ষেত্র বিশেষে কার্য্য সিদ্ধি হয়, আবার কাহারও পক্ষে বিপত্তি ঘটে, তা'হলে জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুই সমান ব'লতে হ'বে।

ডাঃ। বাঃ অগ্নিবেশ তো বড় জবর কথা বলেছেন !

ক। আত্রেয় আরও জবর কথা বলেছেন। তিনি উত্তর ক'রলেন, অগ্নিবেশ, আমরা অথবা আমাদের মত ব্যক্তিরাই এরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে সমর্থ হই, আমাদের ঔষধের দ্বারা নিশ্চয় রোগ নিবারণ হয় কোনরূপ বিপত্তি ঘটে না। এরূপ প্রয়োগ সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিতেও কেবল আমাদেরই সামর্থ্য আছে। কিন্তু এমন লোক কেহ নাই যে, আমাদের মত উপদেশ দিতে এবং সেই উপদেশের মর্ম্ম সম্যক অবধারণ ক'রতে সমর্থ। আমার উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ ক'রে তদনুরূপ কার্য্য ক'রতে পারে—এমন লোকও কেহ নাই। দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ), ঔষধ দেশ, বল, শরীর আহার, সাত্ম্য সত্ত্ব, প্রকৃতি এবং বয়স প্রভৃতির এত অবস্থান্তর এবং সেই সকল অবস্থান্তর (ভিন্নতা) এত সূক্ষ্ম যে, ইহাদের বিষয় সম্যক ভাবে চিন্তা করিতে বিশাল ও বিপুল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরও বুদ্ধি আকুল হইয়া পড়ে, অল্প বুদ্ধিরত কথাই নাই।

ডাঃ। অতি সত্য কথা। কিন্তু আত্রেয়ের কি তেজোগর্ব্ব উক্তি—আমি বা আমার মত ব্যক্তি কি পারে, আর কেউ পারে না।

ক। তাঁরা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁরাই শুধু এরূপ কথা উচ্চারণ ক'রতে সাহস ক'রতে পারেন। সংহিতাকার অগ্নিবেশকে পর্য্যন্ত বিপত্তির প্রতিকারের উপায় শিখতে হ'য়েছিল।

ডাঃ। তা আপনি যখন বিরেচনের কথা ব'লেছেন, তখন বিপত্তির প্রতিকারের কথাও বলতে হবে।

ক। দেখুন—সত্য কথা না ব'ললেও বাঁচিনে, এ আপনাকে যা বলছি সেটা পাখীর রাধাকৃষ্ণ বলার মত, কথার মানে না বুঝে বলা। যখন বিরেচন আমরা সম্যকরূপে প্রয়োগও ক'রতে পারিনে, আর তার বিপত্তির প্রতিকার কত্তে জানিনে। তবে শাস্ত্রে যা লেখা আছে—তাই বলছি।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্যরক্ষায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী।

—:*:—

আশ্বিনের "আয়ুর্ব্বেদে" "হিন্দুর স্বাস্থ্য নীতি" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। পরে কার্ত্তিকের পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা পূরণোদ্দেশে পরবর্ত্তী প্রবন্ধ লেখক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে শরীর রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটী বাস্তবিক মূলত্যাগ করিয়া কেবল আখ্যায়িকা মাত্র হইয়াছিল। এস্থলে দ্বিতীয় প্রবন্ধলেখকই প্রকৃত প্রশংসনীয়। যাহা হউক এক্ষণে বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি উপলক্ষ্য করিয়া দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার কি ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে অবশ্য পল্লীগ্রাম সমূহেও যথাসম্ভব একটু একটু করিয়া সহরের পদ্ধতিই অনুবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, সুতরাং সহরের কথা বলিলেই অনেকটা মফঃস্বলের কথাও আসিয়া পড়িবে। কলিকাতা মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি। প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ নির্ব্বাচিত কমিশরণগণ দ্বারা মিউনিসিপালিটী পরিচালিত। রাস্তা প্রস্তুত করণ, উহা মেরামত ও পরিষ্কার রাখা, রাত্রিকালে রাস্তায় আলোক প্রদান, বাটীর ও পথের জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত, পুরীষ রাশি ও আবর্জ্জনাদির স্থানান্তরের দূরীকরণ, পানীয় জল সরবরাহ, খাদ্য ও পানীয়ের অবিশুদ্ধতা নিবারণ, মহামারী ও সংক্রামক রোগসমূহের প্রতিকার সাধন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য মিউনিসিপালিটি দ্বারা সমাধা হয়। এই সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মিউনিসিপালিটি দ্বারা প্রজার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে কর

সংগ্রহ করা হয়। ফলকথা মিউনিসিপালিটী প্রজার অর্থে ও প্রজাদের নির্ব্বাচিত কমিশনরগণ কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত।

বাটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, অর্থাৎ মিউনিসিপালিটীর অনুমোদন ভিন্ন কাহারও বাটী নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা নাই। যাহাতে গৃহমধ্যে আলোক প্রবেশের ও রায়ুসঞ্চালনের উপায় থাকে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধও আছে। কলিকাতার ন্যায় স্থানে যেখানে জমির মূল্যের অত্যন্ত মহার্ঘতা বশতঃ অনেককেই অতি সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, সেরূপ স্থলে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে আইন বিধিবদ্ধ করিতে হয়, এজন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ। আইনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে মিউসিপাল কর্ম্মচারিগণের গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি দিবার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু কখনও কখনও এরূপও হয় যে, আইন বজায় রাখিয়া গৃহনির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তবে আইনের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেও স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হয় না। এইজন্য কোন কোন স্থলে বাটী নির্ম্মাণকারক দরখাস্ত করিলে, চেয়ারম্যান, হেল্‌থ অফিসর ও কমিশনরগণ মন্ত্রণাসভার আন্দোলন করিয়া, যদি স্বাস্থ্যহানিকর হইবে না মনে করেন, তাহা হইলে বাটী নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়া থাকেন। বন্দোবস্ত বাস্তবিকই খুব ভাল। তবে এরূপ অনুমতি লাভ কমিশনরের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন ঘটে না। যাঁহারা কমিশনরের প্রিয়পাত্র, তাঁহাদের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য লাভ সহজেই ঘটে। যে সকল কমিশনর অপক্ষপাতী ও করদাতাগণের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কেবল তাঁহাদের ওয়ার্ডে সকলে সমভাবে এই সুবিচার লাভে অধিকারী হন। যাহা হউক এ দোষ মিউনিসিপালিটীর নহে, উহা করদাতৃগণের কমিশনর নির্ব্বাচনের দোষ। বঙ্গদেশের গৃহনির্ম্মাণের যে প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল, তাহা খুব ভাল হইলেও কলিকাতার ন্যায় বহুজনাকীর্ণ মহানগরীর প্রতি প্রয়োজ্য নহে, এবং সে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অনেকের পক্ষেই বাসগৃহ নির্ম্মাণ দুরূহ হইয়া পড়ে। এস্থলে মিউনিসিপালিটীর অবলম্বিত ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে যেখানে জমির মূল্য সুলভ, সেরূপ স্থলে প্রাচীন পদ্ধতিই ভাল, যথা,—"পূবে হাঁস। পশ্চিমে বাঁশ। উত্তর বেড়ে। দক্ষিণ ছেড়ে। ঘর কর রে ভেড়ের ভেড়ে॥" ইহার অর্থ এই যে, বাসভবনের পূর্ব্বদিকে জানালা থাকা আবশ্যক; কারণ নবোদিত তরুণ তপনের নাতিতীক্ষ্ণ রশ্মিরাজি গৃহমধ্যে স্বতঃপ্রবিষ্ট হইয়া এবং কোন কোন অগম্যস্থানেও জলাশয় হইতে প্রতিবিম্বিত কিরণমালা প্রবেশ করিয়া গৃহের ও গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশির আর্দ্রতা নিবারণ ও রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়। পশ্চিমে বাঁশঝাড় বা উচ্চ বৃক্ষরাজি থাকা আবশ্যক; তাহা হইলে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের অসহ ও অস্বাস্থ্যকর কিরণরাশি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তর দিক বেষ্টন বা প্রাচীর রুদ্ধ করিবার কারণ এই যে, উত্তর বায়ুর গতি রোধ হইয়া শৈত্য নিবারিত হইবে। যাহাতে দক্ষিণ মলয়ানিল অবাধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—তজ্জন্য দক্ষিণ দিক খোলা থাকা আবশ্যক। যেখানে জমির স্বচ্ছলতা আছে, সেখানে

এ প্রণালীতে গৃহনির্ম্মাণ বেশ স্বাস্থ্যকর বটে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর জন্য কলিকাতায় রাস্তা পরিষ্কারের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে—যেখানে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হয় নাই—তথাকার রাস্তা পরিষ্কার ব্যাপারটা গ্রামবাসিদের উপর নির্ভর করে। তবে জমির সচ্ছলতা প্রযুক্ত অনেক গ্রামের আবর্জ্জনা রাশি রাস্তায় ফেলিতে দেখা যায় না। মধ্যে যে সকল পতিত জমি থাকে বা গৃহস্বামীর নিজের যে পতিত জমি থাকে, তাহাতেই পল্লীগ্রামের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করা হয়—এবং ঐ আবর্জ্জনা রাশি ক্রমে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ঐ সকল পতিত জমি প্রায় বাসগৃহ হইতে দূরেই অবস্থিত, সুতরাং উহা দ্বারা গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হয় না। কিন্তু যে সকল গ্রামের লোকসংখ্যা অধিক এবং বাস ভবনের অনতিদূরেই আবর্জ্জনা রাশি পচিতে থাকে, তথায় উহা পীড়া উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি রাস্তা পরিষ্কারের জন্য দু'বেলা রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া, দুবেলা জল সেচন করা, দুবেলা আবর্জ্জনা রাশি গাড়ী করিয়া স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি দ্বারা কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে অর্থও প্রচুর ব্যয়িত করা হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটু সুবন্দোবস্ত হইলে ভাল হয় বলিয়া আমরা মনে করি। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আবর্জ্জনা রাস্তায় ফেলিতে দেওয়া হয় না বা স্থানে স্থানে লৌহ নির্ম্মিত যে আধার থাকে তন্মধ্যে ফেলিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহার একটু পরিবর্ত্তন হইলে ভাল হয়। কারণ অনেক গৃহস্থের সর্ব্বদা আবর্জ্জনা রাশি পথস্থিত লৌহাধারে নিক্ষেপ করিবার সুবিধা হয় না। যাঁহাদের গৃহকার্য্যের জন্য ঠিকা লোক নিযুক্ত থাকে; সে লোক দিনান্তে একবার আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গন পরিষ্কার করে ও আবর্জ্জনা রাশি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ্ করে। কিন্তু সমস্ত দিবারাত্রি ঐ সব আবর্জ্জনারাশি গৃহমধ্যেই পচিতে থাকে। কারণ অবরোধস্থ স্ত্রীলোকেরা রাস্তায় যাইয়া আধার মধ্যে আবর্জ্জনা ফেলিয়া আসিতে পারে না। আবর্জ্জনা রাশি পচিয়া দূষিত হইতে থাকে। যে সকল বাটীর সন্নিকটে আবর্জ্জনার আধার থাকে—তাহাদের আবর্জ্জনা ফেলিবার সুবিধা হয় বটে; কিন্তু একস্থানে প্রচুর আবর্জ্জনা রাশি থাকায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয়। ধাঙ্গড়ের সংখ্যা যদি বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সমস্ত দিন আবর্জ্জনা রাস্তায় পড়িবামাত্র যদি উঠাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার হইতে পারে। শুনিয়াছি চীনদেশের কোন কোন সহরে নাকি এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। মেথর সমস্ত দিন ঝাড়ু হাতে রাস্তায় উপস্থিত থাকে, আবর্জ্জনা পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা হয়।

এইবার রাস্তা মেরামত সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে কলিকাতার রাস্তা সর্ব্বদাই মেরামত হইতেছে। বড় রাস্তা ও ফুটপাথ সমূহে পাথর দেওয়াতে বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এমন কি অনেক গরীব লোক গ্রীষ্মকালে রাত্রে ফুটপাথে শয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ষার সময় পাথরের উপর বড় পা পিছলাইয়া যায় বলিয়া তাহারও প্রতিকার সাধন হইয়াছে; অর্থাৎ পাথরের উপরিভাগ যাহাতে মসৃণ না হয়—সেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গলির

রাস্তায় ইট বিছাইয়া পাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অনেক রাস্তার উচ্চতা এত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে যে, অনেক বাটীর প্রাঙ্গন বা গৃহতল যাহা পূর্ব্বে রাস্তা হইতে উচ্চ ছিল, তাহা এক্ষণে রাস্তা অপেক্ষা নিম্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিম্নতলের গৃহগুলির আর্দ্রতা বর্দ্ধিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এ বিষয়টীর প্রতি মিউনিসিপালিটীর লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নোটিশ দিয়া গৃহস্বামীকে নিজ খরচায় গৃহ প্রাঙ্গন উচ্চ করান হইতেছে। কিন্তু নীচু হইলে না দিলে আর এরূপ নোটিশ দিবার প্রয়োজন হয় না। কোন কোন স্থলে উঠান উচু করিতে গিয়া শয়ন ঘরের মেজের সহিত প্রায় সমতল হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ঘরের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে রাস্তা উচু না হইয়া সমভাবে থাকে, সে বিষয় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণের একটু কৃপাদৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। যে সকল রাস্তা অনেক উচু হইয়াছে, যদি সেগুলিকে নামাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত।

কলিকাতায় অধিকাংশ বাটীই সঙ্কীর্ণ স্থানে নির্ম্মিত। তথায় অবিরুদ্ধ বায়ু সেবনের উপায় নাই। সে কারণ মুক্ত বায়ু সেবনার্থ কলিকাতা মিউনিসিপালিটী স্থানে স্থানে স্কোয়ার বা সরকারি বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কলিকাতার ন্যায় অন্যান্য বড় বড় সহরেও এইরূপ স্কোয়ার ও পার্ক নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ বন্দোবস্ত যে খুব ভাল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতায় আবার অবরোধবাসিনীদের বায়ু সেবনার্থ পার্ক হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এ সব সম্বন্ধে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কার্য্যকলাপ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ইহাতে আমাদের প্রতিবাদ বা নূতন প্রস্তাব করিবার কিছুই নাই।

খাদ্য ও পানীয়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহারা বেশ কৃতকার্য্যও হইতেছেন। বাজারে পচা মৎস্য বা মাংস, দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাদি বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। বিক্রয় করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হয় ও বিক্রেতাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়। পানীয় জলের বিশুদ্ধতাই কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রথম সোপান। শুনা যায়, কলিকাতায় যখন প্রথম কলের জলের সৃষ্টি হয়, তখন তিন দিন নিমতলা শবদাহ ঘাটে শবদাহ হয় নাই, অর্থাৎ কলিকাতায় ৩ দিন লোক মরে নাই। সে সময় মহাত্মা হগ্ সাহেব চেয়ারম্যান ও ডাক্তার টনিয়ার হেলথ্ অফিসার ছিলেন। কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির সম্বন্ধে ইঁহারা সর্ব্বাগ্রে ধন্যবাদার্হ। এই ডাক্তার টনিয়ার সাহেব হোমিওপ্যাথ ছিলেন। ইঁহার পর কোন হেলথ্ অফিসরের আমলে মৃত্যুসংখ্যা একদিনের জন্যও একেবারে শূন্য হইতে দেখা যায় নাই। যে কলের জল কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির মুখ্য কারণ, বর্ত্তমানে সেই জল সরবরাহ করা সম্বন্ধে দুই এককথা বলিবার আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী দ্বারা এক্ষণে দুই প্রকার জল সরবরাহ করা হয়। পান, স্নান এবং গৃহকর্ম্মের জন্য পরিস্কৃত জল, এবং পায়খানা পরিষ্কারের জন্য অপরিস্কৃত জল মাপিয়া দেওয়া হয়, তাহার অতিরিক্ত খরচ হইলে স্বতন্ত্র দাম দিতে হয়। সে কারণ যাঁহাদের বিশুদ্ধ জলের খরচ অধিক, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে অপরিস্কৃত

জল ব্যবহার করেন। ইহা রোগোৎপত্তির একটী কারণ। এই জল খরচের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য মিউনিসিপালিটীর খরচায় গৃহদ্বারে একটী মিটার বা পরিমাপক যন্ত্র স্থাপিত আছে। উহা পরিদর্শনের জন্য অনেক ইন্‌স্পেক্টর ও কুলি নিযুক্ত আছে, এবং মেরামতের জন্যও মিস্ত্রী আছে। এই সকল খরচা কমাইয়া যাহাতে বিশুদ্ধ জল অবাধে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে বন্দোবস্ত করিলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া জলের অপব্যয় করিতে দেওয়াও যুক্তি সঙ্গত নহে। তবে অন্য উপায়ে জলের অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে। দিবারাত্র যদি কলে জল থাকে, তাহা হইলে কতক পরিমাণে অপব্যয় নিবারণ হইতে পারে। কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। খাদ্য, পানীয়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে হিন্দুকে অনেক কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয়। দিবারাত্র জল না থাকার জন্য জল চৌবাচ্ছায় ও অন্যান্য আধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। ফলে সামান্য কারণে এই জল হিন্দুর অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। হয় ত বায়সাদি দ্বারা চৌবাচ্ছার জলে কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য আসিয়া পড়িল, হয় ত ইন্দূরাদি দ্বারা কোন উচ্ছিষ্ট বা অস্পৃশ্য দ্রব্য জলের জালা বা কলসীর গাত্রে সংলগ্ন হইল। সেইজন্য হিন্দুকে পূর্ব্ব সংগৃহীত জল পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু দিবারাত্র কলে জল থাকিলে জল সংগ্রহ করিয়া রাখিবার আবশ্যক হয় না। ফলে নানা কারণে কলিকাতায় জলের অপব্যয় হইয়া থাকে। এখন কলের মুখ যেরূপ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া রেল ষ্টেসনের কলের ন্যায় বা রাস্তার কলের ন্যায় মুখ প্রচলন করিলে অনেক সময় অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ধরিয়া থাকিলে জল পড়িবে এবং ছাড়িয়া দিলেই জল বন্ধ হইবে—এরূপ করিলে জল যাহার যত আবশ্যক—অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবেন, এবং জলের অপব্যয়ও নিবারিত হইবে।

আমরা আশা করি, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের কথাগুলি বিবেচনা করিবেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

ওলাউঠার প্রতিষেধক।

—:*:—

("নীহার" হইতে উদ্ধৃত)

ওলাউঠা ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ নিয়ম আছে, যাহা ব্যক্তিগত ভাবে পালন করিলে ঐ ব্যারামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। দেশের জনকয়েক শিক্ষিত লোক ছাড়া পল্লীবাসী অসংখ্য জনসাধারণে এ বিষয়ে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। বর্ত্তমান ওলা-

উঠার প্রাদুর্ভাব কালে জনসাধারণের হিতার্থে নিম্নে কয়েকটী নিয়ম লিখা হইল।

(১) কলেরা ব্যারাম প্রায়ই শীতকালে দেখা যায়। দরিদ্র লোককে যাহাদের শীতবস্ত্রের অভাব তাহাদের বেশীর ভাগ লোককে এই ব্যাধিতে মরিতে দেখা যায়। শরীরে—বিশেষতঃ পেটে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকে সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সামান্য পেটের অসুখ হইলেও স্নান করা একেবারে নিষিদ্ধ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে—স্নান করিলেই পেট ঠাণ্ডা হইবে, উহা সম্পূর্ণ ভুল। পেটের অসুখ হইলে স্নান করা কোন রকমে উচিত নহে।

(২) প্রায়ই দেখা যায়,—কলেরা দূষিত জল ও দুগ্ধ পান করিলে হয়। এ সময় প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত—পানীয় জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহা পরিষ্কার নেকড়ার দ্বারা ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করা। জল সিদ্ধ করিলে উহার সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। কাঁচা দুগ্ধও কখন পান করা উচিত নয়। আমি জানি—একজন বড় সাহেব কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন খাঁটী দুগ্ধ পাইবার উপায় নাই। দুগ্ধ বিক্রেতারা অনেক সময় দূষিত খাল বিলের জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধকে বিষাক্ত করে।

(৩) কলেরা রোগের বিষ রোগীর ভেদ ও বমির সহিত নিঃসৃত হয়। অতএব রোগীর মল-মূত্র ও বমি আদি যাহাতে পানীয় জলে না পড়িতে পারে এবং উহার উপর মাছি না বসে, সে বিষয়ে সকলের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। মাটীর গামলা অথবা সরাতে রোগীর মলমূত্রও বমি ধরিয়া তাহার উপর তৎক্ষণাৎ মাটী অথবা বালি দিয়া ঢাকা দিলেই মাছি বসিতে পারে না এবং তাহার পর পাত্র সহিত রোগীর মল—মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলা বিধেয়। রোগীর মল কখনও যেখানে সেখানে ছড়াইয়া ফেলা উচিত নয়। কলেরা একটী অতি সংক্রামক ব্যাধি, রোগীর ভেদ বমির উপর যদি মাছি বসিতে পায়, তবে উহারা ঐ পীড়ার বিষ লইয়া খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিলে তাহাও বিষাক্ত করিয়া দেয় এবং সেই খাদ্য দ্রব্য খাইয়া লোকে কলেরা ব্যারামে আক্রান্ত হইতে পারে। এই জন্য খাদ্যদ্রব্য সমূহ এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক, যাহাতে উহার উপর মাছি আদৌ বসিতে না পারে।

বাজারে অনেক খাবারের দোকান আছে, কিন্তু সমস্ত দোকানের খাবারগুলি রাস্তার ধূলায় ও মাটীতে ঢাকা থাকে। এইরূপ খাবার খাইলে লোকের অনিষ্ট ছাড়া উপকার হইতে পারে না।

কলি চূণ একটী বিষ প্রতিষেধক। কলেরা রোগীর মলে ইহা দিলে বিষ নষ্ট হয়। ইহা ছাড়া পারমাঙ্গানেটঅব পটাশ দ্বারাও জলের দোষ নষ্ট করা যায়। ইহা একটা সাধারণ কুয়াতে অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণে মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট হয়, অথবা ক্লোরোজেন ১ আউন্স দিলেই জলের দোষ নষ্ট হয়। ফেনাইলও একটী উত্তম বিষপ্রতিষেধক। বাড়ীতে কলেরা হইলে ঘরের দেওয়াল ও মেজেয় ফেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঘর পরিষ্কার করা দরকার এবং ঘরের মেজেতে ঘুঁটিয়ার আগুন করিয়া দিলে সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত গন্ধক জালাইলেও দূষিত হাওয়া পরিশোধিত হয়।

(৪) কলেরা রোগীর কাপড় কখনও পুকুর অথবা অন্য কোন জলাশয়ে ধোওয়া উচিত নহে। উহা হইতেই ব্যারাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। রোগীর কাপড়-হাঁড়ি অথবা টিনের ভিতর রাখিয়া উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া উচিত। জলে ফিনাইল অথবা চূণ মিশাইয়া লওয়া বিধেয়।

(৫) কলেরার কীটাণু দেখিতে কমার ন্যায়। সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছে, কমা ব্যাসিলাস্। কলেরার বিষ অম্লে নষ্ট হয়। কলেরার সময় লেবু (পাতি, কাগজি, কমলা) খাওয়া ভাল এবং ঔষধ Sulphuric Acid Dilute ১০ ফোঁটা করিয়া আহারের পর দুইবার খাওয়া ভাল।

শ্রীরমণীমোহন মুখোপাধ্যায়
এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

পিত্তশূল বা Gallstone.

[ডাক্তার গ্লাইকোকোলেট বলেন,—সোডার চেয়ে কবিরাজী কুলেখাড়া—এ রোগের অব্যর্থ ঔষধ]

আজকাল আর একটী রোগ বেশ ব্যাপক ভাবেই এ দেশে দেখা দিয়াছে। রোগটার নাম—"গলষ্টোন" [Gallstone.] শাস্ত্রীয় নাম—'পিত্তশূল"। পূর্ব্বে এ রোগ কদাচ কাহারও হইত, এখন কিন্তু অনেককেই এ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিতেছি। গত বৎসর—আমি গলষ্টোন রোগাক্রান্ত ১৭টী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা—আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নহে। কবিরাজ মহাশয়গণ—এই ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ রোগের পরিচয় বিলক্ষণই জানেন, কেননা তাঁহাদের শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বেশ নিপুণ ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের কাছে এ রোগের পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল নূতন শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—গলষ্টোনের বাঙ্গালা নাম 'পিত্তশূল"। "পৈত্তিক শূল" পিত্ত প্রধান শূল। আর "পিত্ত শূল ও পৈত্তিক শূল" এক নহে। "পিত্তশূল" পিত্তকোষের শূল। পাঠকগণ নামের এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিবেন। আমার প্রিয়সুহৃদ্ আয়ুর্ব্বেদে অসাধারণ অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়—"বৈদ্যাঞ্জন" নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদে এ রোগের নাম লিখিয়াছেন, "পিত্ত-শিলা", নামটী খুব সঙ্গত। কেননা এ রোগে পিত্তকোষে শিলা অর্থাৎ পাথুরী জন্মে।

রোগটী এমন জটিল লক্ষণাক্রান্ত যে, প্রথমে ধরা বড় শক্ত। অনেক রোগের লক্ষণের সহিত ইহার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

নিদান। এ রোগের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ—

অতিশয় পরিশ্রম, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, অতি মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, অপরিমিত শীতল

জল পান, রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, পিষ্টকাদি এবং অধিক ঘৃত মস্লাযুক্ত দ্রব্য আহার, চিন্তা, দিবানিদ্রা, আলস্য, ক্ষীর মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মাদক সেবন, মাংসাশক্তি, অজীর্ণতা, মল মূত্রাদির বেগধারণ, শোক, উপবাস, অতিহাস্য, অতি ভাষণ, ইত্যাদি কারণে—শরীরে বায়ু কুপিত হয়, পিত্ত নিঃসরণের ব্যাঘাত জন্মে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ইহাই অভিমত। এই কারণগুলি—আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে, দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাই গলষ্টোনও ব্যাপক ভাবে দেখা দিতেছে।

পূর্ব্বরূপ। যকৃতের নিকটে [Right Hypo chon drium] অল্প অল্প ভার বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল-বিপাক, এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য—এইগুলি এ রোগের "পূর্ব্বরূপ" রূপে প্রকাশ পায়। পরে শূলের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই যন্ত্রণা দেখা দিলেই আসল রোগ ধরা পড়ে।

ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—মাঝে মাঝে যকৃতের নিকট অত্যন্ত বেদনানুভব। এই বেদনা নবম পঞ্জরাস্থির কার্টিলেজ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ অস্থির লাইনে দক্ষিণ Scapuler প্রদেশে যায়, কখনও আরও উর্দ্ধে দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে, কখনও বা বাম স্কন্ধের দিকে, আবার কখনও বা নিম্নদিকে নাভি দেশ পর্য্যন্ত—গমন করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়। ইহাতে পিত্ত নিঃসরণ নালীর গাত্র প্রসারিত (Relaxed) হওয়ায়, পাথুরী Duodenumএ চলিয়া আসে। পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণার জন্য রোগী কাতর হইয়া পড়ে। এমন কি—হিমাঙ্গ (Collupse) হইয়া মারা যাইতে পারে।

প্রবল আক্রমণ। রোগের প্রবল আক্রমণে – রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, তাহার আর্ত্তনাদে দর্শকের নেত্র সজল হইয়া উঠে। রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে থাকে, পীড়িত স্থান পুনঃ পুনঃ টিপিতে থাকে; তাহার শরীরে ম্যালেরিয়া রোগীর মত কম্পন উপস্থিত হয়। জ্বরও দেখা দেয়—জ্বরের উত্তাপ বিলাতী মাপ কাটিতে মাপিলে, ১০২।১০৩ কখনও ১০৪ পর্য্যন্ত উঠে। কাহারও কাহারও অতি ঘর্ম্মস্রাব হয়, পেট ফাঁপে, প্রস্রাব বন্ধ বা মূত্রকৃচ্ছ উপস্থিত হয়।

যদি পাথুরীর আকার অতি বৃহৎ হয়, এবং উহা বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, পিত্তকোষ ও অন্ত্রের গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া, একেবারে অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্যের গমনাগমনের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই সময় অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। খুব প্রবল ভাবে জ্বরও দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় রোগীর জীবন সংশয় হইয়া পড়ে।

উপসর্গ। পিত্তকোষে পাথুরী জন্মিলে তাহার উপসর্গরূপে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

১। শূল বেদনা। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শূলের ডাক্তারী নাম Gullstone Colic. পিত্ত কোষের চতুর্দ্দিকস্থ টিস্যুর সহিত সংযোগ হইলে এই যন্ত্রণা খুব বেশী হইয়া থাকে।

২। বমন। কখন কখন ক্রমাগত বমন হইতে থাকে, কখনও ১৫ মিনিট অন্তর, কখনও বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর। বমনে ভুক্তদ্রব্য উঠিয়া যায়, তাহার সহিত পিত্ত মিশ্রিত থাকে।

৩। পাণ্ডুতা। ইহার ডাক্তারী নাম জণ্ডিস্। যখন যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ প্রণালী (common clucb) রুদ্ধ হয়, তখনই ইহা প্রকাশ পায়। রোগীর দেহ পীতবর্ণ—রক্ত-শূন্য মনে হয়। কিন্তু crall bladder কিম্বা oyatic cluct বা পিত্ত কোষ প্রণালীতে পাথুরী থাকিলে—প্রায়ই জণ্ডিস্ হয় না।

৪। অম্ল বিপাক। বুক, পেট, গলা—অম্লে জ্বালা করে, ওষ্ঠ, মুখ অম্লাস্বাদ যুক্ত হয়।

৫। অরুচি। কোন জিনিষ খাইতে ভাল লাগে না। ৬। জ্বর। জ্বরের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই জ্বর—ঠিক্ urithral fever এর মত।

৭। বস্তি দেশের স্ফীততা। তলপেট ফাঁপা। ৮। কোষ্ঠ বদ্ধতা। ৯। মূত্রকৃচ্ছ্র অতি সরু ধারে মূত্র বাহির হয়, কখনও ফোঁটা ফোঁটা। মূত্রের বর্ণ কখনও জলের মত স্বচ্ছ, কখনও পীত, কখনও গোমেদ মণির মত, কখনও আবিল, কখনও রক্ত মিশ্রিত। মূত্রের গন্ধ—ছাগ গন্ধী।

১০। অবসাদ। ১১। তৃষ্ণা। ১২। মূর্চ্ছা। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, হস্ত পদাদির আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ১৩। দাহ। ১৪। শিরোরোগ—মাথাধরা, মাথার রোগ। ১৫। শোথ। এ লক্ষণ—মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেই দেখা দেয়।

১৬। অজীর্ণ। কেবল মাত্র অজীর্ণতার জন্য—গলষ্টোন রোগ জন্মিতে পারে।

এমন অনেকগুলি রোগ আছে—যাহাদের সহিত গলষ্টোন রোগের অনেক বিষয়ের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই গলষ্টোনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বড় বড় চিকিৎসককেও হারি মানিতে হয়। চলনশীল Right Kidney. Solid or cystic tumour of Kidney. ক্যান্সার পাইলোরস্, ক্যান্সার লিভার, দক্ষিণ সুপ্রারীণেল ক্যাপসুলের টিউমার ওমেণ্টামের অর্ব্বুদ, যকৃতের Hydatid. প্রভৃতি অনেকগুলি রোগে—গলষ্টোন বলিয়া ভ্রম হয়। আবার গলষ্টোনের যন্ত্রণা যেরূপ,—নিম্নলিখিত রোগগুলিতে ঠিক সেই ভাবের যন্ত্রণা হইতে পারে। যথা—Intestinal colic, Renal colic পাকস্থলীর Pyloric endoy স্থূলতা ও বেদনা, Lead colic. duolenal ulcer. লিভারের congestion. —প্রভৃতি।

পরীক্ষা। পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও তাহার ভিতর গলষ্টোন আছে কিনা? ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে রোগীকে জানুর উপর হাতের ভর দিয়া সম্মুখ দিকে বাঁকিয়া বসিতে বলিবে। চিকিৎসক রোগীর পিছনে বসিবেন এবং নিজের হস্ত সমতল ভাবে রোগীর পেটের উপর পিত্তকোষের কাছে লম্বা করিয়া রাখিবেন, পরে রোগীকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে বলিবেন। প্রতি প্রশ্বাসের সহিত রোগীর পেট কুঞ্চিত হইলে, চিকিৎসক নিজের হাতখানি রোগীর পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহা ঘুরাইয়া রৈখিক ভাবে (Hori Zontally) যকৃতের নিম্নতলে আনিবেন ইহার দ্বারা পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও পাথুরীর অস্তিত্ব—অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

গলষ্টোন সম্বন্ধে চিকিৎসককে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। এ রোগ পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকদেরই বেশী হয়। আবার যে সকল স্ত্রীলোকের ৩০ বৎসরের বেশী বয়স হইয়াছে, তাহারাই এ রোগে আক্রান্ত হইয়া

থাকেন। যাঁহারা সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহারা আবার অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব করায় ডায়াফ্রাম দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; যে সকল রমণী দিনরাত জামাজোড়া সেমিজ-সাঁয়া আঁটীয়া—জুজুবুড়ী সাজিয়া থাকেন, ডায়াফ্রামিক শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁহাদের অল্পই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কাজেই পিত্তকোষে পিণ্ড জমিয়া যায়—জোরের সহিত বাহির হইয়া অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে না। এই পিণ্ডই প্রস্তরাকারে প্রকাশ পায়। এ রোগ বৃদ্ধাদের মধ্যে আরও বেশী। বঙ্গ রমণীর চেয়ে কর্সেট আঁটা বিবিদের পিত্তকোষে প্রায়ই পাথুরীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। ডাক্তারী মতে—অস্ত্র চিকিৎসাই ইহার মুখ্য চিকিৎসা। কিন্তু অনেক সময়ই ইহা বিপজ্জনক। রোগীর বল না থাকিলে, বয়সটা বেশী হইলে,—তাহাকে ক্লোরফর্ম করা চলে না, অস্ত্রপ্রয়োগ করাও চলে না। বিশেষতঃ—যে স্থলে নিশ্চয় রূপে রোগ ধরা শক্ত, সে স্থলে অস্ত্র চিকিৎসা যুক্তি সঙ্গত হইতেই পারে না।

একবার একজন বড় ডাক্তারকে এজন্য অপ্রতিভ হইতে দেখিয়াছি! আমি তাঁহার সাহায্যকারী ছিলাম। রোগিণী—বড় লোকের বাড়ীর বধূ, বয়স ৩৫।৩৬, সন্তানাদি হয় নাই। ২ বৎসর রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, রোগিণী বড় ডাক্তারটীর চিকিৎসাধীন হ'ন। তাঁহার গলষ্টোনের বেদনার মত বেদনা ধরিত, ঐ সময় কম্প উপস্থিত হইত, গা বমি বমি করিত, মাথা ঘুরিত, ফিট্‌ও হইত। অস্ত্র প্রয়োগে গলষ্টোন বাহির করিতে গিয়া দেখা গেল—রোগ ঠিক্ ধরা যায় নাই। তাঁহার রোগ গলষ্টোন নহে,—Congestion of the ovary. আর একটী রোগিণীর গলষ্টোনের চিকিৎসা করিতে গিয়া পেট চিরিয়া দেখা গেল—ইরিটায়ে টিউমার হইয়াছে!

আরও ২।৩টী রোগী ও রোগিণীর গলষ্টোনের চিকিৎসা করিতে গিয়া শক্ত মলের চাপ, কাহারও ক্ষুদ্রান্ত্রের বায়ুপূর্ণতা, কাহারও বা Membrunous Enleritis.—দেখা গিয়াছে!

ডাক্তারী মতে। সেডিয়ম গ্লাইকো-কোলেট এবং মাঝে মাঝে অলিভ অয়েল প্রয়োগ করিলে গলষ্টোনের যন্ত্রণা কমিয়া যায়। ৫ গ্রেণ গ্লাইকোকোলেট অফ্ সোডা—কিঞ্চিৎ ম্যাগনেসিয়ার সহিত মিশাইয়া, প্রত্যহ ২।৩ বার সেব্য, আবশ্যক মত বিরেচক ঔষধের প্রয়োগ। কিন্তু এ ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল দেখি নাই। তবে একথা সত্য—ডাক্তারী মতে গ্লাইকোকোলেট, ও অলিভ অয়েল—গলষ্টোনের একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধ। বিশেষতঃ গ্লাইকোকোলেট পিত্তনিঃসরণের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

এ স্থলে গলষ্টোনের একটী অব্যর্থ ঔষধের উল্লেখ করিব। ঔষধটী—**কবিরাজী ঔষধ।** গলষ্টোনের এমন ঔষধ এ পর্য্যন্ত আমার আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই ঔষধটীর আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে।—

কর্ম্মক্ষেত্র হইতে মাঝে মাঝে দেশের বাড়ীতে যাইতাম। সেখানে—একজন নগণ্য পাড়াগেঁয়ে হাতুড়িয়া—কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। দেশে গেলে তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপ আমার বসিবার আড্ডা হইত। এই ব্যক্তির কাছে—অনেক দরিদ্র এবং নীচ জাতীয় রোগী প্রায়ই চিকিৎসার জন্য আসিত। ইনি স্বয়ং

নাপিত জাতীয় ছিলেন। পল্লীগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর রোগী অধিকাংশেরই পেটজোড়া প্লীহা যকৃৎ, ঘুষ ঘুষে জ্বর, পায়ে শোথ, পেটের পীড়া। আমাদের গ্রামের আসে পাশে প্রায় ১৫।২০ খানা গ্রামের লোকের বিশ্বাস ছিল—এই নাপিত-কবিরাজ প্লীহা-যকৃতের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

আশ্চর্য্যের বিষয়—ইহার হাতে অনেকে আরোগ্যও হইত। প্রায়ই দেখিতাম—এই নরসুন্দরবর তাঁহার রোগীগণকে এক রকম ক্ষার পদার্থ সেবন করিতে দিতেন। অনেক অনুসন্ধানের পর—তাঁহারই এক পুত্রের মুখে শুনিলাম—ঐ ক্ষার—কুলেখাড়া নামক গাছ হইতে প্রস্তুত।

আমিও জানিতাম—কুলেখাড়া যকৃতের একটী মহৌষধ। একদিন নাপিতটীর কাছে—উহার ক্ষার প্রস্তুতের কৌশলটী শিখিয়া লইলাম। তাহার পর হইতে—স্বহস্তে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া বিকৃত ও বিবৃদ্ধ যকৃৎ রোগীর উপর ইহা প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি কুলেখাড়ার অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইলাম।

কুলেখাড়া—মাঠে, জলা জমির ধারে, পুষ্করিণীর পাড়ে প্রচুর জন্মে। গাছ—লম্বা, পাতাও লম্বা, পাতার কোণে—তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে, ফুল নীল বর্ণের। চাষা ভূষা সবাই চিনে। এই কুলেখাড়ার গাছ—তুলিয়া আনিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। পরে ঐ শুষ্ক গাছগুলিকে একটী মাটীর হাঁড়িতে পুরিয়া,—হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা এবং উভয়ের জোড়ের স্থানে কাদার প্রলেপ দিয়া,—উনানে বসাইয়া ১ ঘণ্টা জ্বাল দিতে হয়। ইহাতে কুলেখাড়ার গাছ পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে, সেই অঙ্গার-গুলি ওজন করিয়া, ৮ গুণ জলে গুলিয়া, মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া (বৈদ্য মতে ২১ বার ছাঁকিলে ভাল হয়, আমি ৪।৫ বার মাত্র ছাঁকিয়া লই) সেই পরিশ্রুত জল লৌহ কটাহে রাখিয়া আবার জ্বাল দিতে হয়। জল মরিয়া গেলে বেশ দানাদার একরকম ক্ষার পদার্থ কটাহের গাত্রে লাগিয়া থাকে। ইহাই কুলেখাড়ার ক্ষার। এই ক্ষার ৬ গ্রেণ হইতে ১২ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার (আহারের পর) খাইলে, গলষ্টোনের যন্ত্রণা এবং পিত্ত-কোষের বিবৃদ্ধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়! আমি বহুস্থলে এই ক্ষারের কার্য্যকারীশক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। কাজটা একটু 'ভজকট' —কিন্তু যিনি ইহার গুণ বুঝিতে পারিবেন—তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে—অল্প ব্যয়ে একটী অমোঘ মহৌষধ পাইয়াছি।

কুলেখাড়ার ক্ষার সেবন করিলে, যকৃৎ-কোষে উত্তেজনা উপস্থিত হয়; তাহাতে ক্ষয় জনিত সঞ্চিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়—কেননা এই ক্ষার উদরস্থ হইবামাত্র পিত্ত নিঃসরণ অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং যকৃতে বিলিরুবিন সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যে রোগীর দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু, মূত্র প্রভৃতি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে রোগী ১০।১৫ দিন এই ক্ষার ব্যবহার করিলে—তাহার দেহের ও ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কুলেখাড়ার ক্ষার—গলষ্টোনের একটী মহৌষধ। কিছুদিন ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে আর বেদনা ধরিবার ভয় থাকে না। এই ঔষধের কোন বিষক্রিয়া নাই। বরং ইহাতে স্বাভাবিক রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

এই ক্ষার সেবনে প্রথম দুই একদিন কোন কোন রোগীর গা' বমি বমি করে, এ ভাব ৫।৬ দিন পরেই তিরোহিত হয়।

গলষ্টোনের যন্ত্রণায়, পিত্তকোষের বিবৃদ্ধিতে এবং ম্যালেরিয়া জ্বরে—যকৃতের ক্রিয়া ভাল না থাকায় রোগীর শরীরে পাণ্ডুতা দেখা দিলে ও বর্ণ মলিন হইলে, এই ক্ষার প্রয়োগ করিবে। যে কোনও রোগে—শরীরে পাণ্ডুতা দেখা দিলে—এ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহার অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে—কয়েক সপ্তাহের মধ্যে—গলষ্টোন বা পিত্তশিলা গলিয়া যায়। অস্ত্র প্রয়োগের আর আবশ্যক থাকে না।

যখন গলষ্টোন রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, অথচ ইহার ফলপ্রদ কোন ঔষধই দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন—আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, চিকিৎসকগণ—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

তবে—এই ঔষধ ব্যবহারের সময়—রোগীর পথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগীকে এমন পথ্য দিবে—যেন তাহার যকৃত একটু বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায়, অথচ শরীর পোষণের ব্যাঘাত না ঘটে। দৈনিক ৬ ড্রাম নাইট্রোজেন হইলেই দেহ রক্ষা হয়। পোষণ কার্য্যে প্রোটইড্ খাদ্য যথেষ্ট আবশ্যক বটে, কিন্তু উহার জন্য যকৃৎ এবং কিড্নীর কার্য্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কার্ব্বোহাইড্রেট্ পরিপাক করিতে যকৃৎকে বেশী খাটিতে হয় না। মাংস, মাখন, উদ্ভিজ্জ তৈল, অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। উদ্ভিজ্জ পথ্যাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তাহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে ফলমূলও দেওয়া চলে। যথেষ্ট পরিমাণে জলপান—পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য করে।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
এল, এম্, এস,

গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

—:*:—

বৃশ্চিক দংশনে।—(১) খানিকটা গাওয়া ঘি আগুনে গরম করিয়া একটু সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (২) ছাগলের নাদি জলে গুলিয়া ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (৩) রাঙা শাকের পাতা মুখে চিবাইয়া লাগাইলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

বোলতা, মোমাছি ও ভীমরুলের কামড়ে।—সৈন্ধব লবণের গুঁড়া ঘসিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়।

চুলকণায়।—(১) শ্বেত চন্দন ঘসিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্প্পূর মিশাইয়া ২।৩ দিন মাখিলে চুলকণা আরোগ্য হয়। (২) চাল মুগরার ফল ও হরিদ্রা সমান ভাগে বাটিয়া গায়ে মাখিলে চুলকণা ভাল হয়।

দন্ত শূলে।—খদির ১ তোলা চুণ চারি আনা, তুঁতে চারি আনা, গুঁড়া করিয়া এক পোয়া জলে গুলিয়া গরম করিবে, পরে সেইজল দ্বারা কুলকুচা করিবে। ইহাতে সদ্যঃ দন্তশূল আরোগ্য হইবে।

মাকড়সার গরলে।—কুড়চির ছাল ১ মাষা, গোলমরিচ চারিটা—একত্র লইয়া বাসিজল দিয়া বাটিয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিবে এবং কুড়চির ছাল—বাসি হুঁকার জল দিয়া বাটীয়া ১ সপ্তাহ গায়ে মাখিবে,—ইহাতে গরল ভাল হইবে।

পাঁকুইয়ের ঔষধ।—মেদিগাছের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁকুই আরোগ্য হয়।

খোস পাঁচড়ার ঔষধ।—বেগুণের পাতা ভস্ম করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক পাথরের চুণ লইয়া, নারিকেলের তেলে মিশাইয়া, নিম পাতার জলে ক্ষতস্থান ধুইয়া ৩।৪ দিন লাগাইলে খোস পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

কাণপাকায়।—সরিষার তৈল এক পোয়া, নিমপাতা, মিঠাবিষ, হিং ও সমুদ্র ফেণা প্রত্যেক ১।০, গোমূত্র ⁄১ সের একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লাগাইলে কাণপাকা আরোগ্য হয়।

উপদংশে।—মোম ১ তোলা, নারিকেল তৈল অর্দ্ধ ছটাক—একত্রে আগুণে গলাইবে, শীতল হইলে মুদ্রাশঙ্খ ও কজ্জলী ১ তোলা হিসাবে মিশাইয়া দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত আরোগ্য হয়।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

বনৌষধি।

—:*:—

অদ্য আমরা দুইটি বনৌষধির কথা বলিব। গুলঞ্চ ও নিম। প্রথমে গুলঞ্চের কথা বলি।

গুলঞ্চ (গুড়ূচী)—গুলঞ্চ সর্ব্বত্রই সহজ প্রাপ্য, পল্লীগ্রামে ইহা প্রচুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুড়ূচী দ্বিবিধ, সাধারণ গুড়ূচী ও পদ্ম গুড়ূচী। নিম্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে গুড়ূচীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঔষধার্থে উহাই শ্রেষ্ঠ। কোন প্রকার অম্লবৃক্ষ যথা তেঁতুল, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষাশ্রিত গুড়ূচী ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। নিম্ব বৃক্ষাশ্রিত গুড়ূচীর অভাবে অম্ল বৃক্ষ ব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষাশ্রিত গুড়ূচীও ব্যবহৃত হয়।

পদ্ম গুড়ূচীর গাত্রে অতি অল্প উন্নত কণ্টক উদ্ভূত হইয়া থাকে। উভয়বিধ গুড়ূচীই ঔষধার্থে ব্যবহারযোগ্য।

গুড়ূচী অধিকাংশ স্থলে ক্বাথ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। গুড়ূচী হইতে এক প্রকার সার বহির্গত করা যায়, তাহাকে গুড়ূচীর চিনী বা "পালো বলে। উহা চা খড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ চূর্ণ, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুড়ূচীর পালো প্রস্তুতের প্রণালী উল্লেখ করা যাইতেছে। কাঁচা গুড়ূচীলতার উপরিস্থিত পাতলা খোসা ছাড়াইয়া লইবে, তৎপর উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হামানদিস্তা বা

ঢেঁকীতে কুট্টিত করিয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে (হাঁড়ী বা গামলায়) জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে কুট্টিত গুড়ূচী ভিজাইয়া এক দিবস রাখিয়া দিবে। পর দিবস উক্ত গুড়ূচী গুলি উত্তম রূপে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া সিটী গুলি পরিত্যাগ করিয়া পাত্রস্থ জল স্থিরভাবে রাখিয়া দিবে। ঐ জলের নিম্নে যে পদার্থ দৃষ্ট হইবে তাহাই গুড়ূচীর পালো। কিন্তু উহা পরিষ্কৃত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জল দ্বারা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইলে তবে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুড়ূচীর পালো পিত্ত প্রশমক। রক্তপিত্ত রোগে মধুর সহিত সেবন করিলে সুফল ফলিয়া থাকে। গুড়ূচীর স্বরস, কল্ক, কাথ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

রসায়নে গুড়ূচী।—যাঁহারা রসায়ন কামী, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে গুড়ূচীর স্বরস ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবেন।

বিষম জ্বরে গুড়ূচী।—বিষমজ্বরে বা ম্যালেরিয়া জ্বরে গুড়ূচী একটী প্রধান ঔষধ। যাঁহারা নিত্য ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া কঙ্কলসার হইতেছেন, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে গুড়ূচীর কাথ পান করিলে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। ইহা কুইনাইনের তুল্য ফলদায়ক।

কামলায়।—(হ্যাবা) গুড়ূচী। কামলা রোগ (যাহাকে হ্যাবা বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে) প্রত্যহ প্রাতে গুড়ূচীর শীত কষায় মধু সহযোগে পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বাতরক্তে গুড়ূচী।—গুড়ূচীর রস দুগ্ধ সহ তৈল পাকের বিধানানুসারে তিল তৈলে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে বাত রক্তের উপশম হয়। পিত্তপ্রধান বাতরক্তে গুড়ূচীর কাথ পান করিলে বিশেষ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্তন্য দুগ্ধ শোধনে গুড়ূচী।—প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে ঐ স্তন্য পানে স্তন্যপায়ী সন্তান রোগগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রসূতিকে সপ্তাহকাল গুড়ূচী ও ছাতিম ছালের কাথে কিঞ্চিৎ শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঐ কাথ পান করাইলে স্তন্য দুগ্ধ বিশোধিত হইয়া থাকে।

বাত জ্বরে গুড়ূচী।—গুড়ূচীর কাথ সেবনে বায়ু প্রধান জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগে গুড়ূচী। পিত্ত প্রধান মেহ রোগী গুড়ূচীর কাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্ত প্রধান মেহ নিরাময় হয়।

আমবাতে গুড়ূচী।— আমবাতগ্রস্ত রোগী গুড়ূচী পেষণ করিয়া (১ তোলা) কিঞ্চিৎ শুষ্ঠী চূর্ণ সহ সেবন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

শ্লীপদে (গোদে) গুড়ূচী।—তিল তৈল বা সর্ষপ তৈল সহযোগে গুড়ূচীর কাথ পান করিলে গোদ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠে গুড়ূচী।—গুড়ূচীর স্বরস প্রত্যহ প্রাতে পান করিয়া, কিঞ্চিৎ পরে গব্য ঘৃত অথবা মুগের যুষের সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

হৃদ্‌রোগে গুড়ূচী।—হৃদয়স্থিত বায়ুতে বুক "ধড়ফড়" করিলে গুড়ূচী পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে, উহা উপশমিত হইয়াথাকে।

ক্রিমিরোগে গুড়ূচী।—ক্রিমিরোগে গুড়ূচীর কাথ কিঞ্চিৎ মধুসহযোগে পান করিলে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ডাক্তারি মতে যে স্থলে কলম্বা ব্যবহৃত হয়, আয়ুর্ব্বেদ মতে তৎস্থলে গুড়ূচীর ব্যবহার হইয়া থাকে। গুড়ূচী শোণিত শোষক, পিত্ত প্রশমক, বয়ঃসংস্থাপক। শীতজ্বর, শুক্রক্ষয় কৃত দুর্ব্বলতা, মূত্রকৃচ্ছ্রে গুড়ূচী বিশেষ উপকারী।

মেহ বা গণোরিয়ায় গুড়ূচী।—পাষাণ ভেদীর (পাথর কুচির) রস ও গুড়ূচীর রস সমাংশে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে পান করিলে সপূয মেহ বা গণোরিয়া প্রশমিত হয়। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রেও বিশেষ ফলদায়ক।

গুড়ূচী বলকারক, জ্বরনিবারক এবং মূত্র সরলকর, ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

নিম্ব।

নিম্ব বৃক্ষ তিন প্রকার। নিম্ব, মহানিম্ব কৈডর্য্য। মহানিম্বকে ঘোড়ানিম্বও বলিয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে আপাততঃ নিম্বের গুণ বর্ণনা করিব। ত্রিবিধ নিম্বের আকৃতি পার্থক্য রহিয়াছে।

কুষ্ঠে নিম্ব।—কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীর নিম্ব মহৌষধ। নিম্ব তরুতলে বাস, নিম্বপত্রে ব্যজন, নিম্বপত্র ভক্ষণ - কুষ্ঠের ক্ষত স্থানে নিম্ব পত্রের প্রলেপ বিশেষ উপকারী। কুষ্ঠ রোগীর স্নান ও পানীয়জল নিম্ব পত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করিবে। যে কুষ্ঠরোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে, তাহাকে নিম্বপত্র দ্বারা জল উত্তপ্ত করিয়া ক্ষত ধৌত করাইবে। শয়নকালে কাঁচা নিম্ব পত্র শয্যায় বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করাইবে। কুষ্ঠরোগীর বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে নিম্ব বৃক্ষ থাকিলে—উহার শীতল বায়ুতে রোগের উপশম হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগীর পক্ষে নিম্ব তৈল মহোপকারী।

পদ্মিণী কণ্টক রোগে নিম্ব।—ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগ বিশেষ। গাত্রে স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকবৎ খস্‌খসে দাগ দৃষ্ট হয়। ঐ রোগে নিমছাল ১ তোলা, সোণালু পত্র ১ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ এক ছটাক দ্বারা প্রত্যহ ঐ স্থান ধৌত করিবে।

বাতরক্ত রোগে নিম্ব।—নিম্বপত্র ও তিক্তপটোল লতা—পূর্ব্বোক্ত কাথ প্রস্তুতের নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া, কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

সুরামেহ রোগে।—নিম্বছালের কাথ বিশেষ উপকারী।

দাহ জ্বরে নিম্ব।—জ্বরের প্রদাহ হইলে নিম্বছালের কাথ পান করাইবে। নিম্বপত্র দ্বারা ব্যজন ও নিম্বপত্র শয্যা বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করিবে।

কফজ তৃষ্ণায় নিম্ব।—কফপ্রধান জ্বরে তৃষ্ণাধিক্য হইলে নিম্ব ফুলের উষ্ণ কাথ পান করাইবে। ইহাতে বমন হইয়া তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে।

ব্রণক্ষতে নিম্ব।—নিম্বপত্র দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষত স্থান পরিষ্কৃত হয়। নিম্বপত্র গব্য ঘৃতে ভাজিয়া শিলায় পেষন করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে, ঐ মলম যে কোন প্রকারের ক্ষত হউক তাহাতে প্রয়োগ করিলে অত্যল্প কাল মধ্যে ক্ষত পূরণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

বিষনাশনে নিম্ব।—কোন প্রকার স্থাবর বিষাক্রান্ত হইলে নিম্ব ফল পেষণ

করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমনের দ্বারা বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

কেশের অকালপক্কতায় নিম্ব। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক মাত্র দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এক মাস কাল নিম্ব তৈল কেশে মর্দ্দন ও নিম্ব তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা দূর হয়। খালিত্য (টাক) রোগেও নিম্ব তৈল বিশেষ উপকারী।

শীতপিত্ত, বিস্ফোটক, কোঠ, কণ্ডু, ক্ষতরোগে নিম্ব।—শরীরে নানা স্থানে চুলকাইয়া অত্যল্প সময় মধ্যে যে চক্রবৎ লালবর্ণ দাগ ও সে স্থান স্ফীত হইয়া উঠে ও সময়ান্তরে উহার কিছুই থাকে না, —তাহাকে শীতপিত্ত বলে। ঐ রোগে এবং বিস্ফোটকাদি উল্লিখিত রোগ সমূহে শুষ্ক নিম্বপত্রচূর্ণ গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অথবা কাঁচা নিম্ব পত্র ও শুষ্ক আমলকী সমাংশে খলের দ্বারা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে উল্লিখিত ব্যাধি নিরাময় হইয়া থাকে, ইহা পিত্তাধিক্যের পক্ষে মহোপকারী।

কামলা রোগে নিম্ব।—নিমছালের বা নিম্বপত্রের রস ২।৪ ফোঁটা মধু সহযোগে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে কামলা রোগ নিরাময় হয়।

হৃদ্‌রোগে নিম্ব।—কফজ হৃদ্‌রোগে বচ ও নিম্ব ছালের ক্বাথ পান করিলে বমন দ্বারা হৃদ্‌রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

নেত্ররোগে নিম্ব।—নিম্বপত্র ও কিঞ্চিৎ শুঁঠ, (আদা শুষ্ক) সামান্য জলের সহিত পেষণ করিবে, তৎপর উহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণঃ করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চক্ষের উপর ও নিম্ন পাতায় প্রলেপ দিবে, (সতর্ক থাকিতে হইবে যেন চক্ষুর ভিতর ঔষধ প্রবেশ না করে, অসাবধানতাবশতঃ কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলেও কোন ক্ষতির কারণ নাই) দিবসে ২।৩ বার এইরূপ প্রলেপ দিলে চক্ষুর কণ্ডু (চুলকান) স্ফীতি ও বেদনা নিবারিত হয়। কাঁচা নিম্ব পত্রের রস কিঞ্চিৎ কাঁচা হরিদ্রার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে ৩।৪ ফোঁটা প্রদান করিলে, চক্ষুর পিঁচুটী নষ্ট হয়, এবং চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল হয়।

শিশুর জ্বরে নিম্ব।—মধু ও গব্য ঘৃতের সহিত কাঁচা নিম্বপত্র নির্ধূম অগ্নিতে (কাঠকয়লায়) দগ্ধ করিয়া ঐ ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইলে জ্বর নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ক্রিমিরোগে নিম্ব।—ক্রিমিরোগে, প্রত্যহ প্রাতে নিম্বপত্র রস ২।৩ ফোঁটা মধু সহ যোগে সেবন করাইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্তে নিম্ব।—রক্তপিত্ত রোগী নিম্বপত্রের ঝোল সেবন করিবে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, কবিরত্ন।

আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে একখানি পত্র।

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদ সভা'য় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" ও "আয়ুর্ব্বেদে—খণ্ডপ্রলয়"—শীর্ষক যে প্রবন্ধ দুইটী পঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত, প্রথিতনামা লেখক

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রবন্ধ দুইটীর লেখককে যে পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য এইস্থলে উদ্ধৃত হইল। চণ্ডীবাবু আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী না হউন, কিন্তু তিনি যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি কল্পে পত্র খানি লিখিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চণ্ডীবাবুর লিখিত বিষয় এই—"আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় তোমার দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। তুমি একজন আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী হইয়াও আয়ুর্ব্বেদের ত্রুটি বিষয়ে যে ভাবে আলোচনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার উদার মতের সমর্থন না করিয়া থাকা যায়না এবং সাধারণের বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের নিকট তুমি যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র একথা অস্বীকার করা যায়না। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার উদ্দেশ্য প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া প্রচার করা; অবশ্য তাহা পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া নহে, বরং পুরাতনের পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রচলন দ্বারা। কেননা আমাদের পুরাতনই বিদেশীয়দিগের নূতনের ভিত্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পুরাতনের স্মৃতি ব্যতীত অন্য চিহ্ন কিছুই নাই। চিরকাল সেই গৌরব-স্মৃতি বুকে করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিলে জগতের সম্মুখে গৌরব লাভ তো হইবেই না, অধিকন্তু হাস্যাস্পদ হইতে হইবেই! আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের পশ্চাতে সময় সময় ধিক্কারের যে করতালি প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা কি অযৌক্তিক? আমার তো বোধ হয় না।

"কেবল কায়চিকিৎসার জন্যও কায়তত্ত্বজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, ইহাই তো আমার বিশ্বাস। তুমিও সেই কথাই বলিয়াছ, তবে তোমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধ-সমালোচনা কেন হইয়াছে, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে জগত সমক্ষে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকারেই তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল মুখের কথায় লোক ভুলিবেনা, কাজে দেখাইতে হইবে। পূর্ব্বে যে সকল ব্যাধিতে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আজকাল অস্ত্রোপচার দ্বারা সেই সকল ব্যাধি কেন সত্বর ও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইতেছে? এ সকল বিষয় নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কি পুরাতনের বাঁধা বুলি আওড়াইয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং "মড়াকাটা" চিকিৎসকগণের নিন্দা করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে?

"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি মুসলমান রাজাদিগের যত্নে ও কাল মাহাত্ম্যে যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছেই, তদ্ব্যতীত স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যদোষেও ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। যখন দেশে ম্যালেরিয়া—মহামারীরূপে প্রবেশ লাভ করিল এবং নিত্য শত সহস্র লোককে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া, জনপূর্ণ গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতে উদ্যত হইল, তখন কবিরাজ মহাশয়গণ চিকিৎসায় সাফল্য লাভ দূরের কথা, কেবল চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং এরূপ মহামারী দৈবের পীড়ন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য অর্থাৎ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। কিন্তু তখন এই নিদারুণ ব্যাধির সম্মুখে "কুইনাইন" লইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ ডাক্তারগণ দণ্ডায়মান হইলেন এবং এই কালব্যাধির গতিরোধ

করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন। দেশের সাধারণ লোক কবিরাজগণকে ফেলিয়া ডাক্তারগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার বোধ হয়, এই সময় হইতেই দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ দূরে পড়িয়া রহিল; উচ্চস্থান ও সম্মানজনক আসন অধিকার করিল—বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও তদনুবর্ত্তী ডাক্তারগণ। তখন,—বলিতে লজ্জাও করে—দুঃখও হয়—কিন্তু এটা খুব সত্য কথা,—আয়ুর্ব্বেদ বিশারদগণ বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ও সেই শাস্ত্রব্যবসায়ী ডাক্তারগণের এবং ম্যালেরিয়ানাশককুইনাইনের কুৎসা রটনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুইনাইনের ম্যালেরিয়া দমনের অদ্ভুত শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপনারাও কুইনাইনের বটিকা—নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন! ইহাতে তাঁহাদের অর্থাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ফল কি হইল? পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী এদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল, কুইনাইন কবিরাজী ব্যবসায়ের অন্তরায় হইয়া উঠিল। বাস্তবিক প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলা যায় যে, এই সমস্ত হিংসাপরায়ণ স্বার্থ সর্ব্বস্ব কবিরাজকুলের কল্যাণেই হিন্দুর গৌরবের আয়ুর্ব্বেদ,—জগতের আদি চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ—অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে গা' ঢাকা দিল। তাহাকে বাহির করিয়া বিশ্বের বাজারে প্রচার করিবার জন্য কেহ যত্নও করিলেন না।

"তুমি আয়ুর্ব্বেদের ত্রুটি পরিলক্ষিত করিয়া এই সমস্ত কবিরাজগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য লেখনী চালনা করায় উঁহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তোতাপাখীর মত শিক্ষকের বুলির আবৃত্তি করিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিতেছেন, তাঁহারা যত বড় বিজ্ঞ বিচক্ষণই হউন, নিজের শিরে নিজে অস্ত্রাঘাত করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ লোক যখন পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালীর, পাশ্চাত্য চিকিৎসকবৃন্দের নিন্দা করিতে থাকেন, তখন বাস্তবিকই হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে! কেননা যিনি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তিনি সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রচার করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদিগের এই অনধিকার চর্চ্চাই তাঁহাদিগের স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকে।

এখনকারদিনে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার একাঙ্গ লইয়া আন্দোলন করিলে চলিবে কেন? অষ্টাঙ্গেরই আন্দোলন চাই। যদি সক্ষম হও তবে আয়ুর্ব্বেদ লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ ও ব্যবসায়—পরিত্যাগ কর। অষ্টাঙ্গের একাঙ্গ, (তাহারও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে) অধ্যয়ন করিয়া অষ্টাঙ্গের পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্খা কেন? ইহারইনাম "ভাবের ঘরে চুরি!" বিশেষতঃ কায়চিকিৎসা বলিতে গেলেই ত শল্যাদি অন্যান্য অঙ্গ তাহারই অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। শল্য শালক্যাদিতে পারদর্শী না হইলে কিরূপে কায়চিকিৎসায় দক্ষ হওয়া যাইবে? সুতরাং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা না করিলে তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিব কেন?

"যে কুইনাইনের নিন্দায় কবিরাজ মহাশয় গণ চতুর্ম্মুখ, সেই কুইনাইন জিনিসটা কি? উহা কি আয়ুর্ব্বেদবহির্ভূত কোন পদার্থ? আমার তো বোধ হয় না। গুলঞ্চেরপালো, নাটার বীজ যে শ্রেণীর ঔষধ, কুইনাইনও তাহাই, উহা তো বৃক্ষ বিশেষের পালো মাত্র! তবে নামটা

বিদেশী বটে! এই কি তার অপরাধ! অতি মাত্রায় কুইনাইন দ্বারা কুফল ফলিতে পারে বলিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সুফল ফলিবেনা কেন? কবিরাজগণের সেঁকো অতি মাত্রায় কুফল প্রদান করে বলিয়া, তাঁহারা কি উপযুক্ত মাত্রায় তাহার ব্যবহার করা পরিত্যাগ করিয়াছেন? তবে কেবল কুইনাইনকেই এত ঘৃণার চক্ষে দেখা কেন? এ কেবল অজ্ঞের কাছে প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস মাত্র।

"আর একটা সত্য কথা অনেকের অপ্রিয় হইলেও তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; কারণ তুমি আজ প্রকৃতপক্ষে গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া সত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ। আমার বিশ্বাস, আয়ুর্ব্বেদের অবনতির আরও একটা খুব গুরুতর কারণ আছে। পূর্ব্বে বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসকগণ নিজ নিজ বাস ভূমিতে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া রাজা মহারাজা হইতে নিতান্ত দীনহীন ভিক্ষুকেরও চিকিৎসা করিতেন এবং এইরূপ দরিদ্রের উপকার করাতেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিতেন। বড় লোকের জন্য বহু ব্যয় করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হইত, কবিরাজ মহাশয়ের কৃপায় দীনদরিদ্র জনসাধারণে সেই সকল মূল্যবান ঔষধের দ্বারা উপকৃত হইত। তখন তাঁহারা গরীবের জন্য তিন পয়সার ঔষধের মূল্য তিন টাকা ধার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন এবং এরূপ করাকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। গরীবের জন্য তাঁহাদিগের ঔষধ বিতরণের কথা মনে হইলে মনে হয় যে, তখনকার এক এক জন "কবিরাজ বাড়ী"ই ছিল আজকালকার "দাতব্য চিকিৎসালয়!" আধুনিক প্রত্যেক কবিরাজ মহাশয় যদি তাঁহাদিগের পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতির কীর্ত্তিকাহিনী মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমাকে আর এজন্য পৃথক প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে না। কিন্তু এখন কি আর তেমনটি আছে? বিলাস বিহীন ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল কবিরাজ মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে সন্ধ্যা দিতেন এবং প্রতিবাসী দীন দরিদ্রের জীবনদানে অনন্ত পুণ্য অর্জ্জন করিতেন, এখন তাঁহাদেরই বংশধরগণ মুখে পাশ্চাত্যচিকিৎসাপ্রণালীর অখ্যাতি রটনায় অভ্যস্ত হইয়া ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া, বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া, জন্মভূমি পল্লীর মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানারূপে কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার বাল্য সহচরের পরিবারবর্গ ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইতেছে,—নিত্য নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—যমের সহোদর পাড়াগেঁয়ে হাতুড়ে-ডাক্তার কবিরাজের উপর নির্ভর করিয়া অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসী তিল তিল করিয়া মৃত্যু-পথে অগ্রসর হইতেছে, আর তিনি নগরমাঝে সুদীর্ঘ সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া,—মোটর জুড়ি হাঁকাইয়া—প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে নিজেকে কৃতার্থমনা অনুভব করিতেছেন! তাঁহারই দীন প্রতিবাসী যে অসময়ে এক বিন্দু ঔষধের অভাবে শমন সদনে গমণ করিতেছে, ইহা তাঁহার চিন্তারও অবসর নাই, কিন্তু তিনি ব্যবসায়ের খাতিরে—অর্থের উদ্দেশ্য আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি জন্য খেয়াল দেখিতেছেন! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—আধুনিক কবিরাজগণ অর্থের লোভে পল্লী ছাড়িয়াছেন, দেশ ভুলিয়াছেন, আত্মীয় স্বজনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বিলাসে ডুবিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের

পরিত্যক্ত পল্লীবাসীর রোগের সময় ঔষধ দিয়া চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, দেশরক্ষায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা মড়াকাটা ডাক্তার বলিয়া নিন্দিত হইতেছেন! বিজ্ঞতার বাহাদুরী লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। দেশেরলোক আজকাল কবিরাজমহাশয়দের 'সর্ব্বজ্বরহরলোহ যে কি পদার্থ তাহা জানেনা, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এক পয়সার চারি গ্রেন কুইনাইনের ট্যাবলেট খুব চিনিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণ কুইনাইনের যতই নিন্দা করুন, লোকে তাঁহাদের কথা শুনিবে কেন? তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, এদেশেরই চিরপ্রবাদ "কেবল কথায় চিঁড়ে ভেজে না।"

"দুঃখের সহিত আরও একটা কথা বলিতে হয়,—আজকালকার কবিরাজ মহাশয়গণ পল্লীগ্রামের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার পাচন প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য বৃক্ষাদির পুঁথিগত পরিচয় তাঁহারা অবগত থাকিলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গাছগাছড়ার সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। "অনন্তমূলের" সহিত "সূক্ষ্মফলা"'র পার্থক্য নির্ণয় করা বোধ হয় অনেকেরই সাধ্যাতীত।

"আমার কথাগুলা অপ্রিয়; কিন্তু সত্য। হয় তো কিছু রূঢ়ও হইয়া থাকিবে। কি করিব ভাই, তোমার প্রকৃত কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপেই এই অপ্রিয় কথার অবতারণা করিতে হইল।"

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্ব্বনেশে ক্রিমি বা হুকপোকার প্রতিকার।

—:*:—

(বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশের বক্তৃতা)

সর্ব্বনেশে ক্রিমি বা হুকপোকার প্রতিকার কল্পে গত ২৮শে নভেম্বর সায়ংকালে কলিকাতা লাটপ্রাসাদে সেনেটারি বোর্ডের এক বিশেষ সভা বসিয়াছিল। সভার উদ্বোধনে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

হুকপোকায় রোগী এদেশে বিস্তর। সাধারণে উহার প্রকৃতি অবগত নহে, এমন কি, অনেকে এই রোগোৎপাদক কীটের নামই অবগত নহে, সেইজন্য এই বিষয়টি সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

হুকপোকা একরূপ পরগাছা, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় আধ ইঞ্চি। মানুষের অন্ত্রের মধ্যে উহাদের বাস। অজীর্ণ এবং রক্তহীনতা—এই দুইটি রোগ ইহারা উৎপাদন করিয়া থাকে। এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে লোকের কাজকর্ম্মে উৎসাহ থাকেনা এবং অলস হইতে হয়।

মানুষের অন্ত্রে অবস্থান কালে হুকপোকা বহুসংখ্যক ডিম্ব প্রসব করে, ঐ ডিম্ব সকল মলের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং উত্তাপ ও আর্দ্রতা সহযোগে উহারা অতি

শীঘ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটরূপে পরিণত হয়। এই রূপ হইলেই তাহারা মানুষের পায়ের তলার চামড়া ভেদ করিয়া মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহিয়া—ক্রমে অন্ত্রমধ্যে উপস্থিত হয়। এই সময় তাহারা ডিম পাড়িতে থাকে, সেই ডিম মলের সহিত বাহির হইয়া আবার পরিবর্দ্ধিত হয়। হুকপোকার বংশবৃদ্ধি এই ভাবেই চলিতেছে। ফলে হুকপোকার জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্ম মানব জাতির মতই চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জ্ঞানগভীরগবেষণার ফলে পুরাকালীন মনীষীগণ এই চক্র হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির কামনায় কত উপায়ই না উদ্ভাবন করিয়াছিলেন! গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ মহানুভবগণ কঠোর সংসার চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্য যেরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন, হুকপোকার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য ইদানিন্তন কালের চিকিৎসকদিগকে সেইরূপ চেষ্টাশীল হইতে হইবে। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত ২টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১) যাহাদের শরীরে হুকপোকা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের শরীর হইতে উহা বিতাড়িত করিতে হইবে। (২) কীটাকারে যাহাতে উহারা মানব দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে না পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

দু'একটা ঔষধ ব্যবহার করিলেই মানব দেহ হইতে হুকপোকা সহজে বাহির হইতে পারে। উহা দূরীকরণের প্রধান ঔষধ—থাইমল। চেনোপোডিয়াম' নামে আর একটা ঔষধ বাহির হইতেছে—ইহা বাঙ্গালাদেশে সহজে জন্মান যাইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার পূর্ব্বে জানা উচিত—যাহার চিকিৎসা করা হইতেছে, সেই ব্যক্তি প্রকৃতই সেই রোগে আক্রান্ত কিনা? এজন্য আনুবীক্ষণিক পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষিত ডাক্তারের আবশ্যক।

রক্তহীনতা, অজীর্ণতা এবং আলস্য—হুকপোকায় আক্রান্ত ব্যক্তির যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর এখন সাধারণ লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য হুকপোকা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিগণ সত্য সত্যই যে উহা কর্ত্তৃক আক্রান্ত, একথাও তাহাদিগের মনে ধারণা করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালী পূর্ব্বে কখনও হুকপোকার নাম শুনে নাই, কাজেই সুস্থ শরীরে এ সকল লক্ষণ দেখা দেয় বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে মলত্যাগের ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে পল্লীভূমির আশপাশে হুকপোকা কীটাকারে বিচরণ করে। পল্লীবাসীরাও নগ্নপদে সাধারণতঃ ঐ সকল স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহার ফলে কখন কখন পায়ের তলা চুলকাইলে লোকে চলিত কথায় কথায় 'হাজা' লাগিয়াছে বলে। ইহার জন্য প্রতীকার করা আবশ্যক। ইহার প্রতীকার না করিলে এ রোগ ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিবে।

ইহার প্রতিকারের জন্য জনসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা দরকার। কিন্তু ইহার ফল শীঘ্র না হইয়া একটু ধীরে ফলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। জেলের কয়েদি এবং চা বাগানের কুলীদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া আমরা অমূল্য ফল পাইয়াছি। কয়লার খনির ও শ্রমজীবি কলকারখানায় মজুর প্রভৃতির উপরও ইহার চিকিৎসার প্রয়োগে সুফল ফলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

সমালোচনা।

ক্ষয়রোগ তত্ত্ব ও তাহার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। ডাক্তার শ্রীশরৎচন্দ্র বসু সংগৃহীত। মূল্য ॥৹ আনা। ইহার ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া গেল,—গ্রন্থকারের পত্নী ক্ষয়রোগগ্রস্তা হইয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাঁহার আরোগের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করেন, ফলে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রাণময় করিয়া ক্ষয়রোগের অনুসরণের চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল, পীড়িতা পত্নীকে মৃত্যুমুখ হইতে তিনি ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ পুস্তক সেই উপলক্ষ্যে লিখিত। ক্ষয়রোগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া সর্ব্বশেষে গ্রন্থকার নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথির ঔষধ তত্ত্বে আমরা অভিজ্ঞ নই, সেইজন্য সে সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিনা, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের ইতিহাস বলিতে গিয়া ক্ষয়রোগের উৎপত্তির কারণ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কিরূপ ভাবে সারধানতা অবলম্বন করা উচিত—এ সকল কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সত্য সত্যই দেশের উপকার হইবে। রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে গ্রন্থকার যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভেজাল খাদ্য ভক্ষণ, দারিদ্র্য, চরিত্রহীনতা ও যথেচ্ছাচারে যে বাঙ্গালী অধিক ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতেছে—ইহা নির্ভাঁজ সত্য কথা। বিপরীত ধাতু ও প্রকৃতিগত বিবাহের ফলেও বাঙ্গালী ক্ষয়গ্রস্ত সন্তান সন্ততি প্রসব করিতেছে ইহাও সুনিশ্চিত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যাঃ।—একথা যখন হিন্দু জানিত, হিন্দুর বিবাহে তখন কোষ্ঠী বিচারে গণ, বর্ণ, রাশি প্রভৃতির মিলন করিয়া বিবাহ দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার ফলে পতি-পত্নীর মিলনে সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ হইত। এখন সে ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, পাশের বিনিময়ে টাকা হইলেই এখন আর কোনো বিচার করিবার আবশ্যক হয় না। ফলে স্ত্রী-পুরুষের ধাতু ও প্রকৃতির বৈষম্যেও দেশে ক্ষয়-রোগীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ক্ষয়গ্রস্ত ব্যক্তির সাবধানতা সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ মানা কর্ত্তব্য—গ্রন্থকার তাহা আয়ুর্ব্বেদ হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলে পুস্তক খানি বিশেষ উপাদেয়ই হইয়াছে। ভূমিকার লিপিচাতুর্য্যে পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষয় প্রবণ বাঙ্গালা দেশে এ পুস্তকের সমাদর হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকেরাও এ পুস্তক পড়িয়া অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ধুমপান নিবারণ আইন।—সংপ্রতি বঙ্গীয় বংবস্থাপক সভায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের জন্য ধুমপান নিবারণ আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। ১৬ বৎসরের কম বয়সের কোনো বালক ধুমপান করিতেছে দেখিলেই এই আইনের বলে পুলিশ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক ও জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীরা বালকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন। এই অপরাধে অপরাধী বালকদিগকে প্রথমবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে এবং ৫৲ ১০৲ টাকা, উর্দ্ধ সংখ্যা ২৫৲ অর্থদণ্ড হইতে পারে। আমরা এ আইন পাশে সুখী হইয়াছি।

মেডিকেল কন্‌ফারেন্সে আয়ুর্ব্বেদ। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, দিল্লীতে যে মেডিকেল কনফারেন্স বসিয়াছিল, তাহাতে কথা হইয়াছে "ভারতের কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশী চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিন।" সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণেও একথার সমর্থন করিয়া বলেন—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিয়া ফেলা উচিত। আমাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দেশী চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলেই সহজে ইহা সাধিত হইতে পারে। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োগ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে এদেশী ঔষধ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য এক ফার্ম্মাকোপিয়াসমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সেই সমিতি ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার মত একখানি ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া সঙ্কলন করুন।"

ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ে দণ্ড।—ভেজাল ঘৃত বিক্রয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৩০।১১।১৮ তারিখে দণ্ডিত হইয়াছে —(১) চম্পরান।—২০ এবং ২১নং বড়তলা ষ্ট্রীট, জরিমানা—১৪০৲ টাকা (২) রামলাল, ২৯নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট, জরিমানা ১২৫৲ টাকা। (৩) শিউপ্রসাদ রাম ও তাহার দোকানের চাকর সখিচাঁদরাম, জরিমানা—যথাক্রমে ৩০০৲ ও ১০০৲ টাকা। (৪) পোপাত-লাল ৮১ নং মল্লিক ষ্ট্রীট, জরিমানা ২০০৲ টাকা।

বিজ্ঞ চিকিৎসক।—ডাকার কার্ত্তিক চন্দ্র দাস জনৈক বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক। বহুদিন হইতে ইনি আমাদের পরিচিত। অনেকবার আমরা ইঁহার চিকিৎ-সায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি চিকিৎসাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার সাধারণের অনুরোধে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইনি হোমিওপ্যাথ হইলেও আয়ুর্ব্বেদের পক্ষপাতী। ইনি আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপাথির সম্মিলনে মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা পুরাতন জটিল রোগসমূহ আরোগ্য করিতেছেন।

৩য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩২৫

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



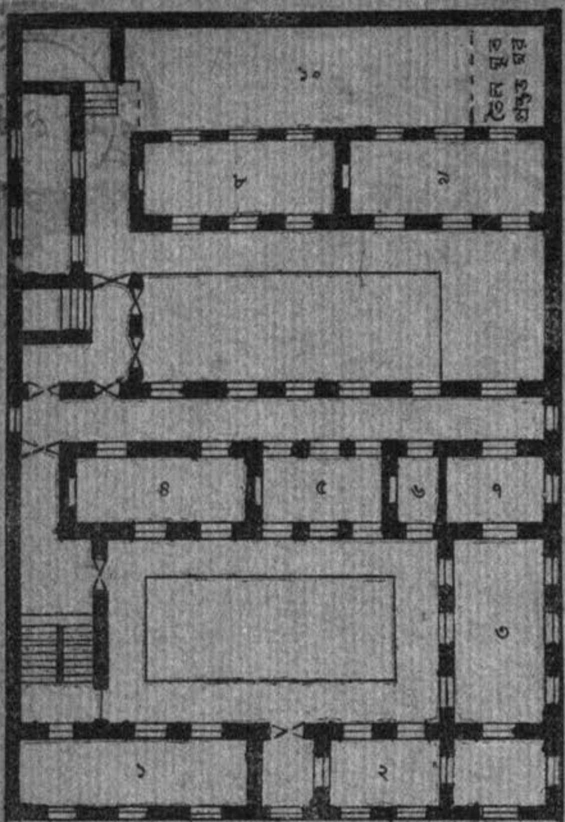
সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৵৹
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

“অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়”

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

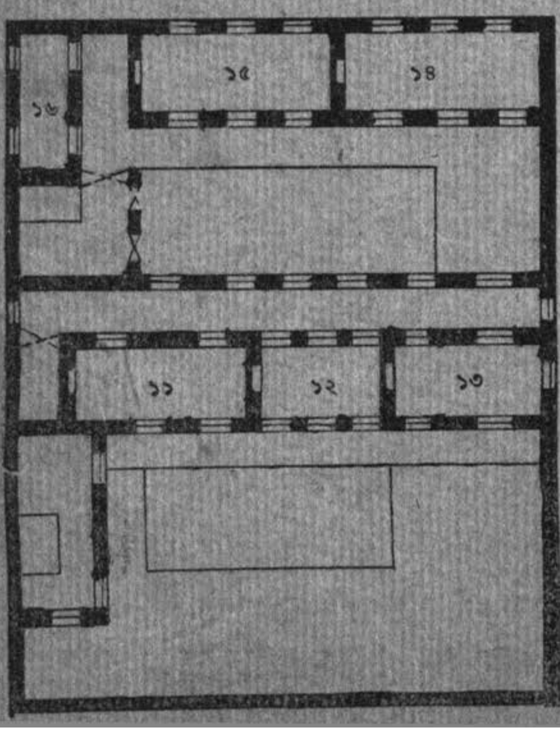
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

গ্রাহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

"আয়ুর্ব্বেদে"র তৃতীয় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা চলিতেছে। যাঁহাদিগের নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহার মূল্য পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদের সকলেরই নামে আমরা ভিঃ পিঃ করিতেছি। সকলেই ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপনাপন মূল্য প্রদান করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

গ্রাহকবর্গই 'পত্রিকা'র জীবন। আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এ কথা স্মরণ রাখেন—ইহাই আমাদের সকরুণ প্রার্থনা। কার্য্যাধ্যক্ষ।

ফাল্গুনের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদে"র নিয়মাবলী।

"আয়ুর্ব্বেদের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৩৵০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয়। কেহ কোনো মাসের 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুবা পুনরায় মূল্য দিয়া সেই সংখ্যা লইতে হইবে।

আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, এজন্য যখনই ইহার গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ষের আশ্বিন হইতে ইহা লইতে হইবে।

কোনো বিষয়ের জন্য পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা সে পত্রের কোনো কার্য্য হয় না।

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।—এক বৎসরের চুক্তিতে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪॥০ সিকি পৃষ্ঠা ২৷০ এবং অষ্টাংশ পৃষ্ঠা ১।০ টাকা। কভারের বিজ্ঞাপনে প্রতি পেজ ১০৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বর্ত্তমান অবস্থা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির উপায়।

(নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম বৈদ্য সম্মেলনে দিল্লী নগরীতে হিন্দী ভাষায় পঠিত।) *

——:০:——

বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া থাকিলেও তাহার দাহিকাশক্তি নষ্ট হয় না। সুগন্ধি পুষ্পস্তবক ছিন্ন ভিন্ন দলিত এবং পর্য্যুসিত হইয়া কক্ষ প্রান্তের একতম দেশে রক্ষিত হইলেও তাহার সুরভিসম্ভার কক্ষমধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগণের ফুল্লতা সম্পাদনে সমর্থ হয়। বহুল আয়াস লভ্য রত্নশ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ নিশীথকালের ঘোর তমসাচ্ছন্ন স্থানে রক্ষিত হইলেও দিব্য জ্যোতিঃ বিকীরণ পূর্ব্বক সে স্থানকে আলোকময় করিয়া তুলে।

এখনকার দিনে আমাদের সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবস্থাও সেইরূপ। শুভক্ষণে জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ ইহার আবিষ্কার করিয়া দক্ষ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ইন্দ্র এবং ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণের ভিতর ইহার শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থায় পুণ্যভূমি ভারতজননীকে এক অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্ববাসী সে সম্পদ দর্শনে শুধু যে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে ;—সে সম্পদের কৃপা-প্রসাদ পাইবার জন্যও সে সময় সমগ্র বিশ্ব উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আরবীয়গণ, গ্রীসবাসীগণ এবং গ্রীসদেশ হইতে সমগ্র বিশ্ববাসী এইরূপে ইহার কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ লাভ করিয়া একদা যে কৃতার্থমনা হইয়াছিল,—তাহারই ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজি সমুন্নত হইয়া প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে

* হিন্দী অনুবাদের সময় পঠিত প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে বলিয়া মূল বাঙ্গালা হইতে কতক কতক স্থান বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

শারীর তত্ত্বের চরমোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইতেছে। আর আয়ুর্ব্বেদ।—ব্রহ্মার কমণ্ডলু নিঃসৃত দিবৌষধি সকলের সমন্বয়ে সুসংবদ্ধ—বেদ-বেদাঙ্গ-তন্ত্র-উপনিষদের সার সঙ্কলন—সমগ্র বিশ্বচিকিৎসার মূল গ্রন্থ—পুণ্য—পবিত্র জীব চিকিৎসার পরিসমাপ্ত গ্রন্থ—আমাদের আয়ুর্ব্বেদ! রাষ্ট্রবিপ্লবে—রুচিবিপর্য্যয়ে—শিক্ষার ব্যতিক্রমে—নানাকারণে ছিন্ন ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় —দলিত এবং পর্য্যুসিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় ও নিশীথকালের তমসাচ্ছন্ন কক্ষে পদ্মরাগ মণির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

সত্য কথা—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যদি সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত না হইত—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গ বিষয়ের চিন্তা করিয়া যদি ইহা আবিষ্কৃত না হইত—ইহার প্রচারিত ঔষধ সকলের কার্য্যকারী শক্তি যদি মন্ত্রশক্তির মত ফলপ্রদ না হইত—তাহা হইলে এ চিকিৎসা —জীবকুশলেচ্ছু আর্য্যঋষিগণের জ্ঞানগভীর গবেষণা সম্ভূত সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে কোন্‌কালে কোন্ অতীত গগনের বিস্মৃতির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলয় প্রাপ্ত হইত, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। যাহা খাঁটি—যাহা সত্য—যাহা অভ্রান্ত —যাহা সংশয় রহিত—প্রকৃতই তুমুল সংগ্রামের তাণ্ডব নৃত্যেও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইন্দুনিভ কাঞ্চন পাবক শিথায় বর্ণহীন হইলেও তাহা খাঁটি বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া থাকে। প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনে কিয়ৎকালের জন্য হিমাংশুকিরণ লোক লোচনের অন্তরালে অবস্থিত থাকিলেও মেঘ মুক্ত নির্ম্মল আকাশে আবার তাহার মনোমদ অংশুরাশি সন্দর্শনে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হইয়া থাকে। রোগে ভোগ আছে,—সে ভোগে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী ষোড়শী সুন্দরীর স্বভাবসুলভ চমৎকারিণী দৃশ্যশোভা নষ্ট হইয়া অস্থি কঙ্কাল সর্ব্বস্ব হইলেও সে রোগ ভোগের অন্তে আবার তাহার সম্পদ সম্ভার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সর্ব্বস্থান জুড়িয়া পূর্ব্বভাব আনিয়া থাকে। বিশ্বজগতে বিশ্ব নিয়ন্তার নিয়মই এইরূপ। ইহার প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

তাই বলিতেছিলাম,—আমাদের আয়ুর্ব্বেদ —হিন্দু রাজত্বের অবসানে—মোগল-পাঠানের সৌভাগ্য লক্ষ্মী ভারত গগনে সমুদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসা রাজ সাহায্য লাভে পরিপুষ্ট হইয়া তাহার শক্তি সামর্থ্য প্রচার করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাওয়ায়,—সমগ্র বিশ্ব সংসার বিজয়ী - জগতের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ তাৎকালিক ভারত সম্রাটের প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট একেবারে অনাদৃত না হউক, ক্রমশঃ উপেক্ষিত হইতে লাগিল। সেই উপেক্ষাই হইল—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সর্ব্বনাশের সূচনা। ক্রমে মোগলের বিজয় লক্ষ্মী যখন সুসভ্য ইংরাজ রাজের করতলগত হইয়া ভারতবাসীর সংসার পরিচালনার অশেষ সুখসমৃদ্ধি তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিল,—সেই সময় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ—ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসাও লুপ্ত প্রায় হইল এবং অ্যালোপাথিক চিকিৎসার প্রচার হওয়ায় ভারতবাসীর রোগ চিকিৎসার এক অভিনব ঐন্দ্রজালিক দ্বার উন্মুক্ত হইয়া উঠিল। সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অভ্যন্তর প্রদেশে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি নিহিত আছে, ভারতবাসী তাহা আর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করি-

বার চেষ্টা করিল না,—এখনকারদিনের পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত, মার্জ্জিতবুদ্ধি সুসভ্য সন্তান যেরূপ গলিতদন্ত—পলিতকেশ বর্ষীয়ান—বর্ষীয়সী-জনকজ-ননার পরিচর্য্যায় কর্ত্তব্যপালন অপেক্ষা হাবভাবশালিনী নবোঢ়া পত্নীর প্রীত্যুৎপাদনে আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিকৃত বুদ্ধি ভারত সন্তানও সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদের অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন পাচন-মুষ্টিযোগ, চূর্ণ-বটিকা মোদক-অবলেহ, তৈল ঘৃত—সকলই বিসর্জ্জন দিয়া পিল্-মিক্স্চার, লোসন-অয়েন্টমেন্ট, একসট্রাকট-লিকুইয়েডের দৃশ্যশোভা ও সহজ সুলভ ব্যবহার-প্রণালী নিরীক্ষণে বিমূঢ়—বিমুগ্ধ হইয়া তন্ময় হইয়া উঠিল।

ঠিক এমনই সময়ে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব লীলায় বঙ্গ জননী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে—যে সময় অ্যালোপাথিক চিকিৎসা দেশের মধ্যে অল্পে অল্পে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইতেছে—ঠিক সেই সময়ে বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইল। কিন্তু তখনও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পাচন-মুষ্টিযোগ বা চূর্ণ-বটিকাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রোগ নিবারণের জন্য অ্যালোপাথিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হইবার প্রবৃত্তি দেশের সকল লোকের জাগিয়া উঠে নাই। ম্যালেরিয়ার নাম নূতন হইলেও ইহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিষম জ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—সুতরাং বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের ম্যালেরিয়া-নিবারণে যাঁহাদের মনে তখনও অ্যালোপাথিক চিকিৎসার অনুরাগ-বাসনা জাগিয়া উঠে নাই, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধে ইহার ২০ বৎসর পরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে ইহা প্রকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যখন গ্রামখানি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল,—মহম্মদপুরের পঞ্চ সহস্র অধিবাসী যখন ঐ দারুণ ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণে কালকবলিত হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপের কথা সমগ্র দেশবাসীকে উপলব্ধি করাইয়া দিল, তাহার পর মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা—এক কথায় বাঙ্গালার সকল স্থানেই যখন এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি কালানল ছড়াইয়া পড়িল, তখনই সত্য সত্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা—কুইনাইনের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে সমগ্র বাঙ্গালায়—ক্রমে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যতগুলি কারণে অবনতি ঘটিয়াছে, আমাদের মনে হয়—বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া তাহার একটি কারণ। এই ম্যালেরিয়া না হইলে আমাদের দেশে কুইনাইনের মহিমা বড় একটা প্রচারিত হইত না। কুইনাইন অপেক্ষা 'নাটা'য় বেশী ফল হয় কিনা, হরিতালঘটিত ঔষধ প্রয়োগে ম্যালেরিয়াবিষ নষ্ট হয় কি না, কুইনাইনের সহিত প্রতিযোগিতায় আয়ুর্ব্বেদীয় কোনো ঔষধ দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ কিনা—সে সব বিষয়ের আলোচনা আমি এক্ষেত্রে করিতেছিনা,—আমি আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আলোচনায় যতটুকু দরকার—তাহাই বলিয়া যাইতেছি মাত্র।

যাক্ তা'রপর। তা'র পর আয়ুর্ব্বেদীর চিকিৎসার অবনতি ঘটিল কি কারণে সে কথাটা এইবার একটু বিশদ করিয়া বলিব। মোগল-পাঠানের অভ্যুদয়ে—যৎকালে ইউ

নানির প্রচলন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হইল, —সেই সময় পুরুষপরম্পরায়—আয়ুর্ব্বেদের সেবা ভিন্ন যাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না, তাঁহারাও অবস্থা বুঝিয়া কর্ম্মান্তরে মনোভিনিবেশ করিলেন। ইংরাজের অভ্যুদয়ে সে মনোভিনিবেশটা আর একটু বেশী করিয়া হইল। তাহার ফল এইরূপ ফলিল যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা ভিন্ন যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয় না,—পক্ষান্তরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শল্য-শালাক্য প্রভৃতি তন্ত্র সকলের শিক্ষালাভ তো দূরের কথা,—কায়চিকিৎসারও সকল তথ্যের শিক্ষা না করিয়া, নিতান্ত উদরান্নের—সংস্থানের জন্য অনেকে এই ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া, শুধু অর্থোপার্জ্জনের পথই সুপরিষ্কৃত করিতে সচেষ্ট হইলেন। রাজ আইনে আমাদের শল্য চিকিৎসার এই সময় এক ভীষণ অন্তরায় ঘটিল বটে, কিন্তু যদি তখন আমাদের সনাতন শল্য চিকিৎসার পবিত্র সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদের মনে প্রগাঢ় বাসনা জাগিয়া উঠিত,—নরসুন্দরপুঙ্গবের হস্তে অস্ত্র চিকিৎসার ভার অর্পণ পূর্ব্বক যদি আমরা নিশ্চিন্ত না হইতাম, ভারতে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট শস্ত্রবিশারদ চিকিৎসকদিগের কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে যদি আমরা চমৎকৃত হইয়া, শুধু তাঁহাদের পারদর্শীতার প্রশংসা না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় রাজ আইনে ভারতবাসীর শস্ত্র চিকিৎসার যে একটা বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছিল, সকলের মিলিত চেষ্টার ফলে সেই অন্তরায়ের অন্তরায় সংঘটন ভারতবাসীর নিকট বড় কঠিন হইত না,—অস্ত্র চিকিৎসার অভাবে আমাদের আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গহানি হইতেছে—এ কথা যদি আমরা প্রাণ খুলিয়া সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপন করিতাম, মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত যন্ত্র ও উপযন্ত্রের বিবরণ, ক্রিয়া ও প্রতিকৃতির প্রকটন করিয়া, তদ্বিরচিত তাবৎ চিকিৎসা প্রণালী যদি আমরা তখন ন্যায়নিষ্ঠ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন পূর্ব্বক তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতাম, এক কথায় অস্ত্র চিকিৎসাই যে আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা—এ কথা যদি আমরা ভারতীয় তাবৎ বৈদ্য সম্মেলনে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, ইংরাজের তুলাদণ্ডে কথনই আমাদিগকে অস্ত্রহীন হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইত না। আমরা তখন সে চেষ্টা করি নাই।

ধর্ম্মার্থৌ কীর্ত্তিমতার্থ্যং সতাংগ্রহণমুত্তমম্
প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্ম্মণা।

এ কথা তখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

"তথা বিধাহি কেবলে শরীর জ্ঞানে শরীরাভিনিবৃত্তি জ্ঞানে প্রকৃতিবিকারজ্ঞানে চ নিঃসংশয়াঃ সুখসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য যাপ্য প্রত্যাখ্যেয়াণাঞ্চ রোগাণাং সমুত্থান পূর্ব্বরূপ লিঙ্গ বেদনোপশয় বিশেষ বিজ্ঞানে ব্যাপগত সন্দেহাঃ" প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ তখন আর আমাদের ধারণায় আসিতে পারে না।

"কপিলা কোটীদানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম ফলং তৎ কোটীগুণিতমেকাতুরা চিকিৎসয়া।

একথাও তখন বৈদ্য ভুলিয়াছে।

ফলে তখন দেশের দুর্দ্দিনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—শল্য চিকিৎসা রক্ষা করিবার লোক আর কেহই রহিল না। তা' ছাড়া বৈদ্যচিকিৎসকগণই শারীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকদিগকে 'মড়াকাটা চিকিৎসক' বলিয়া

ঘৃণা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মধুসূদন গুপ্ত যখন প্রথম মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজজাতি তোপের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার সম্মান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শবব্যবচ্ছেদের ফলে সমাজ তাঁহাকে পতিত করিতেও চেষ্টার ক্রটী করে নাই। ভারতীয় সমাজের তখন তো এইরূপ অবস্থা!

ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির একটি প্রধান কারণ অস্ত্র চিকিৎসার অঙ্গহানি। Practical জ্ঞান অর্জ্জনে সে শস্ত্র চিকিৎসা-শিক্ষার প্রবৃত্তি তো কাহারও নাই-ই, সুশ্রুত পাঠেও বিষয়গুলি বুঝিবার প্রবৃত্তি বৈদ্যের মধ্যে লোপ পাইয়াছে। যে শরীর লইয়া আমরা চিকিৎসার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই শারীরযন্ত্রের প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করা কর্ত্তব্য নহে কি? আমরা বড় বড় গ্রন্থ পাঠের জন্য প্রবৃত্তিপরায়ণ হইতেছি, কিন্তু আমাদের বর্ণপরিচয়েই জ্ঞান জন্মে নাই! অবস্থাটা কিরূপ ভাবুন দেখি! আমরা এ স্থলে বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু সেই বায়ু-পিত্ত-কফে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তো শারীর স্থানের শিক্ষালাভ সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ফলে সে শিক্ষার অভাবেই আমাদের আর্য্য চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে—ইহা নির্ভেজাল সত্য কথা, এ কথার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ধাত্রী বিদ্যাতেও আমাদিগকে পারদর্শী হইতে হইবে। এক কথায় শল্য, শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ তন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র—আয়ুর্ব্বেদের সকল অঙ্গ গুলিই আমাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণে ভারতের সকল স্থানেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। দ্বেষ হিংসা তুলিয়া এক মনে এক প্রাণে সেই সকল বিদ্যাপীঠের সাধনায় সকলকে প্রাণপণ করিতে হইবে, কায়চিকিৎসার যে সকল গলদ—যথা 'মকরধ্বজের' পরিবর্ত্তে 'রস সিন্দূরের' প্রচলন, সস্তার প্রলোভন দেখাইয়া বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশের পরিবর্ত্তে আমলকীর পিণ্ড প্রদান, সহস্রপুটিত লৌহ অভ্রের পরিবর্ত্তে এলামাটির গুঁড়া মিশ্রিত লৌহ অভ্র বাজার হইতে কিনিয়া ঔষধে ব্যবহার—এ সকল বৈদ্য চিকিৎসার ভিতর হইতে একেবারে পরিহার করিতে হইবে। আমরা যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারি, তবেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি সম্ভবপর হইবে, নতুবা ইহার অধঃপতন আরও যে অবশ্যম্ভাবী, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত রত্নের আধার। বেদব্যাস মহাভারত-প্রসঙ্গে সেরূপ বলিয়াছেন,—যাহা মহাভারতে নাই, তাহা পৃথিবীর কোনো ইতিহাসেই নাই, আমরাও সেইরূপ দম্ভ করিয়া বলিতে পারি,—যাহা আয়ুর্ব্বেদে নাই, তাহা পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা পুস্তকেই দৃষ্টিগোচর হইবেনা। তুমি আমি এ কথা বুঝিতেছি না, কিন্তু অ্যালোপাথিক চিকিৎসক সমাজ এ কথা বিলক্ষণই বুঝিয়া থাকেন। তোমাদের রত্নাবলী হইতে মকরধ্বজ, মৃগনাভি, অশোক, গুলঞ্চ, কালমেঘ, অশ্বগন্ধা তাই তাঁহারা বাছিয়া লইয়া আদর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এই দিল্লীতেই গত ডিসেম্বর মাসে যে মেডিকেল কনফারেন্স হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সভা-

পতি ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন—"দেশীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসা প্রণালীর অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ভারতের মেডিকেল কলেজ গুলিতে আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপক নিয়োগের চেষ্টা করা আবশ্যক এবং ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার মত ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক।"

আসল কথা, তোমাদের মহামহিম মহিমান্বিত বিশাল আয়ুর্ব্বেদ সমগ্র চিকিৎসার মূল ভিত্তি সে তো পুরাতন কথা,—উপস্থিত অন্য চিকিৎসাবলম্বীগণ তোমাদের রত্নরাজি যে নূতনভাবে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিতেছেন, ইহাতে তোমাদের গৌরব বাড়িবে কি কমিবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। তোমাদের অস্ত্র চিকিৎসা তো এমনই করিয়াই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে! শুধু বিলয় প্রাপ্ত নহে—উহার অবস্থা এক্ষণে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণ যে অস্ত্রবিশারদ ছিলেন, এ কথা তোমরাই এখন আর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ। ডাক্তারি চিকিৎসায় তোমাদের অন্যান্য ঔষধাদি যদি গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উহার অবস্থাও যে অস্ত্র চিকিৎসার মত দাঁড়াইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তোমরা যদি নিজেরা আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত চর্চ্চা পরিহার না কর, শল্য-শালাক্য প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের শিক্ষায় সত্য সত্য তোমরা যদি সুপণ্ডিত হইতে পার, প্রত্যেক দ্রব্য সন্দর্শন মাত্র যদি তাহার নাম ও গুণব্যাখ্যায় তোমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে না হয়, তাহা হইলে তোমাদের রত্ন অন্য চিকিৎসকগণ যতই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন,—তোমরাই যে তাহার প্রকৃত অধিকারী—সে পরিচয় আর জগতে কাহারও নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। মাইকেল 'মেঘনাদ বধে' নূতন ছন্দো বিন্যাস বাঙ্গালায় আবিষ্কার করিলেও উহা যে ইংরাজীর ছাঁচে ঢালা—তাহার জন্য আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়না। তোমরা তোমাদের নিজের দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলে, অন্যে তোমাদের অনুকরণ করিলেও মাইকেলের 'মেঘনাদবধের' অবস্থা যে প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

তোমরা নিজের ঘরের দিকে তাকাইয়া নিজের জিনিস রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কর, ভারতের নানাস্থানে বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি করিয়া চরক সুশ্রুতের যুগ ফিরাইয়া আনিবার সংকল্পে কায় চিকিৎসার মত শল্য চিকিৎসার পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হও, ডাক্তারেরা যেমন তোমাদের ঔষধ গ্রহণে তাঁহাদের চিকিৎসার অঙ্গ পুষ্ট করিবার জন্য উদগ্রীব—তোমরাও সেইরূপ তোমাদের লুপ্তপ্রায় বিষয়গুলি তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক তোমাদের পূর্ব্ব চিকিৎসার গৌরব ফিরাইয়া আনিয়া, সেই ঋষিকল্প আর্য্য চিকিৎসার যুগের পুনঃ প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হও।—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, ইহা ভিন্ন আর আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

শেষ কথা—এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও বৈদ্য সন্তান জাগরিত হও। চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া চাহিয়া দেখ—নিখিল বেদের সারাংশ সঙ্কলনে তোমাদের যে আয়ুর্ব্বেদ রচিত, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ সম্পদলাভের একমাত্র উপায় যে আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছে, শুধু চিকিৎসার কথা নহে—দর্শন এবং বিজ্ঞানের পূর্ণপ্রতিভা যে আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অক্ষরে প্রকটিত—

তোমাদের শিক্ষার অভাবে তাহা আজি ছন্ন ছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমাদের অযত্ন দেখিয়া—তোমাদের বিবেকবুদ্ধির অভাব বুঝিয়া—এক কথায় তোমাদিগকে অসার ও অকর্ম্মণ্য উপলব্ধি করিয়া—তোমাদের অমূল্য রত্ন অন্যে লুণ্ঠন করিবার জন্য চেষ্টাশীল। এ সময় আর তোমাদের অপদার্থের মত নিশ্চিন্ত থাকা কোনোক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। মিসর দেশের 'মামি'র অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঔষধবিশেষ রক্ষিত মৃতদেহের কথা শুনিয়াছ কি? আয়ুর্ব্বেদের উৎকৃষ্ট ভেষজ গুলি বিজাতীয় চিকিৎসকের করতলগত হইলে আমাদিগকেও যে ক্রমে মিসরবাসীর অবস্থায় পড়িতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাই বলি, বৈদ্য সন্তান, আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, উঠ,—জাগ। জাগিয়া আবার প্রাচীন কালের শিক্ষালাভের জন্য সচেষ্ট হও,—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের যথারীতি শিক্ষালাভ করিয়া,—শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন নহে - হাতে কলমে সে শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া—সকল বিষয়ে পারদর্শী হইয়া, চিকিৎসার সকল অঙ্গের জ্ঞান-গর্ব্বে তুমি গরীয়ান হইয়া উঠ, তোমার জাগরণে বিশ্বসংসার জাগরিত হউক,—দিগ্বধুগণ মুখরিত হইয়া তোমার জয়কীর্ত্তন করুক,—তুমি অন্যের নিকট অপরাজের—অক্ষয়—অমর হইয়া ঋষিপ্রদর্শিত-পন্থায় সমগ্র বিশ্ববাসীর পূজা পাইতে চেষ্টা কর—আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য ইহাই প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ। ফল কথা, দেশের বড় দুর্দ্দিন—এ দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষা করিতে হইলে আর আমাদের অচেতন প্রায় থাকিলে চলিবে না,—উঠিতে হইবে—জাগিতে হইবে—নিদ্রার অবসাদ একেবারে পরিহার করিতে হইবে। তাই আবার বলি - বৈদ্য সন্তান, আর ঘুমাইও-না—ঘুমের নেশা কাটাইয়া ফেল—উঠ জাগো—জাগো—জাগো।

আর একটা কথা। এই কথাটা বলিয়াই আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য স্থানে স্থানে যে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা কথার কথা বলিয়াছি,—সে কথাটায় প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয়চিকিৎসককে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে—এ প্রস্তাবটী উপেক্ষার বিষয় নহে—উপেক্ষার হাস্যে আস্য বিকাশ পূর্ব্বক ইহা উড়াইয়া দিলে আর্য্য চিকিৎসার যে কিছুতেই পুনরুন্নতি ঘটিবে না—ইহা খাঁটি সত্য কথা। আর্য্য চিকিৎসার অবনতির যতগুলি কারণ দেখাইয়াছি, তা' ছাড়া আর একটি কারণ সকলে জানেন কিনা জানিনা—সেইজন্য সে কথাটাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। মহামান্য ইংরাজ রাজের কৃপায় যে সময় মেডিকেল কলেজের স্থাপনা হইল, সেই সময় মধুসূদন গুপ্তের দেখাদেখি অনেকে ডাক্তারি শিক্ষার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের ব্যবসায় পরিচালনায় বিঘ্ন তো ঘটিলই, তা' ছাড়া এই সময় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলির সমালোচনা ও অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। এই সমালোচনা ও অনুবাদ কারীদিগের মধ্যে কোনো একজন ডাক্তার তাঁহার প্রণীত হিন্দু মেটেরিয়া মেডিকার ভূমিকায় প্রকাশ করিলেন—"আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক, ইহার ভিতর প্রত্যক্ষ ও পরিদর্শনযোগ্য কিছুই নাই।" সনাতন আয়ুর্ব্বেদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই সময় অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন, এমনই সময়

ঐ ডাক্তার মহাশয়ের এই উক্তি তাহার বিলক্ষণ পোষকতা করিল—দেশ ব্যাপিয়া রাষ্ট্র হইল—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভ্রমাত্মক, ঐ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্য্যে একান্তই অনুপযোগী—উহারা হাতুড়ে বা কোয়াক" কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ কিরূপ বিজ্ঞানসম্মতচিকিৎসা,—ডাক্তারদিগের মত অ্যানাটমী পড়িয়া, ফিজিওলজি শিখিয়া, সার্জ্জারিতে সুপণ্ডিত হইয়া এ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইতেন কিনা—তাহা সুবিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ প্রভৃতি অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার প্রণীত হিন্দু সিষ্টেম অব্ মেডিসিন নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শারীর স্থান লিখিত হইয়াছে।" কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দেশবাসীর রুচি এতই পরিবর্ত্তিত যে, সে কথা শুনিবার আর প্রয়োজনই নাই। একজন ডাক্তারের কথায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে হাতুড়ে বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিকিৎসা গ্রন্থ তাহারই ফলে quackery ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাস্তবিক আমাদের ছিল সব, কিন্তু এখন যে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং 'ছিল' বা আমাদের গ্রন্থ মধ্যে আছে এ কথা বলিয়া আর নির্ব্বাক থাকিলে চলিবে না, সেই অভাব পরিপূরণের জন্য ভারতের নানাস্থানে আমাদিগকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক সত্যতা উদ্‌ঘাটন করিয়া বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি একান্তই করিতে হইবে। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ইহার প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছে। যথারীতি অ্যানাটমী ও সার্জ্জারির শিক্ষা দিয়া—আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলকে সংক্ষেপ ও সহজ বোধ্য ভাবে প্রণয়ন পূর্ব্বক ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই বিদ্যালয়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মাধবকরের নিদানে যে সকল কথার উল্লেখ নাই, অথচ যে সকল বিষয়ের অনুল্লেখ থাকিলে নিদান শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না—তাহা বিস্তর শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রোগ বিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রোগনিদান বুঝান হইতেছে। কুমারতন্ত্র, বিষতন্ত্র, শল্য তন্ত্র, শালাক্য তন্ত্র, দ্রব্যগুণ শিক্ষার পুস্তক এই বিদ্যালয় হইতে যেরূপ ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পন্থা সুগম করিবে বলিয়া মনে হয়। তবে বাঙ্গালায় একটি কবিতা আছে—

"চাঁদেও কলঙ্ক আছে মৃণালে কণ্টক"

সেইজন্য এ বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা যেরূপ অনুষ্ঠান লইয়া গঠিত, তাহা হয় তো দোষশূন্য না হইতে পারে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় যে একান্তই আবশ্যক—সে পক্ষে যদি সন্দেহ না থাকে—তাহা হইলে কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় কর্ত্তৃক সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। যাহা হউক আমাদের মনে হয় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য ভারতের সকল স্থানেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের যদি কোনো ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে—প্রত্যেক বৈদ্য সন্তানের তাহা দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ফলে আমাদের কথা হইতেছে—হে মহামহিম মহিমান্বিত—সর্ব্বজনবরেণ্য বৈদ্য চিকিৎসকগণ—সনাতন আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করিবার জন্য—বৈরী সমাজের অলীক রটনা—আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্মত নহে—এই মিথ্যা অপবাদ সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার জন্য, জীব-কুশলা-কাঙ্ক্ষী ফলমূলাশী সর্ব্বত্যাগী আর্য্যঋষি মণ্ডলীর বৈজ্ঞানিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য,—ভেদা-ভেদ ভুলিয়া,—দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ করিয়া,—স্বার্থ-পরার্থ বিসর্জ্জন-সলিলে নিমজ্জিত করিয়া—যাহার যতটুকু শক্তি আছে—যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে—যাহার যতটুকু সামর্থ্য আছে—বৈদ্য-চিকিৎসার পুনরুন্নতির বিরাট—বিশাল-যজ্ঞকুণ্ডে তাহার আহুতি সম্পাদনে বৈদ্য নামের মহিমা রক্ষায় ধন্যমনা হইয়া—জাতীয়-গৌরব রক্ষায় কৃতকৃতার্থ হও। তোমরা যে পুণ্যপূত কর্ম্ম রাশি লইয়া লোকহিতার্থ জন্মগ্রহণে একদিন বিশ্ববরেণ্য হইয়াছিলে,—ব্রহ্মার ছিন্নশিরঃ সংযোজনে তোমাদেরই পুণ্যকীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষ একদিন যে যজ্ঞাংশ গ্রহণের অধিকারী হইয়া-ছিলেন - তোমাদের চিকিৎসা গ্রন্থের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, সমগ্রবিশ্ব যে তোমাদের গর্ব্বে হিংসা-প্রবণতায় তোমাদিগকে খর্ব্ব করিবার অধিকারী—এই খাঁটি সত্য কথা আর না বুঝিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কিছুতেই চলিবেনা, সেইজন্য অনুরোধ করিতেছি—তোমাদের অধঃপতিত অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—সমাজের গৌরবস্থল—দেশের আশা ভরসা—সোদর প্রতিম বৈদ্যব্যবসায়ীগণ,—আর নিশ্চিন্ত থাকিও না,—উঠ,—নিদ্রার ঘোর পরিত্যাগ কর,—জাগো, জাগো জাগো। দেশের বড় দুর্দ্দিন—তাহা মনে কর,—তোমরা কি ছিলে আর কি হইয়াছ—তাহা মনে কর,—যাহা ছিলে—তাহা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবার বদ্ধপরিকর হও—সময়ে তোমাদের সুদিন আবার নিশ্চয়ই আসিবে—সময়ে তোমরা আবার নিশ্চয়ই যাহা ছিলে, তাহা হইবে। তাই আবার বলিতেছি—জাগো, জাগো, জাগো।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

রোগ নিবারণ কিসে হয় ?

—:০:—

জগদ্ব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড দাবানল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই "ইনফ্লুয়েঞ্জা" নামক মহামারী ভীষণভাবে সংহার কার্য্য সাধন করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি ছাড়া অন্যান্য ব্যাধিও এই সংহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। পূর্ব্বে সংগ্রামে নিযুক্ত সকল জাতিই চেষ্টা করিতেছিলেন যে, কিসে সেই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়-কারী সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া জগতে শান্তি স্থাপিত হয়। সেই চেষ্টায় যেমন আমেরিকা আসিয়া যোগ দিলেন, তেমনি সকলেরই চেষ্টা ফলবতী হইয়া মহাযুদ্ধে লোকক্ষয়কর ব্যাপার বন্ধ হইল। যুদ্ধে লোকক্ষয় বন্ধ হইল, কিন্তু রোগে লোকক্ষয় বন্ধ হইল কি? যেমন যুদ্ধের ভীষণ সমস্যা লোকলোচনে নৃত্য করিতেছিল, তেমনি

ব্যাধির আরও ভীষণতর অথবা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম সমস্যা মধ্যে মধ্যে আশার আশা দিয়া ঘোরান্ধকারে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিতেছে। আবার সকল দেশের লোক বদ্ধপরিকর হইয়া স্বাস্থ্যসমিতি গঠন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা মহামারীর দাবদাহ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভারত শুধুই নিশ্চেষ্ট। যুদ্ধের সময় আমাদের সম্রাটকে সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভারতের অতুলনীয় রাজভক্তি যুদ্ধ সাহায্যে জাগাইয়া ছিল। এখন সেই যুদ্ধ যেমনি বন্ধ হইয়াছে, ভারত তেমনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঘুমাইলে আর চলিতেছে না। মৃত্যু গভীর হুঙ্কারে আমাদিগকে তাহার তাণ্ডবলীলা দেখাইতেছে। ইহাতেও যদি আমরা প্রতিকারের কোন উদ্যোগ না করি, তাহা হইলে পরিতাপের বিষয় নহে কি? দেশে চিকিৎসকের অভাব—বিশেষ সুচিকিৎসকের। যিনি নির্লোভ হইয়া নিজের ভরণপোষণের আয়োজন ও পরোপকার উভয় কার্য্যই করিতে পারেন এরূপ চিকিৎসক ত অত্যন্তই বিরল। ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে এই মহামারীর কারণ ও নিরাকরণের উপায় আমার যৎসামান্য জ্ঞানমতে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহার সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা—যাহা শ্রীভগবান্ হৃদ্দেশে থাকিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিতে গিয়া যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদের কথা লিখিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ভাল করিয়া না দেখিয়া লেখনী চালনার ভ্রম মাত্র,—উহা পন্থার ভ্রম নয়। কিন্তু যাহাতে লোকে সুস্থভাবে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়, কই এবিষয়ে নিস্বার্থ-ভাবে কে চেষ্টা করিতেছেন? যিনি দরিদ্র, তিনি তাঁহার দারিদ্র্য কষ্টে কাতর হইয়া দিন-পাত করিতেছেন। যিনি মধ্যবিত্ত লোক—তিনি কোথাও কৃষিকার্য্য—কোথাও বাণিজ্য—কোথাও দাস্যবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা এই খাদ্য দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যের দিনে কোনরূপে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করিয়া আর অন্য কার্য্যের সময় পাইতেছেন না। আর যাঁহারা ধনী—তাঁহারা অলসে, বিলাসে, খেলায়, নৃত্যগীতে, ব্যসনে এবং কেহ কেহ কতই কুরুচিপূর্ণ কার্য্যে তাঁহাদের অগাধ ধন নিশ্চিন্ত মনে ব্যয় করিতে-ছেন। কেহ কাহাকেও বাধা দিতে নাই। কোথাও চালক নাই, সকলেই স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ চলিতেছেন। যিনি চিকিৎসক—তাঁহার দ্বারাই এই দুর্দ্দিনে বেশী উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু তিনিও যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ দ্বারা নিজেকে ধনী করিবার জন্য "চরক" "সুশ্রুত" প্রভৃতি গ্রন্থ কথিত চিকিৎসকের গুণকে উপেক্ষা করিয়া মনুষ্য জীবনের বহুমূল্য সময় অযথা ব্যয় করিতেছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ত কথাই নাই। কিসে অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজে প্রভূত ধনের অধিকারী হইব—অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের শুধু তাহারই চেষ্টা! পূর্ব্বে লোকে এইরূপ ধন-লালসায় ব্যাকুল হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইত না। বিষয়-বাসনা-বিষ লোককে এত জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই। রামায়ণে মহামুনি বাল্মিকী অযোধ্যাবাসীর বর্ণনকালে অযোধ্যা-বাসীর দুইটি গুণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন—প্রথম কেহ কাহারও অপেক্ষা বেশী ধনী হইত না—সকলেই সমভাবে ধনী ছিল এবং ইহাতেই তাহারা সুখী ছিল; দ্বিতীয়—তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ তৎক্ষণাৎ করিতে পারিত। আমাদের এই দুইটিরই অভাব। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ অত্যন্ত লোভী,

"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণ নষ্ট হওয়ায় অন্যান্য জাতিও নষ্ট হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্যানুকরণ আমাদের কেবল দোষভাগেরই হইয়াছে, গুণভাগের হয় নাই। তাহাদের মত আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়াছি, ধর্ম্মকে ভুলিয়াছি এবং সব ছাড়িয়া এক সংসারকে চিনিয়াছি। কিন্তু তাহাদের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিপদে কর্ত্তব্যাবধারণ ও তন্মুখে চেষ্টা, একতা, পরোপকার, দয়া প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণের অনুকরণ করি না।

যিনি ব্যবহারজীবী, তিনি তাঁহার উচ্চশিক্ষা ও পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, কি করিয়া অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজে ধনবান্ হইতে পারেন, তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত। যিনি বাণিজ্য করিতেছেন—তিনি তাঁহার ঘৃতাদি পণ্যদ্রব্যে লোকের প্রাণহানিকর বিষাক্ত দ্রব্যাদি লোকের অজ্ঞাতসারে ও অলক্ষিতে মিশ্রিত করিয়া ধনী হইবার চেষ্টায় দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। চিকিৎসক মহোদয়গণও যিনি বিশেষ ও উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, তিনিও অর্থের দাস হইয়া কত অনর্থ সাধন করিতেছেন। বিনা দর্শনীতে চিকিৎসার বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া; নিজের কৃতিত্বের ঢাক বাজাইয়া, কত প্রকারে নানাবিধ বিজ্ঞাপনের জাল বিস্তার করিয়া রোগকাতর-জ্ঞানশূন্য রোগীকে —কুরঙ্গকে বংশীবাদন দ্বারা লুব্ধ করার ন্যায় নিজের জালে ফেলিয়া অবাধে ঐশ্বর্য্যবান্ হইতেছেন। চিকিৎসকের মোটর গাড়ী, কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথের উপর বৃহদট্টালিকা প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারের আয়োজন না হইলে তাঁহার ১৬৲ টাকা ৩২৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ দর্শনীর উপায় হয় না। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র ভারতে কতদিন এইরূপ চলিবে! চিকিৎসকগণও যদি এই ভীষণভাবে অর্থ সংগ্রহে তৎপর হন, তবে তাঁহারা চিকিৎসা দ্বারা পরোপকার কি প্রকারে করিবেন? এখনকার দিনে পরোপকারের কথা বলিলে লোকে গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে।

চিকিৎসকের এখন প্রথম দৃষ্টি অর্থে। সেই অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রসার করিতে যদি রোগীকে কষ্ট পাইতে হয়, রোগ বেশী দিন ভোগ করিতে হয় ও রোগীর জন্য গৃহস্বামীকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কি হইল? ফলকথা এখনকার অনেক চিকিৎসকই যে অর্থশোষণে তৎপর—একথা বলিলে অন্যায় হইবে না। পূর্ব্বেকার চিকিৎসকগণ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। ৺গয়ানাথ কবিরাজ আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমার অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামে একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার গুরু স্বর্গীয় গঙ্গাধরের ন্যায় তাঁহার পাচন চিকিৎসাটাই বেশী ছিল। কাজেই চিকিৎসায় কম খরচ পড়িত ও বহুলোকে তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারিত। আমার পিতা ৺বরদাপ্রসাদ রায়কে তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জীর্ণ জ্বরের চিকিৎসা করেন। জীর্ণজ্বরের সহিত শোথ-প্লীহা প্রভৃতি উপসর্গও জুটিয়াছিল। তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণের পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় মাস কাল বাঁচিবেন, যদি তাহার বেশী বাঁচেন, তবে আরোগ্যের সম্ভব। চতুর্থ মাসে রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা উপশম হইয়া আসে। কিন্তু একদিন আবার জ্বর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল এবং তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত করিল। এইরূপ কঠিন রোগের চিকিৎসায় ২ প্রকার

পাচন, ১টি অবলেহ, ১টি বড়ি ও পঞ্চামৃত লৌহ ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে মাসিক ৬৲ টাকার বেশী ব্যয় পড়িত না। তাঁহার যে মাসে মৃত্যু হয়, তাহার পূর্ব্বের ১ মাসের ঔষধের দাম বাকী ছিল। আমি উহা আন্দাজ করিয়া ৪৲ টাকা পিতৃদেবের মৃত্যুর পর দিতে গেলে তিনি লইলেন না। যখন আমি বলিলাম,—"তবে আমার পিতৃদেব কি প্রকারে আপনার ঋণমুক্ত হইবেন"? তখন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"উহা কাহাকেও দান করিয়া দেন, আমি মৃত ব্যক্তির ঔষধের দাম লই না।" সেই চিকিৎসক আর এখনকার চিকিৎসক! এখনকার চিকিৎসক রোগীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আত্মীয় স্বজন কাঁদিতেছে, সেই সময় কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শনীর টাকাটা আদায় না করিয়া যাইবেন না। ৺গয়ানাথ কবিরাজ মহাশয় বড়লোকেরা পাল্কী পাঠাইলে পাল্কীতে রোগী দেখিতে যাইতেন। পল্লীগ্রামে রাস্তা ভাল না থাকায় ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না। তিনি জুড়ি গাড়ীও রাখেন নাই। নিকটে চিকিৎসা করিতে হইলে পদব্রজেই ঔষধের ব্যাগটি হাতে লইয়া যাইতেন। দূরে হইলে 'ডুলি' করিয়া যাইতেন, যদি কেহ বলিত আপনি পাল্কী করিয়া যান না কেন?—তাহাতে বলিতেন —"আমার রোগীর বেশী পয়সা খরচ হইবে, পাল্কী ভাড়া তো রোগীর নিকট হইতেই আদায় হয়। যদি আমি পাল্কীতে যাতায়াত করি, তাহা হইলে অনেক গরীব আমায় ডাকিতে পারিবে না।" চিকিৎসক সমাজের সেই এক দিন, আর আজকালকার মোটর গাড়ী চড়া জুড়ি গাড়ী চড়া, দীর্ঘদর্শনী গ্রহণ করা চিকিৎসক সমাজের এই এক দিন! এ সকল খরচ ছাড়া মহা আড়ম্বরযুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিশেষ খরচ আছে, তাহাও কিন্তু ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা রোগীর উপরেই পড়ে। তা'ছাড়া বৃহদট্টালিকার ব্যয় ভার। অবশ্যই চিকিৎসকের জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্যে অর্থ আবশ্যক, কিন্তু ঐ সকল নিয়ম অবলম্বনে ও কঠোর হইয়া অর্থ সংগ্রহকেই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং চিকিৎসা দ্বারা রোগীর যন্ত্রণা উপশমকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলে কি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কথিত চিকিৎসকের গুণ রক্ষিত হয়? প্রাতঃস্মরণীয় ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় একবার একটী বিদ্যার্থীর শিরঃশূল একটী মুষ্টিযোগ দ্বারা আরোগ্য করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কয়েক আনা পয়সা মাত্র খরচ করিতে হয়। এক ধনীর ঐ পীড়া হওয়ায় সেই কয় পয়সার ঔষধেই সেই রোগ আরাম করিয়া তাঁহার নিকট ৫০০৲ টাকা লন। এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা আমাদের দেশের বিলাস-ব্যসন-তৎপর পরোপকার-পরাঙ্মুখ, ঈশ্বরের দরিদ্র মূর্ত্তির সেবা-বিমুখ ও গর্ব্বী ধনীর নিকট হইতে অজস্র অর্থ গ্রহণ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভালই কিন্তু সেই অর্থ নিজ ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করিয়া, দরিদ্রকে অকাতরে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দান করুন। ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কে এক ব্যক্তি বলিলেন—"মহাশয় এই কয় পয়সার ঔষধে আপনি ধনীর নিকট অত টাকা কেন লইলেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন—"বাবা, আজকাল ধনীরা চিকিৎসককে কোন প্রকারে সাহায্য করেন না, যদি উহার নিকট অত টাকা না লইব—তবে জয়মঙ্গলরস, বসন্তকুসুমাকর রস, স্বর্ণ পর্পটি প্রভৃতি বহুমূল্য ঔষধাদি দ্বারা কোথাও বিনামূল্যে, কোথাও স্বল্পমূল্যে গরীবের ও মধ্য-বিত্ত লোকের কি প্রকারে চিকিৎসা করিব?"

সূর্য্য সহস্র সহস্র কর বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে জলরূপ কর গ্রহণ করিয়া বর্ষা-কালে লোকের হিতসাধন জন্য নিজে আকাশে কিছু না রাখিয়া সমস্তই অর্পণ করেন "পরোপ-কারায় সতাং জীবনম"—এই কথা মনে করিয়া সূর্য্যদেবকে সমস্ত আরোগ্যের নিদান জানিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধারণা করিয়া, তাঁহার উদাহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। তাহার ফলে ভারতের বহু দুঃখ মোচন করিতে পারিয়া ইহকালে ও পরকালে উভয় লোকেই সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

আমার ভ্রাতা ৺শরৎ চন্দ্র রায়—স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সেন এম. এ, এম,ডি, মহাশয়ের একটী উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তিনি গরীবদের বিনা-পয়সায় ঔষধ ত দিতেনই, তা' ছাড়া বিনা মূল্যে ভাল সাগু-বার্লি প্রভৃতি পথ্যের দ্রব্য দিতেন। শীতকালে একটী প্রসূতির চিকিৎসায় নিজের স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করায় নিজে নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইয়া অকালে ৩৬ বৎসর বয়সে স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার পরোপকার বৃত্তি মৃত্যুর পরও কিরূপে তাঁহাকে চালিত করিয়াছিল—তাহা নিম্নের সত্য ঘটনায় প্রকাশ পাইবে।

"আমাদের পুরোহিত শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, ইনি আপনাদের আয়ুর্ব্বেদের এক-জন গ্রাহক। একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রবল জ্বর হয়। তখন রাত্রি ৯টা, ছেলেটি জ্বরের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। পিতা পুত্রের অবস্থায় কাতর হইয়া চিকিৎসক ডাকিতে পাঠান। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে কাতর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আজ যদি শরৎ ডাক্তার থাকিত, তবে আমার ছেলেটার এই প্রবল ব্যাধিতে এইরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইত না।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বসিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া একটু তন্দ্রাবেশে পড়িলেন এবং সেই সময় দেখিতে পাইলেন যে, ৺শরৎ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাকে কেন ডাকিলেন? আমার আসিতে বড়ই কষ্ট হইল, দেখুন আমি আর এসংসারে নাই—তা' আপনারা জানেন, তবুও আমাকে ডাকিলেন কেন? আর দেখুন, এখন আমি চিকিৎসা করি না, আমার কাছে ঔষধাদিও নাই যে আপনার ছেলেকে দিব। আচ্ছা যখন আসিয়াছি—তখন এক কাজ করুন—এই গৃহের কোণে একটা শিশি আছে, উহাতে এক-শিশি জল পুরুন ও উহার কতকটা তিনবার আপনার ছেলেকে খাওয়াইয়া দেন, জ্বর সারিয়া যাইবে।" বলিয়া সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন এবং একটী শিশিও ঘরের কোণে দেখিলেন। উহা জল পূর্ণ করিয়া সেই জল প্রথমবার দিবা মাত্র ছেলেটির ছট্‌ফটানি কমিয়া গেল। আর দুইবার দেওয়ার পর সে ঘুমাইয়া গেল। প্রাতে চিকিৎসক আসিয়া নাড়ীতে জ্বর নাই দেখি-লেন। তাহার পর সে দিন আর জ্বর আসিল না, তৃতীয় দিনে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। এখন এই ঘটনাটি কি ভাবে হইল, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা চিন্তা করিয়া দেখুন। যখন আমরা এই সংসার হইতে চলিয়া যাইব, তখন আমাদের সঙ্গে কিছুই যাইবে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যাইবে—পাপ পুণ্য যাইবে। আমরা যখন সকলেই সুখ ইচ্ছা করি, তখন পরকালের সুখ ইচ্ছা

কেন করি না! বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, এই সংসারকে সার জানিয়া, কেবল অর্থ সংগ্রহ-তৎপর হইয়া অধর্ম্মকে অবলম্বন করি ও ধর্ম্মকে ত্যাগ করি। ধর্ম্ম যে আমাদের পরকালের পথপ্রদর্শক ও সুখের আবাস স্থল-নির্ণয়কারী,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে কথিত আছে।

ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে
নারী গৃহদ্বারে জনাঃ শ্মশানে।
দেহশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে
ধর্ম্মানুগো গচ্ছতি জীব একঃ॥

ধন এই পৃথিবীতে পড়িয়া রহিবে। অশ্ব-গজ-গো—তাহা তাহাদের স্থানে রহিবে। প্রাণ প্রিয়া পত্নী গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যাইবেন। এই যে এত সাধের দেহ তাহাও চিতায় দগ্ধ হইবে,—সঙ্গে কিছুই যাইবে না। এক ধর্ম্ম জীবের পরলোক মার্গে অগ্রে অগ্রে যাইবে।

রোগের আদি কারণ অধর্ম্ম। সেই রোগের যিনি চিকিৎসা করিবেন—তিনি যদি ধর্ম্মকে অবলম্বন না করেন, তবে কোন্ বলে তিনি রোগীর রোগ অপনয়ন করিবেন?

এই তো গেল চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। এখন যাঁহারা চিকিৎসিত হইতেছেন বা যাঁহাদের চিকিৎসিত হইবার আবশ্যক আছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হইলে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই রোগ যাহাতে দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই প্রথমে চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে পৌষমাসের প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম পালন করিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা খুব কম থাকে। রাজ নিয়মের ব্যবস্থা (আইন) অমান্য করিলে, উহার অজ্ঞানতা, অপরাধীর দণ্ড বিধান নিবারণ করিতে পারে না—Ignorance of Law is no excuse. সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে রোগ অনিবার্য্য। তবে অল্প অল্প অনিয়মে রোগ হয় না। "প্রাপ্তে কালে গদো যথা—" অনিয়ম করিতে করিতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও রোগ আক্রমণ করিয়া আয়ু হ্রাস করিয়া ফেলে। সেই জন্য আমাদের সকলকে প্রাকৃতিক নিয়মে চলা উচিত ও কিসে রোগ হয়, কি করিলে রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—স্বাস্থ্যরক্ষার এসব নিয়মগুলি জানা চাই। রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ হইতে না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বেকার লোকেরা নিয়মে থাকিতেন, মিতাহার করিতেন পূর্ব্বের আহার সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইলে পুনরায় আহার কবিতেন না। অধিকাংশই একাহার করিতেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন অর্থাৎ বীর্য্য ধারণ করিতেন, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবাস করিয়া পাকস্থালীকে বিশ্রাম দিতেন। অমেধ্য অখাদ্য আহার, যাহার তাহার হাতে আহার—এ সব করিতেন না, দেব সেবা, ব্রাহ্মণে ও গুরুজনে ভক্তি, সাত্ত্বিক ভোজন ও সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া নীরোগে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ইহকালের ও পরকালের উভয় কালের সুখ ভোগ করিতেন। চিকিৎসককে সম্মান করিতেন। এখন তাহার বিপরীত হইয়াছে। তাই জরা ব্যাধি প্রভৃতি আসিয়া অকালে লোককে কাল গ্রাসে পাতিত করিতেছে। এখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? আগে সামান্য সামান্য রোগ বাড়ীর গৃহিণীরা নিজেরা জানিত-মুষ্টিযোগ দ্বারা আরাম করিতেন। এমন কি, কখনও কখনও চিকিৎসক না পাওয়া গেলে, তাঁহারা

কঠিন কঠিন রোগও আরাম করিতেন। কিন্তু এখন ছেলের সামান্য মাথা ধরিলেই ছেলের মা ডাক্তার ডাকিলেন, তিনি আসিয়া কতক গুলা উগ্রবীর্য্য ঔষধ ব্যবহার করাইয়া শরীরকে আরও খারাপ করিয়া দিলেন। উপবাস তো এখন উঠিয়াই গিয়াছে। "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যম্"—একথা বলিলে লোকে হাসে। আমরা একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। এখনকার দিনে নবজ্বরে অবাধে দুগ্ধ পান করার ফলে আন্ত্রিক বিকার অর্থাৎ টাইফএডকে আহ্বান করা হয় মাত্র। একবার আমার কোন বন্ধুর ছেলে কাসিতে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম বাসক গাছের ছাল—মূলের ছাল ও পাতা—(যাহাকে ত্রিবাসক বলে) জলে সিদ্ধ করিয়া ছেলেটিকে খাওয়ান, তাহাতে তিনি বলিলেন,—"কে অত হাঙ্গাম করে? একটা সিরাপ অব বাসক কিনিয়া লইয়া খাওয়াই। ' তিনি অবাধে ৸০ আনা পয়সা খরচ করিলেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক উপকারী টাট্‌কা বাসকের ফাণ্ট তৈয়ার করাইয়া খাওয়াইলেন না। আর এক বন্ধু উহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া সকলকে বলিলেন,—এখন আমার বাসক গাছে পাতা গজাইতে পায় না। আমার বাসক গাছটি দেখিলে মনে হয়—যেন পরোপকারার্থে সে জীর্ণশীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। বাসক গাছটি এখন প্রমাণ করিতেছে যে—

বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থ মবসীদতি॥

ফলকথা, সকলকেই মোটামুটি রোগের চিকিৎসা জানিতে হইবে। গাছ গাছড়া কতকগুলি চিনিতে হইবে। নিজের ঘরের পাশে, আঙ্গিনায় বা বাগানে কতকগুলি অত্যাবশ্যক ভেষজ বৃক্ষলতাদি লাগাইতে হইবে। রোগ নিবারণের জন্য রসায়ন ব্যবহার করিতে হয়, ঋতু হরীতকী তন্মধ্যে সুলভ ও প্রশস্ত রসায়ন জানিয়া যাঁহারা রোগ প্রবণ, তাঁহারা উহা ব্যবহার করিতে যত্নবান হইবেন। কি পরিমাণে উহার ব্যবহার করিতে হয়। সম্পাদক মহাশয় এইখানে ফুট নোটে তাহার প্রকাশ করিলে বড় ভাল হয়। * ঋতুহরীতকী যে ঋতুতে যে দ্রব্যের সহিত সেব্য নিম্নের শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

সিন্ধুত্থ-শর্করা-শুণ্ঠী-কণা মধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিস্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

বাড়ীর নিকট নিম্ব, বেল, তুলসী, কণ্টকারী, বাসক, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, ক্ষেতপাঁপড়া, দূর্ব্বা, কালমেঘ, আমরুল, আমলকী প্রভৃতি যেন রোপণ করিয়া রাখা হয়। নিম্বের অশেষ গুণ। আমার যে গোয়ালা গাভী দোহন করে, সে বৃদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু তাহার পিতার শরীর দেখিলে তাহাকে যুবা বলিয়া মনে হইবে। তাহার পিতা বলে—তাহার কখন জ্বর হয় না। একদিন তাহার গামছার একটু কোন অংশে সবুজবর্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওরূপ কেন?" তাহাতে সে বলিল "চৈত্রমাসের প্রথম পনর দিন নিমপাতার রস খাই বলিয়া, ঐ রস নিঙড়াইতে এরূপ হইয়াছে। বেশী পাই না বলিয়া পোয়াটাক ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধ ইহার

* ঋতু হরীতকী সেবনাকাঙ্ক্ষিগণ প্রথমে দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১ সপ্তাহ সেবনের পর প্রতিদিন এক আনা হিসাবে বাড়াইয়া অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবেন। আঃ সং।

পর পান করি, তাহার ফলে আমি সমস্ত বৎসর বেশ ভাল থাকি।" এক সর্পবিষচিকিৎসক আমাকে বলেন যে, প্রত্যহ কিছু কিছু নিম্ব পাতা খাইয়া যখন গায়ে নিমের গন্ধ হইবে, তখন আর সর্পবিষ দেহে বিষক্রিয়া অত্যল্পই করিবে, তাহাতে প্রাণহানি হইবে না।

দেশের কবিরাজগণ সকলে মিলিয়া চরকোক্ত ভাবে এক বিরাট সভা করিয়া স্থির করুন যে, কি উপায়ে বর্ত্তমান রোগ সকলের হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পায়। তাহা তাঁহারা প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে প্রকাশ করুন। "আয়ুর্ব্বেদের" মত মাসিক পত্রিকা আরও প্রকাশিত হউক, মূল্য যথা সম্ভব কম করা হউক এবং তাহাতে যে বিষয় যিনি ভাল জানেন তাহা লিখুন। সকল গৃহস্থই "আয়ুর্ব্বেদ" বা অন্য কোন ভাল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা গ্রহণ করুন ও পরিবারের সকলে উহা পড়ুন ও তদনুযায়ী কার্য্য করুন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন মহাশয় যে প্রণালীতে সরল পদ্যে নানারোগের সরল চিকিৎসা প্রণালী "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশ করিতেছেন, ঐরূপ অন্যান্য কবিরাজেরাও করুন এবং উহা বালকবালিকাদের কণ্ঠস্থ করান। বড়ই দুঃখের বিষয় যে "আয়ুর্ব্বেদ" কাগজে সকলে লেখেন না বা তাহার বিস্তারের চেষ্টা করেন না।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়। (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল্।

বাঙ্গালীর ভগ্নস্বাস্থ্য।

—:০:—

দেখা যাইতেছে, দিন দিন বাঙ্গালী, জীবন সংগ্রামে অধিকাংশ জাতি হইতেই অধঃপতিত হইয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যের বিষয়েও একথা সমীচীন হইয়া পড়িয়াছে। 'আয়ুর্ব্বেদ' যখন স্বাস্থ্যালোচনার পত্র, তখন আমরা ইহাতে বাঙ্গালীর এই স্বাস্থ্যের অধঃপতনের বিষয়ই আলোচনা করিব।

যে জাতি একদিন মহারথ মহাবীরগণকে বক্ষে স্থান দিয়া ধন্য হইয়াছিল; কুরুক্ষেত্র সমরেতিহাস যে জাতির বীরত্বের চরম নিদর্শন; সে জাতি আজ কত নিম্নে ভাবিলে দুঃখে ম্রিয়মান হইতে হয়। আগেকার বাঙ্গালী-বীরগণের সহিত তুলনা করিলে আধুনিক শীর্ণকায়, অস্থিচর্ম্মসার, সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত বাঙ্গালীকে দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও বিষাদের উদ্রেক হয়। বৈষম্যধারণা হাস্যের সৃষ্টি করে এবং অধঃপতনের স্মৃতি-অশ্রু টানিয়া আনে।

বাঙ্গালীর এ অধঃপতন কেন হইল? আমার বিশ্বাস, পর-নির্ভরতা ইহার প্রধানতম কারণ। যে জাতি দুইশত বৎসরেরও অধিক কাল পরমুখাপেক্ষী, তাহার জাতীয় প্রাণ যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে। ইহা খুব স্বাভাবিক। আত্মরক্ষার শক্তি তাহার কোথায়? একবার বাঙ্গালী জাতির দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি? ঐ দেখুন—কেরাণীকুল ২০৲ টাকা মাহিনার জন্য রেলে কয়লা দিবার

মত করিয়া তাড়াতাড়ি ৮টা বাজিতে না বাজিতে আহার কোন রকমে সারিয়া অর্দ্ধাশনে ময়লা কোট গায়ে, ছেঁড়া জুতা পায়ে অফিসের পানে ছুটিতেছে। তাহাদের পঞ্জরগুলি গণনা করা অনায়াস সাধ্য, অকালে পক্ককেশ তাহাদের মস্তক বিভূষিত করে, তাহাদের যাবতীয় শক্তি কলম চালাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়।

আজিকাল আমরা খুব চাকরি ভক্ত বটে, তথাপি ভাবিতে গেলে চাকরি একটি নিকৃষ্ট কাজ। তাই সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকে ভিক্ষার অগ্রে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি মোটা মোটা চাকরিগুলি বাঙ্গালীর নহে। বিলাত প্রত্যাগত বা বিলাত সম্ভূত মহা পুরুষগণই তাহা উপভোগ করেন। বাঙ্গালীর সর্ব্বোচ্চ আশা—হয় একটা ডেপুটী বা মুন্সেফ হওয়া—নয় বড় জোর একটা হাইকোর্টের জজ্ হওয়া। হায়, হায়, যে নিজের ঘরে বন্দী, নিজের অন্ন পরের হাতে খায়—তা'র কি মনের তেজ, দেহের বল থাকিতে পারে! তা'র কেননা শীর্ণ দেহ, উৎসাহহীন মন, দমিত আশা—জীবনের প্রধান উপকরণ হইবে? সে কেননা পরের সেই Indrader এর এক বিন্দু কৃপা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিবে?

এই পরনির্ভরতা বাস্তবিকই বাঙ্গালীর মজ্জা একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি যে, যত সব অনর্থ, যত কিছু শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা—তৎসমুদয়ই এই পরনির্ভরতার পরিণাম। হায়, হায়, বাঙ্গালী কেন পরমুখাপেক্ষী হইল?

তা'র পর, বাঙ্গালীর রাজা বিভিন্ন জাতীয়ও বিভিন্ন দেশীয় হওয়ায় বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কম ক্ষতি হয় নাই। সে সর্ব্বদা রাজার জাতির সহিত নিজেকে তফাৎ করিয়া দেখে, খাটো করিয়া দেখিতে শিখে। এই খাটো করিয়া দেখা, এই আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, তাহার উন্নতির পথে অনতিক্রমণীয় বাধার সৃষ্টি করে। সে বুঝে, সে দেখে,—আমি ধরাধামে নগণ্য, ছোট, রাজার জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। রাজার জাতির কাছে নমিত হওয়ায় রাজার জাতিরই ক্ষমতার প্রাবল্য স্বীকৃত হয় এবং নিজে ভগ্ন স্বাস্থ্যকে বরণ করিয়া বাঙ্গালী হীনতাকে আশ্রয় করে।

আধুনিক বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যভঙ্গের আরম্ভ বাল্যকাল হইতে। আগের দিনে যখন বাঙ্গালীর সব ছিল—হিন্দুর গৌরব ছিল, ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, সেই দিনে বালককে কি সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল! গুরুগৃহে প্রথমতঃই চরিত্র শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য পালন, পরে বিদ্যোপার্জ্জন। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাটা বাল্য কালের একটা প্রকৃষ্ট শিক্ষা ছিল। কারণ বীর্য্যই উন্নত মনের স্রষ্টা। সুতরাং বীর্য্যকে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার, উপায় আগেই জানা আবশ্যক। কিন্তু যখন হইতে বাঙ্গলী পরমুখাপেক্ষী হইল; পরের ধর্ম্ম, পরের আদর্শ ভয়াবহ হইয়া যখন বাঙ্গালীর ঘাড়ে চাপিয়া বসিল, তখন হইতে তাহার সব লোপ পাইতে থাকিল, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত একেবারে ভারতের বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্ত্রীজাতির সহিত আধ মিশ্রণ,—বিলাতি courtship, বাঙ্গালীর মজ্জাগত হইতেছে। ফলে বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। বীর্য্য ক্ষয়ে অপরিণত বয়স্ক বালক যৌবনের প্রারম্ভেই শীর্ণ শরীর-বৃদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে মৃত্যুর আহ্বান

যেন সর্ব্বদা তাহাদের শিয়রে জাগিয়া আছে। যে জাতি ব্রহ্মচর্য্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল, অধুনা সেই জাতির মত ব্রহ্মচর্য্যহীন জাতি পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই। কি তীব্র, কি কঠোর, কি নিষ্ঠুর, কি মারাত্মক পরিবর্ত্তন! আজকালকার বালকগণ কিরূপ অল্প-বয়সে উচ্ছৃঙ্খল, তাহা এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের "কাজের কথা" যাহারা নিয়মিতরূপে পাঠ করেন, তাঁহাদিগের নিকট আর তাহার উল্লেখ করিতে হইবে না। বাস্তবিকই বালক-জগত আজ বীর্য্যক্ষয়ে ম্রিয়মাণ। বাল্যকালের এই বীর্য্যক্ষয় যে কিরূপ সর্ব্বনাশকর তাহা বলিয়া বুঝাইবার জো নাই। বাল্যকালেই যখন পরিপক্ক বয়সের সূচনা হয়—বালকই যখন পরে প্রবীণ মানব হইয়া গড়িয়া উঠে—যখন the child is father of the man তখন বালককে বড় সাবধান হইয়া পালন করা উচিত। কারণ তা'র উচ্ছৃঙ্খল জীবন, হীনবল ও দুর্ব্বল-মন মানব-সমাজের সৃষ্টি করে, এবং তার সংযত সাধনা—ধার্ম্মিক, দীর্ঘকায় ও সবল মনস্বীগণের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ পূর্ণ করিয়া দেয়। মিল্টনের বাণী সার্থক The child shows the man as morning shows the day.

অতএব বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান করিতে হইলে প্রথমেই বালকের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহাদের শারীরিক উন্নতির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত ব্যায়ামের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। বালক যদি সুস্থকায় ও সবল হইয়া গড়িয়া উঠে, তবে বাঙ্গালীর পূর্ব্বদিন আবার ফিরিয়া আসিবে। আমরা দেখিব বিস্তৃত রাজপথে শিখসৈন্যের মত প্রশস্ত ললাট, সমুচ্চবক্ষ, আজানুলম্বিতবাহু, মানসিক তেজ ও শারীরিক ওজঃ লাবণ্যে ভাস্বর—অসংখ্য বাঙ্গালী আদি স্বাধীন যুগের সুহাস্যে হাসিয়া উঠিবে।

বাঙ্গালীর ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের একটী উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, স্বাস্থ্যরক্ষা যে একটী অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম—এ কথা সে পরিপূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ তাহারই পূর্ব্ব পুরুষ একদিন সেই বিজ্ঞান সম্মত বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" আজ সে কাণা কড়িকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে। শক্তিকে যে উপেক্ষা করে, শক্তিমানকে সে একটা অনাবশ্যক সৃষ্টি, একটা অন্যায় উপদ্রব, একটা 'গুণ্ডা' বলিয়া বিবেচনা করে, শক্তির কাজ, সাহসের কাজকে সে অভদ্রোচিত হঠকারিতা বলিয়া উপহাস করে। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন অনেকে আছেন যাঁহারা শীর্ণ-কায়, শক্তিমাত্রহীন, তাঁহাদের প্রধান প্রয়াস এই প্রমাণ করা যে—শক্তিশালী মাত্রেই নির্ব্বোধ ও তাঁহাদের ন্যায় শীর্ণকায় না হইলে বুদ্ধিমান হইবার উপায় নাই। একি ভীষণ কুসংস্কারের কথা! ভাবিলেও যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! হায় বাঙ্গালী! আজ শরীরকে, বলকে এত খাট' করিয়াছ?

পরাধীন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ—কেরাণীগিরি ও চাকরির উপর তাহার একান্ত ভক্তি। সে বাণিজ্য করিবে না বা মূলধনের অভাবে করিতে পারে না। ভদ্রতার হানির জন্য সে চাষ আবাদে মন দিবে না, কিন্তু ১৫।২০ টাকার জন্য জাতি নির্ব্বিশেষ ভুলিয়া যাহার তাহার পদলেহন করিতে পারিবে। অসময়ে খাওয়া, ব্যায়ামের অভাব, স্বল্প আয়ে সাংসারিক খরচ নির্ব্বাহ করার দারুণ চিন্তা, কন্যাদায়, ঋণশোধের চেষ্টা বাঙ্গালীর শরীর ও

মনকে একেবারে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

বাঙ্গালী বড় কদর্য্য খায়। প্রথমতঃ তা'র রোজগার অল্প, তদুপরি একজনের ঘাড়ে ভর করিয়া দশজনে থাকে। এক পয়সায় অক্রুর সংবাদ শোনা হয় না। অর্দ্ধাশনে বা অল্প খাদ্যে পনের আনা বাঙ্গালী কষ্ট পায়। বাঙ্গালীকে স্বাবলম্বন শিখিতে হইবে। প্রত্যেককে নিজে নিজে উপার্জ্জন করিতে শিখিতে হইবে। তাহা হইলে আয় বেশী হওয়ায় সকলে পুষ্টিকর সুখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণে মনোযোগী হইতে পারিবে ও সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

আর একটা সর্ব্বনাশ করিতেছে—খাদ্যাদির কৃত্রিমতায়—'ভেজালে'। আধুনিক যুগের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেন 'ভেজাল' আগমন করিয়াছে। কোন জিনিষই বিশুদ্ধ পাইবার উপায় নাই। ঘৃতে, 'ভেজাল,' তৈলে 'ভেজাল' দুগ্ধে 'ভেজাল। মানুষ বাঁচিবে কি খাইয়া? বাঙ্গালী পেটের দায়ে অল্প পয়সায় ঐ সব অপরিশুদ্ধ জিনিষ ক্রয় করিয়া মনে করে—পুষ্টিকর খাদ্য লইতেছি, কিন্তু কি বিষ তাহারা শরীরে গ্রহণ করিতেছে, তাহা বারেকের তরেও উপলব্ধি করে না। ঘৃতের ভেজালের যে হৃৎকার জনক কাহিনী শুনিয়াছি, তাহা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিব না। বাঙ্গালী এইরূপ নিয়ত কত বিষ ও অভক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে নানারূপ আধি-ব্যাধি বাঙ্গালীকে বেড়িয়া ধরিতেছে। পয়সা কম,—কিন্তু উৎকৃষ্টখাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী, কাজেই কৃত্রিম জিনিষ ক্রয় ভিন্ন উপায় নাই। ব্যবসায়ীরাও কেরাণী বাবুদের ইচ্ছা পূরণার্থে ঘৃতে নারিকেল তৈল বা সাপের চর্ব্বি মিশ্রিত করেন, দুগ্ধে বারো আনা জল শুধু তাহাই নহে, তাহাতে এরারুট ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সুমিষ্ট করিয়া লয়।

তদুপরি রাজার জাতির অনুকরণে যে আমাদের স্বাস্থ্যের কম ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে। পাশ্চাত্য অনুকরণে চায়ের অপকারিতা আজি কালিকার দিনে বুঝিবার প্রধান বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে হ্যাট্-কোট পরিধান বিশেষ স্বাস্থ্যহানিকর। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ফুটবল খেলা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আমাদিগকে যে অনুকরণ করিতেই হইবে, সুতরাং ছেলেদের সে খেলা না শিখাইয়া উপায় নাই।

এইত যতদূর মনে পড়িল বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রদান করিলাম। খুঁজিয়া দেখিলে এমন শত সহস্র বিষয় বাহির করা যায়। যাহা হউক অধুনা এই বিষম সমস্যার যুগে বাঙ্গালী কেমন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে সে বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা যাউক।

বাঙ্গালী আত্ম প্রাণকে স্বাধীন করিতে শিখুক। শরীর অন্যের পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু মনের উপর অন্য কাহারও অধিকার নাই। মন স্বাধীন হইলে মনের প্রফুল্লতায় তাহার স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। বাঙ্গালী স্বাবলম্বন শিক্ষা করুক। প্রত্যেকেই নিজের পায়ে নিজে দণ্ডায়মান হউক। এক জনের ঘাড়ে ভর করিয়া যেন দশজন থাকিতে চেষ্টা না করে। তাহা হইলে উপার্জ্জন বেশী হইবে ও স্বচ্ছলতা বাড়িবে। আমাদের উদ্দেশ্য হউক—আমরা আয় বুঝিয়া যত কমই হউক খাঁটি জিনিষ ব্যবহার করিব। অল্প পয়সায় বেশী বা মূল্যবান জিনিষ আশা করিলে তাহা প্রায়শঃ

অসার ও অপরিশুদ্ধ হয়। লোভের জন্য, সাময়িক রসনা তৃপ্তির জন্য, আমরা যেন স্বাস্থ্য-ধন স্বাস্থ্যকে না হারাই।

বাঙ্গালীর চাকরির প্রতি পরম ভক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। গোলামীকে ছাড়িয়া আত্ম নির্ভরতাকে বরণ করিতে হইবে। স্বাধীন মনঃপ্রবৃত্তি যে শরীরের স্বাস্থ্যবিধান করে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালী আজি হইতে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া উপার্জ্জন করিতে শিখুক। কুড়ি টাকার জন্য একটী গাধার মত ভারবাহী না হইয়া, স্বাধীন মন লইয়া বানিজ্য করুক কৃষিকর্ম্ম করুক। মূলধন কম? সবাই কি ধনী হইবে? বিনা ধনেও ব্যবসা করা চলে।

লোক দলে দলে বড় বড় ব্যবসায়ীর স্থানে apprentice ভাবে কাজ করুক. তাহাদের নিকট বিশ্বাসী হউক। তৎপরে সেই ব্যবসায়ীই মহাজন হইয়া তাহাকে ধার দিবে, তাহার ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দিবে। চাই বিশ্বাস, চাই সত্য, চাই ধর্ম্ম, সত্যের জয় ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্গদেশের কৃষিক্ষেত্র গুলি সমস্তই অজ্ঞ-অশিক্ষিতের দ্বারা কর্ষিত হয়। ঐ সব ক্ষেত্র যদি বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শিক্ষিত লোকের উপদেশে ও তত্ত্ববিধানে কর্ষিত হয়, তবে ক্ষেত্রে কত বেশী ফসল হয়? ছোট লোকও মজুরি খাটিয়া পয়সা পায়। শিক্ষিত বাঙ্গালীও কেরাণীগিরি না করিয়া প্রভূত আয় করিতে পারে। প্রত্যেকের জমী না থাকিতে পারে, কিন্তু জমী সংগ্রহ করিতে সকলেই পারে। বাণিজ্যে বাস্তবিকই লক্ষ্মী বসতি করেন—ফলে যে বাণিজ্য করে, সে তো লাভবান হয়ই অধিকন্তু অপরেও কায়ক্লেশে যা' উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহারা লাভবান হয়। এইরূপ ভাবে আত্ম নির্ভর করিয়া উপার্জ্জন করিতে শিখিলে, মন পবিত্র থাকে, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

শেষ কথা আমাদের আদর্শ থাকিবে অনুকরণ নহে—কিন্তু সমীকরণ। পরের জিনিষ আমরা গ্রহণ করিতে পারি এবং চিরকাল করিব কিন্তু নিজস্বকে ত্যাগ করিয়া নহে। আমার ধর্ম্ম, আমার জাতীয়তা, আমার আদর্শ-চিরকালই আমার থাকিবে। অনুকরণের দ্বারে তাহাদিগকে বলি দিব না। পরের কাছ হইতে যাহা আহরণ করিব, তাহাতে ঐ জাতীয়তা, ঐ আমার ধর্ম্ম, ঐ আমার আদর্শ পুষ্টিলাভ করিবে। যদি ইহা করিতে পারি, তবে দেখিব আবার নবীনতর স্বাস্থ্য-সুষমা বাঙ্গালীর অঙ্গে অঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। আবার দেখিব - বাঙ্গালী মনের স্বাধীনতার আনন্দে শিহরিত হইয়া উঠিতেছে,—আর বাঙ্গালী ভিক্ষুক নহে, আর বাঙ্গালী অনুকরণশীল নহে; আর বাঙ্গালী পরাধীন নহে। জগতের অন্যান্য জাতির মত জাতীয় মহাসভা-স্থলে সেও তার আপন উচ্চাসন বাছিয়া লইবে। সেও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিবে—"ওগো আমি ছোট নহি। এককালে আমি কত বড় ছিলাম। আমার বিজ্ঞান, আমার চিকিৎসা শাস্ত্র, আমার জ্যোতিষ কত জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, কত জাতি আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজি ধরাধামে ধন্য ও বরণীয় হইয়াছে। আমি আবার অতীত সংস্কারকে মস্তকে ধরিয়া তোমাদেরই মাঝে আসন বাছিয়া লইবার জন্য আসিয়াছি। আমার অতীত গৌরবের ধারণা করিয়া, তোমরা আমাকে ঘৃণা করিতে পার না।

তোমরা আজ আমাকে স্বীকার কর, বরণ কর। তাহা হইলেই আজ তোমাদের পক্ষ হইতে আমাকে চরম কৃতজ্ঞতা দেখান হইবে।"

সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ।

পঞ্চকর্ম্ম।

ক। বমন, বিরেচন, স্বেদ আর স্নেহ সম্বন্ধে আর একটু ব'লছি। উর্দ্ধভাগ দিয়ে দোষহরণ করার নাম বমন এবং অধোভাগ দিয়ে দোষ হরণ করার নাম বিরেচন। রেচন অর্থাৎ দোষ নিঃসরণ করে ব'লে উভয়কেই আবার বিরেচন বলা যায়। সুতরাং যেথানে অধোভাগ দিয়ে দোষ হরণ করায় অপকার ঘটে, সেথানে উর্দ্ধ ভাগ দিয়ে এবং যেথানে অধোভাগ দিয়ে দোষহরণ করায় বিপত্তি ঘটে, সেথানে উর্দ্ধভাগ দিয়ে দোষহরণ করা যেতে পারে। আর শাস্ত্রে বলে যে, যেমন স্নেহাক্ত পাত্রে মধু রা'খলে যেমন মধু পাত্রে সংলগ্ন হয় না এবং পাত্র থেকে সমস্ত মধু অনায়াসে ফেলে দেওয়া যায়, সেইরূপ স্নেহাক্ত শরীরে বমন-বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে, সমস্ত দোষকে অনা-য়াসে বাহির ক'রে দেয়। আর স্বেদত নানা কারণে আপনারাও দিয়ে থাকেন। নিমো-নিয়ায় শুষ্ক শ্লেষ্মা বক্ষে আবদ্ধ হ'লে, তরল হ'য়ে যা'তে সহজে উঠে যায়—সে জন্যে স্বেদ দেওয়া হয়। পঞ্চকর্ম্মের পূর্ব্বে স্বেদ দিলেও তেমনি দোষ সকল উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গম-নোন্মুখ হ'য়ে আমাশয়ে বা পক্কাশয়ে সঞ্চিতহয়।

ডাঃ। এখন বেশ বুঝতে পা'রলাম। এখন বিরেচনের পরে কি ক'রতে হয় বলুন?

ক। বিরেচনের পর যতদিন না পূর্ব্বের মত বল ও বর্ণ লাভ না হয় এবং মন ও শরীর সুস্থ এবং অন্নসুজীর্ণ না হয়—ততদিন বল, শরীর প্রকৃতি, বয়স, সাত্ম্য, দেশ কাল প্রভৃতি বিচার ক'রে, বমন করার পর যেরূপ নিয়মে আহার দেবার কথা বলা হ'য়েছে, সেইরূপ আহার দিতে হয়। তা'রপর বল বর্ণাদি হ'লে মাথা ধোওয়া, গাত্রে সদ্গন্ধ মাখা এবং উত্তম বস্ত্রাদি ধারণ করিয়ে জ্ঞাতি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে দেবে এবং ইচ্ছামত আহার বিহারাদি ক'রতে ব'লবে।

ডাঃ। কেন তার পূর্ব্বে কি জ্ঞাতি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষেধ নাকি?

ক। রাজা রাজতুল্য লোককে পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগ ক'রতে হ'লে উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে, তা'র ভিতরে সমস্ত উপকরণ রেখে তবে পঞ্চ-কর্ম্ম ক'রতে হয়। চিকিৎসা শেষ হ'লে তবে রোগীকে ঘরের বাহির করে।

ডাঃ। কৈ সে কথা ত আগে বলেন নি।

ক। ব'লেও লাভ নেই, শুনেও লাভ নেই। আর রাজ রাজাড়া ছাড়া সে রকম কেউ ক'রতে পারে না।

ডাঃ। তবে কি দরিদ্রের পক্ষে পঞ্চকর্ম্ম বিহিত নয় ?

ক। অনেকটা সেই রকমই বটে। তবে শাস্ত্রকার ব'লেছেন যে, দরিদ্রের পক্ষে পূর্ব্ব কথিত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা সুকঠিন। অতএব দরিদ্রের ব্যাধি হ'লে তা'কে একরকম ক'রে বিরেচন প্রয়োগ ক'রবে। কেন না, সকল মনুষ্যের সমস্ত উপকরণ থাকে না, আবার দরিদ্রের দারুণ রোগ হ'য়ে থাকে। অতএব দরিদ্রের রোগ উপস্থিত হ'লে যে রকম ঔষধ সে সংগ্রহ ক'রতে পারে, আর যেরূপ অশন বসন জোটে, তা'র সাহায্যেই চিকিৎসা ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। দরিদ্রের প্রতি সবাই বিমুখ দেখছি। এখন বড়লোক মশাইদের জন্যে কি রকম কি ক'রতে হয় বলুন শুনি।

ক। শুনুন তবে। প্রথমেই একটী উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ক'রতে হ'বে। গৃহটী দৃঢ় ও বায়ুরহিত হ'বে, কেবল একস্থানে বায়ু চলাচলের পথ থাকবে। গৃহে বিচরণ ক'রতে যেন কোন কষ্ট না হয়। গৃহের পার্শ্বে যেন অন্য উচ্চ গৃহ বা পর্ব্বতাদি না থাকে। গৃহের মধ্যে যেন ধূম, রৌদ্র, ধূলা প্রবেশ করতে না পারে এবং গৃহটী যেন অনিষ্টকর শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধের অগম্য হয়। তা'র পর গৃহের মধ্যে চিকিৎসার জন্য আবশ্যক মত যে সকল বিবিধ দ্রব্য রা'খবার উপদেশ আছে, সংক্ষেপে ব'লছি। সকল কার্য্যে সুনিপুণ এবং কিছুতেই বিরক্ত না হয় এরূপ শুশ্রূষাকারী, গীতবাদ্য ও মনোহর কথা নিপুণ পারিষদ, বিবিধ মনোহর পক্ষী, জীবিতবৎসা নীরোগ গাভী, জল পূর্ণ টব, হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি, তা'রপর রোগীর চিকিৎসার জন্য বিবিধদ্রব্য, পথ্যের জন্য বিবিধ দ্রব্য, শয়ন উপবেশনের শয্যাদি সমস্তই আবশ্যক। এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে সেই ঘরের মধ্যে থেকে চিকিৎসা কর'তে হয়।

ডাঃ। এ যে আমাদের হাসপাতাল ছাড়িয়ে উঠল দেখছি। হাসপাতালে বাজারের দুধ মাংস ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এযে একেবারে দুগ্ধের জন্য গাভী আর মাংসের জন্য পশুপক্ষী সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা দেখছি।

ক। ব্যবস্থা কি ভাল নয় বলেন ?

ডাঃ। না ভাল খুবই, তবে বড় কঠিন ব্যাপার।

ক। কঠিন ব'লেইত রাজা রাজাদের জন্যে এই রকম বন্দোবস্ত করার কথা বলা হ'য়েছে।

ডাঃ। যাক্ সে কথা। এখন বিরেচনের কম বেশী বা সমান হওয়ার বিষয় বলুন।

ক। দশবার দাস্ত হ'লে জঘন্য, বিশবার দাস্ত হ'লে মধ্যম এবং ত্রিশবার দাস্ত হ'লে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়। পরিমাণ অনুসারেও উত্তম এবং অধম বিরেচন বুঝা যায়। তিন সের চব্বিশ তোলা পরিমাণে দাস্ত হ'লে জঘন্য। চার সের চার তোলা হ'লে মধ্যম এবং পাঁচসের আট চল্লিশ তোলা হলে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়।

ডাঃ। এযে মারাত্মক শোষণ কবিরাজ মশায়। একেবারে রোগ রোগী—দুই আরাম।

ক। এখন তাই হ'য়েছে, কিন্তু আগে যা' বলেছি, সেই পরিমাণ দাস্তই করান হ'ত। সে সময়ে সে ওষুধটা আটতোলা মাত্রায় প্রয়োগ করা যেত; এখন তার মাত্রা—দুই তোলা; কাজেই আগে যা' জঘন্য বিরেচনছিল, এখন তা'কেই প্রধান বিরেচন ব'লতে হ'বে!

ডাঃ। তা' হ'লে সঙ্গত হয় বটে, এখন সম্যক ও অল্পাধিক বিরেচনের লক্ষণ কি বলুন।

ক। সম্যক বিরেচন হ'লে স্রোতঃ সমূহের বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা, শরীরের লঘুত্ব ও বলাধান, অগ্নির দীপ্তি, রোগের নিবৃত্তি, এবং মল, পিত্ত, কফ ও বায়ুর ক্রমশঃ বহির্নিসরণ এই—সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে যথা রক্তপিত্ত, ক্ষয়জনিত ও বায়ুজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি. স্পর্শশক্তির অভাব. গা ভাঙ্গা, ক্লান্তি, কম্প, নিদ্রাহীনতা, দুর্ব্বলতা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, উন্মাদ, হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

অসম্যক বিরেচন হ'লে শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ, ঘর্ম্ম নির্গম, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও বায়ুর প্রতিলোমতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অসম্যক বিরেচন হ'লে, যে দিন বিরেচন প্রয়োগ করা হয়—সে দিন দিবাভাগে যবাগু পান ক'রতে দিবে না। অল্প ক্ষুধা বোধ হ'লে দিবসান্তে আহার করিতে দিবে। কারণ অগ্নির অল্প উদ্রেকে অতি লঘুপাক দ্রব্য আহার করিতে দিলেও অল্প অগ্নিতে তৃণ ও শুষ্ক গোময়াদি দিলে যেমন ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ অন্তরাগ্নিও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে দিবসে বিরেচন ঔষধ পান করা যায়, সেই দিবস যদি সম্যক বিরেচন না হয়, তাহা হইলে সেইদিন আহার করিয়া পর দিন বিরেচন করাইবে।

ডাঃ। অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে কি ক'রতে হয়।

ক। অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে পিত্তনাশক ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্যাদি প্রয়োগ হিতকর। বিরেচন দ্বারা ক্ষীণ দেহ ব্যক্তির পক্ষে মাংস রস, ঘৃত, দুগ্ধ এবং মনোজ্ঞ বলকারক দ্রব্য সুপথ্য। বিরেচনের অতিযোগবশতঃ শোণিত নির্গত হ'তে থাকলে, মৃগ, মহিষ বা ছাগলের সদ্যো নিঃসৃত রক্ত পান ক'রতে দেবে। ঐ সকল জীবের রক্ত কুশমূলের কল্কের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে বস্তি প্রয়োগ করাও চলে।

ডাঃ। আচ্ছা বিরেচন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে আর কি উপদেশ আছে বলুন?

ক। উপদেশ অনেক, সব ব'লতে গেলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ হ'য়ে প'ড়ে। সেই জন্যে বাদসাদ দিয়ে স্থূলভাবে ব'লছি শুনুন।

ডাঃ। বিরেচন ঔষধ সেবন ক'রে মলের বেগ উপস্থিত হ'লে যদি সে বেগ ধারণ করা যায়, তা'হ'লে দোষ কুপিত হয়ে হৃদয়ে গিয়ে উৎকট হৃদ্রোগ এবং হিক্কা, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, দীনতা, লালাস্রাব ও দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। রোগী সংজ্ঞাহীন হ'য়ে জিহ্বা দংশন এবং দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে। এরূপ অবস্থা ঘ'টলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত না হ'য়ে তৎক্ষণাৎ সেই রোগীকে বমন করা'বেন। পিত্তজ মূর্চ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পেলে মধুর রসযুক্ত ঔষধ দ্বারা আর কফজ মূর্চ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পেলে কটুরসযুক্ত ঔষধ দ্বারা বমন করা'তে হয়। তা'রপর দোষনাশক পাচন প্রয়োগ ক'রে ক্রমশঃ অগ্নির বল ও শারীরিক বল বৃদ্ধির চেষ্টা ক'রতে হয়।

ডাঃ। পিত্তজ মূর্চ্ছা আর কফজ মূর্চ্ছা কিরূপ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়।

ক। এইজন্যেই তো ব'লছিলাম যে, সমস্ত কথা ব'লতে গেলে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ ব'লতে হয়।

ক। পিত্ত প্রধান ব্যক্তিকে বা পিত্তজ রোগে কষায় ও মধুর দ্রব্য দ্বারা, কটু

দ্রব্য দ্বারা এবং বায়ুতে স্নিগ্ধ উষ্ণ ও স্নেহ দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করা'তে হয়। বিরেচন না হ'লে উষ্ণ জল পান এবং হাত গরম ক'রে উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বল ব্যক্তি, যাহাদের পূর্ব্বে শোধন করা হ'য়েছে এরূপ ব্যক্তি, অল্প দোষযুক্ত ব্যক্তি, কৃশ এবং যাহাদের কোষ্ঠ কঠিন নাই, তাদের মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করা উচিত। রুক্ষ বায়ু প্রধান, ক্রূর কোষ্ঠ, ব্যায়ামসেবী এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে দাস্ত না হ'য়ে ঔষধ জীর্ণ হয়ে যায়। সেই জন্য এইরূপ ব্যক্তিকে বিরেচন করাতে হ'লে প্রথমে বস্তি ক্রিয়া ক'রে পরে স্নেহ সংযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ ক'রাতে হয়। এতদ্ভিন্ন অস্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে রুক্ষ এবং যে সকল ব্যক্তি স্নেহ পানে অভ্যস্ত তাহাকে রুক্ষ ক'রে স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। এই খানেইত গোলমাল হচ্ছে কবিরাজ মহাশয়। বমনের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে তবে বিরেচন প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হ'য়েছে। এখন আবার অস্নিগ্ধ, রুক্ষ, স্নেহ সাম্য প্রভৃতির কথা বলা হচ্ছে। সুতরাং বিরোধ ঘটছে যে।

ক। কেন বিরোধ ঘটবে, পূর্ব্বেত বলেছি যে, অনেক রোগে পঞ্চকর্ম্ম না করে, এক, দুই বা তিন প্রকার কর্ম্ম করবার আবশ্যক হয়। আবার এ সকল ক্ষেত্রে প্রায় কর্ম্ম ও অর্থাৎ স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করবার আবশ্যক হয় না, সুতরাং বিরোধ ঘটলো কি করে?

ডাঃ। হাঁ বুঝেছি এইবার। এখন বিরেচন সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন।

ক। মোটামুটি সবই এক রকম বলেছি। তবে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগের সম্বন্ধে যে একটু বিশেষত্ব আছে, তার দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই মনে করুন, রোগীকে একগাছা আক খেতে দিলে কিম্বা মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি গলায় ফুলের মালা শুকলে তার বিরেচন হবে।

ডাঃ। সে কি রকম?

ক। এক গাছা আক দু খণ্ড করে তার অভ্যন্তর ভাগে তেউড়ী মূলের কল্ক বাটা মাখাতে হয়। আর সেই দুই খণ্ড আক একত্র ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে কুশ দিয়ে জড়িয়ে তার উপর মাটির লেপ দিতে হবে। তারপর পুট পাকে অর্থাৎ ঘুটের আগুনে পুড়িয়ে ঠাণ্ডা হলে রোগীকে খেতে দিতে হয়। এতে পিত্তজ রোগ পীড়িত ব্যক্তির সহজে দাস্ত হয়।

ডাঃ। বাঃ এত বেশ মজার ওষুদ খাওয়ান। শুনেছি হাকিমেরা রোগীর ইচ্ছায় মিষ্টি ঝাল এবং সুস্বাদু করে ওষুদ খেতে দেয়। সেটা বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের অনুকরণে হ'য়ে থাকবে।

ক। খুব সম্ভব তাই। কেননা আয়ুর্ব্বেদ থেকেই মুসলমানী চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। যাক সে কথা, এখন মালার কথা বলি শুনুন। তেউড়ী, সোঁদাল, দন্তী, শঙ্খিনী ও সপ্তলা—এই সকলের চূর্ণ সমান ভাগে নিয়ে রাত্রিতে গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবসে সূর্য্যতাপে উদ্ধার করিবে। এই নিয়মে শত ভাবনা দিতে হবে। আর মনসার আঠাও এই রকম নিয়মে সাত দিন ভাবনা দিতে হবে। তার পর সুগন্ধ ফুলের মালাতে এই সমস্ত ওষুদ মাখাবে। শরীর বস্ত্র দ্বারা আবৃত ক'রে এই মালার আঘ্রাণ নিলে মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির সুখে বিরেচন হয়।

ডাঃ। চমৎকার ঔষধ প্রয়োগ বটে। আরও কি রকম প্রয়োগের নিয়ম আছে বলুন। শুনতে কৌতূহল হচ্ছে।

ক। রোগী যা'তে বিনা কষ্টে ওষুদ খেতে পারে, তা'র জন্যে নানাপ্রকার কল্পনা আছে। দুগ্ধের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে, শুষ্ক মৎস্য ও শুষ্ক মাংসের সঙ্গে, সরবতের সঙ্গে, সুরার সঙ্গে, আসবের সঙ্গে, অরিষ্টের সঙ্গে, আরও অনেক দ্রব্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার নিয়ম আছে।

ডাঃ। আচ্ছা বমনকারক ওষুদের কি এ রকম প্রয়োগ নাই?

ক। আছে বৈকি। বিরেচন ঔষধের কল্পনাও যত রকম, বমনকারক ঔষধের কল্পনাও প্রায় তত রকম। বমনকারক ঔষধ ফুলের মালায় মাখিবে, সেই মালা শুঁকিয়েও বমন করা'বার নিয়ম আছে।

ডাঃ। ঔষধ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ অদ্বিতীয় দেখ্‌ছি।

ক। এইটুকু শুনেই সে কথা ব'লবেনা না। বমন ও বিরেচনকারক ঔষধ সকলের কথা ব'লে পরে শাস্ত্রকার বলেছেন :—

"এই যে ছয় শত ঔষধের কথা বলা হইল, ইহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র। চিকিৎসক স্বীয় বুদ্ধি বলে এইরূপ সহস্র বা কোটী যোগ কল্পনা করিয়া লইবেন। দ্রব্যের কল্পনা বহুবিধ বলিয়া যোগ সকলের সংখ্যার সীমা নাই।

ডাঃ। তা' মশা'য়েরা নূতন কল্পনা করা দূরে থাকুক, যে ছয় শত প্রকার কল্পনা শাস্ত্র কারেরা ক'রে গেছেন, সে গুলিও বোধ হয় ভুলে গেছেন।

ক। হাঁ সে কৃতিত্ব টুকু আমাদের ঘ'টেছে বৈকি?

ডাঃ। বড়ই দুঃখের বিষয় কবিরাজ ম'শায়। তা' যাক, এখন বিরেচন সম্বন্ধে যদি আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে ত বলুন।

ক। পূর্ব্বে বমন বিরেচনের হীনযোগ, সম্যক যোগ ও অতি যোগের কথা ব'লেছি। তা' ছাড়া তীক্ষ্ণ, মধ্য ও মৃদু ভেদে বমন-বিরেচন তিন প্রকার। যে বমন, বিরেচন বা নিরূহ দ্রব্য প্রদত্ত হ'লে সত্বর তাহার ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, যাহা অত্যন্ত গ্লানিকর নহে, যাহা গুহ্যদেশ ও হৃদয়ে বেদনা জন্মায় না এবং যাহা অন্নাশয় থেকে সমস্ত দোষকে নিষ্কাশিত করে, সেই হ'ল তীক্ষ্ণ।

যে সকল ঔষধ জল, অগ্নি ও কীট দ্বারা দূষিত নয়, উপযুক্ত স্থান থেকে উপযুক্ত কালে গৃহীত, তুল্যবীর্য্য ঔষধ দ্বারা ভাবিত এবং অপেক্ষা কৃত অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত—সেই ঔষধ স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক'রলে তীক্ষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

যে সকল ঔষধ ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন গুণ বিশিষ্ট এবং পূর্ব্বাপেক্ষা হীন মাত্রায় প্রযুক্ত, সেই সকল ঔষধ স্নিগ্ধগুণ ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক'রলে মধ্যতা প্রাপ্ত হয়। আর যে ঔষধ মন্দবীর্য্য, অতুল্য বীর্য্য ঔষধ দ্বারা ভাবিত, অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত, সেই ঔষধ রুক্ষ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করলে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়।

মধ্য ও মৃদুবীর্য্য ঔষধ বলবান ব্যক্তিদের সমস্ত দোষ হরণ ক'রতে পারে না ব'লে, তা'দের সম্যক্ শোধন হয় না। এই জন্য বলবান ব্যক্তিদের তীক্ষ্ণ এবং মধ্যবান ও হীনবান ব্যক্তিদের মধ্য ও মৃদু ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়।

আবার যে সকল রোগে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা তীক্ষ্ণ ব্যাধি, যাহাতে মধ্যম লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা মধ্যব্যাধি, আর যাহাতে অল্প লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা মৃদু ব্যাধি। ব্যাধির বল বুঝিয়া তীক্ষ্ণব্যাধিতে তীক্ষ্ণ ঔষধ, মধ্যম ব্যাধিতে মধ্যম ঔষধ

এবং মৃদু ব্যাধিতে মৃদু ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। ঔষধ সংগ্রহের উপযুক্ত দেশ সকল যাহা এর আগে ব'লছিলেন, সেটা আবার কি?

ক। যে ঋতুতে যে ঔষধির যে অঙ্গ (যেমন ফল পুষ্প, আটা) সম্যক বীর্য্যশালী হয়, সেই ঋতুতে তাহা সংগ্রহ ক'রতে হয়। আবার বল্মীক, ক্ষার, মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ঔষধ জন্মায়—সেগুলি পূর্ণবীর্য্য হয় না ব'লে, সেই সকল ঔষধি গ্রাহ্য নয়।

ডাঃ। বুঝেছি, তা'র পর বলুন।

ক। বমন বা বিরেচন জন্য প্রদত্ত ঔষধ যদি দোষ সকলকে বহির্গত না ক'রে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তা' হলে বিজ্ঞ চিকিৎসক পুনরায় ঐ ঔষধ সেবন করা'বেন!

যে ব্যক্তি দীপ্তাগ্নি, বহু দোষযুক্ত ও দৃঢ়, স্নেহ গুণ বিশিষ্ট তাহাদের দুঃশোধ্য। ইহাদিগকে পূর্ব্ব দিন দোষের উৎক্লিন্নকারক দ্রব্যাদি ভোজন করাইবার পর দিন পুনরায় ঔষধ পান করাইবে। যাহারা দুর্ব্বল ও বহু দোষযুক্ত এবং যাহাদের দোষের পরিপাক হইয়া বিরেচন হয়, তাহাদের ভোজ্য ও রসাদির সহিত ঔষধ সেবন করাইতে হয়?

দুর্ব্বল ও অল্প দোষান্বিত রোগীকে এবং যাহাকে পূর্ব্বে সংশোধন ঔষধ সেবন করান হ'য়েছে—এরূপ ব্যক্তিকে মৃদু ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কেননা মৃদু ঔষধ বারংবার প্রয়োগ ক'রলেও কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ সহসা প্রযোগ করা উচিত নয়। কারণ তাহাতে শীঘ্র প্রাণ সংশয় হ'য়ে উঠতে পারে।

দোষের বিবদ্ধতা হেতু বমন বা বিরেচন ঔষধ দ্বারা যদি বিলম্বে অল্প দোষ নির্গত হয়—তবে গরম জল পান করান উচিত। ইহাতে আধ্মান (পেট ফাঁপা), পিপাসা, বমি ও দোষের বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

বমন বা বিরেচন ঔষধ যদি দোষ দ্বারা রুদ্ধ হয়ে ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিয়ে নির্গত না হয়, এবং উদ্গার ও উদরে শূলবৎ বেদনা হয়—তা' হ'লে স্বেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিরেচন ঔষধ সেবন ক'রে যদি সম্যক বিরেচন হওয়ার পরেও সেই বিরেচন ঔষধের গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠতে থাকে তাহা হ'লে রোগীকে বমন ক'রাবে, তা' না হ'লে অতিরিক্ত বিরেচন হ'বে। আর ঔষধ জীর্ণ হওয়ার পর যদি অতিরিক্ত বিরেচন হয়, তা' হ'লে বিরেচন বন্ধ ক'রবার জন্য শীতল জল পান ক'রা'বে।

ঔষধ কদাচিৎ শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিতে পারে। পরে শ্লেষ্মার ক্ষয় হলে সন্ধ্যাকালে বা রাত্রে আপনা হ'তেই নির্গত হয়। বিরেচন ঔষধ যথাযথ ভাবে প্রয়োগের পর যদি লালাস্রাব, গা বমি বমি বিষ্টম্ভ, পেটভার হয়ে থাকা ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্য কটু রসাদি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

সুস্নিগ্ধ ক্রূরকাষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন ঔষধ সেবন ক'রে যদি বিরেচন না হয়, তা' হ'লে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে স্বেদ জনিত শ্লেষ্মার বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

রুক্ষভোজী, নিয়ত পরিশ্রমী ও দীপ্তাগ্নি শক্তিদের সঞ্চিতদোষ সকল—শ্রমজনক কর্ম্ম বায়ু, আতপ ও অগ্নির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উহাদিগের বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্বে ভোজন) ও অজীর্ণ জনিত দোষ সকলও পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয়

প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ করিয়া কুপিত বায়ু হইতে রক্ষা করা উচিত। কারণ রুক্ষ ভোজন, পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে ইহাদিগের বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ইহাদের কোন বিশেষ ব্যাধি না হইলে বিরেচন করাইবে না।

ডাঃ। বিরেচন সম্বন্ধে সমস্ত বলা হ'য়েচে ?

ক। মোটামুটি প্রায় সবই বলা হ'য়েচে। কেবল শিরোবিরেচন বাকী রহিল। সেটা নস্য প্রসঙ্গে বলা যা'বে।

ডাঃ। তা' এই যদি আপনার মোটামুটি হয়, তা' হ'লে বিস্তারিত না জানি কি ব্যাপার !

ক। ব'লেছি ত সে বিস্তারিত ব'লতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে। প্রথমতঃ সে সকল কথা আরও ভাল ক'রে বোঝাবার জন্যে অনেক কথা বলা আবশ্যক। যেমন দাস্ত না হ'লে স্বেদ দেবে। এ কথাটা ভাল ক'রে বোঝাতে হ'লে কি স্বেদ দেবে, কোথায় দেবে কতক্ষণ দেবে—এ সব কথা ব'লতে হয়। আর বমন বিরেচনের নানা প্রকার যোগ, নানা প্রকার স্নেহের কল্পনা, স্নেহ পাকের নিয়ম, ঔষধ সংগ্রহ বিধি, আরও কত বিষয় ব'লবার আবশ্যক হয়। কাজেই যা' ব'ললাম—তা' মোটামুটি বৈ কি।

ডাঃ। আচ্ছা বিরেচন তো বলা হ'ল, এখন বস্তির কথা বলুন।

ক। আপনি কি এক দিনেই সব শিখ্‌তে চান ?

ডাঃ। তা'তে ক্ষতি কি ?

ক। না, ক্ষতি কিছু নাই, তবে লোকে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়। আর আপনি কি একদিনেই হবেন ?

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।)

আগন্তুক। এই যে কবিরাজ ম'শায়! আমি আপনার বাসায় খুঁজে এখানে আসছি।

ক। ব্যাপার কি ?

আগন্তুক। আমার ছোট ভাই জোলাপের ওষুধ খেয়েছিল। তা' দাস্ত হয়নি, ভয়ানক যন্ত্রণা হ'চ্চে। তা' আপনি চলুন, ডাক্তার বাবুকেও যেতে হবে।

ক। (ডাক্তারের প্রতি) চলুন, আপনার পিচকারী দেবার সরঞ্জাম সঙ্গে নিন।

ডাঃ। যা' আলোচনা করা হচ্ছিল, সেটা দু'জনে একত্রে প্রত্যক্ষ ক'রবার বেশ সুযোগ ঘটেছে।

আগন্তুক। আজ্ঞে আপনাদের পক্ষে সুযোগ বটে, কিন্তু আমার পক্ষে বিষম গোলযোগ। এখন আসুন।

(ক্রমশঃ)

ওয়ার ফিভার।

—:০:—

বিগত কার্ত্তিক মাসের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রে "ওয়ার ফিভার" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছি, সুতরাং ইহাকে উহার দ্বিতীয় প্রবন্ধও বলা যায়। দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে ওয়ার ফিভারের ছায়া, কায়া, সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া একবারে ইহা

সংহার মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। একটা বিষম প্রবল ঝড়ের মত দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রথমে যখন ওয়ার ফিভার আমাদের দেশে আসিয়াছিল, তখন আমাদের বড় বেশী শত্রুতা করিত না, অধুনা জ্বরটা একবারে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, আর রুদ্র মূর্ত্তিতে আমাদের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে। জ্বরের প্রকারটা আগেকার অপেক্ষা বহু প্রকারে বিভিন্ন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় সামান্যই দেখা যায়।

প্রথমে যেমন করিয়া জ্বর আসিত, এখনও তেমন করিয়াই আসে, তবে মূর্ত্তিটা মারাত্মক। আগেও কফ, কাস, গা বেদনাটাকে সঙ্গে লইয়া আসিত, এখনও তা'রাই তা'দের সহায়, বডি গার্ড; অধিকন্তু নিউমোনিয়া নামক উগ্র সিপাহী রোগীর দেহে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিউমোনিয়া হইলে রোগী প্রায় বাঁচান যায় না। যাহাদের নিউমোনিয়া প্রথমে হয় নাই, সামান্য কারণেই তাহাদের নিউমোনিয়া হইবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। তাহা হইলে রোগীকে বাঁচানর বড় সম্ভাবনা থাকে না। নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীকে এই সময় কোন চিকিৎসক ভাল করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। রোগীর বিলক্ষণ কফ থাকে এবং তাহা দুর্গন্ধময়। কোন্ প্রকার চিকিৎসা যে এ সম্বন্ধে কার্য্যকারী, তাহাও এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। আমি যে সকল রোগী দেখিয়াছি, তাহাদিগকে ঔষধ দিলে সাময়িক উপদ্রবগুলি কমিয়া থাকে, কিন্তু ব্যারামের শেষ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। সব রোগীই যে মরিয়া যায় এমন নহে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল হইয়াও থাকে। যে সকল রোগী সাবধানে থাকে—তাহাদেরই অধিকাংশ ভাল হয়, আর যাহারা অসাবধান, শরীরে ঠাণ্ডা লাগায়; ভাত বা ঠাণ্ডা দ্রব্য খায় বা পান করে তাহাদের অবস্থাই গুরুতর হইয়া পড়ে। "সাবধানের মার নাই"—কথাটা এখানে অনেকটা খাটে। যাহাদের প্রথম অবস্থায়ই নিউমোনিয়া লইয়া জ্বরটা আসে, তাহাদের রক্ষার উপায় প্রায় দেখা যায় না।

জ্বর যখন হয়—তখন হইতেই সাবধানতা অবলম্বন দরকার। ঠাণ্ডা জল ও অন্ন পথ্য বর্জ্জন করিতে হইবে, ঠাণ্ডা বাতাস যাহাতে লাগিতে না পায় তাহার উপায় করিতে হইবে। যাহাদের জ্বর হয় নাই তাহাদের সকলকেও জল ফুটাইয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া পান করা উচিত। জল ফুটাইয়া লইলে জলে সংক্রামিত হইবার রোগ-বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে ভাল মানুষের রোগ হইবার আশঙ্কা অতি কম থাকে। আর প্রতিদিন গৃহে ধুপ ও গন্ধক পোড়ান উচিত, তাহাতে দূষিত বাষ্প পরিষ্কার হইয়া রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া দেয়। ওয়ার ফিভার যেখানে আরম্ভ হয়, তথাকার প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেই এই রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে, সুতরাং সকলেরই সতর্ক থাকা বিধেয়।

প্রথমতঃ ওয়ার ফিভারকে আমরা বড় ভয় করিতাম না, কারণ তখন মৃত্যুসংখ্যা প্রায়ই হইত না, কেবল ভোগই ছিল, এখন তা'র অন্যরূপ অবস্থা দেখিয়া দেশের লোক নিতান্ত আশঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের দেশের পল্লী গ্রামের লোক সমূহ বড় দরিদ্র, তা'দের রোগী-গুলি মাটীতে বিছানা করিয়া শুইয়া থাকে, ঘরে রীতিমত বেড়া নাই, তা' দিয়া হিম আসে ও ঠাণ্ডা লাগে। ওয়ার ফিভারের চিকিৎসকগণ বর্ত্তমান নাম দিয়াছেন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, যে নামই

হউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না। মারাত্মক অবস্থাটা এখনই খুবই। এই রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎগণ প্রায়ই স্বর্ণ সিন্দূর বা মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সাময়িক উপদ্রব সমূহ তাহাতে সময় সময় অনেকটা কমিয়া থাকে।* ইহার যতটা সংক্রামক অবস্থা, ততটা প্রবল পরাক্রান্ত ওলাউঠারও নাই। সেই জন্যই ইহাতে সর্ব্বদা বেশী সতর্ক থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহাদের জ্বর হয় নাই, তাঁহারাও ঠাণ্ডা লাগাইবেনা। এই জ্বরের জন্য দেশের মৃত্যুসংখ্যা বড় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা কলিকাতার মৃত্যুর হার দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অচিকিৎসায় বা বিনা শুশ্রুষায় বহু রোগী মারা পড়িতেছে। রীতিমত শুশ্রুষা পথ্য ও ঔষধ পড়িলে অনেকেই রক্ষা পাইতে পারেন। কাসের উপদ্রবে বাসক পাতার রস জ্বাল দিয়া মিশ্রির সঙ্গে খাইলে অনেক উপকার হয়। তাহার সঙ্গে আদা, গোলমরিচ, কাবাবচিনী প্রভৃতি দিলে ভাল হয়। এই জ্বরে মাথা গরম ও মাথা বেদনা হয়। সেইজন্য সেই সকল উপদ্রবের প্রতি চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। বুকটাকে গরম রাখিতে পারিলে নিউমোনিয়া আক্রমণ হইতে প্রায়ই রোগীকে রক্ষা করা যাইতে পারে। এই জ্বরে প্রায়ই দেখা যায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এমন কি ৩।৪ দিনেও একবার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। তজ্জন্য কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ দিয়া শরীরটাকে হাল্কা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সাবধান, যেন তীক্ষ্ণবীর্য্য জোলাপের ঔষধ দেওয়া না হয়। এখন শীতকাল, ঠাণ্ডার সময়, সুতরাং যে ঘরে রোগী থাকিবে সে ঘর গরম রাখিবার জন্য ঘরে আগুণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া হাতে পায়ে সেঁক দেওয়াও কর্ত্তব্য। অবস্থা বুঝিয়া বলকারক পথ্য দেওয়াও উচিত। জ্বর নির্দ্দোষ সারিয়া গেলে কয়দিন পর অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া অন্ন পথ্য দেওয়া ব্যবস্থা হইতে পারে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনেক স্থানেই টিনের ঘর, শীতকালে টিনের ঘর বড় ঠাণ্ডা, সুতরাং সে গৃহে রোগীকে না রাখিলেই ভাল হয়। বাধ্য হ'য়ে ঐরূপ গৃহে রাখিতে হইলে ঘরটাকে গরম রাখিতে হইবে। এই জ্বরে ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষাই অধিকতর কার্য্যকারী হয়। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ঘরে ঘরেই রোগী, কে কা'র শুশ্রূষা করে? সুতরাং ইহারই মধ্যে যাহা করিয়া উঠিতে পারা যায়—তাহার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই জ্বর সমগ্র দেশে অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যমের নিকট হইতে যেন পাশ লইয়া আসিয়াছে, যা'কে ধরিবে—তা'কে আর ছাড়িবে না—এইরূপই অবস্থা। যে গ্রামে বা পাড়ায় এই জ্বর আসিয়াছে, সেখানকার সমস্ত লোককেই সাবধান হইতে হইবে। নতুবা আর রক্ষা নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

———

* মকরধ্বজে শুধু সাময়িক উপদ্রব নহে,—উহার প্রয়োগে ঐ ব্যাধির বিলক্ষণ উপকারই হইয়া থাকে। আং সং।

সমর জ্বরের প্রতিষেধক আদা।

আদার সংস্কৃত নাম আর্দ্রক; বাঙ্গালা নাম আদা, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ডাক্তারী নাম Gingiber Officinale. ইংরেজীতে Ginger এবং হিন্দিতে আদরক্ বলে। আদা উদ্ভিদ বিশেষ; ইহার কন্দের নাম আদা। ইহা বাঙ্গালাদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। রৌদ্র ও গাছের ছায়া—উভয় স্থানেই ইহার আবাদ চলে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জমী উত্তমরূপে খুঁড়িয়া দেড় হাত অন্তর শ্রেণী কাটিবে এবং প্রতি শ্রেণীতে আধহাত অন্তর আদা পুঁতিয়া দিবে। বেশ এক পস্‌লা বৃষ্টির পর জমীতে আদা বসাইবে। গোড়ায় যাহাতে জল না দাঁড়ায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ছাই ও খোল আদার পক্ষে উত্তম সার। দোঁয়াশ মাটিই আদার উত্তম জমি। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আদার গোড়া হইতে কতক আদা ভাঙ্গিয়া লওয়া চলে এবং পরে মাটী চাপা দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ মাসে পাতা শুকাইয়া গেলে সকল আদা মাটী হইতে উঠাইবে। আদা ইয়ুরোপে প্রচুর পরিমানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পরিপুষ্টক আর্দ্রককন্দ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া কৃষকেরা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ছাল তুলিয়া ফেলে। ইহা রৌদ্রে ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া লইলেই শুঁঠ প্রস্তুত হয়। উত্তম শুঁঠ দেখিতে শুভ্রবর্ণ এবং বহু দিন অবিকৃত থাকে। পাটনাতে বিস্তর আদা জন্মে এবং বঙ্গে পাটনাইশুঁঠই সাধারণতঃ বাজারে বিক্রীত হয়।

মাত্রা সরস অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা; চূর্ণ ／০ আনা হইতে ।০ আনা ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে হয়।

এই বৎসর (১৩২৫ সন) কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে, এমন কি গ্রামে-ঘরেও এক-প্রকার বহুব্যাপক নাশক সংক্রামক সর্দ্দি-জ্বর দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জ্বর "সমর জ্বর" বলিয়া কথিত। ভারতবর্ষে প্রথমতঃ বোম্বে প্রদেশেই এই রোগ দেখা দেয়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল সর্দ্দিজ্বরের মত নাক ও গলা শ্লেষ্মা পূর্ণ হয়, অত্যন্ত মাথা ধরে, ক্ষুধা মাত্রও থাকে না, শরীর ম্যাজম্যাজে ও দুর্ব্বল বোধ হয়। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বর দেখা দেয়, মূত্র রক্তবর্ণ হয়, শেষে বুকে সর্দ্দি বসিয়া স্থল বিশেষে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত করে। এ রোগ কলিকাতায় সংক্রামক রূপে দেখা দিলে তথায় আমরা যে বাটীতে ছিলাম, ঐ বাটীর সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হন এবং ৩।৪ দিন ভুগিয়া সকলে আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু কলিকাতার অন্যান্য স্থলে এই ব্যাধি এত সহজে আরোগ্য হয় নাই। এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ভীতিপ্রদ।

এই রোগের গৌণ কারণ যাহা হউক, মুখ্যতঃ কোন আগন্তুক বিষ গলা ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং পাকস্থালী আক্রমণ করিয়া বায়ু, পিত্ত এবং কফকে দূষিত করে। কফের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আকণ্ঠ আদার রসের কুলি দিবসে ৩।৪ বার এবং আদার রস ও মধু দিবসে ৩ বার এবং তুলসী পাতার রস মধু সন্ধ্যার পর ১ বার সেবন করা যায়, তাহা হইলে ব্যাধি নিশ্চয়ই প্রবল হইতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায়। জিঞ্জারেড ব্যবহার করাও মন্দ নহে, ইহাতে আদা আছে। গুরুতর আক্রমণেও এইরূপ চলিতে হইবে। আমি এ পর্য্যন্ত ৭৬ জন রোগীকে এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন দুষ্ট উপসর্গ দেখা দেয় নাই। সকলকেই ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। আদা খাদ্যরূপে আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ব্যবহারে কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। আদার রসের কুলি লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা বুক ও নাক হইতে সর্দ্দি কাটিতে থাকে, বেদনার হ্রাস হয় এবং সমর জ্বরের যাতনাও অনেকটা নিবৃত্ত হইয়া যায়, ক্রমে ক্ষুধা দেখা যায় ও রোগ আরোগ্য হয়। গ্রামঘরে সমর জ্বর দেখা দিলেই আহারের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব লবণ সেব্য। এইরূপে চলিয়া সমর জ্বরে আক্রান্ত হইতে আমরা কাহাকেও দেখি নাই। আদা ও তুলসী সমর জ্বরের প্রতিষেধক ও উত্তম ঔষধ। যতদূর পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে এই সত্যই প্রতিপাদিত হয়।

আদা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিস্তৃত অভিপ্রায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চক্রদত্ত মতে (১) আদার রসে সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিবে, পুনঃ পুনঃ থুঁথু ফেলিবে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বরে বুকের, গলার ও কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া লঘুতা জন্মে। (জ্বর, চিঃ) (২) অতিসার রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে পিষ্ট-আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থল আদার রসে পূর্ণ করিবে; ইহা অতিসার রোগীর পক্ষে অতিশয় হিতকর। (অতিসার চিঃ) (৩) শুঁঠ কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া গ্রহণী রোগে সেব্য; ইহা বায়ুর অনুলোমক (গ্রহণী চিঃ) (৪) ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব লবণ সেব্য। (অগ্নিমান্দ্য চিঃ) (৫) নূতন সর্দ্দি ও শ্বাসকাশে আদার রস ও মধু সেব্য। (কাস চিঃ) (৬) আমবাত রোগী কাঁজির সহিত শুঁঠ চূর্ণ পান করিবে। (আমবাত চিঃ) (৭) হৃদরোগ ও কাস আদির পক্ষে শুঁঠের ক্বাথ গরম গরম পান হিতকর। (হৃদরোগ চিঃ) (৮) তীব্র শিরোবেদনায় গব্যদুগ্ধের সহি শুঁঠ-চূর্ণ নস্য লইবে। (শিরোরোগ চিঃ)।

শার্ঙ্গধর মতে (১) শুঁঠচূর্ণে গব্যঘৃত মাখাইয়া এড়ণ্ডপত্র বেষ্টন পূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবনে আমাতিসারের বেদনা দূর হয়। (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ) (২) শুঁঠচূর্ণ এড়ণ্ডমূলের রসে সিক্ত করিয়া পিণ্ডাকার করতঃ এড়ণ্ডপত্র দ্বারা আবৃত ও মাটীর প্রলেপ দিয়া পুটপাক করিবে। ইহার রস মধুসহ পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয়। (দ্বিঃ খঃ ১অঃ)।

ভাবপ্রকাশ মতে (১) পীতপুষ্পবেড়েলা মূলের ছাল ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ২।৩ দিন এই ক্বাথ পান করিলে শীতকম্প-দাহযুক্ত বিষম-জ্বর নষ্ট হয়। (মঃ খঃ ২ভা) (৪) সার্জ্জিকাক্ষার ও

আদা সমভাগে গুল্মরোগে সেব্য। (মঃ খঃ ৩ভাঃ)

চরক মতে (১) আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে উদর রোগে সেব্য। (চিঃ ১৮ অঃ) (২) গরম জলের সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিলে আম বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৯ অঃ) (৩) পুরাণ গুড় ও আদা তুল্যভাগে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ ১ মাস সেবন করিবে, এই সময়ে দুগ্ধের সহিত অন্ন পথ্য ব্যবস্থেয়। শোথরোগে ও শ্বাসের পক্ষে এই ঔষধ হিতকর। (চিঃ) ১৭ অঃ) (৪) ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠচূর্ণ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্ন ত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ পান বলারোগ্যপ্রদ। (চিঃ ১৬ অঃ) (৫) বালা ও শুঁঠ সমভাগে ক্বাথ প্রস্তত করিয়া অতিসারে সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসারহর।

দ্রব্যগুণ হিসাবে আদা—ভেদক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকারক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষবাত ও কফনাশক। শুঁঠে যে সমস্ত গুণ, প্রায় সমস্তই আদাতে আছে। শুঁঠের গুণ যথা—রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক, বলকারক এবং স্বরবর্দ্ধক। আগ্নেয় গুণ হেতু শুঁঠ আভ্যন্তরীণ জলীয়াংশ শোষণ করতঃ মল পদার্থ সংগ্রহ করে এই হেতু শুঁঠ গ্রাহী।

'ঢাকা প্রকাশে'—

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ।

মকরধ্বজের অনুপান বিধি।

—:০:—

সর্ব্বজন শুন শুন, মকরধ্বজের গুণ,
যে রোগেতে যাহা অনুপান।
আদা মধু সর্দ্দি জ্বরে, তুলসীর পত্র পরে,
স্বল্পকাসি সারে দিলে পান॥
দাহ, পিপাসা কারণ, রোগী ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ,
—সে সময় পটোল বেদানা।
মধু আর বেলপাতা, আশ্চর্য্য এর ক্ষমতা,
শান্তি পায় জ্বর ও বেদনা॥
মৌরী ও শ্বেত চন্দন, ইহাতে সারে বমন,
শশা বীজ, কুল আঁটি শাঁসে।
চাউল ধৌত জলে, অজীর্ণে সুফল ফলে,
জাম ছালে অতিসার নাশে॥
হইলে হে নাড়ীক্ষয়, দেখে সবে পায় ভয়,
সে সময় কর্পূরের জল।
আর দিলে আদা তা'তে, মঙ্গলময় কৃপাতে,
অত্যাশ্চর্য্য জানিবেক ফল॥
ভস্ম ময়ূরের পুচ্ছ—হিক্কাকে করয়ে তুচ্ছ,
পুনঃ পুনঃ ইহা ব্যবহারে।
শিথিল হইলে গাত্র, মৃগনাভি একমাত্র,
ঘোর সান্নিপাতিক বিকারে॥
কদলী মুলের রস করিলে সেবন।
হিক্কা ভয় দূর হয় শুন সর্ব্ব জন॥
মকরধ্বজের সহ কচিতাল জল,
মিশা'য়ে সেবিলে হয় হিক্কা রোগে ফল॥

ভিজান মুড়ির জল পরম সহায়।
থোড়ের রস ও চিনি হরে হিক্কা রোগ ভয়॥
গুলঞ্চ সিউলি পাতা, মধু ও পলতা লতা,
পুরাতন জ্বর নিবারক।
যদি কা'র থাকে কাসি, তাহাকে কহি প্রকাশি
—উপকারী পিঁপুল বাসক॥
থাকিলে উদরাময়, না করিহ কোন ভয়,
আল্‌কুশী সহ ভদ্র মূল;
অথবা বিট লবণ, যমানী সহ সেবন,—
করিলে হে যায় আমশূল॥
শ্বেত পুনর্নবা রস, শোথ রোগী এর বশ,
হ'য়ে থাক পাবে পরিত্রাণ।
পটোল আর বেদানা, ইহাদের গুণপণা,
শীঘ্র সারে উদর আধ্মান॥
ধাইফুল, মোচরস রক্ত আমাশয়।
পরমোপকারী ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
চিকি সুপারির রস আমরুলি রসে।
আমাশয় যায় দূরে দু' তিন দিবসে॥
রক্তনাইলের ফুল মৌরী ও চন্দন।
রক্ত আমাশয় এতে হয় নিবারণ॥
কুড়চি ও জায়ফল, রক্তআমে ফল,
বনমূলা পাতা আয়াপান।
মুথা ও কাঁচড়া দাম, ব্যবহারে অবিরাম,
রক্তরোধে ইহাই বিধান॥
হইলে রক্তাতিসার, মুথা ও দাড়িম পাতার,—
রস সহ করিবে সেবন।
আর অতি উপকারী, তণ্ডুল ধৌত বারি,
শুন শুন ওহে বিচক্ষণ॥
বেলপোড়া ইক্ষু চিনি, ইহাতে সারে গ্রহণী,
কিম্বা আমলকী ভিজা জলে।
মুথা, কর্পূর, খদির, এই অনুপানে ধীর,
ভীষণ গ্রহণী যায় চ'লে॥
আমলকী পদ্মমূল, যষ্টিমধু ধাইফুল,
ইহা শীঘ্র তৃষ্ণা নিবারক।
যজ্ঞ ডুমুরের রস, দ্রাক্ষা ও অম্লবেতস,
মুখ শুষ্ক—পিপাসা নাশক॥
মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, ভীষণ বাত,
মকরধ্বজেতে উপকার।
প্রমেহেতে পুঁজ পড়া, যজ্ঞ ডুমুরের গুঁড়া,
ব্যবহারে হয় প্রতিকার॥
গঁদ ও ইসবগুল প্রমেহ করে নির্ম্মূল,
কাঁচা হলুদ ও আমলকী।
কাঁকুড় বীজের শাঁস, মূত্রকৃচ্ছ্র করে নাশ,
মৃদু বিরেচনে হরীতকী॥
কাবাব চিনির গুঁড়া শ্রেষ্ঠ স্বপ্নভঙ্গে।
সেবিলে শয়ন কালে মধু দিয়ে সঙ্গে॥
যৌবনে প্রধান রোগ শুক্রের তারল্য।
তালমূলী রসে যায় ইহার প্রাবল্য॥
রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ভীতিপ্রদ কাসে,
সতত কাতর রোগী পড়ি মহা ত্রাসে,—
আলতা ভিজান জল মধু দিয়া তা'তে।
ফটকিরি গুঁড়া সহ সেবিবেক প্রাতে॥
যজ্ঞডুমুরের রস এক তোলা ল'বে।
মধু দিবে অর্দ্ধ তোলা সেবিবেক সবে॥
কামিনী ফুলের পাতা লবে রস করি।
সেবিবে মকরধ্বজ বিষ্ণুনামস্মরি॥
বাসক পাতার রসে সারে রক্ত পিত্ত।
ভগবান পাদ পদ্মে রেখো রোগীচিত্ত॥

শ্রীতারিণীচরণ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

রক্ত মোক্ষণ।

—:o:—

Blood Letting.

রক্ত মোক্ষণ দুই প্রকার। (১) সার্ব্বাঙ্গিক (genarel) এবং (২) স্থানিক (Local)।

সার্ব্বাঙ্গিক রক্তমোক্ষণ দুই প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে,—(১) শিরচ্ছেদন (venesection) ও (২) কোন ধমনীচ্ছেদন (Artteristoiny)। প্রথমোক্ত প্রণালী ডাক্তারী মতে সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে। যতটুকু রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে, রোগীর বয়স, অবস্থা ও রোগের প্রকোপ অনুসারে তাহা স্থির করা আবশ্যক। এরূপ অবস্থায় নাড়ীর অবস্থা আমাদের প্রধান নিদর্শন। নাড়ী যতক্ষণ কঠিন থাকে, ততক্ষণ রক্ত মোক্ষণ করা যাইতে পারে এবং তাহা কোমল হওয়া মাত্র নিবৃত্ত হওয়া উচিত। নতুবা শোণিত ক্ষয়ে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা।

স্থানিক (Local) রক্ত মোক্ষণ ও দুই প্রকার (১) জোঁক বসান (Leeching) এবং (২) যন্ত্র দ্বারা রক্ত চোষণ (cupping)।

১। জোঁক বসান। প্রথমতঃ একটি পাত্রে একসের পরিমাণ জল রাখিয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে জলৌকা নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলে উহা স্বয়ং লালা ত্যাগ করিতে থাকিবে। সেই লালাহীন জলৌকা রক্তমোক্ষণ কার্য্যে প্রশস্ত। যে স্থানে জোঁক বসাইতে হইবে, সেই স্থান ধৌত করিয়া মুছিয়া ফেলিবে। এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা জলৌকা ধরিয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে। সহজে না ধরিলে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, মাখন বা রক্ত ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে। চিত্র জলৌকা সচরাচর এক হইতে দুই ড্রাম এবং দেশীয় জলৌকা এক হইতে তিন ড্রাম রক্ত শোষণ করে। প্রায়ই ১৫ ২০ মিনিটের মধ্যে জলৌকা পড়িয়া যায়। যদি শীঘ্র ছাড়াইবার প্রয়োজন হয়, তবে একটু তামাকের জল বা লুণের জল দিলেই খুলিয়া পড়িবে। হুঁকার কটু জল অথবা চূণের জল দিলেও খুলিতে পারে। জোঁক কোন মতেই টানিয়া খুলিবে না। ইহার পর যদি আরও রক্ত মোক্ষণ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত দষ্ট স্থানে উষ্ণ জলের সেঁক দিবে এবং চোষণাদি করিবে। যদি জোঁক ধরার স্থান হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে কিঞ্চিৎ তূলা ঐ স্থানে টিপিয়া ধরিলেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে অথবা অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে ফট্‌কিরী চূর্ণ কিম্বা তাহার গাঢ় দ্রব লাগাইলে সহজেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তারী মতে acid tanic, nitrit of silver অথবা Tr. Steel প্রয়োগে সহজেই রক্ত বন্ধ হয়। মলদ্বারে, গলমধ্যে ও জরায়ু, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে রক্ত মোক্ষণের আবশ্যক হইলে উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে জলৌকা প্রয়োগ করিতে হয়; কেননা, সামান্য কারণে ঐ সকল গহ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এরূপ হইলে লবণ জল কিম্বা হুঁকার কটু জল

প্রয়োজন মত পান করিতে দিবে অথবা পিচ্‌-কারী দ্বারা অন্তঃক্ষেপ করিবে।

২। যন্ত্র দ্বারা রক্ত চোষণ (cupping) দুই প্রকার; (১) আর্দ্র (moist) ও (২) শুষ্ক (dry)। moist cupping ডাক্তারী মতে নিম্নোক্ত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্কারিফিকেটর নামক যন্ত্র দ্বারা প্রদাহ স্থান কর্ত্তন করিবে। এবং একটি কাঁচের বাটির অভ্যন্তর প্রদেশে তুলি দ্বারা স্পিরিট (Spirit) লাগাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে। অগ্নি প্রজ্জলিত হইবা মাত্র কর্ত্তিত স্থানে তাহা বসাইবে। ইহাতে বাটির অভ্যন্তর বায়ুশূন্য হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা উক্ত স্থানের ত্বক আকৃষ্ট ও স্ফীত হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নিঃসৃত হইয়া যায়।

Dry cupping অস্ত্র দ্বারা অথবা অন্যরূপে চর্ম্ম না চিরিয়া ঐরূপে বাটি বসাইবে। ইহাতে শোণিত নিঃসৃত না হইলেও বাটির নিম্নস্থ ত্বকের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়; তাহাতে আভ্যন্তরীণ রক্তাধিক্য কমিয়া যায়।

আময়িক প্রয়োগ;—বলিষ্ঠ ও যুবকদিগের ফুস্‌ফুস্‌ ও মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি, হৃৎপিণ্ডাবরক স্বরযন্ত্র ও মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ এবং সন্ন্যাস, গাউট, স্থানিক চর্ম্ম প্রদাহ প্রভৃতি অবস্থায় সার্ব্বাঙ্গিক ও স্থানিক রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক।

কোন কারণে শরীর হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অল্লাধিক পরিমাণে সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু কোন প্রদাহিত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইলে তথাকার প্রদাহ কমিয়া আসে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ প্রায়ই রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিতেন। সুশ্রুতে রক্ত মোক্ষণ প্রণালী অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি কালের কুটিল চক্রে আজকাল এই প্রথা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অদ্যাপি আমাদের ময়মনসিংহ জেলার স্থানে স্থানে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ইহার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বাঁশের চোঙ শিঙ্গা, বিল্ব প্রভৃতির সাহায্যে আশ্চর্য্য উপায়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিল্ব দ্বারা রক্তমোক্ষণ প্রণালীই সহজ ও সুফল প্রদ। আমি অনেক স্থলে ইহার অসীম উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য সহজ উপায়টিই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একটি ছোট সুগোল অথচ সুপক্ক বিল্ব—কপিত্থক হইলেই ভাল হয় সংগ্রহ করিয়া তাহার মুখ সামান্য পরিমাণে কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং সেই কর্ত্তিত বিল্বকে জলে উত্তম রূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ভাবে বিল্বের মধ্যস্থিত পদার্থ গলিয়া গেলে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। পরিষ্কৃত বিল্বটি রৌদ্রোত্তাপে শুষ্ক করিয়া এক খণ্ড ফ্লানেল অথবা অন্য কোন গরম কাপড় দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক আলমারীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে—যেন তাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে।

কাকিলা মৎস্যের ঠোঁট দ্বারা প্রদাহিত স্থান পাচিয়া লইতে হইবে। পরে উক্ত বিল্বের অভ্যন্তর ভাগে স্পিরিট লাগাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নি প্রজ্জলিত হইবামাত্র উহা প্রদাহিত স্থানে জোরে বসাইয়া দিবে হইবে, স্পিরিট না পাইলে কেরোসিন দ্বারায় বিল্বের অভ্যন্তর প্রলিপ্ত করিলেও চলে। তবে স্পিরিট দিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহাতে বিল্বের অভ্যন্তর ভাগ বায়ুশূন্য হইয়া ত্বক্‌কে আকৃষ্ট করিয়া দূষিত রক্ত নির্গত করিয়া

ফেলে। যে পর্য্যন্ত দূষিত রক্তে বিম্বের অভ্যন্তর পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত বিম্ব পতিত হয় না। পরে পরিমাণ মত রক্ত নির্গত হইয়া গেলেই বিম্ব আপনাপনিই খুলিয়া পড়িয়া যায়। তবে প্রদাহ বেশী হইলে কদাচিৎ ২।১ দিন পরেও পুনরায় উপরোক্ত নিয়মে রক্ত চোষণ করিতে হয়।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর লোহ।

বসন্তে মুষ্টিযোগ।

বসন্তে রস প্রয়োগ। শোধিত গন্ধক দুই ভাগ ও শোধিত রস এক ভাগ লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, তাহা যথোপযুক্ত মাত্রায় পানের রস সহ সেবন করাইলে, বসন্তের প্রতীকার হইয়া থাকে।

বসন্তে দাহ নিবারণ। বসন্ত রোগ নিবন্ধন শরীরে দাহ উপস্থিত হইলে, বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, দাহের শান্তি হইবে। অধিকন্তু এই মধু মিশ্রিত জল পান দ্বারা বসন্ত রোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

কায় শোধন। চালিতার ছাল দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া লইয়া ঐ জল দ্বারা শরীর ধৌত করিলে বসন্তের ক্লেশ বিদূরিত হইবে। পাচন প্রস্তুতের নিয়মে পূর্ব্ব দিন কষায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া পরদিনে উহা ব্যবহার করাইতে হয়। এইরূপ ক্বাথকেই আয়ুর্ব্বেদে শীতকষায় বলা হইয়াছে। এ স্থলে ধৌত করিবার জন্য ষড়ঙ্গপানীয় বিধানেই শীত কষায় প্রস্তুত করা বিহিত।

ধূপ। বচ, বাঁশের নেলি, যব, বাসক মূলের ছাল, কার্পাস বীজ ব্রাহ্মী শাক, তুলসীপাতা, আপাং বীজ, লঙ্কা ও ঘৃত সংযোগে ধূপ প্রদান করিলে, সকল প্রকার বসন্ত ও অন্যবিধ ব্রণ রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে এ স্থলে ধূম দ্রব্যের সহিত বিষ প্রদান করাও কর্ত্তব্য, কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, বসন্ত রোগের কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারে বিষের সম্পর্ক রাখা, জীবনের পক্ষে হিতজনক নহে।

কষায় (পাচন) নিম্বাদি। নিমছাল, ক্ষেতপাঁপড়া, আকনাদি, কটকি, পলতা, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, ও শ্বেতচন্দন;—এই দ্রব্যগুলি যথোপযুক্ত মাত্রায় সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, উহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, জ্বর ও বিসর্পযুক্ত ত্রিদোষজাত বসন্ত রোগেরও শান্তি হইয়া থাকে। বসন্তের গুটি বসিয়া গেলে, এই পাচন ব্যবহারে তাহা পুনরায় বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পাচনটি সকল প্রকার বসন্তের বিশেষ ফলপ্রদ।

পটোলাদি। পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, ধনে, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কটকি ও ক্ষেতপাঁপড়া—এই সকলের মিলিত ক্বাথে, কি আম

অথবা কি পক্ক, সকল প্রকার বসন্তেরই উপশম হইয়া থাকে ; অধিকন্তু জর ও-বিস্ফোট প্রভৃতি এই কষায় সেবনে নিবারিত হয়।

শীঘ্র পাকাইবার উপায়। টাবালেবুর কেশর, কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই বসন্তের গুটিকাগুলি পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবারিত হয়।

পাদদাহ নিবারণ। পাদদ্বয়ে উৎপন্ন বসন্তগুলি অত্যন্তদাহ জন্মাইয়া থাকে, চেলেনি জলদ্বারা বারংবার পাধুইলে সেই দাহ নিবারিত হয়।

পক্কাবস্থায় ব্যবস্থা। বসন্তের পক্কাবস্থায় বায়ুর অতিশয় প্রকোপ হইয়া থাকে, এইজন্য বসন্তের এই অবস্থাতে বিশোষণ অর্থাৎ রুক্ষ ক্রিয়া করা কোন মতেই বসন্তরোগ পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক নহে, প্রত্যুত এইরূপ অবস্থাতে সংবৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই আতুরের জীবন কামনায় সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

পক্ক অবস্থাতে—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু; কিসমিস, ইক্ষু-মূল, ও দাড়িম ছালের ক্বাথে উপযুক্তরূপ ইক্ষু গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে শীঘ্র বসন্তের স্ফোটকগুলি পাকিয়া উঠে এবং বায়ুরও শান্তি হইয়া থাকে।

মাংসরস প্রয়োগ। বসন্তের পক্কাবস্থাতে রুক্ষক্রিয়ানিবন্ধন বায়ুর প্রকোপ হইয়া পড়িলে, সেই আতুরের শূল, আধ্মান (পেট ফাঁপা) ও কম্প প্রভৃতি বাতজাত উপদ্রবগুলি জন্মিয়া থাকে। এই অবস্থাতে চাতক ও তিতির প্রভৃতি পাখীর মাংসরস অল্প মাত্রায় সৈন্ধব সহযোগে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অরুচি। বসন্তরোগে অরুচি হইলে অম্ল দাড়িমের রসের সহিত যূষ পান করা উচিত। খয়ের এবং পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতল ক্বাথ পানেও অরুচি বিদূরিত হয়।

শৌচ। খয়ের কাষ্ঠ ও চালিতা ছালের দ্বারা ষড়ঙ্গপানীয় বিধানে অর্দ্ধেক জল শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত ক্বাথ, বসন্তরোগে শৌচ ক্রিয়ায় ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মুখ ও কণ্ঠরোগে। জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীকাঠ, আমলা ও যষ্টিমধু দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল অবস্থায় তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, মুখ ও কণ্ঠরোগে গণ্ডূষ ধারণ করিতে হইবে।

চক্ষুরোগে। গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু জলের সহিত বাটিয়া লইয়া বস্ত্র দ্বারা পুটুলি বাঁধিতে হইবে। ঐ পুঁটুলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেঁক দেওয়া কর্ত্তব্য।

যষ্টিমধু, হরীতকী আমলা, বহেড়া, সূচমুখী, দারুহরিদ্রা নীলোৎপল (সুঁদি) বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা—এই সকল দ্রব্য মিলিত ভাবে অথবা পৃথক ভাবে (এক একটির) যথাযথ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ বা ক্বাথ দ্বারা অভিষেক করিলে নয়নগত বসন্তের উপশম হয় এবং ফোড়া গলিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

পুঁয হইলে তাহার প্রতিকার। বসন্তের স্ফোটকে পুঁয হইলে বট, অশ্বত্থ, পাকুড় যজ্ঞডুমুর ও বকুলের ছাল চূর্ণ তাহাতে ব্যবহার করা বিধেয়। ঘুঁটের ছাই অথবা শুষ্ক গোবর চূর্ণ ও পূর্ব্বোক্তরূপে ক্লেদ নিবারণের জন্য প্রয়োগ করা বিহিত।

ক্রিমি নিবারণ। বসন্তের স্ফোটকে ক্রিমি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নিবারণের জন্য সরল, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতি

দ্বারা বেশ ধূম প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ ধূমের দ্বারা আতুরের বেদনা ও দাহের শান্তি হয় এবং পূঁয নির্গত হইয়া স্ফোটকগুলিও বিশুদ্ধ হয়; সুতরাং শীঘ্রই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

কণ্ঠশুদ্ধি। এই রোগে কণ্ঠে শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, পিঁপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। কণ্ঠশুদ্ধির জন্য অষ্টাঙ্গবলেহ অথবা আদার কবল করাও বিহিত।

স্নেহ প্রয়োগ। বসন্তরোগে পান, অভ্যঞ্জন ও ভোজ্য দ্রব্যের সহিত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবহার করা ব্যবস্থা। ব্রণরোগের জন্য যে সকল প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে, ইহাতে সে সকলও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা আবশ্যক। কিন্তু বসন্ত-রোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রাচীন ও প্রবীন বিচক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ আচার্য্যগণ সকলেই এক-বাক্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

'পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্॥

অধিকন্তু,—

'বাতং স্বেদং শ্রমং তৈলং গুর্ব্বন্নং ক্রোধমাতপম্।
কট্‌ম্লং বেগরোধঞ্চ মসূরিগদবাংস্ত্যজেৎ॥"

মসূরি পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি (বাহিরের) বাত বর্জ্জন করিবে; কোনরূপ স্বেদ (অগ্নির উত্তাপ) ও আতপ (রৌদ্র) গ্রহণ করিবে না; তৈল ব্যবহার করিবে না; গুরুপাক, কটু (ঝাল) বা অম্ল দ্রব্য আহার করিবে না; ক্রোধের বশীভূত হইবে না এবং মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

রক্তমোক্ষণ। বসন্তরোগে রক্তের বিকৃতি পরিলক্ষিত হইলে অবস্থা বিশেষে রক্তমোক্ষণ করাও বিহিত।

গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ। হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বেণারমূল, শিরীষপুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর;—উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া শরীরে মাখিলে বসন্তের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। এই প্রয়োগটির দ্বারা বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ ও গাত্র দৌর্গন্ধ প্রভৃতিও নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্য ও অপথ্য।

ভাবপ্রকাশ বলেন,—

'মসূরিকাসু ভুঞ্জীত শালীন্ মুদ্গমসূরিকান্।
রসং মধুরমেবাপ্যাৎ সৈন্ধবং চাল্পমাত্রকম্॥

বসন্তরোগে হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, মুগ ও মসূর ডাইল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ এবং উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবে।

অধিকন্তু বাত, পিত্ত ও কফের সংস্রব অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যাঙ্গগুলিও পথ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইলে, বসন্ত রোগের উপশম হইয়া থাকে।

পুরাতন যেটে ধান, আমনধান ও যব; ছোলা, মুগ ও মসূর ডাইল, প্রতুদ জাতীয় অর্থাৎ পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, জলকুক্কুট ও ডাহুক প্রভৃতির মাংস, করল্লা কাকরোল কাচকলা সজিনা ও পটোল তরকারি, কিসমিস ও ডালিম এবং এতদ্ভিন্ন মেধাবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক অন্ন ও পানীয় অন্যান্য দ্রব্য সমূহ, কুল ও মাংসরস, বসন্তরোগে সুপথ্য।

সংক্ষেপে বসন্তরোগের প্রতীকারকারক কতিপয় মুষ্টিযোগ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করার জন্য যত্ন করা গিয়াছে। ইহা দ্বারা মানবের জীবন রক্ষা হইলেই সেই প্রযত্নের সার্থকতা হইবে। "হিতবাদী"তে—

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ।
কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন। গত ২৬শে হইতে ২৯শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত দিল্লী নগরীতে নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন—৺কাশীধামের প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ন শাস্ত্রী। হাকিম আজমল খাঁ সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত খাপার্দ্দি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক আয়ুর্ব্বেদানুরাগী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৯শে জানুয়ারি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলেন যে, তিনি কলিকাতার তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই টাকায় তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ স্বরূপে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও একটি আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ গাছড়ার উদ্যান প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে এই সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ ও কয়েকটি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। আগামী বৎসর এই সম্মেলন ইন্দোরে হইবে স্থির হইয়াছে।

মারওয়ারি হাসপাতাল।—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সংপ্রতি একটি মারওয়ারি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। ইহার কার্য্যপ্রণালী ভাল ভাবে চলিতেছে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

কলিকাতার স্বাস্থ্য।—কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা হ্রাস পাইলেও এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। হাম-বসন্ত এবং কলেরাও আরম্ভ হইয়াছে। এ সময় সহরবাসীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য বিভাগ।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য ঔষধালয়ে এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী বহু সংখ্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। 'জ্বরের চা' নামক এক প্রকার নূতন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে এ রোগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ হইয়াছে। ইহা গরম জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া সেবন করিতে হয় এবং ইহার কার্য্যকারী শক্তি সত্বঃই বুঝা যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় বৈদ্যুতিক চিকিৎসা।—জোয়ারসন নামক একজন সুইডেন্ দেশীয় ডাক্তার তীব্র বৈদ্যুতিক তাপ সহযোগে স্পেন দেশীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়িত বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। এই তাপ প্রয়োগে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মোদ্গম হয় এবং তাহাতেই না কি এ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। এ চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই, আমরা উহা জানিবার জন্য উৎসুক থাকিলাম।

ম্যালেরিয়ার ঔষধ।—লাহোরের সিবিল মিলিটারি গেজেটে প্রকাশ—ইটালির জনৈক ডাক্তার ম্যালেরিয়ার এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ঔষধে এক সপ্তাহেই না কি ম্যালেরিয়া জ্বর সম্পূর্ণরূপে

আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙ্গালা দেশে ইহার পরীক্ষা করিলে হয় না ?

দোক্তায় মৃত্যু।—মেদিনীপুর-হিতৈষীতে প্রকাশ,—"কাঁথি মহকুমার বাহিরী গ্রামের এক ব্যক্তি কয়েক দিন হইল কাঁথি হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পানের দোকান হইতে পান ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করে। পানে দোক্তা দেওয়া ছিল। লোকটী পান খাইয়া কিছু পথ চলিয়া যাওয়ার পর তাহার মাথা এবং শরীর হইতে খুব ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। সে তখন কাঁপিতে থাকে। সে পথিপার্শ্বে পড়িয়া যায় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" দোকানের চারি খিলি পান এক পয়সায় কিনিয়া যাঁহারা চর্ব্বণসুখ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এ ঘটনায় তাঁহারা কিছু শিখিবেন কি ?

ইন্‌ফুলেঞ্জায় তামা।—২৪ পরগণা-গোবরডাঙ্গা হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরি পত্রান্তরে লিখিয়াছেন, "ডাক্তার সাল-জার, ওয়াটসন, হকিন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য ডাক্তারগণ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে তামার ব্যবহার দ্বারা কলেরা, ক্ষয়কাশ, অর্শ, পুরাতন উদরাময়, অতিসার মৃগী প্রভৃতি রোগ ভাল হয়! হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি কুপ্রম এই তামা হইতে প্রস্তুত। আয়ুর্ব্বেদে শোধিত তামার ব্যবহার খুব আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, যাহারা তামার খনিতে কাজ করে, তাহারা অনেক রোগের হাত হইতে রক্ষা পায়। বর্ত্তমান ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা রোগ যেখানে সংক্রামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে সকলকে তামার তাগা পরাইয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।"


B W
Syrup of
Vasaka

৩য় বর্ষ—৭ম সংখ্যা
চৈত্র, ১৩২৫

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

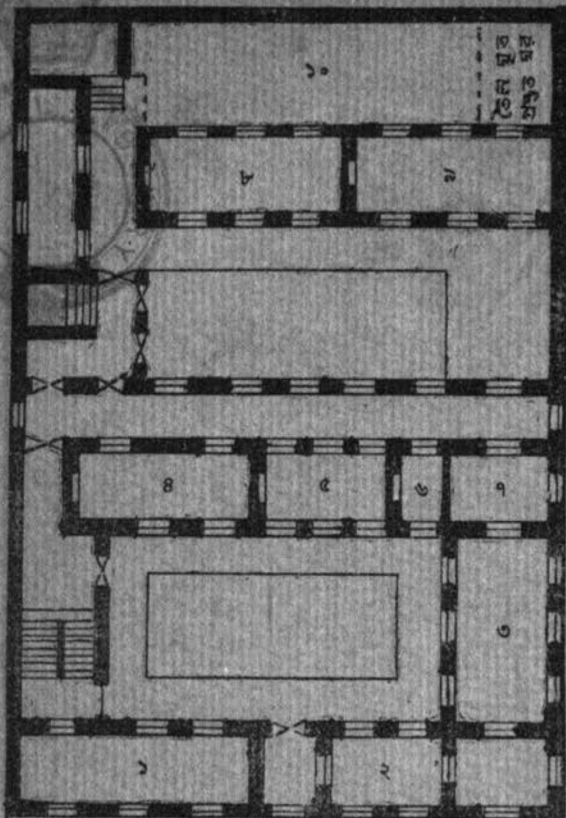


সম্পাদক—
কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯ কড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

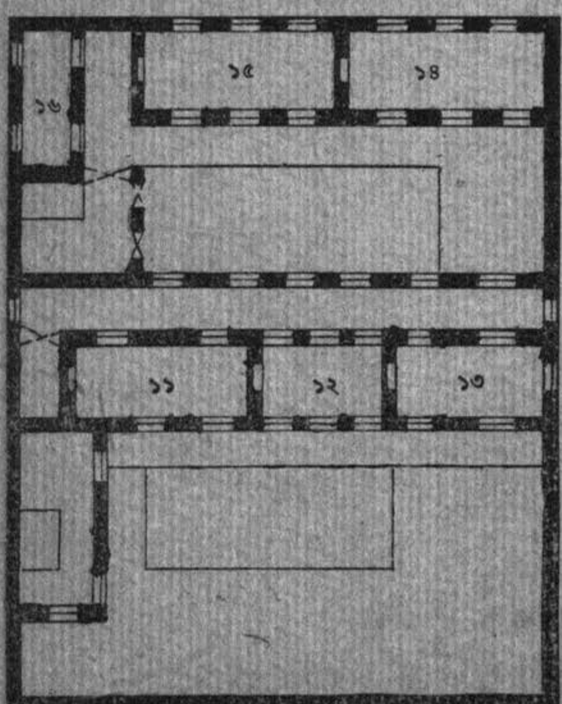
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। মাসিক বেতন ৩্ প্রবেশ ফি: ৫্ কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,এ, এম,বি, অধ্যক্ষ।

গ্রাহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

"আয়ুর্ব্বেদে"র তৃতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা চলিতেছে। যাঁহাদিগের নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহার মূল্য পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদের সকলেরই নামে আমরা ভিঃ পিঃ করিতেছি। সকলেই ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপনাপন মূল্য প্রদান করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

গ্রাহকবর্গই 'পত্রিকা'র জীবন। আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এ কথা স্মরণ রাখেন—ইহাই আমাদের সকরুণ প্রার্থনা। কার্য্যাধ্যক্ষ।

চৈত্রের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদে"র নিয়মাবলী।

"আয়ুর্ব্বেদের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৩৷৵০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয়। কেহ কোনো মাসের 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুবা পুনরায় মূল্য দিয়া সেই সংখ্যা লইতে হইবে।

আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, এজন্য যখনই ইহার গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ষের আশ্বিন হইতে ইহা লইতে হইবে।

কোনো বিষয়ের জন্য পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা সে পত্রের কোনো কার্য্য হয় না।

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।—এক বৎসরের চুক্তিতে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৷০ সিকি পৃষ্ঠা ২৸০ এবং অষ্টাংশ পৃষ্ঠা ১৷০ টাকা। কভারের বিজ্ঞাপনে প্রতি পেজ ১০৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩২৫—চৈত্র।	৭ম সংখ্যা।

আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য।

—:০:—

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

ধান্য-জাত খাদ্য।

[বিগত অগ্রহায়ণ মাসের "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রে—"শিশুর খাদ্যবিচার" ইতি নামধেয় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিবন্ধের মুখবন্ধে এ অধমের প্রতি একটু কটাক্ষ করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম্ এ মহোদয়—বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্, সুতরাং তাঁহার কথা আমার শিরোধার্য্য। তাঁহার আক্ষেপ—আমি অনেক কাগজেই অনেক প্রবন্ধ লিখি, কিন্তু কোনটাই শেষ করিতে পারিনা! অবশ্যই ইহা আমার দোষ, এ কথা ত অস্বীকার করা চলেনা। তিনি আমার অগ্রজতুল্য—ভক্তিভাজন, তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি ত আমার নাই। আমার আত্মপক্ষসমর্থনের কেবল একটী মাত্র কৈফিয়ৎ আছে—আমি সারস্বত মন্দিরের পূজারি নহি, স্বেচ্ছাসেবক মাত্র; স্বেচ্ছা সেবার দোষ—তাহার উপর বারমাস নির্ভর করা যায় না। আমার দুর্ভাগ্য—এমন সহজ সত্যটুকুও সতীশ বাবু ভুলিয়া গিয়াছেন!

কথনও স্বনামে পরিচয় দিয়া, কথনও বা ছদ্মনামের অন্তরালে থাকিয়া আমি ত আশৈশব মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই "নভেলী" যুগে, নভেল ছাড়া কাজের কথা ত বিকাইতে দেখিলাম না! মর্ম্মব্যথার সহৃদয় শ্রোতাও পাইলাম না! যে দেশে আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের স্বাস্থ্যনীতি অনধিকারীর ধিক্কার-বাণে ক্ষত বিক্ষত হইতে পারে, সে দেশে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির রচনাকে কেহ কি অভিনন্দিত করিতে পারে? বন্ধু বর্গের অনুরোধে অযোগ্য হইয়াও, কদাচিৎ সাদা কাগজে একটু কালীর আঁচড় দিয়া ফেলিয়াছি,—তাহা আমার প্রয়াসের পূর্ব্বাভাষ, তাহাকে পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব দিতে আমার

সাহসে কুলায় নাই। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালীর অতীত বিস্মৃতিময়, বর্ত্তমান অগ্নিজ্বালাময়, ভবিষ্যৎ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন! তাই নিজের জাতির সব ভুলিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে—"পুরাতন"কে কখন কখন "নবরাগ" দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমার চেষ্টার আদ্যন্তই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। চিতা-চুল্লীর অঙ্গার ঘাঁটিয়া হাত কাল করিয়াছি, তথাপি সে "বিষ্ণুপঞ্জর" খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল মনে হইয়াছে—এই সাহিত্যসেবাই আমার ভাগ্য-গগনের নষ্ট চন্দ্র, স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধফল; এই জন্যই আমার উদ্যমের শেষভাগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালী যদি কাজের কথা শুনিত, গুণের আদর করিত, তাহা হইলে কবিরাজ সত্য চরণের "ভৈষজ্য মণিমাণিক্যার" এতদিনে ৫টী সংস্করণ হইত। বিরজাচরণের "বনৌষধি দর্পণে" বহু সংসার প্রতিবিম্বিত হইত! বঙ্কুবিহারীর "জীবন চিত্র" গৃহে গৃহে বিরাজ করিত।

আমি সতীশ বাবুকে আশ্বাস দিতেছি—"জ্বর" নামক প্রবন্ধটী-পরিবর্ত্তিত হইয়া মদ্রচিত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের" অঙ্গীভূত হইয়াছে। "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য" গ্রন্থাকারে পাঠকবর্গের সঙ্গে পুনঃ সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অতঃপর আর কোন প্রবন্ধই "ক্রমশঃ"—ভাবে এ অকিঞ্চনের নাম স্বাক্ষরের বিশেষত্ব লইয়া মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইবে না।

চিপিটক বা চিঁড়া।

ধান্য হইতেই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোধ হয় বৌদ্ধ যুগেই ইহার প্রথম আবিষ্কার। বৈষ্ণবেরা ইহার বহুল প্রচলন করেন। ধান্যকে জলে ভিজাইতে হয়, তাহার পর খোলায় ভাজিতে ভাজিতে স্ফুটিত হইলে, ঢেঁকিতে ফেলিয়া ধীরে ধীরে 'পাড়' দিতে হয়। ঢেঁকির মুষলে—লৌহের বেষ্টনী থাকিলে চলিবে না। বঙ্গদেশে সূত্রধর জাতীয়া স্ত্রীলোকগণ—চিঁড়া প্রস্তুত করে।

চিঁড়া অত্যন্ত গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। অতিসার ও প্রবাহিকা রোগে—চিঁড়ার মণ্ড প্রয়োগ করিলে, বিরেচকের কার্য্য করে অর্থাৎ মল নিঃসরণ হয়। এইজন্য সাধারণের ধারণা—চিঁড়া ধারক, ইহাতে পেট আঁটিয়া যায়। চিঁড়া কিন্তু ধারক নহে। শরৎকালে চিঁড়া ও নারিকেল ভক্ষণ করিলে, পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য হইয়া থাকে, পিত্তজ বিষাক্ততার আশঙ্কা থাকে না।

চিঁড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, শর্করা সংযোগে পায়স প্রস্তুত করিতে হয়। এই পায়স—অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকারক, কামোদ্দীপক এবং বলকর। ইহা ক্রূরকোষ্ঠে জোলাপের কার্য্য করিতে পারে।

যদি উদরাময়পীড়িতব্যক্তিকে চিঁড়ার মণ্ড ব্যবস্থা কর,—তাহার রোগ বাড়িতে পারে। তবে—চিঁড়াকে ভাতের মত সিদ্ধ করিয়া, মাড় গালিয়া ফেলিয়া খাইতে দিলে, তাহা অপেক্ষাকৃত লঘুপাচ্য হয়।

চিঁড়াকে ঘৃত সংযোগে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণ ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিলে, বহুমূত্র রোগীর উপকার হয়। নবপ্রসূতা নারীকেও চিঁড়া ভাজা খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে জরায়ুর দোষ নষ্ট হয়। ভাজা চিঁড়া কফনাশক, সর্দ্দী, কাসি ও গাত্র বেদনায় উত্তম ফলপ্রদ। অধিকন্তু ইহা পিপাসা নিবারণ

করে, মুখ-গহ্বরের লালা নিঃসরণের সাহায্য করে, স্বাদগ্রহণের শক্তি বাড়াইয়া—অরুচি দূর করে।

খণ্ড চিপিটক।—আধপোয়া চিঁড়াকে শুষ্ক খোলায়, মৃদু উত্তাপে, বেশ করিয়া ভাজিবে। যখন চিঁড়ার বর্ণ বাদামের মত হইবে, তখন ঐ চিঁড়াকে হামানদিস্তায় ফেলিয়া গুঁড়া করিয়া লইবে। আধপোয়া চিনীতে ৵৷৷০ সের জল দিয়া আগুনে চড়াইবে। রস একটু চট্‌চটে হইলে তাহাতে চিঁড়াচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে ৪ রতি এলাচ চূর্ণ, ৪ রতি মরিচ চূর্ণ এবং ১ রতি কর্পূর নিক্ষেপ করিবে। ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য। অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকর মাংসবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়তর্পক। ক্ষয়রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

চিঁড়া সাধারণতঃ গুরুপাক—তাই ইহার নাম "পৃথুক"। চরকের সূত্র স্থানে—ভাজা চিঁড়া অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করিবার উপদেশ পাওয়া যায়।

ভৃষ্ট তণ্ডুল বা মুড়ি।

ইক্‌মিক্‌কুকারের আবিষ্কার কর্ত্তা অসাধারণ পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ৺ ইন্দুমাধব মল্লিক—বিলাতী বিষকুটের চেয়ে বাঙ্গালার মুড়ির প্রশংসা করিতেন। বাস্তবিক মুড়ি গৃহস্থের একটী সহজলভ্য সুলভ খাদ্য।

স্থূল ধান্যকে উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ও বাছিয়া লইয়া, অতি পরিষ্কার জলে ৩।৪ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ধান্যগুলিকে প্রয়োজনমত জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। এই সিদ্ধ ধান পরিষ্কার জলে একরাত্রি আবার ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন আবার তাহাকে সিদ্ধ করিবে। হাঁড়ি হইতে বাষ্প উথিত হইলে ধানগুলি নামাইয়া লইবে। এই ধান্যের নাম "দোভাবা" ধান। দোভাবা ধানকে রৌদ্রে শুকাইবে—যেন বেশী শুকাইয়া 'কট্‌কটে' না হয়। মধ্যম রূপ শুষ্ক হইলে, সেই ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম "মুড়ির চাল"। মুড়ির চাল রসযুক্ত থাকায় —বেশী দিন ঘরে রাখা উচিত নহে। যে ধান্য হইতে মুড়ির চাউল প্রস্তুত করিবে, সে ধান্য যেন নূতন না হয়। পুরাতন ধান্যই মুড়ির চাউল প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রশস্ত।

এইবার "মুড়ির চাউল" হইতে মুড়ি প্রস্তুত কর। মুড়ি ভাজিবার ৫।৭ ঘণ্টা পূর্ব্বে [১০।১২ ঘণ্টা পূর্ব্বে হইলেও ক্ষতি নাই] চাউল গুলি একবার বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে এবং তাহাতে কিছু লবণ মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। যদি চাউল গুলি বেশী শুকাইয়া গিয়াছে মনে হয়, তবে তাহাতে আর একটু জল মাখাইয়া লইবে। এই লবণাক্ত আর্দ্র চাউল—একখানা মাটীর খোলায়, মৃদুতাপে কাষ্ঠের তাড়ু দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে—চা'লগুলি নীরস হইয়াছে—দু' একটী চা'ল ফুটিতেও আরম্ভ করিয়াছে— তখন আগুন হইতে চা'ল গুলি নামাইয়া রাখিবে। এইবার বালুকাপূর্ণ উত্তপ্ত খোলায়—কুঁচির সাহায্যে অল্পে অল্পে চাউল গুলিকে ভাজিয়া লইবে। তাহা হইলেই মুড়ি প্রস্তুত হইল। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় উৎকৃষ্ট মুড়ি প্রস্তুত হয়। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের হাউর ষ্টেশনে - আমি খুব বড় মুড়ি দেখিয়াছি। অমন মুড়ি বাঙ্গালার আর কোন অঞ্চলে জন্মায় না।

মুড়ি—অত্যন্ত লঘুপাক। মুড়ি ভিজাইয়া বা শুষ্ক মুড়ি উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে হয়। চিবাইবার সময় মুখগহ্বরে প্রচুর লালাস্রাব হইতে থাকে। ইহাতেই মুড়ি অতি সহজে জীর্ণ হইয়া যায়। নারিকেল সংযোগে শুষ্ক মুড়ি চিবাইয়া খাইলে অম্লবিপাকের শান্তি হইয়া থাকে। মুড়ি খাওয়ার পর জল কিম্বা অপর কোন তরল পদার্থ পান করা উচিত নহে, জল কিম্বা দুগ্ধ পানের আবশ্যকতা হইলে, অন্ততঃ ১ ঘন্টা পরে পান করা উচিত। মুড়িতে তৈল কিম্বা ঘৃত মাখিলে—তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে। এরূপ মুড়ি প্রবলাগ্নির পক্ষেই ব্যবহার্য্য।

মুড়ির উপাদান—

আমিষ জাতীয়	৫·৯
শালি-জাতীয়	৮২·৪
লবণ জাতীয়	১·৩
স্নেহ „	০·১
জল	১০·১

মুড়িতে লবণ থাকায়—উহা শোথরোগী এবং রক্তহীন ব্যক্তির খাওয়া উচিত নহে। যাহাদের বুক্কের দোষ আছে (অর্থাৎ কিড্নির দৌর্ব্বল্য) তাহাদের পক্ষেও মুড়ি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মুড়ি বা চাউল ভাজা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মৃদুতাপে অল্প ঘৃতে ভাজিবে। ভাজা হইলে, তাহাতে কিছু সূক্ষ্ম চিনী এবং অল্প পরিমাণে মৎস্যণ্ডীর (মিছরী) চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইয়া গরম থাকিতে থাকিতে লাড়ু পাকাইবে, এই লাড়ু খুব মুখপ্রিয়। হৃদ্‌পিণ্ডের দৌর্ব্বল্যে ইহা একটী সুপথ্য। লাড়ু পাকাইবার সময় কিছু মরিচ চূর্ণ, জীরা ভাজার চূর্ণ এবং অল্প পরিমাণে ভাজা কৃষ্ণ তিল মিশাইয়া লইলে ইহা আরও রুচিকর হইয়া থাকে।

মুড়ি ভিজান' জল—হিক্কা ও বমি নিবারণে ব্যবহৃত হয়।

লাজ বা খৈ।

স্বর্ণ বর্ণ খর্ব্বাকৃতি "কণকচূর্ণ" নামক ধান্য হইতে সাধারণতঃ খৈ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধান্যকে বালুকাপূর্ণ উত্তপ্ত খোলায় কুঁচির সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে ভাজিয়া লইলেই খৈ হইয়া থাকে। খৈ এর তুল্য লঘু খাদ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক রোগেই খৈ পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। খৈ অনেকগুলি ঔষধের উপাদান স্বরূপেও গৃহীত হইয়াছে।

খৈ এর গুণ। অত্যন্ত লঘু, অগ্নি বৃদ্ধি কর, পাচক, মল ও মূত্র প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, শীতল, মধুর রস, বমি, অতিসার, অজীর্ণ, কফজ ও পিত্তজব্যাধিনাশক, রক্তদুষ্টি, রক্তাল্পতা, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ ও পিপাসা নাশক। খৈ শরীরের মেদ কমাইয়া দেয়। বল বৃদ্ধি করে।

লাজমণ্ড। টাটকা ভাজা খৈ বেশ করিয়া বাছিয়া লইয়া,—গরম জলে আধ ঘণ্টা ভিজাইবে। পরে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। খৈকে জলে সিদ্ধ করিয়াও মাড় বাহির করা যায়। ইহা সমধিক গুণসম্পন্ন। পাকস্থালীর পীড়ায় (গ্রহণী অতিসার প্রভৃতি) জ্বরে, পিত্তজ ও কফজ রোগে, অতিঘর্ম্মে, হিমাঙ্গে, সান্নিপাতিক বিকারে এই লাজমণ্ড বা খৈ এর মাড়—উৎকৃষ্ট পথ্য। সাগু-বার্লির চেয়ে খৈএর মণ্ড লঘু। অনেক শিক্ষিত ডাক্তারও—বিদেশী ফুডের পরিবর্ত্তে খৈ-মণ্ড ব্যবহার

করিবার উপদেশ দেন। খৈএর উপকারিতায় মুগ্ধ হইয়াই হিন্দুরা সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে —খৈকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈদ্যগণ রোগীকে অন্ন পথ্য দিবার পূর্ব্বে—মুগের যূষ মাখিয়া খৈ খাইতে দিতেন।

খৈ হইতে নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তত হইয়া থাকে। ধনেখালির "খৈচুর" কাঁচরাপাড়ার "চাঁপা" জয়নগরের মোয়া; কৈচারের "মুকুন্দ মোয়া"—এক সময় রাজ রাজেশ্বরের রসনাকেও রসসিক্ত করিয়া তুলিত। এখন দেশের লোকের রুচি ফিরিয়াছে—পথে পথে ফিরি করিয়া ফিরিলেও কেহ মোয়া কিনিতে চায় না!

খৈ ২ ভরি, গোলাপ জলে ভিজাইয়া লেবুর রস ও চিনীসহ খাইতে দিলে. অজস্র উত্থিত হিক্কারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

মুগের যূষে—খৈ এবং চিনী প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ জ্বর প্রশমিত হয়।

গরম দুগ্ধ খৈ, মিছরীর গুঁড়া একত্রে রাত্রিকালে ভক্ষণ করিলে, বায়ুর অনুলোম হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

খৈচূর্ণ মধুর সহিত চাটিয়া খাইলে হাঁপানীর টান কমে, হিক্কা নিবারিত হয় ও বমনোদ্বেগ দূর হয়।*

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

পঞ্চকর্ম্ম।

(ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ)

——:০:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ডাঃ। সে দিনকার সে রোগীর আর কোন সংবাদ পেয়েছিলেন?

ক। হাঁ, পেয়েছিলাম বৈকি? সে দিন বমি করা'তেই সে সুস্থ হ'য়েছিল আর কোন উপসর্গ ঘটেনি।

ডাঃ। লোকটা আর বোধ হয় যা'র—তা'র কথা শুনে কেমন জোলাপের ওষুদ খাবে না।

ক। কথা তাই বটে। তবে লোকের মন বলা যায় না। আবার কেউ হয়ত পরামর্শ দেবে, সে থাকতে পা'রবে না। আর এই রকম অযাচিতপরামর্শদাতারা হাতে স্বর্গ তুলে দেন। বলেন যে,—এই ওষুদ খেলেই একেবারে নিরাময়! লোকে স্বল্পবুদ্ধি, সহজেই তাই ক'রে বসে. পরিণামে যে বিপদ ঘ'টতে পারে- তা' বোঝে না।

---

* "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য" সাময়িক পত্রে শতাধিক প্রবন্ধেও নিঃশেষ হইবার নহে। অতএব এ প্রবন্ধের এই স্থানেই উপসংহার করা হইল। "আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য"—শীঘ্রই পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হইবে। লেখক।

ডাঃ। এই সব পরামর্শদাতার পরামর্শে অনেক সময় লোকের বিষম অনিষ্ট হয়।

ক। তা'ত নিশ্চয়ই হয়? কিন্তু অনেক পেটেণ্ট ওষুদ আর অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ডাক্তারের চিকিৎসায়ও অনেক রোগীর অনিষ্ট হয়। পূর্ব্বে মনুষ্য বা পশুর মিথ্যা-চিকিৎসা ক'রলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

ডাঃ। এখনও সে আইন আছে।

ক। আছে বটে, কিন্তু সে মিথ্যা চিকিৎসায় নয়, সদ্যোমারাত্মকচিকিৎসায়। একজন পাশ করা ডাক্তার যদি দুই তিন মাস মিথ্যা চিকিৎসা ক'রে কোন রোগীর মৃত্যুর কারণ হন, তা' হলে তাঁকে দণ্ডিত করা যায় না। সদ্যোমারাত্মক চিকিৎসায়ও প্রায় সেই রকম। তবে যাঁরা পাশ না দিয়ে চিকিৎসা করেন, তাঁ'রা সদ্যোমারাত্মক চিকিৎসা করলে দণ্ডিত হ'তে পারেন। কিন্তু যে অবস্থার লোকের মধ্যে তা'রা চিকিৎসা করে, তা'র কয় জনই বা সেটা বুঝতে পারে? আর কয় জনই বা দণ্ডিত করবার জন্য চেষ্টা করে?

ডাঃ। যাক, সে কথা। এখন বস্তি প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। কেন হাতে রোগীপত্র নেই নাকি?

ডাঃ। জরুরী রোগী বড় নেই। একটা ছিল মাত্র।

ক। তবে নিশ্চিন্ত হয়ে শুনুন। বস্তি তিন প্রকার। প্রথম অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ, দ্বিতীয় নিরূহ বা আস্থাপন-কষায়াদি দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ, তৃতীয় উত্তর বস্তি অর্থাৎ লিঙ্গ বা যোনি মধ্যে বস্তি প্রয়োগ।

ডাঃ। আচ্ছা প্রথমে বলুন—যা'দের বস্তি দিতে হয়, আর যা'দের দিতে নেই।

ক। আস্থাপনের অযোগ্য ব্যক্তি, যথা অজীর্ণ রোগী—অতি স্নিগ্ধ, স্নেহপীত উৎক্লিষ্ট দোষ, যানাক্রান্ত, অতি দুর্ব্বল, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রম পীড়িত, অতি কৃশ, যাহারা আহার বা জল পান করিয়াছে, যাহাদের বমন বা বিরেচন করান হইয়াছে, ক্রুদ্ধ, ভীত, মত্ত, মূর্চ্ছিত, যাহাদের প্রায়ই বমন হয়, এবং যাহারা মুখ দিয়া থুঁথু উঠা, শ্বাস কাস, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, আধ্মান, অলসক, বিসূচিকা, অতিসার, মধুমেহ বা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। যে সকল স্ত্রীলোক আমগর্ভ প্রসব করে তাঁহাদেরও আস্থাপন কার্য্যের অনুপযুক্ত জানিবে।

ডাঃ। থামুন মশা'য়। বমন-বিরেচনের পরে ত বস্তিকর্ম্ম ক'রতে হয়, তবে বমন-বিরেচনের পরে বস্তিকর্ম্ম নিষেধ করা হ'ল কেন? আর বদ্ধোদর ছিদ্রোদর, এ সব কি?

ক। বমন-বিরেচন করা'বার কিছুদিন পরে বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়? এখানে বমন-বিরেচনের পর সঙ্গেই সঙ্গেই বস্তিকর্ম্ম নিষেধ করা হ'য়েছে। আর ঐ যে উদর রোগের কথা বল্লেন, রোগ বিনিশ্চয়ে উদর রোগের মধ্যে তা'দের পরিচয় পা'বেন।

ডাঃ। এখন কা'দের আস্থাপন ক'রতে হয়—বলুন।

ক। সর্ব্বাঙ্গ বাত (অর্থাৎ যাদের সর্ব্বাঙ্গে বায়ুর প্রকোপ) একাঙ্গবাত, কুক্ষিরোগ, বায়ু, মল, মূত্র ও শুক্রের বিবদ্ধতা, বল, বর্ণ, মাংস ও শুক্রক্ষয়জনিত রোগ, উদরাধ্মান, অঙ্গের অসাড়তা, ক্রিমিকোষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, বেগধারণজনিত রোগ, অঙ্গের স্তব্ধতা, অতিসার, প্লীহা, গুল্ম, হৃদ্রোগ, ভগন্দর, উন্মাদ, জ্বর, ব্রধ্নরোগী, শিরশূল, কর্ণশূল, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটীদেশের গ্রহ (আড়ষ্ট

হওয়া বা ধরিয়া যাওয়া) কম্পন, আক্ষেপ, শরীরের অত্যন্ত গুরুত্ব, বা লঘুত্ব, রজঃক্ষয়. রজঃহীনতা, বিষমাগ্নি, হিক্কা—জানু, জঙ্ঘা, উরু, গুল্ম পায়ের গাঁট, পার্ষ্ণি (গোড়ালি) প্রদেশ (পায়ের পাতা) যোনিকচ্ছ, অঙ্গুলি, স্তনদেশ, দন্ত, নখ, পর্ব্ব ও অস্থিসমূহে শূলবৎ বেদনা, শোথ; স্তব্ধতা, অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা) পরিকর্ত্তিকা (উদরের মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া) উদরে অল্প অল্প শব্দ, এই সকল রোগে, বিশেষতঃ নানা প্রকার বাতব্যাধিতে (Nervous deases) আস্থাপন বস্তি প্রধানতম চিকিৎসা। বৃহৎ বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে তাহা যেমন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আস্থাপন প্রয়োগ দ্বারা বায়ুর প্রধান স্থান পক্বাশয় স্থিত বায়ু প্রশমিত হয় বলিয়া অন্যান্য স্থলগত বায়ুরও সেইরূপ প্রশমন হয়।

ডা। এখন অনুবাসনের যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তির নির্দ্দেশ করুন।

ক। যা'রা আস্থাপনের অযোগ্য, তা'রা অনুবাসনেরও অযোগ্য, বিশেষতঃ নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা, প্রমেহ, অর্শঃ, প্রতিশ্যায় অরুচি, অগ্নিমান্দ্য দৌর্ব্বল্য, প্লীহা, কফোদর, উরুস্তম্ভ, পিত্ত ও কফজনিত অভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) শ্লীপদ, গলগণ্ড, অরুচী (আব বিশেষ) ও ক্রিমিকোষ্ঠ এই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা ভোজন করে নাই, যাহাদের কোষ্ঠ গুরু যাহারা বিষ বা শববিষ পান করিয়াছে, তাহাদিগকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবেনা।

ডা। এখন যা'দের অনুবাসন দেওয়া উচিত—বলুন।

ক। যাহাদের আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, তা'দের অনুবাসনও প্রয়োগ করা যায়। বিশেষতঃ রুক্ষ, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বাতার্ত্তরোগিগণের পক্ষে অনুবাসন প্রধানতঃ চিকিৎসা। মূলে জলসেক ক'রলে যেমন বৃক্ষের নূতন পল্লব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অনুবাসন দ্বারা রোগনাশ হওয়ায় নূতন ধাতু সকল উৎপন্ন হোয়ে থাকে।

ডা। অনুবাসন প্রয়োগের নিয়ম বলুন।

ক। ব'লছি, কিন্তু দেখুন—যে সকল রোগে যে যে কর্ম্ম করা প্রশস্ত বলা হ'য়েছে, তাও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিতে হয়। এই মনে করুন—অতিসার রোগে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হোয়েছে, কিন্তু অতিসার হ'লেই আস্থাপন দিতে হয় না। অতিসারের পুরাতন অবস্থাতেই আস্থাপন হিতকর।

ডাঃ। তবেইত গোলমালে ফেললেন। কোন্ রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্ কর্ম্ম করতে হ'বে, তা' না জা'নলে পঞ্চকর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কি ক'রে হবে।

ক। এত জ্ঞান লাভ নয়, যত কর্ম্ম আয়ুর্ব্বেদে আছে, সেগুলি এই প্রকার, এই রূপে প্রয়োগ ক'রতে হয়, তা'রি একটা মোটা মুটি ধারণা হওয়া মাত্র।

ডা। তবে রোগের অবস্থাভেদে প্রয়োগ শিখব কি করে?

ক। সে সম্বন্ধে আমরাই বিশেষ কিছু বুঝিনে। তা' আপনাকে শে'খাব কি করে! তবে রোগভেদে কোন্ রোগের কিরূপ অবস্থায় কিরূপ চিকিৎসা করা উচিৎ, সে বিষয় ক্রমশঃ আমরা আয়ুর্ব্বেদে আলোচনা ক'রব, তাইতে দেখতে পাবেন।

ডাঃ। আচ্ছা রোগনাশ ব্যতীত বস্তি দ্বারা আর কি কি উপকার হয়?

ক। বস্তি প্রয়োগের ফলে ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির বাজীকরণ হয়, কৃশ ব্যক্তি পুষ্টি হয়, স্থূল দেহ কৃশ হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, বলী পলিত নষ্ট হয়, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শরীর পুষ্ট হয়, বর্ণ উজ্জল হয় বল বৃদ্ধি হয়, এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

ডাঃ। বলী পলিত নষ্ট হয়—মানে কি? বৃদ্ধ ব্যক্তিরও কি বলী পলিত নষ্ট হ'য়ে আবার যৌবন ফিরে আসে?

ক। তাও কি কখন হ'তে পারে মশায়! আর আপনি নিতান্ত অমনোযোগী বা প্রতিভাহীন ছাত্র ব'লে এ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন? কেননা যখন পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বস্তিপ্রয়োগ করা নিষেধ. তখনই ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'য়ে গেছে।

ডাঃ। সত্যই অধ্যাপক মহাশয়, এটা এই অযোগ্য ছাত্রের বিশেষ ত্রুটী। এক্ষণে ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রে বস্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

ক। বৎস, এক্ষণে বস্তিপ্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বিরেচনের সাতদিন পরে রোগী সবল হইলে অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে রোগীর শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। পরে ভোজন করাইয়া অল্পক্ষণ পরে পাদচারণা করিতে বলিবে। অনন্তর মলমূত্র ত্যাগ করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়াগ করিবে।

বলা হইয়াছে—সেই সকল দোষ পরিহারের জন্য শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে এবং গ্রীষ্ম, প্রাবৃট ও শরৎ কালে—দিনান্তে স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। বায়ুর আধিক্য থাকিলে যে কোন সময়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তীব্র রোগে যে রোগীর আহার জীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অভুক্ত ব্যক্তিকে কদাচ স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধ ও শূন্য থাকে বলিয়া স্নেহ উর্দ্ধে গমন করে। অতএব ভোজনের পরেই স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। ভুক্ত দ্রব্য বিদগ্ধ হইলে সেই অবস্থায় যদ্যপি স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জ্বর হইয়া থাকে। অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে দুই প্রকারে স্নেহ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া মত্ততা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। আবার রুক্ষ অন্ন ভোজন করাইয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিলে বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অল্প পরিমাণে স্নেহ সংযুক্ত দ্রব্য আহার করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অথবা রোগের অবস্থা বিবেচনায় কফ, পিত্ত ও বায়ুরোগীকে যথাক্রমে রুক্ষ মুগের যূষ দুগ্ধ বা মাংস রস পান করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, ভুক্তব্যক্তিকে বস্তি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। আবার এখন বলা হচ্চে যে, আহার না করিয়ে বস্তি প্রয়োগ করবে না। এ যে বিষম মত দ্বৈধ ঘ'টল দে'খচি।

ক। মতদ্বৈধ কিছু ঘটেনি, একটু ব'লবার এবং বোঝবার এদিক ওদিক। অনুবাসন প্রয়োগ ক'রতে হ'লে রোগী যে পরিমাণ আহার ক'রতে অভ্যস্ত, তা'র সিকি পরিমাণ কম খাদ্য আহার করা'তে হয়, আর নিরূহ প্রয়োগ ক'রতে হ'লে আহার না করিয়ে পূর্ব্ব অন্ন জীর্ণ হ'লে প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। এবার বু'ঝতে পেরেছি।

ক। শুধু এইটুকু বুঝলে হ'বে না আরও একটু বুঝে রাখুন। অনেক সময় নিষিদ্ধ স্থলেও বস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। যেমন বমিতে, হৃদ্‌রোগে এবং গুল্ম রোগে বমন, এবং কুষ্ঠাদি রোগে বস্তি কর্ম্ম নিষিদ্ধ হলেও আবশ্যক স্থলে প্রয়োগ কর'তে বাধ্য হ'তে হয়। এইজন্য যোগ্যাযোগ্য নির্দ্দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। কারণ দেশ কাল এবং বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিষিদ্ধ কার্য্যও সময়ে ক'রতে হয়।

ডাঃ। এ বিষম ব্যাপার দেখছি, মাথা গুলিয়ে যায়।

ক। চিকিৎসাই বিষম ব্যাপার বৈকি। বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম অশেষ কৌশলময় নরনারীদের চিকিৎসা করা কি সোজা কথা। পূর্ব্বেত ব'লেছি যে মহর্ষি আত্রেয় বলেছেন যে, এসব ব্যাপারে বিশাল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির চিত্তও আকুল হয়. তা' আমাদের মত অল্পবুদ্ধি লোকের মাথা গুলিয়ে যা'বে তা'তে আর সন্দেহ কি।

ডাঃ আচ্ছা আমরা এখন যে রকম যন্ত্র দিয়ে পিচকারী দিই, আয়ুর্ব্বেদের বস্তি কি সেই রকম ছিল।

ক। না, সে রকম ছিল না। আগে বস্তিনির্ম্মাণ ক'রবার কথাই বলি শুনুন। বস্তি (Bladder) দিয়েই বস্তি নির্ম্মাণ করার নিয়ম ছিল। পূর্ণবয়স্ক অথচ বৃদ্ধ নয়—এরূপ গো, মহিষ, শূকর, ছাগ বা মেষের বস্তিই এ জন্য ব্যবহৃত হ'ত। এই বস্তি কোমল, অত্যন্ত দীর্ঘ নয়, অত্যন্ত স্থূলও নয়, দৃঢ় এবং উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য ধরে—এরূপ হওয়া উচিত। বস্তির অভাব হ'লে পাতলা চর্ম্ম, বা পুরু বস্ত্র দিয়ে প্রস্তুত কর'তে হয়।

এই ত গেল বস্তি। তা'রপর বস্তির একটা নেত্র বা নল চাই। রোগীর বয়স এক বৎসর হ'লে নলের পরিমাণ চার আঙ্গুল, এক বৎসর থেকে আট বৎসর পর্য্যন্ত আট আঙ্গুল, এবং আট থেকে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দশ আঙ্গুল দীর্ঘ হওয়া উচিত। নলের বেধও বয়স ভেদে ক্রমশঃ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির মত হ'বে। আর উহার পরিমাণ বয়স ভেদে ক্রমশঃ দেড় আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল ও আড়াই আঙ্গুল হ'বে। নলের যে মুখ মলদ্বারে প্রবিষ্ট করাতে হ'বে, তা'র পরিমাণ বয়স ভেদে যথাক্রমে কাক, এবং ময়ূরের পালকের নলের মত হবে। আর নলের ভিতরের ছিদ্র ক্রমশঃ মুগ, মাষকলায় বা মটর কলায়ের মত হবে। পঁচিশ বৎসরের অধিকবয়স হ'লে নলের পরিমাণ চার আঙ্গুল দীর্ঘ, মূলের বেধ অঙ্গুলির মধ্যভাগের ন্যায়,অগ্রের বেধ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যভাগের ন্যায়, প্রবেশ মুখ শকুনের পালকের নলের মত, ভিজা মটরের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নলের নিয়ে বস্তি বন্ধনের জন্য দুইটী কর্ণিকা (কোণ) রাখিতে হইবে। এই স্থলে জানা উচিত যে, অঙ্গুলি পরিমাণ অর্থে রোগীর অঙ্গুলির পরিমাণ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিতল, হস্তি দন্ত, গো মহিষাদির শৃঙ্গ, স্ফটিক বা সারকাঠ— এই সকল পদার্থ দ্বারা নল প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ নলের অভাবে শর, বাঁশ বা অস্থি দ্বারা নল নির্ম্মাণ করা উচিত। নল মসৃণ, দৃঢ়, গো-পুচ্ছের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ গোড়ার দিক মোটা, মুখের দিক সরু, সরল ও অতীক্ষ্ণাগ্র (যাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ নয়) হওয়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত বস্তির সহিত এই নলের মূলদেশ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা বাঁধিয়া তদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

যক্ষ্মারোগ ও তাহার চিকিৎসা।

—:০:—

(অগ্রহায়ণ ৩য় সংখ্যার পর)

পূর্ব্বে যক্ষ্মরোগ সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলিয়াছি। আরও অনেক বলিবার আছে। জর্ম্মণ দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ককের প্রসাদে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এ রোগের ঐ জীবাণুর নাম—"বেসিলাস্ টিউবার কুলোসিস্।" ইহারা সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ জলে, স্থলে শূন্যে, বাতাসে, জীবের খাদ্যে—বিচরণ করিয়া থাকে। এই ভয়ানক জীবাণু প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদেরদেহে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সকল সময় সকল অবস্থায় ইহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। করুণাময় ঈশ্বর মানবদেহে এমন একটী মহাশক্তি দিয়াছেন, যে শক্তির প্রভাবে দুষ্টজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া সহসা অত্যহিত ঘটাইতে পারে না। সে মহাশক্তির নাম "ফ্যাগোসাইট"। 'ফ্যাগোসাইট' অণু বিশেষ,—শরীরমধ্যেই তাহার বাস। বাহির হইতে দুষ্টজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে এই "ফ্যাগোসাইট"ই জীবাণুগুলিকে খাইয়া ফেলে। আর্য্য ঋষিগণের অভিমত—মানুষের জীবনী শক্তি যতক্ষণ প্রবল থাকে, শারীর ধাতু সাম্য অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ দুষ্টজীবাণু শরীরের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। জীবনী শক্তি হ্রাস হইলে ধাতুর বিকৃতি ঘটিলে, [শরীর রক্ষক "ফ্যাগোসাইটস্" সংখ্যায় হীন হইলে] জীবাণু শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেক সময় জীবাণু পিতৃবীর্য্য ও মাতৃরক্তের সহিত ও প্রবেশ করিতে পারে। এ সকল কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নিপুণ ভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

কি কি কারণে ধাতু বৈলক্ষণ্য ঘটে? কারণ অনেকগুলি। যথা,—জনাকীর্ণ স্থানে বাস, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের অভাব, জলময় স্যাঁতানে স্থানে বাস, রুগ্ন পিতা মাতার ঔরসে জন্ম, আবদ্ধ স্থানে উৎকট আসনে বসিয়া কায করা, অতি মৈথুন, অতি ভোজন, অতি অল্পাহার, চিন্তা প্রভৃতি কারণে ধাতুর বিকার ঘটিয়া থাকে। ধাতুর বিকার ঘটিলে, রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া দেহকে নাশ করে।

যক্ষ্মাজীবাণু শরীরের নানাযন্ত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। আক্রান্ত যন্ত্রে প্রথমে স্থানে স্থানে গুটি প্রকাশ পায়। কালে সেগুলি হয় গলিয়া যায়,—ছোট বড় কোষে পরিণত হয়, কিম্বা শক্ত হইয়া শুকাইয়া যায়। কোষমধ্যে পুয ও রক্তস্রাবের সহিত মিশ্রিত থাকে, ছোট বড় শিরা বাহির হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে শিরাগুলি ফুলিয়া রক্ত খনিতে পরিণত হয় এবং ফাটিয়া যায়। কাসির সহিত দুষিত স্রাব—ফুসফুসের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়, কখনও মুখে থাকিয়া অন্ত্রে প্রবেশ করে। কখনও বা রস ও রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে।

যক্ষ্মার লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এস্থলে অতি সংক্ষেপে আর একবার উল্লেখ করিতেছি।

জ্বর। অল্পাধিক, কখন সবিরাম কখনও বা স্বল্পবিরাম।

ঘর্ম্ম। অত্যন্ত, বিশেষতঃ ভোর রাত্রে বেশী।

কৃশতা। শরীরের গুরুত্ব দিন দিন কমিয়া যায়। সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

কাসি। হয় শুষ্ক না হয় আর্দ্র। রোগের আরম্ভে শুষ্ক কাসি, ফুস্‌ফুসে ক্ষত হইলে আর্দ্র কাসি। কাসি প্রথমে কিছুই ওঠে না, পরে খুব উঠিতে থাকে।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায়— জীবাণু এবং ফুস্‌ফুসের তন্তু প্রভৃতি অণু দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্তোৎকাস। কখনও রক্তের ছিটা কাসির সঙ্গে থাকে, কখনও ভলকে-ভলকে রক্ত উঠে।

বক্ষ পরীক্ষা। বক্ষের বিকৃতি ঘটে। যথা :—বুক বাঁকিয়া যায়, বসিয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বক্ষস্ফীতির ব্যাঘাত হয়; অর্থাৎ কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান ওঠে না। রোগীর কথা কহিবার সময় বুকের উপর হাত রাখিলে স্পর্শকম্পনের আধিক্য! বাজাইলে শব্দের স্তৈমিত্য। যন্ত্রদ্বারা শুনিলে—নানারূপ অস্বাভাবিক শব্দজ্ঞান প্রথম অবস্থায়—যখন গুটি উঠিতেছে—তখন নিশ্বাস বায়ু শব্দ কখনও ক্ষীণতম,—প্রায় শোনা যায় না; কখনও কর্কশ, কখনও তরঙ্গায়িত; যখন ফুস্‌ফুস সংযত ও কঠিন হইতে আরম্ভ হয়—তখন নল শব্দ শোনা যায়। যখন গলিতে আরম্ভ হয়—তখন কট্‌কট্‌ এবং ভুড় ভুড় শব্দ, যখন ক্ষত কোষে পরিণত হয়, তখন ভড় ভড় শব্দ এবং অন্যান্য নানাবিধ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

আনুসঙ্গিক রোগ। যক্ষ্মার সঙ্গে প্রায়ই ফুস্‌ফুস্ নানা প্রকার পীড়িত হইয়া থাকে। যথা ফুস্‌ফুস্ নালী প্রদাহ, বায়ু কোষ প্রদাহ, বায়ু কোষের স্ফীততা, বায়ু নল-স্ফীতি, প্লুরাদাহ—তরুণ ও জীর্ণ। বায়ু বক্ষ; পূয়-বায়ু বক্ষ। গলিত ফুস্‌ফুস্, কণ্ঠকোষ প্রদাহ, পাক যন্ত্রে গুটীক্ষত, তজ্জনিত উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি, রক্তমণ্ডলী, স্নায়ুমণ্ডলী, যকৃতাদিযন্ত্রও পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা-রোগ ভাল হয় কি না?

ইহাই আজকালকার গুরুতর প্রশ্ন। অধিকাংশ লোকের ধারণা—যক্ষ্মা রোগ ভাল হয় না। এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। যক্ষ্মারোগ সাংঘাতিক বটে, কিন্তু সকল যক্ষ্মাই অসাধ্য নহে। বরং কোন কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই ভাল হয়।

যদি উৎপত্তিসময়ে রোগ ধরা পড়ে, রীতিমত চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, রোগী চিকিৎসকের মতাবলম্বী হইয়া চলিতে পারে, তবে যক্ষ্মারোগ অনেক স্থানেই আরোগ্য হয়। আবার কোন কোন স্থলে—রোগের শান্তি না হইলেও তাহার গতিরোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু জীবাণুদোষ সংঘটন হইবার সময় যদি রোগ ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে রোগমুক্তির আশা করা যায়।

সেই জন্যই যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে—যত অধিক আলোচনা করা যায়, ততই ভাল। শীত প্রধান ইউরোপ ও আমেরিকায় যক্ষ্মারোগের প্রভাব—আমাদের দেশের চেয়ে বেশী। কেননা সেখানে ঘোরজীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। উপার্জ্জনের জন্য, সভ্যতার অনুরোধে, সেখানকার লোক—প্রাকৃতিক নিয়ম পদে পদে লঙ্ঘন করিতেছে, আর্য্য ঋষিগণ

বলিয়াছেন—"বেগরোধ, ক্ষয়, অতি সাহস, এবং বিষমাশন" এই চারিটী যক্ষ্মা রোগের কারণ। বাস্তবিক এ গুলি পাকা লোকের পাকাকথা। এই কারণগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত। এজন্য কবিরাজ মহাশয়গণ রীতিমত চেষ্টা করুন।

যক্ষারোগের প্রথম কারণটি সচরাচর ঘটিয়া থাকে—বেগ অর্থাৎ মল মূত্রাদি ত্যাগের ইচ্ছা। সে ইচ্ছার পূরণ না করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। সভ্যতার মত্ততায় জীবন সংগ্রামের তাড়নায়, মানুষ সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারেনা। সময়ে খাইতে পায় না, কখনও অল্পভোজনে তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, কখনও অতি-ভোজনে পাকযন্ত্র ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইউরোপে মাতা ছেলেকে স্তন্য দেন না, কৃত্রিম খাদ্যে শিশু পালিত হইয়া থাকে। এদেশেও অনেক গৃহে কৃত্রিম খাদ্যের প্রচলন রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। ভাবিবার কথা বটে।

পল্লীগ্রামের চেয়ে সহরে যক্ষ্মারোগের প্রভাব অনেক বেশী। ইউরোপেও তাই, এদেশেও তাই। সহরের লোক ছোট একটি অন্ধকূপে গোষ্ঠীশুদ্ধ বাস করে। বাতাস ও সূর্য্যালোক না পাইলে যক্ষ্মারোগ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পল্লীগ্রামে এ অসুবিধা নাই। তথাপি পল্লীগ্রামে যে যক্ষ্মারোগ হইতেছে, ইহা অনেকটা সহরের আমদানি।

অতি সাহস—ক্ষয়রোগের একটি কারণ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক অতি সাহসে মানুষের তেজঃক্ষয় হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা জীবাণুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভের উপায়।

একটী জীবাণু হইতে অত্যল্প কালে কোটী কোটী জীবাণু জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং এই জীবাণুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিশেষ সাধনা করিতে হয়। প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া স্থানলাভ করিতে না পারে। অর্থাৎ যাহাতে শারীর ধাতুর সমতা-রক্ষা হয়, শরীর রক্ষক ফ্যাগসাইট অণু দলে ভারি থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ফ্যাগসাইট দলের সহিত জীবাণুর ঘোরতর সংগ্রাম চলে। যাহার বল বেশী, শেষে তাহারই জয় হয়। ফ্যাগ-সাইটের দলপুষ্টির প্রধান উপায়—স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়ম গুলি মানিয়া চলা। নিয়মিত আহার বিহারে, নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক শ্রমে, আলোক-বাতাস উপভোগে,—জীবনী-শক্তি বা ফ্যাগসাইট দলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর্য্য ঋষিগণ—যে দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পালন করিতে পারিলে, শুধু যক্ষ্মা রোগ কেন, কোন রোগই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমার ইচ্ছা—কোন যোগ্যতম ব্যক্তি ঋষিনির্দ্দিষ্ট দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার বিধি-ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য—এই আয়ুর্ব্বেদ পত্রেই একটু বিস্তৃত আলোচনা করেন। দিনচর্য্যা ও ঋতু-চর্য্যার নিয়ম বর্ত্তমান কালে পালন করা খুব কঠিন হইলেও, তাহার মধ্যে অনেকগুলি নিয়ম যে মানিয়া লইতে পারা যায়—তাহা আর অস্বীকার করা চলে না। অন্ততঃ লোকের তাহা জানিয়া রাখাও ভাল।

চিকিৎসকের চেষ্টায় জীবাণু ধ্বংস করা অসম্ভব। তাহাদিগকে পুড়াইয়া কিম্বা বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে—আগে রোগীকে পুড়াইতে কিম্বা বিষ খাওয়াইতে হইবে। ইহার চলিত ব্যঙ্গ পূর্ণ নাম—"এক সঙ্গে রোগ-রুগী দুই আরাম !!"

কিন্তু যদি শারীরধাতুর উন্নতি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবাণুর ধ্বংস অনিবার্য্য। দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন করিলে শারীর ধাতুর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রকুমার দে।

(ক্যাম্বেল হস্‌পিট্যালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন)

অস্ত্রোপচার।

মুখ নাসিকা ও গলকোষ।

উপসর্গ। ১। পচন সংক্রমন। ২। পচন জনিত নিউমোনিয়া। ৩। ডিপ্‌থিরিয়ার জন্য গলকোষের পচনদোষ। ৪। ত্বক্ কণ্ডু। ৫। কর্ণাভ্যন্তরের তরুণ প্রদাহ। ইত্যাদি।

নাসিকার এডিন্‌ইড্ অস্ত্রের সাহায্যে উচ্ছেদ করিলে পূর্ব্বোক্ত উপসর্গগুলি দেখা দিতে পারে। অনেক স্থলে উহা মারাত্মকও হইতে পারে।

এডিন্‌ইড্ উচ্ছেদের জন্য অস্ত্রোপচার অতি সহজ। কিন্তু যাহাতে উপসর্গগুলি উপস্থিত হইতে না পারে—সেজন্য সাবধান হইবে। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে দেখিবে—রোগীর গলার অবস্থা ভাল আছে কি না ? মুখ-গহ্বরে কোন ক্ষতযুক্ত বা দূষিত দন্ত থাকিলে, অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে—তাহা উৎপাটন করিবে। পরে ২।১ দিন পর্য্যন্ত পচন নিবারক স্প্রে প্রয়োগ করিবে। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে ইহাও সন্ধান লইবে—রোগী সে সময়ে ডিপ্‌থিরিয়া বা অন্য কোন দূষিত জ্বরের সংস্রবে আসিয়াছিল কি না ? অথবা রোগীর বাসস্থানের কাছে কাহারও ঐরূপ রোগ হইয়াছে কি না ?

এডিনইড্ কাটার পর রোগীকে পূর্ণ একদিন ও এক রাত্রি শয্যায় শুইয়া থাকিতে বলিবে। নাক মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য—প্রত্যেকবার পরিষ্কার ন্যাকড়া ব্যবহার করিবে। অস্ত্রোপচারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে—রোগীর মুখ হইতে বমনের সঙ্গে রক্ত বাহির হইতে পারে। ইহাতে ভয় করিও না। রোগীকে এমন স্থানে শয়ন করাইবে—তাহার শরীরে বায়ু প্রবাহ না লাগে, অথচ দরজা জানালা খোলা থাকিবে—যেন বায়ু চলাচলের কোন ব্যাঘাত না হয়।

অস্ত্রোপচারের ২ ঘণ্টা পরে—যবাগূ, মোহন ভোগ, মুগের যূষ প্রভৃতি লঘুদ্রব্য

রোগীকে খাইতে দিবে। পর দিবস পচন নিবারক ঔষধের স্প্রে প্রয়োগ করিবে।

ডাক্তারী পচন নিবারক।

(১) সোডা সাল্‌ফ্‌ অর্দ্ধ ড্রাম। হাইড্রাজ আইওডাইড রুব্বাই ২ গ্রেণ। সোডি আইওডাইড্‌ ২ গ্রেন। পরিশ্রুত জল ১ পাইণ্ট।

(২) সোডা সালফ্‌ ১ ড্রাম, স্যানিটাস্‌ ১ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টিল ১ পাইণ্ট।

(৩) সোডা সালফ ২ ড্রাম, সোডাবাইকার্ব্ব ১০ গ্রেণ, গ্লিসিরিনাই কার্ব্বলিক এসিড ৪০ মিনিম, একোয়া ডিষ্টীল ১ পাইণ্ট।

(৪) লিষ্টীরিণ ৩ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টীল ½ পাইণ্ট।

কবিরাজী মতে পচন নিবারক।

(১) হরীতকী, বহেড়া, আমলা, প্রত্যেকটী ১ ভরি ওজনে লইয়া একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া লইবে।

(২) সর্জ্জিকাক্ষার ও যবক্ষার প্রত্যেক৶০ আনা, জল ⁄॥০ সের।

(৩) জাতীপত্র, নীলঝাঁটী পত্র, প্রত্যেক ১ তোলা, ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে।

(৪) জাতীপত্র, ময়নাফল, বৈচিফল, কট্‌কী প্রত্যেক আধ ভরি, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশেষ।

(৫) লোধছাল, খদির কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টীমধু প্রত্যেক আধতোলা, জল পুর্ব্ববৎ।

(৬) নিমপত্র, নিসিন্দা পত্র, পলতা, গুলঞ্চ। পুর্ব্ববৎ।

(৭) বিড়ঙ্গ, নিমুকাপত্র, দন্তীপত্র, দারু হরিদ্রা। ওজন ও জল পুর্ব্ববৎ।

(৮) নিমছাল, বাসকছাল, কণ্টিকারি, পলতা, গুলঞ্চ। প্রত্যেক ওজন ॥০ তোলা। জল পূর্ব্ববৎ।

(৯) নিমুকা, দ্রাক্ষা, জাতীপত্র, খদির। পূর্ব্ববৎ।

(১০) বাবলা, গুয়েবাবলা, যষ্টীমধু, অনন্ত মূল, লাক্ষা, বকুলছাল, বাবুই তুলসী। প্রত্যেক ওজন।০, জল পূর্ব্ববৎ।

(১১) যোয়ান, লতাকস্তুরী, অগুরু, অনন্ত মূল, জায়ফল, কাকলা—প্রত্যেক ওজন।০, জল পূর্ব্ববৎ।

ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটী ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় স্প্রে প্রয়োগ করিবে।

স্প্রের অভাবে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ গরগরা বা গারগল রূপে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে মুখমধ্যস্থিত সঞ্চিত রক্ত ও ক্লেদাদি বাহির হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন গারগল—শিশুর পক্ষে—সুবিধাজনক নহে। সুতরাং স্প্রে প্রয়োগই ঠিক। ৭ দিন উপর্য্যপরি স্প্রে বা গারগল দেওয়া উচিত। ইহাতে পচন দোষের আশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে।

নাসিকার পশ্চাৎ অংশে পিচকারী দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, খুব জোরে পিচকারী দিবে না। পিচকারীর ভিতরের তরল পদার্থ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নাসিকায় এমন পিচকারী প্রয়োগ করিবে,—যাহার মধ্যে ৫ ঔন্স তরল পদার্থ ধরিতে পারে। অথচ পিচকারীর নলের মুখে রবারের সরু নল লাগানো থাকে। নাসা গহ্বরের অস্ত্রোপচারের পর, নাসিকায় ও গলায় ক্রিয়েসটআইওডিন এবং কার্ব্বলিক এসিডের বাষ্পগ্রহণ করিলে বেশ উপকার হয়। শ্বেতচন্দন ও যোয়ান সিদ্ধ করিয়া সেই

জলের বাষ্প গ্রহণ বিশেষ ফলপ্রদ। অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে সামান্য জোলাপ দেওয়া উচিত। ডাক্তারেরা লাবণিক বিরেচক ব্যবস্থা করেন। বৈদ্যমতেও এমন বিরেচক দিবে—যাহাতে লবণ থাকে। রোগীকে—অস্ত্রোপচার সামান্য হইলেও অন্ততঃ ২।৩ দিন গৃহমধ্যে বিশ্রাম করিবার উপদেশ দিবে।

নাসাগহ্বর অবরুদ্ধ থাকিলে ছোট ছেলে মেয়েরা মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করে। অস্ত্রোপচারের পর অবরোধ দূরীভূত হইলেও, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ফুলিয়া উঠিয়া ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত নাসাগহ্বর পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ থাকে। এই ৬।৭ দিন অতীত হইয়া গেলে ছেলেদের নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে অভ্যাস করাইবে। মুখপথ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে বলিবে।

এডিনইড জন্য নাসা গহ্বর অবরুদ্ধ থাকায় বালক বালিকারা অনুনাসিক স্বরে কথা কহিয়া থাকে। অস্ত্রচিকিৎসার পরও কিছুদিন এ অভ্যাস থাকিয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশুদ্ধ ভাবে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলে তবে এ দোষ সারিয়া যায়।

নাসিকার পশ্চাদংশে পচনদুষ্ট এবং দুর্গন্ধ যুক্ত প্রশ্বাসবায়ুসহ জ্বর অর্থাৎ দৈহিক উত্তাপ বর্দ্ধিত হইলে, নেসাল ডুস দিয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার নেজো ফেরিংক্স ধুইয়া দিতে হয়। গরম জলে সোডা মিশ্রিত করিয়া সেই জলের ডুস দেওয়া উচিত। ডুস দিবার সময় রোগীকে মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে বলিবে। ডুস অতি ধীরে ধীরে দিবে। যেন এক নাসিকা দিয়া জল প্রবেশ করিয়া অপর নাসিকা দিয়া বাহির হইতে পারে।

মন্দলক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাক্তারেরা জোলাপ দিয়া থাকেন, কুইনাইন ও আয়রণ খাইতে দেন।

মধ্য কর্ণের প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই কর্ণের পশ্চাদংশে জোঁক বসানো ভাল। অথবা ব্লিষ্টার দেওয়া ভাল। কখন কখন উষ্ণ স্বেদ দিলেও উপকার হয়। এই সময় নাসিকার পশ্চাদংশে ইরিগেশন করা প্রয়োজন। পুঁয হইয়াছে দেখিলে, সাধারণ কাণপাকার চিকিৎসা করিবে।

ডিপথিরিয়া প্রভৃতি উপসর্গ অত্যন্ত মারাত্মক, ইহার চিকিৎসা করিয়া ফললাভের আশা কম। যাহাতে এরূপ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইতে না পারে, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

এডিনইড উচ্ছেদ করার পর ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার সম্ভাবনা। বাটীতে কিম্বা পাড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ হইয়াছে দেখিলে,—অস্ত্রোপচার না করাই সৎপরামর্শ।

এডিনইড উচ্ছেদের পর রোগীর দেহে আর একটী উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাহা—গাত্রের ত্বকে কণ্ডু নির্গমন। অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে ইহা বাহির হয়। ৩।৪ দিন থাকিয়া আপনাআপনি মিলাইয়া যায়। টনসিল উচ্ছেদের পরও ইহা ঘটিতে পারে।

অস্ত্রোপচারের পর ৪র্থ বা ৫ম দিনে পলিজার ব্যাগদ্বারা ইউষ্টেকিয়ান নলে বায়ুর পিচকারী দেওয়া খুব ভাল। ইহা ৩।৪ দিন প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর বধিরতার লক্ষণ দেখিলে ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত বায়ুর পিচকারী প্রয়োগ করিবে।

টনসিল উচ্ছেদ করিলে—এডিনইড উচ্ছেদের সমস্ত উপসর্গই উপস্থিত হইতে

পারে। প্রভেদের মধ্যে এই ;—এডিনইড উচ্ছেদে মধ্যকর্ণের প্রদাহ জন্মিতে পারে। টন্‌সিল উচ্ছেদে ইহার সম্ভাবনা নাই। টনসিল উচ্ছেদের পর—পূর্ব্বোক্ত পচন নিবারক ঔষধের স্প্রে গলার মুধ্যে প্রত্যহ ৩।৪ বার প্রয়োগ করিবে। টনসিল উচ্ছেদ করিলে গলায় যথেষ্ট বেদনা হয়—কাজেই রোগী গারগল বা কবল করিতে পারে না। ফলি কিউলারটন্ সিলাইটিস জনিত গলায় অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলে রোগীকে—পটাস ক্লোরেট্ ৫ গ্রেণ, একোয়া মিন্থপিপ ১ উন্স ; অথবা নিসিন্দাপত্রের ক্বাথে গোলমরিচ ঘষিয়া প্রত্যহ ৩বার সেবন করিতে দিবে।

কচি নারিকেলের কড়কচি বাবলাছাল, চামেলীর পত্র এবং পেয়ারা পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটু ফটকিরি মিশাইয়া সেই জলে রোগীকে মুখ ধুইতে বলিবে। কিম্বা পটাস ক্লোরেট ৭ গ্রেণ, টিঞ্চর ফেরি পরে ক্লো ১০ মিনিম, গ্লিসারিং ১ ড্রাম, একোয়া মিন্থ পিপ ১ উন্স—একত্রে মিশাইয়া তদ্দারা মুখ ধুইবার পরামর্শ দিবে।

এডিন্‌ইড্ ও টনসিল যুক্ত রোগীর স্বাস্থ্য আদৌ ভাল হয় না। সুতরাং অস্ত্রোপচারের পর—রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য—"চ্যবনপ্রাশ" খাইতে দিবে। সক্ষম হইলে, রোগীকে কিছুদিন বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য—ওয়ালটিয়ার, পুরী প্রভৃতি স্থানে যাইবার পরামর্শ দিবে।

দন্তোৎপাটনের পর ২।১ দিন পর্য্যন্ত রোগীকে পচননিবারক ঔষধের মুখধোতি প্রদান করিবে। নিম্নে ডাক্তারী ও কবিরাজী মতের ২।৪টী মুখধৌতির নির্দ্দেশ করিতেছি ;

ডাক্তারী মতে—

(১) জল ১ পাইণ্ট, ফেরেট অফ সোডা ১ ড্রাম।

(২) আর্ণিকা সলিউসন্।

(৩) হাইড্রেজেন্ পার অক্সাইড্।

(৪) ম্লাইকো থাইমলিন।

ইহারা মুখ গহ্বর পরিস্কার ও বেদনা নিবারণ করিয়া থাকে।

কবিরাজী মতে—[পচন নিবারক মুখ ধৌতি]

(১) বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর, ইহাদের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ দিয়া মুখ ধুইবে।

(২) বচ, চৈ, সর্জ্জিকাক্ষার, আকনাদি, লাক্ষা—ইহাদের চূর্ণ গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জলে মুখ ধুইবে।

(৩) পল্‌তা, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথ দিয়া মুখ ধুইবে।

(৪) বেয়াকুড়, ভুঁইকদম, ভেরেণ্ডা ও কণ্টিকারী সিদ্ধ জলে সরিষার তৈল নিক্ষেপ করিয়া—ইহার দ্বারা মুখ হইবে।

(৫) গরম জলে আকন্দর আটা ও ছাতিম গাছের আটা প্রক্ষেপ দিয়া সেইজলে মুখ ধুইবে।

(৬) মুথা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা পাতা, খদিরকাষ্ঠ, বেণার মূল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ—ইহাদের কাথ দিয়া মুখ ধৌত করিবে।

কাহারও দাঁত তুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে নিম্নলিখিত মুখধৌতির ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

Re.

এলকোহল	...	১০০ ভাগ।
টিংচার রেটানী	...	৪০ ভাগ।

এসিড্ বেঞ্জোইক্	...	৮ ভাগ।
স্তাকারিণ	...	৪ ভাগ।
ওলিয়াই মিন্থাপিপ	...	½ ভাগ।
ওলিয়াই সিনামোমাই	...	½ ভাগ।

একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহার পঞ্চাশ ফোঁটা লইয়া আধ পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা মুখ ধুইতে হইবে।

জিহ্বাদির অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। বিগলন। শোণিত স্রাব। পচন জন্য ফুস্ফুস্ প্রদাহ। গলকোষের সেলুলাইটিস্।

এই শ্রেণীর অস্ত্রোপচারে—খুব সতর্ক হইলেও—সামান্য পরিমাণ পচন দোষ সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা পরিহার করা অসাধ্য। জিহ্বায় অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে দেখিবে—রোগীর কোন দন্তে ক্ষত বা অপর কোন দোষ আছে কিনা? থাকিলে, প্রথমেই সেই দন্তটীকে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। পরে, ২।৪ দিন পচন নিবারক ঔষধ দিয়া মুখ ধৌত করিয়া অস্ত্রোপচার করিবে।

জিহ্বায় অস্ত্রোপচার করার পর রোগীকে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিলে, স্রাব বাহির হইয়া যায়, মুখ গহ্বরে সঞ্চিত থাকে না।

এই অবস্থায় উষ্ণ বোরাসিক দ্রব বা তদ্রূপ অন্য কোন দ্রব দ্বারা মুখের মধ্যে ইরিগেসন করিলে,—সমস্ত স্রাবই ধৌত হইয়া যায়। ইরিগেটারের নল কাচের হওয়া চাই। অতি অল্প সঞ্চাপে ইরিগেসন প্রয়োগ করিতে হয়। ইরিগেটারের অভাবে পিচকারীর দ্বারাও কাজ চলিতে পারে।

রোগীকে তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রাখিলে ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য হইতে পারে না। জিহ্বা কর্ত্তন করার পর তাহার যে অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া শ্বাসরোধ উপস্থিত করিতে পারে না। কাসি উপস্থিত ও হইতে পারে না।

জিহ্বায় অস্ত্রোপচারের পর, রোগীকে পথ্য দিবার সময়, একটী বাটীতে ৩।৪ ইঞ্চি দীর্ঘ রবারের নল সংলগ্ন করিবে, এবং বাটিতে দুগ্ধাদি তরল খাদ্য পূর্ণ করিয়া, নলটী গলার অভ্যন্তরে দিয়া বাটী অল্প উচ্চ করিয়া ধরিবে। ইহাতে খাইবার সুবিধা হইবে।

শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য।

(অবসর প্রাপ্ত—এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন)

ওলাউঠা হইতে আত্মরক্ষার উপায়।

—:০:—

ওলাউঠা অতি সাংঘাতিক পীড়া। ইহা যেখানে সংহারমূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তথাকার অধিবাসীগণের এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে একের পর একজে আক্রমণ করিতে থাকে, চিকিৎসার অভাবে—অসাবধানতায় শত শত লোক অকালে প্রাণ

বিসর্জ্জন করে। অনেক স্থলে মৃত্যুর সময় আত্মীয়স্বজনও কেহ উপস্থিত হননা। এমন কি, সেবা-শুশ্রূষাদির জন্যও লোকের একান্ত অভাব হইয়া উঠে। যদিও নিকটে ২।৪ জন চিকিৎসক থাকেন, তাঁহারাও ভয়ে জড়সড় হইয়া চিকিৎসা করিতে অস্বীকৃত হন। যাহাতে চিকিৎসা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও নিজ পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা করিয়া এ ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রতিষেধক ও মোটা-মুটি চিকিৎসা প্রদত্ত হইল।

ওলাউঠাদি চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এমন কি, অনেকে স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথিক ওলাউঠা ও রক্তামাশয় ইত্যাদিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যখন ওলাউঠা বহুব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়, তখন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাক্‌লগ্‌লিন নিরপেক্ষভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, "যদিও আমার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই এলোপ্যাথিক মতে, তথাপি আমি যদি ওলাউঠা দ্বারা আক্রান্ত হই, আমার চিকিৎসার ভার এলোপ্যাথের হাতে না দিয়া হোমিওপ্যাথের হাতেই দিব।

ইতিহাস—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গা নামক গ্রামে একটী মেলা উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হওয়াতে হঠাৎ এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভূমণ্ডলে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র অষ্ট্রেলিয়া ও আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ইহার ভীষণ আক্রমণ হইতে এ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়াছে।

ওলাউঠা অর্থে ভেদ বমন বুঝায়। (ওলা—নামা অর্থাৎ ভেদ, উঠা—বমন) ওলাউঠা এক প্রকার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই জীবাণু দেখিতে নখচিহ্নবৎ অর্থাৎ (,) কমার ন্যায়। এই জন্য এই জীবাণুকে Comma bacillus বলে। ইহার দৈর্ঘ্য $\frac{১}{২৫০০০}$ ইঞ্চ ও বিস্তার $\frac{১}{১২৫০০}$ ইঞ্চি। ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমনে এই জীবাণু বর্ত্তমান থাকে।

প্রতিষেধক—ইংরাজীতে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে Prevention is better than cure অর্থাৎ রোগ হইলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ জন্মিতে না দেওয়াই উচিত। এজন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

১। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে মনে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি রাখা আবশ্যক। পীড়ার চিন্তা আদৌ মনোমধ্যে স্থান দিবে না। সর্ব্বদা সৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিবে। এজন্য দেশ প্রচলিত হরি সংকীর্ত্তনাদি এত সুফলদায়ক হয়।

২। অধিকক্ষণ খালিপেটে থাকা উচিত নয়। নিয়মিত সময়ে লঘু ও পরিমিত আহার করা উচিত। দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপক্ক ফলমূল, অম্ল বা পচা দ্রব্য (বিশেষতঃ পচা মাছ মাংস) ভোজন, মাদক দ্রব্য ও দূষিত বায়ু সেবন বর্জ্জনীয়।

৩। পানীয় জল ও দুগ্ধাদি ফুটাইয়া ব্যবহার করা উচিত, কারণ জল ও দুগ্ধাদির

দ্বারা এই রোগ বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়। আহারীয় দ্রব্যে মাছি আদি বসিতে না পারে —এরূপভাবে ঢাকাইয়া রাখা উচিত।

৪। রাত্রি ১টার পর হইতে প্রাতে নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তৃষ্ণায় কাতর হইলেও কখন জলপান করিবে না।

৫। একটী পয়সা বা তাম্রখণ্ড কোমরে ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য তাম্রখনিতে যাহারা খননের কার্য্য করে, তাহাদের প্রায় কলেরা হয় না।

৬। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেরিং বলেন, পরিধানের জুতা ও মোজার অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া সেই জুতা ও মোজা ব্যবহার করিলে কলেরা প্রায় আক্রমণ করিতে পারে না।

৭। সংক্রামিত স্থানে কাহারও বাটীতে জলপান ও তাম্বূল গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

৮। কলেরা রোগীর ভেদ ও বমন যেখানে সেখানে না ফেলিয়া বাড়ীর সীমানার বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করা উচিত। যেখানে ভেদ বমি করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেনাইল ছড়া দিবে। সমস্ত গৃহ গন্ধকের ধূমে বিশোধিত করিবে।

৯। স্প্রীট ক্যাম্ফার বা সাধারণ কর্পূরের ঘ্রাণ প্রত্যহ মধ্যে মধ্যে লওয়া উচিত।

১০। সংক্রামিত স্থানে সুস্থ ব্যক্তিরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভিরেট্রাম এল্বাম ৬ষ্ঠ শক্তির বা কিউপ্রাম ৩০ শক্তির ১ ফোঁটা মাত্রায় ১ কাঁচ্চা জলের সহিত সেবন করিলে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না।

চিকিৎসা :—

ওলাউঠা রোগের ৪টী অবস্থা।

১। আক্রমণাবস্থা;

২। পূর্ণবিকাশাবস্থা।

৩। পতনাবস্থা।

৪। প্রতিক্রিয়াবস্থা।

আক্রমণাবস্থায় চিকিৎসা :—

প্রথম ভেদ হওয়ামাত্রেই রুবিনীর স্প্রীট ক্যাম্ফর সেবন করা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর দাস্তে মল থাকে ও বমন পিপাসার উদ্রেক না হয়, ততক্ষণ ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক দাস্তের পর ১ মাত্রা করিয়া, এইরূপে ২।৩ মাত্রা ঔষধ সেবনের পর যদি কোনও উপকার না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে দিবে।

উক্ত ক্যাম্ফার বালকদিগের জন্য ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ও পূর্ণবয়স্কের জন্য ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় চিনি কিম্বা বাতাসার সহিত সেব্য। ইহা কখনও জলের সহিত ব্যবহার করিবেনা। ক্যাম্ফার ঔষধটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত রাখিবে না। তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সমূহ গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

ক্যাম্ফারে কোনও উপকার না হইলে একোনাইট ১X ক্রম দিবে। তরল ভেদ, মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, পিপাসা, পেটবেদনা ইত্যাদিতে ইহা ব্যবস্থেয়। চতুর্দ্দিকে কলেরায় মৃত্যু হইতে দেখিয়া ভয় জনিত দাস্ত হইলে একোনাইট তাহার প্রধান ঔষধ। বমনের প্রধান ঔষধ ইপিকাক; বমন হইয়া গেলেও বমনেচ্ছার নিবৃত্তি না হওয়া লক্ষণে ইহা উত্তম ঔষধ। কিন্তু বমন হইলেই বমনেচ্ছার নিবৃত্তি লক্ষণে এন্টিম টার্ট ৬।

পূর্ণবিকাশাবস্থার চিকিৎসা।

চাউলধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, অত্যন্ত বমন, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী ক্ষীণ ও

অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম ১২ উপযোগী। ভেদ ও বমনের পরিমাণ কম, দুর্নিবার পিপাসা, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, অতিশয় অবসন্নতা, বমনের পর পাকাশয়ে অত্যন্ত জ্বালা, মূত্রাবরোধ, ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি লক্ষণে আর্সেনিক ৩০ ক্রম ব্যবস্থেয়। ভিরেট্রাম ও আর্সেনিকের পিপাসার পার্থক্য এই যে, ভিরেট্রামের রোগী একেবারে বেশী পরিমাণ জলপান করে ও আর্সেনিকের রোগী অতি অল্প অল্প বহুবার জলপান করে। ওলাউঠায় হস্ত ও পদদ্বয়ে অধিক মাত্রায় খিলধরা লক্ষণে কিউপ্রাম ৬ মহৌষধ। কিউপ্রামে খিলধরার কোনও উপকার না হইলে সীকেলী কর ৬ দিবে। পিত্তযুক্ত তরল ভেদ, অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট বমন, পরে পিত্ত বমন, বমনের পর জ্বালা, শেষ রাত্রিতে পীড়ার আক্রমণ প্রভৃতিতে আইরিস ভার্স ৩X ব্যবস্থেয়। পাকস্থালীতে অতিশয় যন্ত্রণা, জলপান করিবামাত্র উঠিয়া পড়া, সহসা পিচকারীর ন্যায় বেগে তরল মলস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে ক্রোটন টিগ ৬। উদরের মধ্যে গড়গড় কল্‌কল্ শব্দ, প্রথমে বমন, পরে ভেদ, হস্তপদের আক্ষেপ, সার্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, মলধোয়া জলের পরিবর্ত্তে আঠা আঠা শ্বেতবর্ণের তরল ভেদ ইত্যাদিতে জ্যাট্রোফা ৬ উপযোগী। ওলাউঠা রোগীর রক্তদাস্ত হইলে ইপিকাক ৩× ব্যবস্থেয়। রক্তভেদের সহিত শ্লেষ্মা থাকিলে মার্কুরিয়াস কর ৬ প্রযুজ্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হইলে ক্যান্থারিস ৬ দিবে। উহাতে উপকার না হইলে টেরিবিন্থিনা ৬ সেবন বিধি। মস্তকের রক্তাধিক্য জন্য প্রলাপ হইলে বেলেডোনা ৩০ ব্যবস্থেয়।

পতন অবস্থার চিকিৎসা।

হিমাঙ্গ অবস্থায় কার্ব্বভেজ ৩০ বিশেষ উপকারী ঔষধ। ভেদ বমন বন্ধ হইয়া উদর স্ফীত, কপালে ও গলায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, অতিশয় শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত গাত্রদাহ, নাড়ী বিলুপ্ত, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ ও বরফের ন্যায় শীতল লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। পতনাবস্থায় এসিড হাইড্রো সায়েনিক ৬ একটী মহৌষধ। মৃতবৎ দেহ, শীতল ঘর্ম্ম, ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ী লোপ, অচেতনাবস্থা ও গোঙ্গানি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উৎকষ্ট কার্য্য করে। পতনাবস্থায় এসিড হাইড্রোসায়েনিকের দ্বারা কার্য্য না হইলে কোব্রা বা ন্যাজা ৬ দিবে। বারম্বার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, উদরস্ফীত, সর্ব্ব শরীর নীলবর্ণ ও বরফবৎ ঠাণ্ডা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা পতনাবস্থার শেষ ঔষধ।

প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা।

এই অবস্থায় রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ঔষধ সেবন বন্ধ রাখা উচিত. কিম্বা লক্ষণানুসারে উপরোক্ত ঔষধ সমূহ দীর্ঘ সময় অন্তর অল্প মাত্রায় সেবন করান আবশ্যক।

মাত্রা—রোগের প্রবলতার সময় ১০।১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ ১ ফোঁটা মাত্রায় ও বালকের জন্য অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায়. শিশুদিগের জন্য সিকি ফোঁটা মাত্রায় সেবন আবশ্যক। ক্রমে দীর্ঘ সময় অন্তর ঔষধ সেবন করিবে।

পথ্য।

রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় ঠাণ্ডা জলই একমাত্র পথ্য। প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ভ হইলে রোগীকে খুব পাতলা জল-এরারুট অল্প লবণসহ দিবে। ওলাউঠার ভেদ বমন হইলে রক্তের

জলীয়ভাগ ও লবণাংশ বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং রক্ত গাঢ় হইয়া আসে। এজন্য জলসহ লবণ মিশাইয়া দিলে, উক্ত জল ও লবণাংশ রক্তমধ্যে সহজেই সঞ্চারিত হইয়া শারীরিক যন্ত্রাদিতে বল আনয়ন করে ও রক্ত গাঢ় করিয়া হৃৎপিণ্ডকে সহসা নিস্তেজ করিতে পারে না। কলেরায় এজন্য Saline Injection এত সুফলদায়ক হয়। *

ডাক্তার শ্রীমহাদেব মণ্ডল।

পিত্তজ-বিষাক্ততা।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষিগণ—পিত্তের শক্তি, কার্য্য, প্রভাব ও অবস্থানাদির আলোচনা করিয়া, তাহার স্বরূপ যেরূপ নিপুণ ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন, সেরূপ আর কোনও বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠক! আয়ুর্ব্বেদের পঞ্চবিধ পিত্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন; দেখিবেন—ভারতের ঋষি ভিন্ন পিত্ত-রহস্যের মীমাংসা করা অন্যের অসাধ্য। আয়ুর্ব্বেদের পিত্তরহস্য যিনি বুঝিতে পারিবেন, জগতের জীব-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে। পিত্ত-রহস্য সংক্ষেপে আলোচিত হইবার নহে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সে চেষ্টাও করিব না। আমি কেবল নব্য তন্ত্রের "পিত্তজ বিষাক্ততা" বুঝিবার প্রয়াস পাইব।

পিত্ত—বিষধর্ম্মাক্রান্ত। পিত্তের মধ্যে নানা পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলি পিত্তের উপাদান। এই সকল উপাদানের মধ্যে কোনটির পরিমাণ কতটুকু? তাহার বিষক্রিয়াই বা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা—আধুনিক বিজ্ঞানের অতি অল্প। কিন্তু চিকিৎসকের তাহা জানা উচিত। পিত্তজ বিষাক্ততার সাধারণ নাম—"কোলিমিয়া"। পিত্তের বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে যেটী প্রধান—তাহার বিলাতী সংজ্ঞা – Bilirubin. এই বিলিরুবিণের জন্যই পিত্তজ বিষাক্ততার অধিকাংশ লক্ষণ জীবদেহে প্রকাশ পায়।

বিলিরুবিণের রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ – $C_{32}\ H_{30}\ N_4\ O_6$.

ইহা অম্লের অনুরূপ পটাশিয়ম শ্রেণীর ধাতব পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া অনেক রকম মিশ্র পদার্থ উৎপাদন করে। পিত্তস্থলীর ভিতরকার পিত্তের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ এই বিলিরুবিণ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু শোষ যা হইতে নির্গত পিত্তে শতকরা ০.১ অংশ মাত্র বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত পরিমাণ বিলিরুবিণ উৎপন্ন হয়, অদ্যাপি তাহা সঠিক রূপে স্থির করা যায় নাই।

---

* আজকাল কলেরা রোগে অনেকেরই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস বলিয়া এপ্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম। আয়ুর্ব্বেদেও কিন্তু ওলাউঠা বা কলেরার অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আছে। আমরা সে চিকিৎসা-প্রণালী ইহার পর প্রকাশ করিব। আং সং।

কেবল এইটুকু জানা যায়—সুস্থব্যক্তির শরীরে ৫·৩ গ্রামের অধিক বিলিরুবিণ জন্মায় না। রক্তের বর্ণজ পদার্থ অবস্থাবিশেষে বিশ্লেষিত হইয়াই বিলিরুবিণের উৎপত্তি অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কিরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে যে ইহার উৎপত্তি হয়, এখনও তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

অন্ত্রের মধ্যে, রোগ-জীবাণু কর্তৃক "হাইড্রোজেন" হইতে "হাইড্রোবিলিরুবিণ" উৎপন্ন হয় এবং ইহাই ষ্টারকো বিলিনে পরিবর্ত্তিত হইয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই হাইড্রোবিলিরুবিণের কিয়দংশ অন্ত্র মধ্যে শোষিত হইয়া, পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া "উরুবিলিণ" রূপে মূত্রসহ নির্গত হইয়া থাকে। বিলিরুবিণ হইতে "উরুবিলিনের" উৎপত্তি ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

জীব দেহের গুরুত্বের সের প্রতি ৬০০০ পিত্ত পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করিলে [বিধান মধ্যে]—আক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই পিত্তকে যদি জান্তব অঙ্গারের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া তাহার বর্ণক পদার্থ দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পিত্তের বিষক্রিয়া দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

বিষধর্ম্মাক্রান্ত বিলিরুবিণ যদি দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তাহা মল-মূত্রাদির সহিত নির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলে সমগ্র শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে, পৈশিক উত্তেজনার আধিক্য হয়। এই অবস্থার নামই—Nervousness অর্থাৎ স্নায়বীক দুর্ব্বলতা।

যকৃতের দোষ—বিলিরুবিণ পিত্তের সহিত বাহির হইয়া অন্ত্রের মধ্যে না গিয়া, তথা হইতেই শোষিত হয়। পিত্তবহা সূক্ষ্ম নলের আবদ্ধতা, যকৃতের ক্ষয় (সঙ্কোচন—সিরোসিস) এবং কোষের দোষেই—ইহা হইয়া থাকে। ত্বকের বর্ণ পিত্তের বর্ণে রঞ্জিত দেখিলে এই অবস্থাই ধরিয়া লইতে হইবে। পিত্তজ বিষাক্ততা ধরিবার সহজ উপায় রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ—তাহার আবশ্যকতা মনে করিতেন না। তাঁহারা রোগীর দেহের অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়াই তাহা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতেন। নিম্নে পিত্তজ বিষাক্ততার সাধারণ লক্ষণ লিপিবদ্ধ হইল।

স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, অনুদ্যম, (কোন কার্য্যেই মন নিবিষ্ট হয় না) স্নায়বীয় উত্তেজনা খিটখিটে স্বভাব, মানসিক বিকার, অজীর্ণ (খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়না।) আহারান্তে পেটভার বোধ হয়, ইহার ১ কি ২ ঘণ্টা পরে পিপাসা বোধ, অম্লোদ্গার, আহারের পরই পাকস্থালীতে বেদনা বোধ, (এই বেদনা কয়েক মুহূর্ত্ত পরে নিবৃত্তি হয়, ৩।৪ ঘণ্টা পরে আবার দেখা দেয়) আহার্য্য বস্তু যেন পাকস্থালী হইতে গলদেশে উঠিতেছে এইরূপ অনুমান; বিবমিষা (গা বমি বমি) কখনও বা বমন; কোষ্ঠবদ্ধতা, মধ্যে মধ্যে অতিসার, মল অম্লাক্ত, বাহির হইবার সময় গুহ্যদ্বার জ্বালা করে, মলে যথেষ্ট পরিমাণে পিত্ত মিশ্রিত থাকে, শ্লেষ্মাও শোণিত ও মিশ্রিত থাকিতে পারে। কখন কখন—বমি ও অতিসার এক সঙ্গে উপস্থিত হয়। নাড়ী—কখনও স্বাভাবিক, কখনও দুর্ব্বল, মৃদু, উত্তেজিত, এবং বিষম গতি বিশিষ্ট। মুখের লালা অম্লাক্ত, মুখে তিক্ত স্বাদ, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, দৈহিক উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি—স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত (অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে ৭টার সময় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তাপ

বেশী হয় অপরাহ্নে উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম) রোগী মনে করে তাহার বুঝি জ্বর হইয়াছে। কখনও নাসিকা হইতে কখনও বা মুখ হইতে শোণিতস্রাব। বৃদ্ধ হইলে চক্ষু হইতে কখন কখন রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোক হইলে অধিক আর্ত্তবস্রাবও দেখা যায়।

ত্বক অপরিষ্কার, পীতাভ, (ঈষৎ লঘু হরিদ্রা বর্ণের আভাযুক্ত) হস্তের পশ্চাতে ও পদের পৃষ্ঠে—এই বর্ণপরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পর্ব্বাস্থির সংযোগ স্থলের ত্বকে ঐরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন নাও দেখা যাইতে পারে। উভয় সন্ধির মধ্যবর্ত্তী স্থলেই বর্ণপরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট দেখা যায়। হাতের তেলো, পায়ের তলা, মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও বিন্দু বিন্দু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগের প্রবলাবস্থায় সমস্ত শরীরের ত্বকই বিবর্ণ হইয়া যায়, স্থানে স্থানে গাঢ়বর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক বিকারের নানা লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই সকল লক্ষণের দিকে চিকিৎসককে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেননা, অনেক সময় ম্যালাঙ্কোলিয়ার লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী বিমর্ষভাবে বসিয়া বা শুইয়া থাকে, সামান্য ত্রুটীতে অত্যন্ত রাগিয়া ওঠে। অনিশ্চিত বিষয়ের আশঙ্কা করে। মৃত্যুকামনা করে। তবে আত্মহত্যা করে না। নানারকম শব্দ শুনিতে পায়। দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, শরীরক্ষয়, শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বা উন্মাদ হইয়া যায়।

দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—যকৃত সামান্য একটু হ্রাস, প্লীহা সামান্য একটু বড়, কিন্তু সকল রোগীর ইহা হয় না।

পিত্তজ-বিষাক্ততারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায়—পূর্ব্বে অজীর্ণ (ডিসপেপসিয়া) ছিল, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না। এই কোষ্ঠবদ্ধতায় রোগী বহুদিন ধরিয়া কষ্ট পাইয়াছে, এই কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যই শরীর বিষাক্ত হইয়াছে।

পাকস্থালীর মধ্যে জৈবিক অম্লের উৎপত্তি, তজ্জন্য যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, সূক্ষ্ম পিত্তবহা আক্রান্ত হওয়ায়—পিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে বহির্গত হইতে পারে না,—লসিকার মধ্যে থাকিয়া যায়, পাকস্থালীর উৎসেচন ক্রিয়ায় ফলে যকৃতের সঙ্কোচন (সিরোসিস) হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, পিত্তনলীর প্রদাহ ইহা হইতেও হইতে পারে।

এইরোগে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা খুব কঠিন। ডাক্তারেরা অল্প মাত্রায় পারদ ঘটিত ঔষধ এবং গ্লাইকোকোনেট সোডিয়ম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আর্টিফিসাল সিরসের পিচকারীর ব্যবস্থা করেন। কেহবা ক্ষারাক্ত ঔষধ এবং সোডিয়ম স্যালিসিনেট প্রয়োগের উপদেশ দেন।

আমি অনেক রোগীকে কবিরাজী মতে চিকিৎসিত হইতে দেখিয়াছি। গুলঞ্চ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি বেঙ্গলের গুলঞ্চ লিকুইড প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। ২ তোলা গুলঞ্চ—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া—৪ ঔন্স শিশিতে পূরিয়া ৪ দাগ—৩ ঘণ্টান্তর করিয়া খাইতে দিয়াছি। ইহাতেও বেশ উপকার পাইয়াছি। রোগের প্রথমাবস্থায়—গুলঞ্চ প্রয়োগ করিতে পারিলে, রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইবে। অথচ গুলঞ্চ সর্ব্বজন পরিচিত, সহজ প্রাপ্য, সুলভ মহৌষধ। ফলত্রিকাদিপাচনও পিত্তজ বিষাক্ততার একটী ফলপ্রদ ঔষধ। হরীতকী,

বহেড়া, আমলা গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরাতা ও নিমছাল—এই ৮টী জিনিষ প্রত্যেকটী ।০ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, ৪ ঔন্স শিশিতে পুরিয়া ৩ ঘণ্টান্তর সেবন করিলে—পিত্তজ বিষাক্ততার বিশেষ উপকার হয়। এই পাচনটী যকৃতের উত্তেজক। ইহাতে ত্বকের বিবর্ণত্বের হ্রাস হইয়া থাকে। ত্বকের বিবর্ণত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে বুঝিতে হইবে—পীড়ার লক্ষণও হ্রাস হইয়াছে। শুনিয়াছি—মণ্ডুর ভস্ম নাকি এ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু আমি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
এল, এম, এস।

বনৌষধি।

আদ্রক-আদা, হিঃ আদরক।—বঙ্গদেশে আদার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন গৃহস্থ-বাড়ীতেও ইহা যত্নে রক্ষিত হয়। হিন্দী ভাষায় আদাকে অদরক বলে।

আদা কাঁচা ও শুষ্ক দুই রকমে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আদাকে শুঁঠ বা শুণ্ঠী বলে। কাঁচা ও শুষ্ক আদার পৃথক পৃথক গুণ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশ হইতে বহু পরিমাণে আদা ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা হইতেই "টিঞ্চার জিঞ্জার' ও "সিরাপ জিঞ্জার' প্রস্তুত হয়।

আদ্রকের গুণ।—কাঁচা আদা অগ্নি বৃদ্ধিকারক, কফনাশক, বিরেচক, মুখরোচক। আদার স্বরস ঔষধের সহ পানার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদ্যকমতে কাঁচা আদা অপেক্ষা শুঁঠের ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়।

ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কাঁচা আদা কিঞ্চিৎ লবণের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও মুখে রুচি হইয়া থাকে।

সন্নিপাত জ্বরে আদা।—আদার রসে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ (শুঁঠ, পিঁপুল মরিচ) মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিবে, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ করিলে বক্ষের, গলার ও কণ্ঠের শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শরীরের লঘুতা জন্মিবে। ইহা স্বরভঙ্গেও বিশেষ উপকারী।

অতিসারে আদা।—অত্যন্ত প্রবল অতিসারে যাহার মল কোনপ্রকারেই রোধ করা যাইতেছে না, তাহার নাভীর চতুঃপার্শ্বে শুষ্ক আমলকী বাটিয়া আলিবদ্ধ করিবে, তৎপরে ঐ আমলকী বেষ্টিত স্থানে (নাভি মূলে) কাঁচা আদার স্বরস পরিপূর্ণ করিয়া ২।৩ ঘণ্টা রাখিবে। ইহা অতিসার রোগে একটী শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোগ, ইহাতে প্রবল অতিসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।"

গ্রহণী রোগে শুঁঠ।—শুণ্ঠি (আদা শুঁঠ) কল্কের সহিত গব্যঘৃতে পাক করিয়া

চারি আনা কিম্বা ছয় আনা মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী উপশমিত হয়। ইহা বায়ুর অনুলোমক।

রক্তস্রাবে আদা।—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে শুঁঠ ২ তোলা, জল দেড় পোয়া গব্যদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া—একত্রে জাল দিয়া দুগ্ধ শেষ রাখিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিবে, ইহাতে রক্ত স্রাব বন্ধ হইবে।

অতিসারে শুঁঠ।—শুঁঠ ১ তোলা, বালা ১ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, এই ক্বাথ পান করিলে অতিসারের নিবৃত্তি হয়। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক।

ক্ষত স্থানে শুঁঠ।—ক্ষতক্ষীণ রোগী প্রত্যহ শুঁঠ চূর্ণ।০ চারি আনা পরিমাণ জলের সহিত সেবন করিবে, ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে ব্যাধির উপশম হইবে। এক পক্ষ কাল এইরূপ নিয়মে সেবন করিবে।

উদরী রোগে আদা।—উদরী রোগে প্রত্যহ প্রাতে আদার রস ১ তোলা ও দুগ্ধ ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। (২) দশগুণ আদার রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অঙ্গে মালিশ করিবে। ইহাতে উদরী রোগের উপশম হইবে।

আমদোষে শুঁঠ।—গরম জলের সহিত প্রত্যহ চারি আনা পরিমাণ শুণ্ঠী চূর্ণ সেবন করিলে আম পরিপাক হয়, ইহা বিশেষ অগ্নি বর্দ্ধক।

আমাতিসারে উদর বেদনায় শুঁঠ।—শুণ্ঠী চূর্ণ কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া পরে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া একটী মোষ প্রস্তুত করিবে। ঐ মোষ ঘুঁটিবার অগ্নিতে মৃদুপাক করিবে, পাকশেষে শীতল হইলে অভ্যন্তরস্থ ঔষধের চূর্ণ দুই আনা পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সামান্য জলসহ সেবন করিলে উদরের আমজনিত বেদনার উপশম হয়।

কর্ণশূলে আদা।—তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব মিশ্রিত পূর্ব্বক ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের আভ্যন্তরিণ বেদনার নিবৃত্তি হয়।

কাসে আদা।—খুসখুসে কাসিতে কাঁচা আদা খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে, পরে উহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মাখাইয়া একটী শলাকা দ্বারা আদার টুকরাগুলিকে বিদ্ধ করিয়া তৈলের প্রদীপের শিখায় সেঁকিয়া লইয়া ২।১ টুকরা করিয়া চিবাইয়া সেবন করিবে, ইহা সর্দ্দি কাসির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুল্মরোগে আদা।— সর্জিকাক্ষার (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) ও আদা সমভাগে লইয়া, বাটীয়া ৪ রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে রক্তজ গুল্ম উপশমিত হয়।

শীতপিত্তে আদা।—রক্ত এবং পিত্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতপিত্তরোগ জন্মে, ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে অথবা দেহের স্থানে স্থানে চাকা চাকা মণ্ডলাকৃতি বোলতার দংশনের ন্যায় দৃষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত আদার রস সেবন করিলে ইহা উপশমিত হইয়া থাকে।

বিষম জ্বরে শুণ্ঠী।—শ্বেত বেড়েলার মূলের ছাল ও শুণ্ঠী সমভাবে গ্রহণ করিয়া উহার ক্বাথ করিবে। (১ তোলা বেড়েলা, ১ তোলা শুঁঠ, জল ॥০ সের, শেষ ৵৹ পোয়া)

প্রত্যহ প্রাতে এই ক্বাথ পান করিলে শীতকম্প দাহযুক্ত বিষম জ্বর উপশমিত হয়।

হিক্কায় শুঁঠ।—ছাগী দুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর পাকানুযায়ী শুন্ঠীর ক্বাথ হিক্কা নাশক।

শিরোরোগে শুণ্ঠী।—শুণ্ঠি চূর্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে শিরোরোগের উপশম হয়।

শূলরোগে শুণ্ঠী।—শূলরোগে ।৵০ আনা শুঁঠ, ৵০ আনা বিট লবণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম হয়।

শুঁঠ-বায়ুনাশক, বেদনা নিবারক, ইহা গলরোগ নাশক, শ্লেষ্মা প্রশমক, অগ্নিমান্দ্য বিসূচিকা, উদরাময়, পেট ফাঁপা, শোথ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

বাতজনিত বেদনা স্থানে।—শুণ্ঠীচূর্ণ, তার্পিণ তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, উহাতে কিঞ্চিৎ সজিনার ছালের রস ও ধুস্তূর পাতার রস মিশ্রিত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট বাতের মালিশ হয়।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

ডাক্তারের ডায়েরি।

[স্বর্গীয় মহাত্মা ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত]

(১৯০৬)

—:০:—

কার্ব্বলিক অ্যাসিডের কুফল।

অনেক ডাক্তারের বিশ্বাস—কার্ব্বলিক অ্যাসিডের স্থানিক প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, কার্ব্বলিক অ্যাসিডে ঘা পচিতে পারে। এরূপ দেখা গিয়াছে—শতকরা দুই অংশ শক্তির কার্ব্বলিক দ্রব দিয়া কোন রোগীর আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গুলি আবৃত রাখা হইয়াছিল! পরদিন ঐ অঙ্গুলিতে গ্যান্‌গ্রিন হইয়াছিল। কোনও যুবকের আঙ্গুলে বেদনা হওয়ায়—কার্ব্বলিক লোশন (মৃদু প্রকৃতির) প্রয়োগ করা হয়। ৫।৬ দিন পরে ঐ আঙ্গুলে গ্যান্‌গ্রিন্ হইয়া অস্থি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। বালক বালিকার শরীরে অল্প পরিমাণে কার্ব্বলিক প্রয়োগ করিলেও স্থানিক পচন আরম্ভ হইতে পারে। কার্ব্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে পীড়িত স্থান পীতাভ পাটল বর্ণ ধারণ করে; ক্রমে ঐ স্থানের বর্ণ কাল হইয়া যায়। আক্রান্ত স্থানের স্পর্শজ্ঞান লোপ পায়, কোমল হয়। শেষে পচিতে আরম্ভ করে। মাংস বিগলিত হইয়া পৃথক হয়। অতএব ডাক্তার ভায়ারা এবং সাধারণ গৃহস্থেরা—কার্ব্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সতর্ক হইবেন।

আফিং পরিত্যাগের ঔষধ।

যদি কোন ব্যক্তি আফিম সেবনের বদ-ভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ডাক্তারের

শরণাগত হন, ডাক্তার তাঁহাকে "হায়সিন হাইড্রোব্রোমেড" ব্যবস্থা করিবেন। ইহা প্রয়োগ করিয়া আমি দিল্লীর কয়েকজন আফিংখোর ভদ্রলোককে আফিম ছাড়াইয়া দিয়াছি।

আফিম পরিত্যাগেচ্ছু ব্যক্তিকে ডাক্তার এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সর্ব্বদাই তাহাকে দেখা চলে। এমন একটী ঘর চাই, যে ঘরে কোনও দ্রব্যাদি থাকিবে না, অথচ ঘরটি অন্ধকার হইবে। হায়সিন সেবনে রোগীর শরীরে উন্মত্ততার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। চক্ষে আলোক লাগিলে উত্তেজনা আসিতে পারে। রোগীর কাছে একজন বিশ্বাসী—সুশ্রূষাকারীকে রাখিতে হইবে।

হায়সিন প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আফিংখোরের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং মূত্রযন্ত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। ঐ সমস্ত যন্ত্রের কোনও পীড়া থাকিলে, প্রথমে তাহারই চিকিৎসা করিবে।

যে দিন হায়সিন ব্যবহার করাইবে, তাহার পূর্ব্বদিনে—রোগীকে উষ্ণজলে স্নান করিতে বলিবে—গায়ে যেন ময়লা না থাকে। তা'রপর ষ্ট্রিকনিন সালফেট দুই ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করাইবে। রাত্রে ক্যালমেল, পডফিলিন এবং ইপিকাক সেবন করাইয়া ভোরের সময় লবণ ঘটিত জোলাপ দিবে।

ইহাতে হৃৎপিণ্ড সবল হইবে, যকৃতের ক্রিয়া ভাল হইবে, শরীরস্থ সঞ্চিত দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। 'গা' বমি, পেটবেদনা, পেটের পীড়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিবে না।

অভিজ্ঞ এবং সাহসী চিকিৎসক ভিন্ন—হায়সিন প্রয়োগ বড়ই শক্ত ব্যাপার। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ১ গ্রেণ মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রত্যেক ঘণ্টায় ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। হায়সিনের ক্রিয়া রোগীর দেহে প্রকাশ পাইবা মাত্র বন্ধ রাখিবে। যখন দেখিবে—নাড়ীর গতি মৃদু (প্রতি মিনিটে ১৫ বার) হইয়াছে, মুখমণ্ডল উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে, কনীনিকা প্রসারিত এবং জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছে, রোগী সামান্য প্রলাপ বকিতেছে, অথবা কল্পিত বস্তু দর্শন করিয়া উন্মাদের মত তাহা ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে—তখনই বুঝিবে—হায়সিনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল লক্ষণ যাহাতে ৩০।৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, সেজন্য অতি অল্প মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ করিবে। ইহার পরই রোগী প্রকৃতিস্থ হইবে, অথচ আবার হায়সিন খাইতে চাহিবে। কিন্তু আর দিবে না। ইহার ২।১ দিন পরেই রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে। আফিমের অভ্যাস দূর হইবে, শরীরে উৎসাহ ও বল ফিরিয়া আসিবে।

রোগীর প্রলাপ ও অজ্ঞানাবস্থা দেখিয়া ভয় করিও না। রোগী যে পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সে পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা হায়সিন প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাহারক।

অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীকে সংজ্ঞাহারক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। আমার বিশ্বাস—সংজ্ঞাহারক ঔষধের মধ্যে ইথিল ক্লোরাইড খুব ভাল। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়। রোগীকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় না পাইলে ইথিল ক্লোরাইড সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাহারক। ইহাতে ৫।৬ মিনিটের মধ্যে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পুনরায় তাহার জ্ঞান হইতে ১০

মিনিটের অধিক সময় লাগেনা। ক্লোরফরম ও ইথরের পরিবর্ত্তে—ইথিন ক্লোরাইডের বহুল প্রচলন আবশ্যক।

চাউল জলে অম্ল নিবারণ।

অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও দেখিয়াছি—অম্ল বা অজীর্ণ হইলে তাহারা আস্ত চাউল জল দিয়া গিলিয়া থায়। কেহ কেহ ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্যও এরূপ করিয়া থাকে।

এ নিয়মটী খুব ভাল। যাঁহাদের অজীর্ণ রোগ আছে, ক্ষুধা ভাল হয় না তাঁহারা প্রত্যহ আহারের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে—৫।৭টী আস্ত চাউল (না চিবাইয়া) জল দিয়া গিলিয়া খাইবেন। ইহাতে Stomach এর (আমাশয়) অজীর্ণ জনিত যাবতীয় পদার্থ অতি শীঘ্র পক্কাশয়ে নির্গত হইয়া যায়। আস্ত কাঁচা চা'ল—অজীর্ণ রোগীর পেটে হজম হয় না ইহা সত্য, কিন্তু ঐ চা'ল পাকাশয় ও আমাশয়কে উত্তেজিত করিয়া থাকে. তাহার ফলে রোগীর পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

এস্পাইরিণের বিষক্রিয়া।

স্যালিসিলেট অফ সোডার মন্দ ফল দেখিয়া উহার পরিবর্ত্তে আজকাল এস্পাইরিণ প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু এস্পাইরিণও নির্দ্দোষ নহে—ইহারও বিষক্রিয়া আছে। ধাতু ও প্রকৃতি বুঝিয়া সেই বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। এমন কি ১০ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ বার এস্পাইরিণ ব্যবহার করিয়া অনেকের দেহে বিষক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি।

কাহারও হৃদপিণ্ড, কাহারও পেশী কাহারও বা মস্তিষ্কের স্পর্শবোধক সমস্ত স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়। বিষ ক্রিয়ার লক্ষণও সর্ব্বত্র এক নহে। কাহারও কর্ণে প্রদাহ হয়, কাহারও মুখ ফোলে, কাহারও প্রস্রাব সবুজ বর্ণ হয়। কাহারও বা শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। কেহ বা দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কাহারওবা অনেক বার অধিক মাত্রায় প্রস্রাব হইতে থাকে।

অতএব এস্পাইরিণ অধিক মাত্রায় হঠাৎ প্রয়োগ করিওনা। অল্প মাত্রায় দিবে। মাত্রা ৫ গ্রেণের বেশী না হয়।

বহুমূত্র রোগে—বঙ্গ প্রয়োগ।

রাং নামক ধাতুকে কবিরাজী শাস্ত্রে 'বঙ্গ' বলে। রাঙের মধ্যে পদ্ম রাং উৎকৃষ্ট। ইহা ভস্ম করিয়া লইতে হয়। ভস্ম করা রাং বহুমূত্র রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি উরানিয়ম প্রয়োগে তিনটী বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা করি। বিশেষ কোন ফল পাই নাই, উরানিয়ম নাইট্রেট—অতি সাবধানে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিতে হয়। আমি এই তিনটী রোগীকে আহারের পর ১ গ্রেণ উরানিয়ম যথেষ্ট পরিমাণ জলসহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিতাম, প্রত্যহই ইহাদের প্রস্রাব পরীক্ষা করিতাম। প্রস্রাবে অণ্ড লাল প্রচণ্ড হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধ বন্ধ করিতাম। উরানিয়মের দোষ—ইহাতে অণ্ড লাল বাড়ায়। কোষ্ঠবদ্ধতাও উপস্থিত করে।

অবশেষে—ইহাদিগকে বঙ্গভস্ম খাইতে দিই। ইহাতে বেশ সুফল ফলিয়াছিল। প্রত্যেক রোগীর খুব উপকার হইয়াছিল।

"বঙ্গ"—রোগীর দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। ঔষধের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়াইলে, ঐ গুরুত্ব বহুদিন স্থায়ী হয়। "বঙ্গ" প্রস্রাবের শর্করা কমাইয়া দেয়। রোগীর উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি করে। স্নায়বিক বেদনা নিবারণ করে।

"বঙ্গ" যক্ষ্মারোগীরও ক্ষয় নিবারণ করে,— দৈহিক গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—হিন্দুরা এই অপূর্ব্ব ঔষধের আবিষ্কার করিয়া ছিলেন !! বঙ্গের অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া ঋষিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

বঙ্গের গুণ পরীক্ষা করিয়া আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ;—

বঙ্গ—ক্ষত শুষ্ক করে, রক্ত রোধ করে, অণ্ডলাল সংযত করে, প্রস্রাবের চিনী কমায়, দৈহিক গুরুত্ব বাড়ায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে, ক্ষয় নিবারণ করে।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য দেশী ও বিলাতী মুষ্টিযোগ।

কুড় নামক বণিক দ্রব্যের গুঁড়া, জামের আঁটীর গুঁড়া, তেজপাতার গুঁড়া ও পাপ্‌ড়ি খয়ের একত্র মিশাইয়া দাঁত মাজিবে।

স্যাকারিণ ১৫ গ্রেণ, সোডাবাইকার্ব্ব ১৫ গ্রেণ, অ্যাসিড স্যালিসিনিক ৩০ গ্রেণ, এলকোহল ৩ উন্স। একত্র মিশাইয়া শিশির মধ্যে রাখিবে। ইহার কয়েক ফোঁটা ১ গ্লাস জলে দিয়া, সেই জলে কুলকুচা করিবে।

রোগ নির্ণয়ের ভ্রম।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আর একটী বিভ্রাট সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। সন্ধিস্থলে বেদনা হইলেই অনেক ডাক্তার তাহাকে "রিউমেটিজম্" নামে অভিহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে "রিউমেটিজমের" অমোঘ ঔষধ স্যালিসিলেট অফ সোডা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাক্তার যদি একটু ধীরভাবে রোগটী পরীক্ষা করিতেন তাহা হইলে হয় ত সে বেদনা অন্য পীড়া বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। মাঝে থেকে রোগীকে মিছামিছি স্যালিসিলেট খাইয়া অনর্থক কষ্ট পাইতে হইত না। দুঃখের বিষয় ডাক্তার তাহা করিলেন না, তিনি সন্ধির বেদনা মাত্রকেই 'রিউমেটিজম্' স্থির করিয়াছেন। কাজেই রোগীকে স্যালিসিলেটের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ফলে – স্যালিসিলেট খাইয়া রোগীর পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিল। কিডনীর কার্য্য বাড়িল, ক্ষুধা কমিল, পোষণ ক্রিয়ার বিঘ্ন হইতে লাগিল, জীবনীশক্তিও আংশিক নষ্ট হইয়া গেল।

অবশ্য অল্প মাত্রায় স্যালিসিলেট প্রয়োগ করিলে এতদূর মন্দ ফল হয় না। কিন্তু ডাক্তার যখন দেখেন—ঔষধ প্রয়োগে ফল হইতেছে না, তখন তিনি অধিক মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করেন। ঠিক রোগ ধরা পড়ে নাই —ইহা তাঁহার মনেই হয় না।

আমার চ'খের সম্মুখে আমি এইরূপ ৫।৬টী রোগী দেখিয়াছি—যাহাদের সন্ধিস্থলের বেদনা "রিউমেটিজম" আখ্যা পাইয়াছে। ডাক্তার রাশি রাশি স্যালিসিলেট খাওয়াইতেছেন, অথচ রোগীর বেদনার তিলমাত্র উপশম হইতেছে না। শেষে রোগী ডাক্তারের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়া কবিরাজের হাতে পড়িতেছে। ভালও হইতেছে। ডাক্তারের পক্ষে অবশ্যই ইহা লজ্জার কথা!

ষ্ট্রাফিলোকোকাস, গণোকোকাস টিউবারকেল বাসিলাস এবং অন্যান্য বহুবিধ রোগের বীজাণু কর্ত্তৃক সন্ধিস্থলে বেদনা হইতে পারে। এই সকল জীবাণুর উপর স্যালিসিলেটের কোনো প্রভাব নাই। সুতরাং স্যালিসিলেট প্রয়োগে পূর্ব্বোক্ত রোগ গুলিতে কোন উপকারের আশা করা যায় না। বরং অধিক মাত্রায় স্যালিসিলেট সেবনে রোগীর সমূহ অপকার হইয়া থাকে।

সম্প্রতি আমি একটী রোগী পাইয়াছিলাম। সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক। তাঁহার সন্ধিতে বেদনা হওয়ায় উপর্য্যুপরি ৩ জন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—তাঁহার বেদনা "নিউমোকোকাস্" জন্য। সন্ধিতে পূয হইয়াছে। ফুস্‌ফুস্ পরীক্ষায় প্রদাহের লক্ষণও পাওয়া গেল। সন্ধির আবরক ঝিল্লীতে স্রাব সঞ্চিত হওয়ায় প্রদাহ এবং স্ফীততা দেখা দিয়াছিল। পচন দোষের লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। জ্বর কমিত, বাড়িত। এস্‌পিরেট করিয়া যে পূয পাইলাম তাহার বর্ণ পীতাভ সবুজ, গন্ধহীন, সূত্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত। ইহাতে নিউমোকোকাউ বর্ত্তমান ছিল।

পূয বাহির করিয়া দিয়া লক্ষণানুযায়ী ঔষধাদি দিয়া—আমি তাঁহাকে অনেকটা সুস্থ করি। এখন তিনি সালসা খাইতেছেন। এক-জন বৃদ্ধ হাকিমি চিকিৎসা করিতেছেন।

ডাঃ শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত।
এল্ এম্ এস্।

ব্রহ্মচর্য্যে বালকসমাজ।

—:০:—

বালক স্বাস্থ্য বিষয়ে 'আয়ুর্ব্বেদে' ত অনেক প্রবন্ধই বাহির হইয়া গেল ও সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আরও হইবে। কিন্তু 'কাজের কথা', ঔষধের কথা, বালক রক্ষার উপায়ের কথা এখনও ভালো করিয়া বলা হইল না ত! যথা বাহান্ন—তথা তিপ্পান্ন! এতই যখন লেখা হইয়াছে, তখন আমি আরও কতকটা এ বিষয় লিখিতে চাহি, 'কাজের কথা' হইবে কি না বলিতে পারি না, তবে ঔষধের কথাও যে হইবে না—এমন নহে।

সত্য সত্যই আধুনিক ভারতীয় বালক-সমাজের কথা খুব করিয়া ভাবিবার বিষয়। যে অঙ্কুরই ভবিষ্যতে ফলফুলসমন্বিত মহা-মহীরুহে পরিণত হয়, সে অঙ্কুর বড় যত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত। যে বালক ভবিষ্যতের মানুষের খস্‌ড়া, তাহাকে সাবধানে রক্ষা না করিলে পরিণামের সমস্ত জাতিটা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। আমরা যে আজ এত হীন, ঘৃণ্য, দলিত, ক্লিষ্ট-ক্ষিপ্ত,—তাহার কারণ, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের বালকরক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ও আমাদের এখনকার ঔদাসীন্য ভবিষ্যতে একটী বীর্য্যহীন খর্ব্বকায় অজ্ঞ জাতির সূচনা করিতেছে। এ বক্তৃতার ভাষা নহে—এ কবিত্ব নহে; এ অতি বাস্তব —অতি সত্য কথা। ইহা আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে। কেন করিতে হইবে বলিতেছি।

আপনারা একবার সেই ধূমায়মান অতি অতীত হিন্দুযুগের মাঝে প্রবেশ করুন। সত্য বটে—সে মহিমোজ্জ্বল যুগের আজ বিশেষ কিছুই নাই—আছে বুঝি অতীত মহিমার ক্ষীণ ক্ষীণস্মৃতিগুলি—না, না, তাও বুঝি বিলুপ্ত প্রায়। কিন্তু তা'র যতটুকুই আছে—তত টুকুই বড় পবিত্র, বড় আশাব্যঞ্জক, বড় সত্য।

—এত সত্য যে তাহা শুদ্ধ ভারতবাসী কেন সমগ্র মানবজাতির আদর্শ হইবার যোগ্য। আমরা সেই গুরুগম্ভীর-ঋষিযুগ হইতে বালক শিক্ষার ক্ষীয়মান আদর্শটাকে বাছিয়া লইতেছি।

ঐ দেখুন, ঋষিকুল নদীর তীরে তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আছেন। তাঁহাদের জীবনের সাধনা, সমগ্র ইচ্ছা শিক্ষার কার্য্যে—বালক শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য গঠনের কার্য্যে-উৎসর্গীত। ঐ অসংখ্য কোমলমতি বালক সেই কুলপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে সমবেত। কুল পতির আহার-নিদ্রা নাই তাঁহার দিবারাত্র চেষ্টা—বালকগুলি কিসে মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবে—তাঁহার নিয়ত লক্ষ্য—বালকের শরীর ও মন যুগপৎ উন্নত হইতেছে কিনা। তখনকার আদর্শ ছিল—বালককে চরিত্রবান হইতেই হইবে, শারীরিক বলশালী হইতেই হইবে, মনস্বী হইতেই হইবে। বালক এই আদর্শকে পোষণ করিয়া গুরুগৃহের বহু বর্ষের সাধনার পর মানুষ হইয়া আসিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিত এবং বিবাহিত ও সংসারী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জনে মনোযোগী হইত। এই আশ্রমকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—এই আচরণকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য্য। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির মধ্যে এ চর্য্যা সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া ইহার ঐরূপ অর্থগত নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে অর্থের উপলক্ষণা দ্বারা পরিবর্ত্তনের ফলে যে কোন জাতির বাল্যের অধ্যয়ন, শরীর রক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি সংযত-শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইত। কিন্তু আধুনিক যুগে এ অর্থের আরো পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন ব্রহ্মচর্য্য বলিলে আবালবৃদ্ধবণিতার পক্ষে মাত্র বীর্য্যরক্ষা বুঝায়। এইরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তনের দুইটী কারণ—একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আধুনিক সভ্যতায় সমূলে বিলুপ্তি; আরএকটী হিন্দুর ক্রমশঃ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভাব ও শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। ব্রহ্মচর্য্যকে আগে বড় ভক্তির চক্ষে দেখা হইত, তাই ইহার শিক্ষার জন্য চতুরাশ্রমের একটী আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল—ইহাকে ধর্ম্মের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া, বালকজীবনের বিবিধ শিক্ষার সহিত একীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি সে শ্রদ্ধা—সে গৌরব আজিকার জগতের আদর্শ নহে। বীর্য্যধারণশিক্ষা এখন শ্লীলতার বহির্ভূত বিষয়। স্কুল কলেজের শিক্ষা হইতে তাই ব্রহ্মচর্য্যকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। তাই বিবাহিত জীবনে পুত্রকন্যার পিতা হইয়াও আধুনিক স্কুলকলেজে অধ্যয়ন সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু শ্লীলতার এ আদর্শ ত আমাদিগকে মুগ্ধ করে না। দর্শন-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়ীচালান শিক্ষা দিবার জন্য পর্য্যন্ত আধুনিক যুগে বিদ্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে, কিন্তু এত বড় একটা শক্ত কার্য্য—বীর্য্যরক্ষা তাহা অশ্লীল বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত দূরে থাকুক, আংশিক বন্দোবস্ত ও নাই। শিক্ষা ভিন্ন যদি গাড়ী খানা চালান মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে কোমলমতি, অজ্ঞ বালকের পক্ষে এত বড় একটা বিরাট যন্ত্র একটা ধাঁধা যে এই মনুষ্য শরীর—তাহাকে চালান কত বেশী অসম্ভব। তাহার অকৃতকার্য্যতা যে কত স্বাভাবিক! বালক সমাজ যে আজ বীর্য্য ক্ষয়ে ম্রীয়মাণ—আমি বলি, সেজন্য বালকের বিন্দুমাত্র দোষ নাই। সে দোষ তাহাকে যে আদর্শটী আমরা দিয়াছি তাহার, সে দোষ

তাহার শিক্ষা-প্রণালীর, সে দোষ সর্ব্বৈব আধুনিক প্রবীণ মনুষ্য সমাজের সভ্যতার। বালককে কেন আমরা অমন স্বাধীনতার কোলে ছাড়িয়া দিই? কেন তাহাকে সাহেব সাজাইয়া তৃপ্ত হই? কেন তাহাকে উগ্র—অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইতে দিই? কেন তাহাকে প্রতিপদে লক্ষ্য করি না। সে না বুঝিয়া যদি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলে, তবে অশ্লীলতার ভয়ে চক্ষু চাপিয়া না থাকিয়া, কেন উপদেশ দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিনা? আজ আমরা সত্যসত্যই বড় এক নিষ্ঠুর সভ্যতাকে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। জীবনমরণের যাহা বিষয়ীভূত—অশ্লীল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, আমরা বালককে—তথা মনুষ্যসমাজকে বিপন্ন, শ্রীহীন, ক্ষীণদেহ করিয়া দিতেছি।

আধুনিক বালক সমাজকে দেখিয়া চক্ষু কাটিয়া জল আসে না কি? তাহার শীর্ণদেহ, বিকশিত দশন, প্রকটিত কণ্ঠা, নয়ন নিম্নে নীলিমা, তাহার যক্ষ্মা, তাহার অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেখিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ কত অন্ধকারময় উপলব্ধি হইয়া বুক শুকাইয়া আসে না কি? চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না কি, যে আধুনিক সভ্যতার আদর্শ আমাদের পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার গরিমা, ইহার শৃঙ্খলা, ইহার শিক্ষা তপোবনবাসী ফলমূলাহারী সন্ন্যাসী হিন্দুর পুত্রের পক্ষে চলিবেনা।

বাস্তবিকই বালকশিক্ষার কেতন উড়াইয়া পথে-ঘাটে বক্তৃতা দিবার, পত্রে পুস্তকে লিখিবার দিন বহিয়া গিয়াছে। আমাদের বালক আজ আসন্ন মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিতে উপক্রম করিয়াছে। আর বিলম্ব না করিয়া আমাদেরও ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহাদিগকে আগুলিয়া রক্ষা করিতে হইবে। উপদেশের দিন কাটিয়া গিয়াছে। বালক শিক্ষার অভাবে যে অধঃপতনে গা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাকে শাসাইয়া আজ আর তা'র প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিকই এ বিষয়ে তিরস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তিরস্কার করিতে হয় আমাদের নিজেদিগকে, আমাদের অজ্ঞতাকে, আমাদেরই অর্জ্জিত শিক্ষাপ্রণালীকে, আর সর্ব্বোপরি যে নিখিল ভারতে পরনির্ভরতারূপ নিদারুণ অনর্থকে আনিয়াছে—সেই চিরকালের অচেনা কিন্তু সর্ব্বকাজের নেতা আমাদের অদৃষ্টকে।

যাহা আমাদের পক্ষে অতি গুরুতর, জীবন রক্ষার নিদান-তাহাকে লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলে আর আমাদের সৌভাগ্যের সম্ভাবনা নাই। তাই বালকরক্ষা বিষয়ে আজ সকলেই প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে থাকুন। ভাবিয়া দেখুন, পরের আদর্শ গ্রহণ, পরপদলেহন, পরের খাদ্যে তৃপ্তি—এসব যদি শীলতা ও সভ্যতা হয়—তবে নিজের আদর্শকে পোষণ করা,—পুনরুদযাপিত করা, আমার অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনা, আমার শুভকে ইচ্ছা করিয়া আমার জাতিকে বর্দ্ধিত করা—নিশ্চয়ই অশ্লীলতা নহে, পরন্তু সূর্য্যাপেক্ষাও ভাস্বর, গাঙ্গোদক অপেক্ষাও পবিত্র, স্বর্গ অপেক্ষাও ঈপ্সিত।

এত দিনত পরের আদর্শকে বুকে-মাথায় করিয়া রাখিলে, কিন্তু লাভ কি হইল? টাকায় একমন চাউল ছিল, এখন পাঁচ সের বিক্রীত হইতেছে, হস্তীর মত বলীয়ান ছিলে, আজ দশ সের ভার উত্তোলন করিতে বা দশমাইল পথ হাঁটিতে পার না, ধর্ম্মের দধীচি ছিলে, আজ

অখাদ্যে কুখাদ্যে তোমার তৃপ্তি, সুজলাসুফলা গিরিনদী-সমন্বিতা-ভারতভূমি স্বাস্থ্য জগতের মধ্যে আদর্শ স্থানীয় ছিল, আজ ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ-বসন্তের গুঁতায় লক্ষ প্রাণ ধ্বংস হইতেছে, তুমি গৃহে অন্নাভাবে কাঁদিয়া মরিতেছ, তোমারই ধন দেশান্তরের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। যাহাদের আদর্শ লইয়া তুমি স্বগৃহে বীর্য্যক্ষয়ে অলস শক্তিহীন, তাহারাই বলিষ্ঠ দেহের ও মানসিক তেজের স্পর্দ্ধায় তোমার সম্মুখ দিয়া বিচরণ করিতেছে। যাহার আদর্শ—তাহারই পক্ষে ভাল—অন্যের তাহা খাটে না। একটা বড় সভ্যতা একটা দুর্ব্বল জাতির পক্ষে মারাত্মক-হইয়া পড়ে। সভ্যতার পেষণে কত জাতি যে বিলুপ্ত হইয়াছে—ইতিহাসে তাহার নিদর্শনের ইয়ত্তা নাই। ভারতবাসী আজ পূর্ব্বাপেক্ষা ঢের দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক সভ্যতা তাহার পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে কিছুতেই ইহাকে হজম করিতে পারিতেছেনা। তাই ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীর এখন কর্ত্তব্য—এ সভ্যতার গ্রাস হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ান ও নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন ইহার আস্বাদনে বিরত থাকা। নিজেকে সে বৰ্দ্ধিত করুক—নিজস্বকে গ্রহণ করিতে যাইয়া যদি সে মরে—সে মরণও লোভনীয় ও বরেণ্য হইবে।

ভারতবাসি! আরো কি নবযুগ, নব আদর্শ, নব সভ্যতাকে বুকে করিয়া মরিবে? একবার জাগো। দেখো তোমার নিজস্ব কত উজ্জ্বল, কত মহার্ঘ, কত বরণীয়। নিজেকে নিজে চেন, নিজেকে নিজে প্রস্তুত কর, গড়িয়া তোল। বালক তোমার পুত্র, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তোমার বৃদ্ধত্বের যষ্টি, তোমার জাতির ভবিষ্যৎ আশা, তোমার গৌরবের অঙ্কুর। তাহাকে তুমি সুশিক্ষা দেও, তাহাকে তুমি রক্ষা কর। তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে চলিবে না। তা'র কি দোষ? সে ত বালকই বটে, সে যে অজ্ঞ, সে যে দুর্ব্বল, সে যে চঞ্চল। তাহার ভ্রম যে অবশ্যম্ভাবী। তাহাকে যদি জ্ঞানী, বীর, বলীয়ান, সুচরিত্র করিতে না পার, সে দোষ কে তোমারই। এ দোষের ভুল তুমি ত ভোগ করিবেই—এমন কি ভবিষ্যতের শত অনুশোচনা, অবিরল অশ্রুধারা—এ দোষকে প্রক্ষালিত করিয়া লইতে পারিবে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত)

—:০:—

শ্বেতচন্দন, মদন ফল,
শুলকা, চিনি, চা'লের জল,
বেশ ক'রে বেটে—দুধে দিয়ে—

গর্ভিণীকে দাও খাওয়াইয়ে।
প্রথম মাসের বেদনা হ'লে
এ মুষ্টিযোগে সুফল ফলে।

নীলোৎপল, পাণিফল, কেশুর নিয়ে,
চা'লের জলে নাও বাটিয়ে,
দ্বিতীয় মাসের ব্যথা হ'লে
শাস্ত্রে এ যোগ খেতে বলে।

আমলকী, কাঁকলা ক্ষীরকাঁকলা
গরম জলে বেটে—খাও দু'বেলা,
তৃতীয় মাসের ব্যথা যাঁ'র
এ যোগে নিবারণ হয় তা'র।
ঔষধ জীর্ণ হ'বে যখন,
শালি তণ্ডুলের অন্ন খেও তখন।

কুড়, শালুক, পদ্ম, নীলোৎপলে
বেটে নাও চিনির জলে,
তৃতীয় মাসে ব্যথা বড়—
দুধে মিশিয়ে পান কর।

নীলোৎপল, শালুক, কণ্টকারী
আর দুধ সহ বাট' গোক্ষুরী,
কিম্বা—গোক্ষুর, বালা, কণ্টকারী,
নীলোৎপল তা'য় মিশাল করি'
দুধে বেটে পান কর,
চতুর্থ মাসে যা'র ব্যথা বড়;

ক্ষীরকাঁকোলী, নীলোৎপল—
সমান ক'রে বাট' কেবল,
দুধ, ঘি আর মধু দিয়ে
পাঁচ মাসের ব্যথায় দাও খাওয়াইয়ে।
কিম্বা—নীলোৎপল, কাঁকলা সমান নিয়ে—

শীতল জলে নাও বাটিয়ে—
দুধে মিশিয়ে পান কর,
পাঁচ মাসে যা'র ব্যথা বড়।

———

টাবালেবুর বীজ নীলোৎপল,
প্রিয়ঙ্গু, চন্দন—সমান সকল
দুধে বেটে কর পান—
ছ'মাসে গর্ভিণী যদি ব্যথা পান

———

পিয়ালবীজ, কিস্‌মিস্‌, খইয়ের চূড়
ছ'মাসের ব্যথা করে দূর।

———

পদ্মমূল আর শতমূলী
দুধে বেটে খাওগে খালি,
সাত মাসের ব্যথা দূর হ'বে,
গর্ভ স্থির ভাব হ'য়ে রবে।

———

কদবেলের মূল, খই, চিনি
আর শুপারির মূল আনি,
জলে বেটে সেবন কর,
সাত মাসের ব্যথায় উপকার বড়।

———

ধনে বেটে চা'লের জলে
আট মাসের ব্যথায় খাও—শাস্ত্রে বলে।
কিম্বা—পলাশ পাতা বেটে নিয়ে
আট মাসের ব্যথায় খাও চুমুক দিয়ে।

———

এরণ্ডমূল আর কাঁকলা বেটে
ন'মাসের ব্যথায় খাওগে চেটে।

———

পলাশবীজ, কাঁকলা, ঝাঁটিমূল
কাঁজি সহ খাও—ন'মাসে যদি ব্যথার শূল।

———

নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ আর চিনি
দশ মাসের ব্যথায় খাও—উপকার জানি।

———

পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, যষ্টিমধু,
আর মৃণাল বাট' জলে শুধু।
কিম্বা—বরাহক্রান্তামূল, ক্ষীরকাঁকোলী
আর নীলোৎপল, কুড় জলে গুলি'।
বেটে নিয়ে সেবন কর—
এগার মাসে যা'র ব্যথা বড়।

———

ভুঁইকুমড়া, কাঁকোলি, ক্ষীরকাঁকোলি
চিনি সহ বাট'—জলে গুলি'।
প্রথম মাসে রক্তস্রাব হয় যা'র
এই যোগ জেন ব্যবস্থা তা'র।

———

আমরুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী,
কৃষ্ণতিল বাট—দুধে গুলি।
রক্তস্রাব যা'র দ্বিতীয় মাসে—
খেতে ব্যবস্থা দাও তাহার পাশে।

———

পরগাছা, ক্ষীরকাঁকোলি, নীলোৎপল,
অনন্তমূল বাট'—দুধে কেবল,
তৃতীয় মাসে রক্ত স্রাব হ'লে—
এ যোগ খেলে সুফল ফলে।

———

শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী
অনন্তমূল, যষ্টিমধু—দুধে বাটি'।—
চতুর্থ মাসে রক্তস্রাব যা'র
এ যোগ সেবন ব্যবস্থা তা'র।

———

বটাদি গাছের ছাল,—শুঙ্গ পারি'
গাম্ভারিফল, বৃহতী, কণ্টকারী,
আর মৃণাল নাও সকল সমান,

দুধে বেটে করাও পান,
পাঁচ মাসে রক্ত স্রাব হয়,
এ যোগে যায়—শাস্ত্রে কয়।

চাকুলে, বেড়েলা, যষ্টিমধু,
আর সজিনা, গোক্ষুর শুধু,
দুধে বেটে কর সেবন,
ছ' মাসে রক্তস্রাব হয় নিবারণ।

মৃণাল, পাণিফল, কেশুর, চিনি,
কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু আনি'
দুধে বেটে সেবন কর,
সাত মাসে রক্তস্রাব হ'লে বড়।

বেল, কদবেল, আক, বৃহতী,
সবার মূল আর কণ্টকারি, নতি,
সমান ভাগে দুধের সহ—
আট মাসের স্রাবে খেতে কহ।

শ্যামালতা, অনন্ত মূল, ক্ষীরকাঁকোলী
আর যষ্টিমধু—দুধে গুলি'
ন'মাসের স্রাবে খেতে দাও,
হাতে হাতে ফল দেখতে চাও।

আট গুণ দুধ, শুঁঠ দু'ভরি—
জল নাও দুধের আট গুণ করি,
দুধ যতটা—ততটা শেষ,
দশ মাসের শূল এতে বিশেষ।

শুঁঠ, দেবদারু যষ্টিমধু,
সব গুলিতে দু' তোলা শুধু,
দুধ ষোল তোলা—আট গুণ জল,
ষোল তোলা র'লে খাও কেবল,

দশম মাসে গর্ভ শূল যা'র
এতে উপকার সদ্যঃ তা'র।

ভেরেণ্ডা, গোক্ষুর, কুশ, কেশে,
মূল কেটে নাও—সবার ঘেঁসে,
এক একটি নাও আধ আধ ভরি,
দুধ—সব গুলির আট গুণ করি,
তা'র আট গুণ জল—দুগ্ধ শেষ,—
চিনি সহ খেলে গর্ভশূল বিশেষ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

স্বাস্থ্য-শিক্ষা।—অনারেবল মিঃ আই-রুণ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে "এ দেশের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ও খাস সরকারী স্কুলকলেজ সমূহে ছাত্রগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ের শিক্ষা দানের জন্য বজেটে ব্যবস্থা করা হউক।" বাঙ্গালার শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"স্বাস্থ্যবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রায় সকল স্কুলেই পড়ান হইয়া থাকে। ফল কথা আপনি যাহা চাহিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন।" আমরা বলি,—শুধু স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তক পাঠে স্বভাবতঃ তরলমতি ছাত্রদিগের যতটা উপকারের সম্ভাবনা,—বাঙ্গালী বালকদিগের উপযোগী হাতেকলমে শিক্ষা দিলে তাহাপেক্ষা বেশী উপকারের আশা করা যায়। চিত্তসংযম ও ব্রহ্মচর্য্যপালনই যে স্বাস্থ্যরক্ষার মূল মন্ত্র—সুকুমারমতি শিশুজীবনে ইহা উপলব্ধি করাইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেরূপ ধরণের গ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিলে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের বক্তৃতায় সে সকল কথা বুঝাইবার বন্দোবস্ত করিলে, বাঙ্গালী শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা কতকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কনফারেন্স।—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার কারণ নির্ণয় ও উহার প্রতিষেধকল্পে আগামী মার্চ্চ মাসে ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে এক বৈঠক বসিবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার মেজর নরমান হোয়াইট সম্ভবতঃ ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রদর্শনী।—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী করাচী নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রদর্শনী খুলিয়াছে। সহস্রাধিক নাগরিক ঐ উদ্বোধনসভায় উপস্থিত

হইয়াছিলেন। দেশের লোকের দেশীয় চিকিৎসার প্রচার কল্পে যত মতিগতি বাড়িবে, ততই দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা।

চিকিৎসকের অভাব।—বাঙ্গালার লোক সংখ্যার তুলনায় এখনো চল্লিশ হাজার সুচিকিৎসকের প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মাত্র ২টী সরকারি কলেজ ও ২টী স্কুল আছে। মহামান্য বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর বর্দ্ধমানে আর ১টী মেডিকেল স্কুল স্থাপনায় চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী হিতবাদী বলিতেছেন, "শুধু বর্দ্ধমানে নহে, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলাতেই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য।" সহযোগীর পরামর্শ যে সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি, কলিকাতায় আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালার কুবের সম্প্রদায় তাহাকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার প্রধান প্রধান স্থানে সেইরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগঠন করিতে চেষ্টা করুন না। বাঙ্গালার অর্থশালীগণ উদ্যোগী হউন এবং গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যকারী করিতে চেষ্টা করুন, ইহাতে সুচিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদও আবার মাথা তুলিতে পারিবে। সহযোগী আমাদের এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কি বলেন?

শ্রমশিল্প-বিদ্যালয়।—কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের ব্যয়ে বাঙ্গালায় একটী শ্রম শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কলিকাতায় এ বিষয়ের একটী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যও কলিকাতা-করপোরেসনে আলোচনা চলিতেছে। আলোচ্য বিষয় কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক বাঙ্গালী—স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা তো করিতে পারিবেই, তা' ছাড়া ইহার ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে বলিয়াও আমাদের মনে হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু।—সার শঙ্কর নেয়ার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন,—প্রায় ৫০ লক্ষ ভারতবাসী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নিউমোনিয়া রোগে ভারতবাসী অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া ভারতবাসীর ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত মৃত্যু হইবার কারণও তিনি ঐ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপক সভায় জানাইয়াছেন। ফলে এ সব আলোচনা যত হয়—ততই মঙ্গল। কিন্তু যাহাতে দেশবাসী ইহা হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কি?

মাদক নিবারণ।—আমেরিকা নিজ দেশে মদ্যের আমদানি রহিত করিয়াছেন। বিলাতেও মদ্যপানসম্বন্ধে কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবাসীর—বিশেষ বঙ্গবাসীর মাদকপ্রিয়তা কিন্তু ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালী এইজন্যই তো এত রোগজীর্ণ।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।—'সঞ্জীবনী' লিখিয়াছেন—"১৮৩৮ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছর ধরা হইত। ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সালে ৫১ বৎসর ধরা হইতেছে।

সার নিউম্যান মানুষের এই অল্প আয়ুতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন ৫০।৬০ বছর বয়সেই মানুষ মরিবে কেন? মানুষ স্বভাবতঃই ১০০ বছর বা তাহারও বেশী কেন বাঁচিবে না?

বৈজ্ঞানিকেরা সকলে একমত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মানুষ যদি তাহার শরীর হইতে ক্ষয়কারী জিনিষ ও রোগের কারণ বাহির করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে সে ১০০ বছর কেন—পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া ৫ শত এমন কি ১০০০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

শিরা প্রশিরা ও গ্রন্থিগুলির মধ্যে চুণ জাতীয় জিনিষ জমিয়া মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়। ক্রমে দেহ কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয়। পরিণামে মৃত্যু ঘটে। এই ক্ষয়কারী জিনিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে বিজ্ঞানমতে দীর্ঘজীবন লাভে কোন বাধা থাকিবে না।

দধি, ঘোল এবং আপেলফলের মধ্যে এমন জিনিষ আছে, যাহাতে দেহের জমাট চুণ গলাইয়া বাহির করিয়া দিতে পারে। এইরূপ কথিত হয় যে, আদিম জনক জননী যে জীবনতরু ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষ আপেল গাছ। বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুরা এই ফল খাইয়াই দীর্ঘজীবী হন।"

এখনকার বাঙ্গালীরা এ সকল বোঝেনা বলিয়াই তো বাঙ্গালীর এত দুঃখ।

মাড়োয়ারী হাসপাতাল।—মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে কলিকাতা সহরে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মারওয়ারীহাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। হাসপাতালের জন্য ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ২১৮৲ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে শুনিলাম। এরূপ সদনুষ্ঠানের জন্য মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের দানস্পৃহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ঐ হাসপাতালের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে দুইজন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে লওয়া হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই সুচিকিৎসক। হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন—লাহোর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ ও ২য় চিকিৎসক হইয়াছেন স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন গুপ্ত। আমরা এই হাসপাতালের ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

মাদকতা নিবারণী বক্তৃতা।—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের সূর্য্যকান্ত টাউনহলে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এরূপ বক্তৃতায় দেশের উপকারের সম্ভাবনা।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
১১০-১-১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট—সংস্কৃত প্রেস হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩য় বর্ষ—৮ম সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩২৬

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



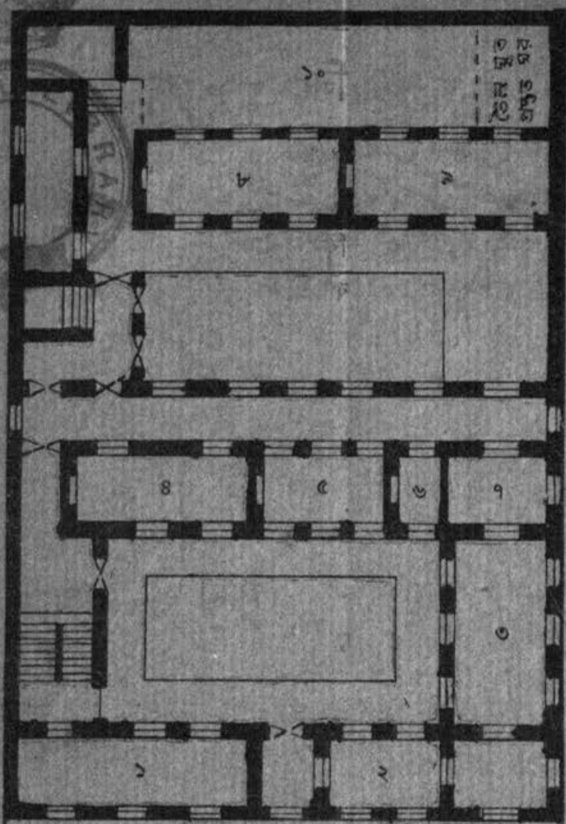
সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
,, শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
,, শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

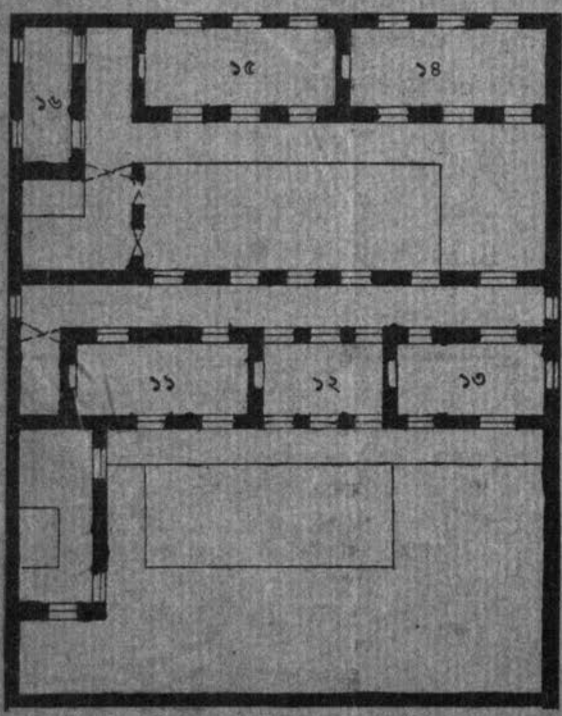
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। মাসিক বেতন ৩৲ প্রবেশ ফিঃ ৫৲ কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,এ, এম,বি, অধ্যক্ষ।

গ্রাহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

"আয়ুর্ব্বেদে"র তৃতীয় বর্ষের ৮ম সংখ্যা চলিতেছে। যাহাদিগের নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহার মূল্য পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদের সকলেরই নামে আমরা ভিঃ পিঃ করিতেছি। সকলেই ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপনাপন মূল্য প্রদান করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

গ্রাহকবর্গই 'পত্রিকা'র জীবন। আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এ কথা স্মরণ রাখেন—ইহাই আমাদের সকরুণ প্রার্থনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈশাখের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদে"র নিয়মাবলী।

"আয়ুর্ব্বেদের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৩৷৵০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয়। কেহ কোনো মাসের 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুবা পুনরায় মূল্য দিয়া সেই সংখ্যা লইতে হইবে।

আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, এজন্য যখনই ইহার গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ষের আশ্বিন হইতে ইহা লইতে হইবে।

কোনো বিষয়ের জন্য পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে হয়, নতুবা সে পত্রের কোনো কার্য্য হয় না।

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।—এক বৎসরের চুক্তিতে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৷০ সিকি পৃষ্ঠা ২৸০ এবং অষ্টাংশ পৃষ্ঠা ১৷০ টাকা। কভারের বিজ্ঞাপনে প্রতি পেজ ১০৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৬—বৈশাখ। { ৮ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

—:০:—

আবার গাহিব গান, আবার তুলিব তান,—
তব শুভ আগমনে ওগো নববর্ষ,
আবার আমার মুখে ফুটিয়াছে হর্ষ।

হৃদয়ে নাহিক বল, চক্ষু দু'টি ছল ছল,
রোগে জীর্ণ তনু খানি—বদন মলিন,
তবু প্রদানিছ সুখ, বরষ নবীন!

অতীত চলিয়া গেছে, কিন্তু বড় ব্যথা দেছে,
—কোটী কোটী বিশ্ববাসী করিয়াছে গ্রাস,—
স্মরণে এখনো যেন উঠিতেছে ত্রাস।

তোমারে পাইয়া তাই, সব যেন ভুলে যাই,
—তাই আজি ভাবিতেছি তব আগমনে—
শান্তি বুঝি উঠিবে গো এ বিশ্ব-ভবনে।

অন্তরের দাগা গুলি বল গো কেমনে ভুলি?
তুমিই বা কি করিবে—কে বলিতে পারে?
তবু আশা—তুমি বুঝি রাখিবে ধরারে।

নিবেদন আজি তাই, শান্তি টুকু যা'তে পাই—
হে নূতন, কর তুমি তা'রি আয়োজন,
বিশ্বের ফুটায়ে দাও নূতন নয়ন।

ধরমে করিয়া ভর বিশ্ববাসী নিরন্তর
কর্ম্মগতপ্রাণ হোক—এই অভিলাষ,
হে নূতন, তুমি কি গো পূরাইবে আশ?

হিন্দুর হিন্দুত্ব রাখি' পাপের মূরতি আঁকি'—
যদি তুমি দেখাইতে পারগো আবার,
নির্ব্ব্যাধি—দীর্ঘায়ু লাভ হইবে সবার?

পাপে তাপ—তাপে রোগ, আধিব্যাধি তা'রি ভোগ
—এই কথা বিশ্ববাসী বুঝিবে যখন
চির শান্তি বিশ্বমাঝে বহিবে তখন।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

বালক রক্ষা।

—:০:—

সকল লোকই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে। দুঃখ কেহ চায় না, সকলেই সুখ চায়, সকলেই আনন্দে থাকিতে চায়। তবে দুঃখ আসে কেন? দুঃখের কারণ পাপ, আর সুখের কারণ পুণ্য। পাপকে দুঃখের কারণ জানিয়াও লোকে পাপ হইতে বিরত হয় না। জগতের সকল উন্নতির মূলে লোকের দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা নিহিত আছে। এই উন্নতি বাস্তবিক সাংসারিক উন্নতি নয়। সাধারণতঃ লোকে সাংসারিক উন্নতিকেই উন্নতি বলে, কিন্তু তাহা অসার ও ক্ষণবিধ্বংসী। মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া আমাদের সুরত্ব লাভ করিতে হইবে। সুর হইতে পারিলে তবে আমরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করিতে পাইব। সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে এবং সদা সেই দর্শন ও আনন্দ হইতে মোক্ষানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই পরমপদ বা পরমধামকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মমরণ প্রবাহোৎক্ষিপ্ত সংসার-সাগরে ভাসিয়া অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। যেমন মনুষ্য-দেহ সর্ব্ব দুঃখের মূল, তেমনি আবার এই দেহ

দ্বারা আমরা মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই। সেই জন্য এই দেইটা সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে। শরীর নীরোগ ও সবল না হইলে সেই আত্মাকে জানিবার উপায় নাই। শ্রুতি বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই বল—শারীরবল ও মানসবল—উভয়বিধ। শরীরে বল না থাকিলে আমরা সংসারে কত প্রকারে লাঞ্ছিত হই তাহা সকলে জানেন, সেইজন্য সে সব কথার এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।—এই সংসারের জীবন সংগ্রামে যেমন শরীরের বলের আবশ্যক, তেমনি মানসিক বলের আবশ্যক। আবার এই দুইপ্রকার বল পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ। শরীরে বল থাকিলে মনে বল হয়; মনের বল হইলে শরীরে বল হয়। প্রথম কার্য্য আমাদের শরীরকে নীরোগ রাখা তাহার পর শারীরিক ও মানসিক বল সংগ্রহ করা। আজকাল আমাদের ভারতবাসীর যে অবনতি হইয়াছে ও আরও তীব্র গতিতে যে অবনতি হইতেছে, তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। অনেক মহাপুরুষ, সাধু ও স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি আমাদের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুই হইতেছে না। সমাজের সেই যথেচ্ছাচারিতা, সেই বিলাস-ব্যসন, সেই ঈশ্বর-পরাঙ্মুখতা, সেই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া অধর্ম্মকে অবলম্বন, সেই দয়াধর্ম্ম ত্যাগ,—আর কত বলিব?—মানুষের দেবত্ব লাভের চেষ্টা ত নাই-ই, তাহার উপর যেটুকু মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি—সেটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা নানাস্থান হইতে আসিয়া মিলিত হইয়া বা বৃহৎ নদীতে মিলিত হইয়া তাহার জলের স্রোতঃ বৃদ্ধি পূর্ব্বক যখন প্রবল বেগ ধারণ করে, তখন সে বেগের গতি ফিরান অসম্ভব। আমাদের সমাজের অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছে। অধঃপতনের মূলকারণসকল সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে ও যেরূপ অলর্কবিষ বর্ত্তমান আছে কিনা বুঝা যায় না—কিন্তু যখন প্রসর্পিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন আর সে বিষ হইতে আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। আমাদেরও তাহাই ঘটায় সাধু মহাত্মাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এখন এই প্রবল স্রোতের প্রতিচেষ্টা বিফল দেখিয়া নিরস্ত হইলে আরও সর্ব্বনাশ। আর সময় নষ্ট করিলে আরও ভীষণ বিপদ। সেইজন্য সকলেই জাগরিত হউন। সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার পবিত্রতা রক্ষণে যত্নবান হউন। আমাদের বালকেরা যাহাতে এখনও আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারে—আমাদিগকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাদের রক্ষা সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই করিতেছি না। আমাদের বালকেরা যে প্রকার অবনতির মুখে চলিতেছে, তাহাতে কিন্তু আর রক্ষা না করিলে কোনো উপায় নাই। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় বিশেষ চেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদে এসম্বন্ধে বিশেষ তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া—আমাদের সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গাইতে কেহই সক্ষম হইতেছেন না। এখন এই নিদ্রা ভাঙ্গার উপায় কবিরঞ্জন মহাশয় একটা কিছু স্থির করিয়া সে বিষয়ে লিখুন। সমাজের এই প্রকার উপেক্ষা ভাব দেখিয়া কিছু লিখিতে গেলে হতাশের ঘোরান্ধকার দৃষ্টি-

শক্তিলোপ করে, কলম ধরিতে গেলে হাতে বল আসে না, কিন্তু কবিরঞ্জন মহাশয়ও ছাড়িবার লোক নন। আয়ুর্ব্বেদে লিখিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা। সেই জন্য আবার নিরাশার কিছু স্থির করিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় বিষয় বালক রক্ষা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লেখা হইল। বালকদের রক্ষা করিলে তবে আমাদের বংশরক্ষা হইবে, আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে থাকিবে, আর্য্যধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা ভারত হইতে লোপ পাইবে না। নতুবা কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া আর কূলকিনারা পাওয়া যায় না। যাঁহাদিগকে, বালকদের রক্ষা করিতে অনুরোধ করা যাইবে, তাঁহারাই এইরূপভাবে শিক্ষিত যে, তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা বা উদাহরণ দ্বারা যে কিছু করিতে পারিবেন,তাহার আশা আদৌ করা যায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মনুষ্যমাত্রের চেষ্টা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ। এই লাভ কেবল নিজের হইলেই হইল না। পরিবারের সকলেই যাহাতে এই লাভে লাভবান্ হন—তাহার চেষ্টা করা সমানভাবে কর্ত্তব্য। কারণ হয়ত আমি নিজেকে কোন প্রকারে সুখী করিলাম, নিজে সুস্থ ও রোগহীন হইলাম, কিন্তু যদি আমার পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি কেহ দুঃখ পায় বা রোগগ্রস্ত হয়, তবে আমার শান্তি কোথায়? তাঁহাদের রোগ-কষ্ট প্রভৃতি আমাকেও কাতর করিয়া ফেলিবে। আমরা সংসারে বড়ই স্বার্থপর। নিস্বার্থভাবে চলেন—এমন লোক খুবই বিরল।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ" আমরা তাহাও করি না। সামান্য সুখের লালসায় আমরা আত্মাকে চিনিতে, জানিতে চেষ্টা না করিয়া যথার্থরূপে আত্মহন্তা হই। আমাদের যথার্থ মঙ্গল কিসে হয়—তাহা আমরা একবারও ভাবি না। মানিয়া লইলাম যে, আমরা নিজের উন্নতি যাহাকে বলে—তাহার চেষ্টা করি, নিজ সুখের ইচ্ছা করি। কিন্তু কেবল তাহা করিলেইত হইল না। পশু পক্ষীরও জ্ঞান আছে, তাহারাও মানুষের মত সন্তানাদি পালন করে। কিন্তু এবিষয়ে তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর। কেন না, তাহারা লোভ বা প্রত্যুপকারের আশায় সন্তান পালন করে না, মানুষ তাই করে। এ বিষয়ে পশুপক্ষী অপেক্ষা মনুষ্যকে নিম্নস্তরে দেখিয়া মেধস্ মুনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানিনো মনুজা সত্যং কিন্তু তে নহি
কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যানাং যৎ তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যানাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥
জ্ঞানেঽপি সতিপশ্যৈতাম্ পতগঙ্গাবচঞ্চুষু।
কণ মোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥

তোমরা আপনাকে যে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ, সেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়-রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যমাত্রই হইয়া থাকে। একথা সত্য—কেবল মনুষ্য কেন—পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। এই-রূপে মনুষ্যের যেরূপ জ্ঞান আছে, পশু পক্ষী-দেরও সেই জ্ঞান আছে, আবার পশুপক্ষীদের যে জ্ঞান আছে, মনুষ্যদেরও সেই জ্ঞান আছে অর্থাৎ আহার বিহারাদি বাহ্য বিষয়ে মানুষ ও পশুপক্ষী সকলেই একপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট। তথাপি ঐ দেখ—জ্ঞানসত্ত্বেও পক্ষীরা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ আদর সহ-

কারে তণ্ডুলাদির কণা সমস্ত শাবকদিগের চঞ্চুতে প্রদান করিতেছে। হে মনুজব্যাঘ্র! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না—মনুষ্যগণ চরমকালে প্রত্যুপকারলুব্ধ হইয়া পুত্রাদির প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া থাকে।”

যে কারণেই হউক, ফল কথা, আমরা আত্মৈষণা ও পুত্রৈষণা দ্বারা সংসারসুখ অন্বেষণ করি। আত্মাকে ভাল বাসি বলিয়া আত্মার সুখ পুত্রাদি দ্বারা হইবে ইহাই ভাবি, কিন্তু আমরা আজকাল সংসারে যেরূপ আচরণ করিতেছি—তাহাতে আমরা আত্মাকেও যথার্থ ভালবাসিনা, পুত্রাদিকেও যথার্থ ভাল বাসিনা, বিষয়-সুখের লালসায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেবল গরলভক্ষণ করিয়া আত্মহা হইতেছি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পুত্রহাও হইতেছি—এবিষয় ওরিয়েন্টাল্ সেমিনারিতে পারিতোষিক বিতরণ কালে হাই-কোর্টের মহামান্য জজ্ ঋষিতুল্য সার জন উড্রফ্ যাহা বলিয়াছেন,—যাহা ৬ই মার্চ্চ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেরই পাঠ্য। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে পিতা পুত্রকে যথার্থ উন্নতি বিষয়ক শিক্ষা দিবেন, তিনিই আধুনিক শিক্ষায় বিকৃতমনা, সে অবস্থায় তিনি পুত্রের শিক্ষা কি প্রকারে প্রদান করিবেন? এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মুসলমানেরা এ বিষয়ে অনেক ভাল, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে বাল্যকালে তাঁহাদের ভাষা, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, অন্য ভারতবাসীরা সেইরূপ দেননা। বিশেষ বাঙ্গালীদের এবিষয়ে উদাসীনতাটা খুবই বেশী। আমি এবিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি গরীবেরা অন্নচিন্তায় ব্যাকুল, মধ্যবিত্তেরা আপিসের চাকরী—ব্যবসায় প্রভৃতিতে বিপন্ন, আর বড়লোকেরা কি করিয়া ধনের অপব্যয় করিয়া বিলাসে-ব্যসনে সময় কাটাইবেন—তাহারই চিন্তায় বিশেষরূপে নিমগ্ন। এ অবস্থায় আমাদের দেশে বালকদের শিক্ষা দিবার লোকের সময় কই? আমাদের রোগপ্রবণ-তার যে আমরাই একমাত্র কারণ, তাহা কি ইহাদ্বারা উপলব্ধি হয় না? সম্প্রতি গিড়িডিতে মদীয় বাটীতে এক মহাপুরুষ পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমি যে কয়টী প্রবন্ধ আয়ুর্ব্বেদে লিখিয়াছি, তাহা তিনি পাঠ করিয়া বলিলেন,—যদি কেহ ইহার একটী প্রবন্ধও পাঠ করিয়া তদনুযায়ী চেষ্টাশীল হয়, তবে দেশের বহু উন্নতি হয়, কেহ শোনেনা আর লিখিয়া কি করিবেন! আমি তাই হতাশ হইয়া চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় বৈশাখের সংখ্যায় একটী জ্ঞানগভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও বালকরক্ষার পুনঃ পুনঃ উদ্যমে উৎসাহান্বিত হইয়া আবার এই হতাশ মনে কিছু লিখিলাম, কিন্তু এবারকার প্রবন্ধ সেরূপ মনের জোরের সহিত লিখিতে পারিলাম না; তাই মনে হইতেছে যে, এবার আয়ুর্ব্বেদের পাঠকগণ আমার প্রবন্ধ পড়ায় সময় নষ্ট করা মনে করিবেন। কি করি—সেই হৃদ্‌বিহারী পরমাত্মা যাহাতে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাহাই লিপি-বদ্ধ করিলাম। আসুন ভারতবাসী ভাইবন্ধুগণ, আমরা নববর্ষের নবীন উৎসাহে আমাদের অধঃপতিত নষ্টপ্রায় বংশরক্ষা করিতে চেষ্টিত হই,—বালকদের রক্ষাবিধান করি ও যাহাতে বীর্য্যধারণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপালন দ্বারা আমাদের বালকেরা দুর্ব্বল অবস্থা মুক্ত হইয়া দেহে বল

পায়, মনে শান্তি পায়, সর্ব্বদা পবিত্র চিত্ত হইয়া সুস্থ থাকে—তাহারই উপায় অন্বেষণে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হই। আমি প্রথমেই বলিয়াছি—সকলেই সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত, এক্ষণ দেখা যাউক কিসে এই সুখ উপস্থিত হইতে পারে? ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণে সুখ নাই। সুখের লালসা ঐ পথেই চালায় বটে কিন্তু তাহা দুঃখের মূল। "সংসারের সুখ যত, নিশার স্বপন মত, যতক্ষণ উপভোগ, ততক্ষণ থাকে সুখ, দিনান্তে আঁধার মত পরিণামে ঘটে দুঃখ।"—কবির সহিত এবিষয়ে আমি একমত হইতে পারিলাম না। কারণ তিনি "যতক্ষণ উপভোগ, ততক্ষণ থাকে সুখ"—এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এইটা সুখ নয়। চেতনাকে অভিভূত করিবার ঔষধ-ঘ্রাণ দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রোপচার করিলে সে কষ্টবোধ করিতে পারে না, কিছু আরাম প্রথম অবস্থায় বোধ করে, আমাদের সংসারের সুখ সেই প্রকার, দুঃখকে বিস্মৃতি করাইয়া দুঃখ মিশ্রিত সুখকে অর্থাৎ দুঃখকে সংসার হইতে ভুলাইবার মোহময়ী মদিরা পানের উন্মত্ততাকে সাংসারিক সুখ বলা যায়। দেহ হইতে আত্মাকে বিভিন্ন করিয়া, সেই আত্মদর্শনে আত্মার স্বরূপ অবস্থানে যে আনন্দ—তাহাই যথার্থ সুখ। এখন সেই সুখ লাভের জন্য জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা আত্মদর্শন আবশ্যক। সেই পরমাত্মাই সুখসাগর ও তিনিই "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্।" সেই সত্যস্বরূপকে লাভ করা ও বারম্বার জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইতে রক্ষা পাওয়াই মোক্ষানন্দ বা মুক্তি ও ইহাই লাভ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীভগবানেরও ইহারই জন্য আমাদের নরদেহ প্রদান, বিশেষ যাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয় হইয়া, তাঁহার শক্তির অধিকতর অধিকার লাভ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ফল কথা, সেই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যদি তাহার সদব্যবহার না করিলাম, তবে আমরা নিজেরা আত্মঘাতী হইলাম ও সেই বিশ্বস্বামীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইয়া ঘোর নরকে স্থান পাইবার সরণী পরিষ্কার করিলাম। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না—সে সুখ বা আনন্দ সেই ব্রহ্মে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদানন্দং ব্রহ্ম কেবলম্।"

সংসারে আমাদের আত্মা পুরুষরূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া, অন্তঃকরণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, যেমন রক্তপুষ্প সমীপে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়,—বাস্তবিক তাহার রঞ্জনা নাই-সেইরূপ আত্মা আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করেন। বাস্তবিক তাঁহার সুখ বা দুঃখ নাই। আমরা কি প্রকারে সেই সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হই—তাহাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত ও আমাদের সন্তানেরাও যাহাতে সেই সুখ পায়—তাহাতে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। এই প্রকৃতি হইতে তিনটী গুণ উৎপন্ন হইয়াছে, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ। এই তমোগুণ আমাদিগকে নীচমার্গে লইয়া যায়। রজগুণ মধ্যাবস্থায় রাখে ও সত্ত্ব গুণ উন্নতি-পথে লইয়া যায়। নিদ্রা, আলস্য প্রমাদ প্রভৃতি তমোগুণ হইতে হয়। তৃষ্ণা, অনুরাগ —আজ ইহা পাইলাম—কাল আর একটি পাইব—এইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান ও বিষয়-বাসনা রজগুণের কার্য্য। সত্ত্বগুণের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং উহা সুখের কারণ হইয়া সমস্ত দুঃখের নিহন্তা মোক্ষকে লাভ করাইয়া দেয় এই বিষয়ক "জ্ঞান যথার্থ সুখেরই প্রাপ্তির হেতু হয়। প্রসন্নেন্দ্রিয়তারোগ্যা না লালস্যাপ্তাস্তসত্ত্বজাঃ।"

ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, আরোগ্য, অনালস্যাদি সাত্ত্বিক ভাব। সেইজন্য প্রথমেই এই সত্ত্বগুণকে পাইতে হইলে যাহাতে আমাদের আহার ও আমাদের বালকের আহার সত্ত্বগুণাকর্ষী হয়—তাহাই করা উচিত। আহার শুদ্ধি দ্বারা সংসারে সবই লাভ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

আহার শুদ্ধৌ তু সত্ত্বশুদ্ধিঃ স্বত্ত্বশুদ্ধৌ
ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং

বিপ্র মোক্ষা—ইত্যাদি—

আহার শুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধদ্রব্য পান-ভোজনাদি দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়া সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মাকে জানিবার উপযুক্ত হয়। এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারা স্মৃতিলাভ হয়। স্মৃতিলাভ হইলে আমি কে?—কোথা হইতে আসিয়াছি?—কোথায় যাইব?—ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান হইয়া আমি যে সেই অখণ্ড ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও মায়োপাধিক যুক্ত হইয়া ঘটাকাশের ন্যায় মহাকাশের অনন্তস্বরূপ জীবাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছি—এইটা স্মরণ হয়। আমরা সংসারে অতিশয় মিশিয়া গিয়া তমঃ ও রজগুণে বদ্ধ হইয়া আত্মাস্বরূপকে বিস্মৃত হইয়াছি। এই বিস্মৃতি অপনোদন করিয়া আত্মার স্বরূপকে স্মরণ করাইবার জন্য চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক, মহামনা অর্জ্জুন কত সংশয়ে পড়িয়া কত কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য মনে করিয়া নিজ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম সুখাবহ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীভগবান যখন তাঁহাকে কত বুঝাইলেন, তখন তাহাতেও অর্জ্জুন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাহার পর ভগবান যখন পরমাত্মার স্বরূপ নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন, তখন অর্জ্জুন সেই বিরাটরূপ দর্শন করিতে সক্ষম না হইয়া বলিলেন—"তে নৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।" তাহার পর শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মহাত্মা আবার সৌম্যবপু হইয়া মানুষরূপে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আবার অর্জ্জুন অবহিত চিত্তে ভক্তি সহকারে শুনিতে লাগিলেন। দশ অধ্যায় গীতা শোনাইয়া নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও শ্রীভগবান যখন অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তহৃদয়ে নিজের স্বরূপ ধারণা করাইতে পারিলেন না, তখন বিশ্বরূপ দেখাইয়া, অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থায় আবার তদগতচিত্ত অর্জ্জুনকে আরও ছয় অধ্যায় গীতা শ্রবণ করাইলেন। অর্জ্জুন শুদ্ধচিত্ত ছিলেন, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, এইজন্য শ্রীভগবানের উপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া আপনাকে স্মরণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে বলিবেন

নষ্টোমোহঃস্মৃতির্লব্ধাত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ;
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

এইখানে আত্মতত্ত্ব উদয় হওয়ায় অর্জ্জুনের স্মৃতি লাভ হইল। শ্রীভগবান্ ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, আমার ও তোমার বহুজন্ম গত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অজ হইয়াও নিজ মায়ায় ধর্ম্মরক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমার সে সব মনে আছে—তোমার সে সব মনে নাই; কারণ জন্মজরাব্যাধি ও মৃত্যু—এই সকল ভুলাইয়া দেয়। কিন্তু যদি কেহ চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মোহমুক্ত হয়, তবে সে ভোলে না। আমি ভুলি নাই, তুমি ভুলিয়াছ। শ্রীভগবানের কৃপায় আজ অর্জ্জুনের সেই স্মৃতি লাভ হইল। সেই স্মৃতি লাভের পূর্ব্বেই মোহ নষ্ট হইয়াছিল, এখন তাঁহার হৃদয় গ্রন্থি সকল ভিন্ন হইয়া গেল,

সেইজন্য তিনি গতসন্দেহ হইলেন এবং শ্রীভগবানের আদেশ পালনে তৎপর হইলেন, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার অনুকূল কার্য্য করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম তাহা জানি না, তাহা জানিলে বিষয়ে এত আসক্তি আসিতনা। আমাদের মন এত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইতনা। এই স্মৃতি লাভের প্রধান উপায় শুদ্ধমন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারিটীতে মনের নানা অবস্থার সমষ্টি অন্তঃকরণ রূপে বর্ত্তমান। এই শুদ্ধি লাভ করিতে হইলে প্রথম আহারশুদ্ধি আবশ্যক। অতএব দেখুন—যাঁহারা বলেন, আহারের মধ্যে ধর্ম্মের সংস্রব কি? তাঁহাদের সেটা ভ্রান্তি পূর্ণ কথা নহে কি? ধর্ম্ম আর কিছুই নয়—যাহা দ্বারা আমরা ধৃত হই অর্থাৎ যে সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া বারংবার জনম মরণ স্বরূপ সংসারে পুনঃ পুনঃ পতিত না হই—তাহাই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম দেহের ও মনের;—দুইএরই পবিত্রতার আধার। আমাদের আর শুদ্ধ হইবার সময় নাই—এ আপত্তি করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। যেমন করিয়া হউক চিত্তশুদ্ধি আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। আমার গিড়িডি বাটীতে এক সাধু পুরুষ আমাকে আসন শিক্ষা দিবার সময় আমার কষ্ট দেখিয়া বলেন "বুড়ো হাড়ে আর কি হইবে"?—তখন মনে বড় দুঃখ হইল যে জন্মটা বৃথা গেল। তাই আমার বড় ছেলেকে তাহা শিখাইবার জন্য প্রবৃত্ত করাইলাম, তাহার খুব শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত সাধনা সম্পন্ন হইতে লাগিল, আমি পারিলামনা। তাই সকলকে বলিতেছি, আমাদের যাহা হইবার হইয়াছে—এখন আমাদের ছেলেদের বাল্যকাল হইতে তৈয়ার করিতে চেষ্টা করুন। তাহারা তৈয়ার হইলে আমাদের অনেক ভরসা আছে। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হউক যে, ধর্ম্মের প্রথম সোপান সংযম শিক্ষা ও তন্মধ্যে প্রধান শুদ্ধ আহার। শুদ্ধ আহার বলিতে যে আমরা যাহা খাই বা পান করি তাহা নয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ভিতরে যাহা গ্রহণ করি তাহাই আহার। এই আহার যাহাতে শুদ্ধ হয়, বালকদিগকে তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে। চক্ষুদ্বারা এমন রূপ গ্রহণ করিতে বালককে শিক্ষা দিতে হইবে—যাহাতে তাহার মনে কোন প্রকার কুভাব না আসে। সেই রূপ গ্রহণে শুদ্ধ পবিত্রতা ছাড়া যেন আর বালকের মনে অন্য কিছু না আসে। কর্ণ এমন প্রেমমাখা হরিনাম শ্রবণ করিবে—যেন হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে গদ্‌গদ্ হইয়া আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইতে থাকে। কর্ণ যেন কোন প্রকার কুভাব উত্তেজক শব্দ, সঙ্গীত বা স্ত্রীলোকের সঙ্গীত শ্রবণ না করে। চক্ষু-তাহাদের নর্ত্তন দর্শন না করে। এই চক্ষু-কর্ণ দ্বারা কলিকাতা বা অন্য সহরে থিয়েটারাদি দর্শন করিয়া স্ত্রীলোকের হাবভাব পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ বা তাহাদের নর্ত্তন দর্শন দ্বারা কত পবিত্র হৃদয় সুকুমারমতি বালকগণ নরকের ঘোরান্ধকারে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায়না। স্পর্শ কেবল বিল্বপত্র, তুলসীদল, বানলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, সাধু মহাত্মার শ্রীচরণ, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের শ্রীচরণ স্পর্শ ও অন্যান্য পবিত্র বস্তু স্পর্শ ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ না করে। নাসিকা যেন পবিত্র বস্তু ঘ্রাণ ছাড়া অন্য ঘ্রাণ না লয়। জিহ্বা যেন পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর রস গ্রহণ না করে। সর্ব্বোপরি জিহ্বা যেন সেই শ্রীভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ রূপ অমৃত-

রসে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকে এবং পৌলস্ত্যের ন্যায় বলেন :—

হে জিহ্বে রস-সারজ্ঞে সর্ব্বদা মধুর প্রিয়ে।
নারায়ণাখ্যাং পীযূষ্ পিব জিহ্বে নিরন্তরম্॥

হে জিহ্বে! তুমি নানারস মধ্যে যাহা সার রস তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর এবং সর্ব্বদা মধুর রস ভালবাস. কিন্তু এরসে আনন্দ নাই। সেই আনন্দের আধার শ্রীনারায়ণের নামামৃত সর্ব্বদা পান কর। বালককে বাল্য-কাল হইতে জিহবার সংযম শিক্ষা দিতে হইবে। বালক যেন অসার সুখের লালসায় অখাদ্য—কুখাদ্য দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন না করে। আহার শরীর ও মনের ধর্ম্মরক্ষার জন্য—দেহ রক্ষার জন্য ;—জিহবার তৃপ্তির জন্য নয়। আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের খুব সম্বন্ধ, একথা সকল-কেই বিলক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায়,—

ক্ষমাশৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
অহিংসা গুরু শুশ্রূষা তথানুশরণং দয়া॥
আর্জবং লোভ শূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজণম্
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম্ম সামান্য উচ্যতে॥

বাল্যকাল হইতে বালককে ইহা অভ্যাস না করাইলে বয়স হইলে উহার কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হইয়া থাকিবে। বালককে ক্ষমা শিক্ষা দিতে হইবে, বাহ্য এবং অন্তর শৌচ শিক্ষা দিতে হইবে, সত্যকে অবলম্বন করা আবশ্যক ইহার শিক্ষা বিশেষ করিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। বাক্ সংযত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। অনর্থক বাক্য বলিলে তাহার জন্য শাস্ত্রে বিষ্ণু স্মরণের ব্যবস্থা আছে—বালককে ইহা অভ্যাস করাইলে মধ্যে মধ্যে বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা বাক্য সংযত হইবে ও সত্য বাক্য ভিন্ন অন্য বাক্য বলিতে তাহার মতি হইবেনা। বাক্যই ব্রহ্ম, সেই জন্য বাক্যরূপী ব্রহ্মকে কখনও মিথ্যা বিষয়ে লিপ্ত করা হইবে না শাস্ত্রে আছে "বাচং পবিত্রং পরমম্, বাচোঽমৃতং বিষং বাচঃ"। বাক্যই অমৃত, বাক্যই বিষ, বাক্যই পরম পবিত্র। স্বয়ং ব্রহ্ম—শব্দব্রহ্মবেদ রূপে সৃষ্টির আদিতে প্রকাশ হন। সেইজন্য বাক্য প্রয়োগ বিষয়ে বালককে বিশেষ সংযত হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। কল্পনা প্রসূত অসত্যঘটনাবলম্বিত নাটক-নভেল বালককে আদৌ পড়িতে বা শুনিতে দিবেন না। জীবন বেশী দিনের জন্য নয়—সর্ব্বদা মৃত্যুর সন্নিকট হইতেছে—এই ভাবিয়া ধর্ম্ম অবলম্বনে ব্যসনকে দূরে ফেলিতে বালককে শিক্ষা দিতে হইবে। মহা-মান্য হাইকোর্টের জজ স্যার জন উড্রফ সাহেব ওরিএন্টালসেমিনারিতে যাহা বলিয়াছেন, সেইমত আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের মহিমা ও গৌরব বালককে দেখাইয়া দিতে হইবে ও ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে বালকগণকে চালিত করিতে হইবে। ঋষিরা এই কথা বলিয়াছেন বা কোন পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন বলিলে কেহ তাহাতে অনাস্থা স্থাপন করিবেন না ; সেই জন্য এই ঘোর কলিকালের বিকার নাশের জন্য শ্রীভগবান্ উড্রফ্ সাহেব, অলকট্ সাহেব, মাতা এনিবেসাণ্টকে ঋষি রূপে, গার্গী রূপে আমাদের নিকট তাঁহার বার্ত্তা প্রচার করিতে নিয়োগ করিয়াছেন। সার্ জন উড্রফ্ সাহেব বলিয়াছেন, "যদি ভারতের উন্নতি চাও তবে বালকদিগকে তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব সকল দেখাইয়া দাও। পাশ্চাত্য গুরুর নিকট মন্ত্র লইলে সভ্যতা শিক্ষা

হইবেনা"। যে সভ্যতা জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং যাহা এখনও করিতেছে—সেই সভ্যতা বনবাসী ফলমূলাহারী সিদ্ধার্থ ঋষিগণ আমাদের হিতের জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আজ তাহা ভুলিয়া গিয়া অশেষ দুঃখ সাগরে ভাসিতেছি। এখন যাহাতে আমাদের বালকদিগকে আমাদের মত দুঃখ সাগরে না ভাসিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে পর প্রবন্ধে বালক রক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল,

পঞ্চকর্ম্ম।

(ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

ডা। আচ্ছা বয়সভেদে ঔষধ প্রয়োগ করবার মাত্রার তারতম্য কিরূপ?

ক। আস্থাপন দ্রব্য পূর্ব্বে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত যেমন নলাদির বিভাগ করা—সেই অনুসারে ক্রমশঃ রোগীর দুই চার এবং আট অঞ্জলি পরিমাণ। তা'রপর রোগীর বয়স উত্তরোত্তর যত বেশী হবে, নল ও বস্তির পরিমাণ সেইরূপ বাড়া'তে হ'বে। পঁচিশ বৎসরের অধিক বয়স হ'লে নলাদির পরিণাম যেরূপ হবে—তা' বলা হ'য়েছে। ঔষধের পরিমাণ রোগীর অঞ্জলির বার অঞ্জলি হবে। কিন্তু সত্তর বৎসরের উর্দ্ধে নলের পরিমাণ এবং আস্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কের ন্যায় হ'বে।

ডা। এই আবার আপনি সব গোলমাল ক'রে দিলেন! এই বললেন যে—বৃদ্ধকে বস্তি প্রয়োগ করা যখন নিষেধ, তখন বৃদ্ধের বলী পলিত নষ্ট হবে কিনা এ প্রশ্নই উঠতে পারে না। আবার কখন বৃদ্ধকে বস্তি দেবার কথা বলছেন!

ক। ধৈর্য্য ধারণ করুন। বাক্যার্থের কদন্বয় করবেন না—সমন্বয় করুন। তা'হ'লেই উপদেশ বোধগম্য হবে।

ক। এর সমন্বয় আমার মাথায় কিছু আসছে না।

ক। ভবদীয় মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ গোময়ের আধিক্য হ'য়েছে। ভাল, আমিই সমন্বয় ক'রে দিচ্ছি। প্রথম বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধকে বস্তি দিতে নাই। তা'রপর বলা হ'য়েছে যে, বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বলিপলিত নষ্ট হয়। সুতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় যে, এ বলীপলিত বৃদ্ধের নয়—অকাল বলীপলিত। কেমন সঙ্গত কথা ত?

ডা। হাঁ সঙ্গত।

ক। এত গেল সাধারণ কথা, তা'রপর বিশেষ কথা বলা হ'য়েছে যে, আবশ্যক হ'লে

নিষিদ্ধ স্থলেও বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। বৃদ্ধ নিষিদ্ধ স্থল, সুতরাং আবশ্যক হ'লে বৃদ্ধকেও বস্তি দেওয়া যেতে পারে—এ কথা আসেত?

ডা। হাঁ আসে।

ক। এখন বৃদ্ধকে পূর্ব্বমাত্রায় বস্তি দিয়ে পাছে তা'র অনিষ্ট করা হয় এবং পাছে বৃদ্ধের উপযুক্ত নল এবং ঔষধের পরিমাণ সম্বন্ধে চিকিৎসকের ভ্রম হয় - সেই জন্য এরূপ নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে। এখন সমন্বয় হলো কি?

ডা। হলো বটে, কিন্তু বড় হাঙ্গামা। আমাদের শাস্ত্রে সকল বিষয় খোলসা ক'রে এক যায়গায় লেখা থাকে। তা'তে বুঝাবার খুব সুবিধে হয়। আমার বিবেচনায় এটী আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান দোষ।

ক। আপনার চক্ষে যা প্রধান দোষ ব'লে বোধ হ'চ্চে—আমার চক্ষে সেটী মহৎ-গুণ ব'লে বোধ হয়।

ডা। কি সে?

ক। নয় কি সে? দেখুন আপনারা যখন পরীক্ষা দেন, তখন কোথা থেকে একটু হাড় কি কোন যন্ত্রের একটু অতি সূক্ষ্ম অংশ এনে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কেন বলুন দেখি—নর-কঙ্কালের ভিতর সেই হাতটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়।

ডাঃ। তা হ'লে আর তা'র পড়ানর পরিচয় কি হল? যথাস্থানে থাকলেত অনায়াসেই বোঝা যায়।

ক। এখন পথে আসুন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে এই সকল একটু অস্পষ্ট ভাবে বলা আছে—সেটা বুদ্ধির উন্মেষ এবং অজ্ঞানের পরিচয় সম্বন্ধে সাহায্য করে। বৃদ্ধকে বস্তি দিবে না—অথচ বলিপলিত নষ্ট করে—ইহার সমাধান করতে গেলে, শিক্ষার্থীকে একটু চিন্তা কর'তে হয়, আর চিন্তার ফলে তার বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। অধ্যাপক যদি দেখেন যে, ছাত্র এই সকল বিষয় সমন্বয় ক'রতে পারছে, তখন তা'কে চিকিৎসক হবার যোগ্য বলে বিবেচনা করেন। আর যদি দেখেন যে, এই সকল রহস্য ভেদ ক'রবার ক্ষমতা আদৌ নেই, তখন তাহাকে বলেন যে বৎস্য, চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করা অপেক্ষা হলচালনা শিক্ষা করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

ডা। না, বাক্যে আপনারা অদ্বিতীয় বটে!

ক। আপনাদের শাস্ত্রে তো বলে যে, শরীরের একদিকের হ্রাস বৃদ্ধির অন্যদিক দিয়ে পুরণ বা হ্রাস ঘটে। তা' আমরা কার্য্যে যত অপটু হই না কেন,—বাক্যে তো পটুতার বৃদ্ধি হচ্চে।

ডা। তা' এখন বাক্য থাক, কি ক'রে অনুবাসন প্রয়োগ ক'রতে হয় বলুন।

ক। প্রশস্ত এবং উপাধানহীন শয্যায় রোগীকে বাম পার্শ্বে (বাঁ কাতে) শয়ন করা'তে হয়। রোগী দক্ষিণ উরু সঙ্কুচিতভাবে ও বাম উরু প্রসারিতভাবে রা'খবে এবং কথা বলবে না।

এদিকে চিকিৎসক বস্তি ঔষধ পূর্ণ করবেন। ঔষধ পূর্ণ ক'রবার সময় বস্তি যেন দীর্ঘ বা সঙ্কুচিত না হয়, ঔষধে বুদ্‌বুদ না জন্মে এবং বস্তিতে যেন বায়ু না থাকে। বস্তির এক দিকে নল বাঁধা থাকে আর একদিকে খোলা থাকে। সেই খোলা মুখ দিয়ে ঔষধ পূর্ণ ক'রে সেই মুখে দুই তিনটী বেষ্টনী দিয়ে বাঁধতে হয়। তা'রপর দক্ষিণ হস্ত চিৎ করে তদ্বারা বস্তিটী ধ'রতে হ'বে, আর বাম হস্তের প্রদেশিনী ও মধ্যাঙ্গুলী দ্বারা নলটী ধ'রে নলের মুখ

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চেপে রেখে পরে ঘৃতাক্ত গুহ্য দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেবে। ঠিক পিঠের শিরদাঁড়ার সঙ্গে সোজা ভাবে বস্তির কাণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়ে বাম হাতে বস্তিটী ধ'রে দক্ষিণ হস্তের চাপ দিয়ে বস্তি প্রয়োগ ক'রবে। একবার চাপ দিয়েই প্রয়োগ করা এবং খুব দ্রুতভাবে বা খুব আস্তে চাপ দেওয়া উচিত নয়। বস্তিতে স্নেহের কিছু শেষ থাকা উচিত।

অনন্তর এক শত বাক্য বলিতে যতক্ষণ সময় লাগে—ততক্ষণ রোগীকে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বলিবে। কারণ সর্ব্বগাত্র প্রসারিত হইলে স্নেহবীর্য্য প্রসারিত হইতে পারে। পরে রোগী হাত পা আকুঞ্চিত ও প্রসারিত ক'রবে। ইহার পর রোগীর হস্ত পদতলে তিনবার আঘাত করিবে এবং শয্যা হইতে তিনবার নিতম্বদেশ ঈষৎ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবে। ইহাতে স্নেহ উর্দ্ধ ভাগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার পর বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে এবং হিতকর দ্রব্য সেবন করিবে।

ডাঃ। আচ্ছা অনুবাসনের যে মাত্রা বলা হয়েছে, তাই কি সকলের পক্ষে প্রযুজ্য? সবল দুর্ব্বল বিচার নেই?

ক। আছে বৈকি। চিকিৎসা সম্বন্ধে যে কোন বিষয় নানাদিক দিয়ে দেখতে হয় একদিক দিয়ে দেখ্‌লে হয় না। অনুবাসনের মাত্রা ত্রিবিধ, যথা শ্রেষ্ঠা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা। শ্রেষ্ঠা মাত্রা ৪৮ তোলা, শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তির প্রতি প্রয়োজ্য। মধ্যমা মাত্রা ২৪ তোলা মধ্য বল ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য। আর কনিষ্ঠা মাত্রা ১২ তোলা অল্প বয়স ব্যক্তির প্রতি প্রযুজ্য।

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি কি একদিন একবার মাত্র প্রয়োগ ক'রলেই হয়।

ক। একবারত নয়ই, কতবার সেটা ক্রমশঃ শুন্‌তে পারেন। শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তিকে যে ৪৮ তোলা স্নেহ প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হ'য়েছে—সেট একদিনে নয়। প্রথম দিন ১৬ তোলা, তা'রপর একদিন বাদ দিয়ে ২০ তোলা, তা'রপর একদিন বিশ্রাম ক'রে ২৪ তোলা, এইরূপে একদিন অন্তর ৪ তোলা ক'রে বাড়িয়ে নয় দিন স্নেহ প্রয়োগ ক'রলে ৪৮ তোলা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয়। মধ্যবল ব্যক্তিকে স্নেহ প্রয়োগ ক'রতে হ'লে প্রথম দিনে আট তোলা, তা'রপর একদিন অন্তর ২ তোলা ক'রে বাড়িয়ে নয় দিন প্রয়োগ ক'রলে ২৪ তোলা হয়। আর অল্পবলব্যক্তিকে প্রথম দিনে ৪ তোলা স্নেহ প্রয়োগ ক'রে একদিন অন্তর একতোলা বৃদ্ধি ক'রে, নয় দিন স্নেহ প্রয়োগ ক'রলে ১২ তোলা প্রয়োগ করা হয়।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ—কোষ্ঠে থাকে কতক্ষণ?

ক। এ সম্বন্ধে এইবার যে সমস্ত কথা ব'লছি তা'তেই বুঝতে পা'রবেন যে স্নেহ কতক্ষণ থাকে।

প্রযুক্ত স্নেহ কার্য্যকারী না হ'য়ে শীঘ্র নির্গত হ'য়ে প'ড়লে সত্বর পুনরায় স্নেহ প্রয়োগ ক'রতে হয়। যাহার স্নেহ তিন প্রহর কাল শরীরের মধ্যে থেকে বায়ু ও বিষ্ঠার সহিত বিনাক্লেশে নির্গত হয়, তাহার সময়ের অনুবাসন হ'য়েছে বুঝ'তে হবে। অহোরাত্রের পরে স্নেহ নির্গত হলেও দোষের হয়না, বরং বস্তির গুণই প্রকাশ করে। বস্তিযাগে প্রবিষ্ট স্নেহ বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হয়ে রুক্ষতা বশতঃ যদি সম্পূর্ণরূপে নির্গত না হয়, তা' হলে উহা বাহির কর'বার চেষ্টা করা উচিত

নয়। কারণ উহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। দিবা রাত্রির মধ্যে স্নেহ নির্গত না হলে যদি কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় তা হ'লে শোধনবস্তি প্রয়োগ করে তা' নিঃসারিত করতে হয়। কিন্তু স্নেহ নির্গত না হলেও কদাচ স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করবে না।

স্নেহবস্তি বা নিরূহ বস্তি একবারে অধিক পরিমাণে অভ্যাস করা কদাচ উচিত নয়। কারণ স্নেহবস্তি নিয়ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ ক'রলে অগ্নিমান্দ্য ও দোষের উৎক্লেশ হয়। আবার নিরূহবস্তি অধিক পরিমাণে নিয়ত অভ্যাস ক'রলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়। এই জন্য ক্রমান্তরে স্নেহবস্তির পর নিরূহ বস্তি এবং নিরূহ বস্তির পর স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে পিত্ত বা কফের উৎক্লেশ কিম্বা বায়ু বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

রুক্ষ দেহ ও অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিকে প্রতিদিন স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়। অপর ব্যক্তিকে অগ্নিমান্দ্যের ভয়ে প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। আবার রুক্ষদেহ ব্যক্তিকে সকল সময়েই অল্প পরিমাণে স্নেহ বস্তি এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে সকল সময়েই অল্প মাত্রায় নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা যায়।

কেবল বায়ুদ্বারাপীড়িত ব্যক্তিকেই স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়। নচেৎ বমন বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন না করিয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ অবিশুদ্ধ অবস্থায় স্নেহবস্তি প্রয়োগ ক'রলে তাহার কোন গুণই শরীরে প্রকাশ পায় না, পরন্তু উক্ত স্নেহ মলের সহিত মিশ্রিত হ'য়ে শরীরের দুর্ব্বলতা আগ্মান, শূল, শ্বাস ও পক্বাশয়ের গুরুতা উৎপন্ন করে। এরূপ অবস্থায় নিরূহ এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। আচ্ছা শোধন বস্তি, তীক্ষ্ণ বস্তি— এসব আবার কি ?

ক। শ্রেষ্ঠা মাত্রায় বস্তি প্রয়োগ করা যায়—তাকে তীক্ষ্ণ বস্তি বলে। আর গুণ ভেদে বস্তির নানা নাম হয়। যেমন শোধন, (যেমন বিরেচন কারক) দ্রব্যসহ সিদ্ধ শোধন বস্তি, লেখন (দোষ চাঁচিয়া ফেলা) বস্তি; বৃংহণ (পুষ্টিকারক) বস্তি, বাজীকরণ বস্তি। পিচ্ছিল (অতিসারাদিতে প্রয়োজ্য) বস্তি, সংগ্রাহী মল বোধক) বস্তি, উৎক্লেশনবস্তি, দোষ হর বস্তি, দোষের প্রশমনকারক বস্তি, মাধুতৈলিক (মধু ও তৈল প্রধান) বস্তি, যুক্ত রথ নামক মাধুতৈলিক বস্তি, সিদ্ধবস্তি, মুস্তাদি বস্তি প্রভৃতি।

ডাঃ। বিরাট ব্যাপার দেখছি!

ক। এতেই বিরাট ব্যাপার দেখছেন, শাস্ত্রে আরও যে কত প্রকার তৈল প্রভৃতির বস্তি দেবার উপদেশ আছে, শুন'লে অবাক হবেন। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ ক'রলাম না। বন্ধ্যানারীকে যে বলা তৈলের বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়, সেই তৈল এক শতবার পাক করা হয় ব'লে "শতপাকী বলা তৈল" বলে।

ডাঃ। আচ্ছা, বস্তি কতগুলি দেওয়া যেতে পারে ?

ক। প্রয়োগের পরিমাণ ভেদে বস্তি তিন প্রকার, যথা কর্ম্মবস্তি, কালবস্তি ও যোগ বস্তি। প্রথমে একটী অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিয়া পরে পর্য্যায় ক্রমে অর্থাৎ একটীর পর অপরটী এইরূপ ভাবে দ্বাদশ

নিরূহ বস্তি এবং দ্বাদশটি স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। পরে পাঁচটী স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে, এইরূপে ত্রিশটী বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাকে কর্ম্ম বস্তি বলে। আর প্রথমে একটী স্নেহবস্তি দিয়া পরে একটী নিরূহবস্তি—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশটি বস্তি দিবে। পরে তিনটী স্নেহবস্তি দিবে। এইরূপে উপর্য্যুপরি পনরটি বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাল বস্তি বলে। আবার প্রথমে একটী স্নেহ বস্তি পরে একটী স্নেহ ও একটী নিরূহবস্তি—এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সাতটী বস্তি দিয়া শেষে একটী স্নেহ বস্তি দিতে হয়, তাকে যোগবস্তি বলে। রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝে এই তিনরকম বস্তির যে কোন একটী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্ব্বে যে সংশোধন, বৃংহণ প্রভৃতি বস্তির কথা ব'লেছেন তাদের কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রয়োগের নিয়ম আছে।

ক। আছে বৈকি। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। সংক্ষেপে দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি রোগে শোধনীয় বস্তি প্রয়োগ করা উচিত; বৃংহনীয়বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নাই। মেদস্বী ব্যক্তিদের বৃংহণীয়বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নেই, লেখন বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। ক্ষতক্ষীণ, শোষ রোগী, অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রভৃতি রোগীকে শোষনীয় বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নাই; অবস্থা-ভেদে বৃংহণ বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন।

ক। বস্তিদ্রব্য অতি শীতল হইলে শরীরকে স্তব্ধ করে। অত্যুষ্ণ হইলে দাহ ও মূর্চ্ছা জন্মায়। অতিস্নিগ্ধ বস্তি দ্বারা শরীরের জড়তা, রুক্ষ বস্তিতে বায়ুর প্রকোপ, পাতলা, মাত্রাহীন ও অল্প লবণযুক্ত বস্তি দ্বারা অযোগ এবং মাত্রাধিক বস্তি দ্বারা অতিযোগ হয়। অল্প ও গাঢ় বস্তি বিলম্বে প্রত্যাগত হয়। অতি লবণ মিশ্রিত বস্তি দ্বারা দাহ ও অতিসার জন্মায়। সুতরাং বস্তি দ্রব্য ঐ সকল দোষ রহিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বস্তি অর্দ্ধেক পরিমাণ প্রদত্ত হইলে যদি মল ও অধোবায়ুর বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বস্তির মল বাহির করিয়া লইবে এবং মল ও বায়ু নির্গত হইলে পুনরায় অবশিষ্ট বস্তি প্রয়োগ করিবে।

ডাঃ। আর কি নিয়ম আছে বলুন?

ক। পূর্ব্বে সাধারণ নিয়ম বলা হয়েছে যে বস্তি শীতল হ'লে অনিষ্টকর হয়। কিন্তু বিশেষ নিয়ম এই যে, উষ্ণাভিভূত ব্যক্তিকে শীতল এবং শীতাভিভূত ব্যক্তিকে সুখোষ্ণ বস্তি দিতে হবে। আবার শীতাভিভূত ব্যক্তিকে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের সঙ্গে, আর উষ্ণাভিভূত ব্যক্তিকে শীতবীর্য্যদ্রব্য দিয়ে বস্তি দিতে হ'বে।

ডাঃ। দুই রকম যথন বলা হ'ল, তখন শীতল বস্তি অনিষ্টকর বলার তাৎপর্য্য কি?

ক। এইত আপনি হাঙ্গামায় ফেল্লেন। সাধে কি ব'লেছি যে, সব কথা জানতে হ'লে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ জা'নতে হয়। আচ্ছা বলছি, শুনুন। বায়ু সাধারণতঃ শীতগুণ বিশিষ্ট আর বায়ু নাশের জন্যেই বস্তি দেওয়া হয়। সুতরাং শীতগুণের বিপরীত উষ্ণই বায়ু নাশের জন্য প্রয়োজ্য। এই কারণে সাধারণতঃ উষ্ণবস্তি প্রয়োগ ক'রতে বলা হ'য়েছে। কিন্তু দেখুন পাথর যেমন স্বভাবতঃ শীতল হলেও উষ্ণ সংযোগে উষ্ণ এবং শীত সংযোগে

শীতল হ'য়ে পড়ে, তেমনি বায়ুও উষ্ণ সংযোগে উষ্ণ এবং শীত সংযোগে শীতল হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের বায়ু এবং শীতের বায়ু ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাজেই মনে করুন, বায়ু নাশের জন্য সাধারণতঃ উষ্ণবস্তি প্রয়োগ হ'লেও পিত্ত সংসর্গে বায়ু যখন উষ্ণগুণ বিশিষ্ট হয় তখন শীতল এবং শ্লেষ্মা সংযোগে যখন অধিকতর শীতগুণ বিশিষ্ট, হয় তখন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বস্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা ঘটে। যেমন শীতের শীতল বায়ু হ'তে অব্যাহতি প্া'বার জন্যে আমরা গরম কাপড় পরি, অগ্নি সেবন করি। আর গ্রীষ্মের উষ্ণ বায়ু থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমরা শীতল ব্যজন, শীতল অনুলেপন ব্যবহার করি।

ডাঃ। অনেক লোকের ধারণা যে, ঠাণ্ডা ক'রলে বায়ু নাশ হয়।

ক। সেটা ভুল ধারণা। উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর উপশম হয়, আর শীতল ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বায়ু বর্দ্ধিত হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধর্ম্মের বিধি-নিষেধ।

—:০:—

স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিধি নিষেধ অনেক রহিয়াছে। অনেককাল পর্য্যন্ত তা মা'নিয়া আমরা ধর্ম্ম-রক্ষা ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়াছি, দেশে যখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার ঢেউ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল তখন আমরা ধর্ম্ম বিদ্রোহী হইলাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য পালনে হীন ও অনাস্থাসম্পন্ন হইলাম, ইহা শুধু আমাদের শিক্ষার দোষ—অনুকরণের পরিণপন্থি। পাশ্চাত্যশিক্ষা-সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবল ঝড়ের মত বহিতে লাগিল, আমরাও সেই বাতাসের ঢেউ সহিতে না পারিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। ত্রিসন্ধ্যাপূতঃ, স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া যখন শাস্ত্রাদেশ বাহির হইয়াছিল—তখন স্বাস্থ্যরক্ষার না হউক—ধর্ম্মরক্ষার ভয়ে তাহা পালন করিয়া আসিতেছিলাম। যখন আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রকে অবিশ্বাস করিতে শিখিলাম, তখন আমরা তাহার বিধিনিষেধকেও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিধিনিষেধ ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল আমরা ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া বেদ বাক্যের মত পালন করিতে লাগিলাম, হিন্দু সব করিতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেনা, কিন্তু এখন আমরা ধর্ম্ম হীন। শাস্ত্রাদেশ ত দূরের কথা,—তদীয় বিধি নিষেধও আমাদের এখন গ্রহণ যোগ্য নহে। আমরা চাই সুখ, আমরা চাই বিলাসিতা। আপাতমধুর সুখকে আমরা আলিঙ্গন করিয়া ধর্ম্ম তো হারাইতে বসিয়াছি-ই, স্বাস্থ্যেরও হানি করিতেছি।

হিন্দুর ধর্ম্ম প্রাতরুত্থান, প্রাতঃস্নান। প্রভাতের স্নান—সূর্য্যরশ্মি লাগিবার আগে জল নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যোপযোগী থাকে বলিয়া তাহাতে অবগাহন করিলেও দেহ, মনের পাপ দূরীভূত

হয়। স্বর্গীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেহ ও মনকে আনন্দিত করিয়া তোলে। তারপর পুষ্প চয়ন, পুষ্পের সুগন্ধ—নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া, মনকে আনন্দ ও সুখ প্রদান করে, ভ্রমর গুঞ্জন শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মনকে নব-ভাবে মাতাইয়া তোলে। ভ্রমরবঁধু যেন আকুলি-বিকুলি করিয়া গুঞ্জরিয়া থাকে। তা'র পর আহ্নিক, এই সময় ভগবানের আরাধনা কত আনন্দদায়ক—তা' যাঁ'রা ইহার সেবক—তাঁরাই বুঝিতে পারিয়াছেন। সাত্বিক আহার হৃদয় মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া দেহকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া তোলে। তাই সে কালের হিন্দু নিরোগী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। নানা পাপে লিপ্ত থাকিয়া আমরা এখন আর তাঁহাদের ন্যায় নিরোগ দেহ, সুস্থ মন ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হইনা। সায়াহ্নে আমাদের হিন্দুর সন্ধ্যাবন্দনা ও রজনীযোগে সাত্বিক আহার আয়ুরক্ষার অনুকুল ছিল। এগুলি আমরা এখন আর রক্ষা করিনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত আমরা কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়া মনে করি—ইহা আমাদের পুর্ব্ব পুরুষগণের অসভ্যতার লক্ষণ। এককালে এমন দিন ছিল, আমরা এইরূপ হিন্দুকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছি। এখন অনেক কারণে সে বাতাস কতকটা ফিরিয়াছে; মঙ্গলের লক্ষণ।

অধুনা প্রতারণা ও পাপ আমাদের হৃদয় দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। গ্রহ বিপাকে আগেকার কোনটাই আমাদের এখন আর ভাল লাগিতেছেনা। ধন্বন্তরি সদৃশ ঋষি গণের ঔষধে আমাদের বিশ্বাস নাই, আয়ুর্ব্বেদে আস্থা নাই আমাদের দেশের উপযোগী, আমাদের দেহে যা' সহনীয়—আমরা তা' গ্রহণ করিতে নারাজ। উষ্ণ প্রধান আমাদের দেশ, শীত প্রধান দেশের উগ্রবীর্য্য ঔষধ পথ্য আমাদের সহিবে কেন? তাহাতে সুফলের অপেক্ষা কুফলই অধিক হইয়া থাকে। চ্যবন ঋষি কৃত চ্যবনপ্রাশকে ছাড়িয়া আমরা নিত্য কড্‌লিভার ব্যবহার করি। সুস্বাদ চ্যবনপ্রাশের পরিবর্ত্তে বিস্বাদ কড্‌লিভারকে আমরা কেন পছন্দ করি, তা' আমরাই বুঝি না। এইত একটা উদাহরণ দিলাম, আর কত রহিয়াছে, সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মাসিক পত্রে লিপি বদ্ধ করা চলে না।

পূর্ব্বে হিন্দুর প্রাতঃকৃত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, অধুনা যাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করেন, তাঁহারা সেই শুভ মুহূর্ত্তেই চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হন। কাক যখন ডাকে কা,—বাবুরা তখন ডাকেন চা! একটু বিস্কুট, এক পেয়ালা চা উদরস্থ করা চাই, তা' না হইলে ত সভ্যতাই হইলনা। বিদেশের আমদানীকরা শিক্ষা লাভ করিয়াই বা লাভ হইল কি? আগে দেশে চা ছিলনা, কেমন করিয়া চা আমাদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিল, তা' অনেকেই অবগত আছেন। বিলাতি ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে চা খাওয়াইয়া আমাদিগকে নেশার বশে কাবু করিয়া—তাঁহাদের ব্যবসায় বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কি কেহ কলিকাতায় এতগুলি চায়ের দোকান দেখিয়াছেন? তা'রপর অলিতে গলিতে চা ফেরি করিয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, আমরা তা' না খাইয়া যাই কোথা? আমি একবার পশ্চিমে যাইতেছিলাম,—মোগলসরাই ষ্টেসনে গাড়ি অনেক্ষণ দাঁড়ায়, ফেরিওয়ালা চা

দিতেছে,—"ব্রাহ্মণ চা" বলিয়া যখন হাঁকিল—তখন বড় শীত বলিয়া তা'কে ডাকিলাম, এক পেয়ালা চা খাইয়া দাম দিতে চাহিলাম, সে কহিল, "আমরা লিপটর্ন সাহেবের চাকর বিনা দামে চা খাওয়াই।" আমি ভাবিলাম ব্যবসায়ী বটে! আমি যে কামরায় ছিলাম সেই কামরায় আরো দুইজন কলিকাতার সৌখিন বাবু ছিলেন—তাঁহারা বলিলেন "ছিঃ আপনি হিন্দুর চা খাইলেন কেন? হিন্দুরা কি চা তৈয়ার করিতে পারে? মুসলমানের চা খান, বেশ আরাম পাইবেন।" আমি তো ইঁহাদের বিকৃত শিক্ষা বুঝিয়া অবাক হইলাম। যাহা হউক আমাদের আর একটা মহৎ দোষ হইয়াছে—হিন্দুর সব তাতেই অগ্রাহ্য করা। হিন্দুর অস্পৃশ্য জাতি না রাঁধিলে আমাদের ভাল লাগেনা, তাহারা ছুঁইয়া না দিলে আমাদের রসনায় সেটা যেন তৃপ্তিকর বলিয়াই উপলব্ধি হয় না। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য জাতির পক্কাহারে এবং চায়ের মত উগ্রবীর্য্য দ্রব্য পানে আমাদের উদরের পীড়া হইবার কথা, ফলে হইতেছেও তাহাই। চায়ের অপকারিতা যথেষ্ট, চা-খোরদের ডিস্‌পেপসিয়া নামক রোগটি যেন একচেটিয়া। চা পানে সাময়িক একটা স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু অবসাদ হয় তার দ্বিগুণ। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেঙ্গুন চিফকোর্টের উকীল, তাঁহার বিবাহের জন্য আমাদের সমাজ ছাড়িয়া আমার কোন আত্মীয় কলিকাতা অঞ্চলে মেয়ে দেখিতে-ছিলেন. একটী মেয়ে ঠিক করিয়া পত্র লিখিলেন, কলিকাতায় গিয়া মেয়ে দেখিলাম। সে মেয়ে যেন একটী থিয়েটারের অভিনেত্রী বেশে আমার নিকট হাজির হইল। অবস্থা দেখিয়াই ত আমি অবাক্। পরে জানিলাম, মেয়ে প্রাতে উঠিয়া চা-বিস্কুট খায়? সন্ধ্যায় বিকালে আবার চা চাই। সাবান এসেন্সেরত কথাই নাই। যাহা হউক সে মেয়েকে আর আমাদের গৃহে আনা হইল না। আমাদের কোন পুরুষেই—কি মেয়ে কি পুরুষের জন্য চায়ের ব্যবস্থা নাই, কেবল দেশের অবস্থা বুঝিয়া অভ্যাগতদের জন্য গৃহে চায়ের আয়োজন আছে মাত্র। যাহাহউক হিন্দুর প্রাতঃকৃত্যাদির পরিবর্ত্তে ঐ সময় এই সকল বিজাতীয় পান ভোজনের ব্যবস্থা আমাদের গৃহে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহা আমাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দখল করিয়া ফেলিয়াছে—ইহাই ভয়ের কথা। আমাদের দেশে অনেকেই স্বীয় পুত্র কন্যাকে স্বহস্তে এই বিষ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আরো আশঙ্কার কথা। পুর্ব্বে যে অবিবাহিতা মেয়ের কথা বলিলাম, তাহার পিতা মাতাই তাহাকে এই কুঅভ্যাসগ্রস্ত করিয়াছেন শুনিলাম।

শাস্ত্রকারেরা কতকগুলি তিথি বিশেষে কোন কোন বস্তু গ্রহণ ও ভক্ষণের ব্যবস্থা দেন নাই—উহার সহিত স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। অমাবস্যায় স্ত্রী, তৈল, মৎস্য, মাংস-সম্ভোগ-নিষেধ-ব্যবস্থা আছে। আবার কোন তিথিতে তাল, কোনটাতে অলাবু ও কোনটাতে বার্ত্তাকু ইত্যাদি রূপে তিথি বিশেষে, দ্রব্য বিশেষের ভক্ষণ নিষিদ্ধ; এখানেও শাস্ত্র-কারেরা ধর্ম্মহানি, বংশহানি প্রভৃতির ভয় দেখাইয়াছেন। ফলকথা, যে সকল নিষিদ্ধা-দেশ হইয়াছে তাহার সহিত স্বাস্থ্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিহিত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিশারদেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। একাদশীতে উপবাস ও পক্ষান্তে নিশি পালন ব্যবস্থা আছে। একাদশী যাঁহারা

পালন করেন—আর একাদশী যাঁহারা পালেন করেন না—তাঁহারা উভয় পক্ষ হইতেই এই সকল উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। একাদশী জোয়ারের দিন, সে দিন উপবাস দিলে দেহটা খুব ঝরঝরে থরথরে হয়, সে দিন উপবাস দিলে বাতাদি রোগের বিশেষ উপকার দর্শে। সেই জন্য দেখা যায়, আমাদের বিধবাগণ প্রায় সকলেই নীরোগ। আবার পক্ষান্তদিনেও জোয়ারের দিন। অমাবস্যা, পূর্ণিমায় নিশিপালন অর্থাৎ রাত্রিতে উপবাস দিলে বা অন্নাহার রহিত করিলে শরীরটা বেশ হাল্‌কা হয়। তাহাতেও বাতাদি রোগের উপকার দর্শে। বর্ত্তমান-কালে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারেরাও পক্ষান্তে রোগীকে অন্নাহার দেননা, একাদশীতেও তাঁহারা তদ্রূপ ব্যবস্থা করেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ঐ সকল নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হিন্দু, ধর্ম্মকে ছাড়িতে পারেনা, আর সব পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিজড়িত এই কথা আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত। আমরা যেরূপ অল্পায়ু ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে আর ইহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিয়াই আমরা মরিতে বসিয়াছি—ইহা আমা-দিগকে বিশেষরূপে মনে করিতে হইবে, নতুবা আমাদের আর আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নাই।

কোন ইংরেজের মুখ দিয়া কথা বাহির না হইলে আমরা তাহা মানিতে চাই না। ইংরেজ যাহা বলেন, তাহা আমাদের ঋষি প্রণীত বেদ বাক্য অপেক্ষাও অধিকতর গ্রহণ করিয়া থাকি। পথ্যাদি সম্বন্ধেও আমাদের এক্ষণে সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। রোগীর পথ্য দেশভেদে আমাদের রোগ ও দেহের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন, আমরা আমাদের আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত পথ্যাদিতে তেমন আস্থা—বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছিনা, ইহাও আমাদের দুর্লক্ষণ। তাহা না হইলে খই ও চিঁড়ার মণ্ড, মসুরের যূষ প্রভৃতি অনেকদিন পূর্ব্বে আমাদের বাস্তুভিটা হইতে নির্ব্বাসিত হইত না। এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে—বিলাতি নানাবিধ কুপথ্য। তবে সংপ্রতি মসুরের যূষের আদর হইতে দেখিতেছি, কারণ আমেরিকার ডাক্তারগণ বা মেডিকেল বোর্ড বলিয়াছেন, যে মসুরের দালে মাংসের তুল্য উপাদান রহিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহা পূর্ব্বেই জানি-তেন। তাই তাঁহারা রবিবার ও অমাবস্যায় মৎস্য, মাংসের নিষেধের সঙ্গে মসুরের দাইলেরও নিষেধব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কেমন করিয়া বলিব—আমাদের শাস্ত্রকারগণ কিছু বুঝিতেন না, অথবা তাঁহারা অবৈজ্ঞানিক ছিলেন?

ফলকথা; স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ঋষি প্রণীত শাস্ত্রা-দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলে আর আমাদিগকে নিত্য ডাক্তারের দাওয়াইখানায় দৌড়া দৌড়ি করিতে হইবেনা, —আজ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কাল শিরঃপীড়া, পরদিন জ্বর—এ সকল নিত্য অসুখে ভুগিতে হইবে না। শাস্ত্রাদেশ না মানিয়া আমরা এই সকল আধিব্যাধির বাঁধা নিমন্ত্রণ আনিয়া ফেলিয়াছি। ছেলে জন্মিতেই সামান্য অসুখে ডাক্তারী ঔষধে তা'র পেটে চড়া পড়িয়া যায়। আমাদের প্রাচীনাদের টোটকা টাটকী সুতিকা-

ঘর হইতে বিদায় হইয়াছে, আমাদের সূতিকা ঘরে শিশুর ক্রন্দনেও ডাক্তারের ডাক পড়ে! আর বাকী রহিল কি? যদি নিজেকে নীরোগ, দীর্ঘজীবী ও পুত্র পৌত্রাদিকে সুস্থদেহ দেখিতে চাও—তবে আর বিলম্ব করিওনা, শাস্ত্রাদেশকে আলিঙ্গন কর, কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

দর্শনেন্দ্রিয়-বিবরণ।*

দর্শনেন্দ্রিয়ের আলোচনা করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে জ্ঞানের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। কারণ দর্শনেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেরই কারণ বা দ্বার স্বরূপ। কোন পদার্থ শরীরের বাহিরে অথবা ভিতরে সংস্পৃষ্ট হইলে তথাকার স্রোতের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে, মনকে যে সংজ্ঞা প্রদান করে, তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি।

আমাদের এই দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই চৈতন্যময়। চৈতন্যময় হইলেও ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য স্রোতের দ্বারা মস্তকে নীত হইলে আমরা মনের দ্বারা তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকি।

যদিও আমাদিগের ধমনী অথবা স্রোত বস্তুর সকল ধর্ম্মকে বহন করিতে পারে না, তথাপি তাহারা যে পদার্থের বিশেষ বা ভেদক ধর্ম্ম বহন করিতেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বাহিরের পদার্থ ব্যতীত আভ্যন্তরিক কোন কারণে ধমনীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে, সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা মস্তকে উপনীত হইলে চৈতন্যের উদয় হইতে পারে। যেমন বাহিরে গন্ধদ্রব্য ব্যতীত সময়ে সময়ে নাসারন্ধ্রে গন্ধদ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায়; শ্লৈষ্মিক রোগে অনেক সময় ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। বাহিরের কোন উত্তেজনা ব্যতিরেকেও চক্ষুদ্বারা আলোক ও অন্ধকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, অপস্মার রোগে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

চৈতন্য নানা প্রকার; তন্মধ্যে অসুস্থতা, দৌর্ব্বল্য, গ্লানি বা অবসন্নতা প্রভৃতি চৈতন্য

---

* আয়ুর্ব্বেদ সভার সাধারণ অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের সমালোচনার জন্য আর একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচনার সুবিধার জন্য ১০০২ জন সভ্যের নিকট প্রবন্ধের প্রতিলিপি পাঠান হইয়াছিল। কতকগুলি সভ্য প্রবন্ধের বহুস্থলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অধিবেশনান্তরে স্থির হয় যে প্রবন্ধ লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক একটী পৃথক্ প্রবন্ধ লিখুন। আশা করি প্রবন্ধ লেখক সভার অনুরোধ মত কার্য্য করিবেন, এবং করিলে সেই প্রবন্ধ সাদরে আমরা মুদ্রিত করিব। আঃ সং

শরীরের কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু উহারা যে শরীরস্থ দোষ বা রসরক্তাদি ধাতুর বিকৃতি বা অস্বাভাবিক অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুধা বোধ, ইহাকে আমাশয়িক চৈতন্য, শিরা ধমনীর ক্রিয়া লোপ, ইহাদিগকে শিরা ধমনীর চৈতন্য, গুরুত্ব লঘুত্ব বোধ, ইহাকে, পেশীর চৈতন্য বলা যায়।

আবার সাধারণ উত্তেজনার দ্বারাই হউক, বা বিশিষ্ট উত্তেজক দ্রব্য দ্বারাই হউক, কোন বিশিষ্ট স্থান উত্তেজিত হইয়া যে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান কহে, এবং তৎ স্থানকে তাহাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয় কহে। ইন্দ্রিয় পাঁচটী—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক।

৩। উত্তেজক কারণ দেহ মধ্যেই থাকুক অথবা বাহির হইতেই দেহে সংস্পৃষ্ট হউক তাহা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করে। যেমন চক্ষুতে বাতাদিদোষ দূষিত হইলে নানা প্রকার আলোক এবং অন্ধকার দৃষ্ট হয়, ঘ্রাণ দূষিত হইলে বিবিধ গন্ধ এবং কর্ণে নানা প্রকার শব্দ এবং জিহ্বায় বিবিধ আস্বাদ এবং ত্বক দূষিত হইলে শীত উষ্ণ বেদনা প্রভৃতি নানা প্রকার স্পর্শ অনুভূত হয়।

উপরে যে জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করা হইল, অনেক সময় তাহা ভ্রম পূর্ণও হইতে পারে, যেমন এক গাছি দড়ি দেখিয়া অনেক সময় সর্প ভ্রম হইতে পারে। বিস্তৃত ময়দানে স্থাণু দেখিয়া ভূত ভ্রমে অচেতন হইতে পারে। এই-রূপ দৈহিক কোন কারণ জনিত চৈতন্য ও বাহ্য কারণ সম্ভূত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। যেমন চক্ষু পিত্তদূষিত হইলে বাহির হইতে আলোক পড়িতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। কর্ণ দূষিত হইলে শব্দ বাহির হইতে আসিতেছে অথবা কিয়দ্দূরে ঢাক ঢোল বাজাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

আবার দেখা যায় যে, এই সকল ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান বিষয়ে, ইন্দ্রিয়ের উপর মন প্রভুত্ব করিয়া থাকে। কারণ দেখা যায় যে, এই সকল বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ সংযোগ থাকিলে তবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। মনঃ সংযোগ না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না, যেমন কোন ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সহিত কথা বলিতে বলিতে যদি তাহার মন• অন্য কোন একটা গুরুতর বিষয়ে আক্রান্ত হয় তবে সে তাহার বন্ধুর কোন কথাই বুঝিতে পারে না, কারণ তাহার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত নহে। ঘোর নিদ্রার অবস্থায় মন ক্লান্ত হইয়া বিষয় গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে, অথবা রাগান্ধ হইলে, তখন কোন জ্ঞানই মনোমধ্যে উদিত হয় না। আবার তীব্র মনঃসংযোগে মানব ঐক্যতান বাদনের বিবিধ যন্ত্রের স্বর তান ও তাল স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, জ্ঞানোৎপত্তি স্থান যেখানেই হউক না কেন, সেই জ্ঞানের উপলব্ধি মস্তকেই হয়। জ্ঞান সাধারণতঃ অসংখ্য প্রকার হইলেও তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও মানস প্রত্যক্ষ। শরীরের ভিতর হইতেই হউক বা বাহির হইতেই হউক, যাহা কোন বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে—তাহাই ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান; এবং যাহা কোন বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে না, কেবল মাত্র মনকে স্পর্শ করিবে, তাহাই মানস জ্ঞান। এই জ্ঞান আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ। যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান এবং অযথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। মানস দোষেই

ভ্রম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি কালে মন অন্য কোন বিষয়ে অভ্যস্ত থাকিলে হঠাৎ তাহা উপস্থিত হইয়া ভ্রম জ্ঞান উৎপাদন করে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রথমে চৈতন্য গ্রহণ করে, তৎপ রস্ব স্ব স্রোতঃ দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহাহউক এক্ষণে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারা দেখিতে পায়, যাহাদের চক্ষু নাই তাহারা দেখিতে পায় না। অন্ধকারে চক্ষু খুলিয়া রাখিলেও যে ফল, আলোকে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলেও সেই ফল। ইহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, চক্ষু দ্বারা আমরা দেখিতে পাই এবং আলোকের সাহায্যেই ঐ সকল বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ; সুতরাং আলোক এবং চক্ষু সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়গণ স্বজাতীয় দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াই স্বস্ব বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন সন্দেশটী মুখে প্রক্ষিপ্ত হইলেই রসনেন্দ্রিয় দ্বারা উহার মধুরতা অনুভূত হয় না, কিন্তু কণ্ঠগত শ্লেষ্মা দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেই উহার স্বাদ অনুভূত হয়। সেইরূপ দর্শনেন্দ্রিয় রূপ দ্বারা উত্তেজিত হইলেই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। আলোকের ধর্ম্ম এই যে, তাহারা কোন পদার্থ হইতে নিঃসৃত হইয়া সরল রেখা অভিমুখে গমন করে। জল অথবা তৎতুল্য কোন দ্রব পদার্থ অথবা উজ্জ্বল ঘন কাচ বা তৎতুল্য কোন পদার্থের ভিতর দিয়া ঐ আলোক সরল রেখাভিমুখে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে। চক্ষুর সম্মুখাংশ জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং দ্রব পদার্থে পূর্ণ থাকে ; সুতরাং চক্ষুর ভিতরে ঐ আলোক অনায়াসে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় ; এবং ইহার দ্বারা দৃষ্টি উত্তেজিত হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই পঞ্চমহাভূতাত্মক হইলেও চক্ষুতে তেজো ধাতুর আধিক্য আছে বলিয়া আলোক দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে পারে।

চক্ষুর আকার গোল, কয়েকখানি অস্থি নির্ম্মিত কোটরে অবস্থিত, ইহার বেধ নিজ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের দুই অঙ্গুল। এবং দৈর্ঘ ও প্রস্থ সার্দ্ধ দ্ব্যঙ্গুল। ইহার উপরি ভাগের গঠন অনেকটা গোস্তনের ন্যায় ইহা কয়েকখানি মাংস পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। নয়ন গোলক কতক গুলি আবরণ মাংসপেশী, কাচ সদৃশ পদার্থ ও উজ্জ্বল তেজোময় আলোচক পিত্তদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার চতুর্দ্দিক জলময়, কিন্তু মধ্য প্রদেশটী তেজোময় পিত্ত দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় চক্ষুর সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশই দেখিতে বেশ উজ্জ্বল হয়। ঐ উজ্জ্বলতা জলের দ্বারা নষ্ট হয় না। উহা হইতে সর্ব্বদাই একটা জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে এবং তাহার ক্ষয় হয় না, বাহিরের আলোকের সংস্পর্শে উহা আরও উদ্দীপিত হয়। ইহার অক্ষয়ী জ্যোতিঃ অনেকটা খদ্যোতের আলোকের ন্যায়। এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটী উষ্ণ; সুতরাং চক্ষু শীত সাত্ম্য অর্থাৎ শৈত্য দ্বারা উহা নিরাপদ থাকে এবং উষ্ণস্পর্শে উহা উত্তেজিত হয়, এমন কি এতদূর উত্তেজিত হইতে পারে যে, তদ্বারা তাহার আশ্রয় স্থান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতে পারে। বিদেহাধিপের মতে শৃঙ্গাটক সিরা চক্ষুর পশ্চাৎ দেশ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টিমণ্ডল নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক পার্শ্বের সিরা তাহাদের নিজ চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক পার্শ্বের কতকগুলি স্রোতঃ অপর

পার্শ্বে গমন করে, এজন্য প্রত্যেক চক্ষে দুই সিরাই দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর বহির্দ্দেশ দেখিতে শুভ্র, কিন্তু উহার সম্মুখাংশ উজ্জল ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর, এইস্থান দিয়াই চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করে।

চক্ষুতে মণ্ডল পাঁচটী, তন্মধ্যে পক্ষ্মমণ্ডল ও বর্ত্মমণ্ডল পরিত্যাগ করিলে নেত্র গোলকে তিনটী মাত্র মণ্ডল দেখা যায়। এইস্থলে শুদ্ধ সেই তিনটী মণ্ডলের এবং নেত্রগোলকের সম্মুখ হইতে পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত যে চারিটী পটল বা স্তর আছে, তাহারই বিবরণ করা যাইতেছে। মণ্ডল—ইহা সিরা স্নায়ু ব্যাপ্ত জরায়ু বিশেষ, সাধারণতঃ ভাষায় ইহাকে আমরা পর্দ্দা বলিয়া থাকি। এই পর্দ্দাগুলি শৃঙ্গাটক সিরার সম্মুখ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত নেত্রগোলককে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া আছে এই জন্যই ইহাদের নাম মণ্ডল রাখা হইয়াছে। নেত্রগোলকে মণ্ডল ৩টী, —শ্বেতমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডল দৃষ্টিমণ্ডল। এই মণ্ডলগুলি উপর্য্যুপরি ব্যবস্থিত অর্থাৎ প্রথম শ্বেত মণ্ডল তাহার মধ্যে কৃষ্ণমণ্ডল এবং তন্মধ্যে দৃষ্টিমণ্ডল। সর্ব্ববহিস্থিত মণ্ডলের নাম শ্বেত মণ্ডল।

শ্বেতমণ্ডল—ইহা অতি কঠিন ও ঘন সূত্রে নির্ম্মিত। ইহা চক্ষু মণ্ডলের প্রায় পাঁচভাগের ৪ ভাগ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখস্থ অপর পঞ্চমাংশ অত্যন্ত উজ্জল ও নির্ম্মল। এই সম্মুখস্থ গোস্তনাকার অংশের নাম গোস্তন। এই সর্ব্ববহিস্থ স্তরের ত্বকগুলি রসবাহিনী ধমনীদ্বারা নির্ম্মিত; রক্তবাহিনী ধমনীও ইহাতে প্রবেশ করে একথা কেহ কেন বলেন। এবং ইহাতে যে দ্রব পদার্থ রহিয়াছে, তাহা স্বচ্ছ রস, এই রসের স্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত এই রস স্বচ্ছ বলিয়াই গোস্তনটী ওরূপ সুন্দর দেখায়। যদিও এই স্বচ্ছরসের সহিত শোণিত মিশ্রিত নহে, তথাপি উহাকে কখন কখন রক্তবর্ণ হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণমণ্ডল—এই আবরণটী কৃষ্ণ বর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ. ইহা শোণিতে রই অংশ, অত্যন্ত আগ্নেয়, কারণ দেখা যায় যে, ইহা দ্বারা সমগ্র দৃষ্টিমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে। কৃষ্ণ বর্ণের পদার্থ গুলি শোণিতের অংশ হইলেও উহাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ুথাকায় তৎ সংযোগে উহার বর্ণও কাল হইয়াছে। এই আবরণটী শ্বেতমণ্ডলের মূলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধে শ্বেত মণ্ডল ও বাহ্য পটল এই উভয়ের সংযোগ স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। এবং ইহারই একটী অংশ আরও অগ্রসর হইয়া মাংস পটলকে সর্ব্বতোভাবে উর্দ্ধে ও নিম্নে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যে, যে সকল তীক্ষ্ণরশ্মি অতিমাত্রায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নয়নাধিষ্ঠানকে অভিভূত করে, তাহাদিগকে শোষন করে।

মাংসপটল—ইহা গোলাকার কুঞ্চনশীল পেশী বিশেষ। ইহার মধ্যস্থলে গোলাকার একটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, ইহার নাম দৈব ছিদ্র। মাংস পটল মেদঃ পটলের সম্মুখ গাত্রে সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করে। ইহার বাহ্য ধার গোস্তন শ্বেতমণ্ডল ও কৃষ্ণমণ্ডলের আবরণদিগের সন্ধিস্থলে। ইহাতে কতকগুলি পিত্ত শোণিত বাহী এবং মেদো বাহী স্রোত এবং কণ্ডরা দৃষ্ট হয়। ইহার ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ ইহারই সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে কৃষ্ণবর্ণের একটী পর্দ্দা সংলগ্ন রহিয়াছে। বাহিরের অতিরিক্ত আলোক গোস্তনের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র তাহার কতকাংশ এই কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ শোষন

করিয়া লয়। সুতরাং পরিমিত আলোকই দৈব ছিদ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়া থাকে। এবং ইহা আলোকরশ্মিকে বিপথে গমন করিতে দেয় না। এই পটলটী নিম্নভাগে দূষিত হইলে সমীপস্থ বস্তু এবং উর্দ্ধভাগে দূষিত হইলে দূরস্থ বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্থাৎ দূরদর্শন বা নিকটদর্শন পক্ষে মাংস পটলই কারণ। এই মাংসপেশী কুঞ্চিত হইলেই দৃষ্টিমণ্ডল কুঞ্চিত হয় এবং ইহার প্রসারনেই দৃষ্টিমণ্ডল প্রসারিত হয়। নানা-কারণে দৃষ্টিমণ্ডল কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়।

দৃষ্টিমণ্ডল—ইহা মেদোবাহি স্রোতঃ দ্বারা নির্ম্মিত। শৃঙ্গাটকসিরা চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া দৃষ্টিমণ্ডল এই সংজ্ঞা লাভ করে। ইহাতে মশক, মক্ষিকা, মণ্ডলাকার, পতাকা সদৃশ, নক্ষত্র সদৃশ, জালকের ন্যায় নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নেত্রগোলকের সমস্ত অভ্যন্তরপ্রদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। দেখা যায় যে, দৃষ্টিমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলের ক্রোড় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া শুক্ল মণ্ডল ও কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে মিলিত রহিয়াছে। এবং তথা হইতে মাংস পটলের নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়া দৈবছিদ্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই অংশটীর নাম মেদঃ পটল। মেদঃ পটল মাংস পটলেরই নিম্নগাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এখান হইতে দৃষ্টিমণ্ডলের, সমস্ত নিম্নপ্রদেশই মেদোময়। কালকাস্থি, ইহাই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান। যদিও সমস্ত নেত্রগোলককেই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলা যাইতে পারে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই পটলই প্রধান বলিয়া ইহাকে দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলা যায়। কালকাস্থি একটী মেদঃ পূর্ণ কুপের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহা ক্ষুদ্র এবং কিঞ্চিৎ ঘন সূত্রাকার অস্থি পদার্থ হইতে নির্ম্মিত। ইহার পরিমাণ মাংসপটলের এক সপ্তমাংস। ইহার সমস্ত উপরিভাগ একখানি গাঢ় নীলবর্ণ পর্দ্দা দ্বারা আবৃত। এই অস্থিখণ্ডের মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ চাপা হইতে পারে। ইহা হইতে অগ্নি শিখার ন্যায় একটী আলোক রশ্মি নির্গত হয়, তদ্বারা নেত্রগোলকের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত উজ্জল হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র পল্লবের উপরিভাগ টিপিলে উহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অন্ধকারে পশুদিগের প্রশস্তচক্ষে অথবা বিড়ালের চক্ষে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। এই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে কোনরূপ আলোক পড়িবা-মাত্র ইহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এবং সেই সময় তারকা কুঞ্চিত হয়। উপরোক্ত মাংস পটলের কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দাখানা নিম্নদিকে ক্রমে ক্রমে আরও ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া কালকাস্থিতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের সারভাগ, যাহা মাংস পটলের নিম্নভাগের স্রোতের মধ্যে প্রস্তুত হয় তাহাই কালকাস্থিতে প্রবেশ করিয়া তারকা নামে অভিহিত হয়। এই উজ্জল তার-কাই বস্তুর সমস্ত রূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ধর্ম্ম শৃঙ্গাটক শিরাদ্বারা মস্তকে প্রেরণ করে। এই কালকাস্থির গাঢ় নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আগ্নেয়, সুতরাং অত্যন্ত উষ্ণ। এই নীল বর্ণ পদার্থ ব্যতীত নয়ন গোলকে যে নানাবিধ রস দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্বারা নেত্র বুদ্বুদের সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশ পূর্ণ রহিয়াছে, তাহারা সকলেই শ্লেষ্মধর্ম্মা অর্থাৎ শীতল। যদি

এইরূপ না হইত তবে কালকাস্থিগত ঐ পিত্ত নয়ন গোলককে দগ্ধ করিয়া ফেলিত—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। রূপের আলোচন অর্থাৎ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম আলোচকপিত্ত, এই আলোচক পিত্ত যদি একবার নির্ব্বিবাদে রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায়, অর্থাৎ দর্শনশক্তি ইহাতেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

বস্তুর রূপ গোস্তনের ভিতর দিয়া কাল কাস্থি এবং তথা হইতে কাল কাস্থির ভিতর দিয়া শৃঙ্গাটক শিরার অগ্রভাগ এবং শৃঙ্গাটক শিরাদ্বারা ঐ রূপের বহন কার্য্যে পথিমধ্যে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না। দেখা যায় যে পরিষ্কার জল উজ্জ্বলকাচ অথবা তত্তুল্য পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিলে যতক্ষণ না উহা বাধা প্রাপ্ত হইবে, ততক্ষণ উহা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবেনা। যেমন বাধা প্রাপ্ত হইবে—অমনি উহা ঘুরিয়া দাঁড়াইবে, ইহার নাম প্রতিবিম্ব। প্রতি অর্থাৎ বিপরীত ভাবাপন্ন, বিম্ব অর্থাৎ প্রতিকৃতি, তাহাই প্রতিবিম্ব। চক্ষুতে আলোক প্রবেশ করিলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে কোন স্থানে উহা বাধা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং প্রতিবিম্ব গ্রহণের কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব আমরা যে সকল দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা বিপরীত ভাবে দর্শন করি না। স্বাভাবিক অবস্থাই দর্শন করিয়া থাকি।

পূর্ব্বে যে মাংস পটলের উপরিভাগে এক-খানি পর্দ্দা বা জরায়ুর কথা বলা হইয়াছে, যাহার উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, উহার নাম কৃষ্ণ ত্বক। ঐ কৃষ্ণত্বক মাংস পটলের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। উহাতে দুই প্রকার স্রোতঃ দেখা যায়—শ্লেষ্মবাহি ও পিত্তবাহি। তন্মধ্যে কোন কারণে পিত্তবাহি স্রোতঃ উত্তেজিত হইলে চক্ষুর তারকা কুঞ্চিত হয়, এবং শ্লেষ্মবাহি স্রোতে শ্লৈষ্মিক অংশ বৃদ্ধি পাইলে চক্ষু প্রশস্ত হয়।

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রত্যেক চক্ষুর ভিতরে একটী বস্তুর স্বতন্ত্র রূপ প্রবেশ করায় আমরা একটী বস্তুকে দুইটী কেন দেখি না। উত্তর এই যে, শৃঙ্গাটক শিরা একটি, দুইটী অথবা তিনটীকিম্বা সহস্রটী চক্ষু দ্বারায় একই রূপ প্রবেশ করিলেও শৃঙ্গাটক শিরা একই রূপ দ্বারা অভিন্নরূপে ভাবিত হওয়ায় একই ধর্ম্মকে বহন করে। সুতরাং একটী বস্তুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ দুইটী চক্ষুদ্বারা প্রবেশ করিলেও আমরা একটী বস্তুর দুইটী রূপ দেখি না। ইন্দ্রিয়বাহী ধমনীগণ যদিও পদার্থের রূপ বহন করিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে লইয়া যায় না, কিন্তু রূপের দ্বারা তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা অভিন্ন রূপ হওয়ায় দুইটী চক্ষু দ্বারা অভিন্ন রূপ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই বুঝিলাম যে, পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইয়া নির্ম্মল গোস্তনের ভিতর দিয়া দৈবছিদ্র দ্বারা কালকাস্থিতে উপস্থিত হয়। এবং সেই মুহূর্ত্তেই কাল কাস্থির ভিতর দিয়া সরল রেখাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে শৃঙ্গাটক শিরার মুখে উপস্থিত হইয়া তত্তৎ পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মকে মস্তকে প্রেরণ করে। সুতরাং প্রকৃত দর্শন জ্ঞান মস্তকেই হইয়া থাকে। পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইয়া শৃঙ্গাটক শিরার সহিত মিলিত হওয়ায়

উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল তদ্দারা শৃঙ্গাটক শিরা ভাবিত হইতে পারে, সুতরাং আমরা বস্তুর প্রকৃত রূপই দর্শন করিয়া থাকি, প্রতিবিম্ব নহে।

শ্রীহরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ,
কবিভূষণ।

স্বাস্থ্যতত্ত্বে বৈধব্য ধৰ্ম্ম।

—:০:—

ভগবানের বিশাল বিরাট অবনীমণ্ডলে ভারতবর্ষের "বৈধব্য ধৰ্ম্ম" স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অদ্বিতীয়। এমন গবেষণাপূর্ণ উচ্চ বৈজ্ঞানিক-সুব্যবস্থা অন্য কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে নাই। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আধুনিক কি পুরুষ—কি স্ত্রীলোক-প্রায় সকলেই এ হেন সুপ্রতিষ্ঠিত সাধুপ্রথার বিরুদ্ধে নানা প্রকার ভ্রূকুটিভঙ্গী ও নিন্দাবাদ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে মুক্তকণ্ঠ! নব্যশিক্ষিত পুরুষ গণের মধ্যে অধিকাংশই বৈধব্যধৰ্ম্মকে নিতান্ত কষ্টকর এবং অবিচারজনিত কুপ্রথা বলিয়া ঘৃণা করতঃ তাঁহাদের উদার দয়ার-দ্বার উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত হন। সেজন্য সনাতন যতি ধৰ্ম্মাবলম্বিনী বিধবাদিগের বিবাহ দিতেও বদ্ধপরিকর! আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রমণী সমাজও ইহার স্বাস্থ্যজনকতা ও ধাৰ্ম্মিকতা এবং পরম পবিত্রতা বুঝিতে না শিখিয়া নানা প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ বৈধব্য যেন মহা পাপের ফল এবং বৈধব্য ধৰ্ম্ম যেন নিতান্ত ঘৃণিত কুকাৰ্য্য ও কষ্টদায়ক;—কারণ প্রত্যহ মাৰ্জ্জিত বগুনায় রান্না করিয়া এক সন্ধ্যামাত্র স্বপাক আহার, ঘৃত সৈন্ধবযুক্তভোজনে জীবনধারণ, মৎস্য, মাংস ও পৰ্য্যুসিত দ্রব্য তিন বার আহার করিতে না পারা, একাদশী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পর্ব্বে উপবাস করিতে বাধ্য থাকা, বেশভূষা পরিত্যাগে সন্ন্যাসিনী সাজিয়া জীবন যাপন, কামেন্দ্রিয়ের চরিতার্থে বঞ্চিত থাকা,—ইত্যাদি আচরণ নিতান্ত দুঃখজনক।—ইহার পরিবর্ত্তে উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রে রান্না করিয়া বা পৰ্য্যুসিত রাখিয়া তিন চারিবার প্রেতাহার, পলাণ্ডু, পাঙ্গালবণাদি জাতিদুষ্ট কদাহার, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি কদৰ্য্য বস্তু এবং পূতিগন্ধযুক্ত ইত্যাদি রাক্ষসাহার, অল্পপবাস, অধৌতপদ উড়িয়া প্রভৃতি যাহার তাহার আশ্রয়দুষ্ট আহাৰ্য্য গ্রহণ, আর সর্ব্বদা আভরণ মণ্ডিতা ও ল্যাভেণ্ডার আপ্লুতা এবং তাম্বুলরঞ্জিতা বিলাসিনী সাজিয়া কামপূর্ণ অন্তঃকরণে জীবন যাপনই পরম সুখ-কর এবং ইহাই যেন জগতের সার সর্ব্বস্ব মঙ্গল-জনক। এতাদৃশ ধারণাতেই যতিধৰ্ম্মের গ্লানিকর ব্যবহার দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

আধুনিক পুরুষ এবং সধবা সম্প্রদায়ের প্রাগুক্তরূপ ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল থাকায় সরলা বিধবা রমণীগণের স্ব স্ব জীবনের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা ও বিরক্তি এবং কদাচিৎ কোথাও বা সধবার আচরণে গোপন প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। তা' ছাড়া যতিধৰ্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তদ্দারা যে স্বীয় স্বামী এমন কি ভগবানকে পৰ্য্যন্ত লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা না বুঝিয়া নিতান্ত নিরুৎসাহ-পূর্ণ চিত্তে স্বীয়কর্ত্তব্যে অনাস্থা উপস্থিত হওয়া বড়ই দুঃখের কথা। এই কারণে বৈধব্য ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দুশাস্ত্রের সহমরণের সুব্যবস্থা থাকিলেও সংসারের সর্ব্ব ধৰ্ম্ম রক্ষার জন্য, ধৰ্ম্মের আদর্শ

সমুজ্জ্বল রাখিবার জন্য, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চতর আসন প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যকেই যতিধর্ম্ম বলে। এই ধর্ম্মে স্মরণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুনাভাব ব্রত স্থির রাখিবার নিমিত্ত এবং স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবার জন্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল আচার ব্যবহার, ব্রত উপবাসাদি করিবার বিধি হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা শাস্ত্রের সদুদ্দেশ্য সুন্দররূপেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সহমৃতা রমণীর অপেক্ষা প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর আসন উচ্চতর, যেহেতু সহমৃতার ধর্ম্ম সকাম আর ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্ম নিষ্কাম। স্বামীবিয়োগে মরণোন্মুখা সতীর দেহ ও মনের যে অবস্থা ঘটিবার কথা, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর মনেরও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার এতদূর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা যে, সন্তান সন্ততি ও গুরুজনের মুখ চাহিয়া তাহাদের কষ্ট এবং সাংসারিক বিশৃঙ্খলতার চিন্তায় পাষাণে বুক বাঁধিয়াও তাহাদের উপকারে বিধবাগণ জীবনোৎসর্গ করেন।

হিন্দু বিধবার স্বামী বিয়োগ জনিত শোক যাহা সাগর অপেক্ষা গভীর এবং হিমাদ্রি অপেক্ষা গুরুতর এবং গগনাপেক্ষা বিস্তৃত—তাহাই উপশমের কৌশল স্বরূপে হিন্দু সমাজ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা বিশেষরূপে জড়িত। এবং তাহারই ফলে পরিবারবর্গের রোগপরিচর্য্যায় তাঁহাদিগের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ, দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম, সকলই সম্ভবপর হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়া ও নিষ্কামী হিন্দু বিধবা ভিন্ন সধবা রমণী বা পুরুষের শক্তি, অধ্যবসায় এবং উৎসাহ সমান ভাবে জন্মিতে পারে না? ফল কথা ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ বিধবাদিগের ধর্ম্ম পালনে যে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই চমৎকার। ইহা সমাজের কল্যাণকর এবং সহমরণাপেক্ষা অধিকতর উপকারী।

মানব সহস্র সহস্র জন্ম সাধনা করিয়া নিষ্কামধর্ম্ম লাভ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। সনাতন বৈধব্য ধর্ম্ম নিবৃত্তিমূলক, ইহা প্রবৃত্তিমূলক নহে এই ধর্ম্ম পালনে যথার্থ স্বর্গীয় সুখ শান্তি ও সুন্দর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয় এই ধর্ম্ম পালনে যে তৃপ্তি, তাহা আনন্দ বা ভোগ বিলাসের জন্য নহে, সংযমের জন্য। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই নিবৃত্তি মার্গ বা সংযমের পথ কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির হেতুভূত। আগে হিন্দুসমাজে প্রথম শিক্ষারম্ভ ভিত্তি হইতেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন দ্বারা মনুষ্যত্বের সংস্থাপন করা হইত, তপস্যা ও যোগাভ্যাস প্রভৃতি মানব জন্মের প্রকৃত কর্ম্ম সকল স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ব্যবস্থা ছিল। সংযম, কঠোরতার সহিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ব্যবস্থা, উহা সধবা, বিধবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজবন্ধনকে ছিন্ন করিতে প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহাদের বোঝা উচিত যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র স্বাস্থ্য লইয়াই লিখিত। এ ধর্ম্মের অপলাপ করা—অনভিজ্ঞতা ও বিবেক-বিহীনতার পূর্ণপরিচয় প্রদান মাত্র।

যুগধর্ম্মে, বিজাতীর অনুকরণ প্রভাবে হিন্দু সমাজে বিলাস বাসনা ও ভোগ কামনা-রাহুর-করাল গ্রাসে নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যময় বৈধব্য ধর্ম্ম রূপ চন্দ্রামগ্রস্ত হওয়াতেই হিন্দু জ্যোতিঃ লালসার আঁধারে ডুবিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফলে আজ দেশব্যাপী অশেষ

প্রকার দুরারোগ্য রোগ, শোক, তাপ, জ্বালায় হিন্দু জীবন অশান্তিময়, দেহ রোগের আধার, পরমায়ু ক্ষয় এবং অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। কি যে বিষম দুর্ব্বুদ্ধি ও কি মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতায় হিন্দু সমাজ আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিভ্রান্ত হইতে হয়। দগ্ধোন্মুখ গৃহে সুশীতল জল সেচনের পরিবর্ত্তে কুম্ভপূর্ণ ঘৃত ঢালিবার ব্যবস্থা চলিতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দুজাতি প্রায় সহস্র বৎসরের কুসংসর্গে অনেকেই পশুবৎ ইন্দ্রিয় পরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল এবং—অধঃপতিত। কাজেই ব্রহ্মচর্য্যের সম্মান বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছে। সেই ভীষণ পাপের ফলেই দেশব্যাপী রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু ও দুঃখ দৈন্য প্রভৃতি নানাবিধ সহনীয় ক্লেশের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব।

যে দেশে একদিন শিবাণী, সাবিত্রী, সীতা এবং দময়ন্তী প্রভৃতি বহু সতী, আর লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন এবং জরৎকারু প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, আজকাল সেই দেশের ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় মাসিক পত্রিকায় আলোচনা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হয়—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে?

বর্ত্তমান কালের পুরুষোচিত স্ত্রী শিক্ষায় স্বর্গীয় ভাব বিনাশ করিতেছে। পুরুষ বর্গের কুশিক্ষার ফলে রমণীগণের আত্ম সুখাকাঙ্ক্ষাজনিত স্বার্থপরতায় বাঙ্গালী সমাজকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। নাটক নভেলের পোকা এবং বিলাস ভোগের কৃমি হইয়া আধুনিক অধিকাংশ রমণীগণ সন্তানপালন বা স্বামীসেবা কিম্বা রোগী পরিচর্য্যা, অতিথি সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অবসর পান না। প্রাচীন কালে গৃহিণীগণ—রোগ প্রতিকার বিষয়ে কত সহজ ও সুন্দর মুষ্টিযোগ বা অন্যান্য উপায় পরিজ্ঞাত ছিলেন, কত দ্রব্যগুণ জানিতেন যাহাতে গৃহাঙ্গনস্থিত গুল্মলতা দ্বারায়ই ডাক্তার খরচা বাঁচিয়া যাইত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে রমণীগণ—নাটক, নভেল, ইতিহাস, ভূগোল পড়া, আর দেশ বিদেশে প্রত্যহ পত্র লিখিয়া পোষ্টাফিস খরচার দায়ে কর্ত্তাকে বিপন্ন করিতে অভ্যস্ত! তাহাতে না হয় ইহকালের কাজ, না হয় পরকালের কাজ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি—কোন বাড়ীতে কোন বৃহৎ ব্যাপার হইলেও গ্রাম্য স্ত্রীলোকেই রন্ধনপরিবেশনাদি সম্পন্ন করিতেন, গৃহে ত কথাই নাই। এখন স্ত্রীলোকের রন্ধন অভ্যাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত কুলশীল অপবিত্র মলিন পাচক এখন পাকের ও পরিবেশনের কর্ত্তা। সেই কদর্য্য অন্নগ্রহণে দেহ ক্ষীণ ও রুগ্ন এবং স্ফূর্ত্তিহীন হইতেছে। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার এমনি কুফল প্রসব করিয়াছে। আর গৃহে গৃহে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা এককালেই নাই। সে সব স্থান এখন ইংরাজী ছাঁচেঢালা নাটক-নভেল অধিকার করিয়াছে।

তাই বলি হে হিন্দু সন্তানগণ! এখনও যদি অশেষ অকল্যাণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ স্বাস্থ্য ও সুখসম্পন্ন হইতে চাও, নিজে বাঁচিতে ও দেশকে বাঁচাইতে চাও, তবে আবার সেই সনাতন পথে প্রত্যাবর্ত্তন কর! কুপথের অনেক দূর চলিয়া গিয়াছ, এখনও স্ব স্ব পুত্র কন্যাগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী—সতী। রমণীদিগকে আবার সেই সতী ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান কর। দেবার্চ্চনা, গুরুজন সেবা, রোগী শুশ্রূষা, দীনে

দয়া, অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্র হীনকে বস্ত্র দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হও। বৈধব্য ধর্ম্মচারিণীর ন্যায় আদর্শ শিক্ষয়িত্রী জগতে আর কোন স্থানেই মিলিবে না। অপবিত্র মনকে পবিত্র করিবার, চিত্তশুদ্ধি করিবার অব্যর্থ মহৌষধ যে ব্রহ্মচর্য্য পালন—ইহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া দাও। পুরুষকার, তেজ, বীর্য্য ও লাবণ্য—ব্রহ্মচর্য্য হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ বংশধর না জন্মিলে হিন্দুস্থানের কল্যাণ সাধন সংঘটিত হইতে পারিবে না। যদি মঙ্গল কামনা কর, তবে এখনো পথে এস।

শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার।

সেকাল ও একাল।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় কিছুতেই আমাকে ছাড়িতেছেন না। আমি তাঁহাকে শতবার নিবেদন করিয়াছি যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ; সাধারণ জ্ঞানও আমার নিতান্তই তুচ্ছ—যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন যদি কিছু বলিতে হয়, তাহা হয় পুনরাবৃত্তি, না হয় কথিত বিষয়ের উদাহরণ। সাধারণতঃ মানুষ দুই একটী কথাই বলিতে আসে—সেই দুই একটী কথাকে বেষ্টন করিয়াই তাহার মৌলিকতা লতাইয়া উঠে। তা'রপরও যদি সে কিছু বলে—তবে তাহা ঐ মৌলিকতাকে পরিপোষণ করিবার জন্য নিদর্শন প্রদান মাত্র। কিন্তু কবিরঞ্জন মহাশয় তথাপি আমাকে দিয়া পত্রিকার পত্রাঙ্ক পূরণ করিতে চাহেন। তিনি নিজে বিজ্ঞ,—অভিজ্ঞ সম্পাদক, কিন্তু অজ্ঞের দুঃখ বোঝেন না।

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?

তাঁহার মত মহীয়ানের এ আগ্রহে আমার মনে একটু আনন্দ সঞ্চার হয়। আমার মনে হয়—আমার জ্ঞান যতই তুচ্ছ হউক,—বলিবার শক্তি যতই কম হউক,—আমার বক্তব্য, আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ। এ মহত্বের গৌরব আমার নহে,—এ গৌরব তাঁ'র,—যিনি আমার মধ্য দিয়া তাঁহার অভাব অভিযোগ ভারতবাসীকে পাঠাইতেছেন—এ গৌরব সেই ভারতমাতার। ভারতমাতা তাঁহার সন্তান মণ্ডলীকে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—"দেখরে দীন, দেখরে পতিত, দেখরে শীর্ণম্লান; দেখ তোর উৎপত্তি, তোর অতীত—কত সমুজ্জল। এ অতীতকে পুনরুদ্দ্যাপিতকর। তোর দৈন্য, আমার দুঃখ—ভয়ে পলায়ন করিবে। ওরে আমার আদর্শ আমার যত হিতকর, পরের আদর্শ কি তার শতাংশের একাংশও হইতে পারে? আমার অতীত ত হীন ছিল না? তবে কেন আধুনিকতা তাহাকে মুছিয়া ফেলিতে চায়? ভস্মাচ্ছন্ন রাখে?" মূর্খই নূতন তুচ্ছকে মাথায় তুলিয়া লইয়া পুরাতন সনাতনকে ভুলিয়া যায়। নূতন চিরকালই

প্রখর, চঞ্চল ও সম্মুখবর্ত্তী। অজ্ঞমানব স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, কাজেই সে এই চঞ্চলতা—এই প্রখরতাকেই আশ্রয় করে, এই সম্মুখবর্ত্তীকেই বরণ করে। কিন্তু জ্ঞানী—পুরাতনকেই ভালবাসে, কারণ পুরাতন প্রায়শঃই সাম্য, গম্ভীর ও পরীক্ষিত বলিয়া বিশুদ্ধ,—অসত্যের চাঞ্চল্য তা'তে নাই, সত্যের স্থিরতা ও বিনয় তাহাকে মৌন করিয়া পশ্চাদনুবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছে। সময়ে সময়ে পুরাতনকে পরিবর্ত্তন করিতে হইতে পারে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তন বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ হওয়া বিধেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনুকরণ ও চাঞ্চল্যের যুগে ভাবিবার অবসর নাই,—শুদ্ধ চলিবার, ধাইবার—মাতিবার উৎসাহ আছে।

বলবীর্য্যের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ আজি যে রুগ্ন, শীর্ণ, খর্ব্ব—তাহার মধ্যেও এই আধুনিকতা, এই অনুকরণের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি। জীবন-যাপন একটা মহাসংগ্রাম। এখানে বলীয়ানের জয়, মৌলিকতা ও প্রতিভার স্বায়ত্ত শাসন। দুঃখিত, ম্লান অশক্তের এখানে স্থান নাই। মৌলিকতা এখানে রাজত্ব করে, অনুকরণ ভিক্ষা করিয়া মরে। এ জগতে চিরকালই দানের সম্মান, গ্রহণের নহে। এক সময়ে ভারতমাতা সমস্ত পৃথিবীকে তাঁ'র জ্ঞানস্তন্য দান করিয়াছিলেন; তাই সে সময়ে সম্মানে তিনি জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর তিনি কিছু দিতে পারেন না;—গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত; তাই তিনি আজ আহত, দলিত। আজও যদি কেহ এনিবেসান্তের মত ভারতভূমিকে পূজা করেন, তবে তাঁহার অশেষ মাতৃভক্তি বলিতে হইবে। স্তন্যত্যাগের পরও যা'র মাতৃভক্তি অটুট থাকে, তিনি নিশ্চয়ই পশ্বাদি ইতর প্রাণী-সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহেন, তিনি অতিমানুষ।

আমাদের অতীতের জন্য এ ক্রন্দন কত যথার্থ তাহা একদিন আমাদের কি ছিল—আর আজ আমাদের কি নাই—ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারি। মাননীয় সম্পাদকের একান্ত ইচ্ছায় আজ আমি এই চিত্রটিই অঙ্কিত করিব। বাস্তবিক চিত্রের শক্তি অশেষ। এ কিছু বলে না, অথচ সুষ্ঠুরূপে সবটা বুঝাইয়া দেয়। শ্রেষ্ঠ কবিতার মত এ একেবারেই গিয়া মর্ম্মে আঘাত করিয়া, আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে বহির্ম্মুখী করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে চায়। উপদেশ অপেক্ষা যে উদাহরণ শ্রেয়ঃ—চিত্রই তাহার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমাদের সেকালে একটু মোটা, সোজা অথচ স্থায়ী জিনিসের বেশী আদর ছিল, কিন্তু একালে আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি—উজ্জ্বল অথচ ক্ষণভঙ্গুরকে,—মিহি অথচ অস্থায়ীকে। এই চাকচিক্যের প্রতি সম্মান আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আগে এককালীন কিছু বেশী ব্যয়ে অনেক দিনের সুযোগ হইত, এখন বহুবারের স্বল্পব্যয়ে নিত্য নূতন জিনিসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আগে সোনা-রূপা-পিত্তলকাঁসার জিনিসের দাম অবশ্য কিছু বেশী ছিল, কিন্তু এগুলি স্থায়ী হইত—অনেকদিন। আজকালের কাঁচের বাসন, ঝিনুকের বোতাম কম দামে পাওয়া যায়, কিন্তু নষ্ট হয় খুব সহজে। কাজেই মাসে মাসেই নূতনের ব্যবস্থা করিতে হয়। মূলতঃ ব্যয়টা অস্থায়ী সামগ্রীতেই বেশী লাগে। খাদ্য জগতেও ঐ কথা খাটে। আগে খাইতাম—মূল্যবান ও পুষ্টিকর ঘৃত, দুগ্ধ, চর্ব্ব্য, চোষ্য,

লেহ্য, পেয়, এখন খাই দুই পয়সার গরম চা, এক পয়সার আঠার'ভাজা। ফলে যত রকম বাজে ও নকল মাল, যত রকম জাল জুয়াচুরি ও শঠতার আবির্ভাব হইয়াছে। বিদেশী—আমাদের উপর আমাদের এই আপাতমনোরমের প্রতি অনুরক্তির সুবিধা লইতেছে; কৃত্রিম ঘৃত, কুক্কুর, গাধা, শূকরের দুগ্ধ, গিল্‌টী করা চক্‌চকে গহনা, হাওয়ায় ছিঁড়ে—এমন ফুর্‌ফুরে পোষাক অল্পদামে সরবরাহ করিয়া আমাদিগকে রুগ্ন ও দুস্থ ও নিজেদিগকে ধন্য ও ধনী করিতেছে। বরিশালের গীতি কবি মুকুন্দ দাসের গান সার্থক :—

'খেতে ভাত সোনার থালে,
now satisfied steelএর থালে,
তোমার মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে ?'

আমাদের আদি মোটা ও স্থায়ী জিনিস অনাদরের তাপে শুকাইয়া গিয়াছে। তাই এই মহাসমরের দুর্ম্মূল্যের দিনে আমরা অনেকে যখন আমাদের সেই নিজস্বকে খুঁজিয়াছিলাম—তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তা'র জীর্ণ কঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই পাই নাই। বাণিজ্যের এই হানি আমাদের অর্থ কমাইয়া দিয়াছে। বিদেশীয় চাকচিক্যের প্রতি এই সমাদর, এই কামনা আমাদের ঐ ক্ষয়িত অর্থ বিদেশে পাঠাইতেছে। এই অশুদ্ধ ও অসারে তৃপ্তি আমাদিগকে বাবু সাজাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের বস্তু আর কিছুই রাখিতেছ না। কাজেই আমরা ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল ও নানারোগের আকর হইয়া পড়িয়াছি।

মঙ্গল চাহিতে হইলে আমাদের এই স্বকীয় বাণিজ্যকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে, নিজ বিশুদ্ধ খাদ্যের আবার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ঘরের জিনিস ঘরে পাইয়া স্বাধীনতার একটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভারতবাসীর মানসিক দৈন্য নিরাকৃত হইয়া যাইবে। পবিত্র আহার বিহারে শারীরিক স্বাস্থ্য আবার ফুটিয়া উঠিবে। আর চিরকালই বা আমাদের মোটা জিনিসে তৃপ্ত থাকিতে হইবে কেন? সর্ব্ববিষয়েই জগতে ক্রমোন্নতি ত আছেই। চেষ্টার ফলে আমাদের ঘরেই সুন্দর অথচ বিশুদ্ধ, চিক্কণ অথচ স্থায়ী, পুষ্টিকর অথচ সুখাদ্য জিনিস আমরা পাইতে পারিব। এ গেল সাধারণ জীবনের কথা।

এই অনুকরণ-প্রবৃত্তির ফলে আমাদের নৈতিক আদর্শও যথেষ্ট বদলাইয়া গিয়াছে। অনুকরণের একটা বিষম দোষ এই যে, এ নিজেকেও নষ্ট করে, পরকেও খর্ব্ব করে। এ আপন গৌরবকে তহারাইয়া ফেলেই, পরন্তু যে আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হয়—তাহাকেও 'খাস্ত' করিয়া ঘরে আনে। আমাদের নৈতিক আদর্শেও আমরা বিলাতি নীতিকে প্রবর্ত্তিত করিতে চাই, কিন্তু যাহার প্রবর্ত্তন করি—তাহা কিছুই নহে—বিলাতিও নয়, স্বদেশীও নয়। পূর্ব্বপুরুষ ভিক্ষুকমাত্রকে ভিক্ষা দিতেন। বিলাতি আদর্শ ডাকিয়া করিল—"সমর্থকে ভিক্ষা দিবে না; কারণ উহা indiscriminate charity" ফলে আমরা একেবারেই ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। বাড়ীর দুয়ারে যোগ্য বা অযোগ্য—যে কোন প্রকারের প্রার্থী আসিলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া, আমরা যেন পরম নৈতিক আনন্দ উপভোগ করি। কাজেই কত প্রকৃত গরীব অর্থাভাবে অনশনে মরিতেছে, কত দুস্থ-রুগ্ন রোগে ঔষধ পাইতেছে না। আবার আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা টাকার যে কোন খেলাকে দ্যূতক্রীড়া বলিয়া

ঘৃণা করিতেন। আমরা পাশ্চাত্য horserace, lottery প্রভৃতিতে টীকেট কিনিয়া বড় সুখী হই। এদিকে প্রতিবাসী দুঃখী অনাহারে শুকাইয়া মরে, ওদিকে আমাদেরই অর্থে এক ধনকুবেরের অর্থাধার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্যেরা দুইই বজায় রাখে; horserace এর যেমন টিকেট কিনে; orphanage এও তেমনই সাহায্য করে। আমরা অনুকরণ করিতে যাইয়া কোন দিকই বজায় রাখিতে পারি না। তাই আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, —যা'র আদর্শ তা'র ভাল—কেননা তা'র সমাজে, তার দেশে ঐ আদর্শ বেশ খাপ খায়; কিন্তু বিভিন্ন সমাজে, সে আদর্শ সর্ব্বনাশের সূচনা করে।

এবার ধর্ম্মজীবনের কথা বলিয়া আজিকার মত বিদায় লইব। এখানেও অনুকরণের আব্‌হাওয়া বহিয়া সব পর্য্যুসিত করিয়া দিয়াছে। অধুনা এমন অনেক ভারতবাসী আছে—যাহারা চার্চ্চেও যায় না, কৃষ্ণ আল্লাও ভজে না। তাহাদের পক্ষে ধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত। ধর্ম্মজ্ঞান যাহাদের নাই—তাহারা না করিতে পারে—এমন কাজই নাই। এরা না মানে—জড়বাদীর মত ভৌতিক বা প্রাকৃতিক শাসন, না মানে ধর্ম্মের শাসন। যথা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও প্রাতরুত্থান করে না, বা সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্যও না। সুতরাং প্রাতরুত্থানের মঙ্গল তাহারা উপভোগ করিতে পারে না। খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও তাহাদের সহানুভূতি সার্ব্বজনীন। তাহারা দুনিয়ার সব খায়। সর্ব্বজাতির আদর্শ হইতে তাহারা আহারীয় সংগ্রহ করে। মুসলমান কুক্কুট খায়, কিন্তু শূকর বর্জ্জন করে। আবার সম্প্রদায় বিশেষ শূকর ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত রহে। তাহারা কিন্তু কুক্কুটও খায়, শূকরকেও অব্যাহতি দেয় না। দেশভেদে যে খাদ্যাখাদ্যের ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হওয়া উচিত; এটা তাহারা বোঝেনা ও মানেনা। কিন্তু ফল যা' দাঁড়ায়—তা' নিতান্ত শুভকর নহে। মানুষ দোষ ক্ষমা করিতে জানে, কিন্তু প্রকৃতি কাহাকেও ক্ষমা করে না। নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ভিক্ষুক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজাকে পর্য্যন্ত ব্যাধিভোগ করিতে হয়।

শেষকথা, একদিন যে আদর্শকে পোষণ করিয়া ভারতবাসী বরেণ্য হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে—সেই আদর্শই ভারতের পক্ষে হিতকর। সেই আদর্শকেই সর্ব্বান্তঃকরণে পুষ্ট করা আমাদের কর্ত্তব্য। অন্যে দেশকাল পাত্রভেদে যে ভিন্ন আদর্শকে বরণ করিয়া উন্নত হইয়াছে, তাহার অনুকরণ করিয়া আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই – কারণ তাহা আমাদের নিজস্ব নহে। নিজস্বকে বড় করিবার জন্যই মানুষ জন্মে—এ সর্ব্বধর্ম্মের কথা। অতএব সকলের নিজস্বকেই আশ্রয় করা উচিত। ইহা স্বার্থ নহে; পরন্তু ইহাই পরার্থপরতার নিদান। উপলখণ্ড যেমন আগে নিজের শরীরেই বালুকা জড়াইতে জড়াইতে শেষে এক বিরাট চড়ার সৃষ্টি করে, মানুষও সেইরূপ নিজস্বকে বড় করিতে করিতে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে। self realisation সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্ম। charity begins at home—বিশ্বপ্রেমের জন্ম—গৃহকোণেই হইয়া থাকে।

নিজস্বকে বড় করিতে থাকিলে আমরা দেখিব—আর আমরা দলিত রুগ্ন নহি, স্বাস্থ্য-গৌরবে, আয়ুর প্রসারে আয়ুর্ব্বেদের মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া জগতে আবার এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

চরকোক্ত পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

—:০:—

দুর্ব্বল, শোধিত কিংবা অঙ্গদোষ যা'র।
মৃদু ঔষধ দিবে কোষ্ঠ অজ্ঞাত যাহার ॥
অল্পৌষধ বারে বারে পীড়াকর নয়।
অতি তীক্ষ্ণ প্রয়োগিলে জীবন সংশয় ॥
দুর্ব্বলীর বহু দোষে দিলে বিরেচন।
অল্প অল্প বহুবারে করিবে অর্পণ ॥
ঔষধ মৃদুতা হেতু দোষ বিনিঃসৃত।
না হইলে প্রাণহানি হইবে নিশ্চিত ॥
উর্দ্ধে কফাবৃত হ'য়ে অধোগামী হলে।
লঙ্ঘন করিবে, তাহা নাশিয়া কবলে ॥
পূর্ব্বাপেক্ষা কফ ক্ষীণ হইলে তৎপরে।
বমন প্রয়োগ পুনঃ বৈদ্যগণ করে ॥
বহু দোষ অল্পে অল্পে বিলম্বে স্রাবিত।
হ'লে বিরেচনে, উষ্ণ জল পানে হিত ॥
তাহাতে আধ্মান, তৃষ্ণা, বিবদ্ধ অপর।
বমি বিদূরিত হ'বে জানিবে সত্বর ॥
শোধন ঔষধ যদি দোষে রুদ্ধ রয়।
উর্দ্ধ কিবা অধোদিকে নিঃসৃত না হয়,
উদ্গার বা অঙ্গশূল হয় যদি তায়।
স্বেদ প্রয়োগের বিধি জানিও তথায় ॥
ঔষধের সঙ্গে যদি উদ্গার সহিত।
বাহিরায় বিরেচন হ'লেও বিহিত ॥
তবে সে ঔষধ বমি করিয়া ফেলিবে।
নহে অতি বিরেচন তাহাতে হইবে ॥
অতিশয় বিরেচন তাতে যদি হয়।
শীতল প্রক্রিয়া করি নিবে শুভ চয় ॥
কখন ঔষধ বক্ষে কফে রুদ্ধ করে।
কফ ক্ষীণ হ'লে রাত্রে সন্ধ্যায় বা পরে ॥
রুক্ষ অনাহারে জীর্ণ, ঔষধ হইলে।
অজীর্ণে বিষ্টম্ভ্য বাতে উর্দ্ধগত হলে ॥

পুনর্ব্বার সে ঔষধ স্নেহ ও লবণ।
সংযোগে প্রয়োগ করে শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ ॥
তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা জীর্ণৌষধে হয়।
পিত্তঘ্ন, শীতল স্বাদে ঔষধ দিতে হয় ॥
সে সব ঔষধ যদি কফাবৃত রয়।
বিষ্টম্ভ, লালাহৃল্লাস লোমহর্ষ হয় ॥
তাহাতে তীক্ষ্ণোষ্ণ কটু কফ বিনাশক।
ঔষধ প্রয়োগ পুনঃ করিবে ভিষক ॥
সুস্নিগ্ধ ও ক্রূর কোষ্ঠে লঙ্ঘনাদি দিবে।
স্নেহ জাত শ্লেষ্মা, তার বিবদ্ধ নাশিবে ॥
রুক্ষ, বহু কফ, ক্রূর কোষ্ঠ দীপ্তানল।
বিরেচন জীর্ণ করে ব্যায়ামী সকল ॥
বস্তি দিয়া পরে এতে দিলে বিরেচন।
দোষ হরি শীঘ্র তাহা হয় নিঃসরণ ॥
রুক্ষ ভোজী পরিশ্রমী দীপ্তাগ্নির দোষ।
পরিশ্রম বাতাতপ অনলে নির্দ্দোষ ॥
বিরুদ্ধ অজীর্ণাহার অধ্যশন কৃত।
পীড়া হলে ঐ উপায়ে হয় প্রশমিত ॥
উহাদের স্নেহ বিধি বায়ু রক্ষা তরে।
বিরেচন নাহি দিবে বিনা রোগান্তরে ॥
অতি স্নিগ্ধে নাহি দিবে স্নেহ বিরেচন ॥
স্নেহোৎক্লিষ্ট দেহে দিবে রুক্ষ বিরেচন ॥
ইহা জ্ঞাত হ'য়ে জ্ঞানী দেশ কাল আর।
পরিমাণ অনুসারে করিয়া বিচার ॥
বিরেচন যোগ্য জনে দিলে বিরেচন।
অপরাধী নাহি হয় সে জন কখন ॥
সু প্রয়োগে সুধাসম ভ্রমে বিষবৎ।
কালে যত্ন করি পান করিবে তাবৎ।
মৃদুকোষ্ঠে তিন দিন সপ্তাহ অন্তর।
স্নেহপান করি স্নিগ্ধ হইবেক পর।

সপ্তাহের পরে তারে স্বেদ দিতে হয়।
স্নেহসাধ্য সপ্তাহান্তে হইবে নিশ্চয় ॥
স্নেহ বায়ুনাশ আর দেহ মৃদু করে।
মলের বিবন্ধ নাশ হয় তার পরে ॥
স্নেহ প্রয়োগের পরে স্বেদ দিলে তায়।
সূক্ষ্ম স্রোতে লীন দোষ দ্রব হয়ে যায় ॥

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠা।

(চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ)

—:*:—

অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়ার মত ওলাউঠা রোগও আমাদের দেশে নূতন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এ রোগ আমাদের দেশে ছিল না, ভারত ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পর ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা আমাদের দেশে নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই দুইটি রোগের কোনো প্রকার চিকিৎসা নাই।

যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের কথা যে ভ্রমপূর্ণ—তাহা আমরা গত বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদে" ম্যালেরিয়া বিষয়িনী কয়েকটি প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছি। ম্যালেরিয়া নাম আমাদের দেশে—নূতন হইলেও উহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিষমজ্বরের অন্তর্গত—এবং সেই জন্য অ্যালোপাথিক চিকিৎসায় কুইনাইনের মাহাত্ম্যে ইহা যাপ্য ভাব অবলম্বন করিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ইহা সম্পূর্ণ আরোগ্যের ক্ষমতা আছে। ম্যালেরিয়ায় যাঁহারা নাটা এবং হরিতাল ঘটিত ঔষধের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের এ কথায় যাথার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা সে সব কথার আলোচনা—গত বৎসর যথেষ্ট করিয়াছি; সময়ান্তরে আরও করিব।

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে—ওলাউঠা বা বিসূচিকা চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদে কিরূপ ফলপ্রদ তাহাই দেখাইব। ওলাউঠার ইংরাজী নাম কলেরা। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে বিসূচিকা বলে। বিসূচিকারই বাঙ্গালা নামকরণ হইয়াছে—ওলাউঠা।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—সাধারণতঃ অজীর্ণ হইতে বিসূচিকার উৎপত্তি এবং এই পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতিকুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অন্যান্য বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া বৈদ্যেরা ইহাকে বিসূচী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যথা—

"সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠ তেহনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈ বিসূচীতি নিগদ্যতে ॥"

যাহারা পরিমিতাহারী—তাহাদিগকে এই রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা। আহার বিষয়ে অমিতাচারী, অজিতেন্দ্রিয় ও যাহারা অশনলোলুপ—তাহারাই এই পীড়ায় সাধারণতঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর

পল্লীগ্রামে যখন ওলাউঠা আরম্ভ হয়—তখন ইতর জাতীয়ের মধ্যেই এই জন্য এই রোগের প্রথম আক্রমণ হইতে দেখা যায় এবং ভয়ে বা অন্য কারণে ক্রমে ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হইলেও সংখ্যায় ইতর জাতীয়গণই অত্যধিক পরিমাণে এই রোগে কালকবলিত হইয়া থাকে।

ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর আধিক্যের একটি বিশেষ কারণ,—সংখ্যায় তাহারাই তো এই রোগে অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়ই, তা' ছাড়া রোগাক্রমণে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সুশ্রূষাও তাহাদিগের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না—কিন্তু যদি সুশ্রূষা এবং উপযুক্ত চিকিৎসায় তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করা যায়—তাহা হইলে এই রোগের মৃত্যুর পরিমাণ বোধ হয় অনেক হ্রাস পাইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের চিকিৎসায় সাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস। আজকাল ইন্‌জেক্‌সনের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেইজন্য অনেকে অ্যালোপাথিক চিকিৎসকেরও শরণাপন্ন হন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ইহার যে সকল উৎকৃষ্ট ঔষধ ও ব্যবস্থা রহিয়াছে, সাধারণতঃ অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, সেইজন্য অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের ভাগ্যেই এ রোগের চিকিৎসা করা—বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

আমি যখন রাণাঘাটে ছিলাম—তখন পল্লীর মধ্যে কয়েকটি রোগীকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছিলাম। সেই বিবরণ গুলি নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত—সকল বিষয়েই নদীয়া জেলার রাণাঘাট প্রধান আসন পাইবার উপযুক্ত। রাণাঘাট-মিউনিসিপ্যালিটি রাণাঘাটবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে আটত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পাকা ড্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ড্রেণ নির্ম্মাণের পর ঐ সকল রোগগুলি রাণাঘাটে যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যাউক সে কথা। সে বৎসর রাণাঘাটে খুবই কলেরার প্রাদুর্ভাব। আমি একদিন দ্বিপ্রহরবেলায় রোগী দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, প্রতিবাসী একজন ভদ্রলোক আমায় ডাকিতে আসিলেন। বলিলেন,—"তাঁহার বাটীতে একজনের কলেরা হইয়াছে, আমাকে যাইতে হইবে।" রাণাঘাটে অ্যালোপাথিক চিকিৎসকের অভাব নাই, হোমিওপ্যাথও ২।৩ জন রহিয়াছেন—সাধারণতঃ কলেরা রোগে রাণাঘাটে হোমিওপ্যাথিরই যথেষ্ট আদর—এ অবস্থায় আমার ডাক পড়িল বলিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। যাহা হউক বলিলাম—"আপনি অগ্রগামী হউন, আমি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া যাইতেছি।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমিও অতিশীঘ্র স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

রোগী—স্ত্রীলোক—যুবতী। প্রাতঃকাল হইতে রোগ—প্রকাশ পাইয়াছে, একটু ভাল করিয়া জানিলাম—ভোর রাত্রিতে নহে—প্রাতঃকালেই রোগের সূচনা। ভোর রাত্রের কথাটা ভাল করিয়া জানিবার কারণ,—আমার মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসকের বিশ্বাস—ভোর রাত্রিতে কলেরা আরম্ভ হইলে স্বয়ং মহাদেবও তাহাকে ফিরাইতে পারেননা।

যাহা হউক, গিয়া দেখিলাম—রোগিণীর

দাস্ত প্রাতঃকাল হইতে ১৫ বার হইয়াছে, দাস্ত পাতলা—আঁসধোয়া জলের মত। বমিও কয়েকবার হইয়াছে। পিপাসা যথেষ্ট, তলপেটে শূলবদ্ বেদনা, হাতে পায়ে খালি ধরা, গাত্রদাহ, মধ্যে মধ্যে কম্প, বক্ষোবেদনা—কোনো উপদ্রবেরই বড় একটা বাকী নাই। তবে মূর্চ্ছা বা ভ্রমের চিহ্ন দেখিলাম না।

আয়ুর্ব্বেদে বিসূচিকা রোগের নিদানে উল্লিখিত হইয়াছে—

"মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা
শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভদাহা।
বৈবর্ণ কম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥"

এ লক্ষণ গুলির সহিত মিলাইলে রোগিণীর প্রায় সকল লক্ষণগুলিই যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর কাহাকেও ডাকা হইয়াছিল।"

শুনিলাম—না, রোগিণীর অম্লের পীড়া আছে, মধ্যে মধ্যে দমকা দাস্ত হয়—সেইজন্য প্রথমতঃ অল্প বলিয়াই উপেক্ষা করা হইয়াছিল।

রোগিণীর অম্লের পীড়া ছিল শুনিয়া আমার কিন্তু ইঁহার রোগনির্ণয়ের একটু সুবিধা হইল। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যদিও ইহাকে কলেরা ভিন্ন এখন অন্য কিছুই বলা যায় না, কিন্তু ইহার মূলকারণ বুঝিলাম অম্ল। সেই জন্য তাঁহাকে বিসূচিকা অধিকারের কোনো ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া গ্রহণী অধিকারোক্ত "চিত্রকাদিগুড়ি"র ১বটি শুদ্ধ শীতল জল সহ প্রয়োগ করিলাম। এই ঔষধটি গ্রহণী অধিকারোক্ত হইলেও আমি অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ অবস্থায় খুব বেশী ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সকল স্থলেই বিশেষ ফল পাই। কলেরার পূর্ণ প্রকট অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবার কারণ,—এই কলেরাক্রান্তা রোগিণীর অম্লপিত্ত ছিল এ পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি—সুতরাং বর্ত্তমানে ইহা কলেরা হইলেও ইহার মূল কারণ অম্লপিত্ত। সেইজন্য

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত তদনন্তর মৌষধম"

—এই ঋষিবাক্য যদি মানিতে হয় তাহা হইলে আমি যে ঔষধ ব্যবহারে অম্লপিত্তে যথেষ্ট ফল পাইয়া থাকি—সেই অম্লপিত্তই যদি ইহার মূল রোগ হয়, তাহা হইলে বিসূচিকা অধিকারের অহিফেন ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার না হইয়া বরং উগ্রবীর্য্য ঔষধে কুফলই ফলিবে, এ ঔষধ স্নিগ্ধবীর্য্য, পাচক ও আমদোষনাশক, সুতরাং ইহাতেই ফল হইবে।

যাহা হউক ঔষধের ১ মাত্রা প্রয়োগেই ঔষধের গুণ প্রকাশ পাইল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আর কোনো ঔষধ দিলামনা, কিন্তু এই এক ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর দাস্ত আর আঁসধোয়া জলের মত হইল না, ১ বার মাত্র দাস্ত হইল—কিন্তু তাহাতে মলের সঞ্চার হইয়াছে দেখা গেল। বমিও আর হইলনা, কিন্তু বমনোদ্বেগ রহিল, তাহা নিবারণের জন্য বড় এলাইচভিজানজল—পিপাসার সময় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, এক ঘণ্টার মধ্যে বমনোদ্বেগ কমিলনা দেখিয়া—ধনে, মৌরি ও কর্পূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জল দিবার ব্যবস্থা করিলাম।

এক ঘণ্টা পরে এক মাত্রা বজ্রক্ষারের ব্যবস্থা করিলাম। আর ১ বার দাস্ত হইল, তাহাতেও সামান্য মল বুঝা গেল। আর একটি চিত্রকাদি গুড়ি এই সময় ব্যবস্থা করিলাম। ইহা ভিন্ন নাভির চতুর্দ্দিকে 'বায়ফল'

বাটিয়া প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। ফলে দাস্ত ও বমন বা বমনেচ্ছা দুই-ই বন্ধ হইল। আমি ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলাম।

ঐ রোগীকে আর বড় বেশী ঔষধ দিতে হয় নাই,—ঐ চিত্রকাদিগুড়ি এবং এক আধ মাত্রা বজ্রক্ষারেরই ব্যবস্থায় ৩ দিন রাখিয়া ছিলাম—তাহাতেই রোগিণী নিরাময় হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ২ দিনের পর রোগিণীর আর যখন কোনো উপসর্গ থাকিল না, তখন পথ্য দিলাম—জলবার্লি এবং চারি দিনের পর পথ্য দিলাম—গন্ধ ভাদুল্যার ঝোল ও ভাত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

আবার।

—:*:—

(১)

কোকিল-কূজিত কুঞ্জে আবার
ফুটেছে সুষমা রাশি;
নবীন পুলক পরশি' মলয়
ফুটায় ফুলের হাসি।
নব চেতনার স্পন্দন ভরা
বিশ্বের চারি ধার;
নবীন আলোকে ভূলোক দ্যুলোক
পুলকেতে একাকার।
চৌদিকে নব জাগরণে জাগে,
স্বাস্থ্যের নব বল;
সৌম্য শান্ত শোভা-সজ্জিত
বঙ্গের সমতল।

(২)

স্মরণ অতীত যুগের এমনি
প্রভাতী আলোকে জাগি';
ভারতের ঋষি প্রচারিলা জ্ঞান—
বিশ্ব হিতের লাগি'।
ত্রিতাপ-তপ্ত মানবের তরে
জ্ঞানের ত্রিধারা ঢালি';
দাঁড়াইলা আসি ব্রাহ্মণ ল'য়ে,
বিজ্ঞান বেদ-ডালি।
অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিলা
বিশ্বের যত জন,
সম্ভ্রমে নত মস্তকে সবে
বন্দিলা সে চরণ।

(৩)

বিশ্বের গুরু নিঃস্ব হইয়া
শিষ্যকে দিলা দান;
বরিয়া লইলা দৈন্য আপনি;
অহো কি মহান প্রাণ!
ত্যাগের মন্ত্রে লইলা দীক্ষা,
বর্জ্জিয়া ভোগ-আশা;
রম্য হর্ম্ম্য তুচ্ছ করিয়া
বনেতে বাঁধিলা বাসা।
বিতরিতে জ্ঞান, গোত্রের মাঝে
যত্নের আয়োজন;
পরিচয়ে হই ধন্য আজিও,
স্মরিয়া সে তপোবন!

(৪)

লুপ্ত হ'য়েছে ত্যাগের মন্ত্র,
ভোগে ভরা ধরাধাম ;
সুপ্ত কর্ম্মী, গুপ্ত পন্থা,
স্মৃতি মাঝে শুধু নাম।
আবার এ নব প্রভা-প্রদীপ্ত
প্রভাতী আকাশে আজি ;
ধ্বনিয়া উঠুক সে মহামন্ত্র—
শঙ্খ উঠুক বাজি'।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্মী আবার
আসুক সকলে ফিরে ;
জাগুক আবার ভারত জননী
জ্ঞানের মুকুট শিরে।

(৫)

আবার ভারত-সন্তান সব
এ নব আলোকে জাগি' ;
শিখিতে কর্ম্ম-কৌশল, হও
নূতনের অনুরাগী।
পুরাতন সহ মিলাও নূতন,—
মণি কাঞ্চন যোগ ;
হইবে ধন্য, ঘুচিবে দৈন্য,
দূরে যা'বে রোগ শোক।
আয়ুর্ব্বেদের বিজয় বাদ্য
এ নব প্রভাতে আজি ;
বিশ্বের মাঝে গুরু গম্ভীরে
আবার উঠুক বাজি'।
ব্যাধি মর্দ্দিত শরীরে আবার
করিতে স্বাস্থ্য দান ;
আবার অমৃত কুণ্ডের ধারা,
হউক প্রবহমান্।
আবার বঙ্গ পল্লীর মাঝে,
দীনের কুটির দ্বারে ;
বহন করিয়া স্বাস্থ্য তত্ত্ব,
বিতরণ কর তা'রে।
আবার দীনের পীড়িত অঙ্গে,
বুলাও স্নেহের কর ;
করহ ধন্য জন্ম জীবন,
হে ঋষি বংশধর।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আবগারি আয়।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব সার হেন্‌রি হুইলার বলিয়াছেন, "আবগারি আয় অতিক্রত বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অর্থাগমের প্রধান উপায় ও নির্ভর স্থল হইতেছে। এবার আমাদের আবগারি আয় ৯ লক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া ১ কোটী ৮৪ লক্ষ হইবে। হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণায়, দেশী মদের কাটতি বর্দ্ধিত হওয়ায় আমাদের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।" কিন্তু এই আয় বৃদ্ধিতে দেশ বাসীর যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—ইহাই বিশেষজ্ঞ দিগের চিন্তা করিবার বিষয়। এ দেশের লোকে হাড়ভাঙ্গা খাটিয়াও

উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, কিন্তু মদ্যপানে এত অধিক অর্থ বঙ্গবাসী প্রদান করিতেছে। লজ্জার কথা বটে। ক্লেশ ও দারিদ্র্য এই মদ্য পানের ফল। স্বাস্থ্যহানি তাহারই জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

শিশু মৃত্যু।—কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহার অর্দ্ধেকগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হিসাবে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালায় ৩টি জন্মিলে এক বৎসরের মধ্যে উহার ১টী মরিয়া যাইবে। বিলাতে শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্য প্রত্যেক নগরে শিশু চিকিৎসার স্বতন্ত্র হাসপাতাল আছে ইহা ভিন্ন নানাবিধ উপায়ে সেখানে শিশুমৃত্যু, রোধের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষ কিন্তু এ সম্বন্ধে একেবারেই নিদ্রিত।

যক্ষ্মারোগ।—বাঙ্গালায় যক্ষ্মারোগীর সংখ্যাও দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ—বাঙ্গালার কোনো কোনো স্থানে মৃত ব্যক্তির দশমাংশ ব্যক্তি এই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এক্ষণে খুব সম্ভব ৪ লক্ষ লোক এই ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু বক্তৃতাবীর উদ্যোগী বাঙ্গালীগণ এ সম্বন্ধে প্রতীকারের ভাবনা ভাবিতেছেন কি?

যক্ষ্মার কারণ।—স্বাস্থ্যকমিশনর ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন,—"এ দেশের মিঠাইয়ের দোকানগুলিতে সর্ব্বদাই মাছি ভন্ ভন্ করিয়া থাকে। মাছিগুলি পচা ও দুর্গন্ধময় স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গই রোগবীজাণুপূর্ণ। এই এই সকল মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর রোগের বীজাণু নিক্ষেপ করে। এক বাটী দুধের উপর ইহার একটি মাছি বসিয়াও মিনিটে ঐ দুধের মধ্যে দুই সহস্র রোগ বীজাণু এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বীজাণু নিক্ষেপ করিয়া যায়। মাছির দ্বারা কলেরা টায়ফয়েড প্রভৃতি রোগবীজাণু তো ব্যাপ্ত হয়ই, যক্ষ্মারোগের প্রাবল্যও মাছি দ্বারা হইয়া থাকে। দোকানের খাবারগুলি যাহাতে অনাবৃত না থাকে, তাহার জন্য কর্তৃপক্ষের কঠোর নজর থাকিলেই কিন্তু ইহার প্রতীকার হইতে পারে।

যক্ষ্মায় আমাদের মত।—ডাক্তার বেণ্টলী বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধির জন্য যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহা যে অমূলক তাহা আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু ইহাপেক্ষাও ভীষণ কারণ—বাঙ্গালার দারিদ্র্য। বাঙ্গালী পুষ্টিকর খাদ্য পায়না—অথচ তাহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। বাঙ্গালী যে পরিমাণ উপার্জ্জন করে, বাঙ্গালীর পরিবার বর্গের ব্যয় তাহার দ্বারা সংকুলান হয় না, কাজেই তাহাকে যক্ষা বা ক্ষয়ের প্রধান কারণ দুশ্চিন্তা বিষে অনেক সময়ই জর্জ্জরিত থাকিতে হয়। ইহা ভিন্ন এখনকার দিনে বাঙ্গালী কন্যাদায়ে এতই বিব্রত যে, কিরূপ পাত্রে কত বয়সের পার্থক্য রাখিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করা উচিত—বাঙ্গালীর এখন আর সে চিন্তার অবকাশই নাই—তাহার ফলে বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে এখন অনেকস্থলে অসামঞ্জস্য দোষ ঘটিতেছে। ফলে ব্রহ্মচর্য্য হীন বাঙ্গালীর স্ত্রীপুরুষের মিলনে বয়োবিচারও নাই, বিধি-নিষেধ-নিয়ম-পদ্ধতি—সকলই বঙ্গীয় সমাজ হইতে উঠিয়া গিছে। বাঙ্গালায় যক্ষ্মা বৃদ্ধির ইহা একটি প্রধান কারণ।

ব্যবস্থাপকসভায় পল্লীচিন্তা।—বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর প্রশ্নোত্তরে

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ ওমেলি জানাইয়াছেন,—"পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য গঠনের চেষ্টা করা হইতেছে।" আমরা এ সংবাদে সুখী হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা।—ডাক্তার লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল সাদার ল্যাণ্ড—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" প্রণালীর নিন্দা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর মূলে অন্ধ কুসংস্কার নিহিত। আমরা বলি—এই নিন্দাকারী ডাক্তার সাদার ল্যাণ্ড আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে কিরূপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত—তাহার কিছুই বোঝেন না। যদি তিনি কোনো আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপককে গুরুপদে বরণ করিয়া চরক এবং সুশ্রুতের সমস্ত পৃষ্ঠা গুলি অধ্যয়ন করিতে পারেন, তবেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলে অন্ধ কুসংস্কার নিহিত কি ইহা সকল চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ—তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারেন। সার পারডিলি উকিস্, মার্কিন যুক্ত রাজ্যের ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা তাহা বিলক্ষণই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ডাক্তার পারডিলিউকিস্ বলিয়াছিলেন "যত অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি—এ দেশের সহিত আমার পরিচয় যত বর্দ্ধিত হইতেছে, এ দেশের বৈদ্য এবং হাকিমদের চিকিৎসার মূল্য আমি তত অধিক বুঝিতে সক্ষম হইতেছি।" ডাক্তার ক্লার্কও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"যদি চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক সমস্ত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম তুলিয়া দিয়া চরকের প্রণালীমতে চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের কার্য্য কমিবে এবং পৃথিবী হইতে পুরাতন ব্যাধি পীড়িতের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইতে পারিবে।" ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড কি এ সকল অভিমতও পড়িয়া দেখেন নাই? যে চিকিৎসা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতেও যে চিকিৎসাপ্রণালী লোপ পায় নাই—যে চিকিৎসা শাস্ত্র—হইতে মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ লইয়া অন্য চিকিৎসকেরা কৃতিত্ব দেখাইতেও রাজি—সে চিকিৎসা সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার: পূর্ব্বে ইহার সকল তথ্য অবগত হওয়া উচিত নহে কি?

ঔষধের চাষ।—যুদ্ধের সময় ইউরোপ হইতে ঔষধ আমদানি করার সুবিধা না হওয়ায় ভারতের নানা স্থানে ভেষজ উৎপন্নের ব্যবস্থা করা হয়। সে চেষ্টার ফলে বেলেডোনা, ইপেকাকোহানা পডোফিলাম, নক্সভমিকার চাষ চলিতেছে। ভারতবাসীর এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

সহরের স্বাস্থ্য —কলিকাতার স্বাস্থ্য ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছে। ওলাউঠা, বসন্ত প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতাবাসীগণ তো ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেনই, তাহার উপর প্লেগও আমদানি হইতেছে। সহরবাসীর এ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

মাদকতা নিবারণ।—কাঠিবার নগর রাজ্যের মহারাজা বাহাদুর তাঁহার জন্ম দিন উপলক্ষে তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত মদের দোকান তুলিয়া দিবেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এ ব্যবস্থা হয় না?

সমালোচনা।

বৈদ্যজাতির স্বরূপ নির্ণয়।— শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত প্রণীত ও ৯ নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট—কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ আনা। এই পুস্তকে বৈদ্যজাতি অম্বষ্ঠ এবং অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি, অম্বষ্ঠ শব্দের উৎপত্তি এবং অম্বষ্ঠদিগের বৃত্তি, অনুলোম জন্ম, বৈধবিবাহ বিধি, বিবাহ প্রণালী, কর্ত্তা ও ভার্য্যার একত্ব, অনুলোম বিবাহে দ্বিজভার্য্যা পত্নীপদবাচ্যা, জন্ম বিষয়ে ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজের প্রাধান্য, বৈদ্যের জন্ম গৌরব, বৈদ্য ব্রাহ্মণ বর্ণ, বৈদ্যের কর্ম্মাধিকার অপসদ বৈদ্য, বৈদ্য শব্দের অর্থ এবং বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিও বৈদ্যনামে অভিহিত, বৈদ্যের পূজ্য, আয়ুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের প্রামাণিকতা, আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসাবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব, কু বৈদ্য পংক্তি দূষক ও পূজ্য নহে, সদ্বৈদ্য পংক্তি পাবন— এই সকল বিষয়ের আলোচনা শাস্ত্র প্রমাণ সহ অতি সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রমাণ দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্লোকার্থের পরই যে সকল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি গ্রন্থকারের জ্ঞান গভীর গবেষণা সম্ভূত। যে সকল যুক্তি অবলম্বনে তাঁহার বক্তব্য লিখিত, তাহা পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এখনকার দিনে সংসার তাড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দেশের চিন্তা—সমাজের চিন্তা—স্বজাতির চিন্তা করিবার অবসর বড় একটা কাহারও নাই, সে প্রবৃত্তিও বুঝি সাধারণের মধ্য হইতে লোপ পাইয়াছে। একাকারের প্রাদুর্ভাব ইহারই ফলসম্ভূত এবং সেই একাকারের প্রবল বাত্যায় আমাদের দেশ হইতে যে ধর্ম্মভাব নষ্ট হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালার রোগপ্রবণতা তাহারই কারণ। এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বঙ্গ জননীর দুর্নীতিপরায়ণ সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের ধর্ম্মভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবার আমাদিগকে সমাজের চিন্তা করিয়া সামাজিক রজ্জু সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজন। উদরান্নের সংস্থানের জন্য বর্ত্তমান হাহাকারের যুগে যাঁহারা সে চিন্তা করিবার অবসর পান, তাঁহারা সত্য সত্যই দেশের আদর্শ পুরুষ। জ্ঞানেন্দ্র বাবু সেই জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার রচনা প্রণালী অতি সুন্দর, তাঁহার ভাষার কৃতিত্ব স্বচ্ছ গৌরবে সমুজ্জ্বল। গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। "অম্বষ্ঠ=অম্ব (পিতা)+ষ্ঠ (যিনি থাকেন)। অর্থাৎ যিনি রোগ সময়ে পিতার ন্যায় প্রীতি পূর্ব্বক অবস্থান করেন,"—এই অর্থে যে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এখনকার অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ সে কথা তো আদৌ উপলব্ধি করেন না! তাহা হইলে বৈদ্যজাতির অনেকে চিকিৎসা বৃত্তি ভুলিয়া চাকরিগত প্রাণ হইবেন কেন? এই গ্রন্থের গ্রন্থকার যদি স্বতন্ত্র পুস্তকে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বৈদ্যজাতির মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সে পুস্তক বৈদ্যজাতির আরও উপযোগী হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি "বৈদ্যজাতির স্বরূপ নির্ণয়" আখ্যায় অভিহিত হইলেও আমাদের মনে হয়, ইহা শুধু বৈদ্যজাতির নহে —সকল জাতির ব্যক্তিগণেরই উপকারে লাগিবে। যাঁহারা সমাজ রহস্য জানিবার প্রয়াসী; আমরা তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পরামর্শ দিতে পারি।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

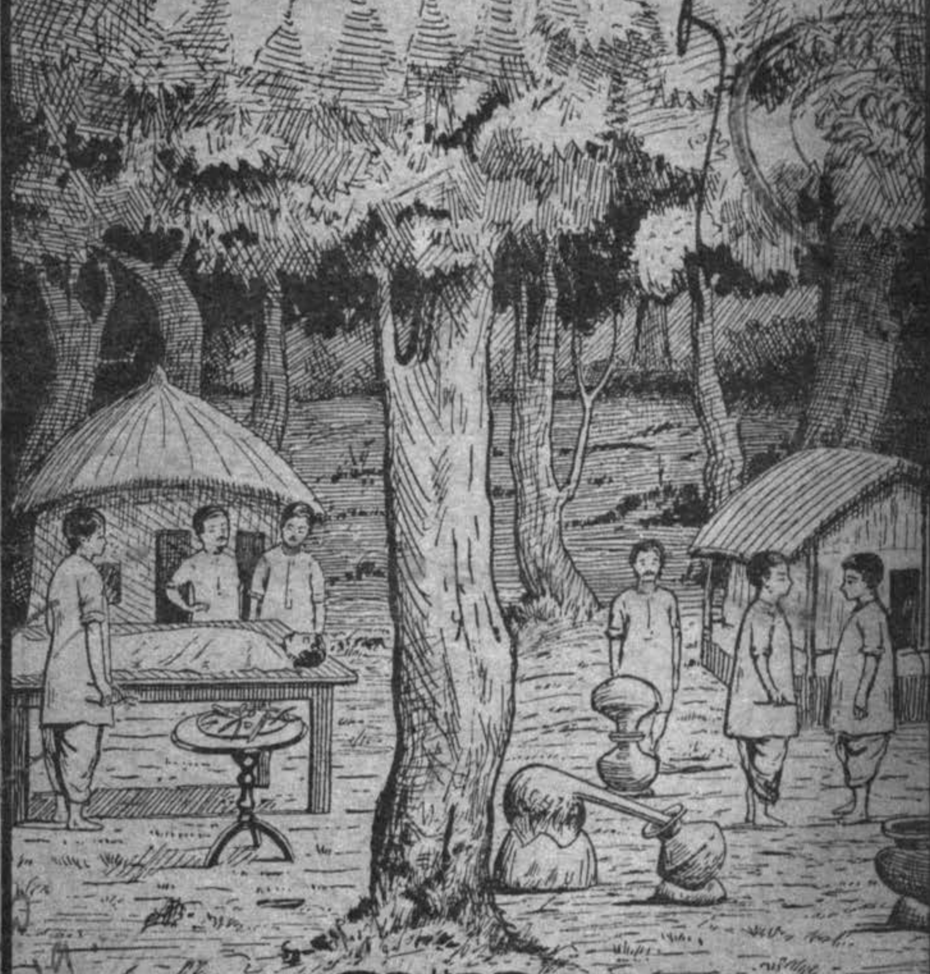
বর্ষ—৯ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



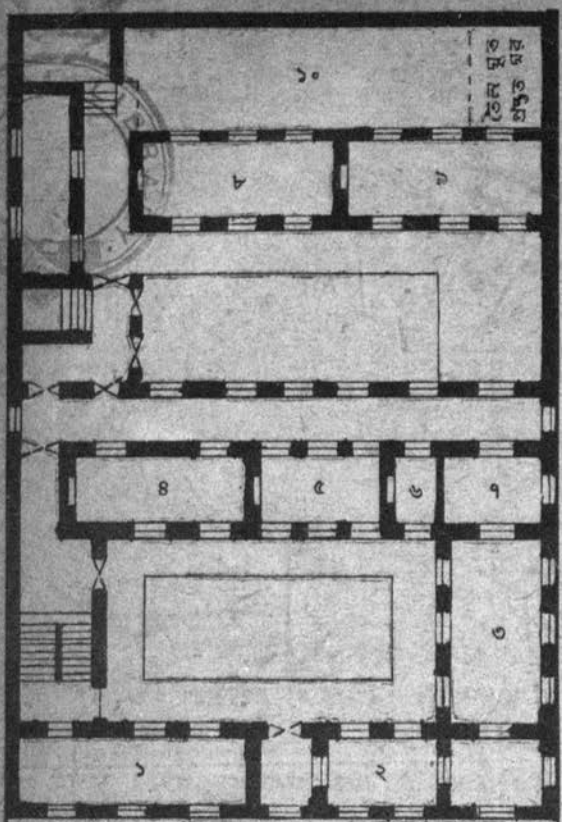
সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

“অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়”

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

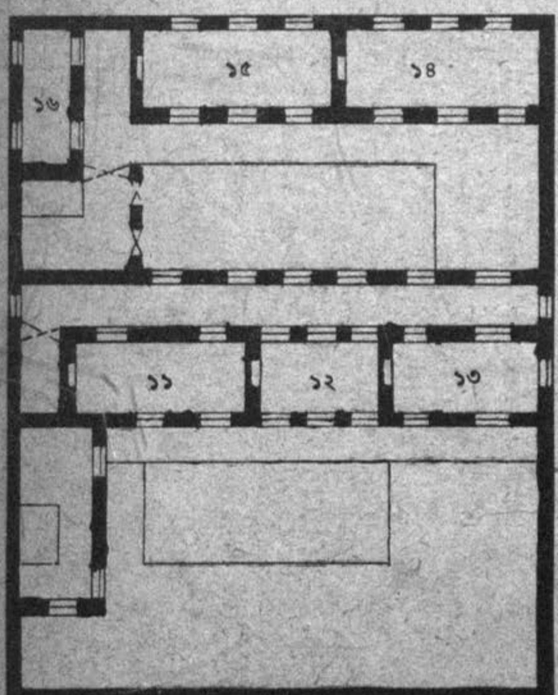
৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। মাসিক বেতন ৩৲ প্রবেশ ফিঃ ৫৲ কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,এ, এম,বি, অধ্যক্ষ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সূচী।

কলিকাতায় মহা হৈরৈ কাণ্ড।

ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা! **ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।**

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে "মায়াপুরি মেটেল।"

অল্প ব্যয়ে গিনির ন্যায় চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট "মায়াপুরি মেটেলের"

গহনা গৃহিণীকে উপহার দিয়া তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবে।

আধুনিক আবিষ্কৃত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি

কার্ড লিখিয়া গ্রহণ করুন ও

সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।

ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার "মায়াপুরি মেটেলের" সেই চুড়ি

১৭ বৎসরের পরীক্ষার ফলে বাজারে বাহির হইয়াছে।

"মায়াপুরি মেটেলের" গহনা গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

ললনা সোহাগ চুড়ি।

"ললনা সোহাগ চুড়ি" পরিলে অন্য গহনার দরকার নাই। ডায়মণ্ড-
গুলি অন্ধকারে হীরার ন্যায় জ্বলে। গিনির অধিক উজ্জ্বল।
পোড়াইলে বা কষিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা আসল স্বর্ণ নয়।
৫০০৲ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট।



বঙ্গললনার নিমিত্ত স্পেশ্যাল অর্ডারে সোণার ডাইসে ১০০৲ টাকা
বেতনের কারিকরের হাতে বেশী পরিমাণে গিনি সোণা দ্বারা
ইলেক্‌ট্রো ব্যাটারিতে পালিশ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এক সেট
লইয়া পরীক্ষা করুন। মাপ মত পাইবেন।

খাঁটী গিনি স্বর্ণের ন্যায় ইহা পালিশ ও সুদৃশ্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট।

মূল্য ৪৲ টাকা, (প্রতি সেট ১০ গাছা) মফঃস্বলে মাশুলাদি ।√০ আনা।

বিনামূল্যে

লাভের কথা।

(উপদেশ পূর্ণ অপূর্ব্ব গল্পের বই)

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে! যিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে ও মাশুলে ১ খানি উপহার পাঠান হইবে।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং,

১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা।—বাঙ্গালী অর্থ অর্থ করিয়া যেরূপ ব্যতিব্যস্ত,—স্বাস্থ্যের কথা তো বাঙ্গালী সেরূপ চিন্তা করেনা। পরিবার-প্রতিপালনের জন্যই বল—আর আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই বল,—সমগ্র বাঙ্গালীকে গড়ে এখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘন্টা এই অর্থের চিন্তায় বিব্রত থাকিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে আগে আমাদের দেশে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল—সে সকল বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন্ করা বাঙ্গালী এখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর এই দশ ঘণ্টা কাল অর্থাগমের গুরু চিন্তায় বাঙ্গালীর দেহ যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বাঙ্গালীর রোগ প্রবণতার সমস্ত কারণ গুলির মধ্যে তাহা অন্যতম।

* * *

স্বাস্থ্যরক্ষায় দিনচর্য্যা।—আগেকার বাঙ্গালী অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিত, বাঙ্গালীর শয্যাবিলাসিনীগণ তাহারও অনেক পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থালীর কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেন। বাঙ্গালী-পুরুষ শয্যা ত্যাগের পর হস্তমুখাদি প্রক্ষালনান্তর প্রাতঃস্নান করিতেন, বাঙ্গালীর মত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে সে প্রাতঃস্নানের ফলে তাহার দেহে বায়ু কুপিত হইতে পারিত না। প্রাতঃস্নানের পর পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া, সেকালের গৃহস্থ-সংসারে যে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে আদার কুচি ও ছোলা ভিজাও সংরক্ষিত হইত। ফলে সেরূপ ব্যবস্থায় সেকালের কাহারও পিত্তও কুপিত হইতে পারিত না,—শ্লেষ্মাও দমনে থাকিত। এক কথায় প্রাতঃস্নান, পূজা আহ্নিক এবং প্রাভাতিক জলযোগের ব্যবস্থায়—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ুপিত্ত কফ—ত্রিধাতুরই যে সাম্যভাব প্রয়োজন, তাহা সকলেরই সম্যক প্রকারে সিদ্ধ হইত। তাহার পর কর্ম্মকালের ব্যবস্থাও সেকালে

নির্দ্দিষ্ট ছিল—প্রাতর্সায়াহ্নে। অর্থাগমের জন্য সেই কর্ম্মকালেও সেকালের বাঙ্গালীকে ৬ ঘণ্টার অধিক বিব্রত থাকিতে হইতনা। ফলে সেকালের লোকে সকল কর্ম্মের মধ্যে "শরীরমাদ্যং"—এ কথাটি অগ্রে মনে রাখিত। আধিব্যাধিতে সেকালের বাঙ্গালী এই জন্যই এত ব্যতিব্যস্ত হইত না।

* * * *

আহারে স্বাস্থ্য বিধি।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে আহারের নিয়ম প্রতিপালন একান্ত প্রয়োজন—এখনকার বাঙ্গালী এ কথা একেবারেই মনে করে না। আগে আমাদের দেশে সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা ছিল। সেকালে আমাদের দেশের লোকে এমনই পবিত্র দ্রব্য আহার করিত যে, আহার করিবার সময় তাবৎ দ্রব্যই দেবতার উদ্দেশে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিত না। এখন বাঙ্গালীর আহারের ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে আহারীয় দ্রব্য সকল আর দেবোদ্দেশে নিবেদন করা সম্ভব নহে। আহারীয় দ্রব্য সকলের মধ্যে গব্য দুগ্ধজাত দ্রব্য গুলি শরীরপুষ্টির যেরূপ সহায়তা করে, এমন আর কোনো দ্রব্য নহে। বাঙ্গালী সংসারে সেই জন্যই সেকালে দুগ্ধজাত দ্রব্য মিশ্রণে আহার—উৎকৃষ্ট আহার বলিয়া পরিগণিত হইত। দুগ্ধজাত দ্রব্য অনায়াস লভ্য হইবে বলিয়াই আমাদের দেশে গাভী মাতৃপদ বাচ্য। সেকালে ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে কন্যার পিতা—পাত্রের সংসারে 'গোয়াল ভরা গাই'—আছে কি না—এই জন্যই অনুসন্ধান করিতেন। ফলে আমাদের দেশে সেকালে যে গব্যজাতদ্রব্য আহারে শরীর পুষ্টির ব্যবস্থা ছিল, যে কারণেই হউক, দেশ হইতে এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে শীত প্রধান দেশবাসীদিগের অনুকরণে বাঙ্গালীর এখন আহার-বিধি চলিয়াছে। ফলে ক্রমাগত উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভক্ষণে বাঙ্গালীর ধাতু সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এখনকার বাঙ্গালী—নানারূপ রোগে ভুগিতেছে ও সেই জন্য।

* * * *

বঙ্গে সংক্রামক ব্যাধি।—সংক্রামক ব্যাধির প্রাবল্যের কারণ, অধুনা দেশের জল বায়ু দূষিত হইয়াছে—এ কথা স্বীকার করিলেও—বাঙ্গালী নিজকর্ম্মকৃত পাপে যে সেই সংক্রামক ব্যাধি কর্ত্তৃক অধিক আক্রান্ত হইতেছে—একথাও অস্বীকার করিবার যো নাই। আহার বিহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘনেই যে সকল প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে হয় —একথা চিকিৎসাশাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিসূচিকা রোগের পরিচয় আমরা পাই; মসূরী বা বসন্ত রোগের পরিচয়ও আয়ুর্ব্বেদে রহিয়াছে, সুতরাং এ সকল রোগ যে আমাদের দেশে আগে হইত—একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু এত প্রবলভাবে—সময়ে অসময়ে, যখন তখন, যাহার তাহার যে হইত না—ইহা নির্ভাজ সত্য কথা। শাস্ত্রবিধিসম্মত আহার বিহারের উল্লঙ্ঘনের ফলেই অধুনা এ রোগ কিন্তু বাঙ্গালায় চিরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল কথা চিন্তাশীল বাঙ্গালীগণ ভাবিতেছেন কি? আমাদের হোমরুলের চিন্তা—বাঙ্গালাকে স্বাধীন করিবার চিন্তা অপেক্ষা এ চিন্তা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

* * * *

সংক্রামক রোগ নিবারণে প্রতি-

ষেধক বিধি।—সংক্রামক রোগাক্রমণ হইতে বঙ্গবাসীদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সকল প্রকার প্রতিষেধক বিধি অবলম্বনের পূর্ব্বে বঙ্গবাসীকে আবার প্রাচীন পদ্ধতি প্রতি-পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনই বঙ্গবাসীর পক্ষে সকল প্রকার সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—এ কথা বঙ্গবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি—বাঙ্গালী অপরিণত বয়স হইতেই ইন্দ্রিয় পরি-চালনার অপব্যবহারে স্বাস্থ্যক্ষয়ে অভ্যস্ত। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলেও যৌবন বিকাশোন্মুখের পূর্ব্বেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে। এক কথায় বাঙ্গালী যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে—তখন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য সম্যক প্রকারে কর্ম্মক্ষম নহে,—কিন্তু উদারান্নের সংস্থানের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম না করিলেও উপায় নাই। তাহার উপর শিক্ষার দোষে বালককাল হইতে বাঙ্গালী ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারে স্পৃহাশূন্য। বাঙ্গালী সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগিবেনা তো ভুগিবে কাহারা? সংপ্রতি কয়েকমাস হইতে কলিকাতায় কলেরা ও বসন্তের পূর্ণ প্রভাব। এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে প্রাতঃকাল হইতে, মধ্যাহ্ন—সায়াহ্ন—রাত্রির প্রথম যাম পর্য্যন্ত চায়ের দোকানগুলির বিক্রয়াধিক্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন কি? বাঙ্গালীর রোগ হইবে না তো হইবে কাহার? সকল প্রকার সংক্রামক রোগেই তো বাঙ্গালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয়,—আমাদের মনে হয়,— ঔষধে ইহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইবে না—বাঙ্গালী যদি আবার সাবেক পদ্ধতি অবলম্বনে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়,—তবে তাহাই বাঙ্গালীর সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইবে।

* * *

রোগের কারণ।—উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য আমাদিগকে জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সে ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী,—পুকুরের মাছ, – গোয়াল ভরা গাভীর দুগ্ধ এখন আর আমাদের সহজলভ্য নহে। সে সাবেক পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এজন্য সংসার পোষণের জন্য আমাদের কর্ম্মকালের নির্দ্দিষ্ট সময় —মধ্যাহ্নকাল পরিশ্রমে অতিবাহিত করিতেই হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে যৎটা সম্ভব—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমরা সচেষ্ট হই না কেন? প্রাভাতিক স্নান—দেবোদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা—উষ্ণ দ্রব্য চায়ের পরিবর্ত্তে আদা, ছোলা ভিজা, মিছরির পানার ব্যবস্থা আমরা তো সহরে থাকিয়াও সহজে করিতে পারি। তৈল মর্দ্দনে এবং স্নানাহার সমাপনে যে পরিমাণ সময় দেওয়া কর্ত্তব্য—তাহার ব্যবস্থা না করিয়া, দশ পনের মিনিটের মধ্যেই ঐ সমস্ত কার্য্য আমরা সমাধা করিয়া কর্ম্মালয় উদ্দেশে ধাবিত হই কেন? আমাদের এই সকল কর্ম্মকৃত ফলেই আমাদের মধ্যে সকলপ্রকার রোগই সংক্রামক ভাবে প্রবেশ করিতেছে। অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে জল বায়ুর দোহাই দিয়া কাটাইলেও, বাঙ্গালার যক্ষ্মাবৃদ্ধি যে ইহারই ফল সম্ভূত, সে পক্ষে আদৌ সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর দেহ নানারূপে ক্ষয়প্রাপ্ত—তাহার পর এরূপ অত্যাচারে ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগ যে একান্তই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

* * *

শিশু মৃত্যু।—বাঙ্গালীশিশুও মরিতেছে পৃথিবীর সকল দেশের শিশু অপেক্ষা অধিক। ইহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। ১ম দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের ফলে উৎপত্তি—২য় তাহাদিগের রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক. আমরা তাহা করিতে পারি না। আমাদের অনুরাগের অভাবে এবং আরও কতকগুলি কারণে শরীর রক্ষার এবং আয়ুবর্দ্ধনের সর্ব্ব প্রধান দ্রব্য গোদুগ্ধ তো একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াই পড়িয়াছে, এজন্য উপযুক্ত পরিমাণে গোদুগ্ধ পানের ব্যবস্থা অনেক শিশুর জন্য করা হয় না, অনুকরণ স্পৃহায় দুগ্ধের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার বিলাতী ফুডে অনেক স্থলে শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা একেবারেই সমীচীন নহে। তাহার পর ভূমিষ্ঠ কালের পর আগে যে প্রচুর তৈল মাখাইয়া মার্ত্তণ্ড কিরণে শিশু দেহ উত্তপ্ত পূর্ব্বক শ্লেষ্মা প্রশমনের ব্যবস্থা ছিল—এখন অনেক ক্ষেত্রে তাহা লোপ পাইয়াছে। পুরুষ জাতির মত দেশের মহিলাগণও বিকৃত শিক্ষায় সাবেক পদ্ধতি ভুলিয়াছেন, তাহারই ফলে নানারূপ বেশবিন্যাসে সর্ব্বদা শিশু দেহ আবৃত করিয়া রাখিলেই যেন শিশুদিগকে রক্ষা করিবার প্রধান উপায় করা হইল—ইহাই এখনকার মা-লক্ষ্মীগণ মনে করেন। ইহা ভিন্ন সামান্য সামান্য রোগে শিশুদিগকে এখন টোট্‌কা টাটকী ছাড়িয়া বড় বড় চিকিৎসকের শরণ গ্রহণে যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়—ইহাও শিশুরক্ষার প্রধান অন্তরায়। সেকালে শিশুদিগের যে সামান্য জ্বর হইত তাহার অভিধান ছিল—'বালসা'। সে বালসায় সামান্য মধু, তুলসীর রস,—বড় জোর একটু ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম—এ সকল দেওয়ার যে রীতি ছিল,—এখন সে ব্যবস্থা দেশ হইতে বিলুপ্ত। ফলে শিশু প্রতিপালন যেরূপ ভাবে করা উচিত—আমরা এখন তাহা করিতে জানি না বলিয়াই বাঙ্গালী-শিশুর মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

* * *

শিশু মৃত্যুর সহিত শিশু জননীর স্বাস্থ্য।—বঙ্গদেশ হইতে শিশু-মৃত্যুর হ্রাস করিতে হইলে বঙ্গমহিলাদিগেরও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের মহিলাগণও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। তাহার উপর কলিকাতার মত স্থানে আয়ের তুলনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী বাটী ভাড়া লইয়া অনেকেরই পক্ষে বাস করা সম্ভবপর নহে, সেই জন্যই অনেককে আলোক রৌদ্র-বায়ু বিহীন সামান্য বাড়ী ভাড়া লইয়া বাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। পুরুষেরা কর্ম্মসূত্রে নানাস্থানে গমনাগমন করেন—সে জন্য সেরূপ বাটীতে অবস্থিতির ফলে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তরায় না ঘটিলেও ইহার জন্য যে মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে – তাহা সুনিশ্চিত। ফলকথা আমরা বলিতে চাহি—শিশু মৃত্যুর সহিত শিশু জননীর ভগ্নস্বাস্থ্য সুসংবদ্ধ।

* * *

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ।—যেরূপ আব্ হাওয়া চলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়। প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য শিশু অকালে কাল কবলিত হইতেছে, অসংখ্য অসংখ্য যুবা-প্রৌঢ় ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে, – নানারূপ রোগের সংহার মূর্ত্তি বঙ্গ জননীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ দুর্দ্দিনে আর

—কাহারও নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে, উপেক্ষার হাস্যে আস্য বিকাশ পূর্ব্বক এই মৃত্যুর আধিক্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া আর আমাদিগের পক্ষে উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? আয়ুর্ব্বেদ তো স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণ সংক্ষয়ঃ॥"

অর্থাৎ তৈলাধার বা প্রদীপে তৈল এবং বর্ত্তিকা সংস্থিত থাকিলেও বায়ু তাড়নে তাহা যখন নির্ব্বাপিত হইতে পারে, সেইরূপ আয়ু থাকিতে অকালে প্রাণহানিও অসম্ভব নহে। আমরা নানারূপ অনিয়মে সেই অকালে প্রাণহানির কারণ করিয়া তুলিতেছি। অতঃপর আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আবার সংযম শিক্ষা ও শাস্ত্রবিধি পালন একান্তই আবশ্যক। এই বাত্যা-বিক্ষুব্ধ বঙ্গে ইহা ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই—ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেই চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের বিশিষ্ট অনুরোধ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

বালক রক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

বাল্যকাল হইতে বালককে আমি কে—এই জ্ঞান পাইবার জন্য শিক্ষা দিতে বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইবে। সুখ দুঃখ কি? এবং দুঃখ দূর হইয়া বিমল সুখ অর্থাৎ আনন্দ লাভ কিসে হয়—সে বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালক কেবল দুঃখময় সংসারে ও সংসারের বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করিয়া আধুনিক শিক্ষার কৃপায় সর্ব্বদা সুখান্বেষী হইয়া আপাতমধুর—পরিণামে বিষবৎ বিষয় উপভোগকে সুখ বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অল্পকালমাত্র দুঃখময়—রোগ শোকময় জীবন যাপন করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এইরূপে অযথা বিষয়ভোগের স্পৃহায় শরীরকে রোগ সঙ্কুল করিয়া অকাল মৃত্যু দ্বারা আত্মঘাতীর মহাপাতকে পতিত হয়। উহাদিগকে এই বিষয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে, এই ধারণা করাইতে হইবে যে, যাহাকে 'আমি' বলি—তাহা এই দেহের মধ্যে দেহী,—যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রী, গৃহের মধ্যে অখণ্ড মহাকাশের খণ্ড স্বরূপ আকাশ এবং সেই অখণ্ড পরমাত্মার খণ্ড স্বরূপ প্রতীয়মান আত্মা। আত্মা এই দেহের মধ্যে দ্রষ্টারূপে আছেন। আমরা মনে করি—ইনি সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির সহিত যতক্ষণ মিলিত থাকেন, ততক্ষণ এইরূপ মনে হয়। বুদ্ধি বৃত্তির সহিত হইতে ভিন্ন দেখিলে তাঁহার স্বরূপ দেখা যায়, তখন আর তাঁহার সুখ দুঃখ থাকে না, নিজ নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কেবল আনন্দময় হইয়া যায়।

এখন এ বিষয়ে আমাদিগকে নিজে বিশেষ জ্ঞানী হইয়া বালককে অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানী করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। আত্মাকে জানিতে পারিলে লোকে আর বৃথা বিষয় সুখের চেষ্টায় ধাবিত হইয়া নিজ আয়ুকে হ্রাস ও রোগ

পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে পারেনা। এই সংসারে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে পূর্ণ জীবিত কাল কাহারও মতে ১২০ বৎসর, কাহারও মতে ১০০ বৎসর নীরোগ অবস্থায় জীবিত থাকিয়া কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মক্ষয় পূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া সেই "সত্যমনন্তং জ্ঞানম্'কে লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই পরম ধামে যাইতে পারি - যেথান হইতে আর ফিরিয়া আসিয়া বারম্বার যাতায়াত ও গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যু যন্ত্রণাভোগ ও সংসারে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। আমরা যে কিরূপ ভাবে যাতায়াত করিতেছি—তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,-"যাবজ্জননং যাবন্মরণং যাবজ্জননী জঠরে শয়নং" ইত্যাদি। কিন্তু এই দুঃখ প্রবাহ অতিক্রম করিয়া বাল্যকাল হইতে এইরূপ ভাবে চলিতে হইবে ও সাধনা করিতে হইবে যে, মৃত্যুকালে সেই পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার ব্যঞ্জক পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, সুষুম্না মার্গ দিয়া প্রাণ বায়ুকে ভ্রূমধ্যে লইয়া গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা শ্রী গীতায় ও কঠোপ-নিষদে আছে - সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব,— আর এ সংসারে আসিতে হইবে না, সেই ধামে যাইব—যেথান হইতে আর ফিরিতে হয় না "যদ্‌গত্বান নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" তাঁহাকে না জানিতে পারিলে আমরা এই ভয়াবহ মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" তাঁহাকে জানিলেই আমরা মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইব,— এই উপায় ছাড়া এই কঠোর দুঃখদায়ক সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা সব বিষয়ে সতর্ক হই—কিন্তু মৃত্যুকে যে এত ভয় করি—তাহার জন্য ত কোন প্রকার সতর্ক হই না। বাল্যকাল হইতে কেহ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বলিয়া জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা ত বিস্মৃত হইয়া "সখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা মারে" বলিয়া অসময়ে চিৎকার করি তেছি। এখন বয়স হইয়াছে "স্বগাত্রান্যপি ভারায়" হইয়াছে। নিজের দেহটা ভার স্বরূপ হইয়াছে, ঈশ্বরকে ভজন করিবার—সাধনা করিবার আর ক্ষমতা নাই। এখন কেবল অনুতাপ আসিয়াছে যে, "জীবনটা বৃথা গেল, কিছুই করিলাম না।" শুধু এ জীবন কেন, কত জীবন যে আমাদের এইরূপ বৃথায় গিয়াছে— তাহার ইয়ত্তা নাই। মায়ের আহ্বান বাণী আমাদের কাণে আসিতেছে না। অনাহূত ধ্বনির কথা শুনিতে পাইবার চেষ্টা দূরে থাকুক উহার কথা বলিলে, লোকে বলে যে, পাগলে উন্মত্ত অবস্থায় এইরূপ শোনে। তাই আমি সেই সকল বিজ্ঞান বেত্তাদের বলি "যে অনাহূত ধ্বনি শুনিয়া আমি পাগল, না,—না শুনিয়া তুমি পাগল—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি"! ভক্ত শিরোমণি স্বর্গীয় বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কথাটি এখানে মনে পড়ে—

"সৃষ্টিচক্রে পরতঃ পর উন্নত এই জীবকুলে।
ডাকেন মা প্রসারি' বাহু
—নেবেন ব'লে কোলে তুলে।
মায়া মোহন মহাচ্ছন্ন জীব
নিদ্রিত তাঁকে ভুলে।
আপন স্বপন মাকেদেখায়, শাখায় ফল সব
পাকায় মূলে॥"

আমরা এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন বৃথায় কাটাইতেছি। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ না করিলে এ পথের পরিচয় হয় না, এখানে চলা যায়না ও গন্তব্য স্থান পাওয়া যায় না। তাই বড় দুঃখে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্তঃ—
তরুণ স্তাবৎ তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

পাঠক বলিবেন, এ কি—"বালক রক্ষা" বিষয় লিখিতে কি লেখা হইতেছে? আমার সানুনয় করযোড়ে নিবেদন এই যে, অনেক কথা বলা হইয়াছে—অনেক বক্তৃতা করা হইয়াছে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে—কিন্তু বালকের মতিগতি আমাদের যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে এখন সকলের দৃষ্টি সেই পরম করুণাধার শ্রীভগবানে আকৃষ্ট না করিতে পারিলে, এই সংসারের বিষয় বিষপান হইতে নিবারণ করিয়া অকাল বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবেনা। আমাদের জীবনটা বৃথা গেল দেখিয়া, আমাদের প্রিয় পুত্রগণ যাহাতে সেরূপ না হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। "ধর্ম্ম রক্ষিত রক্ষতি" আমাদিগকেই আমাদের বালকদিগকে ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই জন্য ধর্ম্মকে আগে রক্ষা করিতে হইবে এবং উহা হইতে অর্থ, কাম ও মোক্ষ পরম্পরা আসিতে থাকিবে। মহাত্মা পুণ্যশ্লোক রামদাস কাঠেরা বাবা দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হন। গৃহস্বামী বলেন,—"এত অল্প বয়সে গৃহত্যাগী কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর দেন, "বাবা সেখানে যাইতে বহুদূর পথ অতিক্রম করিতে হয়, এখন হইতে আরম্ভ না করিলে কি শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিব"? ফলকথা আমাদিগকে বাল্য হইতে ধর্ম্মপথের অন্বেষণ করিতে হইবে।

মৃত্যু সকলেরই ভয়ের জিনিষ এবং অবশ্যম্ভাবী। মানুষ অনেক কল্পিত ভয়ের জন্য কাতর হইয়া তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু যাহা স্থির নিশ্চয়—সেই মৃত্যুর জন্য কেহ প্রস্তুত হয় না, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় করে না। উপায় অবশ্য শক্ত বটে, তাই বলিয়া কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমরা মৃত্যুকে কেহ ভয় করি? মৃত্যুর দ্বার দিয়া আবার আমাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সংসারের অনলে দগ্ধ হইতে হইবে, মরিতে হইবে।

পুনরপি জননং পুনরপি মরনং
পুনরপি জননী জঠরে—শয়নম্।
ইহ সংসারে খলুদুস্তারে কৃপয়াঽপারে
শয়নম্ পাহিমুরারে।

গোবিন্দকে—মুরারিকে ডাকার মত ডাকিয়া তাঁহার মত না হইতে পারিলে এই দুস্তর সংসারে মৃত্যু মুখ হইতে অব্যাহতির উপায় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবের বড়ই কষ্ট হয়। পৈত্তিক উষ্মা অষ্ট মর্ম্মস্থানকে যখন দগ্ধ করিতে থাকে, যখন প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু, সমানবায়ুর অধীনে না থাকিয়া পরস্পর স্বাধীন হইয়া—দেহ ত্যাগের চেষ্টা করে, যখন নাভিশ্বাস হয়, তখন জীবের বড়ই কষ্ট হয়। যাঁহারা কাহারও মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছেন, তাঁহারাই এই যন্ত্রণা দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেখিয়া তাঁহারও এইরূপ হইবে ভাবিয়া সেই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন চেষ্টা

করিয়াছেন কি ? তাহার পর মৃত্যু আসিলে যথন আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তথন বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে দগ্ধ বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম অণু সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ পূর্ব্ব শরীর হইতে আত্মা এই সকল প্রভৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করে।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রমেতীশ্বরঃ।
গৃহী ত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিরাশয়াৎ॥

এই মৃত্যুর পর জীব স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত ও পঞ্চতন্মাত্রের সহিত বাসনা দেহ ধারণ করিয়া প্রেতলোকে (ভুবলোকে) বাসকরে।

আমাদের এই দেহে তিনটী দেহ আছে। প্রত্যেক দেহই যত্নের জিনিষ, কোনটীকে তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই। এই তিনটি দেহ, স্থূলদেহ ও কারণ দেহ। এই তিনটি দেহ ছয়টি কোষের মধ্যে আছে। যথাঃ— এই স্থূল দেহ—অন্নময় কোষের মধ্যে। ইহা ক্ষিতি, অপ্ তেজ্ মরুৎ, ব্যোম পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মাতে দেহে বর্ত্তমান থা.ক। ইহা আহারের দ্বারা ধার্য্য বলিয়া ইহার নাম অন্নময় কোষ।

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ—প্রাণময় কোষ—পঞ্চবায়ু, দশ ইন্দ্রিয়ের তন্মাত্র, পঞ্চ প্রাণ বা বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান; পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় – বাক্ প্যণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ। মন, বুদ্ধি কামাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ু প্রাণ সংজ্ঞক হইয়াই বসু। কেননা তাঁহারাই পুরুষাদি সমস্ত প্রাণিগণকে বাস করান (রক্ষা করেন)। কারণদেহ মধ্যে প্রাণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেই এই সমস্ত জগৎ বর্ত্তমান থাকে, নচেৎ নহে। যে হেতু নিজেরাও বাস করেন এবং অন্যকেও বাস করান, এই জন্য ইঁহারা বসু নামে অভিহিত। এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ যাহার মধ্যে বাসনা ও ভাবনা দেহ আছে—তাহা প্রাণময়, মনোময়,জ্ঞানময় কোষে বিজ্ঞানময় অবস্থিত। তাহার পর কারণদেহ আনন্দময় কোষে বিরাজমান। কেহ কেহ ষট্ কোষ বলেন, কেহ কেহ বিজ্ঞানময় কোষকে এক করিয়া জ্ঞানময় নাম দিয়া পঞ্চ কোষ বলেন। এই পঞ্চ কোষ মধ্যে (যঃ কাশতে শোভতে) যিনি শোভা পান তিনিই কাশী এবং তাঁহাতেই সেই ভাগবতী তনু প্রকৃতি পুরুষ বিশ্বনাথঅন্নপূর্ণা যুগল হইয়া এক দেহে বিরাজমান, আর মা গঙ্গা সেই অন্নপূর্ণা যুক্ত বিশ্বস্বামীর চরণ ধৌত করিয়া বিরাজিত। এখানকার মা গঙ্গা—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সহিত যুক্ত ত্রিবেণী হইতে আসিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টিত করিয়া আছেন। আমাদের দেহেও তদ্রূপ “ইড়া, ভগবতী— গঙ্গা, পিঙ্গলা—যমুনা নদী।

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্নাচ সরস্বতী।
ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজ স উচ্যতে।
তত্র স্নান প্রকুর্ব্বীত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এই হইল আসল কাশী। পঞ্চ ক্রোশ ঘুরিয়া কাশী প্রদক্ষিণ করায় কোন ফল নাই—যতক্ষণ না মনকে এই পঞ্চকোষী করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাঁচটি কোষ হইতে আনিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টিত কুণ্ডলিনী শক্তিতে না লাগান যায় এবং তথা হইতে সকলকে একত্র করিয়া সহস্রার নিম্নে দ্বাদশদল পদ্মোপরি বিরাজ মান সশক্তি গুরুপাদ পদ্মে সেই পরমাত্মায় লীন করিতে না পারা যায়—ততক্ষণই এই মনের স্বত্ত্বায় সংসারে দুঃখ ভোগ বা দুঃখ

মিশ্রিত সুখভোগ বা যাতায়াত, জনম মরণ জননী জঠরে শয়ন আর সংসার শয্যা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। মনকে সেই পরব্রহ্মে পরব্যোমে লয় করিতে পারিলেই সংসার নিবৃত্তি বা মুক্তি বা মোক্ষ বা পরমানন্দলাভ বা সেই পরমধাম প্রাপ্তি হওয়া যায়,—যেথান হইতে আর ফিরিতে হয় না, যেখানে গিয়া আমরা অমৃতের পুত্র হইরা অমৃতত্ব লাভ করি এবং সেই দেশে বাস করি—যেথানকার রক্ষা শ্রীভগবান্ নিজে শ্রীমুখে গীতায় বলিয়াছেন।

ন বদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ
যদগত্বা দ নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

আবার শ্রুতি কঠোপনিষদে বলিয়ছেন—

ন তত্র সূর্যো ভবতি, ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি।
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং—
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

এখানে সেই আনন্দময় স্থান যেখানে নিরানন্দের লেশ নাই। সেই প্রকৃতি পুরুষ পার্ব্বতী পরমেশ্বর সগুণ হইতে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে তথায় বিশেষ প্রকাশমান হইয়াছেন। যদিও তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্ব বিরাট মহান ব্যাপক, তথাপি তিনি শরীরের জন্য সেই ব্রহ্মলোকে বা পর ব্যোমে অত্যুজ্জল জ্যোতির্ম্ময় ভাবে বিরাজমান।

পূর্ব্বে স্থূল দেহের ও সূক্ষ্মদেহের কথা বলা হইয়াছে, বাকী কারণ দেহ, ইহা আনন্দময় কোষে। আত্মা ইহার পরেও ভিন্ন। আনন্দ ময় কোষ ক্ষণিক, আর আমি (আত্মা) সর্ব্বদা স্থিত বলিয়া নিত্য। এই জন্য এই আনন্দময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা কারণ রূপ দেহ। আমি ইহার জ্ঞাত্মা। ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন। এই পঞ্চ কোষ অনুভব গ্রাহ্য। এই পঞ্চ কোষকে অনুভব রূপ যে চৈতন্য তিনি পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্ন আত্মা। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহার জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, শোক আনন্দ কিছুই নাই। তবে তিনি দ্রষ্টা বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে যুক্ত থাকিয়া সুখী দুঃখী মনে করেন।

আত্মা স্বলিঙ্গস্ত মনঃ পরিগৃহ্য মহমিতে।
তৎকৃতান সংজুষনং কামান সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ॥
বিশুদ্ধ স্ফটিকো যদ্বদ্রক্ত পুষ্প সমীপতঃ।
তদ্বর্ণ যুতো ভাতি বস্ততো নাস্তি রঞ্জনা।
বুদ্ধিন্দ্রিয়াদি সামীপ্যাদস্মনোঽপি তথাগতি॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো জীবন্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্ম বশতস্তাত ফল ভোক্তার এবতে।
পঞ্চভূতাত্মকো দেহমুক্তো জীবো যতঃ স্বয়ম্।
ভগবতী গীতা

দেহ পঞ্চ ভূতময়। কিন্তু তন্মধ্যে জীব স্বয়ং মুক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে নির্লিপ্ত।

আত্মা প্রথমতঃ নিজ লিঙ্গ স্বরূপ মনকে গ্রহণ করে, পরে অস্বতন্ত্র ভাবে তৎকৃত কামনা উপভোগ সহযোগে পুনঃ পুনঃ সংসারে পরিভ্রমণ করে। বিশুদ্ধ স্ফটিক যেরূপ রক্তবর্ণ পুষ্প সমীপে থাকিলে সেই বর্ণযুক্ত বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক উহা উহার বর্ণ নয়, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সামীপ্যহেতু সুখী ও দুঃখীরূপে প্রতীয়মান হয়।

উক্ত স্থূল দেহের নাশকে আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি। আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিলেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষ হইতে আত্মা বিচ্যুত হইলে মৃত্যুদ্বার দিয়া সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ বাসনাদেহ ও ভাবনা দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ি। এই অজ্ঞানের পরই যখন জ্ঞান হয়—তখন আমরা দেখি একটা নূতন 'লোকে' আসিয়াছি। তাহাকে 'ভুবঃ' লোক বলে।

ইহার নিম্নস্থলে প্রেত বা কাম লোক। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায়ই অধিকাংশ লোকের মনে বহু কামনা থাকে, সেই সকল কামনা তৃপ্তি না হওয়ায় মানবকে দারুণ যাতনা সকল ভোগ করিতে হয়। তখন ভোগের চেষ্টার জন্য এই অন্নময় কোষ অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ থাকে না, কিন্তু কামনাগুলি থাকিয়া যায়, তাহার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় এই প্রেতলোকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাহার পর যখন পাপক্ষয় হয়, যখন প্রেতলোকে কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে কামনা সকল ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন কামনা দেহের কতকগুলি অণু কমিয়া যায়। এই ভোগকাল সমান নয়, কামনার তীব্রতা অনুসারে ইহার দীর্ঘতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ ইহাকে এক বৎসর ধরিয়া পুত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধার সহিত মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতা মাতার জন্য তর্পণ জল অর্পণ ও মাসিক শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান, ব্রাহ্মণ ভোজন আবশ্যক। এই প্রেত অবস্থায় সেই জীব নিজের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হয় না। তাহাকে কামনার দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। পিপাসায় কাতর হইলে জল নাই। ক্ষুধায় কাতর হইলে আহার নাই। শীতে কাতর হইলে বস্ত্র নাই। প্রেত লোকের এই সকল যন্ত্রণা লাঘব করাইবার জন্য ও অপেক্ষাকৃত সুখকর স্থান পিতৃলোকে গমনের জন্য ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ যথার্থ ব্রাহ্মণের অভাবে এই কলিকালে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে কুশময় ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান করাইয়া তাহাতে বিষ্ণুর আরাধনা ও মন্ত্রাদি দ্বারা শুদ্ধভাবে প্রস্তুত অন্নে ভক্তিভাবে প্রদত্ত পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীতোষ্ণাদির যাতনা নিবারণের জন্য ছত্র, পাদুকা, বস্ত্র, মসারি, খাট প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত সৎপাত্রে দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কি ঘোর কলিকাল আগত! এই পরম লোকহিতকর শ্রাদ্ধাদি ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। লোক দেখানি করিয়া আদ্য শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত হয়, তাহার পর আর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ হয় না। ইহার সম্বন্ধে বিশ্বাস ক্রমশঃ লোপ পাইয়া উঠিয়াছে—বিশেষ আধুনিক শিক্ষা একবারে আমাদিগকে শ্রদ্ধাহীন করাইয়াছে। অন্যান্য যুগের মত পূর্ণ আয়ুভোগ কচিৎ ঘটে। প্রায়ই অকাল মৃত্যু। পূর্ব্বে লোকের মৃত্যু বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্থের পর হইত, তাহাতে তত মৃত্যু যন্ত্রণা হইত না। লোকে প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মরিতে পারিত এখন আর তাহা হয় না। অকালে হঠাৎ মৃত্যুর লক্ষণ আবির্ভাবের পূর্ব্বেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়, সেই জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে অসহ্য যন্ত্রণা ও প্রেত দেহে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমরা আরামে থাকিবার জন্য ভাল ঘর দ্বার তৈয়ার করাই, গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা করি, সুন্দর সুকোমল শয্যার ব্যবস্থা করি, ভাল পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যবস্থা করি, কিন্তু যে অর্থ কেবল অভাব মাত্র মোচনের জন্য, যাহা শাস্ত্রে কেবল ভরণ পোষণ মাত্র আবশ্যক মত উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয়ের নিষেধ করিয়াছেন, সেই অর্থের অগাধ সঞ্চয় ব্যপদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, বাকীটুকু অলসে বিলাসে, আমোদে প্রমোদে ও নিদ্রায় কাটিয়া যায়, কিন্তু আমরা এই ভীষণ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার কোনই উপায় করি না। কারণ বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে কেহ শিক্ষা দেয় নাই। আমরা যদি এখন আমাদের বালকগণকে বাল্যকাল হইতে এই সকল বিষয় না জানাইয়া ও না শিখাইয়া রাখি, তবে কখন হঠাৎ মরিয়া

যাইব,—ইহ সংসারে ত কত কষ্টই পাইলাম। প্রেতলোকের কষ্ট নিবারণের জন্য যে পুত্র কামনা, সেই পুত্রত কই আমার কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবে না। তর্পণ জল দিলে, পিণ্ডদান করিলে, যে পরলোকে প্রেত দেহের তৃপ্তি হয়, এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে কয়জনের আছে যে, আমাদের নিকট হইতে আমাদের বালকগণ সে শিক্ষা পাইতে পারিবে? পিতৃ পুরুষকে শ্রাদ্ধকালে যাহা দেওয়া হয়, তাহা শুদ্ধ ও শুচিভাবে পবিত্র অন্তঃকরণে দিতে হইবে। মন্ত্র সকলশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে ও মন্ত্রার্থ বুঝিয়া, ভাবে-শ্রদ্ধাতে গদ্ গদ্ হইয়া উহা পিতৃ পুরুষকে অর্পণ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালককে এই পরলোকতত্ত্ব উপদেশ দিয়া তাহাদের মনে এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা জন্মাইতে হইবে। এইরূপে তাহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হইবে। মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে। মন্ত্রের দ্বারা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। কেবল যে উপাসনাদির দ্বারা প্রেত দেহের দুঃখের লাঘব হয়—তাহা নহে, তর্পণ জল প্রদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও পিণ্ডদান দ্বারা পরলোকগত জীবের আহার পিপাসা প্রভৃতির কষ্টের নিবারণ হয়, ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে এই সকল দেখিয়া পরের মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থায় ঈশ্বরোপাসনার সহিত মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের বিধি প্রদান পূর্ব্বক উহা আরও ফলদায়ক করিয়াছেন। প্রেতদেহ বিমোচনের জন্য তাঁহারা আশু শ্রাদ্ধাদির এবং ভাবনা দেহ বিমোচনের জন্য সপিণ্ডীকরণাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানবের প্রেতলোকে যে সমস্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা স্মরণ থাকে না বটে—কিন্তু ইহার দ্বারা পরমকারুণিক পিতা পরমেশ্বর জীবের শুদ্ধি ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই কষ্ট ভোগের দ্বারা চিত্তে বড়ই অনুতাপ আইসে এবং তদ্বারা কামনাদেহের অণুপরমাণু অনেক ক্ষয় হইয়া যায়। তাহার দ্বারা জীব পিতৃ লোকে উন্নত হয়। সেখানে কতক সুখ ভোগ কতক দুঃখভোগ দ্বারা বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন তাহার দ্বিতীয় মৃত্যু হয়, তাহার পর ভাবনা দেহ লইয়া স্বর্গে গমন করে। সেখানে সুখ কিন্তু একঘেয়ে; প্রথম প্রথম ভাল লাগিলেও তাহার পর আর ভাল লাগে না। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে তাহার ভাবনা দেহটিও বিচ্যুত হয়, তখন তাহার তৃতীয়বার মৃত্যু হয়। তাহার পর যাহারা বেশী পুণ্যবান হয়, তাহারা আরও উচ্চ স্বর্গে গমন পূর্ব্বক অতুল আনন্দ উপভোগ করে। অতঃপর পূর্ব্ব সঞ্চিত বাসনানুসারে আবার একটী নূতন দেহ ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মফল ভোগের জন্য পৃথিবীতে নিজ কর্ম্মের উপযুক্ত পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কি প্রকারে এই পৃথিবীতে জন্ম হয় তাহা শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

স্বকর্ম্মবশতো জীবো নীহারকণয়া যুতঃ।
পতিতো ধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যগতো ভবেৎ॥
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্তা ভুজ্যতে পুরুষৈ স্ততঃ।
ততঃ প্রবিষ্টং তদ্‌ভুজ্যংপুংসোদেহে প্রজায়তে॥
রেতস্তেন স জীবোঽপি ভবেদ্দেহগতস্তদা॥

ভগবতী গীতা।

জীব স্বর্গলোক হইতে নিজ কর্ম্মফলানুসারে আগত হইয়া কিছুকাল আকাশ মার্গে ভাসমান থাকে। মৃত্যুর পর প্রেতত্ব অবস্থা হইতে এই অবস্থায় আসিতে কাহার কত সময় লাগে—তাহার স্থিরতা নাই। নিজ কর্ম্ম

ফলানুসারে কাহারও বহুকাল লাগে, কাহারও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল লাগে। এইরূপে আকাশ-মার্গে ভাসমান্ থাকিতে থাকিতে জীব নীহার কণাযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া কোন ব্রীহি যবধান্যাদির মধ্যগত হয়। সেই ব্রীহি পুষ্ট ও পরিপক্ক হইয়া রৌদ্রে শুষ্ক, উদূখলে নিষ্পিষ্ট, অগ্নিতাপে পক্ক হওয়া কালীন জীব তন্মধ্যে নিদ্রায় ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় তদ্বারা কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারে না। পুরুষের দেহে কিছুকাল থাকিয়া স্ত্রীলোকের গর্ভে নীত হইয়া সেইখানেই মাতৃভুক্তানুসারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গর্ভে কি প্রকারে জীব দেহাকারে পরিণত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা গর্ভোপনিষদে বর্ণিত আছে :—

"ঋতুকালে সম্প্রযোগাদেক রাত্রোষিতং কললং ভবতি, সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্বুদং, অর্দ্ধ-মাসাভ্যন্তরে পিণ্ডং মাসাভ্যন্তরে কঠিনং, মাস-দ্বয়েন শিরঃ, মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশঃ, চতুর্থে গুল্ফ জঠর কটিপ্রদেশাঃ, পঞ্চমে পৃষ্ঠবংশঃ, ষষ্ঠে মুখ নাসিকাক্ষি শ্রোত্রাণি, সপ্তমে জীবনেন সংযুক্তঃ, অষ্টমে সর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণঃ পিতুরেতো হতিরেকাৎ পুরুষঃ মাতুরেতোঽতি রেকাৎ স্ত্রী, উভয়োর্বীজ তুল্যত্বান্ন পুংসকং ব্যাকুলিত মন সোঽন্ধাঃ খঞ্জাঃ কুব্জা বাসনা ভবন্তি। অন্যোহন্য বায়ু পরিপীড়িত শুক্রদ্বৈবিধ্যাদ্ দ্বিধা তনুঃ স্যাদ্ যুগ্মাঃ প্রজায়ন্তে। পঞ্চাত্মকঃ সমর্থঃ পঞ্চাত্মিকা-চেতসা বুদ্ধির্গন্ধরসাদি জ্ঞানাক্ষরাক্ষরমোঙ্কারং চিন্তয়তীতি তদেকাক্ষরং জ্ঞাত্বাষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ শরীরে তস্যৈব দেহিনঃ (এই দেহে প্রকৃতি, মহত্তত্ব (বুদ্ধি) অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চস্থূলভূত এবং মন—এই ষোড়শ পদার্থ বিদ্যমান আছে।

অথ মাত্রাশিত পীত নাড়ী সূত্রগতেন প্রাণ—আপ্যায়তে।

অথ নবমে মাসি সর্ব্ব লক্ষণ জ্ঞান সম্পূর্ণো-ভবতি, পূর্ব্ব জাতিং স্মরতি, শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম-বিন্দতি॥

যে নাড়ী গর্ভস্থ শিশুর নাভি হইতে মাতার হৃদয় পর্য্যন্ত যুক্ত আছে, তাহা দ্বারা মাতার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের রস গ্রহণ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ আপ্যায়িত হয়। অনন্তর নবম মাসে গর্ভস্থ সন্তান সর্ব্বলক্ষণ ও সর্ব্ব জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করে এবং তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে!

পূর্ব্বে যোনিসহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততোময়া আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতাঃ নানাবিধাঃ স্তনাঃ। জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ। যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ। অহো দুঃখ দধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে মহেশ্বরম্। অশুভ ক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং প্রপদ্যে নারায়ণম্। অশুভক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কং। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তং সাংখ্যং যোগমভ্যসে। অশুভ ক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কমং। যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্।

নবম মাসে শিশু এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে যে, আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্ম দর্শন করিয়াছি। তাহার পর মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু আহার ও নানাপ্রকার স্তনপান করিয়াছি। কতবার জন্মিয়াছি, কতবার মরিয়াছি, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, এই

প্রকার পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। পরিজন প্রতিপালনের জন্য কতই শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি। কিন্তু সেই সকল কর্ম্মের নিমিত্ত আমাকে একাকী দগ্ধ হইতে হইতেছে, তাহারা তো তাহার ফলভোগ করিতেছে না! অহো! এই দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। যদি একবার এই গর্ভ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভ ক্ষয়কারী মুক্তি ফলপ্রদায়ক সেই মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব। যদি একবার এই গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইতে পারি—তবে সেই অশুভ ক্ষয়কারী মুক্তি ফলদাতা নারায়ণের চরণে শরণ লইব। যদি একবার এই যোনি হইতে নির্গত হইতে পারি, তবে অশুভ বিনাশক সাংখ্য জ্ঞান এবং যোগের অভ্যাস করিব। যদি একবার যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি—তবে সর্ব্বদা সেই ব্রহ্মসনাতনকে ধ্যান করিব।

অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপীড্যমাপে মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্ট স্তদান স্মরতি জন্মমরণানিচ কর্ম্ম শুভা শুভং বিন্দতি। গর্ভোপনিষৎ।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে গর্ভস্থ শিশু গর্ভদ্বারে আসিয়া—অস্থি যন্ত্র দ্বারা অতিশয় পীড়িত হইয়া, ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্তির পর নরক হইতে নির্গত নারকীর ন্যায় গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া জন্মলাভ করে। সেই সময় বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জন্মমরণাদি বিস্মরণ হইয়া যায় এবং শুভাশুভ কর্ম্মও আর জানিতে পারে না।

আমরা এই বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বিস্মরণ হই বলিয়া আবার আমরা সংসারী জীবরূপ সংসার-প্রবাহে যাতায়াত করিতে থাকি। যে ব্যক্তি সেই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় এবং আহার শুদ্ধিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি আসিলে স্মৃতি পুনরায় উদয় হইলে যে যন্ত্রণার সংস্কার মাত্র থাকায় মৃত্যুর পর আবার সেই দুঃখে পড়িতে হইবে বলিয়া ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আইসে —সেই সংস্কারের স্থানে পূর্ণ স্মৃতি লাভ পূর্ব্বক সংসার যাতায়াতের যন্ত্রণা—মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তাহার নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া সেই ভয়েরও ভয়—অনন্তেরও অন্ত সেই অনন্তদেবের শরণাপন্ন হই। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মায়াও সরিয়া যায়। এই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড়ই কঠিন। যে ব্যক্তি সেই মায়া যাঁহা হইতে উদ্ভূত ও মায়া যাঁহার আশ্রয়—সেই শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই সেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পান, অন্যে পায় না।

রেবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

আমরা স্বয়ং জানিনা যে, কি প্রকারে আমাদের সংসারে গতাগতি হইতেছে, তাই আমরা সতর্ক হইতে পারি না। সর্ব্বদা বিষয় লিপ্ত হইয়া সেই পরমধনকে ভুলিয়া যাই। আমাদের বালকেরাও আমাদের অনুকরণে ঈশ্বর বিমুখ হইয়া পড়িতেছে এবং সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার সহিত ব্রহ্মবিদ্যা, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতেছেনা বলিয়া, তাহারা এত শীঘ্র অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সংসার জ্বালা-যন্ত্রণার দিকে—শোক দুঃখের দিকে মনকে লইয়া গিয়া মনকে কাতর করিয়া তুলিতেছে, যখন সংসারে বিষয় সুখ নাই, কেবল দুঃখময় দেখাইতে পারিব, তখন প্রকৃত সুখ কোথায়—মন তাহার সন্ধান করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে। সেই সময় যদি ভগবতত্ত্ব

মনকে উপদেশ দেওয়া যায়, মনকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, সেই পতিতপাবন অধম-তারণ দীনবন্ধু দয়াময় হরি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই—তখনই মন সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির পর পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানকে প্রেম ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেখিবে। এই সাধন—সংসারে শ্রেষ্ঠ এবং সার সাধন। এই সাধন জন্য শরীর ও মন—কষ্টের হেতু হইলেও আবার দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টারও একমাত্র উপায়। এখন এই শরীর ও মন যাহাতে বালকের সুস্থ পবিত্র ও কর্ম্মক্ষম হয়—তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল।

পঞ্চকর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি প্রয়োগের পর পথ্যাদির নিয়ম কি?

ক। স্নেহবস্তি প্রয়োগের পর স্নেহ—শরীর থেকে নির্গত হ'য়ে গেলে, যদি পূর্ব্বেই অন্ন জীর্ণ হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে সায়ংকালে লঘু অন্ন আহার ক'রাতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে ধনে ও শুঁঠের সঙ্গে সিদ্ধ করা গরম জল পান করান উচিত। উহাতে অগ্নির দীপ্তি ও আহারে রুচি হয়। বস্তি প্রয়োগের পর অতিভোজন, নিরন্তর একস্থানে থাকা, অধিক কথা বলা, যানে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ. শীত ক্রিয়া, আতপসেবন, শোক ক্রোধ প্রকাশ, অকালভোজন এবং অহিতকর দ্রব্য-ভোজন পরিত্যাগ করা উচিত।

ডাঃ। এইবার নিরূহ প্রয়োগের বিষয় বলুন।

ক। স্নেহ বস্তি ও নিরূহ প্রয়োগের নিয়ম একই, তবে পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হ'লে তবে নিরূহ প্রয়োগ ক'রতে হয়, ভুক্ত ব্যক্তিকে নিরূহ দিতে নেই। নিরূহ প্রয়োগের পর ত্রিশ মাত্রা উচ্চারণ ক'রতে যতক্ষণ সময় লাগে,—ততক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রোগীকে উঠতে বলবে। নিরূহ প্রয়োগের পর উবু হয়ে ব'সতে হয় অর্থাৎ উপবেশন করতে হয়। নিরূহ এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রত্যাগত হয়ে থাকে।

ডাঃ। বস্তি প্রয়োগ ক'রবার সময় কি রকম ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়, আর খারাপ ভাবে প্রয়োগ ক'রলে কি দোষ হয়—সে সব কথা কিছু বলা হয় নি?

ক। হয়েছে বৈকি? দোষ অনেক হয়, আর বস্তিব্যাপৎ বলবার সময় সে সকল

কথা শুন্‌তে পাবেন। এখন দুই একটা কথা ব'লছি। বস্তির নল সোজাভাবে প্রবেশ করা'তে হয়। কেননা তির্য্যকভাবে প্রবেশ করা'লে ঔষধের ধারা ভিতরে প্রবেশ করেনা। বস্তির নল চঞ্চল হ'লে গুহ্যদেশে ক্ষত হয়। বস্তিপুট আস্তে আসতে টিপলে বস্তির ঔষধ আশয় পর্য্যন্ত পঁহুছায় না। অত্যন্ত বল পূর্ব্বক টিপলে বস্তির ঔষধ কণ্ঠ পর্য্যন্ত যায়। এইজন্য বস্তির নল সরল ও স্থির ভাবে রাখবে এবং বস্তি খুব বেশী জোরেও নয় অথচ কম জোরেও নয়—এরূপ ভাবে টিপবে।

ডাঃ। স্নেহ বস্তি আর নিরূহ বস্তি প্রয়োগের পর পথ্যের নিয়ম কি এক রকম?

ক। তা' কি করে হ'বে? স্নেহবস্তি আহার করিয়ে, আর নিরূহ বস্তি আহার জীর্ণ হ'লে প্রয়োগ ক'রতে হয়। সুতরাং স্নেহ বস্তি প্রয়োগের পর স্নান ও ভোজন ক'রতে হয়। পিত্ত, কফ ও বায়ুজনিত রোগে যথাক্রমে দুগ্ধ, মুগের যূষ ও মাংসরসের সঙ্গে আহার দেবে। অথবা সমস্ত রোগেই জাঙ্গল মাংস রসের সঙ্গে পথ্য দেওয়া যেতে পারে। রোগীর দোষ ও অগ্নিবল অনুসারে নিত্য যে পরিমাণ খাওয়া অভ্যাস—তা'র ত্রিকি' অর্দ্ধেক বা তিন ভাগ পরিমাণ খাদ্য দিতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নিরূহ ঔষধ যদি শরীর থেকে না বেরিয়ে না আসে, তা' হ'লে কি অনিষ্ট হয়?

ক। হাঁ, খুব অনিষ্ট হয়। নিরূহ দ্রব্য অধিককাল শরীরের মধ্যে বদ্ধ থা'কলে গ্লানি, জ্বর—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে। সেই জন্য নিরূহদ্রব্য অধিকক্ষণ শরীরের মধ্যে থা'কলে ক্ষার, গোমূত্র এবং অম্ল সংযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূহ প্রয়োগ ক'রে সংশোধন ক'রবে।

ডাঃ। সংশোধন করবেন কি? কতকটা পেটের মধ্যে র'য়েছে, আবার কতকটা পেটে ঢুকিয়ে দেবেন?

ক। হাঁ ঢুকিয়ে দেবেন—আগেকার দেওয়া নিরূহ শুদ্ধ বার ক'রবার জন্যে। যেমন বেনো জল ঢুকে সাবেক জল বা'র ক'রে নিয়ে যায়, সেই রকম, কিম্বা যেমন কানে জল দিয়ে জল বের করার নিয়ম আছে—সেই রকম।

ডাঃ। আচ্ছা নিরূহ প্রয়োগ ভাল কি মন্দ হ'ল—বোঝবার লক্ষণ কি?

ক। নিরূহ সম্যক রূপে প্রয়োগ করা হ'লে শরীর বেশ লঘু হয়, আর মল, পিত্ত, কফ ও বায়ু ক্রমান্তরে নির্গত হ'য়ে থাকে। নিরূহের অতি প্রয়োগ হইলে, অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইরূপ ঘটে। আর অসম্যক প্রয়োগ হ'লে বেগ অল্প হয়, মল ও বায়ু কম নির্গত হয় এবং মূত্ররোধ, অরুচি ও শরীরের জড়তা জন্মায়।

ডাঃ। নিরূহের মাত্রা সম্বন্ধে কি স্বতন্ত্র নিয়ম আছে, না স্নেহবস্তির মত মাত্রা দিতে হয়?

ক। না, স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। পিত্ত প্রধান রোগে কষায়ের মাত্রা পাঁচ ভাগ, স্নেহ এক ভাগ। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকলেও এই রকম মাত্রা। বায়ু প্রধান রোগে কষায়ের মাত্রা আট ভাগ, আর স্নেহ এক ভাগ। এক বৎসর বয়স্ক শিশুর নিরূহের মাত্রা আট তোলা। দ্বিতীয় বৎসর থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর আট তোলা মাত্রা বৃদ্ধি ক'রতে হয়, অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর ১৬ তোলা, তৃতীয় বৎসর

২৪ তোলা, চতুর্থ বৎসর ৩২ তোলা এইরূপ। দ্বাদশ বৎসর থেকে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১৬ তোলা ক'রে মাত্রা বৃদ্ধি ক'রতে হয়। আঠার বৎসর থেকে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মেই নিরূহ প্রয়োগ ক'রতে হয়। সত্তর বৎসরের পর যোল বৎসর বয়সে যেরূপ মাত্রা আছে—সেই রকম মাত্রায় দিতে হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের নিরূহের মাত্রা দুইপল এবং নিরূহ দ্রব্য মৃদুবীর্য্য হওয়া উচিত।

ডাঃ। এ রকম মাত্রায় নিরূহ দিলে বোধ হয় এক নিরূহেই রোগীর দফা শেষ হয়। কেননা আঠার বৎসর বয়সে চার সের বত্রিশ তোলা নিরূহ দিতে হবে। তা'রপর শিশুদের নিরূহের মাত্রা একবার বলা হল যে প্রথম বৎসর ৮ তোলা তা'রপর প্রতি বৎসর আট তোলা বাড়া'তে হবে। তা'রপর বলা হল যে শিশুদের মাত্রা ষোল তোলা! এতে বুঝব কি?

ক। বুঝবেন সবই, কিন্তু ক্রমশঃ। শাস্ত্রে বলে যে "শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম" অর্থাৎ ধীরে ধীরে পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে হয়। তা' আপনি কি আয়ুর্ব্বেদের পঞ্চকর্ম্মরূপ এই মহাপর্ব্বত একেবারেই লঙ্ঘন ক'রতে চান? সবুর করুন—সবুরে মেওয়া ফলে। আপনার আপত্তি আমি খণ্ডন ক'রছি। আপনার প্রথম কথা এই যে, মাত্রা বড় বেশী। পূর্ব্বে ঔষধাদির মাত্রা যেরূপ ছিল, এখনকার লোকে যে সেরূপ মাত্রা সহ্য করতে পারে না—সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। খাবার ওষুদ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম; বস্তি প্রয়োগের ঔষধেরও সেইরূপ নিয়ম। আরও একটা কথা,—দেখুন, শাস্ত্রকার বলেছেন যে, সত্তর বৎসর বয়সের পর ষোল বৎসর বয়সের মত মাত্রা প্রয়োগ ক'রতে হ'বে। কিন্তু এখন সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত কম লোকেই বাঁচে। আগে লোকের একশত বা একশত কুড়িবৎসর পরমায়ু ছিল, আর সেই হিসাবে সত্তর বৎসরের পর লোকে প্রকৃত বৃদ্ধ হতো। বেশী দিনের কথা নহে—খনার বচনেও "নর গজা বিশে শয়" অর্থাৎ নর ও গজ একশত কুড়ি বৎসর বাঁচে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন লোকে যখন সত্তর বৎসরের বেশী বাঁচে না, তখন ৫০ বা ৬০ বৎসর বয়সের আগে বৃদ্ধ হয় এরূপ মীমাংসা করা উচিত। আর তা' ব'লে সত্তর বৎসর বয়সে যে পরিমাণ বস্তি দ্রব্য প্রয়োগ ক'রবার নিয়ম, এখন পঞ্চাশ বৎসরেই সেই রকম প্রয়োগ ক'রতে হ'বে,—তাও কম মাত্রায়, কেননা এখনকার লোক অল্পপ্রাণ। তারপর আপনার দ্বিতীয় কথা—শিশুদের মাত্রা সম্বন্ধে। এখন দেখুন শিশুকাল কত দিন? সকল শিশু সম্যক বলশালী হয় না, সকল শিশুর দেহ সমান ভাবে পবিবর্দ্ধিত হয় না? এ সব বিষয় বিচার ক'রতে হ'লে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন। কোনমতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শৈশব অবস্থা, তাই যদি হয়, তা'হ'লে দুই বৎসরের শিশুকে যে পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নয় বৎসরের শিশুকে কি সেই প্রমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা সঙ্গত? কাজেই শিশুদের একটা সাধারণ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট ক'রে তা'রপর বলা হয়েছে যে, শিশুর বয়স, অগ্নিবল, দেহের, পরিমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি পূর্ব্বে বলেছিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে রেক্‌টাল ফিডিং (Rectal feeding) আছে। সে কি এই বস্তি না আর কিছু?

ক। না আর কিছু নয়, এই বস্তিই বটে।

ডাঃ। তা বস্তিটী রেকফিডিং হ'ল কি করে?

ক। রেকট্যাল ফিডিং মানে মলদ্বার দিয়ে খাওয়ান বা পুষ্টিকর পদার্থ মলদ্বার দিয়ে শরীরে প্রবেশ করান। পূর্ব্বে ব'লেছি যে, বৃংহণ বস্তি আছে। বৃংহণ মানে পুষ্টিজনক। যে বস্তি প্রয়োগে শরীরের পুষ্টি হয়, সে বস্তি কি মলদ্বার দিয়ে খাওয়ান নয়? একটা বস্তি দ্বারা প্রযুজ্য ঔষধের নমুনা দেখুন। ছাগমাংস ৬৷৹ সওয়া ছয় সের, আট গুণ জলে সিদ্ধ ক'রে চতুর্থ ভাগ থাকতে নামাবে। তার পর এক পোয়া তৈল ও এক পোয়া ঘৃত দিয়ে সাঁতলে নেবে। এই মাংসরস, দধি ও দাড়িমের রসের দ্বারা অম্লীকৃত এবং সৈন্ধব লবণ ও মদন ফলের কল্ক মিশ্রিত করে তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করবে। এই বস্তি বল, বর্ণ, মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক এবং আন্ধ্য ও শিরোরোগ নাশক। এখন বিবেচনা করে দেখুন, এই বস্তির উদ্দেশ্য মলদ্বার দিয়ে পুষ্টিকর দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করান নহে কি?

ডাঃ। প্রকারান্তরে এটা রেকট্যাল ফিডিং বটে, কিন্তু আমরা যে রকম স্থলে রেকট্যাল ফিডিং করি, সে রকম নয়। এই মনে করুন, হিক্কা রোগে রোগীকে মুখ দিয়ে খাওয়ানো যাচ্ছেনা, তাকে মলদ্বার দিয়ে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এ সে রকম নয়।

ক। না, সেরকম নয়। তবে সে রকম না হোলেও মলদ্বার দিয়ে যে পুষ্টিকর পদার্থ প্রবেশ করান যেতে পারে, এবং আয়ুর্ব্বেদ কারগণের যে সে সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল এর দ্বারা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়? আর তাই যদি ছিল— তা' হ'লে যে সকল রোগীকে মুখ দিয়ে খাওয়ান যায় না, অথচ আহারাভাবে মারা যাচ্ছে, তাদের যে মল দ্বার দিয়ে খাওয়ান হত না এমন কথা বলা যায় না, তবে এসম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ এখন দিতে পারছিনে।

ডাঃ। কথাটা বলেছেন মন্দ নয়। তবে যখন বিশিষ্ট প্রমাণ নেই, তখন জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। এখন বস্তি সম্বন্ধে যদি সব কথা বলা হয়ে থাকে, তা' হ'লে তা'র পর কি করতে হয় বলুন।

ক। বস্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তবে আর পুঁথি বাড়িয়ে কাজ নেই। কিন্তু বস্তির পর কি ক'রতে হয় তা' বল'বার আগে উত্তর বস্তির কথা বলে নেই।

ডাঃ। হাঁ তাই বলুন ওটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

ক। পুরুষকে উত্তর বস্তি দিতে হ'লে রোগীর আঙ্গুলের চৌদ্দ আঙ্গুল পরিমাণ নল প্রস্তুত ক'রতে হয়, মালতী ফুলের বোঁটার আগার মত সূক্ষ্ম এক একটি সর্ষপ নির্গত হ'তে পারে এরূপ ছিদ্র বিশিষ্ট হবে। কেহ কেহ বলেন যে, লিঙ্গের সমান পরিমাণ নল প্রস্তুত ক'রতে হ'বে। নল স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মসৃণ হওয়া আবশ্যক। বস্তি দ্বারা প্রযুজ্য স্নেহ পদার্থের পরিমাণ আট তোলা। কিন্তু আট তোলা পূর্ণ মাত্রা, পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা কম বয়স হ'লে বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা কম ক'রতে হ'বে।

উত্তর বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদ প্রদান করে ঘৃত ও দুগ্ধ সংযোগে যথা শক্তি যবাগু পান করাবে। পরে রোগীকে জানু তুল্য উচ্চ সমান আসনে বসিয়ে বস্তি ও মস্তকের তালুদেশ উষ্ণ তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করাবে। অনন্তর শলাকা দ্বারা

লিঙ্গের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে পরে ঘৃতাভ্যক্ত বস্তি নল ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ প্রবিষ্ট করাবে এবং বস্তি প্রয়োগ করে নলটী ধীরে ধীরে বার ক'রে নেবে।

বস্তি দ্বারা প্রযুক্ত স্নেহ প্রত্যাগত হোলে অপরাহ্ন কালে দুগ্ধ, মুগের যূষ, বা মাংসের যূষ আহার করতে দেবে। এই রূপ নিয়মে তিন চার বার বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। তবে উপর্য্যুপরি না দিয়ে স্নেহ বস্তির ন্যায় এক দিন অন্তর দিতে হয়।

ডাঃ। স্ত্রীলোকদেরও কি এই নিয়মে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করতে হয়?

ক। স্ত্রীলোকদের অপত্য পথে চার অঙ্গুলি এবং মূত্রপথে দুই অঙ্গুলি বস্তি নল প্রয়োগ করতে হয়। বালিকাদের মূত্রপথে এক অঙ্গুলি পরিমাণ। স্নেহ পদার্থের মাত্রা রোগীর হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ। স্ত্রীলোকদের উত্তর বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে উত্তান (চিৎ) ভাবে শুইয়ে জানুদেশ ঊর্দ্ধদিকে রেখে বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। গর্ভাশয় শোধনের জন্য স্নেহ পদার্থের মাত্রা দুই অঞ্জলি। উত্তর বস্তি প্রয়োগ করলে যদি স্নেহপদার্থ নির্গত না হয়, তা' হ'লে পুনর্ব্বার শোধনীয় ঔষধ সংযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করবে, কিম্বা শোধনদ্রব্য সংযুক্ত বস্তি মলদ্বারে প্রয়োগ করবে। ইহাতে মলের বেগ উপস্থিত হ'লে স্নেহ নির্গত হতে পারে। অথবা বস্তি মার্গে এষণী নামক যন্ত্র প্রয়োগ করবে। কিম্বা মুষ্টি দ্বারা নাভির অধোভাগে পীড়ন ক'রবে। কিম্বা সোঁদাল পাতা, নিসিন্দার রস, গোমূত্র ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে বয়স ভেদে মুগ, এলাচ, জীরা, সর্ষপের ন্যায় বেধ বিশিষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করে প্রয়োগ করবে। অপত্যমার্গে চার অঙ্গুলি বস্তি প্রয়োগ করতে হয়।

বস্তিদেশে দাহ জন্মালে, যষ্টিমধুর শীতল ক্বাথে মধু ও চিনি মিশ্রিত করে অথবা ক্ষীরী বৃক্ষের (যে সকল বৃক্ষের আটা আছে) বটাদি ক্বাথ শীতল দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করে, তদ্দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করবে।

ডাঃ। উত্তর বস্তি কোন্ কোন্ রোগে প্রয়োগ করা হয়?

ক। আর্ত্তব দূষিত হ'লে কিম্বা অসময়ে আর্ত্তব দর্শন বা আর্ত্তব নাশ হলে, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, যোনি রোগ, অপরা (ফুল) না পড়া, শুক্র নির্গমন, শর্করা, পাথরী, বস্তি, কুঁচকি বা লিঙ্গে শূলবদ্ বেদনা এবং মেহ ব্যতীত বস্তি জাত অন্যান্য ঘোরতর রোগ সকল উত্তর বস্তি দ্বারা প্রশমিত হয়। এই উত্তর বস্তির সম্যক প্রয়োগের লক্ষণ; ব্যাপৎ এবং তাহার চিকিৎসা স্নেহ বস্তির ন্যায়।

ডাঃ। এইবার কি ব্যাপদের কথা বলবেন নাকি?

ক। না আগে পঞ্চকর্ম্ম শেষ হোক তারপর ব্যাপদের কথা বলব।

ডাঃ। এইবার কোন্ কর্ম্ম?

ক। এইবার নস্য। বমন-বিরেচন অনু-বাসন ও নিরূহ প্রয়োগ ক'রে শরীর শুদ্ধ হ'লে পর রোগীর মস্তকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রবে। তা'রপর রোগের বল বিবেচনা ক'রে একবার, দুইবার বা তিনবার নস্য প্রয়োগ ক'রে শিরো বিরেচন ক'রবে। শিরোবিরেচন সম্যকরূপে প্রযুক্ত হ'লে হৃদয়, মস্তক ও ইন্দ্রিয় সকল লঘু হয় এবং স্রোতসকল বিশুদ্ধ হয়। আর মস্তক অতি বিরেচিত হলে মস্তক, চক্ষু, শঙ্খদেশে ও কর্ণে বিবিধ পীড়া সূচীবেধবদ্ বেদনা এবং চক্ষুতে অন্ধকার দেখা এই সকল

লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ ঘ'টলে রোগীকে স্নেহ পান করিয়ে মৃদু তর্পণ প্রয়োগ করবে।

ডাঃ। আচ্ছা নস্যমাত্রকেই কি শিরোবিরেচন বলে ?

ক। না, নস্যের কথা এইবার বলছি, যা ব'ললাম—এটা হ'ল বস্তি প্রয়োগের পর শিরোবিরেচনের নিয়ম।

নস্য কর্ম্ম, পাঁচ প্রকার, যথা, প্রতিমর্ষ, অবপীড়, নস্য, প্রধমন ও শিরোবিরেচন। তন্মধ্যে স্নেহ দ্রব্য নাসাপুটের দ্বারা উর্দ্ধে আকর্ষণ ক'রে গলদেশ দিয়ে বহির্গত ক'রলে তা'কে প্রতিমর্ষ নস্য বলে। প্রতিমর্ষ নস্য দুই অঙ্গুলীতে লইয়া সকল ঋতুতেই দিবারাত্রি সকল সময়ই নাসাপুটে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু উর্দ্ধশ্বাসে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। ইহা দ্বারা সুস্থ ব্যক্তিদিগের দন্ত, শিরঃ, কপালাদি দৃঢ় হয়। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, আহারান্তে এবং নিদ্রা, পর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, মস্তকে তৈলাদি মর্দ্দন, গণ্ডূষ ধারণ, মূত্রত্যাগ, অঞ্জন ধারণ; দাঁতন করা এবং হাসি অন্তে দুই বিন্দু পরিমাণ প্রতিমর্ষ নস্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অবপীড়নস্য দুই রকম, শোষণ ও স্তম্ভন। কোনো বস্তু অবপীড়ন ক'রে (টিপে) তা'থেকে রস নিয়ে যে নস্য লওয়া যায়, তা'কে অবপীড় নস্য বলে।

নস্য—স্নেহ শূন্য মস্তককে স্নিগ্ধ ক'রবার জন্য এবং গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বলাধানের জন্য নাসিকা দ্বারা যে স্নেহ প্রয়োগ করা যায়, তার নাম নস্য। এই নস্যের মাত্রা ত্রিবিধ, প্রথম মাত্রা আট বিন্দু, দ্বিতীয় মাত্রা ৩২ বিন্দু এবং তৃতীয় মাত্রা ৬৪ বিন্দু। বলানুসারে ভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ ক'রতে হয়। বায়ু ও কফে তৈল, কেবল বায়ুতে চর্ব্বি, পিত্তে ঘৃত এবং বাতপিত্তে মজ্জার দ্বারা নস্য প্রয়োগ হিতকর।

ছয় অঙ্গুল পরিমিত দুই মুখ বিশিষ্ট নলের মধ্যে ঔষধ রেখে এক মুখে ফুঁদিয়ে মুখ দ্বারা নাসিকার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করাকে প্রশমন নস্য বলে। প্রশমন নস্য সূক্ষ্মতা বশতঃ স্রোতঃ সমূহে প্রবেশ ক'রে বহু দোষের নিঃসরণ করে। আর শিরোবিরেচক দ্রব্য দ্বারা অথবা শিরোবিরেচক দ্রব্য সাধিত স্নেহ দ্বারা যে নস্য প্রয়োগ করা যায়, তাকে শিরোবিরেচন বলে। আবার এই পাঁচ প্রকার নস্যকে স্নেহ এবং শিরোবিরেচন এই দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তন্মধ্যে নস্যের ভাগ প্রতিমর্ষ আর শিরোবিরেচনের অবপীড় ও প্রশমন।

নস্য যে জন্য প্রয়োগ করিতে বলা হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য এবং দৃষ্টি প্রসন্ন করিবার জন্য মস্তক বায়ু কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, দন্ত কেশ ও শ্মশ্রু পতিত হইতে থাকিলে কর্ণশূল ও ক্ষেড় রোগে, তিমির নামক চক্ষুঃ রোগে, স্বরভেদ; নাসারোগ, মুখ শোষ আমরাচ্ছয়া নামক বাতব্যাধি. অকাল বলিপলিত দরুণ বাতপৈত্তিক রোগ, মুখরোগ এবং অন্যান্য বিবিধ রোগে বাত পিত্ত নাশক দ্রব্যসহ স্নেহ পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে।

আর তালু কণ্ঠ ও মস্তক শ্লেষ্মা দ্বারা ব্যাপ্ত হ'লে, অরুচি, মাথাভার, মাথা কামড়ানী পীনস (নাসা রোগ বিশেষ), আধকপালে, ক্রিমি, প্রতিশ্যায় (নাকমুখ দিয়া জলস্রাব), মৃগী, উর্দ্ধগত রোগে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নস্য কি সকলকেই প্রয়োগ ক'রতে পারা যায়।

ক। আহারের পর, উপবাসের পর, তরুণ প্রতিশ্যায় রোগী; গর্ভবতী স্ত্রী, যে

ব্যক্তি স্নেহ পান ক'রেছে, যে ব্যক্তি জল, মদ্য বা দ্রবদ্রব্য পান করেছে, অজীর্ণ রোগী. যা'কে বস্তি প্রয়োগ করা হ'য়েছে, ক্রুদ্ধ, সংযোগ বিষাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শোকাতুর, পরিশ্রান্ত, বালক, বৃদ্ধ, যে ব্যক্তি মল মূত্রের বেগ ধারণ ক'রেছে. যে ব্যক্তি মস্তক ধৌত করেছে—এই সকল ব্যক্তিকে কদাচ নস্য প্রয়োগ ক'রবে না। আর অকালে মেঘোদয় হ'লে নস্য ও ধূম প্রয়োগ উভয়ই নিষিদ্ধ।

ডাঃ। এই বল্লেন বস্তি কার্য্যের পর নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়, আবার বলছেন, যে, বস্তি দেওয়া হ'লে নস্য প্রয়োগ করবে না। আর যদি কেউ এক ঢোক জল কি দুধ খায়, তা'কে নস্য দিলেই বা কি দোষ হয়।

ক। বস্তিকার্য্যের পরেই নস্য দিতে হয়। কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে যে, যে দিন বস্তি দেওয়া হবে, সেইদিন নস্য প্রয়োগ করবে না। বস্তি প্রয়োগের রোগী সবল হ'লে নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়। আর এক ঢোক জল খাওয়া যে বল্লেন, ওটা এক তণ্ডুল ন্যায় অগ্রাহ্য। অর্থাৎ একটী তণ্ডুল খেলে যেমন সে আহার ক'রেছে এ কথা বলা যায় না. সেইরূপ একটু আধটু জল খেলে, সে জল খেয়েছে ও কথা বলা যায় না।

ডাঃ। আয়ুর্ব্বেদ প'ড়তে হ'লে দর্শনশাস্ত্র জানার দরকার দেখছি। এখন কি নিয়মে নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয় বলুন।

ক। মলমূত্র পরিত্যাগ এবং মুখধোতাদি ক'রে মস্তকে স্নেহ-মালিষ ক'রে ও সেঁক দিয়ে রোগীকে বায়ু প্রবাহহীন স্থলে শয়ন করাতে হ'বে। তার পর কণ্ঠার উর্দ্ধদেশে পুনরায় সেঁক দিয়ে পা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এবং মাথা কিছু নীচু ক'রে রাখতে হবে। তারপর গরম জলের বাষ্প দ্বারা নস্য উত্তপ্ত ক'রে এক নাসাপুট রুদ্ধ রেখে অন্য নাসা পুটে নল বা তুলি দ্বারা নস্য প্রয়োগ ক'রবে। পরে সেই নাসাপুট রুদ্ধ করে অন্য নাসায় প্রয়োগ ক'রবে। তার পর রোগীর পদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণ মর্দ্দন ক'রবে। রোগী নাক দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে নস্য টেনে মুখ দিয়ে বার ক'রে ফেলবে। যতক্ষণ সমস্ত ঔষধ বেরিয়া না যায়, ততক্ষণ এইরূপ ক'রতে হ'বে। এইরূপ ভাবে দুই তিনবার নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

নস্য অসম্যক প্রয়োগের ফলে যদি রোগী মূর্চ্ছা যায়, তা'হলে মস্তক বাদ দিয়ে শরীরে শীতল জল সেচন করবে।

ডাঃ। নস্য কি নিত্য প্রয়োগ করতে হয়? আর কতদিনই বা প্রয়োগ করা উচিত?

ক। স্নৈহিক নস্য প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর প্রয়োগ ক'রতে হয়। এইরূপে সাত দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার শিরোবিরেচনও একদিন অন্তর প্রয়োগ ক'রতে হয়। একদিন স্নেহ নস্য তা'র পর দিন শিরোবিরেচন নস্য এইরূপ ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার অবস্থা ভেদে দুদিন অন্তরও প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, এইরূপ ব্যক্তিকে স্নৈহিক নস্য এবং এইরূপ ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করবে, কিন্তু এখন বলছেন যে, দুই রূপ ক'রতে হবে।

ক। সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। আবশ্যক না হ'লে দু'রকম দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবশ্যক হ'লে দুরকমও দেওয়া যায়। এই মনে করুন, মস্তক অতি স্নিগ্ধ হলে বিরেচন নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার শিরোবিরেচনে মস্তক শূন্য, রুক্ষ ও দুর্ব্বল হ'লে

স্নৈহিক নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নস্য প্রয়োগের পর কি করতে হয় বলুন?

ক। নস্য প্রয়োগের পর রোগীর মস্তকে পুনরায় স্বেদ প্রদান ক'রতে হয়। তারপর নস্য স্নেহ বা'র ক'রে ফেলবার জন্যে রোগী বার বার শ্লেষ্মার সহিত স্নেহ আকর্ষণ ক'রে নাক ঝেড়ে ফেলবে। শিরোবিরেচনের পর মস্তক শূন্য হয়ে যায়। রোগী এই অবস্থায় যে দোষ প্রকোপক খাদ্য আহার করে, যাহা সেই দোষ কুপিত হয়ে মস্তক আশ্রয় ক'রে বহু রোগ উৎপন্ন ক'রতে পারে। এই জন্য শিরোবিরেচনের পর সুপথ্য সেবন করা কর্ত্তব্য। শিরোবিরেচন প্রয়োগ করবার সময় স্নেহ যেন চক্ষুতে না পড়ে, এরূপ ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়,আর চক্ষু বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা ভাল।

ডাঃ। আচ্ছা নস্যের অযোগ অতিযোগ হলে কি হয়?

ক। সম্যক যোগ হ'লে মস্তকের লঘুতা, সুনিদ্রা, সুখ জাগরণ; রোগের উপশম, ইন্দ্রিয় সমূহের বিশুদ্ধি এবং মনের সুখ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তক অতিস্নিগ্ধ হ'লে মস্তকের গুরুতা ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম এই সকল উপসর্গ ঘটে। আর অসম্যক যোগ হ'লে ইন্দ্রিয়গণের বিগুণতা, রুক্ষতা ও রোগের অপশম হয়। মস্তক অতিস্নিগ্ধ হ'লে রুক্ষ ক্রিয়া ক'রতে হয়, আর অসম্যক প্রয়োগ হ'লে পুনর্ব্বার আবশ্যক মত নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। এইবার ধূম পানের বিষয় বলুন।

ক। ধূম পাঁচ প্রকার, যথা প্রায়োগিক, স্নৈহিক, বৈরেচনিক, কাসহর ও বামন। মতান্তরে প্রায়োগিক, স্নৈহিক ও বৈরেচনিক ভেদে ধূম তিন প্রকার বলা হয়েছে। এই মতে কাসহর ধূম প্রায়োগিকের এবং বামনধূম বৈরেচনিকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রায়োগিক ধূম নিত্য ব্যবহার্য্য। এই ধূমপানের প্রথা পূর্ব্বে যে প্রচলিত ছিল, সেটা কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ক'রলে জানা যায়। এলাচ, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, বালা, ধুনা, অগুরু, কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্রব্য উত্তমরূপে বেটে একটী বার অঙ্গুলি প্রমাণ শরকাণ্ড আট অঙ্গুলি রেশমী কাপড় জড়িয়ে তার ওপর লেপ দেবে। লেপ যবের ন্যায় মধ্যে স্থূল এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মোটা হওয়া উচিত। লেপ শুষ্ক হলে শরকাণ্ড বারকরে নিয়ে সেই বর্ত্তির ধূম পান করাকে প্রায়োগিক বলে। আর বহেড়ায় মজ্জা, মোম ধূনা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত ঘৃতাদি স্নেহ মিশ্রিত ক'রে বর্ত্তি প্রস্তুত ক'রলে তাকে স্নেহস ধূম বলে। আপাং, সজিনা বীজ, পিঁপুল প্রভৃতি শিরোবিরেচক দ্রব্যের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত ক'রে ধূমপান ক'রলে তাকে বৈরেচন ধূম বলা যায়। বৃহতী, কণ্টকারী, হিং, কাকড়াশৃঙ্গী প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করে ধূমপান করলে তাকে কাসঘ্ন ধূম বলে। আর পশুর খুর, শিং, কাঁকড়ার খোলা, শুষ্ক মাংস প্রভৃতির দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত ক'রলে তাকে বামন অর্থাৎ বমনকারক ধূম বলে।

ডাঃ। ধূমপান ক'রতে হয় কি করে?

ক। পাইপ চাই, তবে পাইপটি একটু দীর্ঘ। প্রায়োগিক ধূমপানের নল দেড় হাত, স্নৈহিক ধূমপানের নল বত্রিশ আঙ্গুল,বৈরেচনিক ধূমপানের নল ষোল আঙ্গুল এবং বামন ধূম পানের নল দশ আঙ্গুল হওয়া উচিত। স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য দিয়ে বস্তির নল প্রস্তুত করবার কথা বলা হয়েছে,

ধূমপানের নলও সেই সমস্ত দ্রব্য দিয়ে প্রস্তুত ক'রতে হয়। নলের অগ্রভাগে একটী কুলের আঁটি যেতে পারে, এমন ছিদ্রযুক্ত হবে, আর গোড়ার দিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ যোগ্য ছিদ্র থাকবে। নলটী ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ হবে।

ডাঃ। ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ কি?

ক। ঋজু কিনা সোজা—আর ত্রিভঙ্গ কিনা—তিন জায়গায় বাঁকা, যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি, অর্থাৎ নলের গঠন শ্রীকৃষ্ণের মত হবে।

ডাঃ। হেয়ালি ছাড়ুন মশায়, ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ কি—সেটা স্পষ্ট করে বলুন।

ক। স্পষ্ট করে বলতে পারছিনে বলেই এই হেয়ালী ধরেছি। যদি অপর লোক হ'ত তা'হলে যা হয় ক'রে বুঝিয়ে দিতাম। কিন্তু সত্য কথা ব'লতে হ'লে নিজেই যখন বুঝিনে তখন বোঝাব কি। অবশ্য আমি এই সত্য কথা বললাম ব'লে অনেক লম্বসাটপটাবৃত কবিরাজ আমাকে গালি দেবেন এবং তাঁহাদের মতে এই সহজবোধ্য কথাটা আমি বুঝতে পারিনি ব'লে আমায় লম্বকর্ণ ব'লে উপাধিও দিতে পারেন। আজকালকার দিনে এই রকমই ঘটেছে। যে যত মূর্খ, তার তত আস্ফালন বেশী। এই ফরফরায়মান সফরীদের জালায় অস্থির হ'তে হয়েছে। আপনার কাছে একটা সত্য কথা ব'লে যতই গালাগালি খাই না কে'ন, কিন্তু একটা আত্মপ্রসাদ জন্মেছে।

কথাটা একটু স্পষ্ট করে আপনাকে বলছি. মূলে আছে "ঋজু ত্রিকোষ ফলিতং" অর্থাৎ নলটা তামাক খাবার পাইপে যেমন কোষ থাকে, সেই রকম তিনটে কোষ থাকবে। কিন্তু সবটা ঋজু যদি হয়, তবে তিনটে কোষ থাকার সার্থকতা কি? ধূমতো কোষে প্রবেশ না করে বরাবর সোজা চলে যাবে।

ডাঃ। যাক মোটামুটি এক রকম বোঝা গেল, এখন ধূমপান করবার নিয়ম কি বলুন।

ক। রোগী প্রসন্নচিত্ত এবং সাবধান হয়ে নীচু দিকে দৃষ্টি সম্বদ্ধ রেখে স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশন ক'রে ধূমপান করবে। স্নেহাক্ত বর্ত্তির অগ্রভাগে আগুন ধরিয়ে নলের ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে ধূমপান করতে হয়। প্রথম মুখ দিয়ে ধূমপান করে পরে নাক দিয়া পান ক'রতে হয়। মুখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে ধূমপান করে যথাক্রমে মুখ ও নাক দিয়েই ধূম পরিত্যাগ করা উচিত। মুখ দিয়ে ধূমপান করে কদাচ নাক দিয়ে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ তাতে দৃষ্টিশক্তির হানি হয়ে থাকে। প্রায়োগিক ধূম নাসিকা দ্বারা, স্নেহস ধূম মুখ ও নাসিকা দ্বারা বৈরেচন ধূম নাসিকা এবং কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূম মুখ দিয়ে পান করাই বিধি। আবার বক্ষ ও কণ্ঠগত রোগে মুখ দ্বারা এবং মস্তক, নাসিকা ও চক্ষুগত রোগে নাসিকা দ্বারা ধূমপান করা উচিত। প্রায়োগিক ধূমপানের বস্তি থেকে শরকাণ্ড ঘুচলে রৌদ্র ও বায়ু প্রবাহ হীন স্থানে শুষ্ক করতে হয়। তারপর আগুন ধরিয়ে নলে বসিয়ে ধূমপান করতে হয়। স্নেহস এবং বৈরেচন ধূমপানের এইরূপ নিয়ম। আর কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূম পান করতে হলে একখানি শরায় কাঠ কয়লার নির্ধূম আগুন রেখে তাইতে বর্ত্তি দিতে হবে। সেই শরার উপর আর এক ছিদ্রযুক্ত শরা ঢাকা দিয়ে সেই ছিদ্রমুখে নল সংলগ্ন করে ধূমপান করতে হবে। যতদিন শরীর নির্দ্দোষ না হয়, তত দিন ধূমপান করা উচিত।

ডাঃ। ধূম কি যখন তখন পান করা যায়

না নির্দ্দিষ্ট সময় আছে।

ক। সময় নির্দ্দিষ্ট আছে বৈকি। মূত্র ত্যাগ, মলত্যাগ, হাঁচি শোষ, এবং মৈথুনের পরে স্নেহ ধূম, স্বেদ, বমন ও দিবানিদ্রার পর বিরেচন ধূম দন্ত প্রক্ষালন নস্য গ্রহণ, স্নান, ভোজন ও শস্ত্রকার্য্যের পর প্রায়োগিক ধূম পান করা উচিত।

ডাঃ। আচ্ছা স্নানের পর বিরেচন ধূম আবার প্রায়োগিক ধূম দুই পান করবার কথা বলা হল কেন ?

ক। স্নানের পর দুই রকমই পান করা যেতে পারে।

ডাঃ। অন্য সময়ে ধূমপান করলে কি দোষ হয় ?

ক। অকালে ধূমপান করলে ভ্রম, মূর্চ্ছা শিরোরোগ এবং কর্ণ ও জিহ্বা প্রভৃতির অনিষ্ট হয়ে থাকে।

ডাঃ। ধূম কি সকলেই পান করতে পারে।

ক। না, শোক পরিশ্রম, ভয়, ক্রোধ, উষ্ণতা, বিষ, রক্তপিত্ত, মদরোগ, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, পাণ্ডুরোগ, তালুশোষ, বমি, মস্তকে আঘাত, উদ্গার, উপবাস, তিমির (চক্ষু রোগ বিশেষ) মেহ, উদরাধ্মান ও উর্দ্ধগতবাত রোগাক্রান্ত এবং বালক বৃদ্ধ দুর্ব্বল, যাহাদের বিরেচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, গর্ভিণী রুক্ষ ক্ষীণ, যাহার বক্ষস্থলে ক্ষত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মধু ঘৃত দধি দুগ্ধ মৎস্য মদ্য ও যবাগু প্রচুর পরিমাণে পান করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি অল্প কফ বিশিষ্ট তাহাদের পক্ষে ধূম পান নিষিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

বাঙ্গালার যক্ষ্মা।

বঙ্গদেশে যক্ষ্মা রোগ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। যক্ষ্মার অপর নাম ক্ষয় রোগ। রোগ মাত্রেই ক্ষয় কিন্তু যক্ষ্মায় অতি শীঘ্র দেহের ক্ষয় করিয়া থাকে বলিয়া ইহার সাধারণ নাম ক্ষয়।—যে শ্রেণীর যক্ষ্মা অতি মারাত্মক, উহার নাম রাজযক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা হইলে মানুষ হাজারদিন অর্থাৎ মোটের উপর তিন বৎসরের অধিক বাঁচেনা। রাজযক্ষ্মা ও সাধারণ যক্ষ্মায় তফাৎ অনেক, রাজযক্ষ্মার ক্ষয়কারী শক্তি যত অধিক, তেমন অপর যক্ষ্মার নহে। উহা অল্পাধিক পরিমাণে সংক্রামক,

তাই মানুষ মাত্রেই উহাকে ভয় করিয়া থাকে। রক্ত বমন ও জর ইহার প্রধান ও সাধারণ লক্ষণ, তবে রক্ত বমন হইলেই যে ক্ষয় হইবে এমন কোন কথাই বলা যায়না বাঙ্গালী অন্ন চিন্তায় জর্জ্জরীত, প্রফুল্ল চিত্ততা বাঙ্গালীর নাই, তাই যক্ষ্মা বাঙ্গালায় এত বিস্তৃতি হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদা কদর্য্য স্থানে বাস, কদর্য্যাহার প্রভৃতি দ্বারাই যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হয়। কখন কখন ম্যালেরিয়া জর হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। কাস সংযুক্ত অল্প অল্প জ্বরই যক্ষ্মার মূল চিনিবার উপায়। যাহারা অত্যধিক মৈথুনাশক্ত তাহা-দেরই যক্ষ্মারোগ হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। যক্ষ্মা রোগীর দিবা নিদ্রা বর্জ্জনীয়। নিত্য মুক্তবায়ু সেবন ও সহ্য মত প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্যবায়ু সেবন কর্ত্তব্য। রাত্রে আবদ্ধ গৃহে না থাকিয়া জানালা খুলিয়া সুবাতাস সেবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া মুক্তবায়ু সর্ব্বদা সেবন করে, তাহাদের দিকে যক্ষ্মা আর ঘেঁসিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন উপদ্রব না থাকিলেও যক্ষ্মারোগী ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে। যক্ষ্মারোগ কতিপয় বৎসরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঋষি প্রণীত নিয়মাদি রক্ষা না করিয়া আমরা হীনবল হইতেছি, তাহার উপর উদরান্নের সংস্থানের জন্য আমাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও যথোপযুক্ত আহারের অভাব বাঙ্গালার যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া লোকে ইহাকে বড় ভয় করে।

যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে মৈথুন সম্বন্ধে সতর্কতাবলম্বন বা তাহাকে বর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। যাহারা এবিষয়ে অসতর্ক, তাহারাই মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনে। বালকগণের ও অতি বৃদ্ধের প্রায় এই রোগ হইতে দেখা যায় না। যক্ষ্মারোগীদিগের কাম বাসনার উদ্রেক অত্যধিক হইয়া থাকে। এবং সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ সে সর্ব্বদাই খুঁজিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে, অন্যান্য কুপথ্য গ্রহণের জন্যও সে অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়ে। এই সকল বিষয়ে কেহ হিতোপদেশ দিলে সে তাহার কথা অগ্রাহ্য করিতে ব্যস্ত হয়।

যক্ষ্মা রোগীর অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালনের মত দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ বর্জ্জনীয়। কুপথ্যত্যাগ করিয়া অতিজনতায় বা এক স্থলে বহু লোক একত্রে শয়ন করিবে না। বহু জন নিঃশ্বাসে গৃহের শুদ্ধ বায়ুও দূষিত হইয়া পড়ে। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বদা মনকে প্রফুল্ল রাখিতে হইবে। স্ত্রী বা মৈথুন বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার চিন্তা হইতে দূরে থাকিবে। কলহ ও ক্রোধ বর্জ্জন করিবে। শোক দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মাইবেনা, অতি আহার বা অনাহার করিবে না। সর্ব্বদা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বিতল ও ত্রিতলে যাতায়াত সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। শীত বা রৌদ্র লাগাইবেনা, দূষিত মৎস্য মাংস ভোজন ও অতি মসলা সংযুক্ত দুষ্পাচ্য ব্যঞ্জনাহার এবং অধিক লঙ্কা পেঁয়াজ রসুন ভক্ষন বর্জ্জন করিতে হইবে, গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এই রোগের একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা, ভাজা পোড়া দ্রব্যাহার নিষিদ্ধ। ২৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণেরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগীই অনেক দেখা যায়।

বর্ষাকালে এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। যাহাদের পুরাতন রোগ তাহারাও বর্ষাকালে বেশী ভুগিয়া থাকে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইহার যাপ্যাবস্থা। শীতকালেও ইহার আক্রমণ কিছু কম। প্রাতরুত্থান দেহকে রোগ মুক্ত-করে, যক্ষ্মারোগে প্রাতরুত্থান অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রাত ভ্র্মণও উত্তম ব্যবস্থা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ু সেবন বড় সুপথ্য, হিমালয় প্রদেশে ধরণহর নামক স্থানে গভরমেণ্ট যক্ষ্মারোগীর বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেখানে একটী যক্ষ্মা আশ্রম করিয়াছেন, আর সংপ্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও গভরমেণ্ট একটী যক্ষ্মা চিকিৎসালয় নির্ম্মান করিয়াছেন,উহা অতি উচ্চ, অতি উচ্চস্থানে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া রোগী প্রফুল্ল চিত্ত হয়। কলিকাতায় কলের ধুম চিমণী দিয়া উপরে উঠিয়া যায় সত্য, কিন্তু সে ধুম উপরের দিকে বেশী উঠিতে না পারিয়া কিছু বিশুদ্ধ হইয়া নীচেই নামিয়া আসে। মন্দের ভাল বলিতে হইবে। অগ্ন্যুত্তাপ, ধুমসেবা—যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। পল্লীতে পল্লীতে যক্ষ্মারোগী দৃষ্ট হয়, সুতরাং যাহারা যক্ষ্মারোগী দেখিবেন, তাঁহারা যেন যক্ষ্মারোগীকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া তাহার আয়ুবৃদ্ধির সহায়তা করেন। এবং যাহাতে সেই স্থানে আর যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহারও উপায় করেন।

বংশানুক্রমে যক্ষ্মারোগ সংক্রমিত হইতে দেখা যায়, তাই অনেকে যক্ষ্মারোগীর পুত্র কন্যার সহিত নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। যাহারা যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষা করে, তাহারাও এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। যক্ষ্মারোগীর পুত্রকন্যাগণকেও সাধারণতঃ দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে যক্ষ্মার বীজাণু বিচরণ করে, অধিকন্তু যক্ষ্মারোগীর শুক্র শোণিতেও যক্ষ্মার বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে পুরুষেরই যক্ষ্মা হয় এমন নয়, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও বহুতর যক্ষ্মারোগী দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাদের জরায়ু দূষিত ও যাহারা প্রদরাদি রোগে পীড়িত, তাহারা অতি সহজেই যক্ষ্মারোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। তাহাদের স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া তাহাদের শিশুগণও যক্ষ্মারোগ গ্রস্ত হইতে পারে। তবে বাল্যকালে উহাদের রোগ প্রকাশ পায় না, উপযুক্ত বয়স হইলে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল তাহা যাপ্য হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার অনেক প্রকার প্রণালী আছে। পুরাকালে আমাদের দেশে এখনকার মত যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও দূরদর্শী ঋষিগণ এই রোগের সর্ব্বপ্রকারে আলোচনা করিয়াছিলেন। অধুনা ইউরোপীয় ডাক্তারগণ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার আলোচনা ভালই হইতেছে। শীত-প্রধান দেশেও যক্ষ্মারোগ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। তবে মরুময় প্রদেশে যক্ষ্মা-রোগ দুই রকম হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি—একদা আমি রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসারজন্য কলিকাতা যাইতেছিলাম, আমার মুখ দিয়া অধিক লালা পড়িত, আমি আমার পুত্রকে লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছি, দুইদিন গাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় পঁহুছিব, মধ্যম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে আমার

অপর সঙ্গী লোক রহিয়াছে। কোন এক জংসনে গাড়ী বদল হইল—রাত্রি তখন দশটা। এই সময় একদল মাড়োয়ারি ধনী সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহারা কলিকাতার যাত্রী, তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া কহিলেন 'বাবু তোমরা ক্যা-হুয়া।" আমি বলিলাম 'জরবি হ্যায়, লহবি গিড়তা।' তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ক্যা বাবু, যথ হ্যায়।' আমি কহিলাম 'হাঁ যথ হ্যায়।' তাহারা 'বাপরে যথ্।' বলিয়া অন্য কোন গাড়ীতে চলিয়া গেলেন! আমার গাড়ীতে একজন রাজভ্রাতা ও একটী তাঁহার একজন উচ্চ সহকারী ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই আমার পূর্ব্ব পরিচিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন আপনার যক্ষ্মা হইয়াছে বলিলেন?' আমি বলিলাম 'এই দেখুননা, ইহারা এ গাড়ীতে উঠিলে কথাবার্ত্তা কহিয়া রাত্রি ভোর করিয়া দিত, আমিতো পীড়িতই, আপনারা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিতেন না।' রাজপুতানা প্রভৃতি মরুময় প্রদেশে যক্ষ্মারোগ নাই বলিলেই হয়, তাই ইহারা যক্ষ্মারোগকে যত ভয় করে, তত আর কোন রোগকে ভয় করে না। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে বাঙ্গালীর আর রক্ষা নাই, সেই জন্য দেশের চিন্তাশীল বাঙ্গালীগণ এই রোগের হস্ত হইতে যাহাতে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা পাইতে পারে—তাহার জন্য চেষ্টাশীল হউন, ইহাই আমার বক্তব্য।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।
এম্, আর, এ, এস।

আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠা।

—:০:—

[চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিত্রকাদি গুড়িটি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও আমি সাধারণের সুবিধার জন্য উহার ফর্দ্দটি এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিতামূল, পিঁপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিং, বনযমানী ও চৈ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোঁড়া লেবুর রসে বাটিয়া দুই আনা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হয়। অম্লজনিত অতিসারে—ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

আর একটি রোগীর পরিচয় দিই। সেটি পুরুষ, বয়স ৩০। সেটির জন্য যখন আমার ডাক পড়ে, তখন তাহার অবস্থা আরও সাঙ্ঘাতিক। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ, হাতে পায়ে খাল ধরাটা খুবই বেশী। খুব অবস্থাপন্ন ঘরের রোগী হইলে—বোধ হয় রাণাঘাট শুদ্ধ ডাক্তার কবিরাজগণকে একত্র করার ব্যবস্থা হইত, কিন্তু রোগীর পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, তাহার উপর কিছু কৃপণ

স্বভাবের,—আর বোধ হয় আমার উপর একটু বিশ্বাসও ছিল—সেইজন্য আমারই হস্তে—একমাত্র পুত্রের জীবন-মরণের দায়ীত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

পরিচয় লইয়া জানিলাম—আহারাদির এমন কোনো বিশেষ গোলযোগ ঘটে নাই—যাহার জন্য তাঁহার এই ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। তখন স্থির করিলাম—সংক্রামক স্থানে অব স্থিতিই ইহার কারণ।

ইঁহার রোগও প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়—এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে।

রাণাঘাটে থাকিতে ঔষধ তৈয়ার করাটা আমার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক—সকল অধিকারেরই নানাবিধ ঔষধ নিত্য তৈয়ার হইত। এক্ষেত্রে চিত্রকাদি গুড়ি'তে কিছু হইবে না—বুঝিলাম, সেইজন্য এ রোগীকে "বিসূচিকারি রসের" ব্যবস্থা করিলাম—হাতে পায়ে থাল নিবারণের জন্য আগুণের স্বেদ দিয়া মালিশ করার উপদেশও দিলাম। বমন নিবারণের জন্য পূর্ব্ব কথিত রোগিণীকে যেরূপ ধনে, মৌরি, কর্পূর ও বড়এলাচ ভিজান জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ইঁহার জন্যও সেই ব্যবস্থা করিলাম। নাভির চারিদিকে সেই—যায়ফলের প্রলেপ—সকল ব্যবস্থাই রাখিলাম, কিন্তু কিছুই উপকার দর্শিলা না, রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমি বড়ই বিপন্ন হইলাম। ভাবিলাম—এরূপ রোগী লইয়া দুর্ণাম কেনা অপেক্ষা অন্য চিকিৎসককে ডাকিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পিতার এক আত্মীয়ের নিকট মনের কথা আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশও করিলাম। রোগীর পিতা আত্মীয়ের মুখে সে কথা শুনিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন,—আমার পুত্রের অবস্থা যাহা হয় হউক—আমি অন্য কাহাকেও ডাকিব না—উঁহারই উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর—যাহা হয় উঁহারই হাতে হইবে।

রোগীর পিতার যখন এতটা আগ্রহ—তখন আমি অন্য চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলাম।

যখন দেখিলাম দাস্ত কিছুতেই কমিতেছে না, তখন অহিফেনঘটিত "কর্পূর বটী"—কর্পূর ভিজান জলের সহ ১ ঘণ্টা অন্তর ২টি প্রয়োগ করিলাম এবং প্রসাব করাইবার জন্য 'হিমসাগর' বা 'পাথর কুচির' পাতা ও 'সোরা' একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। সেবনের জন্য 'কর্পূর বটী' ভিন্ন হিমসাগরের পাতার রস সহ বজ্রক্ষার ৩ রতি ও মকরধ্বজ ১রতি—একত্র মিশাইয়া তাহাও সেবন করার ব্যবস্থা করিলাম। এরূপ ব্যবস্থায় দেখিলাম —ক্রমশঃ উপকার হইতে লাগিল, সেইজন্য ইহার পরিবর্ত্তন না করিয়া ইহাই চালাইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ রোগী আরোগ্য হইল, আমার ভাগ্যে যশ ছিল, আমি অর্থের সহিত কিঞ্চিৎ যশোলাভও করিলাম।

শোধিত হিঙ্গুল (হিঙ্গুল পাতি লেবুর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৩দিন ৩ রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলেই শোধিত হয়) শোধিত অহিফেন (অহিফেন দুগ্ধে ভিজাইয়া শোধন করিতে হয়) মুতা, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফলকে ইন্দ্রযব বলে, ইহা বেণের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়) জায়ফল, সোহাগার খই ও কর্পূর—এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিলেই কর্পূর বটী প্রস্তুত হয়। বিসূচিকা

ভিন্ন প্রবল অতিসার ও গ্রহণী রোগেও ইহা প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

জায়ফল, জৈত্রী, খোসাশুদ্ধ ছোট এলাইচ, খোসাশুদ্ধ বড় এলাইচ, জীরা, মরিচ, যমানী, মৌরি ও রাঁধুনি—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৶০ সিদ্ধির গুঁড়া উহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তাহার পর আফিঙ ভিজান জলে বাটিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটীকা করিলেই "বিসূচিকারি রস" প্রস্তুত হইল। আতপ চাউল ভিজান জল, জীরা ভাজার গুঁড়া ও মধু কিম্বা জীরা ভিজান জল ও মধু দিয়া বিসূচিকায় ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

আমি আরও কতকগুলি বিসূচিকার চিকিৎসা করিয়াছিলাম, সমস্ত পরিচয় এ প্রবন্ধে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সেইজন্য সে সব পরিচয় পরে দিব। তবে আমার বিশ্বাস, যদি প্রথম হইতেই বিসূচিকার রোগী পাওয়া যায়—তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ইহার বিশেষ ফল দর্শিতে পারে—কিন্তু রোগের নিদান বুঝিয়া ও বিশেষ যত্ন লইয়া চিকিৎসা করা চাই। শুধু চিকিৎসকের ব্যবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে চলিবেনা, বাড়ীর লোককেও সেবা সুশ্রূষার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

প্রতিকার।

চপলা টুক্‌টুকে অধরে বিজলী খেলিয়া কমলিনীর নিকট সরিয়া বসিল। চপলা কমলিনীর সই। সে অনেক দিন শ্বশুর বাড়ী কাটাইয়াএই সে দিন বাপের বাড়ী আসিয়াছে। কমলিনী শ্যাম সুন্দরের স্ত্রী। শ্যাম সুন্দরের বাড়ী—চপলাদের বাড়ীর অতি নিকটে, তাই চপলা ও কমলিনীর মধ্যে ভালবাসাটা বেশ গাঢ় হইয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া চপলা—সইকে দেখিতে আসিয়াছে। কমলিনীর মন আজ তত ভাল নয়, তাই মুখখানি যেন মেঘে ঢাকা। হৃদয়ের যাতনা—মুখমণ্ডল যেমন প্রকাশ করে, আমাদের কৃত্রিম ভাষা তেমন পারে না। কমলিনীর মুখ আজ বিষাদ-কালীমায় মাখা দেখিয়া চপলা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, কমলের বিরহ উপস্থিত। চপলার পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক, কারণ চপলা যুবতী—রং-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা ও আমোদ আহ্লাদেই যুবতীগণ অধিক সময় অতিবাহিত করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ইহা তাহাদের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চপলার সিদ্ধান্ত খাটিল না। কমলিনী, বিরহ-বিধুরা নহে।

কমল। সই, ভগবান যা'কে সুখী করেন—সে সকল অবস্থাতেই সুখী—তা'র দুঃখের আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগে না। সই, তুমি বেশ আছ,—বেশ আমোদ আহ্লাদে দিনগুলি

কাটিয়ে দিচ্ছ। যাই হোক সই, তোমাদের দেখেই আমরা সুখী। আমাদের কপালে ত বিধাতা সুখ লেখেন নি! বুঝি এ জীবন এমনি দুঃখেই কাটিয়ে দিতে হ'বে! জীবনের প্রভাতেই যখন এমন আঁধার হ'ল, তখন সারা জীবনই বুঝি আঁধারে কাটাতে হবে! বুঝ্‌লে বোন, আমার বিরষ বদন কেন?

চপলা। সই, তুমি যে এমন কবি হ'য়ে উঠেছ, তাতো আমি জানিনে! খুব লম্বা চওড়া তো ব'লে গেলে আমি যে ওর কিছুই বুঝতে পারলাম না। কবির সঙ্গে থেকে বুঝি কবি হ'য়েছ? তা,—আমাকেও তোমার চ্যালা কর না। তবে আর কিছু বুঝতে পারি, না পারি, তো এই টুকু বুঝলাম যে, আমার কমলকলির ভেতর কি একটা পোকা ঢুকেছে, আর সেই পোকাই তা'র এমন দশা ক'রেছে। সত্যি আমার মনটা কেমন ক'রছে—কি হ'য়েছে—ব'লবনা?

কমল। আর ভাই!

কমল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। বোধ হইল—যেন কত নীরব-বেদনা বুকখানাকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া, একটা উত্তপ্ত বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া গেল। কমল উদাস নয়নে আকাশের দিকে চাহিল। কমলের এইভাব দেখিয়া চপলার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সই-এর এ ভাব সে কখনো দেখে নাই। এমন হাসি ভরা ঢলঢল বিকসিত পদ্ম সদৃশ মুখ—আজ শুকাইয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে। সখীর মর্ম্ম যাতনা আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া চপলা কাঁদিয়া ফেলিল। কমলের নীরব শোকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—সে সইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল। ইহাতে তাহার হৃদয় যেন একটু শান্ত হইল। শোকের অংশ ভাগী যদি পাওয়া যায়—যদি কেহ ব্যথার ব্যথী থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শোকের কিছু লাঘব হয়। কমলেরও তাই হইল।

কিছুক্ষণ পরে কমল বলিল—"চপল, আমার কপাল বড়ই মন্দ, প্রভাত হ'তে না হ'তে সন্ধ্যা এল। প্রাণের কত সাধ, কত আহ্লাদ - সব যেন বন্যার জলে ভেসে গেল। চপল, ভেবেছিলাম,এ শোক-তাপময় সংসারকে নন্দন কানন ক'রে তু'লব—আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়া রাজ্য যে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল! আমি কত আশায় বুক ভরিয়ে রেখেছিলাম—আমার বুক ভেঙ্গে গেল, আশাও চ'লে গেল। চপল, এ আমি কি করলাম—আমি কি কর্ব্বো? এ যাতনা কার কাছে ব'লবো?—যিনি যাতনা দিচ্ছেন—তিনিই কেবল জানেন, আর ত কেউ জানে না—আর ত কেউ শুনে না। চপল, যদি বুকখানা দেখা'বার হ'ত, দেখা'তাম যে, এই নীরব বেদনায় আমার বুক খানাকে কত পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে! কি হ'য়েছে জান, ওঁর খুব শক্ত অসুখ ক'রেছে। সবাই ত যক্ষ্মা ব'লচে। ডাক্তার ব'লচেন (pthysis) থাইসিস্। পয়সাও ত খুব খরচ করা হ'চ্চে, কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না। কিছু দিন যায়—আবার হঠাৎ এক ঝলক রক্ত ওঠে। কাল আবার রক্ত উঠেছে—থানা, থানা রক্ত। কি করি চপল, আমার প্রাণ যে উড়ে যাচ্ছে! ভগবান কি আমার ওপর এতই নির্দ্দয় হ'বেন—আমার দিকে কি একটুও মুখ তুলে চাইবেন না?

চপলা। ভাই, ভগবান দয়া না ক'রলে কি আমরা একদণ্ড বাঁচতাম? তাঁর অসীম দয়া। তাঁর দয়ায় সকল প্রাণীই বেঁচে আছে।

তাঁর যদি দয়া হয় তো তোমার স্বামীর অসুখ সেরে যা'বে। তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাক, তাঁর দয়া হ'বে, তোমার চোখের জল মুছে যা'বে। তোমার মত নিরীহ প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে তাঁ'র কি লাভ?

কমল। তাই বল ভাই,—তাই বল। যেমন ক'রে ডাকৃতে বল—তেমনি কোরে ডাক্‌বো। শয়নে, স্বপনে সকল সময়েই ত তাঁকে ডাকৃছি। এর জন্য যদি আমার প্রাণ দিতে হয়— তাতেও ত আমি কুণ্ঠিত নই!

চপলা। দেখ ভাই, আমার একটা কথা শুনবে?

কমলা। তা শুনবো না কেন সই, আমার যা'তে উপকার হবে—আমি তাই করবো?

চপলা। দেখ, অনেক শক্ত ব্যারাম কবিরাজী চিকিৎসায় সারে। আমি একটা ঠিক এই রকম ঘটনা জানি। আমার শ্বশুর বাড়ীর কাছে ঘোসোদের একটা ছেলের ঠিক এই রকমই হ'য়েছিল। ডাক্তার দেখানর অভাব হয়নি। তা'রা খুব বড়লোক, পয়সাটা জল বৃষ্টির মত খরচ ক'রেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লনা। তা'র বৌয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল। সে রোজ আমাদের বাড়ী আসত; স্বামীর অসুখের কথা তুলে কতই যে কাঁদত— তা' আর কি ব'লব। তা'র চোকের জল শুকোতনা। আর বৌটার স্বামীগতপ্রাণ। তা'র স্বামীও তা'কে খুব ভালবাসত। যখন ডাক্তার কিছু ক'রতে পারল না, তখন সকলেই কবিরাজ দেখাতে ব'লল। বেশ নামজাদা একজন কবিরাজকে আনা হ'ল, তিনি দেখতে লাগলেন। তিনি পর পর ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ দিতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁ'র শরীর সবল হ'তে লাগল এবং রক্ত বমিও দিন দিন ক'মে আসতে লাগল। এমনি করে ৩।৪ মাস ওষুধ খাওয়ার পর রক্ত বমি বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপরও এক বছর নাগাদ ওষুধ খেয়েছিল। এখন শুনতে পাই—তা'র অসুখ একেবারে সেরে গিয়েছে। এখন কেমন সুশ্রী, সবল, সুস্থ দেহ হয়েছে। তার জন্য—দুইটা মুষ্টিযোগ যা' দেওয়া হ'য়েছিল—আমি তা' লিখে নিয়েছি। তোমাকে কাল সে কাগজ খানা এনে দেবো। ভাই, বেলা গেল, এখন উঠলাম, কাল নিয়ে আস্‌বো।

কমল। এস ভাই, তবে। কবিরাজ দেখানর বন্দোবস্ত ক'রব।

পর দিন কমল শাশুড়ীকে কবিরাজ আনিতে শ্বশুরকে বলিতে বলিলেন। শ্বশুর সেই দিন হইতে খুব ভাল একজন বৃদ্ধ কবিরাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কবিরাজীমতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

চপলা যে দুইটা মুষ্টিযোগ লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আনিয়া দিল। তাহা এই—(১) ননীর সহিত মধু ও চিনি একত্র মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দেওয়া,—অথবা দুধ, ঘি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করান, ইহাতে শরীর পুষ্ট হয়। (২) পায়রা, হরিণ, ছাগ বা বানর—ইহাদের মাংস ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগলের দুধের সহিত খাইলে ক্ষয় রোগ ভাল হয়।

কবিরাজ, আয়ুর্ব্বেদ মতে 'অশ্বগন্ধাদিঃ' 'ত্রয়োদশাঙ্গম,' এবং আর কয়েকটী ব্যবস্থা পর পর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দরের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখা গেল—অন্যান্য মুষ্টিযোগের সহিত চপলার উক্ত দুইটা মুষ্টিযোগ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। এক বৎসর যাবৎ ঔষধ

সেবন করিয়া শ্যামসুন্দর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনপ্রাপ্ত হইলেন। কমলিনীর হাসি ফুটিল,—কমল আবার বিকসিত হইল।

* * * *

কিসে শ্যামসুন্দর নবজীবন লাভ করিল —কবিরাজী ঔষধে—কি কমলিনীর একাগ্র ভগবৎ আরাধনায়—তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। তবে আমাদের ঋষিকৃত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এখনো মরে নাই। যদি বল এখন কবিরাজী ঔষধে আর তেমন কাজ হয় না,—সে দোষ ঔষধের নয়, সে দোষ কবিরাজের এবং কতক আমাদেরও। কবিরাজ মহাশয়েরা সকল সময়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন না। মধু অভাবে গুড় দেন। ইহা হয় তাঁহারা গাছ গাছড়া চিনেন না, বেদিয়া যাহা আনিয়া দেয়—তাহার উপর নির্ভর করেন, নয় উপযুক্ত পয়সা পান না বলিয়া মধু অভাবে গুড় দেন। সেই জন্যই ঔষধ কার্য্যকরী হয় না। ইহাতে তাঁহাদের অপযশ ত আছেই, অধিকন্তু লোকের মনে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। ইহার এক প্রতিকার আছে, যদি অস্মদ্দেশীয় ধনী ও রাজা মহারাজগণ কবিরাজ রাখিয়া স্বব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে যথাযথ ভেষজ সংগ্রহ পূর্ব্বক এবং নিয়মিত প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করান, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, সেই ঔষধ মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিতে পারে। পুজ্যপাদ ঋষিগণ জগতের হিতের জন্য অকাতর পরিশ্রম করিয়া যে সকল ঔষধাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কি উর্ব্বর মস্তিষ্কের লক্ষ্যহীন প্রলাপ!

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল বি, এ,।

আয়ুর্ব্বেদের স্বপক্ষে একটী সত্য।

—:*:—

যাহার আদর্শ যাহা, তাহা যে তাহার পক্ষে ভাল—এই মহাসত্যের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন আজ পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই নিদর্শনটী সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ করিবে—কেননা এটী লোকপরম্পরাগত কোন কিম্বদন্তী নহে বা কোন আয়ুর্ব্বেদভক্তের অনুরাগ-প্রসূত কল্পনাও নহে, এটী এই ক্ষুদ্র লেখকের নিজ জীবনে প্রমাণিত একটী বাস্তব ঘটনা।

এবারের সমরজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা কাহারও অবিদিত নাই। আমি গত পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইয়া ইংরাজী নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বারের ভয়াবহ ও মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হই। আক্রান্ত হইয়াই এ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ ইতিপূর্ব্বে আমাদের গ্রামে যে কয়েকটী ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই কালকবলিত হইয়াছিল। অধিকন্তু আমাদের গ্রামে অনেকগুলি হাতুড়ে ডাক্তার বৈদ্যের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা থাকিলেও সুচিকিৎসক সম্বন্ধে একরূপ নিঃস্ব বলিলেই হয়। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় নামক স্বনামধন্য বহু

দেশ প্রসিদ্ধ অনেক শাস্ত্রাভিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণ যে কবিরাজ ছিলেন, তিনিও আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ রোগে, শোকে, জরাজীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ ৺কাশী বাসী হইয়াছেন। বিশ্ববিত্যালয়ের মার্কামারা ডাক্তার এখনও এতবেশী হয় নাই যে, আজকালকার বি, এ, এম এর মত তাহারা গ্রামে গ্রামে ভিড় করিয়া বসিবে। জেলাগুলি চিকিৎসক বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধিশালী হইলেও গ্রাম গুলি প্রায়শঃই 'সহস্রমারী'দের হস্তে সমর্পিত আছে। এই সমস্ত যমস্বরূপদের তীব্র ঔষধাস্ত্র সকল সহ্য করিয়া প্রাণ রক্ষা পাওয়া নিতান্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। সত্য বলিতে কি, আমি নিজেই একেবারে স্বদেশে manufactured অথচ দস্তুরমত বিলাতি ডাক্তারগণকে একটু ভীতি মিশ্রিত সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকি। ইঁহারা ঔষধ বা যন্ত্রের ব্যবহার না জানিলেও প্রয়োগ করিতে ছাড়েন না! কাজেই সহজ ও সুন্দরভাবে চিকিৎসার যে ফলটুকু তাহাও ইঁহারা দেখাইতে পারেন না। ইঁহাদের চিকিৎসায় সুসাধ্য রোগও অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। অনেক রোগী যে ঔষধের বলেই শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিমার্গে উপস্থিত হয়—একথা ও একেবারে অমূলক নহে।

সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসার এই দুর্দ্দিনেও আমাদের গ্রামে অন্ততঃ একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকেই আমার চিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হইল। ইনি আমার বাল্যবন্ধু। অল্পবয়স্ক হইলেও ডাক্তারী চিকিৎসা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ইনি কিঞ্চিৎ যশস্বী হইয়াছিলেন। আমাদের আশে পাশের প্রায় দশবারোটী গ্রাম সাধারণতঃ ইঁহার চিকিৎসাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আমার অসুখ দেখিয়া ইনি যেন কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইলেন ও প্রাণপণে আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই জানেন, এবারকার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—ডাক্তারী ঔষধকে দস্তুরমত পরাজিত করিয়াছে। এই কলিকাতায় এত মহাবিজ্ঞ ডাক্তারগণের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও কচিৎ দুই একটা রোগী কোনগতিকে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। এমতাবস্থায় আমার বন্ধু যে চিকিৎসায় বিশেষ ফলোদয় করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহাকে দোষী করিবার কিছুই নাই। তিনি তাঁহার শাস্ত্রমত তিক্ততীব্র ঔষধাবলী—সমস্তই আমাকে ব্যবস্থা করিলেন। এমন কি, জ্বর নিবারণের শেষ চিকিৎসা এক তরফা কুইনাইন ইন্‌জেক্‌সন পর্য্যন্ত আমার উপর দিয়া হইয়া গেল। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসার বলপ্রয়োগের মূলে বোধ হয় একটা ভুল রহিয়া গিয়াছে। এ চিকিৎসা যদি বুঝিত যে রোগও তত দুর্ব্বল নহে, যে জুলুমের বাধ্য হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় এচিকিৎসায় অনেক সময় অধিকতর ফলোদয় হইত। যাহা হউক বন্ধুবরের শত চেষ্টা বিফল হইল। ইন্‌জেক্‌সনের পরে জ্বরটা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া অধিকতর আক্রোশের সহিত আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল এবং রোগ নিউমনিয়ার দিকে যাইতে না পারিলেও দ্রুতবেগে টাইফয়েডে আসিয়া পৌছিল।—সেই কালো কালো গোবর গোলার মত পিত্তযুক্ত অজস্র মল নিঃসরণ, কখনও দস্তুরমত রক্তভেদ অথবা অতিদাহযুক্ত বিষমজ্বর, মস্তক বিকৃতি, জিহ্বা, হস্তাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন মোটের উপর নিদানোক্ত ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আর কি গেছি। বাড়ীর কথা দূরে থাকুক, গ্রামস্থ সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। বন্ধুবর ডাক্তার আরও কিছু দিন চিকিৎসা করিয়া নিতান্ত গর্ব্বিতভাবে বাবাকে বলিলেন,—"মহাশয়, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, রোগী আমার বিশেষ বন্ধু, ইহার প্রাণরক্ষার জন্য আমিও নিতান্ত ব্যস্ত। অতএব আপনি একবার জেলার ভাল একজন ডাক্তার দেখান। তাঁহার মতানুযায়ী আমি চিকিৎসা করিতে চাহি। একাকী চিকিৎসা করিতে আর আমার সাহস নাই।' বাবা তাহাই করিলেন। বরিশাল হইতে উপাধি প্রাপ্ত একজন ডাক্তার আহূত হইয়া আসিলেন ও সনাতন প্রথানুসারে একখানি প্রেসক্রিপসন লিখিয়া বন্ধুবরকে সাময়িক পরামর্শ দিয়া কতক রজতখণ্ড আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

নূতন প্রকারে আবার কয়েক দিন চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ফল অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতই হইল। বন্ধুবর ডাক্তার এবার ভারী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"আমার বিদ্যা বুদ্ধি শেষ হইয়াছে। বরিশালের ডাক্তারের পরামর্শও কার্য্যকারী হইল না। এখন সকলে পরামর্শ করিয়া কি করিবেন দেখুন।,' বাবার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি বলিলেন -"শেষ চেষ্টা একবার করিব, বরিশাল একবার লইয়া যাইব, তারপর অদৃষ্টে যা' আছে—হইবে।" প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া কহিল, —'রোগী বত্রিশ দিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে, ইহাকে এখন বিশেষ নাড়াচাড়া করা উচিত নহে।' কিন্তু পরে বাবার নিতান্ত অস্থিরতা দেখিয়া সকলে বরিশাল যাওয়ার মত দিল।

বরিশাল যাওয়ার সব ঠিক ঠাক—নৌকা প্রস্তুত, সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক যাইবেন, আর যাইবেন আমার বাবা নিজে ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এমন সময়ে দৈব আশীর্ব্বাদের মত নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন ভাল কবিরাজ কার্য্যগতিকে আমাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই শুনিলেন আমার অত্যন্ত ব্যারাম। চিকিৎসক সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আমাকে তখনি দেখিতে আসিলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া নাকি আমার নাড়ী, জিহ্বা, চক্ষু, উদর ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। আমার তখন সম্যক জ্ঞান ছিল না, কাজেই এ সময়ের কথা আমি যেরূপ শুনিয়াছি—বলিতেছি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'রোগীকে আমি কিছুতেই বরিশাল লইয়া যাইতে দিব না। কুইনাইনের অপব্যবহারের ফলেই এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। আবার কুইনাইনের জল উদরস্থ হইলে রোগীর বাঁচা অসম্ভব হইবে।" বাবাকে বলিলেন— 'ভয় নাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রোগী আরোগ্য না হইলে আমি দায়ী। তিন দিন মধ্যে ফল দেখাইব।' বাবা কাঁদিয়া বলিলেন—"আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, আপনারা যা' ভাল মনে করেন—আমি তাতেই রাজী।' কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—'আবাল্য এ গ্রামের নুন খাইয়াছি। এ রোগীর প্রাণপণ চিকিৎসা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কবিরাজ মহাশয় গ্রাম্য বৈদ্যকে কয়েকটী ঔষধ দিতে বলিয়া বরিশাল চলিয়া গেলেন। তারপর দিন চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কি

চমৎকার তাঁর চিকিৎসা, কিরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক তাঁর পথ্যাপথ্য নির্ণয়,আর সর্ব্বোপরি কি গভীর তাঁর স্নেহ, কি মধুর তাঁর যত্ন,—ভাবিলে চক্ষে জল আসে। শুদ্ধ কবিরাজ হিসাবে নয়, একটী মহাপুরুষ হিসাবেও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। এ মানবপ্রীতি যে ঋষিতুল্য ধর্ম্মপ্রাণ চিকিৎসকাচার্য্যের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই তিন দিনে আমার রোগের অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল, মল অনেকটা গাঢ় হইয়া আসিল, জ্বর থার্ম্মোমিটারে অনেক কম উঠিতে লাগিল,মাথা খুব পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি সজ্ঞানে যখন প্রথম চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, কবিরাজ মহাশয়ের দেবোপম সাম্য শুভমূর্ত্তি দেখিয়া যেন অনেকটা উপশম বোধ করিলাম। সকলের আশার আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হইল, সাফল্য সম্ভাবনায় কবিরাজ মহাশয় বিনয় নম্র হইয়া রহিলেন।

রোগ ক্রমশঃই আরোগ্যের পানে ছুটিল। এই অত্যাগী জ্বর ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে ৪৫ দিনের দিন একেবারে ছাড়িয়া গেল। সকলে হাততালি দিয়া কবিরাজ মহাশয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল। আনন্দাতিশয্যে আমার ডাক্তার বন্ধু নিজেই বলিলেন—"কবিরাজ মহাশয় আপনিই ধন্য। আপনি আজ আমাদের বেশ করিয়া দেখাইলেন যে, ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদই ভারতবাসীর পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র। বিলাতি চিকিৎসা বিলাতের পক্ষে যতই মঙ্গলজনক হউক না কেন, তাহাতে অস্ত্র শস্ত্র ব্যাণ্ডেজ ষ্টেথিসস্কোপের যতই প্রাবল্য থাকুক না কেন, আয়ুর্ব্বেদীয় বটী পাচন মুষ্টিযোগই ভারতীয় লোকের পক্ষে একান্ত উপযুক্ত।

আমি এ যাত্রা কবিরাজ মহাশয়ের কৃপায় নীরোগ হইলাম। ৫৬ দিনে অন্নপথ্য করিলাম। সবল সুস্থ হইয়া ৭৯ দিনের দিন কলিকাতা 'ল' কলেজের থার্ডইয়ার ক্লাশে নবজীবনে পুনরায় উপস্থিত হইতে পারিলাম।

আমার রোগ আরোগ্যের জন্য যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে তাহা জানিয়া লইয়াছিলাম। নিম্নে সেই ঔষধ কয়টির কথা লিখিতেছি :—

জ্বরের জন্য—বিশ্বেশ্বর রস, বৃহৎ জ্বরকস্তুরি ভৈরব। মহামৃত্যুঞ্জয় ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

পেটফাঁপা ও হজমের জন্য—সূর্য্যকান্ত রস, শঙ্করযোগ ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

মস্তিষ্কের জন্য—মহালক্ষ্মীবিলাস, মহা নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

আর কি বলিব ? এবার অসুখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে,আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আর্য্য ঋষিগণের ভারতবাসীর উপর চরম আশীর্ব্বাদ! আজ অনাদরে, অবজ্ঞায় এ চিকিৎসা বিলুপ্ত প্রায়, কিন্তু সুদূর অতীতে এই শাস্ত্র হইতেই ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। এই অবসানের শেষ মুহূর্ত্তেও এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন আয়ুর্ব্বেদের অসীম শক্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে। এ শাস্ত্রকে অবমাননা করিলে আমাদের চলিবে না। আয়ুর্ব্বেদকে পরিপোষণ করিতে পারিলে তবে ভারতবাসী আবার স্বাস্থ্যসুষমা লাভ করিতে পারিবে, নতুবা বিলাতি শত শত পেটেণ্ট টনিক তাহাকে চিররোগের কবল হইতে কিছুতেই অব্যাহতি দিতে পারিবে না! বিদেশীয় চিকিৎসার আধিপত্য বিস্তারে সে ক্রমশঃ ক্ষীণ শীর্ণ হইয়া উঠিবে।

নিরপেক্ষ বিচারে আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ্ করিতে বোধ হয় এই সত্য নিদর্শনটী যথেষ্ট হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,এম, এ।

চরকোক্ত পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

বমনের যোগ্যজনে পূর্ব্বাহে ভিষক।
খায়া'বে আনুপমাংস গ্রাম্য ও ঔদক॥
মাংসরস দুগ্ধ আর করাইয়ে পান।
কফের উৎক্লেশ হ'তে ক'র তারে ত্রাণ॥
বিরেচক-যোগ্যজনে স্নিগ্ধ করাইবে।
যূষ ও জাঙ্গলমাংসে কফ কমাইবে॥
গ্রাম্যমাংসে কফাধিক্য তাহাতে বমন।
মন্দ কফে সহজেই হয় বিরেচন॥
কফাল্পে বমনৌষধি অধোদিগে ধায়।
কফাধিক্যে বিরেচক তথা উর্দ্ধে যায়॥
স্নিগ্ধ করি যথাবিধি করা'বে বমন।
পরে পেয়াদির ক্রম করিবে পালন॥
বিরেচনে যথাবৎ স্নিগ্ধ করি পরে।
স্বিন্ন করি যোগ্যতম রেচন আচরে॥
পেয়া ও বিলেপীকৃত অকৃত অথবা।
যূস, মাংসরস ক্রমে সেবনার্থে দিবা॥
প্রধান, মধ্যম আর অধম শোধন।
তিন, দুই, একবার করিলে সেবন॥
অনুমাত্র অগ্নি যথা তৃণ ও গোময়।
ক্রমে দহি, মহাস্থির সর্ব্বসহ হয়॥
ক্রমে শুদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তরাগ্নি তথা।
পেয়াদি দহিয়া স্থির হইবে সর্ব্বথা॥
নিকৃষ্ট, অধম আর উৎকৃষ্ট লক্ষণ।
চারি, ছয়, আটবার হইলে বমন॥
দশ, বিশ, ত্রিশবার বিরেচন হ'লে।
নিকৃষ্ট, অধম, শ্রেষ্ঠ বেগ তায় বলে॥
অর্দ্ধপ্রস্থ, পৌনেএক, একপ্রস্থ আর।
বমনের দ্রব্যমান ক্রমশঃ তাহার॥
দুই, তিন, চারিপ্রস্থ নৃপে বিরেচন।
নিকৃষ্ট, অধম, আর শ্রেষ্ঠের লক্ষণ॥
পিত্ত দরশন নাহি হয় যতক্ষণ।
বমন করান বিধি তাকে ততক্ষণ॥
কফ দরশন নাহি যতক্ষণ হয়।
ততক্ষণ বিরেচন উচিত সময়॥
আদি দুই তিনবার মল নিঃসরণ।
বিরেচন সংখ্যামধ্যে না হয় গণন॥
পানীয় ঔষধ বেগে যতক্ষণ রয়।
বমন নিকৃষ্ট সংখ্যা মধ্যে তাহা নয়॥
ক্রমে কফ পিত্ত বায়ু হইলে নির্গত।
সম্যক বমন তার হয় রীতিমত॥
হৃদি, পার্শ্ব, শির আর ইন্দ্রিয়নিচয়।
স্রোতের বিশুদ্ধি, দেহ লঘুতাতে হয়॥
দেহে স্ফোট, কণ্ডু, কোঠে আদি সমুদয়।
গাত্রগুরু, অবিশুদ্ধি ইন্দ্রিয় হৃদয়॥
অতিশয় বমনেতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মোহ।
বায়ুকুপ্ত, নিদ্রাহীন, বলনাশে দেহ॥

বিরেচন পরীক্ষা।

বিরেচন হয় যদি সম্যক প্রকার।
ইন্দ্রিয় প্রসাদ হয়, স্রোতশুদ্ধি আর॥
দেহ লঘু বলোদয়, অগ্নির উদ্রেক।
নিরাময় বোধ হয় ধ্রুব জানিবেক॥

বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ, বায়ু ক্রমে নিঃসরণ।
হয়ে থাকে এইরূপ তাহার লক্ষণ॥
ভালভাবে বিরেচন যদি নাহি হয়।
শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ুতাতে কুপ্ত হয়ে রয়॥
অগ্নিমান্দ্য, দেহগুরু, তন্দ্রা, প্রতিশ্যায়।
বমন, অরুচি, বায়ু-বিলোমন তায়॥
অতিশয় বিরেচন কা'রো যদি হয়।
কফ, রক্ত, পিত্ত আর স্বপ্ততা ও ক্ষয়,
অঙ্গমর্দ্দ, ক্লান্তি আর কম্পন রহিবে।
নিদ্রা, বলহানি, হিক্কা, উন্মাদ হইবে॥
সম্যক বমন আর বিরেচন পরে।
নবম দিবসে ভাত ঘৃত পান ক'রে।
অথবা অনুবাসন গ্রহণ করিয়া,
তিন দিন পরে দেহে তৈল মাখাইয়া॥
পাতি' বুভুক্ষিত কালে তাহাকে তথন।
করাবে ভিষকগণ নিরূহ গ্রহণ॥

বমনের অযোগ্যপাত্র।

ক্ষতক্ষীণ, অতি স্থূল, কৃশ শিশুগণ,
বৃদ্ধ, শ্রান্ত, পিপাসিত, দুর্ব্বল যে জন।
ক্ষুধিত ও শ্রমক্লান্ত, উপবাসরত।
অধ্যয়ন-চিন্তা আর ব্যায়াম নিরত॥
ক্ষাম, গর্ভবতী, কোষ্ঠ সংবৃত যাহার,
উর্দ্ধ রক্তপিত্তরোগগ্রস্থ, সুকুমার,
বমি সাধ্য, উর্দ্ধবাতগ্রস্থ, আস্থাপিত,
হৃদ্‌রোগ উদাবর্ত্তগ্রস্থানুবাসিত,
মূত্রাঘাত-প্লীহা-গুল্ম-অষ্ঠীলা-উদর,
তিমির ও শির-শঙ্খরোগী, ভগ্নস্বর,
কর্ণরোগী, অক্ষি-পার্শ্বশূলরোগীগণ।
ইহারা অযোগ্য হয় করাতে বমন॥

অযোগ্যের হেতু।

উরঃক্ষতে ক্ষতবৃদ্ধি বমনেতে হয়।
রক্তের উদ্গম তাতে হয় অতিশয়॥
ক্ষীণ, অতি স্থূল-কৃশ-বাল বৃদ্ধ আর।
দুর্ব্বলে বমনাসহ প্রাণে হানি তার॥
শ্রান্ত, পিপাসিত আর ক্ষুধাতুরজনে।
বমন নিসিদ্ধ হয় এসব কারণে॥
শ্রম ভারাক্রান্ত আর যে করে ভ্রমণ,
উপবাস, রতিক্রিয়া আর অধ্যয়ন,
ক্ষাম, চিন্তারত আর ব্যায়ামী যাহারা,
রুক্ষ হেতু বাতরক্তে প্রকুপিত তারা।
কণ্ঠনালী আদি স্থান ছিন্ন হয়ে যায়,
উরঃক্ষত হতে পারে অরোগ্য তাহায়॥
গর্ভীণীর গর্ভস্রাব, গর্ভব্যাপতাদি,
সুদারুণ রোগ হয় তেঁই ত্যাজ্য বিধি॥
সুকুমার হৃদয়ের বিকর্ষণ তরে।
উর্দ্ধ অধোমার্গে রক্ত বিনিস্থত করে॥
দুর্ব্বম্য, সংবৃত্তকোষ্ঠ করিলে কুন্থন।
আমাশয়ে সমুৎক্লিষ্ট দোষ সে কারণ॥
বীসর্প, স্তম্ভ ও জাড্য, চিত্তের বিকার,
মরণ পর্য্যন্ত করে কি কহিব আর॥
উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত উৎক্ষেপে উদান।
প্রাণ নাশ করে রক্ত হয়ে বলবান॥
প্রশক্ত বমি ও উর্দ্ধবাত আস্থাপিত।
অনুবাসিতে উর্দ্ধ বায়ু হয় প্রধাবিত॥
হৃদ্রোগে হৃদয়-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
উদাবর্ত্তে রোগ বৃদ্ধি প্রাণ নাশে তায়॥
মূত্রাঘাত, প্লীহা, গুল্ম, অষ্ঠিলা, উদর,
স্বরভঙ্গে শূলে হয় তাতে তীব্রতর॥
তিমিরে তিমির বৃদ্ধি শিরঃশূল আর,
শঙ্খ-কর্ণ-অক্ষি শূলে বৃদ্ধি তদাকার।
যে সব ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ বমন।
তার—বিষ-গরজাত, বিরুদ্ধ ভোজন,
কিম্বা আমজাত রোগ হ'লে উপস্থিত।
আশুকরী হেতু তাহা হইবে বিহিত॥

বমনের যোগ্যপাত্র।

পীনস ও কুষ্ঠ আর নবজ্বর, কাস,
রাজযক্ষ্মা, গলগ্রহ, গণ্ডমালা, শ্বাস,
শ্লীপদ, মন্দাগ্নি, মেহ, বিরুদ্ধ ভোজন,
বিসূচিকা, অলসক, অজীর্ণ অশন,
বিষ গরপান, দুষ্টদগ্ধ-বিদ্ধমার,
অধোগত রক্তপিত্ত, প্রসেক, অপর
অরুচি, হৃল্লাসারুচি, অর্শ, অপস্মার;
অবিপাক, শোথ পাণ্ডু, উন্মাদাতিসার,
মুখপাক, ধাত্রীরোগ, শ্লেষ্ম রোগ নানা।
বমনের যোগ্য এরা থাকে যেন জানা॥
ক্ষেত্র আলি ভাঙ্গি যথা শস্য করে নাশ।
বমি তথা দোষ হরি করে রোগ নাশ॥

শ্রীরাসবিহারি রায় কবিকঙ্কন।

মসূরিকা বা বসন্ত।

প্লেগ, কলেরা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মত মসূরিকা বা বসন্ত রোগও ভারতবাসীকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। সরকারি মৃত্যুর হার পর্য্যবেক্ষণ করিলে, গত কয়েক বৎসর হইতে বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম হইবেনা; এবং এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বৎসরই যে বাড়িতেছে তাহাও ঐ তালিকা দৃষ্টে জানিতে পারা যায়. সুতরাং এ রোগের হাত হইতে ভারতবাসী যাহাতে অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, প্রত্যেক চিকিৎসকেরই সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

বসন্তরোগ দেশে যে আগে হইত না. তাহা নহে কিন্তু প্রায়শই এরূপ মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিত না। চৈত্র মাসে—গরম ফুটিলে—এমনই সময় দেশের অল্প সংখ্যক ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইত,কিন্তু সে আক্রমণ যেরূপ ভাবে হইত তাহাতে তাহাকে জলবসন্ত বা পাণিবসন্ত আখ্যা. ভিন্ন আর কিছুই বলা হইত না এবং সামান্য কয়েক দিন কিছু কষ্ট পাওয়ার পর সে বসন্ত বিনা চিকিৎসাতে আপনিই সারিয়া যাইত। মেথী ভিজান জল, কুড় ও বাবুইতুলসী সিদ্ধ, থোড়ের জল—এই সকল ব্যবস্থা সেরূপ অবস্থায় কদাচিৎ করা হইত। ফল কথা বসন্ত হইলে সেকালে আমাদের দেশবাসী আদৌ চিন্তিত হইতনা; সামান্য ব্রণ বা স্ফোটকের মত আপনা আপনি সারিয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত।

কিন্তু এখন এ রোগের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া লোকের মনে একটা বিষম বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে. লোকক্ষয়ও যথেষ্ট হইতেছে, এ অবস্থায় এ রোগের নিদান, প্রতিষেধক বিধি ও চিকিৎসার কথা আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের অভিজ্ঞতা মিশাইয়া এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে।

শাস্ত্রপাঠে আমরা অবগত হই,—কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন, দুষ্ট অন্ন, শিম্বী ও শাকাদি আহার, সদোষবায়ু সেবন ও সদোষ জলপান এবং দেশের প্রতি ক্রূরগ্রহ

দিগের কুদৃষ্টি—এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত সঙ্গত হইয়া মসূরিকা বা বসন্ত রোগ উৎপন্ন করে। এই রোগে মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পীড়কা সকল উৎপাদন করে বলিয়া এই রোগের নাম মসূরিকা। তাহারই বাঙ্গালা হইয়াছে বসন্ত। বাতাদি দোষ বলিলে, বায়ু পিত্ত কফ বুঝায়,কিন্তু কফ ও বায়ু অপেক্ষা এই রোগে আমরা পিত্তেরই অধিক প্রকোপ হইয়া থাকে দেখিতে পাই। আমরা এখনকার দিনে শাস্ত্র মানিনা, ধর্ম্ম মানিনা, স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের ধর্ম্মের যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং দিন চর্য্যা, ঋতু চর্য্যা—ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা পালন যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির মূল এ সকল কথা আমরা কিছুই মানিতে চাহিনা, আমাদের নানারূপ রোগপ্রবণতা তাহার ফলই সম্ভূত। বসন্ত রোগ লইয়াই আমরা সে কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে চাই।

বসন্ত রোগের সূচনা হয় ফাল্গুনের শেষে এবং চৈত্র মাসে ইহার পূর্ণ প্রকোপ প্রকট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই—"শীত ঋতুতে সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্য কিরণে দ্রবীভূত হইয়া অগ্নিনাশ ও বিবিধ রোগ উৎপাদন করে অতএব, তৎকালে কফ নাশক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তীক্ষ্ণ বমন তিক্ততে নস্য, লঘু ও রুক্ষ ভোজন, ব্যায়াম, গাত্রমার্জ্জন ও পরস্পর পাদাঘাত ক্রিয়া দ্বারা প্রবৃদ্ধ কফকে জয় করিবে। স্নান, কর্পূর, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম, পুরাতন যব, গোধূম এবং শূলপক্ক জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে। * * * * মলয় মারুত হিল্লোলে সুশীতল, চতুর্দ্দিকে জলপ্রণালী পরিবেষ্টিত, মণি-বেদি বিরাজিত, কোকিল কাকলী মুখরিত, বিবিধ পুষ্প বৃক্ষ শোভিত, সৌগন্ধময় উপবনে অবস্থিতি করিয়া নানারূপ মনোহর বাক্যালাপে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিবে" ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কি এখনকার দিনে এই সকল ব্যবস্থা করিবার উপায় করিতে পারি?—পারিনা। কেন পারিনা—তাহার কারণ সংসার তাড়নে নিষ্পেষিত কর্ম্মগতপ্রাণ ভারতবাসীর কোকিল কুজিত উপবনে মধ্যাহ্ন উপভোগের আদৌ অবসর নাই; প্রচণ্ড রৌদ্রে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে সে সময় তাহাকে প্রভুর মনোরঞ্জনে অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজেই সে ব্যবস্থা ইচ্ছা সত্ত্বেও অসম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঋতু চর্য্যার সকল ব্যবস্থা তো আমরা করিতে পারি; —তাহার প্রবৃত্তি যে আমাদের তিরোহিত হইয়াছে। অজীর্ণ এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় দেশের লোক জর্জ্জরীত, যখন রোগ পীড়নে একান্ত ক্লিষ্ট হইতে হয়—তখনই অনেকে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু দিনচর্য্যা—ঋতুচর্য্যা—শাস্ত্রবিধি যদি দেশের লোক পালন করিত, তাহা হইলে ডিসপেপ্‌সিয়ার নামও দেশ হইতে লোপ পাইত এবং চিকিৎসকের শরণ গ্রহণও করিতে হইত না। শাস্ত্র বলিতেছেন, 'বসন্ত কালে তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণনস্য ব্যবহারে শরীর শোধন করিয়া লইবে।'—শাস্ত্রকার শুধু উপদেশ প্রদানেই ক্ষান্ত হন নাই, সে জন্য বমন কার্য্যে মদন ফল, নস্যকার্য্যে কটফলা চিনাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন সেই বমন বা নস্যের কথা বলিলে অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু দেশে আগে যখন

আধিব্যাধি কম হইত, তখন দেশের সকল লোকই ঐ সকল কথা বুঝিত এবং পালন করিত। এখন দেশের রুচি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা ব্যাধি প্রবণ হইবনা কেন?

আমাদের আহারের ব্যবস্থা বারমাস এক ঘেয়ে। যাঁহারা মেসে, বোর্ডিয়ে, হোটেলে থাকিয়া প্রাত্যহিক আহারের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই, অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেও শাস্ত্রাদেশ মানিয়া আহারের ব্যবস্থা নাই। সকল সংসারেই বারমাস এক ঘেয়ে আহার চলিয়াছে। কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার ভোজনে মসূরিকা বা বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেই জন্য বসন্ত রোগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বসন্তকালে ইহার পরিহার করা কর্ত্তব্য,—কিন্তু দেশের লোক এ সকল কথা বুঝেন কি? ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ ভোজন—এ তো আমরা সকল সময়ই করিয়া থাকি। আমাদের আধিব্যাধির প্রবলতা এবং আলোচ্য বিষয় বসন্ত রোগ এই জন্য দেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। যাহাহউক আমরা এসকল কথা ছাড়িয়া দিয়া আগামী বারে এই রোগের অন্যান্য কথারই অলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন, এম এ, এম বি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

যশোহর জিলাবোর্ডে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়।—গত ২৯শে মার্চ্চ যশোহর জিলা বোর্ডে আলোচনা হইয়াছে যে যশোহর জিলাবোর্ড হইতে যশোহরে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহার জন্য বোর্ডের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান মহাশয় গবর্ণমেণ্টকে একথা জানাইয়াছেন। আমরা এ সংবাদে পরম সুখী হইয়াছি এবং ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট যশোহর জেলা বোর্ডের এই সাধু প্রস্তাব নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। সরকারি সাহায্য পাওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সর্ব্বজন সমাদৃত হইলেও সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা খাঁটি ও অভ্রান্ত বলিয়া এখনো পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য দেশে অনেক সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক ইহার চিকিৎসাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হারি মানিয়াছে—সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে—এরূপ ঘটনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের অনেকেই দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এত দিন যদি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মত আয়ুর্ব্বেদের পৃষ্ঠপোষক হইতেন, তাহা হইলে আজি অনেক বৈদ্যসন্তান পুরুষপরম্পরার ব্যবসায় —বৈদ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না এবং এখনো ভারতবর্ষে ৪০ চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের আবশ্যক বলিয়া চিকিৎসক প্রস্তুতের জন্যও গবর্ণমেণ্টকে চিন্তা করিতে হইত না। আমাদের মনে হয় —সেরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভারতবর্ষ বোধ হয় নানারূপ রোগ পীড়নে আজি এত বিভী-

যিকাও দেখিত না। যশোহর জিলা বোর্ডের এই সাধু প্রস্তাব শুনিয়া সেইজন্য আমরা যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দেশের লোকের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হউক, মহামান্য গবর্ণমেন্টবাহাদুর লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য সাহায্য করুন—ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক কামনা।

দেশবাসীর আত্মরক্ষার উপায়।—দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে,—আধি ব্যাধিতে বঙ্গভূমি—তথা সমগ্র ভারতভূমি যেরূপ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—তাহার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্টভাবে নিহিত। আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান, সেইজন্য আমাদের দেশে শীতপ্রধান দেশের উগ্রবীর্য্য চিকিৎসার ব্যবস্থা—কখনই সমীচীন নহে। তা' ছাড়া বাতব্যাধি, পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কুষ্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি এমন অনেকগুলি রোগ আছে, যে গুলির চিকিৎসায় অনেক বিজ্ঞ অ্যালোপ্যাথও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করাইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। সরকারী সাহায্য পাইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিলেও কতকগুলি রোগ আরোগ্যের বিশেষ শক্তির জন্য আয়ুর্ব্বেদের গর্ব্ব এখনো খর্ব্ব হয় নাই। ফলকথা, আমরা যদি সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে পুনরুন্নত করিতে পারি, গবর্ণমেন্ট যদি এই চিকিৎসাকে সাহায্য করেন—তাহা হইলে দেশের লোকের মতিগতিও ফিরিবে এবং তাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইহার উন্নতির জন্য আরও চেষ্টাশীল হইয়া দেশ রক্ষায় মনোভিনিবেশ করিতে সমর্থ হইবেন।

পরলোক।—রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম, এ, পি, আর, এচ, বিদ্যাসাগর মহাশয় গত ২৬শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ইংরাজী বিদ্যায় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ উপাধিধারী ছিলেন। কর্ম্মময় জীবনে ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সাহিত্যশাখার একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপেও ইনি বহুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা সাহিত্য-সভার ইনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমরা ইঁহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন।

প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা।—বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়ের প্রশ্নোত্তরে মিঃ ডোনাল্ড, জানাইয়াছেন, যে, প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দানের প্রশ্ন গবর্ণমেণ্ট চিন্তাই করেন নাই এবং ঐ জন্য কোনো বিদ্যালয় স্থাপন অথবা স্থানীয় বিদ্যালয় গুলিতে বাঙ্গালা শাখা খুলিয়া দেওয়ার কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই।" কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করেন—ইহা আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ। যে দেশে এখনও ৪০ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন, সে দেশে প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেক ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিই চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে পারে। দেশের অনেকে ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন নহে বলিয়াই তো ইচ্ছাসত্বেও অনেকে এ বৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ পাইতেছেননা। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এ সকল কথা চিন্তা করিলে আমাদের কথার যাথার্থ উপলব্ধি হইবে।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

[illegible] বর্ষ—১০ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩২৬

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এই আয়ুর্ব্বেদ কালেজের ৪র্থ বৎসর চলিতেছে। কালেজের "বোর্ড অভ্ ট্রষ্টির" সভাপতি—অনারেবল সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী। নাটোরাধিপতি বাহাদুর ও অনারেবল রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতি সদস্য। "কালেজ কাউন্সেলের" সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম-এস এবং বহু গণ্য মান্য কবিরাজ ইহার সদস্য। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী, কালেজ সংলগ্ন আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালে বার্ষিক ২৫০০৲ টাকা সাহায্য দান করিতেছেন।

এই আয়ুর্ব্বেদ কালেজের দুইটী বিভাগ—সংস্কৃত ও বাঙ্গলা। সংস্কৃতে বোধাধিকার থাকিলে সংস্কৃত বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। সংস্কৃত বিভাগে ৫ ও বাঙ্গলা বিভাগে ৪ বৎসর পড়িতে হয়। মাসিক বেতন উভয় বিভাগের তিন টাকা। প্রবেশ ফি ৫৲ টাকা। আয়ুর্ব্বেদের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন।

এই কালেজে আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ তো রীতিমত পড়ান হয়ই অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদের সহিত মিলাইয়া ইংরাজি "এনাটমী", "ফিজিওলজী" "সার্জ্জারি" "মিডওয়াইফারী" উত্তমরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় সুতরাং এখানকার ছাত্রগণ মেডিকেল কালেজে বা মেডিকেল স্কুলে পড়ার এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফল একত্র লাভ করিবেন—এ কম সুযোগ নহে। এই অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া সিংহল, দাক্ষিণাত্য, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ছাত্র প্রতি বৎসর এই কালেজে ভর্ত্তি হইতেছে। ৴১০ টিকিট সহিত নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে অনুষ্ঠান পত্র ও ভর্ত্তির জন্য আবেদনের কাগজ পত্র পাঠান হয়। আষাঢ়ে নূতন সেশন্ আরম্ভ হইবে।

শ্রীযামিনীভূষণ রায় এম-এ, এম-বি,
অধ্যক্ষ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

আষাঢ়ের সূচী।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

দেশের কথা।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে ইংরাজী শিক্ষালব্ধ জ্ঞানার্জ্জনে আমরা এখন এক এক জন মহা মহা কর্ম্মবীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি—ইহা সত্য হইলেও সেই সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে কি অবনতি হইয়াছে—সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এখনকার দিনে আমরা যে পরিমাণে অর্থের মুখ দেখিতে পাইতেছি, এ পরিমাণ অর্থ বঙ্গবাসী —তথা সমগ্র ভারতবাসী কখনো উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। অধুনা B.A. M.A. পাশ করিয়াও অনেকের ইপ্সীত বাসনা অতৃপ্ত থাকে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এখনকার B.A. M.A. ন্যূনকল্পে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করেন, সেকালে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রায়শঃ সেরূপ অর্থ কেহ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন না; সুতরাং বর্ত্তমান যুগে বিদেশীয় শিক্ষার চরম সাধনা করিতে পারিলে, দেশের লোকের অর্থোপার্জ্জনের পন্থা আর কণ্টকাবৃত থাকেনা,—একরূপে তাহার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে।

কিন্তু সে অর্থ উপার্জ্জনের ফলে আমরা করিতেছি কি? যাঁহারা খুব বেশী টাকা রোজগার করেন—তাঁহাদের কথা বাদ দিয়া, যাঁহারা কেরাণী বৃত্তি করিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে মোটামুটি উপার্জ্জন করেন—তাঁহাদের অবস্থায় কতটা শান্তি থাকিতে পারে, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু বহুকাল চিকিৎসা ব্যবসায়ের ফলে এ কথাটি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা আদৌ করিতে পারেননা। তাহার কারণ, এখনকার দিনে আমরা নগদ অর্থের মুখ যেমন যথেষ্ট দেখিয়াছি, তেমনি সকল বিষয়েই অধুনা আমরা অকাতরে ব্যয়শীল হইয়া পড়িয়াছি। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যেরূপভাবে উহার ব্যব-

হার করিতে হয়, এখনকার দিনে আমরা সে জ্ঞান আদৌ অর্জ্জন করিতে শিখি নাই। এক কথায় এখনকার দিনে আমরা অর্থ আনিতে জানি, কিন্তু উহার ব্যবহার করিতে জানি না। তা' যদি জানিতাম, তাহা হইলে আজি কলিকাতা—শুধু কলিকাতা নহে, বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সহরে—শুধু সহরে কেন—পল্লী-গ্রামে পর্য্যন্ত বিড়ি-সিগারেটের বিক্রয়াধিক্য দেখিতে হইতনা, দোকান খুলিয়া পতিতা রমণীকুলকে রাজপথগুলিতে পয়সায় চারি খিলি পান বিক্রয় করিতে দেখিতে হইতনা, সোডা-লেমনেড-সরবতের দোকানের ভিড়ে বঙ্গবাসীকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইতনা! আর আসাম-দারজিলিং ও জলপাইগুড়ির উদ্যানজাত চায়ের কল্যাণেও প্রত্যেক সহরে পয়সা পেয়ালা চা বিক্রয়ে অনেককে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিতে হইত না।

বাঙ্গালী কি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে? কখনই করেনা। তা' যদি করিত—তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতার বাজারে আজি দশটাকা শ'য়ের আম কিনিবার জন্য আপণ গুলিতে প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন—সকল সময়েই প্রবল জনতা দৃষ্টিগোচর হইত না—সেমিজ-জ্যাকেট-বডির দোকান গুলিতেও এত ভিড়ের ব্যবস্থা হইত না।

তাই বলিতেছিলাম—বাঙ্গালী ইংরাজী পড়িয়া—ইংরাজী শিখিয়া—ইংরাজী সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া, দেশের নিকট—দশের নিকট—সমাজের নিকট—আত্মপরিজনের নিকট জ্ঞান-গর্ব্ব-সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের ফলে প্রকৃত সুখলাভের পথ সে যে একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য, এ কথার প্রতিকূলে কিছুই বলিবার নাই।

রাজা আমাদের ইংরাজ, সুতরাং এখন আর শুধু আমাদের দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, আমাদিগকে ইংরাজী পড়িতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইংরাজের অনুকরণ করিব কেন? ইংরাজ তো আমাদের মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দেন নাই যে, তোমরা তাঁহাদের অনুকরণ কর। তাঁহারা তো সে কথা বলিয়া দেন নাইই, বরং তোমাদের জাতীয় শিক্ষার বিস্তার কামনায় সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সংস্কৃতকলেজ খুলিয়া, টোলে বৃত্তি দিয়া, তোমাদের বাঙ্গালা বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্য করিয়া, তোমাদের নিজস্ব বজায় রাখিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট করিয়াছেন। তোমরা সে সকল নিজে গ্রহণ করিবেনা। নিজেরা বিকৃত বুদ্ধিকে প্রণোদিত হইয়া যদি অশুভ উৎপাদনের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তাহার ফল যে তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য এবং ইহারই জন্য বাঙ্গালীর মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাস্থ্যসম্পদে বাঙ্গালী আজি আর সে কালের মত গরীয়ানও নহে।

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশ—জ্ঞানের দেশ,—ইহা ভোগের দেশ নহে। এ দেশের লোকের কোনো কালে অর্থ ছিল না, কিন্তু তাহার এমনই সামর্থ্য ছিল যে, সে সামর্থ্যে একদা সমগ্র বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়াছিল। তাহার কারণ, স্কুলকলেজের বিদ্যা এখন যেমন অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছে, এ দেশে সেরূপ ব্যবস্থার কাহারও প্রয়োজন ছিলনা। ইহার প্রধান কারণ, সেকালে উদরান্নের ব্যবস্থার জন্য কাহাকেও বড় একটা ভাবিতে হইত না।

সকলেরই দু' দশ বিঘা চাষের জমী ছিল—সেই জমীতে ধান্য এবং অন্যান্য ফসলাদি যাহা উৎপন্ন হইত, তদ্দারা প্রায় সকল সংসারেরই অন্নের সংস্থান হইত, সকলেরই গৃহ-সান্নিধ্যে অল্পবিস্তর পরিমাণের বাগান ছিল,—সে বাগানে যে পরিমাণ তরিতরকারি উৎপন্ন হইত, তদ্দারা আহারকালে দৈনন্দিন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইত। পল্লীবাসী মাত্রেরই এক একটা ছোট বড়—যেরূপ ধরণেরই হউক না কেন, দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী থাকিত, তাহার জন্য মৎস্য কাহাকেও কিনিতে হইত না। আর গাভীপালন—এটা সেকালে যে প্রত্যেক বাঙ্গালীর করণীয় বিষয় ছিল, তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। ফলে সেকালের বাঙ্গালী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ বা অমৃত পানে দীর্ঘায়ু ও বয়ঃসংস্থাপনের ব্যবস্থায় সক্ষম হইত। ফলে সেকালে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই জীবিকার্জ্জনের ভাবনা বিশেষ ভাবিতে হইত না। সেইজন্য সেকালে বাঙ্গালী যে বিদ্যাশিক্ষা করিত—তাহা জ্ঞানার্জ্জন উদ্দেশেই করিতে পারিত। এখন তো তাহা নাই। এখন বাঙ্গালী কৃষিকর্ম্ম ভুলিয়াছে, কারণ সে আর চাষা হইতে রাজি নহে, পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা পল্লীভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে—কারণ বহুকাল সহরের সর্ব্ববিধ সুখ উপলব্ধি করিয়া সে আর নানা অসুবিধার মধ্যে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট হইতে ইচ্ছুক নহে। চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়ার মত এখন বাঙ্গালীর অবস্থা হইয়াছে,—পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য তাহার চেষ্টা নাই,—পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি, সুতরাং সে স্থানে আর থাকা হইবে না, ইহাই হইয়াছে বাঙ্গালীর অবস্থা। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর দুরবস্থা হইবে না তো হইবে কাহার?

ইংরাজী শিখিয়া চাকরিজীবি অধিকাংশ বাবুর দলই এখন সহরে বাস করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সহর বাসের ফলে টাকায় চারি সের দুগ্ধ কিনিয়া স্বাস্থ্যসুখ লাভ করিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। অন্যান্য খাদ্যও বাঙ্গালী যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় না। তাহার উপর আয়ের অবস্থায় বাসস্থানের ব্যবস্থাও বিবেচনা করিয়া করিতে হয়,—কাজেই অনেকের ভাগ্যেই আলোক-রৌদ্রহীন বাড়ীতে অবস্থিতি করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শিশু-মৃত্যুর আধিক্য—বাঙ্গালীর অকাল বার্দ্ধক্যের বিস্তৃতি—বাঙ্গালীর যক্ষ্মারোগবৃদ্ধি—ইহারই ফলসম্ভূত।

যক্ষ্মায় বাঙ্গলা দেশ তো সমগ্র বিশ্বকে ছাড়াইয়া ফেলিয়াছে,—আর কলিকাতা হইতেছে—বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর প্রধান তীর্থ। বাঙ্গালী হোমরুল হোমরুল করিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে সে চিন্তার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ের চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নহে কি?

ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অতি নিকট বলিয়াই সে কালের বাঙ্গালী অতি ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্যই সেকালের বাঙ্গালী নীরোগ ও সুস্থদেহে দীর্ঘায়ুলাভ করিতে সক্ষম হইতেন।

এখনকার বাঙ্গালী সে সাবেক পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং সে ধর্ম্মপালনও নাই—সে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কাহারও যত্নও নাই। সেকালের বাঙ্গালী বুঝিত—শরীরমাদ্যং। একালের

বাঙ্গালী জানে—অর্থং সর্ব্বস্বং। শুধু অর্থ সর্ব্বস্ব নহে,—বাঙ্গালী এখন যথেষ্ট অনুকরণ প্রিয় হইয়াছে—বাঙ্গালীর বিলাস-বাসনা তাহার সহিত বিজড়িত। সেই বিলাসিতা হইতে বাঙ্গালী তৈলমর্দ্দন ভুলিয়াছে, তাহার স্থলে সাবান মর্দ্দন আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালী-ধূম-পায়ী হুঁকা-গড়গড়ার সাহায্যে তামাক পরিত্যাগ করিয়া বিড়ি-সিগারেটের সহজ সুলভ ধূম গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কোন স্থানে যাইতে হইলে বাঙ্গালীর আর এক পোয়া পথ হাঁটিবার ক্ষমতা নাই—ট্রাম-অশ্বযান-মোটর ভিন্ন বাঙ্গালী আর চলিতে পারিবে না—এত অত্যাচারেও যদি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অটুট থাকে—তাহা হইলে তো আর বিশ্বনিয়ন্তার কোনো নিয়মই প্রতিপালন করিবার আবশ্যক হয় না। শুধু পুরুষদিগের কথা নহে—আমাদের রমণীদিগকেও গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল হইতে বিরত রাখিয়া আমরা তাঁহাদিগকেও এমনই অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছি যে, সেই অকর্ম্মণ্যতার ফলে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের ও অপচয় ঘটিতেছে। দাস দাসীর নিয়োগ করিও না—পুরলক্ষ্মীদিগকে অনবরত খাটাইয়া-খাটাইয়া মারিয়া ফেল—এরূপ কথা অবশ্য আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের বামুন রাখিয়া, তাহাদের দ্বারা রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া, দেশের নারীদিগকে যে শুধু শয্যাবিলাসিনী করা উত্তম ব্যবস্থা নহে—এ কথা সহস্র বার বলিব।

আমাদের অন্নপূর্ণার দেশে অন্নপূর্ণার অংশ সম্ভূতা রমণীদিগকে অন্নবিতরণে ক্লিষ্টা হইতে দেখিলে সমাজের রুচিপরিবর্ত্তনে ব্যথিত হইতে হয় বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। ফল কথা, দেশের বড় দুর্দ্দিন। এ দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষা করা বাঙ্গালীর পক্ষে যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ অন্ধকারময়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছিলাম—ইংরাজী পড়, আপত্তি নাই—শুধু আপত্তি নাই-ই বা বলি কেন,—ইংরাজী তোমাকে পড়িতেই হইবে—কিন্তু প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি—অনুকরণে মজিয়া যাইও না, পিতৃ পিতামহের আদেশ ভুলিও না—অনুকরণ স্রোতে হিন্দুর দীক্ষা ভাসাইয়া দিয়া বিজাতীয় বন্যার প্রাবল্যে ভাসমান হইও না। তাহাতে হইবে কি?—না—তাহাতে দু'য়ের বা'র হইবে। না পারিবে অনুকরণে আসল টুকু আনিতে, না পারিবে হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে। ফলে একটা খিচুড়ির মিশ্রণে তুমি সহজেই স্বাস্থ্য হানি করিয়া বসিবে।

হিন্দুত্ব বজায়ের সহিত যে আমাদের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিজড়িত—সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; সুতরাং যাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকে, নীরোগ হইতে পার, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পার, বৎসরের মধ্যে নয় মাস-কাল চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিতে না হয়—তোমার বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান সন্ততি যাহাতে তোমারই দোষে অকালে কাল কবলিত না হয়—কায়মনোপ্রাণে হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া তাহারই ব্যবস্থা কর—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

পঞ্চকর্ম্ম।

—:*:—

[ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাঃ। এখন ধূম পানের দ্বারা কি উপকার হয় বলুন।

ক। স্নেহন ধূম বায়ু নাস করে, বিরেচন ধূম কফকে উৎক্লিষ্ট ক'রে নির্গত করে। প্রায়োগিক ধূম স্নেহন ও বিরেচন এই উভয় ধূমের কার্য্যকারী। ধূমপান করিলে ইন্দ্রিয়, স্বর ও চিত্ত প্রসন্ন হয়, কেশ, দন্ত ও শ্মশ্রু দৃঢ় হয় এবং মুখ সুগন্ধ ও পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা সুস্থাবস্থায় ধূম পানের গুণ। ইহা ভিন্ন কাস, শ্বাস, অরুচি, মুখের উপলেপ (যেন কিছু লেপা রহিয়াছে বোধ), স্বরভেদ, মুখ হইতে লালাদি স্রাব, বমি, তন্দ্রা, হনুস্তম্ভ, (চোয়াল ধরা), মন্যাস্তম্ভ, পীনস, শিরোরোগ, কর্ণশূল, চক্ষু শূল এবং বায়ু ও কফজনিত মুখরোগ জন্মিতে পারে না ও জন্মিয়া থাকিলে প্রশমিত হয়।

ডাঃ। ধূম পান বেশী হ'লে কি দোষ হয়?

ক। অতিরিক্ত ধূমপান ক'রলে রোগের শান্তি হয় না এবং তালু ও গলদেশের শুষ্কতা, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম (ঘুরণী) মত্ততা, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, দৃষ্টির হীনতা, নাসারোগ ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

ডাঃ। আচ্ছা ধূম কতক্ষণ পান ক'রতে হ'বে, তা'র কিছু নিয়ম আছে।

ক। আছে বৈকি। প্রায়োগিক ধূম মুখ ও নাসিকা দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে তিন তিন বার বা চার চার বার পান ক'রতে হয়। যতক্ষণ চক্ষু দিয়ে অশ্রু নির্গত না হয়—ততক্ষণ স্নৈহিক ধূমপান করতে হয়। এটা হ'ল সকলের পক্ষে; দুর্ব্বল ব্যক্তি এর চেয়ে কম পান করবে। বিরেচন ধূম ৩।৪ বার অথবা যতক্ষণ শ্লেষ্মা নির্গত না হয়—ততক্ষণ পান করা নিয়ম। কাসহরধূম আহারের পর তিন চার বার পান ক'রতে হয়। আর খোসা শূন্য তিলের যবাগূ আকণ্ঠ পান ক'রে কফণীয় ধূমপান ক'রতে হয়। যতক্ষণ বমন হ'য়ে পিত্ত নির্গত না হয়—ততক্ষণ পান করা উচিত।

ডাঃ। এই ত গেল আপনার চতুর্থ কর্ম্ম। পঞ্চম কর্ম্ম কি?

ক। পঞ্চম কর্ম্ম করান—গণ্ডূষ ধারণ। আর তা' ছাড়া আশ্চোতন তর্পণ, পুটপাক ব'লে কিছু কর্ম্ম আছে।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি সংক্ষেপে সব গুলোর কথাই বলুন। কর্ম্মের বংশ একেবারে নির্ব্বংশ করা যাক।

ক। আজতো সেটা আমি আরম্ভই করেছি, আপনার বলবার অপেক্ষা রাখিনি। এখন সব গুলোর কথাই সংক্ষেপে বলি শুনুন। কবল চার প্রকার, যথা, স্নেহী, প্রসাদী,

শোধন ও রোপণ। বায়ু জন্য রোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ গুণযুক্ত কবল, পিত্ত জন্য রোগে মধুর ও শীত গুণযুক্ত কবল, কফ জনিত রোগে কটু, অম্ল, লবণ, রুক্ষ ও উষ্ণ কবল প্রযুজ্য। ইহাকে শোষন বলে। আর বাতজ রোগে ও পিত্তজ রোগে যে দুই প্রকার কবল প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হ'য়েছে, তা'দের যথাক্রমে স্নেহী ও প্রসাদী বলে। এতদ্ভিন্ন মুখব্রণে কষায় স্বাদু ও তিক্ত দ্রব্যের যে কবল প্রয়োগ করার নিয়ম আছে, তা'কে রোপণ বলে।

ডাঃ। আচ্ছা কবল কি দিয়ে দিতে হয়?

ক। রোগ ভেদে সেই সেই দ্রব্যনাশক ঔষধের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ক্কাথ প্রস্তুত ক'রতে হয়। তারপর বায়ু রোগে ঘৃতাদি স্নেহ, পিত্ত-রোগে কিসমিসের ক্কাথ, চিনি প্রভৃতি মধুর দ্রব্য, আর কফরোগে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ মিশিয়ে কবল প্রয়োগ ক'রতে হয়। মুখের ক্ষতে ক্ষতনাশক দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত ক'রে প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা কবল আর গণ্ডূষে প্রভেদ কি?

ক। ওরা দুই ভাই—কবল ছোট আর গণ্ডূষ বড়। যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিয়ে মুখের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চালন ক'রতে পারা যায়, সেই পরিমাণ নিলে তা'কে কবল বলা যায়। কবল শব্দের অপভ্রংশ কুল্লি আর কুলকুচো। আর যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিলে মুখ মধ্যে সঞ্চালন করা যায় না, মুখটী বুঁজে চুপটী ক'রে ব'সে থাকতে হয়, সেই পরিমাণ নিলে তাকে গণ্ডূষ বলে।

ডাঃ। পূর্ব্বে ঋষিরা গণ্ডূষে সমুদ্র পর্য্যন্ত পান ক'রে ফেলতেন। তা' হলে তাঁদের শ্রীমুখে গহ্বরের পরিমাণ কম ছিল না।

ক। সে ব্যাখ্যা পৌরাণিকেরা ক'রবেন। তবে আয়ুর্ব্বেদের মতে যদি ব'লতে হয়—তা' হলে অগস্ত্য লবণ রসযুক্ত, সুতরাং শোষন গণ্ডূষ ধারণ করেছিলেন ব'লে তাঁর কফরোগ আর পঙ্কু মুণি মধুর রাঙ্গাজলের গণ্ডূষ ধারণ ক'রেছিলেন ব'লে তাঁর পিত্ত রোগ ছিল।

ডাঃ। ঠিক বলেছেন, কোনো বিলিতী এন্টিকোয়েরিয়েনকে (Aatiquarian) লিখলে তাঁরা এটা আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করবেন।

ক। তা করুন আপনি এখন শ্রবণ করুন। অনন্যমনা হয়ে এবং শরীর উন্নত ভাবে রেখে অর্থাৎ সোজা হ'য়ে ব'সে কবল ও গণ্ডূষ ধারণ করতে হয়। যে পর্য্যন্ত দোষ গালের মধ্যে না আসে এবং নাসাস্রোত ও চক্ষু জলপ্লুত না হয়—ততক্ষণ কবল ও গণ্ডূষ ধারণ ক'রতে হয়। তা'রপর মধু ঘৃতাদির কবল ধারণ করতে হয়। কবল প্রয়োগ করবার পূর্ব্বে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সর্ষপ ও হরীতকী বেটে তৈল, গোমূত্র বা মধুর সঙ্গে লবণ সংযোগে মিশ্রিত ও উষ্ণ ক'রে রোগীর গলায়, গালে ও ললাটে মাখিয়ে স্বেদ দিতে হয়।

ডাঃ। কবল গণ্ডূষেরও অযোগ অতি যোগ আছে নাকি?

ক। আছে বৈকি? কবলের হীনযোগ হ'লে মুখের জড়তা, কফের উৎক্লেশ এবং রস-জ্ঞানের হানি হয়। অতিযোগ হ'লে মুখে ক্ষত, মুখের শুষ্কতা, তৃষ্ণা, অরুচি ও ক্লান্তি জন্মায়। আর সম্যক প্রয়োগ হ'লে ব্যাধির উপশম, মনের সন্তোষ, মুখের নির্ম্মলতা ও লঘুতা এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা ঘটে।

ডাঃ। আচ্ছা কবল গণ্ডূষ কোন্ কোন্ রোগে প্রয়োগ করা যায়?

ক। নানা প্রকার মুখরোগ, নাসারোগ, কণ্ঠরোগ; দন্তরোগ প্রভৃতিতে কবল প্রয়োগ করা যায়। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে বসন্তকালে কফ প্রশমনের জন্য কবল হিত কর। নিত্য তৈলের গণ্ডূষ ধারণ ক'রলে অকাল বলী পলিত হয় না, কেশ দন্ত প্রভৃতি ভাল থাকে, ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়, ও দৃষ্টি অব্যাহত থাকে।

ডাঃ। এইবার অঞ্জন, না কি ব'লবেন— ব'লেছিলেন?

ক। হাঁ ব'লছি। তা'র আগে কবলের একটী বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পরিচয় দিই—এঁর নাম প্রতিসারণ। কবলের জন্য যে সব ওষুদ প্রয়োগ ক'রতে হয়, সেই সব ওষুদ সেই সেই ক্ষেত্রে চূর্ণ ক'রে বা বেটে প্রয়োগ করাকে প্রতিসারণ বলে। এর দোষ গুণ—সব কবলের ন্যায় এবং কবল প্রয়োগ দ্বারা যে সকল রোগ নষ্ট হয়, প্রতিসারণ দ্বারা সেই সকল রোগও নষ্ট হয়।

ডাঃ। এইবার অঞ্জনের কথা বলুন?

ক। অঞ্জন সুস্থ শরীরে ব্যবহার ক'রলে চক্ষু ভাল থাকে। পূর্ব্বে অঞ্জন ব্যবহার ক'রবার রীতি ছিল। কজ্জলপূরিত লোচন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ক'রতো ব'লে শোনা যায়। এখন এই হিতকর প্রথাটা প্রায় লোপ পেয়েছে। কেবল শিশুদের জন্য ইহা এখন অনেক স্থলেই দেওয়া হয়। তবে সভ্যতার খাতিরে তাও বুঝি আর থাকে না।

ডাঃ। হাঁ হালি হিসাবে শিক্ষিত অনেক লোকের বাড়ী থেকে ছেলেদের কাজল পরাও উঠে গিয়েছে।

ক। তা' উঠবে বৈকি। নইলে চোখের চিকিৎসকেরা এখন মোটর হাঁকাবেন কি করে! চশমার দোকান চ'ল্‌বে কি করে. আর চশমা চোখে দিয়ে সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচয়ইবা দেওয়া হবে কি করে?

ডাঃ। আপনি কি বলতে চান যে, কেবল কাজল না পরাবার জন্যই এত চোখের দোষ আর চশমার ছড়াছড়ি?

ক। কেবল যে সেই জন্যে—তা' বলছি না; তবে কাজল পরার প্রথা লোপ পাওয়ায় চোখের রোগের এবং চশমা ব্যবহারের যে অনেকটা বাহুল্য ঘটেছে—সেটা বোধ হয় সত্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেক স্থলে অঞ্জন (সুরমা) ব্যবহারের চলিত আছে, আর যারা অঞ্জন ব্যবহার ক'রে—তাদের মধ্যে চোখের রোগ এবং চশমার ব্যবহার খুব কম।

ডাঃ। সেটা কেবল আপনার অনুমান তো?

ক। কেবল অনুমান নয়, একটু সন্ধান নিয়েও দেখিছি। এখন একটা কথা এই যে, কাজল পরা উঠে গেল কেন? সভ্যতার খাতিরে কি? কিন্তু কাজল পরা অসভ্যতার পরিচায়ক হোক আর যাই হোক, কাজল পরলে চক্ষু ভাল থাকে এবং সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। কোন কজ্জলপূরিতলোচনা-সুন্দরীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি. কিন্তু শিশুদের কাজল দিলে বড় সুন্দর দেখায় দেখেছি।

ডাঃ। সে বিষয়ে আমিও আপনার সঙ্গে এক মত। এখন অঞ্জন প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। কফ বিরেচন এবং শিরোবিরেচন দ্বারা রোগীকে বিশুদ্ধ ক'রলেও যদি চক্ষুতে ও চক্ষুর নিকটে দোষ থাকে এবং শোথ বেদনা, বস্ত্র, পৈচ্ছিল্য, ফরফর করা, অশ্রু নির্গম, রক্তিমাবর্ণ ও ঘনদূষিকা (পিচুটি) নির্গম প্রভৃতি ঘটে, তাহা হইলে চক্ষুতে অঞ্জন

প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অঞ্জন তিন প্রকার, যথা লেখন অর্থাৎ দোষ উঠাইয়া ফেলে; রোপণ অর্থাৎ যাহা ক্ষত শুষ্ক করে এবং দৃষ্টি-প্রসাদন অর্থাৎ যাহা দৃষ্টি শক্তিকে নির্ম্মল করে। কষায়, অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য দ্বারা লেখাঞ্জন, তিক্ত দ্রব্য দ্বারা রোপণাঞ্জন এবং স্বাদু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা দৃষ্টি-প্রসাদন অঞ্জন প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

ডাঃ। অঞ্জন কি হাতে ক'রে দিতে হয়?

ক। না, শলায় ক'রে দিতে হয়। শলা দশ আঙ্গুল মধ্যভাগে সূক্ষ্ম এবং শলাকার মুখ কুন্দ, জাতি বা মল্লিকা ফুলের কুঁড়ির মত হওয়া উচিত। লেখনকার্য্যের জন্য তামার শলাকা, রোপণ কার্য্যে কৃষ্ণবর্ণ লৌহের শলাকা এবং দৃষ্টিপ্রসাদনের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত শলাকা কিম্বা অঙ্গুলি দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। অঞ্জনপ্রয়োগ ক'রবার নিয়ম কি?

ক। চক্ষু উন্মীলিত না ক'রে শলাকা দ্বারা চক্ষুতে এবং পরে চক্ষুর পাতার ভিতরে অঞ্জন প্রয়োগ ক'রতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ব্যাধি দোষ এবং ঋতুর উপযোগী জলের দ্বারা চক্ষু ধৌত ক'রতে হয়। তা'র পর বাম চক্ষের উপরের পাতা উর্দ্ধে আকর্ষণ ক'রে নির্ম্মল বস্ত্র—বেষ্টিত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম চক্ষু এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু মার্জ্জন করে পরিষ্কৃত ক'রতে হয়।

ডাঃ। অঞ্জন প্রয়োগ ক'রবার নিষেধ কিছু আছে?

ক। ক্রমশঃ ব'লছি। অঞ্জন প্রয়োগ ক'রলেও যদি কণ্ডূ ও জড়তা ভাল না হয়, তা' হলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও ধূম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগের ফলে চক্ষুতে জ্বালা উপস্থিত হ'লে শীঘ্র শীতল অঞ্জন প্রয়োগ ক'রতে হ'বে। প্রাতঃকালে, অপরাহ্নে, মেঘাগমে এবং সূর্য্যের উত্তাপ প্রবল হ'লে অঞ্জন ব্যবহার করা উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, যাহাকে বিরেচন করান হইয়াছে, যাহার মল মূত্র দিয়া বেগ উপস্থিত হইয়াছে, আহারের পরে, ক্রুদ্ধ, ভীত ও পিপাসিত ব্যক্তিকে, সূক্ষ্ম বা উজ্জ্বল বস্তু দর্শনের পরে, শিরোবেদনায়, শোকে; রাত্রি জাগরণের পরে, মাথা ধুইবার পরে, ধূম বা মদ্যপানের পরে, অজীর্ণে, রৌদ্র সেবনের পরে, দিবা নিদ্রার পরে, পিপাসিত ব্যক্তিকে এবং সূর্য্য প্রকাশ না পাইলে অঞ্জন প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

ডাঃ। আচ্ছা অঞ্জনের আগে আর একটা কি বলেছিলেন?—অচেতন—না কি?

ক। ঠিক অচেতন নয়, তবে কাছাকাছি বটে, আশ্চ্যোতন। যাকে আপনারা আই ড্রপ (Eye-drop) বলেন। বাম হস্ত দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত ক'রে তুলার বর্ত্তি দ্বারা দুই আঙ্গুল অন্তর থেকে চক্ষুর কনীনিকার উপর দশ বা বার ফোঁটা ওষুদ প্রয়োগ করতে হয়। তা'রপর কোমল বস্ত্র দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা ক'রে অপর একখানি কোমল বস্ত্র উষ্ণ জলে ভিজিয়ে চক্ষুতে মৃদু স্বেদ দিতে হয়। বায়ু ও কফ-প্রধান চক্ষু রোগেই এই প্রণালী প্রশস্ত।

ডাঃ। আশ্চ্যোতনে কি উপকার হয়?

ক। ইহা দ্বারা চক্ষুর বেদনা, চুলকানি ফরফর্ করা, জলপড়া, জ্বালা ও লাল হওয়া ভাল হয়। রক্ত ও পিত্তজনিত শীতল এবং বায়ু ও কফরোগে উষ্ণ আশ্চ্যোতন প্রয়োগ ক'রলে—চক্ষু বেদনা, রক্তবর্ণতা এবং অবিশ্রত জলস্রাব হ'য়ে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়। অত্যন্ত

শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ ক'রলে চক্ষুতে সূচীবেধবৎ যাতনা. স্তব্ধতা ও নানাপ্রকার যন্ত্রণা হয়। আশ্চ্যোতন অধিক মাত্রায় প্রয়োগ ক'রলে চক্ষু করকর করা, চক্ষু কষ্টে উন্মীলন করিতে পারা, এবং চক্ষুর পাতায় রক্তবর্ণতা উপসর্গ ঘটে। আশ্চ্যোতন অল্প পরিমাণে ব্যবহার ক'রলে রোগ বৃদ্ধি পায়। আর অপরিস্কৃত আশ্চ্যোতন ব্যবহার ক'রলে চক্ষুতে শোথ হয়।

ডাঃ। এ যে সর্ব্বনেশে চিকিৎসা কবিরাজ মশায়! যা'তে চক্ষু নষ্ট হ'য়ে যায়—এমন চিকিৎসা না করাই ত ভাল।

ক। চক্ষুর হিত করবার জন্তই চিকিৎসা করা, নষ্ট ক'রবার জন্যে নয়। ভাল কর্ম্মের অযথা প্রয়োগ হইলে চক্ষু নষ্ট হইয়া যেতে পারে—এই কথা বলা হ'য়েছে। তা' এটা যে শুধু আশ্চ্যোতনেই হয়—তা' নয়, ঔষধ, শস্ত্র, বমন, বিরেচন, বস্তি প্রভৃতি সব গুলিরই অযথা প্রয়োগে রোগীর মহান অনিষ্ট হতে পারে।

ডাঃ। তা সত্য বটে। এখন আর যা' অবশিষ্ট আছে—সেটা ব'লে ফেলুন।

ক। প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যাকালে তর্পণ প্রয়োগ করা উচিত। যব ও মাষকলায় বাটা দিয়ে চক্ষুর কোণের বাহিরে দুই আঙ্গুল উচ্চ সমান আল প্রস্তুত করতে হয়। তারপর দোষানুসারে দোষনাশক ঔষধ নিয়ে চক্ষুর পাতা পর্য্যন্ত পুরণ করতে হয়। কিন্তু রাতকাণা, বায়ুরোগ, তিমির ও কৃচ্ছ্রনামক চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ঘৃতের পরিবর্ত্তে ঔষধ সিদ্ধ বসা প্রয়োগ হিতকর।

ডাঃ। তারপর কি করতে হয়?

ক। চক্ষু ঘন ঘন বন্ধ ক'রতে হয়, আর খুলতে হয়। চক্ষুর পাতার রোগে এক শত লঘু অক্ষর উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত, চক্ষুর সন্ধিগত রোগে তিন শত মাত্রা (লঘু অক্ষর), শুক্ল মণ্ডল (শ্বেতবর্ণ অংশ) গত রোগে পাচ শত মাত্রা; কৃষ্ণমণ্ডল গত রোগে সাত শত মাত্রা, দৃষ্টিমণ্ডল গত রোগে অষ্ট শত মাত্রা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগে দশশত মাত্রা, বায়ুতে দশ শত মাত্রা, পিত্তে ছয় শত মাত্রা, কফে ও সুস্থ ব্যক্তির দৃষ্টি প্রসাদন জন্য পাঁচ শত মাত্রা কাল তর্পণ রাখতে হয়; পরে অপাঙ্গের নীচে একটী ছিদ্র ক'রে স্নেহ বা'র করে দিতে হয়। ইহার পর রোগীকে ধূম পান করান উচিত আর আকাশ ও দীপ্তিশীল পদার্থ দেখতে দিতে হয়?

ডাঃ। এতে উপকার কি হয়?

ক। বায়ুজনিত রোগে প্রত্যহ, পিত্ত জনিত রোগে একদিন অন্তর, কফজনিত রোগে এবং সুস্থ শরীরে দুইদিন অন্তর চক্ষুর তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তর্পণ ব্যবহার করলে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং চক্ষু সুস্থ হয়।

ডাঃ; এরও কি অযোগ অতিযোগ আছে?

ক। আছে বৈ কি। হীন তর্পণ হ'লে পুর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়. আর অতি তৃপ্তি হ'লে চুলকানি, পিচ্ছিল, স্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্মজ রোগ প্রকাশ পায়।

ডাঃ। আর বাঁকি রইল কি।

ক। এইবার পুটপাকের কথা ব'ললেই শেষ হয়। বাতজনিত চক্ষুরোগে স্নেহন, বাত শ্লেষ্মরোগে লেখন, আর চক্ষুর দৌর্ব্বল্য, বায়ু পিত্ত ও রক্তজনিত চক্ষুরোগে এবং সুস্থ শরীরে প্রসাদন পুটপাক প্রয়োগ ক'রতে হয়। স্নেহন পুটপাক এরণ্ড পত্র বেষ্টিত ও মৃত্তিকা লিপ্ত

ক'রে খব কাঠের কয়লার আগুনে, লেখন পুটপাক বট পত্রে বেষ্টিত ও মৃত্তিকা লিপ্ত ক'রে ধন্বন কাঠের কয়লার আগুনে এবং প্রসাদন পদ্মপত্রে বেষ্টন ও মৃত্তিকা লিপ্ত করে ঘুঁটের আগুনে পাক করতে হয়। লেপ রক্তবর্ণ হ'লে অগ্নি থেকে উদ্ধৃত ক'রে শীতল হ'লে তা'রপর তর্পণের মত প্রয়োগ করতে হয়। লেখন পুটপাক শত মাত্রা কাল স্নেহন পুটপাক দুই শত মাত্রা কাল এবং প্রসাদন পুটপাক সাত শত মাত্রা কাল ধারণ ক'রতে হয়। লেখন ও স্নেহন পুটপাক ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুট-পাকের উপকারিতা এবং অযোগ অতিযোগ তর্পণের ন্যায়।

স্নেহন ও লেখন পুটপাক প্রয়োগের পর ধূম পান করা উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করা যায়, তার দ্বিগুণ সময় পর্য্যন্ত হিতকর পথ্য সেবন করা উচিত। যাদের নস্য প্রয়োগ ক'রতে নেই, তাদের তর্পণ এবং পুটপাক প্রয়োগও ক'রতে নেই।

মসূরিকা বা বসন্ত।

—:*:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আয়ুর্ব্বেদে বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নি-পাত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রাশ্রয় পূর্ব্বক বায়ু পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রসকে আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত উৎপন্ন হয়, চলিত কথায় তাহারই নাম পাণিবসন্ত বা জলবসন্ত। রক্তগত মসূরিকা কৃষ্ণবর্ণ ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত যদি অধিক পরিমাণে দূষিত না হয়, তাহা হইলে এ বসন্তও সুখসাধ্য। মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরুচর্ম্ম বিশিষ্ট; ইহা পাকিতে বিলম্ব হয়। ইহাতে গাত্রশূল, তৃষ্ণা, কণ্ডু, জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে। এই ভাবের বসন্তরোগ কষ্ট সাধ্য। মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোর জ্বরোৎপাদক, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনাযুক্ত। ইহাতে মনো বিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য ও সন্তাপ—এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য ব্যাধি। দৈবাৎ এইরূপ ভাবের বসন্ত হইতে কেহ অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্র সমবর্ণ, রুক্ষ, চিপিটক সদৃশ চেপটা ও কিঞ্চিৎ উন্নত। এইরূপ বসন্তে মোহ, বেদনা ও অরতি হয়। এইরূপ বসন্তে মর্ম্মস্থল সকল ছিন্ন হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গে ভ্রমর দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। এরূপ বসন্ত আশু প্রাণনাশক। শুক্র-গত মসূরিকা চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বেদনা যুক্ত। ইহাতে চিত্তের অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, আর্দ্র বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভূতি—

এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ইহাও আশু প্রাণনাশক।

ত্রিদোষজাত বসন্তও অসাধ্য ব্যাধি। ইহাদের কতকগুলি প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণ, কতকগুলি জাম ফল তুল্য চিক্কণ, কৃষ্ণ, কতকগুলি লোহিতবর্ণ সদৃশ রুক্ষ ও কৃষ্ণ, কতকগুলি তমাল ফলের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

বায়ুর আধিক্য যুক্ত বসন্তে পীড়কা সকল শ্যাববর্ণ বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, তীব্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় এবং এরূপ বসন্ত বিলম্বে পাকিয়া থাকে। এরূপ বসন্ত হইলে—সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বস্থানে বিদারণবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অনবস্থিত চিত্তত্ব ও ক্লম, তালু, ওষ্ঠ জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা এবং অরুচি উপসর্গ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বসন্তের পীড়কা সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল ও কণ্ডু বিশিষ্ট, ইহাতেও অল্প বেদনানুভূতি হয়। ইহা দীর্ঘকালে পাকে। কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্র গৌরব, বিবমিষা, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য—এইগুলি ইহার উপসর্গ।

ইহা ভিন্ন চর্ম্মদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও অরতি উপস্থিত হয়। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

প্রায় সকলপ্রকার বসন্তের কথাই আমরা মোটামুটি ভাবে উল্লেখ করিলাম। এইবার ইহার চিকিৎসা ও প্রতিষেধক বিধি বলিব।

প্রতিষেধক বিধি।

১। তেলাকুচার পাতা, মাধবীলতার পাতা, অশোক পাতা, পাকুড়পাতা ও বেতস পাতা—এই সকল দ্রব্যের এক একটী ।৵১০ ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, একরাত্রি পর্য্যুসিত অর্থাৎ বাসি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা চৈত্রমাসে পান করিতে হয়।

২। হরীতকীর আঁটি বা স্ত্রী-শৃগালের অস্থি পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ধারণ করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩। রুদ্রাক্ষ হস্তে ধারণ করিলে বসন্তভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। ডাবের জলে আতপ চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া এক সপ্তাহ ভোজন করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

৫। কণ্টকারীর শিকড় চারি আনা, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাসি জল দিয়া বাটিয়া, বৎসরে ১ দিন মাত্র সেবন করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৬। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে শুক্লবর্ণ কলসোপরি রক্তবস্ত্র নির্ম্মিত পতাকাযুক্ত সিজ বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে বসন্তের ভয় বিদূরিত হয়।

৭। উচ্ছের বীচি বসন্তের প্রতিষেধক। নিম্ব ভোজনও প্রতিষেধক হইয়া থাকে, এজন্য চৈত্রমাসে এ দুইটী দ্রব্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা উচিত।

৮। মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরুপাক দ্রব্য—এ সময় যত কম ব্যবহার করা যায়, বসন্তের আক্রমণ হইতে ততই আত্মরক্ষার সম্ভাবনা।

প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা।

১। কুমারিয়া লতা ২ তোলা, জল আধ

সের শেষ আধ পোয়া। দুই আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া ইহা আক্রমণের প্রথমাবস্থায় পান করিলে উপকার দর্শে।

২। শেয়ালকাঁটার মূল বাসি জল দ্বারা বাটীয়া পান করিলেও বসন্তের প্রতীকার হয়।

৩। হলুদের পাতা ও তেঁতুলপাতা চারি আনা হিসাবে এক একটি লইয়া শীতল জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে বসন্তের প্রথম আক্রমণে উপকার হয়।

৪। সুপারির মূল, নাটাকরঞ্জের মূল, গোক্ষুর মূল অথবা অনন্তমূল—এক একটি দ্রব্য এক আনা পরিমিত লইয়া জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে।

৫। বাতজ মসূরিকায় দশমূল, বাসক, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা—এই কয়টি দ্রব্যের কাথ উপকারক।

৬। মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাঁকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুম্বুরের ছাল—এইগুলি একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

৭। শোধিত গন্ধক দুই ভাগ ও শোধিত রস একভাগ—লইয়া কজ্জলী করিবে। যথোপযুক্ত মাত্রায় ইহা পানের রস সহ সেবন করিলে বসন্তের প্রতীকার হয়।

৮। টাবা লেবুর কেশর কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র বসন্ত পাকিয়া উঠে।

৯। পাদদ্বয়ের তলায় বসন্ত পীড়কা প্রকাশ পাইলে চাউল ধোয়া জল সহ বারম্বার ধৌত করিলে দাহ প্রশমিত হয়।

১০। শরীরের অন্যস্থানে দাহ নিবারণের জন্য বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

পক্কাবস্থায় ব্যবস্থা।

১। বসন্তের পক্কাবস্থায়—গুলঞ্চ, যষ্টি মধু, কিসমিস, ইক্ষুমূল ও দাড়িম ছালের ক্বাথে উপযুক্ত রূপ ইক্ষু গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

২। দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, খর্জ্জুর, পলতা, নিমছাল; থৈ, আমলকী, দুরালভা ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

৩। বাসক, মুতা, চিরাতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পলতা ও নিমছাল—ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

৪। শিরীষ, যজ্ঞডুম্বুরের ছাল, এবং খদির ও নিমের পাতা প্রলেপ দিলে কফজ ও পিত্তজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

৫। নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পটোল পত্র, কটকী, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন—ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জর ও বিসর্পজনিত এবং ত্রিদোষজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয়। যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয়—তাহাও ইহাতে বহির্গত হইয়া থাকে।

৬। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, স্বল্পপঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাম্ভারী ফল, বেড়েলা মূল ও বৈচি মূল ইহাদের কাথ পান করিলে বাত-জন্য পক্কাবস্থায় মসূরিকার উপকার দর্শিয়া থাকে।

৭। পিত্তজ মসূরিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে, পটোল মূলের ক্বাথ ও ইক্ষুমূলের স্বরস প্রয়োগ করিবে।

৮। দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরাতা ও

কটকী—ইহাদের ক্বাথ পৈত্তিক কিম্বা শ্লৈষ্মিক মসূরিকায় পান করিবে।

৯। বাসক, মুতা, চিরাতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, ত্বরালভা, পলতা ও নিম্ব—ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

১০। খদির কাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুতা, বাসক, সোঁদালপাতা, দেবদারু ও কৈবর্ত্ত মুস্তক—এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া শ্লেষ্মজ মসূরিকায় প্রলেপের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

১১। গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুতা, ছাতিম ছাল, খদির কাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র, নিম্বপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা—ইহাদের ক্বাথ সেবনে বসন্ত ও তৎসংক্রান্ত জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

১২। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলামূল, বৈঁচিমূল—ইহাদের ক্বাথ বাতপ্রধান বসন্ত রোগের পক্কাবস্থায় বিশেষ উপকারক।

বসন্তের দাহ নিবৃত্তির উপায়।

১। পটোলমূল ও রক্ত কাঁটানটের ক্বাথে হরিদ্রা ও আমলকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সকল প্রকার বসন্তের দাহ অবস্থাতেই প্রযুজ্য।

২। পটোল মূল, রক্তকাঁটানটেরমূল, আমলকী ও খদির কাষ্ঠ—ইহাদের সুশীতল ক্বাথে বসন্ত রোগের দাহ প্রশমিত হয়।

৩। বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ মধু মিশাইয়া সেবনে বসন্ত রোগের দাহ নিবৃত্তি হয়।

চক্ষুতে বসন্ত হইলে—

১। গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু—জলের সহিত বাটিয়া লইয়া বস্ত্র দ্বারা পুঁটলি বাঁধিতে হইবে। ঐ পুঁটলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেঁক দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সুঁচমুখী, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল (সুঁদি), বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা—এই সকল দ্রব্য মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে যথাযথ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ বা ক্বাথ দ্বারা অভিষেক করিলে নেত্রগত বসন্তের উপশম হয়। ইহাতে স্ফোটক গলিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার শঙ্কা থাকে না।

বসন্তের অরুচি নিবারণে—

বসন্তে অরুচি হইলে অম্ল দাড়িমের রসের সহিত মুগের যূষ পান করিলে মুখের রুচি হইয়া থাকে। খদির ও পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতল ক্বাথ পান করিলেও অরুচি বিদূরিত হয়।

পূঁয প্রতীকারের উপায়—

১। বট, অশ্বত্থ, পাঁকুড়, যজ্ঞডুম্বুর ও বকুলের ছাল একত্রে মিশাইয়া বসন্তের উপর লাগাইয়া দিলে বসন্তের পুঁয নিঃসারিত হইয়া থাকে।

২। ঘুঁটের ছাই অথবা শুষ্ক গোবর চূর্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে ছড়াইয়া দিলেও পুঁয নিঃসারিত হয়।

ক্রিমি নিবারণের জন্য।

১। বসন্তের গুটিকা গুলিতে ক্রিমি না হয়—এই জন্য সরলকাষ্ঠ, ধুনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতির ধূম প্রদান করিবে।

২। ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও ক্রিমির আশঙ্কা থাকে না।

৩। খদিরকাষ্ঠ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ ও বাসক—ইহাদের কাথ—গুগ্‌গুলু সহ সেবনে বসন্তে ক্রিমি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকেনা। অধিকন্তু ইহা দ্বারা বসন্ত রোগের সর্ব্ববিধ উপদ্রব তিরোহিত হইয়া থাকে। ইহা বসন্তরোগের উৎকৃষ্ট পাচন।

কণ্ঠ শুদ্ধির ব্যবস্থা।

বসন্ত রোগে কণ্ঠে শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ—মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। "অষ্টাঙ্গ অবলেহ" ব্যবহারেও এরূপ অবস্থায় ফল দর্শিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগোক্ত "পঞ্চতিক্ত ঘৃত" এ অবস্থায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

গাত্রের দুর্গন্ধ দূর করিবার উপায়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, শিরীষ পুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর—এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া মাখিলে গাত্র হইতে বসন্তের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়।

দুষ্ট বসন্তে।

দুষ্ট বসন্তে জলৌকা অর্থাৎ জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ঔষধ প্রয়োগের কথা।

বসন্ত নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা বলা হইল—উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে ঐ সকল ব্যবস্থাতেই মসূরিকা বা বসন্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে। এ সকল ব্যবস্থা ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা বড় একটা ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি ঔষধের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় নিম্ন লিখিত ঔষধ কয়টিতে বসন্তে উপকার হইতে পারে।

ঊষণাদি চূর্ণ।

মরিচ, পিপুল, কুড়, গজপিপুল, মুতা, যষ্টিমধু, মুর্ব্বা, বামনহাটি, মোচরস, বংশ-লোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসক ছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। এই চূর্ণ ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার জলের সহিত সেব্য।

দুর্ল্লভো রস।

শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, পিপুল, আম-লকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত ও মধু—এই সকল দ্রব্যের সহিত রসসিন্দুর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বসন্ত প্রশমিত হয়। শাস্ত্রকার বলেন—

"পাপঃ রোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব দুর্লভঃ।"

অর্থাৎ এরূপ পাপরোগান্তক যোগ পৃথি-বীতে দুর্লভ।

ইন্দুকলা বটী।

শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। বাবুই তুলসী রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার বসন্ত আরোগ্য হয়।

পথ্যাপথ্য।

প্রথমতঃ উপবাস, বমন, বিরেচন ও সংশোধনক্রিয়া এই রোগে কর্ত্তব্য। মসূরি পক্ক হইলে মুগের যুষ, জাঙ্গল মাংসের রস, হেলেঞ্চা

শাক, ব্যবস্থা করিবে। ভাবপ্রকাশ বলেন,—

মসূরিকাসু ভুঞ্জীত শালীন্
মুদগ মসূরিকান্।
রসং মধুর মেবাল্পং সৈন্ধবং-
চাল্প মাত্রকম্।

অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, মুগ ও মসুর দাল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্যসকল এবং অল্প মাত্রায় সৈন্ধব লবণ—মসূরিকায় পথ্য স্বরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পুরাতন ষষ্টিকধান্য ও শালিধান্য, ছোলা, মুগ, মসুর, যব, পায়রা, চড়াই, ডাক, বক, চকোর, জলকুক্কুট ও ডাহুক প্রভৃতির মাংস, কাকরোল, কাঁচা কলা, পটোল, সজিনা প্রভৃতির তরকারী উপকারী। দাড়িম এই রোগে পরম পুষ্টিকর। মাষকলায়ের ঝোল ও ইহাতে ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

অপথ্য।

মৈথুন, স্বেদক্রিয়া, গুরুদ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম, দূষিত জল বায়ুর ব্যবহার, শিম, আলু, শাক ও লবণের ব্যবহার, অম্ল দ্রব্য ভোজন—এই রোগে অহিতকর।

মলমূত্রাদির বেগ ধারণ বসন্ত রোগীর একান্ত পরিত্যাজ্য।

বসন্তের গুটিকাগুলি শুষ্ক হইয়া আসিলে নিম্ব পত্র ও কাঁচা হরিদ্রা একত্র পিষিয়া লইয়া শরীরে লেপন করিবে।

পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও বসন্ত হইলে গৃহস্বামীর কর্তব্য।

১। পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও বসন্ত রোগ হইলে সেই বাটীর সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবেন।

২। জপ, হোম, পূজা, শান্তি-সস্ত্যয়ন ও শীতলা স্তোত্রাদি পাঠের ব্যবস্থা বসন্তাক্রান্ত রোগীর বাটীতে হওয়া কর্ত্তব্য।

৩। বসন্ত রোগীর পরিধেয় বস্ত্র দুই বেলা বদ্‌লাইয়া দেওয়া হইবে এবং সংক্রমণ নিবারণের জন্য সে বস্ত্র দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ধৌত না করিয়া বাটীতে প্রত্যহ সাবান দ্বারা ধৌতের ব্যবস্থা করিবে।

৪। চিকিৎসক ও পরিচর্য্যাশীল ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ সে গৃহে অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিবে না, বিশেষতঃ রাত্রিবাস একান্তই পরিহার করিবে।

৫। পিতা, মাতা, স্বামী বা অন্য পূজনীয় সম্পর্কের মধ্যে কাহারও বসন্ত হইলে—পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি সকলেই বসন্ত রোগীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে না।

৬। যে গৃহে আলোকের সুব্যবস্থা আছে, বসন্ত রোগীকে এইরূপ গৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

৭। বসন্ত রোগ জনিত জ্বর হইলে রোগী যাহাতে আদৌ জলস্পর্শ না করে—তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৮। নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিতি এই রোগ আরোগ্যের সহায়তা করিয়া থাকে;

৯। সিদ্ধির চূর্ণ মালিশ এই রোগে হিতকর।

১০। খদির কাষ্ঠ ও চালিতা গাছের ছালের দ্বারা ষড়ঙ্গ পানীয় বিধানে অর্দ্ধেক শুষ্ক করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং বসন্ত রোগীর শৌচের জন্য সেই জল ব্যবস্থা করিবে।

১১। এখন যেরূপ দিন-সময় পড়িয়াছে, তাহাতে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্র সুচিকিৎসকের শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য। উপেক্ষা

করিয়া বিনা চিকিৎসায় রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যে বাটীতে বসন্ত হইবে, সে বাটীতে মৎস্য আনা একেবারে বন্ধ করিবে। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় মৎস্য ও বাজারের দুগ্ধ ব্যবহার করা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে। আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই মৎস্য ও দুগ্ধ হইতেই বসন্তের সংক্রমণ হইয়া থাকে।

শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন
এম, এ, এম-বি।

হুক্ ওয়ার্ম বা বক্রাস্য ক্রিমি।

হুক্ ওয়ার্ম বা বক্রমুখ ক্রিমিকুল মানবজাতির ভীষণ শত্রু। এই কীটের উপদ্রবে ভারতের বহু সহস্র নরনারী আক্রান্ত হইতেছেন। বাঙ্গালার মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর প্রোক্ত রোগের আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সাধীয়সী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে তথাবিধ যত্নের ফলভোগ সর্ব্বদা সকলের পক্ষে সুলভ নহে; যাহাতে দেশীয় ঔষধাদির প্রয়োগেও কথিত পীড়ার প্রতীকার হইতে পারে—তজ্জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(২) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন এই রোগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; তখন আর ইহাকে নিতান্ত অভিনবও বলা যাইতে পারে না; তবে ভারতবর্ষে ইহার প্রাদুর্ভাব নূতন কিনা—সে কথা স্বতন্ত্র। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "হুক্ ওয়ার্ম" বা তজ্জাতীয় কোন ক্রিমির উল্লেখ আছে কিনা—প্রথমতঃ ইহা দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য বৈদ্যমণ্ডলীর মতে এই রোগ নূতন। দেশের জল-বায়ু প্রভৃতির স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে নূতন রোগের লক্ষণেরও তারতম্য হইতে পারে। পাশ্চাত্য স্বাধীনজাতির বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে তাঁহারা নানাবিধ বিস্ময়কর বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, পক্ষান্তরে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানোপজীবিগণ এক্ষেত্রে যে একেবারে নীরব থাকিবেন, তাহাও সমীচীন নহে; তবে যতদূর সম্ভব নূতন প্রাদুর্ভূত রোগ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত ও যাহা শাস্ত্রে লিখিত আছে—তাহারই আলোচনা—দেশীয় বৈদ্যগণের প্রথম কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রক্তজ ক্রিমির আকৃতি প্রকৃতি, উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, আলোচ্য হুক্ওয়ার্ম নামক ক্রিমির সহিত তাহার অনেক ঐক্য হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্রে বহুবিধ ক্রিমির উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি তাম্রবর্ণ, কোন কোন ক্রিমি শ্বেতাভ, কতক নিতান্ত সূক্ষ্ম, নবোদ্ভূত ধান্যাঙ্কুর সদৃশ, আবার কোন কোন ক্রিমি এতদূর সূক্ষ্ম যে চর্ম্মচক্ষুর সাহায্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব

হুক্‌ওয়াম নামক ক্রিমিকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রক্তজ ক্রিমির সম শ্রেণীর জীব বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না।

ক্রিমি প্রধানতঃ দ্বিবিধ ;—বাহ্য ক্রিমি ও আভ্যন্তর ক্রিমি। বাহ্য ক্রিমি শরীরের উপরিস্থিত চর্ম্মে সংলগ্ন ধূলি প্রভৃতি পদার্থে উৎপন্ন হয়—ইহাদিগকে সাধারণতঃ উকুন্‌ বলে। আভ্যন্তর ক্রিমি অন্ত্রনাড়ীতে, মলে, রসে, কফে এবং রক্তবাহি শিরায় জন্মে এবং তথায় অবস্থান করে। ইহাদিগকে কিঞ্চুলক বা কেঁচে ক্রিমি (Tape warm) বলে। এতদতিরিক্ত আরও অনেক কথা লিখিত আছে, প্রসঙ্গতঃ অল্প মাত্র উপদৃত হইল।

হুক ওয়ার্ম "চর্ম্মদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহারা রক্তবহা শিরায় পৌঁছায় * * * রক্ত ও রস ইত্যাদিতে পরিপুষ্ট ও সেইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে" এই প্রকৃতির সহিত প্রাচীন ভারতের বৈদ্যগণের প্রত্যক্ষীকৃত ক্রিমি লক্ষণের সাদৃশ সম্যক্‌ পরিলক্ষিত হয়—যথা, "রক্তবাহি শিরাস্থান রক্তজা জন্তবোঽণবঃ"। রক্তজ ক্রিমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহারা রক্তবাহি শিরায় বাস করে। শাস্ত্র বলেন ; সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদ্দর্শনাঃ। কোন কোন ক্রিমি এত সূক্ষ্ম যে, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। বর্ত্তমান কালে অনুবীক্ষণের সাহায্যে যে রক্তজ সূক্ষ্মতম ক্রিমি দৃষ্ট হয়, লোক লোচনের অবিষয়ীভূত সেই সকল ক্রিমি বা সূক্ষ্মতম পদার্থ পুরাকালের ঋষিগণ যোগবলে সম্যক্‌ অবগত ছিলেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল কিনা, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না। সুতরাং "সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদ্দর্শনাঃ" এই বাক্যের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, রক্তজ ক্রিমিসকল প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণের অপরিজ্ঞাত ছিল না।

ক্রিমির সাধারণ লক্ষণ ;—মানব-শরীরে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ হয়—

জ্বরো বিবর্ণতাশূলং হৃদরোগঃ সদনং ভ্রমঃ
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাত ক্রিমিলক্ষণম্‌॥

জ্বর, শরীরের বিবর্ণতা, শূল, হৃদরোগ (হৃদয়ে যন্ত্রণা বিশেষ, স্পন্দনাধিক্য ইত্যাদি) অপ্রসন্নতা ভ্রান্তি, অন্নে অরুচি এবং অতিসার হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে রক্তজ ক্রিমির যে সকল লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, হুর্কওয়ার্ম নামক ক্রিমির লক্ষণের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। যথা ;—রক্তজ ক্রিমি সকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থান করে, ইহারা অতিশয় সূক্ষ্ম, পাদবিহীন কতগুলি বৃত্ত, কতক তাম্রবর্ণ। আকার ও ক্রিয়াদি ভেদে ইহারা আবার ছয়প্রকার। তাঁহাদের নাম ;—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমোদ্দীপ, উড়ুম্বর সৌরস ও মাতৃসংজ্ঞক। ইহাদের সকল প্রকার ক্রিমিই যে হুকের স্থায় বক্রমুখ, তাহা অনুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন (বর্ত্তমান কালে) নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। এখন দেশীয় মতে এই রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রক্তজ ক্রিমি সকল এতই ভীষণ যে, তাহারা সকলেই কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ভারতের অধিকাংশ লোক নিরন্ন ও নিতান্ত দরিদ্র,—সুতরাং তাহারা উত্তম বসন ও আহারীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেনা ; কাজেই তাহারা অপবিত্র আহারীয় ও মলিন বস্ত্রাদির ব্যবহারে নানাবিধ দুরারোগ্য রোগের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। তবে

কেবল দারিদ্র্যই ভারতবাসীর রোগের কারণ নহে, অনেক সময়ে আলস্যবশতঃও অনেক ব্যক্তি স্বাস্থ্যের অনুকূল নিয়ম প্রতিপালন করে না, তজ্জন্যও তাঁহারা নিজ শরীরকে ব্যাধিমন্দির রূপে পরিণত করেন।

প্রোক্ত ক্রিমির অন্যান্য লক্ষণ সাধারণ ক্রিমি লক্ষণের ন্যায়, অতএব তাহার বিস্তৃতির আবশ্যক নাই। ইতঃপূর্ব্বে "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের ১১ সংখ্যায় হুকওয়ার্ম ক্রিমির প্রতীকার কল্পে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্য পালনীয়। রক্তজ ক্রিমির দেশীয় ঔষধ ;—বিড়ঙ্গাদিঘৃত, ক্রিমিমুদ্গর ও ক্রিমি কুলান্তক প্রভৃতি। আরও কয়েকটী যোগ কথিত হইতেছে ;—(১) পলাশবীজ, যমানী, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ইহা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে, উহা ৵০ মাত্রায় সকালে ও ৵০ আনা রাত্রি কালে সেব্য, অনুপান আনারসের পাতার রস, অভাবে জল। (২) ডালিমের শিকড়, ইন্দ্রযব, খোরমানীমানী ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ সম পরিমাণ। ইহা হইতে ৵০ মাত্রায় পূর্ব্ব অনুপানে বা পালদে মাদারের পাতার রস অনুপানে সেব্য। (৩) শুষ্ক কুচিলাচূর্ণ, হরিদ্রা সোমরাজী, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১০ বা ১৫ আনা মাত্রায় পূর্ব্ববৎ পানের রস সহ সেব্য। (৪) কেবুক, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, আপাঙ, বামনহাটী ও থানকুনী চূর্ণ ইহা পূর্ব্ববৎ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ ৵০ মাত্রায় সেব্য। ইহার অনুপান পালিধা মাদারের পাতার রস, মধু, অভাবে জল। 'ভাঁটের' সুকোমল পত্র ৵০ জলে বাটিয়া ২ রতি বিটলবণ সহ প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে শয়নকালে জলসহ সেব্য। রোগের অবস্থা এবং রোগীর বয়ঃক্রম প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। কথিত ঔষধের পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে প্রযোজ্য। বালকদিগকে অল্প মাত্রায় ঔষধ দিতে হইবে। যেস্থলে সুচিকিৎসকের অভাব, তথায় প্রোক্ত ঔষধের কোন একটী ব্যবহার করা উচিত।

শ্রীসারদাচরণ সেন কবিরত্ন।

মদাত্যয়।

—:*:—

অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় মদ্যপান বিধি সমধিক প্রচলিত না থাকিলেও মদ্যপান বিরল বা একেবারে নিষিদ্ধ নহে। গুণগ্রাহি-মহাত্মাগণ গুণেরই আদর করিতেন, ভক্ষ্য অভক্ষ্য বা পাপ পুণ্য লইয়া সমাজকে বিচলিত করিতেন না, সেই জন্য আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায়ও কতকগুলি ঘৃণার্হ দ্রব্য সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অদ্য সে বিষয়ের মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই, তবে বলিতে হইবে মদ্যপান শাস্ত্র ও সমাজ

বিরুদ্ধ হইলেও আয়ু'র্ব্বেদ মতে নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সমুদায় রীতিতে মদ্য পান উল্লিখিত হইয়াছে, আধুনিক মদ্যপায়ি-দিগের পক্ষে ঐ রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা অতীব দুরূহ ব্যাপার। এমন সুখের বিনিময়ে ঘোর দুঃখ ভোগ মদ্যপায়ীর স্বতঃসিদ্ধ। যাঁহার হৃদয়ে বল আছে, চিত্তে সংযমনী শক্তি আছে, তিনিই যেন সুখের আশায় মদ্যপান করেন। নচেৎ নির্ধন ধনবান, রোগী নীরোগ, ইতর ভদ্র—কাহারও পক্ষে মদ্যপান সঙ্গত নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। এখন ধর্ম্মের জন্য মদ্যপান নাই যোগসিদ্ধির জন্য মদ্যপান নাই, ঔষধার্থ মদ্যপান নাই, আছে বিলাসিনীর কালকূট পূর্ণ কটাক্ষরূপ কন্দর্পশরজর্জ্জরীত যুবকের যন্ত্রণা নিবারণার্থ। তন্ত্রযুক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রথা বহুকাল হইতে গুপ্ত ভাবে চলিতেছিল, কিন্তু এখনকারদিনে ভারতে আর সে গুপ্তভাব নাই, প্রকাশ্যেই উহার সংঘটন হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহাদিগকে আমরা শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাব শালী, ধনবান ও বিদ্বান বলিয়া মনে করি, তাহাদেরও অধিকাংশই ঐ ভয়ঙ্কর দোষে দূষিত। অনুকরণ প্রিয় ভারতবাসী আবার উহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া মজিতে বসিয়াছে। সুরারাক্ষসীর করাল দশন বিকাশ কে না দেখিয়াছে? সর্ব্বসংহারিণী সুরার অসীম শক্তিতে কত শত অমরাবতী বিনিন্দিত সুরম্যহর্ম্ম্য মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। সুরা সাহায্যে কত শত বলিষ্ঠ যুবক—শীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কালসার কলেবরে কাল কবলে কবলিত হইতেছে। মনুষ্য সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোহত্যা, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি কোন্ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে? বাস্তবিক দেখিতে গেলে ধর্ম্মশাসনের ন্যায় সমাজশাসনের ন্যায়, পারিবারিক শাসনের ন্যায় ইহা বন্ধ করিবার শাসন সুদৃঢ় নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রথা ছিল বটে, কিন্তু তাহা বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে। যাহা হউক, অনেকে মনে করেন, ঈদৃশ অনিষ্টজনক মদ্যপান কিরূপে সার্ব্বজনীন আয়ুর্ব্বেদে বিধি বিহিত হইল? আবার অনেক সময় আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া অনেকে সুরা পিপাসার শান্তিও করিয়া থাকেন। আজ আমরা সেই জন্য কিরূপ সুরাপান আয়ুর্ব্বেদানু-মোদিত ও সুরার দোষগুণ কি, তাহাই সাধারণের অবগতির জন্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষশ্চ যৎপরম।
মনঃ সমাধৌ তৎ সর্ব্বমায়ত্তং সর্ব্ব দেহিনাম॥

মনুষ্যদিগের ইহকাল ও পরকাল যাহা শ্রেয়ঃ, মঙ্গল ও মোক্ষ উহা সম্পূর্ণভাবে চিত্তেরএকাগ্র-তার আয়ত্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত ইহ ও পরকালে শ্রেয়ঃ মোক্ষ, বা মঙ্গললাভ করা যায় না। মদ্যপানে চিত্তের সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, সুতরাং ইহ ও পরকালে মদ্যপায়ীরা কথনই শ্রেয়ঃ বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।

মদ্যেন মনসশ্চাস্য সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্।
মহা মারুতবেগেন তটস্থস্যেব শাখিনঃ॥

প্রবল বায়ুবেগে নদীতটস্থ বৃক্ষ যেরূপ আন্দো-লিত হয়, সেইরূপ মদ্যপানে মনের যৎপরো নাস্তি সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। মদ্যপানে মনের স্থিরতা সম্পাদন অতীব দুরূহ ব্যাপার।

মদ্যপ্রসঙ্গ মজ্ঞাত্বা মহাদোষং মহাগদম্।
সুখমিত্যধি গচ্ছন্তি রসে মোহ পরপিতাঃ॥

রজঃ ও তমো গুণাভিভূত ব্যক্তিগণ মদ্যপানের রোগোৎপাদক মহাদোষ না জানিয়া সুখের আশায় মদ্যাসক্ত হইয়া পড়েন ও চিরকাল

মদ্যপান দুর্নিবার অপকার ভোগ করিতে থাকেন।

মদ্যোপহত বিজ্ঞানা বিযুক্তা সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধাঃ মদলালসাঃ॥
মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ।
সোন্মাদ মদ মূর্চ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপ তানকাঃ॥
যত্রৈকঃ স্মৃতিবিভ্রংশ স্তত্র সর্ব্বমসাধুবৎ।
ইত্যেবং মদ্য দোষজ্ঞা মদ্যং গর্হন্তি যত্নতঃ॥

মনুষ্যগণ মদ্যপান করিয়া অজ্ঞানরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পরে স্বাভাবিক সাত্বিকগুণ সমুদায় হীন হয়, সুতরাং মদলালস মদান্ধ ব্যক্তিকে সত্বর মঙ্গল সমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। মদ্য হইতে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, উন্মাদ, মণ্ডল মূর্চ্ছা, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্য হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তও. সংঘটিত হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা হইতে একমাত্র স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়, এমন কোন অমঙ্গল নাই—যাহা তাহা হইতে সংঘটিত হইতে পারে না। মদ্য দোষজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে সর্ব্বদা মদ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন।

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তা স্তেঽপি মদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।

বিষের যে সমুদায় গুণ আছে অর্থাৎ বিষে যে সমুদায় অনিষ্টকারিণী শক্তি আছে, মদ্যেরও তাদৃশী শক্তি।

সত্যমেতে মহাদোষা মদস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অহিতস্যাতি মাত্রস্ত পীতস্য বিধি বর্জ্জনম॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম।
অযুক্তি যুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম॥
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম॥

পূর্ব্বে মদ্যের যে সমুদয় দোষ উল্লিখিত হইল, মদ্যপান বিধি অতিক্রম করিলে বাস্তবিকই ঐ সমুদায় দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বিধি বিহিত মদ্যপানে অপকার না ঘটিয়া উপকারই ঘটিয়া থাকে। উহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে। মদ্য স্বভাবতঃ অন্ন সদৃশ হিতকর দ্রব্য। অবৈধভাবে সেবিত হইলে নানাবিধ রোগের কারণ হয় বটে, কিন্তু বিধি অনুসারে পীতমদ্য অমৃত সদৃশ হিতকর বস্তু। যে অন্ন প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ তাহাও অযথারূপে সেবিত হইয়া প্রাণনাশক হয় এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক গুণসম্পন্ন বিষও যুক্তি অনুসারে সেবিত হইয়া রসায়ন সদৃশ উপকার করে। মদ্যও তদ্রূপ। যুক্তিপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে হর্ষ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পৌরুষ জন্মে। যে মদ্যপানে মত্ততা জন্মে, দুঃখ না হইয়া সুখ হয়, ঐ মদ্য রুচিকারক, পাচকাগ্নির উদ্দীপক, হৃদয়ের সন্তোষ জনক, বলকারক, ভয়-শোক এবং শ্রমনাশক, নিদ্রাজনক এবং বাকপটুতা জনক, এবং অতিনিদ্র ব্যক্তির প্রবোধক, মল মূত্রের বিবদ্ধনাশক, আঘাত প্রাপ্তি এবং বন্ধনাদি যন্ত্রণা নিবর্ত্তক। ইহা ভিন্ন মদ্য অনেক রোগের নিবর্ত্তক, রতিবর্দ্ধক, মনঃসংযোগকারক-প্রীতি বর্দ্ধক এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির উৎসাহ ও আনন্দ জনক।

বহু দুঃখ কৃতাস্থাম্য শোকেনোপ হতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতং।

বহুবিধ দুঃখ ও শোকাভিভূত ব্যক্তির যুক্তি পূর্ব্বক নিষেবিত মদ্যই একরূপ বিশ্রাম স্থল অর্থাৎ ক্লেশ নিবারক।

অনুপান বয়োব্যাধি বল কাল ত্রিকানি ষট।
ত্রীণ দোষাং স্ত্রিবিধং সত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেৎ সদা।

ত্রিবিধ অন্ন, ত্রিবিধ পান, ত্রিবিধ বয়ঃক্রম, ত্রিবিধ ব্যাধি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ বল, ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিবিধ সত্ত্ব এই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মদ্যপান করা কর্ত্তব্য।

তেষাং ত্রিকাণামষ্টানাং যোজনা যুক্তিরুচ্যতে।
যথাযুক্ত্যা পিবেন মদ্যং মদ্য দোষৈর্নবুজ্যতে ॥

উল্লিখিত ত্রিবিধ অন্নাদির সম্যক যোজনার নাম যুক্তি, ঐ যুক্তি অনুসারে মদ্যপান করিলে কোন দোষই ঘটে না।

অপানে সাত্ত্বিকান বুদ্ধ্বা তথা রাজস
তামসান।
জহ্যাৎ সহায়ান যৈঃ পীত্বা সহ দোষানুপাশ্নুতে ॥

মদ্যপান স্থলে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বিবেচনা করিয়া মদ্যপান করা উচিত, যাহাদের সহিত মদ্যপান করিলে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত কখনই মদ্যপান করা বিধেয় নহে। আজকাল এই সঙ্গদোষ বিবেচনা না করার জন্যই অনেক লোককে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়। যে সমুদায় ব্যক্তি সুশীল, মিষ্টভাষী, সুমুখ, সজ্জন, গীত বাদ্যাদিকলাকুশল বিশদবাক, বিষয়াদিতে অত্যাশক্তি রহিত, পরস্পর বশীভূত ও সৌহার্দ্দ যুক্ত, যাহারা সুমধুর হাস্য ও প্রীতিজনক বাক্য দ্বারা পান ভূমির উৎসব পূর্ণ করে, এবং যাহারা পরস্পর দর্শনে সুখবোধ করে, তাহাদিগের সহিত মদ্যপান করিলে মদ্যপায়ী আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ্যপানের কতিপয় ক্রম লিখিত হইল-অধিক লেখা আবশ্যক মনে করিনা, কারণ আমাদের মতে মদ্যপান বিশেষ গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে।

মদ্যের পরিমাণ ও তীব্রতা ভেদে চারি প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয়। অতঃপর যথাক্রমে ঐ সকলের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বুদ্ধিস্মৃতি প্রীতিকরঃ সুখশ্চ পানান্ন নিদ্রা
রতি বর্দ্ধনশ্চ।
সংপাঠ গীতস্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোতি রম্যঃ
প্রথমোমদো হি ॥

প্রথম মদ বুদ্ধি প্রকাশক, স্মরণ শক্তিবর্দ্ধক, প্রীতিজনক, সুখোৎপাদক এবং পান ভোজন, রতিশক্তি ও কণ্ঠস্বর সংবর্দ্ধক, এইরূপ মদাবস্থা অতীব সুখকর। যাহাদের মদ্যপান নিতান্ত প্রয়োজন, তাঁহারা যেন এইরূপ ভাবে মদ্যপান করেন; অর্থাৎ উল্লিখিত লক্ষণ সমুদায় হইতে অতিরিক্ত কোন লক্ষণ উপস্থিত না হয়। বাস্তবিক পক্ষে কেহই মদ্যপানে স্থির থাকিতে পারে না, আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিই ইহার মূল কারণ অর্থাৎ প্রথম মদ্যপানের পর সকলেই মনে করেন আরও একটু পান করিলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখোদয় হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হইয়া পড়ে।

অব্যক্ত বুদ্ধি স্মতি বাগ্বিকচেষ্টঃ সোন্মত্তললাকৃতি
রপ্রশান্তঃ।
আলস্য নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ
পুরুষো মদেন ॥

দ্বিতীয় মদমত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ও বাক্য সম্যক ব্যক্ত নহে অর্থাৎ জড়তাযুক্ত, চেষ্টার বিকৃতি আকৃতি ও কার্য্য উন্মত্তের ন্যায় এবং মুহুর্মুহু আলস্য ও নিদ্রার আবির্ভাব—এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলেই মদ্যপান হইতে বিরত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, নচেৎ অতীব দুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হয়, ইহার নাম দ্বিতীয় মদ।

গচ্ছেদগম্যা ন্ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি
চ নষ্ট সংজ্ঞঃ।

ক্রয়াচ্চ গুহ্যাণি হৃদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে
পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ।

মদ্যপানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা নিবৃত্ত হয়না, আরও অধিক পান করিতে থাকে, ঐ সমুদায় ব্যক্তির নিন্দণীয় তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে মনুষ্য অগম্য নারীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, গুরুজনের অবমাননা করে, এবং হৃদয়স্থ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করে ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করে। এতদবস্থ ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য ও আপনার অনায়ত্ত হইয়া পড়ে।

চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
কার্য্যাকার্য্য বিভাগজ্ঞো মৃতাদপ্য পরো মৃতঃ॥
কোমদং তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদমিব চাপরম্।
বহুদোষমিবা মূঢ়ঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী॥

অতঃপর চতুর্থ মদাবস্থায় মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানশূন্য, ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিকারশূন্য হইয়া পড়ে। চতুর্থ মদবস্থ ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অমূঢ় অর্থাৎ বিকার শক্তি সম্পন্ন আত্মবান কোন কৃতী ব্যক্তি বহু দোষোৎপাদক বিবিধ হিংস্রজন্তুসংকুল দুর্গম পথের ন্যায়, চতুর্থ মদবস্থায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না। মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়শঃই সকলকে যুক্তিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয় এবং অবশেষে নানাবিধ বিপদে পতিত হইতে হয়। তুলনা করিতে গেলে মদ্যপানে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক। সুতরাং কাহারও পক্ষে মদ্যপান যুক্তি ও শাস্ত্র সম্মত নহে।

নির্ভক্তমেকান্তত এব মদ্যং নিষেব্য মাণং
মনুজেন নিত্যং।
আপাদয়েৎ কষ্ট তমান্ বিকারানাপাদয়ে
চ্চাপি শরীর ভেদম্॥

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্নাদি উপকরণ হীন মদ্য-পান করিলে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্ট-দায়ক রোগ জন্মে ও পরিশেষে তদ্দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন
বুভুক্ষিতেন॥
ব্যায়াম ভারাধ্ব পরিক্ষতেন, বেগাবরোধাভি-
হতেন চাপি॥
অত্যম্ল ভক্ষাবততোদরেণ সজীর্ণ ভুক্তেন
তথাবলেন॥
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্য মানং করোতি মদ্যং
বিবিধান্ বিকারান্॥

ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও ক্ষুধার সময়, ব্যায়াম, ভার বহন বা পথ পর্য্যটন ক্লান্ত অবস্থায়, মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগরোধ করিয়া, অন্ন ভোজন বা জল পান দ্বারা উদরের পূর্ণাবস্থায় এবং উষ্ণাবস্থায় অর্থাৎ পরিশ্রমাদির দ্বারা শরীর উষ্ণতা হইলে মদ্য-পান করিবে না, উহাতে পানাত্যয়াদি কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়।

পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা
পান বিভ্রমমুগ্রঞ্চ যকৃৎ রোগং করোতি তৎ॥
তৎ অবধি পীত মদ্য মিত্যর্থঃ।

শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ, পান বিভ্রম ও দারুণ যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। পানাত্যয় ও মদাত্যয় এই দুইটী শব্দ একার্থ বাচক, সুতরাং মদাত্যয়াধিকার নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

হিক্কাশ্বাস শিরঃ কম্প পার্শ্ব শূল প্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্ বহু প্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

বাতিক মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃ কম্পন, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রানাশ ও প্রলাপ বাহুল্য—এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর স্বেদ-মোহাতিসার বিভ্রমৈঃ।
বিস্তাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, অতিসার, ভ্রম ও দেহের হরিত বর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ছর্দ্দ্যরোচক হৃল্লাস তন্দ্রা স্তৈমিত্য গৌরবৈঃ।
বিস্তাচ্ছিত পরিতস্ত কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমনবেগ, তন্দ্রা, গাত্রে আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বোধ,—দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক মদাত্যয় জানিতে হইবে। পরমদ প্রভৃতিতে মদ্যাত্যয় লক্ষণের অতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ লক্ষিত হয়। পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্মপ্রাচুর্য্য, নাসাস্রাব, দেহভার, মুখবৈরস্য, মলমূত্র রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, শিরোবেদনা ও সন্ধি সমুদয়ে ভঙ্গবৎ বেদনা প্রভৃতি শ্লেষ্ম লক্ষণ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়।

পীতমন্ত জীর্ণ না হইয়া পানাজীর্ণ রোগ জন্মায়। ইহাতে অতি ক্লেশকর উদরাষ্মান, বমন, অথবা মত্তগন্ধযুক্ত উদ্গার ও গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পান বিভ্রমাখ্য রোগে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষস্থলে সূচিবেধবৎ বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধুম নির্গমবৎবোধ, মূর্চ্ছা, বমি, শিরঃপীড়া, দাহ এবং গৌড়ী (ধেনো) কাদম্বরী (তাড়ি) প্রভৃতি মদ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়।

মদ্যানাং সততাভ্যাসাৎ তীব্র মদ্য নিষেবনাৎ।
নিরন্নাদপি পানাচ্চ যকৃদ্রোগো ভবন্তি হি॥
যকৃদ্রোধিকারে তান্ সলক্ষণ চিকিৎসিতান্।

বিবিধ মদ্যের নিরন্তর পান, তীব্র মদ্যপান ও খাদ্য রহিত মদ্যপান প্রভৃতি কারণে যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। যকৃতে যে সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে, ঐ সমুদায় এবং তাহার চিকিৎসা প্লীহা যকৃদধিকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীহরিপদ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিভূষণ।

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা।

সাধারণের ধারণা যে রোগে যাহা খাওয়া হিতকর, সেই রোগে তাহাই পথ্য। হিতকর খাদ্য ত পথ্য বটেই, কিন্তু যে রোগে যাহা কিছু হিতকর; সেই রোগে তাহাই পথ্য। যেমন নবজ্বরে উপবাস পথ্য।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বরের প্রথমেই উপবাস দিতে বলা হইয়াছে। কেবল বলা নয়, জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন অমৃতের ন্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেন?

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছে,—আমাশয়স্থ আম

(অপক্ব আহার রস) সংযুক্ত দোষ সকল (বায়ু, পিত্ত, কফ) অগ্নিকে নষ্ট করিয়া এবং মার্গ (ঘর্ম্মাদি স্রোতঃ) সকলকে রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে বলিয়া জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত।

সুস্থ শরীরে শারীরিক স্রোতঃ সকল প্রকৃতিস্থ থাকে এবং অগ্নি প্রবল থাকায় ক্ষুধা হয়। কিন্তু জ্বর হইলে অগ্নি নষ্ট হওয়ায় ক্ষুধা হয় না এবং ক্ষুধা না হইলে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।—ইহা একটা সাধারণ যুক্তি।

জ্বর একরূপ নহে, অতি সামান্য জ্বর হইতে সঙ্ঘোমারাত্মক প্রবল জ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জ্বরেরই সাধারণ সংজ্ঞা জ্বর। জ্বর যত মৃদু হয়, শরীরের এবং শারীরিক যন্ত্রাদির ততই অল্প বিকৃতি ঘটে, আর জ্বর যত প্রবল হয়, শরীরের ও শারীরিক যন্ত্রাদির ততইঅধিক বিকৃতি ঘটে। সেই জন্য মৃদু জ্বরে অল্প এবং প্রবল জ্বরে অধিক উপবাস দেওয়া আবশ্যক।

জ্বরের প্রাবল্যের তারতম্য অনুসারে যেমন অল্প বা অধিক উপবাস দেওয়ার বিধি আছে, সেইরূপ যে সকল জ্বরে লঙ্ঘন দিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেই সকল জ্বরে লঙ্ঘন নিষেধ করা হইয়াছে। যথা ঃ—

"বায়ু জনিত জ্বর, ক্ষয়জনিত জ্বর, মানস দোষ জনিত জ্বর (যেমন কাম বা ক্রোধ জনিত জ্বর) এবং পূর্ব্বে দ্বিত্রণীয়াধ্যায়ে যাহাদিগকে উপবাসের অযোগ্য বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে লঙ্ঘন দিবে না।"

দ্বিত্রণীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে ঃ—

"ঊর্দ্ধ বায়ু (হিক্কাদি), তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মুখ শোষ এবং শ্রম (বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ—মতান্তরে ভ্রম) পীড়িত রোগীকে এবং গর্ভিণী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তি-দিগকে উপবাস করাইবে না।

এই সকল ক্ষেত্রে উপবাস দিলে অনিষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রকার এই সাধারণ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে জ্বরের প্রাবল্য, বহু দোষের সহিত সঞ্চিত অগ্নির নাশ, বমনোদ্বেগ প্রভৃতি থাকিলে যুক্তি পূর্ব্বক অল্প অল্প উপবাস দেওয়া আবশ্যক ও হিতকর —ইহা আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যথা সময়ে সে সম্বন্ধে বলা যাইবে।

পাঠকগণ ইহা মনে রাখিবেন যে, শাস্ত্র-কারগণ চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, রোগীর অবস্থা ভেদে যুক্তি পূর্ব্বক সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হয়। কেননা, জগতে একরূপ আকৃতি বিশিষ্ট দুইটী লোক যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ ঠিক এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট দুইটী লোক দেখা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের প্রথম সাত দিন তরুণ জ্বর বলা হয়। চরকে কথিত হইয়াছে ঃ—যথা

"প্রজ্জলিত অগ্নি ইন্ধন যুক্ত হইলেও যদি বায়ু কর্ত্তৃক বহিঃ প্রেরিত হয়, তাহা হইলে যেমন স্থালী (হাড়ি) স্থিত অন্ন পাক করিতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল অগ্নি স্থান হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত করে বলিয়া জ্বররোগী অন্ন আহার করিলে অগ্নি তাহা পাক করিতে পারে না বা কষ্টে লঘু অন্ন পাক করিতে পারে। এইজন্য বল রক্ষার্থ লঙ্ঘনাদি আবশ্যক। প্রথমে লঙ্ঘন পরে পেয়া ইত্যাদি হিতকর, এক সপ্তাহে সর্ব্ব ধাতু গত মল (কুপিত বায়ু পিত্ত যথা) পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সাধারণ সূত্রের উপর নির্ভর

করিয়া সকল ক্ষেত্রে উপবাস দেওয়া চলে না। উপবাস পাছে অল্প বা অধিক হয় সেই জন্য শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"যাবৎ কাল পর্য্যন্ত দোষ স্থির ভাবে অবস্থিত থাকায় শরীরের বদ্ধবৎ বোধ হয় তাবৎকাল উপবাস দিবে। পরে লঘু পথ্য দিবে।

আম বা তরুণ জ্বরের লক্ষণ—লালা নিঃসরণ, বমনভাব, হৃদয়ের ভারবোধ, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, খাদ্য অবিপাক, মুখের বিরসতা, শরীরের গুরুতা, ক্ষুধার নাশ, প্রচুর মূত্র নিঃসরণ এবং জ্বরের স্তব্ধতা ও প্রাবল্য এই গুলি আমজ্বরের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ থাকা পর্য্যন্ত উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

দোষপাকেরলক্ষণ—জ্বরের মৃদুতা, শরীরের লঘুতা ও মল নিঃসরণ—এইগুলি দোষ পাকের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে লঘু পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সম্যক উপবাস দেওয়া হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, অধোবায়ু, মূত্র ও মল নির্গম, শরীরের লঘুতা, হৃদয়ে উদ্গার, কণ্ঠের ও মুখের বিশুদ্ধতা, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ আহারে রুচি, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং মন প্রসন্ন (গ্লানি রহিত) হইলে সম্যক উপবাস দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জ্বরে উপবাস দিলে কি ফল হয়, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, অনবস্থিত (যাহা স্ব স্থানে এবং উপযুক্ত পরিমাণে নাই) দোষ এবং অগ্নি বিশিষ্ট জ্বর রোগী উপবাস করিলে তাহার দোষ পরিপাক পায়, অগ্নি দীপ্ত হয়, জ্বর নষ্ট হয়, শরীর লঘু হয় এবং অন্নে আকাঙ্ক্ষা ও রুচি হয়।

নবজ্বরে উপবাস অমৃতের ন্যায় হিতকর বলায় উপরোক্ত উপদেশাদি সত্বেও পাছে রোগীকে অধিক উপবাস করান হয়—সেই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"লঙ্ঘন প্রাণের (বলের) বিরোধী বলিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘন দ্বারা বলহানি ঘটে বলিয়া রোগীকে অতিরিক্ত লঙ্ঘন করাইবে না। কারণ যে আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা করা যায়—বলই সেই আরোগ্যের অধিষ্টান অর্থাৎ বলকে আশ্রয় করিয়া আরোগ্য লাভ ঘটে।

অতিরিক্ত উপবাস দিলে রোগীর বলহানি হয় এবং বিবিধ উপসর্গ ঘটে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, অতিরিক্ত লঙ্ঘনের ফলে পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, শরীর বেদনা, কাস, মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধার নাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, চক্ষু ও কর্ণের দুর্ব্বলতা, মনের ভ্রান্তি, প্রবল ঊর্দ্ধগত (হিক্কা, শ্বাস, কর্ণে শব্দ), হওয়া হাই উঠা, মোহ, এবং দেহ, অগ্নি ও বলের হানি ঘটিয়া থাকে। । এইজন্য জ্বর রোগীকে কদাচ অতিরিক্ত উপবাস দিবে না।

নবজ্বরে উপবাস সম্বন্ধে এই সকল সুন্দর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সন্নিপাত জ্বরে উপবাস সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। টাইফায়েড জ্বর, নিউমানিয়া প্রভৃতি—সন্নিপাত জ্বরের অন্তর্ভুক্ত। সন্নিপাতজ্বরে চিত্তের বিকৃতি ঘটিলে তাহা জ্বরবিকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাত জ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন বা যতদিন রোগী আরোগ্য-পথে অগ্রসর না হয়, ততদিন লঙ্ঘন দিবার উপদেশ

দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে অতিরিক্ত উপবাসের বিষম অনিষ্টকারিতার বিষয় বলার পর এইরূপ দীর্ঘ উপবাসের ব্যবস্থা করায় শিক্ষার্থির মন সন্দেহাকুলিত হইতে পারে। তজ্জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

লঙ্ঘনে যে এইরূপ সহিষ্ণুতা অর্থাৎ এত দীর্ঘকাল লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারা —তাহা কেবল দোষের অর্থাৎ কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফের শক্তি বশতঃ ঘটিয়া থাকে দোষের ক্ষয় হইলে কখনই লঙ্ঘনাদি (লঙ্ঘন ও স্বেদাদি) সহ্য করিতে পারে না।

আমরা বহুস্থলে এই শাস্ত্রবাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিয়াছি। সন্নিপাতজ্বরে উপবাস দিলে রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করে। বালকেরাও সন্নিপাত জ্বরে যথেষ্ট উপবাস সহ্য করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম হইতে আহার দিলে তাহা রোগীর মৃত্যু বা দীর্ঘকাল রোগভোগের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। সুখের বিষয় এই, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ক্রমশঃ এই তথ্য বুঝিতে পারিতেছেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক অস্লার সাহেব তাঁহার প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থে টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরের পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই রোগে একেবারে খাদ্য দিতে নিষেধ করেন।

পূর্ব্বে নবজ্বরে সম্যক লঙ্ঘনের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে এবং যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পথ্য দিবার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই লক্ষণ বিচার করিয়া সন্নিপাতজ্বরেও পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নবজ্বরে এক্ষণে এত অধিক উপবাস সহ্য হয় না। অনেক স্থলেই ইহা সত্য। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। এক্ষণে অধিকাংশ লোকেই দুর্ব্বল। সুতরাং এখনকার দুর্ব্বল লোকদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া উপবাসের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত উপবাসের কোন একটী উপসর্গ ঘটিলেই লঘু পথ্য প্রয়োগ করা উচিত। রোগী বলবান হইলে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত উপবাস দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন্নিপাত জ্বরে দোষের শক্তি বশতঃ লঙ্ঘন সহ্য হয় বলিয়া যথোপযুক্ত লঙ্ঘন হেতু কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

নবজ্বরে পিপাসা হইলে জল সংস্কৃত করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত।

চরকে লিখিত হইয়াছে—জ্বর আমাশয়কে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। আমাশয় জাত রোগে বিরেচন, বমন, উপবাস ও সংশমন হিতকর। উষ্ণ জল ঐ সকলের সাধক এবং পাচক বলিয়া জ্বরে হিতকর। ইহা দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয়, অগ্নি প্রবাহ হয়, উষ্ণ জল শীঘ্র পরিপাক পায়, শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে এবং পান করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত করে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে,—উষ্ণ জল অগ্নিদীপক, সংহত কফেরচ্ছেদকারক, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমক, এবং তৃষ্ণানাশক, এই জন্য বায়ুজনিত শ্লেষ্মাজনিত বা বাতশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে হিতকর। অপিচ উষ্ণ জল পান করিলে দোষ সকলের অল্পতা ঘটে এবং স্রোতোপথ সকল বিশুদ্ধ হয়।

শীতল জল উষ্ণ জলের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শীতল জল পান করিলে জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্ত জ্বর, মদ্যপানজনিত জ্বর এবং

বিষজ জ্বরে তিক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। এই প্রকারে সিদ্ধ করা জল এবং উষ্ণ জল অগ্ন্যুদ্দীপক, পাচক,জ্বরনাশক, স্রোতঃ শোধক, বলকর রুচি জনক এবং ঘর্ম্মজনক।

ষড়ঙ্গ পানীয়—মুতা, ক্ষেত পাঁপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি—মোট দুই তোলা লইয়া ধুইয়া থেঁতো করিবে। পরে চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া লইবে; এই জল শীতল করিয়া পান করিতে দিলে পিপাসা ও জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। মতান্তরে শুঠী স্থলে পদ্মকাষ্ট লইবার বিধি আছে

বাতপিত্ত জ্বরে ষড়ঙ্গপানীয় অথবা উষ্ণ জল শীতল করিয়া এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও ত্রিদোষজ জ্বরে উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

সন্নিপাত জ্বরে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকিলেও পুষ্টিকর খাদ্য দিবে না এবং দাহ ও তৃষ্ণায় অভিভূত হইলেও শীতল জল পান করিতে দিবে না।

জ্বরে উষ্ণ জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া, সেই জল সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে দেওয়া উচিত।

লঙ্ঘন এবং জল পানের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে কিরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে. শাস্ত্রকার মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী,—জ্বররোগে পথ্যের জন্য দিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

মণ্ড, পেয়া, ও বিলেপী লঘু বলিয়া এবং ঔষধ সহ সংস্কৃত হওয়ায় অগ্ন্যুদ্দীপক এবং বায়ু, মূত্র, পুরীষ ও দোষের অনুলোমক হইয়া থাকে, তরল ও উষ্ণ বলিয়া ঘর্ম্ম উৎপাদন করে, তরল বলিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, আহার বলিয়া বল জন্মায়, সাহস বলিয়া শরীরের লঘুতা সম্পাদন করে, জ্বরে হিতকর বলিয়া জ্বর নষ্ট করে,—এইজন্য মদ্যপান জনিত জ্বর ব্যতীত অন্য জ্বরে যবাগূ পথ্য দিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রী ———বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ওলাউঠা চিকিৎসা।

ওলাউঠা কাহাকে বলে? ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থই বা কি? এবং কোন্ ভাষা হইতেই বা এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে? ইত্যাদি বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। আয়ুর্ব্বেদীয় কোনো গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল আলোচনা করিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, "ওলাউঠা আয়ুর্ব্বেদ বহির্ভূত এক প্রকার নূতন রোগ। পাশ্চাত্য দেশের সমুন্নত স্থান হইতে এই রোগ ভারতে আসিয়াছে, এই জন্যই ইহার চিকিৎসা বিধান আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং কবিরাজ দ্বারা এই পীড়ার চিকিৎসা হওয়া

* ওলা—ভেদ, উঠা—বমন।

সর্ব্বথা অসম্ভব।” কিন্তু সাধারণতঃ এ রোগের যে সকল লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাকে আমরা নূতন রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রথমতঃ রোগীর অত্যন্ত মলভেদ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্ম্মুহুঃ বমন হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর স্বরভঙ্গ, হিক্কা, মূত্ররোধ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, উৎবেষ্টন, অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খালি ধরা প্রভৃতি লক্ষণ জুটিয়া রোগীকে সাতিশয় যন্ত্রণা দিতে থাকে। সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও দন্তসমূহ নীলবর্ণ হয়। কাহারও কাহারও বক্ষোদেশের তীব্র বেদনা ও শিরঃশূল উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ও কোটরগত হইতেও দেখা যায়। এবম্বিব লক্ষণাক্রান্ত অন্য কোন রোগ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে কিনা,—এক্ষণে আমাদের ইহাই আলোচ্য। সনাতনশাস্ত্রে ওলাউঠা শব্দের প্রয়োগ না থাকুক, কিন্তু তাহার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ বিশিষ্ট অপর কোন রোগের উল্লেখ থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিব কেন? যদি শাস্ত্রবর্ণিত সেই রোগের চিকিৎসা দ্বারা ওলাউঠা রোগেরও সর্ব্বতোভাবে প্রতীকার ঘটাইতে পারা যায়, তাহাতেই বা শিথিলচেষ্ট হইব কেন?

আয়ুঃ শাস্ত্রে বিসূচিকা রোগের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিসূচিকা রোগের নিদান ও লক্ষণের বিষয় অনুশীলন করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যাহাকে বিসূচিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান কালে ওলাউঠা নাম ধারণ করিয়াছেন! ফলতঃ ইহা কোন নূতন রোগ নহে, কেবল নামটিই নূতন। নিদান সংগ্রহ কর্ত্তা ধীমান্ মাধবকর বলিয়াছেন:—

(১) যে পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতি কুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অত্যন্ত বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করিয়া তুলে, বৈদ্যগণ তাহাকে বিসূচিকা বলিয়া থাকেন। (২) এই রোগে মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূলবৎ বেদনা, হস্ত পদে খালি ধরা, জৃম্ভা (হাই); গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা, ও শিরঃশূল উপস্থিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগে এতদ্ব্যতীত নূতন কোন লক্ষণ প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় না। তবে দেখা যাইতেছে যে, আজকাল লোকে যাহাকে ওলাউঠা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, আয়ুর্ব্বেদ, শাস্ত্রে সেই রোগই বিসূচিকা বলিয়া বর্ণিত। এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে কেমন করিয়া এই বিসূচিকা রোগ জীবদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে শারীর স্থান এবং অন্নবিপাক ক্রিয়াপদ্ধতি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, একমাত্র অজীর্ণ রোগই অধিকাংশ রোগের প্রসূতি। (৩) যাহারা লোভপরায়ণ, ঔদরিক, পশুবুদ্ধি ও হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া অপরিমিত আহার করে, তাহারাই নানারোগের মূল স্বরূপ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়।

(১) সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন সন্তিষ্ঠতেহ নিলঃ। যস্যা জীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচিতি নিগদ্যতে॥

(২) মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভ দাহাঃ। বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥

(৩) অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেহ প্রমাণতঃ। রোগানীকস্য তে শূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥

(১) এই অজীর্ণ রোগ তিন প্রকার :—

(ক) অর্থাৎ আমাজীর্ণ, (খ) বিষ্টব্ধাজীর্ণ (গ) বিদগ্ধাজীর্ণ। এবং ইহাদের—হইতেই বিসূচিকা, বিলম্বিকা, অলসিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) শাস্ত্রদর্শী পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, যাহারা আত্মসংযমে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং পেটক, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, একমাত্র অজীর্ণই এই রোগের নিদান। অগ্নিমান্দ্য হইতে অজীর্ণ এবং অজীর্ণ হইতে সকল রোগের উৎপত্তি হয়। তাই আমরা প্রথমতঃ অগ্নিমান্দ্য বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অগ্নি কাহাকে বলে? সকলে সর্ব্বদা যে অগ্নি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, যাহার সহায়তায় জ্বালানীকাষ্ঠ সংযোগে লোকে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করে, যাহার কণিকামাত্র সংস্পর্শে সরস নীরস সর্ব্ববিধ বস্তুই ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহাও কি ঠিক সেই প্রকার পদার্থ? অত্যুচ্চ সূর্য্য মণ্ডল হইতে রসাতল পর্য্যন্ত সমস্তই একজাতীয় অগ্নি বিরাজমান। কাষ্ঠে কাষ্ঠে পরস্পর সংঘর্ষণ করিলে যে অগ্নির উদ্গম হয়, সেই অগ্নি পরিশেষে দেহের, গেহের— সর্ব্ববিধ কার্য্যের সংসাধক হইয়া থাকে। প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় বহ্নিতে তাড়না ব্যতীত কখনও উহা উৎক্ষিপ্ত হয় না। কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জীবদেহও অগ্নিময়। কাষ্ঠ নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে, সুতরাং তাড়না না করিলে উদ্গম হয় না। জীবদেহ তদ্রূপ নয়। দেহ মধ্যে নিমিষে নিমিষে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে রসরক্তাদির অবিরত সঞ্চালন ঘটিতেছে। শারীরিক যন্ত্রগুলিও নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে না। যান্ত্রিক বিষম তাড়না বশতঃ কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা শরীরের উত্তাপ অনেক বেশী। এই দেহ গত বহ্নি পাছে দাবানলের ন্যায় প্রচণ্ড হইয়া পরে, শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রসশূন্য করিয়া ফেলে, মাংসাদির পূর্ণ পরিপাক সংসাধন করিয়া শরীরকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, তাই ভয়ে ভয়ে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পানাহারের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদগুরু ভগবান পুনর্ব্বসু এবং ভদ্রকাপ্য প্রভৃতি ঋষি কহিয়াছেন :—"পিত্তই শরীরের অগ্নি" পিত্তকে সমভাবে রাখিতে পারিলেই শরীর সুস্থ থাকে। যে পিত্ত তীক্ষ্ণ, দ্রব্য, দুর্গন্ধ, নীল ও পীতবর্ণ যাহা উষ্ণ এবং যাহা কটুরস বিশিষ্ট, তাহাই স্বাভাবিক। পিত্তে অম্লরস জন্মিলে তাহা দূষিত হইয়া থাকে। কার্য্যভেদে পিত্ত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত :—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ভাজক।

পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিতি করিয়া ভুক্তবস্তুর পরিপাক সাধন করে, এবঃ মল মূত্রাদির নিঃসরণ করিয়া দেয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা অপরাপর পিত্তের বল বৃদ্ধি হয়। রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অবস্থান করে, এবং ভুক্ত পদার্থের প্রথম পরিপাক হইবার পর—যে রস জন্মে, তাহাকে রসে পরিণিত করে। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা

(১) অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদারিতম্। বিসূচালসকৌ ভস্মাত্তবেচ্চাপি বিলম্বিকা।

(২) ন তাং পরিমিতা হারা লভন্তে বিদিতা গমাঃ। মূঢ়াস্তামজিতাত্মনো লভন্তে হশন লোলুপাঃ॥

হইতে বুদ্ধি, স্মৃতি, এবং মেধার উৎপত্তি হয়। আলোচকপিত্ত নেত্রদ্বয়ে অবস্থান করে, ইহা হইতে দর্শন ক্রিয়ার সংসাধন হয়। ভ্রাজক পিত্ত গাত্রচর্ম্মে অবস্থিত। ইহা অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পরিপাচক এবং শরীরের অগ্নিবর্দ্ধক। পাচ- গাগ্নি চতুর্ব্বিধ অবস্থায় জঠরে অবস্থান করিয়া থাকে—যথা—মন্দ, তীক্ষ্ণ বিষম এবং সম। শরীরে কফাধিক্য হইলে মন্দাগ্নি উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা সুচারুরূপে পরিপাক হয়না। ইহাতে মাথাকন্‌কনানি, উদ্গারবাহুল্য, উদরস্ফীতি, উদরের গুরুত্ব, মলরোধ, এবং মূত্রাধিক্য প্রকাশ পায়। সামান্য সর্দ্দিতেও এই সকল লক্ষণ উপলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু জঠরে কফ সঞ্চিত হইলেই এই অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার অজীর্ণ। জঠরে পিত্তের আধিক্য হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি জন্মে। তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট লোক যখন যাহা কিছু আহার করে, তখনই তাহা শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়, আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ইহাতে শরীরের শোষ আরম্ভ হইলে পীড়া সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করে। বায়ুর আধিক্য বশতঃ বিষমাগ্নির উৎপত্তি হয়। ইহাতে ভুক্ত পদার্থের কখনওবা শীঘ্র এবং কখনও বা বিলম্বে পরিপাক হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সমাগ্নি শরীরের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যসম্পাদক। সমাগ্নির রক্ষণচেষ্টাই সকলের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন অগ্নির তিন প্রকার অবস্থাই অজীর্ণ রোগ বলিয়া সমাখ্যাত। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগে কফদোষ থাকিলে তাহাকে আমাজীর্ণ, পিত্তদোষ থাকিলে তাহাকে বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বায়ুর সংশ্রব থাকিলে তাহাকে বিষ্টব্ধাজীর্ণ কহে। প্রতিদিন যাহা কিছু আহার করা যায়, সেই সমস্ত ভুক্ত রসে অংশ বিশেষ জীর্ণ না হইয়া রসাবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাই সময়ান্তরে অজীর্ণ রোগ রূপে পরিণত হয়, শাস্ত্রে ইহার নাম রসশেষাজীর্ণ। উল্লিখিত সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ হইতে দেশ- বিধ্বংশকর প্রাণনাশক, বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ওলাউঠা রোগের বীজস্বরূপ স্বতন্ত্র কোন বিষের কথা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে জলবায়ু দূষিত হইয়া এই রোগের বীজ জন্মাইয়া থাকে। পরে সে রোগবীজ জীব দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া, সদ্যোমারাত্মক সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের সৃষ্টি করে। এই সকল কথা সারবত্তা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ স্বীকার করেননা। বাহ্য পদার্থ দূষিত হইয়া রোগের বীজস্বরূপ কোন বিষের উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহাদিগের মতে ইহা অসম্ভব। অযুক্ত আহার-বিহারদ্বারা আপনা হইতেই দেহমধ্যে নানাবিধ বিষের উদ্ভব হয়। আচার্য্য- গণ বলেন, তন্মধ্যগত অন্যতম বিষ হইতেই এই সাংঘাতিক রোগের উৎপত্তি। জলবায়ু প্রাণীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। প্রাণীমাত্রেই এই দুইটী বস্তু সর্ব্বদা সমান ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের অভাবে বা বিশ্বপ্রসবিনী ক্রিয়ার দোষে জগতের অস্তিত্ব ও অসম্ভব। বায়ু সঞ্চরণশীল। ব্যক্তি বিশেষের কদাচারের দোষে অথবা নৈসর্গিক দোষে যদি কোন স্থানের বায়ু দূষিত হয়, তবে তাহা অচিরে সমস্তদেশে অভিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবমাত্রেই তাহা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না।

জল সম্বন্ধেও নিয়ম ঠিক ঐ প্রকারই। উক্ত কারণে কোন স্থানের জল বিষাক্ত হইলে তাহা অচিরে বহু স্থানে সঞ্চালিত হয়। তবে স্থানের দূরত্বানুসারে বিষাক্ত অংশ কম হইতে পারে। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারোপযোগী জলবায়ু দূষিত হইয়া ওলাউঠা রোগের উৎপাদন করিত, তাহা হইলে ঐ রোগে কীট পতঙ্গ হইতে মানব পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীকে তুল্যভাবে আক্রান্ত হইতে হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়না। এইজন্য আমরা দেহমধ্যে স্বয়মুৎপাদিত বিষের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা সত্যসত্যই সংক্রামক কিনা,—তাহাই একবার আমরা আলোচনা করিব। যে সকল রোগ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে তাহাকে সংক্রামক রোগ বলে। এই সংক্রামক রোগ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি রোগ আছে, তাহারা নিত্য সংক্রামক। আবার এমন কতকগুলি রোগ আছে যে, তাহারা কাল প্রভাবে কখনও কখনও সংক্রামক হয়।

নানা কারণে সংক্রামক রোগের বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মিথ্যা আহার বিহার দ্বারা আপনা হইতে দেহাভ্যন্তরে এই বীজের উৎপত্তি ঘটে। পরে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সঞ্চালিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের কদাচারিতায় কখনও কখনও প্রথমতঃ স্থানীয় জল দূষিত হইয়া পড়ে। পরে বায়ু কর্ত্তৃক সেই দোষ বহু স্থানে সঞ্চারিত হইতে থাকে। সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য জলবায়ু এইরূপে দূষিত হইলে প্রাণী মাত্রকেই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, সময় সময় ক্রূর গ্রহের কুটিল দৃষ্টিপাতে পার্থিব জলবায়ুও দূষিত হয়। যে কারণেই হউক জলবায়ু দূষিত হইয়া সংক্রামক পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহা ভীষণ আকার ধারণ করে। এতদ্বারা মহাদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়! বর্ত্তমান ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগ এ প্রকার সংক্রামক নহে। ইহা বসন্ত রোগের ন্যায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যে প্রবিষ্ট হয়, একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে ওলাউঠা রোগীর যে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করে, তাহার কোন অংশ যদি কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, অথবা জলের সহিত উদরস্থ হয়, তাহা হইলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা বসন্ত রোগের ন্যায় সংক্রামক পীড়া নহে কিম্বা কুষ্ঠ অর্শ, যক্ষ্মা, ঔপসর্গিক মেহ এবং উপদংশ প্রভৃতির ন্যায়ও ইহাকে সংক্রামক রোগ বলিয়া আমরা গণনা করি না। উক্ত রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দূষিত শুক্র হইতে জাতসন্তানের শরীরেও ঐ সকল পীড়া জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ওলাউঠা রোগ এইরূপ ভাবে কাহাকেও —আক্রমণ করিতে দেখা যায় না। উন্মাদ গ্রস্তা জননীর সন্তানকেও উন্মাদ প্রভৃতি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষীকৃত। ওলাউঠা পীড়ায় সেইরূপ সংক্রামকতা নাই, তবে এই পীড়া কালপ্রভাবে কখন কখনো কখনো সংক্রামক হয়, কখনো কখনো হয়ও না। এক্ষণে আমরা প্রণিধান করিয়া দেখিব—কোন্ সময়এই পীড়া সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায় এবং কোন সময়ই বা সংক্রামক হয় না।

সর্ব্বদাই দেখা যায়,—যে সকল ব্যক্তি ওলাউঠা রোগীর নিকট অবস্থান করিয়া অহরহঃ তাহার সেবা শুশ্রূষা করে,—নিজ

হস্তে মল মুত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দেয়, একটী বারও রোগীর কাছছাড়া হয় না, তাহাদিগকে কখন এই রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। যাহারা ভয়ে ভয়ে অতি বড় সাবধানে থাকে, রোগীর পরিচর্য্যা করা দূরে থাকুক, যে বাড়ীতে রোগী বাস করে, তাহার ত্রিসীমানাতেও পদার্পণ করে না, তাহারাই এই পীড়াতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলিত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে—এই পীড়া সকল অবস্থায় সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায় না।

অজীর্ণ হইতে যে এই কাল ব্যাধির সমুৎপত্তি—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যদি কোন ওলাউঠা রোগীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি দুই তিন দিনের মধ্যে কোন অজীর্ণকর দ্রব্য আহার করিয়াছ কিনা, তখন সে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিবে—আমি ৫।৭ দিনের মধ্যে কোন অপথ্য দ্রব্য ভোজন করি নাই। কিন্তু সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, রোগীর কথার সত্যতা বাস্তবিক কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যায়। সুতরাং রোগীর বা তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট কোন কথা শুনিয়া রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা এক প্রকার দুরূহ ব্যাপার। ওলাউঠা রোগ গ্রামের মধ্যে যখন প্রথম প্রবেশ করে,তখন দুই চারি জন স্বেচ্ছাচারী ঔদরিক লোকই ইহা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহার পর ক্রমশঃ মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এই পীড়া প্রবল বেগে সকলকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে পীড়ার আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হইলে যখন চতুর্দ্দিক হইতে ক্রন্দনের রোল কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয়, পক্ষীকুল থাকিয়া থাকিয়া এক একবার মর্ম্মভেদী কলরব করিয়া উঠে, শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট শব্দে সভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে,—প্রাণসম নৈরাশ্যেরভাবী আতঙ্কে সকলে শিহরিয়া উঠে, তখন আর সদাচারী, কদাচারী, মিতাহারী, অমিতাহারী—এই রোগের বিভীষিকার ভীতি সম্বন্ধে কাহারও কিছুমাত্র প্রভেদ থাকেনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী, কবিরত্ন।

শরীর ও স্বাস্থ্য।

কোন কার্য্যের ফলাফল বিচার করিতে যাইলে সর্ব্বপ্রথমে কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয়না—আবার কার্য্য করিলেই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। জগৎপ্রপঞ্চ কারণসম্ভূত। উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়—কার্য্যকারণের অবস্থান্তর। শৃঙ্খলবদ্ধ কার্য্যপরম্পরা অবলোকন করিলে বোধ হয় জগতের পশ্চাতে—নিয়ম অনন্ত কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের কথায় নৈসর্গিক নিয়মই ভগবানের নিয়ম। তবে ভগবান কি? তাহা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিভিন্ন আখ্যায় ভূষিত করিয়া গবেষণা পূর্ণ জটিল দর্শন লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহাই হউন, বাস্তব জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, এক অতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু হইতে, আরম্ভ

করিয়া সমস্ত উদ্ভিদ জগৎ—সমস্ত প্রাণিজগৎ ও সমস্ত আলোক জগৎ একই নিয়মের অধীন। উত্থান, অবস্থান ও পতন সর্ব্বব্যাপী নিয়মের অবস্থার পরিবর্ত্তন। বিশ্ব যখন নিয়মে পরিচালিত, তখন বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থ সেই একই নিয়মাধীন। সেই নিয়মে ফুল ফুটিতেছে,—সেই নিয়মে নদী ছুটিতেছে—সেই নিয়মে পাখী উড়িতেছে,—সেই নিয়মে পশু বিচরণ করিতেছে.—সেই নিয়মে তুমি হাসিতেছ, আমি কাঁদিতেছি, আবার তুমি কাঁদিতেছ, আমি হাসিতেছি ;—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিয়মই আমাদের নিয়ন্তা।

স্বাস্থ্য কি?—স্বাস্থ্য, এই নিয়ম প্রতিপালন, আর এই নিয়মের ব্যতিক্রমই অস্বাস্থ্য। জগতে এত হাহাকার—এত হা-হুতাশ কেন? এই নিয়মের অবহেলার জন্য। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব জাতিই প্রধান অত্যাচারী। মানবই সকল নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনৈসর্গিক অত্যাচারে—আপনাকে পীড়িত করিয়া ফেলে এবং রোগ শোকে জর্জ্জরীত হইয়া মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া লয়। আমরা মরিবার জন্যই জন্মিয়া থাকি, তাই বলিয়া কি ভগবানের নিকট হইতে যে সর্ত্ত লইয়া মর্ত্তে আসিয়াছি, তাহা আয়ত্ত করিবার আগেই আমরা মরিব? আমরা জানি যে, জন্মিলে মৃত্যু আছেই, তাই মৃত্যুকে সর্ব্বদা নিকটস্থ জানিয়া ভগবানের নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আপন আপন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আছে। আমরা দেখিতে পাই—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছে। ক্রমবিকাশ হইতে পূর্ণবিকাশে উন্নতিই ,মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই জীবন সংগ্রামে (Struggle for existence) প্রকৃত বীরের মত বীরসাজে সজ্জিত হইয়া নীরোগ ও বলিষ্ঠ দেহ লইয়া যে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে, সেই জয়ী হইবে। তাই ইংরাজ কবি বলিয়াছেন :—

In the bevouac of life
Be not dumb driven cattle
Be a hero in the strife."

বাস্তবিক এই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে গেলে আমাদের স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বধিরের শ্রবণেচ্ছা যেমন বৃথা, মুকের বাক্য স্ফূর্ত্তির চেষ্টা যেমন যন্ত্রণাদায়ক, অন্ধের দর্শনেচ্ছা যেমন নিষ্ফল, স্বাস্থ্যহীনের সকল আশাই তেমনি নিস্ফল হয়,—ভবিষ্যৎ জীবন তেমনি তাহার মর্ম্মভেদী শোকান্ধকারে আবৃত থাকে। এই আঁধারময় জীবন লইয়া সে কি করিবে? স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে তাহার কোন উদ্দেশ্যই তো সিদ্ধ হইবে না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" সুস্থ শরীর ব্যতীত ধর্ম্ম ও অর্থ কিছুই আয়ত্ত হয় না। বেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা, মায়াময় স্বপ্ন, সুতরাং জগৎ হইতে সৃষ্ট যে এই শরীর —ইহাও মিথ্যা ও স্বপ্ন মাত্র ; ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি
নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি
নবানি দেহী॥"

যাহা হউক যদিও এই দেহ কিছুই নয়, তথাপি ইহাই কিন্তু সব। এই দেহই দেবতার মন্দির (temple of God),—ইহারই ভিতর আত্মা বাস করেন। এই নশ্বর শরীরের সাহায্যেই আমরা ভগবানের উপাসনা করিতে পারি। মানবজন্ম কেবল

আহার নিদ্রা ও মৈথুনের জন্য নয়, ইহার উচ্চ লক্ষ্য আছে (the goal of life);—আত্ম-জ্ঞান মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্ম-জ্ঞানেই পূর্ণ বিকাশ। শরীর ব্যতীত ইহা অসম্ভব। আবার নাম মাত্র শরীর থাকিলে চলিবে না—শরীর কর্ম্মক্ষম হওয়া চাই, শরীর সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই দেহ—ইহা মিথ্যা হইলেও ইহার যতখানি সত্যতা আছে, তাহা আমা-দিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে; স্বাস্থ্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাই—পশুরা আমাদের অপেক্ষা বলবান ও পূর্ণস্বাস্থ্য। তাহার কারণ, তাহারা স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করে না—প্রকৃতির মঙ্গলজনক নিয়ম তাহারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে, কাজেই তাহাদের মধ্যে ডাক্তার বা বৈদ্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গৃহপালিত পশু—বন্য পশু অপেক্ষা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। গৃহপালিত পশু—স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে, তাই তাহারাও অত্যাচারী মানবের ন্যায় স্বাস্থ্যহীন। সুতরাং তাহাদেরও জন্য ডাক্তার (Veterinary sur-geon) হইয়াছে। যাহার যেমন স্বভাব, সে অপরকেও সেই ছাঁচে ঢালিতে চায়। গৃহপালিত পশুদিগকে আমরা আমাদের মতই করিয়া তুলিতে চাই, তাই তাহাদের দশাও আমাদের মতই হইয়াছে।

এ স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে সুন্দরভাবেই ছিল এবং তাহা প্রতিপালিতও হইত। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদের বহুপ্রকার নিয়ম পালন করিতে হইত। সেই সকল নিয়ম পালন করিয়া যে দ্বিতীয় আশ্রমে উপনীত হইত, সে জীবনে কখনো দুঃখ পাইত না,—বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ করিত। তুমি মেধাবী, বুদ্ধিমান হইতে পার, কিন্তু তোমার যদি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে, তবে তুমি মেধা ও বুদ্ধি লইয়া কি করিবে? তোমার জীবন বৃথা—জীবন তোমার পক্ষে ভার বহন বলিয়া বোধ হইবে। তোমার সুখ-শান্তি, আমোদ প্রমোদ দূরে,—বহুদূরে পলায়ন করিবে,—তুমি নিয়ত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিবে. তুমি জীবন্মৃত্যু (life-in-death) হইয়া থাকিবে। সে কষ্টের সে যন্ত্রণার—সে মর্ম্মান্তিক বেদনার তুলনা—হয় না। স্বাস্থ্যহীন জীবন চিন্তা করিলে চোকে অন্ধকার দেখিতে হয়—মাথা ঘুরিয়া যায়। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য বিষম অন্তর্দাহে কেহ কেহ আত্ম-ঘাতীও হইয়াছে। কিন্তু ইহার মত পাপ বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

যখন ভাবি যে, এই স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ কতই পরিশ্রম করিয়াছেন, তখন আশ্চর্য্য হইয়া যাই। তাঁহারা কি স্বদেশ প্রেমিক। তাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির বংশধরদিগের রক্ষার জন্য কত ধর্ম্মশাস্ত্র,কত যোগ শাস্ত্র,-আয়ুর্ব্বেদ ও কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আমাদের সকল শাস্ত্রেই শরীর রক্ষা ও শরীর পালন সম্বন্ধে লিখিত। আমার বোধ হয় শারীর বিজ্ঞান (hygiene) সম্বন্ধে ভারতবর্ষ সর্ব্ব প্রধান ও মৌলিক। আমরা এখন অত্যাচারী ও প্রবঞ্চক হইয়াছি, ঋষি কথিত শরীরপালনের নিয়ম অনুসরণ করি না। সে সকল নিয়ম পালন করিতে গেলে আধুনিক সভ্যজগতের পারিপার্শ্বিক কতকগুলি অত্যাবশ্যক—খাঁটি কথায় বলিতে গেলে—অনাবশ্যক ক্রিয়া বাধা

পায়। অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ফল ভেদ হয়; এখন যেমন কাল উপস্থিত, আচার ব্যবহারও সেইরূপই হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য —ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অনেকে চীৎকার করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বলিলে যাহা বুঝায়, সে রকম ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ প্রাচীন কালের মত ব্রহ্মচর্য্য এখন পালন করা বড়ই কঠিন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অর্থ বীর্য্যধারণ। বীর্য্যধারণই শারীরিক উন্নতির প্রধান সহায়। এই উর্দ্ধরেতঃ হইতে গেলে আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের সকল নিয়মই পালন করিতে হয়। এখন আর সে রকম গুরুর আশ্রম নাই; আপন আপন গৃহকেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম করিয়া লইতে হইবে। পঞ্চম বর্ষীয় বালককে ব্রহ্মচারীর ব্রতে দীক্ষিত করিতে হইলে গৃহে গুরুর আবশ্যক। আমাদের কিন্তু তেমন গুরুর অভাব। গৃহে মাতা পিতরাই গুরুর কাজ করা উচিত। কিন্তু যাঁহারা গুরু হইবেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারী নহেন, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় পরায়ণ, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কাজ হইবার আশা বড়ই কম। সবল, স্বাস্থ্যসম্পন্ন সন্তান পাইতে ইচ্ছা করিলে মাতা-পিতারও সবল ও সুস্থকায় হওয়া উচিত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তেভার্য্যা" এই কথা মনে করিয়া স্ত্রী সহবাস করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পবিত্র বিবাহবন্ধন নহে। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ নিজে নিজে সংযমী হইলে পুত্রকন্যাদিগকেও সংযমী করিতে পারেন। যেমন বৃক্ষ তেমনি তার ফল হইবে। সংযম ব্যতীত স্বাস্থ্যবান হওয়া বড়ই কঠিন। সংযমই স্বাস্থ্যের ভিত্তি- (control over one's senses is the basis of perfect health)।

শিশু স্বাস্থ্য জননীদের উপর নির্ভর করে। তাঁহারা যদি একটু বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া সন্তানগনকে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে প্রতি-পালন করেন, তাহা হইলে শিশু হৃষ্ট পুষ্ট হয় ও পরে বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ হইয়া উঠে। এই সময়ে যেমন অভ্যাস করান যাইবে, সারা-জীবন সেই অভ্যাস থাকিয়া যাইবে। পূর্ব্বে জননীরা নবজাত শিশুকে সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিতেন, এখন তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে জামা প্রভৃতি পরাইয়া দেওয়া হয়—পাছে শিশু রৌদ্রে তাপে কাল, হইয়া যায় বা বাতাসে তাহার ঠাণ্ডা লাগে। ইহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে যেন রৌদ্র ও জল বায়ু ছিল না। এইরূপে প্রকৃতির ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া জননীরা শিশুদিগকে স্বাস্থ্যহীন করিয়া রাখেন। এই শিশুই কালে মানুষ হইবে। এই রুগ্ন সন্তানগণ ও তাহাদের বংশধরগণ কতদিন জীবিত থাকিবে—তাহা জনক জননীরা একবার ভাবিয়া দেখুন।

তারপর আহার। অধুনা যেরূপ খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখা বড় দুরূহ ব্যাপার। খাঁটি দ্রব্য পাওয়া ভার হইয়াছে। সকল দ্রব্যই ভেজাল মিশ্রিত। স্বাস্থ্যান্বেষীকে বড়ই সতর্ক থাকিতে হইবে।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে এত কথা বলা যাইতে পারে যে, এক মাসের আয়ুর্ব্বেদ একটা প্রবন্ধেই পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা করিলে তো চলিবে না তাই প্রধান প্রধান কারণ উপরে দেখাইয়া আমি প্রবন্ধ আজিকার মত এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল।

পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

অশোধিতে পীতৌষধ জীর্ণ হ'লে পরে।
পুনঃ পান বিধি নহে, অতিযোগ করে॥
কোষ্ঠের গুরুতা, বল. লঘুতা বুঝিয়া।
অযোগে মৃদু বা তীক্ষ্ণ দিবে বিচারিয়া॥
বমি কৃচ্ছ্রে, না বুঝিয়া বমি বিরেচন।
দিলে ক্রমে প্রাণ হানি হয় সেকারণ॥
অস্নিগ্ধ, অস্বিন্ন আর রুক্ষ যেই হয়।
পুরাণ ঔষধে তার দোষোৎক্লিষ্ট রয়॥
হরণ করিতে তাহা না পারি, তখন।
নিম্নোক্ত বিবিধ রোগ করে উৎপাদন॥
বিভ্রংশ প্রবল হিক্কা, আঁধার দর্শন
কণ্ডুঃ গুরুঃ অবসাদ, নিশ্চয় তখন॥
সিদ্ধি সিন্ন হইলে ও অল্প মাত্রা তরে।
কিম্বা দীপ্তাগ্নিতা হেতু ঔষধ জীর্ণ করে॥
অথবা শীতোভারে আমস্তব্ধ হয়।
দোষোৎক্লিষ্ট করে তবে ঔষধ নিচয়॥
নিঃসাধিত করিতে না পারিয়া তখন।
উল্লিখিত রোগ সব করে উৎপাদন॥
ঐরূপ অযোগ হ'লে বৈদ্য বুদ্ধিমান।
নিম্নোক্ত চিকিৎসা তরে করিবে বিধান॥
লবণ মিশ্রিত তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে।
প্রস্তর-সঙ্কর স্বেদে স্বিন্ন করি নিবে॥
পূর্ব্বোষধ খাদ্য জীর্ণ হইবার পর।
গোমূত্রে নিরূহ দিতে হইবে তৎপর॥
ধন্বা মাংস-রস সহ করায়ে আহার।
অনুবাসন বস্তি তারে দিবে পুনর্ব্বার॥
তৈল মাত্রা-অনুযায়ী মদন, পিপুল,
দেবদারু কল্ক ক্বাথে পাকিবে নির্ভুল,
অনন্তর বাতহর তৈলে স্নিগ্ধ করে।
সুতীক্ষ্ণ ঔষধ দান করিবে তাহারে॥
ক্ষুধার্থ ও মৃদু কোষ্ঠে তীক্ষ্ণ বিরেচন।
বিষ্ঠা. পিত্ত, কফ আগে করিবে হরণ॥
ধাতু দ্রবীভূতকারি নিস্রবে তৎপরে।
তাহাতে উহার বল স্বল্প ক্ষয় করে॥
দাহ, কণ্ঠশোষ আর ক্লান্তি, তৃষ্ণা হয়।
তাকে মিষ্টৌষধে বমি করাবে নিশ্চয়॥
বমনের অতিযোগে দিবে বিরেচন।
বিরেচন-অতিযোগে মৃদুল বমন॥
পরে পরিষেক আদি শীতাবগাহন।
করায়ে ভিষক তারে করিবে স্তম্ভন॥
অন্নপানৌষধ যাহা মধুর কষায়।
শীতল ও রক্তপিত্ত অতিসার যায়॥
দাহ জ্বর যাহা হ'তে হয় নিবারণ।
তাহাই এরূপ স্থানে হইবে স্তম্ভন॥
রসাঞ্জন, বেণামূল. লোহিত চন্দন।
পেষি, ছাগরক্ত চিনি করিয়া মিলন॥
গুলিয়া করিলে পান লাজ চূর্ণ সহ।
বিরেচনে অতিযোগ নাশে নিঃসন্দেহ॥
বটাদি বৃক্ষের বৃন্ত পেয়ার সহিত,
সিদ্ধ করি শীতলিয়া মধুর সহিত,
কিম্বা মলসংগ্রাহক ঔষধের সহ।
দুগ্ধ সিদ্ধ করি, পানে নাশে নিঃসন্দেহ॥

বিরেচনে অতিযোগ হইলে তখন।
জাঙ্গল রসের সহ করিবে ভোজন॥
অতিসারে পিচ্ছাবস্তি করিবে প্রদান।
দুগ্ধ ঘৃতে স্নিগ্ধ স্বাদু অনুবাসন দান॥
বমনের অতিযোগে-মুখে, আমাশয়ে।
সুশীতল জল দিবে তার ক্রমান্বয়ে॥
নিম্বুক ফলের রসে লাজ শক্তু আদি।
ঘৃত মধু চিনি যোগে পান করা বিধি॥
সোদ্গার বমি ও মূর্চ্ছা হ'লে মধুসহ।
ধনে, মুতা, যষ্টিমধু, রসাঞ্জন দেহ॥
বমি হেতু জিহ্বা অন্ত প্রবিষ্ট হইলে।
হিতকর, স্নিগ্ধ অম্ল নোনা রস দিলে॥
হৃদ্গ্রাহী যুষপান, দুগ্ধ-মাংস রসে।
কবল প্রয়োগ তারে করিবেক শেষে॥
বমি বেগে জিহ্বা যদি বহির্গত হয়।
পিষ্ট তিল কিস্‌মিস্ কল্ক লেপে তয়॥
বায়ু কুপ্ত, বাগ্ রোধ হইলে তাহার।
স্নেহ স্বেদ, মাংস সিদ্ধ যবাগূ আহার॥
বমিত, বা বিরেচিত মন্দাগ্নি লঙ্ঘিত।
অগ্নি বল বৃদ্ধি তরে পেয়াদি বিহিত॥
বহু দোষ, রুক্ষ আর হীনাগ্নি যে জন।
কিম্বা উদাবর্ত্ত রোগে অল্প বিরেচন॥
দোষোৎক্লিষ্ট করি তাতে মার্গ রোধ করে।
অত্যন্ত আধ্মান হয় নাভির উপরে॥
পৃষ্ট পার্শ্ব শিরঃশূল, বিষ্ঠা মূত্র আর।
বায়ুর বিবন্ধ হয় তাহাতে আবার॥
অভ্যঙ্গ, স্বেদ ও বর্ত্তি তাহাতে বিহিত।
নিরূহ, অনুবাসন, উদাবর্ত্তোচিত॥
স্নিগ্ধ, গুরুকোষ্ঠ কিম্বা আমদোষে যেই,
শোধন ঔষধ সেবে বলবৎ, সেই।
কিম্বা ক্ষীণ, মৃদু কোষ্ঠ, ক্লান্ত, অল্প বলে—
ঐরূপ ঔষধ পান করে যে সকলে,
তার আম দোষ আশু পায়ু স্থানে যায়।

তীব্র শূল পিচ্ছারক্তে বেদনা জন্মায়॥
তাহাতে লঙ্ঘন আর পাচন তৎপরে,
রুক্ষোষ্ণ লঘু ভোজনে অতিহিত করে॥
আর ক্ষীণ ব্যক্তিদের ঐ বিঘ্ন হ'লে।
বৃংহনীয়, জীবনীয় ঔষধ সে স্থলে॥
আমাজীর্ণ হেতু যদি বিবন্ধ জন্মায়।
ক্ষারায় লঘু ভোজন প্রশস্ত তাহায়॥
বাতাধিক্য হ'লে পুষ্প কাসী মিশ্রিত।
লবণ-দাড়িম-ক্ষার-ঘৃতে হয় হিত॥
বাতাধিক্যে পান কিম্বা করিবে ভোজন।
দধ্যম্লে দাড়িমত্বক করিয়া মিশ্রন॥
দেবদারু তিলকল্ক অথবা তেমন।
উষ্ণ জল সহ পানে হয় প্রশমন॥
অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, কদম্ব, পাকুড়,
দুগ্ধ সিদ্ধ করি পানে হয় তাহা দূর॥
কষায় মধুর দ্রব্যে, পিচ্ছাবস্তি কিবা,
যষ্টিমধু সিদ্ধ স্নেহ বস্তি তাকে দিবা॥
বহুদোষে দিলে পরে অল্প বিরেচন।
দোষোৎকৃষ্ট করিকরে অল্প নিঃস্রাবন॥
তাতে কণ্ডু, শোথ কুষ্ঠ গুরুতা উদয়।
অগ্নিনাশ উৎক্লেশ স্তৈমিত্য জন্মায়॥
অরুচি, পাণ্ডুতা, শোষ পরিস্রাব হবে।
ত্রিদোষ শমনৌষধে প্রশমিত রবে॥
তাতে যদি নহে শান্তি করাবে বমন।
তদন্তে করিবা স্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ বিরেচন॥
রোগী শুদ্ধ হ'লে পরে চূর্ণ ও আসব।
অরিষ্ট সংস্কৃত যুষ, প্রদানিবে সব॥
ঔষধ সেবিয়া বেগ করিলে ধারণ।
ত্রিদোষ প্রকোপি, করে হৃদয়ে গমন॥
ঘোরতর হৃদগ্রহ তাহাতে জন্মায়।
হিক্কা, শ্বাস, পার্শ্বশূল, দৈন্য হয় তায়॥
দৃষ্টির বিভ্রম, নাসা, দশন দংশন।
দন্ত কিড়মিড়ি তায় করে উৎপাদন॥

তাহাতে ভীষক নাহি বিচলিত হবে।
রোগীকে তথন শীঘ্র বমন করাবে॥
পিপত্ত্যাপাধিক্য হলে মূর্চ্ছা ঔষধ মধুর।
কফাধিক্যে কটুযোগে করে তাহা দূর॥
তাহাতেও দোষ যদি না হয় নিঃশেষ।
পাচক ঔষধে তবে নাশিবেক শেষ॥
ক্ষুধা বলক্রমে তার করিয়া বর্দ্ধন।
চিকিৎসক করিবেক কার্য্য সমাপন॥
বায়ু যদি করে তার হৃদয় পীড়ন।
স্নিগ্ধায় লবণৌষধে হবে তা শমন॥
পীতৌষধে বমিবেগ করিলে ধারণ।
কুপিত কফেতে বায়ু রোধিয়া তথন।
অঙ্গগ্রহ, স্তব্ধ আর বেপথু জন্মায়॥
নিস্তোদোবেষ্টন অতি মূর্চ্ছা হয় তায়॥
এইরূপ হলে হয় বিবিধ প্রকার।
বাত হর ক্রিয়া স্নেহ স্বেদ ব্যবহার॥
লঘুভোজী মৃদুকোষ্ঠে তীক্ষ্ণ বিরেচন।
দোষ হরি মস্থিকরে শোণিত হরণ॥
অন্নে মিশাইয়া তাহা কাক বা কুক্কুরে,
খাওয়াইবে শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষার তরে॥
বিশুদ্ধ জানিবে যদি করে তা ভক্ষণ;
অভক্ষণে পিত্ত রক্ত বুঝিবে তথন॥
কিম্বা শুক্ল বস্ত্রে মাখি লবে শুকাইয়া।
দেখিবে তৎপর তাহা জলে প্রক্ষালিয়া॥
বিবর্ণ হইলে তাহা পিত্ত রক্ত হবে।
বিশুদ্ধ হইলে রক্ত বসনে না রবে॥
অতিযোগে তৃষ্ণা মূর্চ্ছা মত্ততাদি হলে।
আমরণ পিত্তহর ক্রিয়া সেই স্থলে॥
মৃগ, গো, মহিষ কিম্বা ছাগল শোণিত
পীড়িতাবস্থায় তাহা করিয়া নিঃসৃত,
অতিশয় রক্তক্ষয়ে করিলে তা পান।
জীবন লভিবে তাহা জীবাতি সন্ধান॥
কুশ মূল কল্কে তাহা করিয়া মর্দ্দিত।
বস্তি প্রয়োগেতে আর হয়ে থাকে হিত॥
গাম্ভারী, অনন্তমূল, দুর্ব্বা, বীরা, কুল,
কল্কে জলযুক্ত দুগ্ধ চতুর্গুণ তুল,
পাক করি তাতে ঘৃত রসাঞ্জন যোগে,
শীতলাবস্থায় বস্তি ইহাতে প্রয়োগে।
সুশীতল পিচ্ছাবস্থি অথবা প্রয়োগী।
অনুবাসন ঘৃত মণ্ডে দিবে সেই রোগী॥
অতিশয় বিরেচনে গুদভ্রংশ হলে।
কষায় বসাবে শুদ্ধী বটাদি বল্কলে॥
অতি স্নিগ্ধে সেবে যদি স্নেহ বিরেচন।
দোষে তাহা বদ্ধ করে মূঢ়তা কারণ॥
স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তথন।
স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু নহে নিঃসরন॥
ইহাতে বাত বিবন্ধ, গুদস্তম্ভ শূল,
অল্প অল্প সরে মল, না হয় নির্ম্মূল॥
এইরূপে স্থলে তীক্ষ্ণ বস্তি, বিরেচন।
অথবা প্রশস্ত হয় লঙ্ঘন পাচন।
রুক্ষ অল্পবলে দিলে রুক্ষ বিরেচন।
ঘোর উপদ্রব করে কুপিত পবন।
স্তব্ধ শূল সর্ব্বদেহে হয় ঘোরতর।
ইহাতে স্নেহ স্বেদাদি দিবে বাত হর।
স্নিগ্ধ গুরু কোষ্ঠে দিলে মৃদু বিরেচন।
কফোৎক্লিষ্ট পিত্তবাত রুধিয়া তথন,
তন্দ্রা ও গৌরব, ক্লান্তি দৌর্ব্বল্য জন্মায়।
অঙ্গ অবসাদ হবে নিশ্চয় তাহায়॥
পীতৌষধ শীঘ্র ফেলি করাবে বমন।
পরে দিবে ক্রমান্বয়ে লঙ্ঘন পাচন।
স্নিগ্ধ ও গুরু কোষ্ঠতা দূর করি পরে।
তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে স্নেহ যোগ করে।

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:•:—

ইংলণ্ডে কবিরাজী।—শ্রীযুক্ত এস্, মিত্র বিলাতের বোরণ্‌মাউথ নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিতেছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। কামানের ভীষণ শব্দে সর্ব্ব শরীর কম্পনের ফলে স্নায়ুমণ্ডলীতে বিকার উপস্থিত হইয়াছে—এমন কতকগুলি যোদ্ধাকে তিনি আরোগ্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রক্তদুষ্টি ও পারদ বিকৃতির কয়েকটি রোগীকেও তিনি নিরাময় করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে কুষ্ঠাশ্রম।—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর বাহাদুর সেখানকার কুষ্ঠরোগীদিগের আশ্রম নির্ম্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। এই কার্য্যের সাফল্যের জন্য ৩০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইবে। রামনাদের রাজা বাহাদুরের উপর এই চাঁদা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এরূপ একটা ব্যবস্থা হয় না?

বিদ্বৎসভার বিদ্যালয়।—সহযোগী "ধন্বন্তরি" পত্রে প্রকাশ,—বিদ্বৎসভা হইতে এরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, যে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অধিক থাকিবে অথচ বিশ্ব বিদ্যালয়ের matriculation পরীক্ষাদানোপযোগী ইংরাজী ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইবে। এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য—বৈদ্য ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইলে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পথ তাঁহাদিগের পক্ষে সুগম হইবে। আমরা এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সম্বন্ধে "নায়ক"।—আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সম্বন্ধে গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠের 'নায়ক' লিখিয়াছেন,—"কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজটির ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। এই কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে ও সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়, সুতরাং আর এক বৎসর পরেই বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। এই কলেজে শল্য-শালাক্য প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা দান করা হয়, সেইজন্য উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ডাক্তারী ও কবিরাজী—উভয় চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়া দেশে সুচিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও এই কলেজ এক্ষণে রেজেষ্টারিভুক্ত সাধারণের সম্পত্তি। ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্রও এখানে অধ্যয়নের জন্য আসিতেছে। এই কলেজের কল্যাণে সুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার ফিরিবে আশা করা যায়।"

কুষ্ঠরোগে চালমুগ্‌রা।—কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতা চৌরঙ্গী অঞ্চলে ‘ইয়ংমেন্স ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েসন”সভার প্রাসাদে কুষ্ঠ-রোগীগণের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক সভা বসিয়াছিল। ঐ সভায় বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতা হয়। তাহার পর স্যার লিওনার্ড রজার্স এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহার এক স্থলে তিনি বলেন, যে,—চাউল মুগরার তৈল হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একপ্রকার ঔষধ বাহির করিয়া তিনি কয়েকজন কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। এই ঔষধ প্রস্তুত ব্যাপারে রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর প্রমুখ কয়েকজন রসায়নবিদের কৃতিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ কিন্তু এই চালমুগরার কুষ্ঠ নাশক গুণ বহুপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ‘চাল মুগরা’র অন্যতম নামই এইজন্য “কুষ্ঠ বৈরী”। ইহার নামের পর্য্যায় ও গুণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ আছে,—

“কুষ্ঠ বৈরী শৈলরোহী মহাগদ মহীরুহঃ॥
বৈবস্বতদ্রুমঃ সস্তাদ্‌ বলকৃচ্চ রসায়নঃ॥
পামা বিচর্চ্চিকা কণ্ডু সিধ্মোদর্দ্ধ বিপাদিকাঃ।
হন্ত্যামবাতং বাতাস্রং কুষ্ঠানি চ বিশেষতঃ॥
অস্য ফলস্য বীজং তত্তৈলঞ্চ, গ্রহণীয়ম। বীজস্য মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ, তৈলস্য ৪ বিন্দবঃ।

অর্থাৎ “চালমুগরা’র পর্য্যায় এইগুলি—কুষ্ঠবৈরী, মহাগদ, মহীরুহ ও বৈবস্বতদ্রুম। ইহা বলকর ও রসায়ন। পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, সিধ্ম, উদর্দ্ধ বিপাদিকা, আমবাত, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে, প্রয়োজ্য। ইহার ফলের বীজ ও উহার তৈল ব্যবহার্য্য। বীজের মাত্রা ৬ রতি, তৈলের ৪ বিন্দু।

সর্পাঘাতে মুরগী—“জঙ্গীপুর সংবাদে” প্রকাশ, “জঙ্গীপুরে উকীল থানার একজন কেরাণী সর্পদংশনে আক্রান্ত হন। একজন কাজী তাঁহার ক্ষত স্থানের নিকট ক্ষুর দিয়া চিরিয়া মুরগী লাগাইতে আরম্ভ করেন। ইহাতেই ঐ কেরাণী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন!” এরূপ চিকিৎসা কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বহির্ভূত বিষয় নহে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থা।—সংপ্রতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের যে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বোর্ড অব ট্রাষ্টির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন,—অনারেবল সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি এল এবং কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস। পাঠকগণ এ সংবাদে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজে শল্য-শলাকা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রায় সকল অঙ্গেরই লোপ পাইয়া এখনকার দিনে কেবলমাত্র কায় চিকিৎসাই চলিয়া আসিতেছে। উহারই জন্য কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিতে পারিতেছে না। সেইজন্য লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিবার জন্য জগতের আদি চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের অতীত গৌরব আবার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য—ফলমূলাদি আর্য্য ঋষিদিগের জ্ঞান গভীর গবেষণা যে সমস্ত বিশ্ববাসীকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শরীর লইয়া চিকিৎসা করিতে হইলে আগেই শারীর তত্ত্বে জ্ঞানার্জ্জন কর্ত্তব্য। সেই জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি ভিন্ন অ্যানাটমী, সার্জ্জারী, ফিজিওলজির শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চিকিৎসা বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

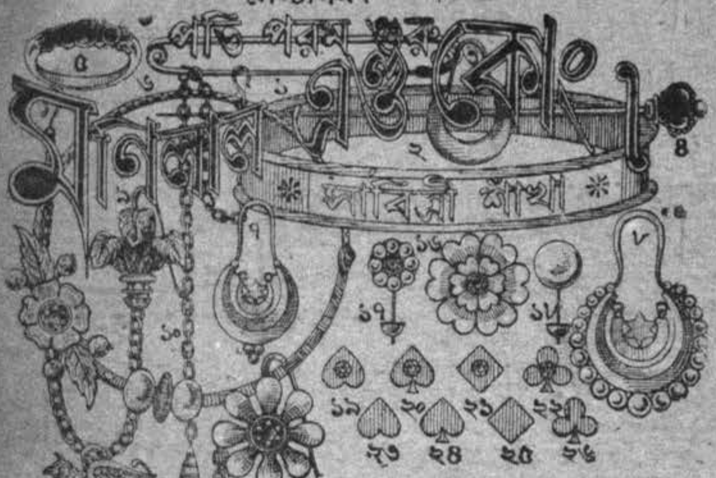
মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স

বিনা পানের

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য।

অল্পমূল্যের নানাবিধ নূতন ফ্যাসনের গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার।

সেপ্টপিন।



১। পতিপরমগুরু সেফ্টাপিন ১৫৲। ২। সাবিত্রী শাঁখা ১৪৲—৪০৲। ৩। কুমারী মাকড়ী ৬॥০। ৪। হেয়ার পিন ১৫৲। ৫। তিনখানি পাথরসেট আংটী ১২—২৫৲। ৬। নথ (নূতন ফ্যাসন) ৭৲—২০। ৭। পারসী মাকড়ী ২০৲—২৫৲। ৮। কাশ্মিরী মাকড়ী ৫৲—২২৲। ৯। নথের টানা (ক্রাউনওয়ালা) ১০৲—১৬৲। ১০। নথের টানা (প্রজাপতিওয়ালা) ১২৲—১৫৲। ১১। নথের টানা (নামওয়ালা) ১২৲—১৫৲। ১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০৲—১৫৲। ১৩। করোনেশন ইয়ারিং ১৫৲। ১৪। কলেটওয়ালা নাকছাবি ৫৲। ১৫। জড়োয়া নাকছাবি ৫৲। ১৬। কাণের টাব (ডবল থাকা ও পাথর সেট) ১০৲—৩০৲। ১৭। জড়োয়া টাব ১৫৲—৪০৲। ১৮। বেলকুঁড়ি টাব ৭৲—১২৲। ১৯। হরতন নাকছাবি (পাথর বসান) ২॥০। ২০। স্থাকছাবি ইস্কাতন ২॥০। ২১। ঐ চিড়িতন ২॥০। ২২। ঐ রুহিতন ২॥০। ২৩। হরতন নাকছাবি (প্লেন হাই পালিশ) ১॥০। ২৫। রুহিতন নাকছাবি ১॥০। ২৬। চিড়িতন নাকছাবি ১॥০ টাকা।

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দিই। বিনামূল্যে ৩নং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স,

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত ও

৩য় বর্ষ—১১শ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩২৬

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No.
C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



সম্পাদক—
কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এই আয়ুর্ব্বেদ কালেজের ৪র্থ বৎসর চলিতেছে। কালেজের "বোর্ড অভ্ ট্রষ্টির" সভাপতি—অনারেবল সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী। নাটোরাধিপতি বাহাদুর ও অনারেবল রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতি সদস্য। "কালেজ কাউন্সেলের" সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম-এস এবং বহু গণ্য মান্য কবিরাজ ইহার সদস্য। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী, কালেজ সংলগ্ন আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালে বার্ষিক ২৫০০৲ টাকা সাহায্য দান করিতেছেন।

এই আয়ুর্ব্বেদ কালেজের দুইটী বিভাগ—সংস্কৃত ও বাঙ্গলা। সংস্কৃতে বোধাধিকার থাকিলে সংস্কৃত বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। সংস্কৃত বিভাগে ৫ ও বাঙ্গলা বিভাগে ৪ বৎসর পড়িতে হয়। মাসিক বেতন উভয় বিভাগের তিন টাকা। প্রবেশ ফি ৫৲ টাকা। আয়ুর্ব্বেদের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন।

এই কালেজে আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ তো রীতিমত পড়ান হয়ই অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদের সহিত মিলাইয়া ইংরাজি "এনাটমী", "ফিজিওলজী" "সার্জ্জারি" "মিডওয়াইফারী" উত্তমরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় সুতরাং এখানকার ছাত্রগণ মেডিকেল কালেজে বা মেডিকেল স্কুলে পড়ার এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফল একত্র লাভ করিবেন—এ কম সুযোগ নহে। এই অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া সিংহল, দাক্ষিণাত্য, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ছাত্র প্রতি বৎসর এই কালেজে ভর্ত্তি হইতেছে। ৴১০ টিকিট সহিত নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে অনুষ্ঠান পত্র ও ভর্ত্তির জন্য আবেদনের কাগজ পত্র পাঠান হয়। আষাঢ়ে নূতন সেশন্ আরম্ভ হইবে।

শ্রীযামিনীভূষণ রায় এম-এ, এম-বি,
অধ্যক্ষ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদ" বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট্ এখনো পাওয়া যায়। সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবলমাত্র ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটি নাই, কিন্তু উহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। এই দুই বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদ" একত্র লইলে ৩৲ তিন টাকায় দেওয়া যাইবে। সত্বর পত্র লিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রাবণের সূচী।

অভাবনীয় ব্যাপার!

অলঙ্কারে যুগান্তর!!

রমণীরঞ্জন চুড়ি।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা
মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।



মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা

বিনামূল্যে উপহার!

"আসল ও নকল" নামক অপূর্ব্ব গল্পের বই পত্র দিলে পাঠান হয়।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এপর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোন ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ষ্টার, এস প্যাটার্ণ, বরফী প্যাটার্ণ, এস চিড়িতন ইত্যাদি সর্ব্ববিধ চুড়িই কেমিক্যালে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু রমণীরঞ্জন চুড়ি—যেমন তেমনিই আছে, গিনি না হইলে উহা প্রস্তুত হয় না। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিম্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা গিনির চুড়ির নিকট পাশাপাশি রাখিলে কোনটী আসল কোনটী নকল তাহা ধরা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ-শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে। ইহা বিজ্ঞাপনের কথা নহে—আসিয়া স্বচক্ষে দেখুন—পরীক্ষা করুন—তারপর যদি ক্রয় না করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, আপনার বাহাদুরী বুঝিতে পারিব।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা। মাশুল।৵০ আনা।

এইচ ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

বাঙ্গালীর ব্যাধি।—আমরা অনেক বারই বলিয়াছি সকল প্রকার আধিব্যাধিতে বাঙ্গালী যত ভুগিয়া থাকে, এমন আর কোনো দেশের লোককে ভুগিতে দেখা যায়না। বাঙ্গালীর অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হারও এইজন্য পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক! ইহার প্রধান কারণ—বাঙ্গালীর মত সংযমবিহীন জাতি পৃথিবীর আর কোনো দেশে নাই। সুসভ্য ইংরাজজাতি—যে জাতির রীতি নীতির অনুকরণের সকলটুকু গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া থাকি, সেই জাতির পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটি পর্য্যন্ত একটা নিয়মের বন্ধনে চলিয়া থাকে। বাঙ্গালীর সেইটিরই অভাব। ইংরাজজাতির মধ্যে দরিদ্রই হউন, মহৎই হউন, সকলের পক্ষেই সকল বিষয়েরই যে নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করেনা। ইংরাজ ঠিক সময়ে আহার করিয়া থাকে, ঠিক সময়ে কর্ম্ম করিয়া থাকে; ঠিক সময়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর অনেক সময় এই তিনটীর মধ্যে কোনোটিরই নিয়ম ঠিক থাকে না। সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই আহার-বিহারের নিয়ম উলঙ্ঘন সকলপ্রকার রোগ-উৎপত্তির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ফলে এখনকার নিয়মবিহীন বাঙ্গালীজাতি তাহারই ফলভোগ করিতেছে।

* * *

নিয়ম লঙ্ঘনের হেতু।—নিয়ম লঙ্ঘনের প্রধান হেতু এখনকার বাঙ্গালী যে পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহার সংকুলান হওয়া শক্ত, কাজেই তাহাকে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইতে হয়। বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া—অগাধ বিদ্যা অর্জ্জন পূর্ব্বক অনেকে যেরূপ চাকরি করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার কলিকাতার মত ব্যয়বহুল স্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব

পর নহে, সেই জন্য তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া বা অন্য কিছু করিয়া প্রাতে অপরাহ্নে—এখন কি রাত্রিতে পর্য্যন্ত অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা পরিষ্কৃত করিতে হয়, ফলে এরূপ পরিশ্রমে স্বাস্থ্যের অপচয় স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। দরিদ্রতার নিষ্পীড়নে অর্থ অর্থ করিয়া যাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়—তাহাদিগের ভাগ্যে পুষ্টিকর আহার্য্যলাভ যে অসম্ভব—তাহা আর বলিতে হইবে না। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও পুষ্টিকর আহারের অভাব—বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যহানির একটা বিশেষ কারণ।

* * *

বাঙ্গালী-ধনীর স্বাস্থ্যহানি।—তাহার পর দেশের মধ্যে যাহারা বড় লোক—যাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া খাইতে হয় না—তাহাদের মধ্যে অনেকের যে অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইতে দেখা যায়—তাহার কারণও সংযমের অভাব। প্রভূত সম্পদের অধিকারী করিয়া দুশ্চিন্তার হাত হইতে ভগবান তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিলে কি হইবে,—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম পালনের আবশ্যক, অনেক সময়ই তাঁহারা তাহার বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন। পুষ্টিকর আহার—তাঁহাদের ভাগ্যে যথেষ্ট জুটিয়া থাকে—কিন্তু যেরূপ পরিশ্রম করিলে সেই আহার্য্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়—দেশের ধনকুবেরদিগের অনেকেরই তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। ইংরাজ জাতি—যাহাদিগের অনুকরণ-স্রোতে আজি বঙ্গজননী মগ্নপ্রায়া হইয়া পড়িয়াছেন—কায়িক পরিশ্রম যে স্বাস্থ্যোন্নতির মূল, সে কথাটা তাঁহারা ভালরূপই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী-গরীবের সংসার প্রতিপালনের জন্য কায়িক পরিশ্রমের অবসর নাই—আর বাঙ্গালী কুবেরদিগের আলস্য পরতন্ত্রতার জন্য তাহার সুযোগ নাই। ইহার উপর বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির ফলেও অনেকে স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটাইয়া থাকেন। ফলে আলস্য পরতন্ত্রতা এবং বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির ফলই বাঙ্গালী ধনীর স্বাস্থ্যহানির কারণ।

* * *

আগেকার বাঙ্গালী।—আগেকার বাঙ্গালী তো এরূপ ছিল না, সেইজন্য আগেকার বাঙ্গালীরা এত রোগেও ভুগিতনা। ধনী দরিদ্রের সৃষ্টি যে দেশে শুধু এখনই হইয়াছে,—আগে ছিল না, তাহা নহে, সেকালেও দরিদ্রকে খাটিয়া খাইতে হইত—কিন্তু এরূপ ভাবে নহে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এখন সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন এত বেশী হইয়াছে যে, সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম না করিলে উপায় নাই। আর বড়লোকদিগের কথা—সেকালে আমাদের দেশে একালের মত এরূপ ব্যসনবাত্যা উপস্থিত হয় নাই সুতরাং সেকালে দেশের বড়লোকদিগের মতিগতিও বিলাস-বাসনায় প্রবাহিত হইত না। সেকালে ধনী দরিদ্র সকলেই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন—সে শয্যাত্যাগের পর এখনকার মত চায়ের বাটি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত না, শয্যাত্যাগের পর হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করা হইলে, সকলেই আয়ুবৃদ্ধিকর তৈলের অভ্যঙ্গ করিয়া স্নানের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালা দেশে সে প্রাতঃস্নানে দেহ স্নিগ্ধের জন্য অমৃত সেবনের ফল ফলিত। তাহার পর পূজা অর্চ্চনা শেষ করিয়া যে জলযোগের ব্যবস্থা হইত, তাহাতে স্নিগ্ধ—অথচ পুষ্টিকর দ্রব্যের ব্যবস্থা হইত। যাহার অন্য জলযোগ ঘটিত না, সেও এক বাটি ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিত।

এখন সে দুগ্ধ পান তো দুগ্ধ প্রাপ্তির অভাবে একেবারেই অসম্ভব। ফলে বাঙ্গালীর এই পরিবর্ত্তন-স্রোতঃই বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যহীন করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

বাঙ্গালী মহিলা।—বাঙ্গালীমহিলারা ও সেকালে যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, এখন তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যে সংসারের অবস্থা উন্নত, সে সংসারের মহিলাদিগকে নাটক নবেল পাঠ এবং সীবন-বনন কার্য্য ভিন্ন গৃহস্থলীর কোনো পরিশ্রমের কার্য্যই করিতে হয় না।—পাচকে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তত করিতেছে, পুরুষদিগের মত মহিলাদিগকেও থালা ভরিয়া সাজাইয়া দিতেছে,—দাসদাসীতে গৃহস্থলীর অন্যান্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে,—আর মা-লক্ষীগণ আরাম-কেদারায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। ফলে এই গৃহস্থলীর কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া পাকস্থালীর ক্রিয়ার যে ব্যতিক্রমের কারণ করিতেছেন—তাহারই ফল হইতেছে—কলিকাতায় বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা বাঙ্গালী মহিলার যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধির কারণ। বাঙ্গালীর সমৃদ্ধি সম্পন্ন গৃহে বঙ্গমহিলার যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য এই কারণে, আর বাঙ্গালী-দরিদ্রের মধ্যে যক্ষ্মারোগে বঙ্গ মহিলা কাল কবলিত হইতেছেন—আলোক রৌদ্র-বায়ু হীন বাড়ীতে বাস করিয়া এবং তাঁহাদিগকে গৃহ স্থলীর কর্ম্ম-নির্ব্বাহে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়—তাহার উপযুক্ত আহার্য্য না পাইয়া। অনেক পুরুষের আয় সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য আয়েও তাঁহারা সপরিবারে কলিকাতা বাসের জন্য যে সামান্য বাড়ীতে বাস করেন, তাহা অস্বাস্থ্যের লীলাভূমি। ফলে নানা কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সকল চিন্তা ফেলিয়া আগে এ সকল বিষয়ের চিন্তায় মনোনিবেশকরা কর্ত্তব্য।

* * *

চিন্তার সমাধান।—এ চিন্তার সমাধান করিবার উপায় কিন্তু এখনো যথেষ্ট আছে, তবে তাহার জন্য বাঙ্গালী পুরুষ যে মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন; তাহা হইতে তাঁহাকে অন্য সরণী অবলম্বন করিতে হইবে, প্রবৃত্তিকে একটু দমন করিয়া রুচি পরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত হইতে হইবে,—বাঙ্গালীকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কার্য্যোপলক্ষে যাঁহাদিগকে কলিকাতায় থাকিতে হয়, তাঁহাদিগকে আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুত্রকলত্রের জন্য আবার পিতৃপিতামহের ভিটায় শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সন্ধ্যা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালী পুরুষকে তো খাটিতেই হইবে, তাহার পক্ষে তো আয়ের পরিমাণ সামান্য হইলেও সহরে বাস না করিয়া উপায় নাই, তা' ছাড়া একাকী থাকিলে সে নিজের বাসোপযোগী একটি মাত্র উৎকৃষ্ট ঘর ভাড়া লইয়াও বাস করিলে পারিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া আপাতমধুর-সুখকামনায় সগোষ্টি একত্র থাকিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়ালাভ কি!

* * *

কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।—তাই বলিতেছি, দরিদ্র বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, এখনও সাবধান হও; —উপেক্ষার হাস্যে আস্য বিকাশপূর্ব্বক আর উড়াইয়া দিলে চলিবেনা—দেশের কথা স্মরণ পূর্ব্বক বিদেশ-বাসের স্পৃহা পরিত্যাগ কর, জননী জন্মভূমি দর্শনের সঙ্কল্প করিয়া পরিবার বর্গের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্নবান হও। পল্লীগ্রামে

ম্যালেরিয়া; কিন্তু ম্যালেরিয়া কি কলিকাতায় নাই? গত অক্টোবর হইতে জানুয়ারি পর্য্যন্ত সরকারী রিপোর্টে সে কথা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে; তা' ছাড়া গত বৎসর কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীটা কিরূপ হইয়াছিল, সে কথাটাও স্মরণ করিও। পল্লীজননী ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি—এ কথা সত্য, কিন্তু সেই ম্যালেরিয়ার নিবারণকল্পে দীর্ঘিকা পুষ্করিণীগুলির সংস্কারের জন্য প্রয়াস করিলে, বনজঙ্গলগুলি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে—পল্লীরক্ষার উপায় করা যাইতে পারে। ইহাতে তো স্বাস্থ্যরক্ষারও উপায় হয়ই,—তা' ছাড়া কিঞ্চিৎ সংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এসব কথা বাঙ্গালীর আর ভাল লাগিবে কি? রুচি-পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালী যে এখন হাবুডুবু খাইতেছে!

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

আয়ুর্ব্বেদের কথা।

আয়ুর্ব্বেদ বলিলে আমরা কি বুঝি? ঋষি বা ঋষিকল্প মহাত্মাগণের জ্ঞানগবেষণার ফল নানাবিধ হিন্দু-চিকিৎসা গ্রন্থকেই আমরা আয়ুর্ব্বেদ সংজ্ঞাপ্রদান করি এবং তদুক্ত চিকিৎসাপদ্ধতিতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আয়ুর্ব্বেদের এ অর্থ একদিন সার্থক ছিল,—যেদিন এই ভারতীয় আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত অন্যত্র এ বিদ্যার অস্তিত্বই ছিলনা। এখন কিন্তু আর সে দিন নাই, এখন নানা দেশে, নানা ভাষায় আমাদেরই এই ভারতীয় হিন্দু-চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সুতরাং এখন আয়ুর্ব্বেদ বলিলে কেবল হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতিকে বুঝিলে আয়ুর্ব্বেদের অর্থ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করা হয়। যাহাতে আয়ুস্তত্ত্বের জ্ঞান জন্মে—তাহাই আয়ুর্ব্বেদ,—তা' সে ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রসূতই হউক—অথবা দেশান্তরের জ্ঞানানুমোদিতই হউক! কিম্বা দেবভাষায় লিখিতই হউক বা দেশান্তরের মানবীয় ভাষাতেই বিরচিত হউক! যাহাতে দেখিব—শারীরতত্ত্বের আলোচনা আছে, ভৈষজ্যতত্ত্বের মীমাংসা আছে, রোগ ও আরোগ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া বুঝিব এবং তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া মানিব; তা' সে স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক!

সকল দেশের আয়ুস্তত্ত্ববিদ্যাই আয়ুর্ব্বেদ নামে পরিচিত হইলেও, অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে যেমন হিন্দুধর্ম্মের কিছু বিশিষ্টতা আছে, হিন্দু আয়ুর্ব্বেদেরও তেমনই কিছু বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, এবং এইরূপ বিশিষ্টতার জন্যই, হিন্দু-ধর্ম্মের মতই সে অন্যকে বিবিধ উপাদান প্রদান

করিয়াও, নিজে অপরের নিকট উপেক্ষিত ও নিন্দিত হইয়া বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষের সন্তান হিন্দুবংশধরগণও কেহ কেহ বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্মবিদ্যাপূর্ণ ধর্ম্মের মতই এই আয়ুর্ব্বেদকে নির্ব্বাসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে এত উর্দ্ধে তুলিয়া ধরেন যে, সাধারণের দৃষ্টি-শক্তি তত উর্দ্ধে পঁহুছিতেই পারেনা!

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে এইরূপ উর্দ্ধে তুলিয়া অতুল গৌরব অর্জ্জনের প্রয়াসী, তাঁহারা ইহাকে একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, "অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যঋষিগণের সাধনার ফল এই আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-জনের প্রতিই সমানভাবে প্রযুজ্য। যে ইহাকে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করে, সে বাতুল ও মূর্খ। এই আর্য্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছে—পরকে দান করিবার জন্য,—পরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার জন্য নয়। কারণ ইহার যাহা আছে, তদ্ব্যতীত অপরের এমন আর কিছুই নাই—যাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ শাস্ত্র অনন্ত কালের জন্য পূর্ণ!"

আর একদল লোক আছেন, যাঁহারা আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি উর্দ্ধে সংস্থাপিত না করিয়া, মানব সমাজের মধ্যেই সংস্থাপনপূর্ব্বক যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনাদি করিয়া মানবের ব্যবহারোপযোগী করিতে চাহেন। ইহাঁরা বলেন, এমন কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞান নাই, যাহা যুগে যুগে অপরিবর্ত্তনীয়। এমন যে সনাতন ধর্ম্ম, ইহার বিধিব্যবস্থাকে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার জন্যই ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয়। সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ হইতে এই সে দিনের চৈতন্য যুগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের কত পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে! তাহাতে সনাতন ধর্ম্মের গৌরব কি কিছু কমিয়াছে? তেমনই এই আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে যদি সময়োপ-যোগী করিয়া লইবার চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব কমিবেনা ত বটেই; বরং তাহার গৌরব বৃদ্ধিই হইবে। ঋষিপ্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঔষধাদির যেরূপ মাত্রা লিখিত হইয়াছে, আজকাল ক্ষীণবীর্য্য মানবমণ্ডলীর জন্য কি তদনুসারে মাত্রা লিখিত হইতে পারে? হইলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত ফলের আশঙ্কা আছে। সুতরাং এরূপ স্থলে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই ইচ্ছানুসারে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্য কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই, আয়ুর্ব্বেদকে চির অপরি-বর্ত্তনীয় বলিয়া প্রচার করিতে যত্ন করেন। পুরাতন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণও "ফিরঙ্গ রোগ" আয়ুর্ব্বেদে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; কিন্তু সেই ঋষিপ্রতিম আচার্য্যগণের তুলনায় যাঁহারা নিতান্তই নগণ্য, তাঁহারাও এক্ষণে অন্যদেশের কোন বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্তই নারাজ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোপনে গ্রহণ করিলেও প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না! এ আত্মবঞ্চনা আর কত-দিন চলিবে জানি না এবং এই আত্মবঞ্চনার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদকে কতদূর গৌরবান্বিত করা যাইবে তাহাও বুঝিনা!

আমাদের চিকিৎসাপদ্ধতি—আমাদের গৌরবের আয়ুর্ব্বেদ—বিদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির

অভ্যুদয়ে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের অমনোযোগে কিছুদিনের জন্য নিতান্তই হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় আবার তাহার গৌরব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবার শুভ সুযোগ উপস্থিত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। জানি না ভগবান ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষে কবে সে শুভদিন আনয়ন করিবেন।

ভারতবর্ষের গৌরব আর্য্যআয়ুর্ব্বেদকে আবার আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে প্রচার করিতে হইলে একণে প্রচলিত বৈদেশিক চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। কেবল মৌখিক প্রতিযোগিতা বা বিবিধ প্রকার বাক্‌বিন্যাসের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হইবে না,—হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রতিযোগীতায় অপরকে পরাজিত করিতে হইবে, কর্ম্মের সাফল্য দেখাইতে হইবে। বৈদেশীক চিকিৎসা পদ্ধতি এক্ষণে দেশের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাকে স্থানচ্যুত করা কেবল মৌখিক উপদেশের দ্বারা হইতে পারে না, এ কথা সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে। অস্ত্র চিকিৎসায় আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহা তো আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুনিয়াছি আর্য্যআয়ুর্ব্বেদে এই অস্ত্রচিকিৎসার বিধি ব্যবস্থা ভালরূপই ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার পঠন পাঠন, শিক্ষা দীক্ষা, সব বিলুপ্ত হইয়াছে। কর্ম্ম—কর্ম্মক্ষেত্র হইতে লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল অতীতের স্মৃতি। কিন্তু সেই পুরাতন স্মৃতি কি এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে? আমাদের তো তাহা বোধ হয় না। শারীর বিজ্ঞানে এবং অস্ত্রোপচারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেবল সুশ্রুতের শ্লোক আবৃত্তি করিলে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনিবার্য্য। হইতেছেও তাই। দিন দিন আয়ুর্ব্বেদকে পশ্চাতে ফেলিয়া বৈদেশিক শল্যতন্ত্র অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। আর ভৈষজ্য বিজ্ঞানে বা ঔষধ প্রকরণে হোমিওপ্যাথিক প্রণালী আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। তাহার গতি দেখিয়া বোধ হয় যে, সুদূর ভবিষ্যতে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি উভয় প্রণালীকেই পশ্চাতে ফেলিয়া হোমিওপ্যাথি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদকে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে তাহার মতই সর্ব্বপ্রকারে সুলভ হইতে হইবে। বিবিধপ্রকার পাচনেরআয়োজন করণ এবং তিনবার ঔষধ সেবনের জন্য ছয় প্রকার চূর্ণ ও নয় প্রকার স্বরসের সংগ্রহ করা বিশেষ আয়াস সাধ্য কার্য্য, দেশের লোক এরূপ আয়াস স্বীকার করিতে পারিত—যখন ইহার অপেক্ষা আর কোন সহজ সাধ্য উপায় ছিলনা, কিন্তু এখন অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালী বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথির সহজপন্থা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই আয়োজনের হিসাবেও হোমিওপ্যাথির ঝঞ্ঝাট কম, সুতরাং সুলভ, আর মূল্যের তো কথাই নাই। এত সুলভে ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে—ইহা বোধ হয় কল্পনাতেও আনা যায় না। কিন্তু উপকারিতার এ প্রণালী অন্যের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে, বরং অনেক স্থলে অধিক বলিয়াই বোধ হয়। আর্য্য

আয়ুর্ব্বেদের এই হোমিওপ্যাথির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে ঔষধ সেবনের আয়োজন কমাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং প্রচার করিতে হইলে হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসা পুস্তকের মত সরল ভাষায় রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহা দেখিয়া সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও বিপদের সময় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারে। আমি যতদূর জানি, মনে হয় যেন আয়ুর্ব্বেদের সকল পুস্তকই পুরাতন প্রণালী ক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। এক স্বর্গীয় কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের আয়ুর্ব্বেদ সোপান কিছু নূতনভাবে লেখা ছিল বটে, কিন্তু তাহাও হোমিওপ্যাথির মত লক্ষণ অনুযায়ী নহে। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের দ্বারা দেশকে নিরাময় করিতে হইলে, যাহাদের লইয়া দেশ সেই চির দরিদ্র পল্লীবাসী কৃষককুলের পর্ণ কুটিরে ঔষধ পঁহুছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন কাল-কলেরার কবলে পতিত হইয়া পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে থাকে—যখন ম্যালেরিয়ার জঠরাগ্নিতে পল্লীবাসী দগ্ধ হইতে থাকে, তখন পল্লীগুলিকে রক্ষা করিয়া পল্লীবাসী পীড়িতগণকে উদ্ধার করিবার জন্য মহামতি ধন্বন্তরির নাম স্মরণপূর্ব্বক সেই নিরন্ন ব্যাধিবিমর্দ্দিতজনগণের কুটির দ্বারে ঔষধ পথ্য লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদিগের রোগ-প্রতীকারের আয়োজন করিতে হইবে। তবে আবার এই ভারতবর্ষে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের গৌরবমহিমা বাড়িয়া উঠিবে। নতুবা নগরে আড়ম্বরপূর্ণ ঔষধালয় স্থাপন করিয়া ধনবানের খেয়ালপূর্ণকরতঃ আপনার পকেটপূর্ণ করিলেই আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও গৌরববর্দ্ধন হইবে না। বরং এই উপায়ে চিকিৎসকের সম্পদ সম্ভার বাড়িয়া উঠিলেও আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে।

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে—হিন্দুর দেশে, আমরা হিন্দু-চিকিৎসা পদ্ধতিরই পক্ষপাতী, তাই আজ বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ কবিরাজ মণ্ডলীর নিকট এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভরসা করি, তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার পীড়িতের সহায়, বিপন্নের উদ্ধার কর্ত্তা ও দরিদ্রের বন্ধু রূপে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। কেবল অর্থের আকাঙ্ক্ষা ও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহের কামনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, বাসনা পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে বলিয়া বোধ করি না এবং দেশের কিছু উপকার হইবে বলিয়াও বিবেচনা করি না।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর সাধারণ নাম যবাগূ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ চাউলের অন্ন আহারে অভ্যস্ত, তাহার সিকি পরিমাণ চাউল গুঁড়া করিয়া লইয়া যবাগূ প্রস্তুত

করিতে হয়। উক্ত চাউলের চতুর্দ্দশ গুণ জলের সহিত মণ্ড ছয়গুণ জলের সহিত পেয়া এবং চারগুণ জলের সহিত বিলেপী পাক করিতে হয়। মণ্ডে সিটা থাকে না, পেয়ার অল্প সিটা থাকে এবং বিলেপীতে প্রচুর সিটা ও অল্প তরল অংশ থাকে।

আজকাল জ্বরে যে সাগু, বার্লি সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহাও যবাগূ। কেবল উপাদানের প্রভেদ মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জ্বরের প্রথম সাত দিন তরুণাবস্থা। এই তরুণাবস্থায় উপবাস দিবার বিধি আছে। কিন্তু উহা অবস্থা ভেদে। সন্নিপাত জ্বরে যখন তিন রাত্রি বা পাঁচ রাত্রি উপবাস দিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন উক্ত ব্যবস্থার পরে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ইহা বুঝা যাইতেছে। ঋষি-বলিয়াছেন,—

লঙ্ঘন, স্বেদ, যবাগূ এবং তিক্ত রস—এই সমস্ত তরুণ জ্বরে অপক্ক দোষের পাচক।

এতদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে তরুণ জ্বরেও যবাগূ হিতকর। সুতরাং তরুণ জ্বরের কাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সম্যক উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যবাগূ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। জ্বরের আম বা তরুণাবস্থার বিচার প্রধানতঃ ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে। সে কথা পরে বলা যাইবে।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

অনুবাদ—জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন, জ্বরের মধ্যাবস্থায়, পাচন, জ্বরের শেষ অবস্থায় ঔষধ এবং জ্বর মুক্তির পর বিরেচন পথ্য।

অপিচঃ—

জ্বরের প্রথম সাতদিন তরুণ জ্বর, আট হইতে বারদিন পর্য্যন্ত মধ্য জ্বর এবং বার দিনের পর পুরাণ জ্বর বলিয়া কথিত।

এই উভয় যুক্তি দ্বারা জ্বরের প্রথম সাত দিন লঙ্ঘন ঋষিদিগের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে জ্বরের তরুণাবস্থায় যবাগূ প্রয়োগ শাস্ত্র সম্মত।

নবজ্বরে একমাত্র যবাগূই পথ্য। দালের যূষ প্রভৃতি মধ্য জ্বরে পথ্য দিতে হয়। কেননা তরুণ জ্বরে বৈদাল আমিষ প্রভৃতি নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখানেও বলিতেছি যে সাতদিন কাল সাধারণতঃ জ্বরের তরুণ অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও যদি এই কালের মধ্যে নিরাম জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে দালের যূষ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

যবাগূ, জ্বরে এবম্বিধ হিতকর হইলেও মদাত্যয়ে নিত্য মদ্য পায়ীর জ্বরে, গ্রীষ্ম-কালীন জ্বরে, পিত্ত ও কফ প্রধান জ্বরে এবং উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যবাগূ নিষিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে প্রথমে তর্পণ প্রয়োগ করিতে হয়। খৈ চূর্ণ জ্বর নাশক ফলের রস বা কাথ এবং মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়াকে তর্পণ বলে। খর্জ্জুর, কিসমিস, দাড়িম, পিয়ারা ও ফলসা প্রভৃতি জ্বর নাশক ফলের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়। কিসমিসের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিতে হইলে এক ছটাক কিসমিস দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে এবং কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে খৈ চূর্ণ চার তোলা, চিনি বা মিছরীর গুঁড়া এক তোলা এবং মধু এক তোলা মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এইরূপে অন্যান্য ফলের কাথের সহিত এবং দাড়িমের রসের সহিত তর্পণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রম, উপবাস

এবং লঙ্ঘন বায়ু জনিত জ্বরে নিষিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে দীপ্তাগ্নিরোগীকে মাংসযূষের সহিত অন্ন পথ্য দেওয়া হিতকর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঔষধ সহ সিদ্ধ যবাগূ হিতকর। এইরূপে ঔষধ সহ সিদ্ধ যবাগূ প্রয়োগে যে মহান্ উপকার হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতের আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ সুন্দর পথ্য প্রয়োগের প্রণালী দেখা যায় না, দুঃখের বিষয় এই সকল পথ্য অস্বাদু বলিয়া পরম হিতকর হইলেও এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর কখন ঐরূপ পথ্যের প্রচলন হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। আমরা আয়ুর্ব্বেদানভিজ্ঞ পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকটী এইরূপ পথ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

(১) পিঁপুল এবং শুঁঠ সহ খৈয়ের মণ্ড সহজেই পরিপাক হয় বলিয়া ক্ষুধা থাকিলে অল্পাগ্নি বিশিষ্ট রোগীকেও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা জ্বর নাশক।

২। মস্তক, পার্শ্বদেশ ও বস্তিতে বেদনা থাকিলে—গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত সিদ্ধ রক্তশালি তণ্ডুলের পেয়া হিতকর।

(৩) কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে বেদনা থাকিলেও কিসমিস, পিপুলমূল চৈ, চিতামূল এবং শুঁঠ সহ সিদ্ধ পেয়া হিতকর।

(৪) স্বল্প পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদিগের সহিত সিদ্ধ পেয়া বাতপিত্ত জ্বর নাশক।

(৫) মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, গাম্ভারী ছাল, শোণা ছাল, পারুল ছাল ও গণিয়ারী ছাল—ইহাদিগের সহিত সিদ্ধ পেয়া বাতশ্লেষ্ম জ্বর নাশক।

(৬) স্বল্প পঞ্চমূল ও মহৎ পঞ্চমূল সহ সিদ্ধ পেয়া ত্রিদোষজ জ্বর নাশক।

(৭) ধনে ও পিপুলের সহিত সিদ্ধ পেয়া পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বর নাশক।*

এই সকল দ্রব্যের সহিত মাংসের যূষ বা দালের যূষও পাক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বহুবিধ যোগের বিষয় আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় উদ্ধৃত করা হইল না। যবাগূ পাকের নিয়ম দুই প্রকার, যথা ক্বাথসাধ্য ও কল্কসাধ্য। ক্বাথসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে ষড়ঙ্গ পাণীয়ের নিয়মে দুই তোলা ঔষধ চার সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া লইবে এবং সেই ক্বাথের সহিত মণ্ডাদি পাক করিয়া লইবে।

কল্ক সাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধ এক তোলা বা আধ তোলা পেষণ করিয়া বা চূর্ণ করিয়া আবশ্যক মত চাউল চূর্ণ এবং চাউল চূর্ণের চতুর্থ গুণ), ছয় গুণ (পেয়া) বা চারিগুণ (বিলেপী) জল সহ একত্র সিদ্ধ করিবে। পরে মণ্ড পেয়াদির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া লইবে।

ঔষধ দ্রব্য তিন প্রকার, যথা তীক্ষ্ণবীর্য্য (যেমন শুঁঠপিঁপুল প্রভৃতি), মধ্যবীর্য্য (যেমন বেলছাল, শোনা ছাল প্রভৃতি) এবং মৃদুবীর্য্য (যেমন আমলকী প্রভৃতি)। শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ দ্রব্য দুই তোলা, মধ্যবীর্য্য দ্রব্য চার তোলা এবং মৃদুবীর্য্য দ্রব্য আট তোলা লইবার নিয়ম আছে। ইহা কল্কসাধ্য যবাগূ সম্বন্ধে, ক্বাথ সাধ্য যবাগূতে ঔষধ আট তোলা হইতে বত্রিশ তোলা লইবার নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু এখনকার স্বল্পপ্রাণ লোকের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথসাধ্য যবাগূর পরিমাণ অনুসারে

দ্রব্য লইয়া ক্বাথ সাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আর কল্কসাধ্য যবাগূর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের চতুর্থাংশ পরিমাণ ঔষধ লইয়া কল্কসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করা উচিত।

কেবল জ্বর বলিয়া নহে আয়ুর্ব্বেদে প্রায় সকল রোগেই এইরূপ ঔষধ সিদ্ধ যবাগূ প্রয়োগের বিধি আছে এবং এই সকল যবাগূ সেই সকল রোগে মহোপকারী। কিন্তু এইরূপ পথ্য প্রয়োগের একটী দোষ যে, অরুচি জন্মায়। "বৃন্দ"—ঔষধের মাত্রা কম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তরুণ জ্বরে যে একমাত্র যবাগূই প্রযোজ্য এবং দালের যূষ প্রভৃতি মধ্য জ্বরে পথ্য তাহা চরকে বিশেষরূপে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"যতদিন জ্বর মৃদুভাবাপন্ন না হয় অথবা ছয় দিন পর্য্যন্ত—বিচক্ষণ ব্যক্তি মণ্ড পেয়াদি পথ্য দিবেন। সমিধের দ্বারা যে অগ্নি দীপ্ত হয়, মণ্ডাদি সেবন দ্বারা জঠরাগ্নিও সেইরূপ দীপ্ত হইয়া থাকে।......অনন্তর সাত্ম্য (অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপ খাদ্য আহার করিতে অভ্যস্ত এবং যাহা তাহার পক্ষে হিতকর, এবং অগ্নি বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তর্পণ জীর্ণ হইলে পাতলা মুগের যূষ বা জাঙ্গলরসের সহিত পথ্য দিবে।

মুগ, মসুর, ছোলা, কুলথ কলায় ও মুগের যূষ নবজ্বররোগীর পক্ষে হিতকর, বেগুন, সজিনার ডাঁটা, উচ্ছে, বেতের ডগা, পটোল, কাঁকরোল, পলতা, কচি মূলা, তিক্ত শাক, নটে শাক এবং গুজেরা শাক মধ্য জ্বরে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ফলের মধ্যে দাড়িম, কিসমিস ও বৈঁচি এবং পূর্ব্ব কথিত খেজুর, ফলসা ফল প্রভৃতি সুপথ্য।

মধ্য জ্বরে অন্ন (ভাত) পথ্য নহে। চরকে মধ্য জ্বরে যূষাদি প্রয়োগের সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, পুরাতন শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের যবাগূ জ্বর নাশক বলিয়া জ্বরিতব্যক্তিকে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তরুণ জ্বরে যে অতি লঘু মণ্ড প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে; মধ্য জ্বরে তাহা না দিয়া পেয়া ও বিলেপী ক্রমশঃ দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাত্ম্য ও অগ্নি বল লক্ষ্য করিয়া মধ্য জ্বরে পথ্য দিবে। শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য (দালের যূষ, শাক প্রভৃতি) পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয় গণের পক্ষে সাত্ম্য হইলে মাংসভোজী য়ুরোপীয় জাতির পক্ষে সাত্ম্য নহে। সুতরাং একজন জ্বরিত য়ুরোপীয়কে পথ্য দিতে হইলে মাংসের যূষ দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বে যে সকল রোগীকে যবাগূ প্রয়োগ নিষেধ করিয়া তর্পণ পথ্য দিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল রোগীকে দাড়িমাদির রস দ্বারা মিশ্রিত জাঙ্গল মাংসের যূষ দিবার বিধি আছে।

সুশ্রুতের মতে মন্দাগ্নি বিশিষ্ট রোগীকে পুরাতন মদ্য এবং যবান্ন (যবকৃত খাদ্য) আহার করিতে দেওয়া হিতকর।

পুরাণ জ্বরে অর্থাৎ জ্বর উৎপন্ন হইবার দ্বাদশ দিন পরে লাব, গৌর তিতির কৃষ্ণবর্ণ হরিণ; চিত্র হরিণ ও চতুঃশৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণের মাংসের যূষ পথ্য দিবে। সারস, কুক্কুট ও তিতিরের মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক ঐ সকল জ্বর রোগীকে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু লঙ্ঘনের জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে কাল ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মাংস বায়ুনাশক, বলবৰ্দ্ধক এবং পুষ্টিকর বলিয়া পুরাণ জরে মাংসের যূষ বিশেষ হিতকর। মধ্য জ্বরে যে সকল পথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও পুরাণ জ্বরে প্রয়োজ্য, তদ্ব্যতীত গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ এবং অবস্থা বিবেচনায় ঘৃত পুরাণ জ্বরে পথ্য দিবার উপদেশ আছে।

পুরাণ জ্বরে অন্ন (ভাত) পথ্য কি না? এক্ষণে দেখা যায় যে, কি আয়ুর্ব্বেদীয়—কি ভিন্ন, সমগ্র দেশের চিকিৎসক রোগী সম্পূর্ণ জ্বর মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ন প্রয়োগ করেন না। বরং জ্বর ত্যাগের পর দুই এক দিন রুটী প্রভৃতি পথ্য দিয়া পরে অন্ন আহার করিতে দেন। শাস্ত্রেও পুরাণ জ্বরে অন্ন পথ্য দিবার কোন উপদেশ নাই। অথচ পুরাণ জ্বরে চরকে ঘৃত পান করিবার উপদেশ আছে। যথা :—

"কষায়, বমন, লঙ্ঘন, এবং লঘুভোজন দ্বারা যে, রুক্ষ রোগীর জ্বর প্রশমিত না হয়, চিকিৎসক তাহাকে ঘৃত প্রয়োগ করিবেন।

কিন্তু এক্ষণে এইরূপ ঘৃত প্রয়োগের প্রথা নাই। ইহার কারণ কি? প্রধাণতঃ ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পূর্ব্বে লোকে ঘৃতসাত্ম্য ছিল এবং নিত্য প্রচুর ঘৃত সেবন করিত বলিয়া উহার প্রয়োগ সহ্য হইত। কিন্তু এক্ষণে লোকে ঘৃত সাত্ম্য হইলেও নিত্য যথেষ্ট সেবন করিতে পায় না এবং ঘৃত প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জাঙ্গল দেশে শরীর যেরূপ শীঘ্র রুক্ষ হয় এবং কফের দোষ নষ্ট হয় বঙ্গের ন্যায় আনূপ দেশে তাহা হয় না। আর এইরূপ না ঘটিলে ঘৃত প্রয়োগ করাও সঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন :—

দশদিন অতীত হইলেও রোগীর শরীরে যদি সম্যক লঙ্ঘনের লক্ষণ সকল প্রকাশ না পায় এবং কফের প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে ঘৃত পান না করিয়া দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

জীর্ণ জ্বর ও বিষম জ্বরের অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্ব কথিত পথ্য সকল প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বর প্রবল হইলে নবজ্বরের নিয়ম পালন করা কৰ্ত্তব্য। জ্বর প্রবল হইলেই অগ্নিবল ক্ষীণ হয় এবং শারীরিক যন্ত্র সকলের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। জীর্ণ জ্বরে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন :—

"দেহস্থ ধাতু সকলের (রসরক্তাদি) দৌর্ব্বল্য বশতঃ জীর্ণ জ্বর হইয়া থাকে। সুতরাং জীর্ণ জ্বরগ্রস্ত রোগীকে পুষ্টিকর আহার দিবে। অবশ্য এখানে পুষ্টিকর আহার অর্থে পোলাও কালিয়া নহে, মাংসের যূষ, দালের যূষ, দুগ্ধ প্রভৃতি। জীর্ণ ও বিষম জ্বরে জ্বর প্রবল না হইলে অথবা কফের প্রকোপ না থাকিলে অন্নভোজী পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে জানা উচিত যে, জীর্ণ জ্বর ও বিষম জ্বরে বিবিধ উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। সেই সকল উপসর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পথ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

জ্বরে রোগীকে অধিক উপবাস দিয়া তাহার বলক্ষয় করা উচিত নহে—সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; পুনরায় বলিয়াছেন :—

"জ্বরিত ব্যক্তির অরুচি হইলেও হিতকর খাদ্য সেবন করা উচিত। কেননা, যথা সময়ে আহার না করিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জ্বররোগী গুরুদ্রব্য অভিষ্যন্দী দ্রব্য এবং অকালে ভোজন করিবে না। অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা আয়ু ও সুখপ্রদ হয় না।

অহিতকর দ্রব্য যখন এইরূপ নিষেধ করা হইয়াছে, তখন অহিতকর দ্রব্য প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কিন্তু দারুণ অরুচির জন্য রোগী যদি সুপথ্য সেবন করিতে না পারিয়া ক্ষীণ হইতে থাকে এবং সামান্য কুপথ্য সহিত যদি কিঞ্চিৎ সুপথ্য আহার করিতে পারে—এরূপ সামান্য কুপথ্য দেওয়া সঙ্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

জ্বরিত ও জ্বর মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অপরাহ্নে ভোজন করা প্রশস্ত। কেননা সেই সময়ে শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায় অগ্নিপ্রবল হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে সময়ে আহারে অভ্যস্ত, সেই সময়েই তাহার ক্ষুধা বোধ হয় এবং সেই সময় অতীত হইলে ক্ষুধা নষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য ভোজনকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে সেই সময়েই আহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিত্য একপ্রকার খাদ্য আহার করায় এবং খাদ্য স্বাদ নহে বলিয়া যদি পথ্যের প্রতি বিরাগ জন্মে, তাহা হইলে যাহাতে রোগীর রুচি জন্মে এরূপ ভাবে পথ্য প্রস্তুত করিবে।

জ্বরে পথ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের একটী বিষম মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নবজ্বরে যথেষ্ট দুগ্ধও পথ্য দিয়া থাকেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

জীর্ণ জ্বরে বলক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় হিতকর। কিন্তু উহা তরুণ জ্বরে প্রযুক্ত হইলে মনুষ্যকে বিষের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া থাকে।

দুগ্ধ মধুর, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক বলিয়া নবজ্বরে দুগ্ধ প্রশস্ত নহে। দুগ্ধ নবজ্বরে প্রযুক্ত হইলে শরীরের অধিকতর গুরুতা জন্মায়, স্বেদবাহী স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ করে, অগ্নি দুর্ব্বল থাকায় সুচারুরূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হওয়ায় আরও আমদোষের বৃদ্ধি করে। এইজন্য বিবিধ রোগে সুপথ্য এবং মনুষ্যের জীবন স্বরূপ হইলেও দুগ্ধ নবজ্বরে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নবজ্বরে দুগ্ধ প্রয়োগের অপকারিতা আমরা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটী মাত্র রোগীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

রোগীর বয়স ২৫।২৬ বৎসর। আসিয়া বলিল যে, জ্বর হইয়াছে, ৪।৫ দিন হইল, জ্বর ছাড়ে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিলাত হইতে ডাক্তারী উপাধি লইয়া প্রত্যাগত হইয়া অল্প বয়স্ক ডাক্তার দেখিতেছে। অন্য পথ্য না দিয়া প্রত্যহ দেড় সের, দুই সের দুগ্ধ পথ্য দেওয়া হইতেছে। দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া এবং জলসাগু ও জল বার্লি খাইতে বলিয়া ঔষধ দিলাম। রোগী তিন দিন পরে আসিয়া বলিল যে, ঔষধ খাই নাই, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে দুগ্ধই যে জ্বর আটকাইয়া রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা নবজ্বরে দুগ্ধ প্রয়োগের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমরা এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দুইটী তুল্য জ্বরবেগবিশিষ্ট রোগীর একটীকে দুগ্ধ এবং একটীকে অপর খাদ্য দিয়া দেখিলে সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যিনি এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি কখনই আর নবজ্বরে দুগ্ধ প্রয়োগ করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী—বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেদ বৃদ্ধি।

—:০:—

অনেক কৃশকায় ব্যক্তির মোটা হইবার সাধ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের শরীরে কোন ব্যাধি নাই, বলও যথেষ্ট আছে, শরীর বেশ শ্রমক্ষম, কিন্তু গঠনের কৃশতা বশতঃ তাঁহারা দুঃখিত। তাঁহাদের অভিপ্রায় যে, দেহখানি বেশ নাদুস-নুদুস হইবে, গণেশের মত ভুঁড়িটী হইবে। এমন কি মোটা হইবার জন্য তাঁহারা ঔষধ খাইতে এবং মেদোৎপাদক পথ্য গ্রহণেও ত্রুটি করেন না। এইরূপ করিতে গিয়া কাহারও কাহারও এত মেদাধিক্য হইয়া পড়ে যে, জীবনের আশঙ্কায় আবার মেদ কমাইবার জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ স্বভাবতঃই মোটা, ক্রমে এত মোটা হন যে, একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। এমন কি নিজের শরীর বহনেও অক্ষম হইয়া পড়েন। মেদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তের তারল্য কমিয়া যায় ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া মৃদু হইয়া আসে। এমন কি হৃৎপিণ্ড মেদোময় হইয়া হঠাৎ উহার ক্রিয়া বন্ধ প্রযুক্ত আকস্মিক মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ফুসফুসে মেদাধিক্য হইয়া শ্বাসরোধেও মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং মোটা হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর বই হিতকর নহে। শুধু স্বাস্থ্যহানিকর নহে, একেবারে প্রাণসংশয়কর। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল, (কোন রোগ বশতঃই হউক বা ধাতুগত কারণেই হউক) তাঁহারা বললাভের জন্য বলবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করিতে পারেন। বলবর্দ্ধন ও মেদোৎপাদন দুইটী পৃথক জিনিষ। কৃশব্যক্তিও যথেষ্ট বলশালী হইতে পারেন এবং মোটা লোকও যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল হইতে পারেন। তবে দৌর্ব্বল্য বশতঃ যদি শরীর কৃশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বলবর্দ্ধক ঔষধ সেবন ও পুষ্টিকর পথ্য গ্রহণে বলসঞ্চার হইলেই ক্রমশঃ কৃশতা নষ্ট হইয়া পূর্ব্ব গঠন লাভ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মেদবৃদ্ধির চেষ্টা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অনেক সময় আহারাদির দোষে স্বভাবতঃই মেদাধিক্য ঘটিয়া থাকে। মেদবৃদ্ধি সখের জিনিষ নহে, ইহাও পীড়া বিশেষ। ইংরাজিতে এই পীড়াকে ওবেসিটি (obesity) বলে।

এই পীড়া সকল বয়সেই হয়। কিন্তু শৈশবাবস্থায় এবং চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সে ইহার আধিক্য দেখা যায়। এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ঋতু বন্ধের সময় অর্থাৎ ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে হইতে দেখা যায়।

এই রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণাবলী বর্ণনার আবশ্যক করে না। রোগীকে দেখিবামাত্রেই ইহার উপলব্ধি লইতে পারে। ইহার প্রথম চিহ্ন শরীরের আয়তন বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন ধীর ও আয়াস-সাধ্য হয়। পদক্ষেপে মন্থরগতি হয়। ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়াব্যত্যয় ঘটে এবং শ্বাসকষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি

হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে উহার মধ্যে মেদসঞ্চয় হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, ধমনী সমূহের কাঠিন্য বৃদ্ধি হয়। মূত্র-গ্রন্থির পীড়া কিম্বা বহুমূত্রও হইতে দেখা যায়, ঘর্ম্ম অতিরিক্ত হয়। অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও হৃৎকম্প হয়।

এই রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কৌলিক, অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কাহারও এই পীড়া থাকিলে তাঁহার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এই পীড়া হইতে দেখা যায়; এই মত কতদূর ভিত্তি-মূলক বলিতে পারি না। তবে কোন কোন স্থলে নির্দ্দিষ্ট বংশের মধ্যে পুরুষানুক্রমে কয়েক জনের এই পীড়া হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার কারণ কুলগত কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে, বংশের এক জনের যে উত্তেজক কারণে (exciting cause) রোগোৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অপর আক্রান্ত ব্যক্তিদের ও সেই কারণ বর্ত্তমান। কারণ নিবারণ করিলে তাঁহারাও এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলে ইহাকে ঠিক কুলগত বলা যায় না। এ রোগের প্রধান কারণ অতিভোজন ও শ্রমহীনতা। গঠনের স্থূলতা কতকটা কুলগত বটে। এই স্থূলতা মেদবৃদ্ধি জনিতও হইতে পারে, অথবা মাংসবৃদ্ধি জনিতও হইতে পারে। আহার ও শ্রমের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে মেদসঞ্চয় (fatty in filtration) না হইয়া মাংসবৃদ্ধি (muscular development) হইতে পারে।

এই রোগ সকল সময়েই যে আরোগ্য সাধ্য তাহা নহে, বরং অধিকাংশ স্থলেই দুরারোগ্য দেখা যায়। একবার মেদবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে, উহার বর্দ্ধনশীলতা কমান বড়ই দুরূহ। তবে আহারাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতিবর্দ্ধন কিয়ৎপরিমাণে দমন করা যাইতে পারে। যাঁহাদের বংশে এই রোগ বর্ত্তমান, তাঁহারা প্রথম হইতে প্রতি-ষেধক উপায়াবলী অবলম্বন করিয়া ইহার আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১ম) আহার হ্রাস, বিশেষতঃ মেদোৎ-পাদক খাদ্য না খাওয়া।

(২য়) মাংসপেশীর ক্রিয়া বৃদ্ধি।

(৩য়) রক্তকণিকার বর্দ্ধন সাধন।

(৪র্থ) দেহাভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে অম্লজান উৎপাদন।

এই চারিটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পরিলে প্রায়ই এ রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু এ গুলি কার্য্যে পরিণত করা দুষ্কর হয় বলিয়া এ রোগ দুরারোগ্য বলিয়া বর্ণিত হয়।

আহার কমাইতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত কমান আবশ্যক। যাহাতে রোগী দুর্ব্বল ও রক্তহীন না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যদি রক্তহীনতা হয় অথচ মেদ না কমে, তাহা হইলে অত্যন্ত ভয়ের কারণ। আহার এরূপ ভাবে কমাইতে হইবে—যাহাতে শরীরের বল ও গুরুত্ব না কমে অথচ মেদ বৃদ্ধি হইতে না পারে। উপবাস দ্বারা রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিবে না, তাহাতে আরও কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। আহারের পরিমাণ না কমাইয়া তাহার রূপান্তর অবলম্বন করিলে

ও এ কার্য্য সফল হইতে পারে। যথা ঘৃত, ছানা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মেদোৎপাদক খাদ্য ত্যাগ করিলে ক্রমশঃ স্থূলতা কমান যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকারের হরিদ্বর্ণ তরকারী ও অম্ল ফল বিশেষ উপযোগী। চাউল ও ময়দা অল্প পরিমাণে খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত করিবেন না। কঠিন খাদ্যের পরিমাণ যত কমাইতে পারা যায় ও পানীয়ের বৃদ্ধি করাযায়, ততই ভাল।

কেবল আহারের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। মেদোৎপাদক খাদ্য না খাইলে মেদ জন্মিতে পারে না বটে, কিন্তু সঞ্চিত মেদের অপচয় হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য মাংসপেশীর ক্রিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা বলিয়া অতিরিক্ত বা স্যাধাতীত পরিশ্রম করা উচিত নহে। কায়িক শ্রম বা ব্যায়াম প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতরূপে করিতে হইবে। প্রথমে অতি সহজভাবে ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে অল্প অল্প করিয়া উহার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। যাহারা অতিরিক্ত মোটা—তাহাদের হৃৎপিণ্ড ও মেদসঞ্চয় বশতঃ উহার যান্ত্রিক ক্রিয়া বড়ই দুর্ব্বল। সুতরাং একেবারে অতিরিক্ত শ্রম আরম্ভ করিলে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আকস্মিক মৃত্যু হইতে পারে। সেইজন্য ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া ব্যায়াম সহ্য করান আবশ্যক। বেড়ান, নৌকা চালান, কাঠ কাটা, পাহাড়ে উঠা, বাইসিকাল চড়া প্রভৃতি ব্যায়াম মন্দ নহে।

রক্ত কণিকার বর্দ্ধনসাধনের জন্য তদুপযুক্ত ঔষধাদি সেবন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ লৌহ ঘটিত ঔষধ বিশেষ উপযোগী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। এ বিষয় চিকিৎসকের নিজের বিবেচ্য।

দেহাভ্যন্তরে অম্লজান বৃদ্ধির জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবন আবশ্যক। অনাবৃত স্থানে বিচরণ বা সামান্য ব্যায়াম মন্দ নহে। গৃহ মধ্যে ব্যায়াম করিলে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। ব্যায়াম অনাবৃত স্থানে করা আবশ্যক। শ্বাস যন্ত্রের ব্যায়াম অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ বিশেষ উপযোগী। হিন্দুর প্রাণায়াম পদ্ধতি ইহার সুন্দর আদর্শ। যাঁহারা ইহাতে অনভ্যস্ত তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত এ ব্যায়াম অভ্যাস করিবেন।

এই সকল উপায়াবলম্বনে মেদসঞ্চয় কমাইতে পারা যায়। অতএব যাঁহারা দুর্ব্বল বা অসুস্থ নহেন, অথচ কৃশ, তাঁহারা যেন কৃশতার জন্য ক্ষোভ না করেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

পঞ্চকর্ম্ম ব্যাপদ্‌।

——:০:——

[ডাক্তার কবিরাজ সংবাদ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক। আচ্ছা পঞ্চকর্ম্মের বিষয় যা' শু'নলেন, তা'তে আপনার কি মনে হয়?

ডাঃ। সে কথা আমি এখন বলছি্নে ব্যাপদের কথা শুনি তা'রপর বলব।

ক। আচ্ছা তা' হলে ব্যাপদের কথা শুনুন। প্রথমে বমন ও বিরেচনের কথা বলছি। বমন বিরেচনের অন্যান্য ব্যাপদ একই রকম, কেবল বমনের গতি উর্দ্ধ দিকে আর বিরেচনের গতি অধোদিকে এই—ব্যাপদের মাত্র প্রভেদ। সুশ্রুত গ্রন্থে পনর রকম ব্যাপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ডাঃ। অন্য গ্রন্থে কম বেশী আছে নাকি ?

ক। কম-বেশী প্রকৃত পক্ষে নাই, কেবল বলবার রীতিগত প্রভেদ বলে মনে হয়। পূর্ব্বে বলেছি যে সুশ্রুতের ধূমপানের বিধি পাঁচ রকম আর চরক তিন রকম ব'লে উল্লেখ আছে। কিন্তু সুশ্রুতের যে দু'রকম বেশী—সে দুটোর চরকের তিন প্রকার ধূমপানের অন্ত বিভাগ মাত্র। কাজেই কম বেশী হলেও ফলে এক।

ডাঃ। বুঝতে পেরেছি আপনি ব'লে যান।

ক। প্রথমে বমনকারক ঔষধ যদি অধো দিকে যায় এবং বিরেচন ঔষধ অধোগামী না হ'য়ে যদি উর্দ্ধগামী হয়—তা হলে কি করা উচিত তাই বলছি। অত্যন্ত ক্ষুধিত, অতি তীক্ষ্ণ অগ্নি বিশিষ্ট, মৃদু কোষ্ঠ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি বমন কারক ঔষধ সেবন ক'রলে যদি অধোদিকে গমন করে, এরূপ অবস্থায় বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তির জন্য রোগীকে প্রথমে স্নেহ প্রয়োগ ক'রে পরে তীব্রতর বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বমি করাবে। আবার যদি উৎক্লিষ্ট শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ আমাশয় অশোধিত থাকে, কিম্বা ভুক্তান্ন পরিপাক প্রাপ্ত হ'তে বাকী থাকে, তা'হলে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করলে পরে অধোগতি না হয়ে উর্দ্ধ গতি হয়ে থাকে। অপ্রিয় বিরেচক অধিক মাত্রায় সেবন করলেও এই দোষ ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে অবিশুদ্ধ আমাশয়যুক্ত এবং অধিক শ্লেষ্মযুক্ত রোগীকে বমন করিয়ে তীক্ষ্ণতর বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করে বিরেচন করাবে। অপ্রিয় বিরেচক ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করার জন্য এরূপ ঘটলে পুনরায় মুখপ্রিয় বিরেচক অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার যদি এইরূপ ঘটে, তা হলে আবার তৃতীয় বার বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করবে। মধু, ঘৃত এবং পাত্‌লা আকের গুড় একত্রে লেহন করিয়ে বিরেচন করাবে।

অল্প মাত্র ঔষধ দোষের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যদি দেহের উর্দ্ধভাগে বা অধোভাগে থাকে এবং দোষকে স্থানচ্যুত ক'রতে না পারে, তা হলে পিপাসা, পার্শ্বদেশে শূলাদি, বমি, মূর্চ্ছা, সন্ধি স্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, গা বমি বমি করা, শরীরের গ্লানি এবং ঔষধের গন্ধযুক্ত ঢেকুর উঠা এই সকল উপদ্রব উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে উষ্ণ জল পান করিয়ে বমন করাবে।

ক্রূর কোষ্ঠ ব্যক্তির, অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অল্পগুণ বিশিষ্ট ঔষধ অন্নের ন্যায় পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বর্দ্ধিত দোষ যথাকালে নির্গত হয় না এবং তজ্জন্য ব্যাধির বৃদ্ধি ও বলহানি হয়ে থাকে এরূপ অবস্থায় প্রচুর এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন বা বিরেচক প্রয়োগ করবে।

স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করে অল্প গুণ ঔষধ প্রয়োগ করলে অল্পমাত্র দোষ নষ্ট হয়। বমন কারক দ্রব্য এইরূপে প্রয়োগ করলে দোষের শেষ থাকে বলে শরীরের গুরুতা,

বমন, ত্রাস, হৃদয়ের অশুদ্ধি এবং ব্যাধির বৃদ্ধি ঘটে। এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বমন ক'রাবে। আর বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ ক'রে দোষের শেষ থাকলে মলদ্বারের শূলুনি, পেটফোলা, মাথা ভার, অধোবায়ুর অনির্গম এবং ব্যাধির বৃদ্ধি হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রে, অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করা'বে। এটা হ'ল হীন দোষের কারণ ব্যাপদ। এইবার বাতশূল-ব্যাপদের কথা বলছি।

স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ না ক'রে রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে অথবা মৈথুনরত ব্যক্তিকে রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে বায়ু কুপিত হয় এবং সেই কুপিত বায়ু পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটী, ঘাড়ের শিরা ও হৃদয়ে শূলবদ্ বেদনা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ও সংজ্ঞানাশ উৎপন্ন ক'রে। এরূপ স্থলে রোগীকে স্নেহ দ্বারা অভ্যঙ্গ করে ধান্য-স্বেদ দিয়ে যষ্টিমধূ সহ পাক করা শীতল তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। বমন বিরেচন উভয়ের বাতশূল ব্যাপদের কি এই একরূপ লক্ষণ এবং চিকিৎসা?

ক। হাঁ, যেখানে অন্যরূপ উল্লেখ না থাকে, সেখানে এক রকমই বুঝতে হ'বে, কেননা প্রথমেই বলা হ'য়েছে যে, উভয়ের ব্যাপদ উর্দ্ধগতি অধোগতি ভিন্ন সমস্তই এক প্রকার।

এইবার আরোগ্যের কথা বলিতেছি! স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ না ক'রে অল্প বা অল্প গুণ বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে তাহা উর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়ে নিঃসৃত হয় না এবং দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট ক'রে ও তাহার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বলক্ষয় করে। ইহাতে পেটবেদনা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ উপসর্গ ঘটে। এরূপ অবস্থায় লবণ মিশ্রিত মদন ফলের কাথ দ্বারা বমন করা'বে এবং তীক্ষ্ণতর কর্পূর প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করাবে। আবার যে ব্যক্তির সহজে বমন হয় না, যে ব্যক্তির বমনকারক ঔষধ সেবন করলে অল্প বমন হয় এবং সেই ঔষধ দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট ক'রে শরীরে কণ্ডু, শোথ, কুষ্ঠ, বেদনা উৎপন্ন করে, এরূপ স্থলে অবশিষ্ট দোষ তীক্ষ্ণ-ঔষধ প্রয়োগ না ক'রে বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে অল্প বিরেচন হয় এবং নাভির অধোভাগে উদরের পূর্ণতা ও স্তব্ধতা, বোধ হয় এবং মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অবস্থায় আস্ফালন প্রয়োগ করে পুনরায় স্নেহস্বেদ এবং বিরেচন করাবে, তাহার পর তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করে বিরেচন করাবে। দোষ উপযুক্তরূপে নিঃসৃত না হলে এবং সংশোধন ঔষধ দুষ্ঠ ভাবে কোষ্ঠে থাকলে বিরেচনের উত্তেজনার জন্য ঔষধ—জল পান করাবে এবং হাত গরম করে পার্শ্বদেশে ও উদরে স্বেদ দিবে। এরূপ করলে দোষ নির্গত হয়। বহু দোষযুক্ত ব্যক্তির অল্প বিরেচন প্রয়োগে শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি হয়। এরূপ অবস্থায় আস্থাপন প্রয়োগ ক'রে পুনরায় স্নেহপান এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করাতে দোষ উপযুক্ত রূপে নিঃসৃত না হলে এবং সংশোধন ঔষধ দুষ্ট ভাবে কোষ্ঠে থাকলে বিরেচনের উত্তেজনার জন্য উষ্ণজল পান ক'রাবে এবং হাত গরম ক'রে পার্শ্বদেশে ও উদরে স্বেদ দিবে। এরূপ ক'রলে দোষ নির্গত হয়। বহু দোষযুক্ত

ব্যক্তির অল্প বিরেচন হ'য়ে যদি ঔষধ জীর্ণ হয়ে যায়, তা'হলে দিবসের শেষভাগে রোগীর বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ ক'রবে। ইহাতেও যদি দোষের নিবৃত্তি না হয়, তা'হলে দশ দিন পরে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে পুনরায় বিরেচন ক'রাবে। রোগী দুর্ব্বল ও যাহার সহজে বিরেচন হয় না—সেরূপ স্থলে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রে, পুনরায় স্নেহপান করিয়ে বিরেচন ক'রাবে।

এইবার অতিযোগের বিষয় ব'লছি, অতিশয় স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের পর অথবা অত্যন্ত মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় বা তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে অতিযোগ হয়, বমনের অতিযোগ ঘটে, অত্যন্ত পিত্ত নিঃসরণ, বল ক্ষয় এবং অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপ হয়। এরূপ অবস্থায় শরীরে ঘৃত মর্দ্দন ক'রে শীতল জলে অবগাহন করাবে এবং শর্করা ও চিনি মিশ্রিত হিতকর লেহ পথ্য দিবে। বিরেচনের অতিযোগ হ'লে অত্যন্ত কফনিঃসৃত হয় ও শেষে রক্ত ভেদ হয়, বলের হানি ঘটে এবং বায়ু অত্যন্ত কুপিত হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে অত্যন্ত শীতল জলে অবগাহন করাবে বা রোগীর শরীরে শীতল জল সেচন করবে এবং শীতল চেলুনি জল মধু মিশ্রিত ক'রে পান করিয়ে বমন করাবে। অনন্তর পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করে দুগ্ধ ঘৃত দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করবে। চেলুনি জল সহ প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি ঔষধ পান ক'রতে দেবে এবং দুগ্ধ বা মাংস রস পথ্য দেবে।

ডাক্তার। আচ্ছা অতিযোগে কি সমস্ত গুলোই ক'রতে হবে। যদি শীতল জল সেবন করলে আর বমন করালে অতিযোগের লক্ষণ দূর হয়, তা'হলেও কি অনুবাসন পিচ্ছাবস্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করতে হবে?

কবিরাজ। না, তা হ'বে কেন। রোগ থাকলেই ওষুদ দিতে হয়, রোগ না থাকলে ওষুদ দেবার আবশ্যক কি, তবে ততক্ষণ ক্রমশঃ ঐ সকল ক্রিয়া ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। ভাল আর একথা কথা,—পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, বিরেচনের সাত দিন পরে বস্তিক্রিয়া করতে হয়, এ স্থলেও কি তাই করতে হবে? আর যোগবস্তি যেরূপ আটটা প্রয়োগ করবার নিয়ম, সেইরূপ করতে হবে?

ক। তাও কি কখন হয়? রোগী অতিরিক্ত বিরেচনের ফলে মারা যেতে বসেছে সে স্থলে কি অপেক্ষা করা চলে? আর এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে—দুই একটী বস্তি—তাও কম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। নইলে রোগী সহ্য ক'রতে পারবে কেন? পিচ্ছাবস্তি দিলে যদি উপসর্গ নষ্ট হয়, তবে দুটী দেবার আবশ্যক নেই।

ডাঃ। আচ্ছা বুঝেছি, এইবার অন্য কথা বলুন।

ক। বমনের অতিযোগ হেতু যদি থুঁথুর সঙ্গে রক্ত উঠে বা রক্ত বমি হয়, জিহ্বা নির্গত হয়ে পড়ে বা ভিতরে প্রবেশ করে, চক্ষু বহির্গত হয়, চোয়াল ধরে যায়, পিপাসা, হিক্কা, জ্বর ও সংজ্ঞানাশ হয়, তবে জীবদান ব্যাপদ বলে। এই অবস্থায় রোগীকে ছাগলের রক্ত, রক্ত চন্দন, বেণার মূল, রসাঞ্জন ও খৈ—চিনি ও জলে গুলে পান ক'রাতে হয়। আর রক্তপিত্তের বিধান অনুসারে চিকিৎসা করতে হয়। দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস পথ্য দিতে হয়।

জিহ্বা অত্যন্ত নির্গত হয়ে প'ড়লে—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করে কিম্বা তিল ও কিসমিস বাটা মাখিয়ে মর্দ্দন ক'রে ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবে। আর জিহ্বা ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে গেলে তাহার সম্মুখে লোভজনক অম্লদ্রব্য আস্বাদান করাবে। ইহাতে জিহ্বা লালাস্রাব হেতু মৃদু হয়ে স্বস্থানে অবস্থিত হয়। চক্ষু বহির্গত হয়ে পড়লে ঘৃত মাখিয়ে শীতল ক'রে যথাস্থানে প্রবিষ্ট করাবে। চোয়াল ধরে গেলে বাতশ্লেষ্মানাশক নস্য এবং স্বেদ প্রয়োগ করবে। তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রবে তৃষ্ণাদি প্রশমক প্রক্রিয়া করবে। রোগী সংজ্ঞাহীন হলে বাঁশী, বীণা ও সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করাবে।

ডাঃ। এটা কি রকম হল কবিরাজ মশায়? রোগী অজ্ঞান হলে গান শোনে কে?

ক। বিশেষ অন্যায় কিছু হয় নি। এতো আর সন্ন্যাস রোগের অচৈতন্য হওয়া নয়, যে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করবার বিধান থাকবে। এতে অতিরিক্ত বমন হ'য়ে রোগী এবং রোগীর ইন্দ্রিয় শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এরূপ স্থলে সঙ্গীতাদির ধ্বনি দ্বারা চেতনার উদ্বোধন হয়। এই মনে করুন—ঘুমের সময়েও মানুষের জ্ঞান থাকে, গীতবাদ্যধ্বনি দ্বারা কি নিদ্রিতের চেতনার উদ্বোধন হয় না?

ডাঃ। কারও কারও অল্পে হয়, কারও কারও ঢাক বাজা'তে হয়।

ক। এও সেই রকম। এ স্থলে অল্পে হয় ব'লে বীণাবেণুর ধ্বনিতেই চলে, আবার বিশেষ অচৈতন্য হলে শাস্ত্রে ঢাক বাজাবারও উপদেশ আছে।

ডাঃ। তাইত অচৈতন্য হওয়ার যেমন নানা রকম আছে, তার জন্য প্রক্রিয়াও নানা রকম দেখছি। বেশ স্পষ্ট ধারণা করতে পারছিনে, কিন্তু মনে হয়—এর ভিতর অবশ্যই কিছু সত্য আছে।

ক। সত্য না থাকলে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষেরা কি কতকগুলো প্রলাপ ব'কে গিয়াছেন মনে করেন?

ডাঃ। তা মনে ক'রলে কি আর এত যত্ন করে শুনতাম?

ক। ভগবান অপনার মঙ্গল করুন, শুনে বড় সুখী হলাম। কিন্তু আজ কাল অনেকেই নিজে যা বোঝেন না—সেটা কিছুই নয় ব'লে মনে করেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে অনন্তরহস্যজগতের কতটুকু রহস্য আমরা বুঝতে পারি? প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বা রোগ সম্বন্ধীয় একটা তুচ্ছ বিষয় মীমাংসা করবার জন্যেও কত সুধী ব্যক্তি জীবন পাত করেও জানতে পারেন নি। আর আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে এক মুহূর্ত্তে সকল বিষয়ের মীমাংসা করে ফেলি—ইহাই আশ্চর্য্য।

ডাঃ। খুব সত্য কথা। এখন আপনি তারপর বিরেচনের অতিযোগের কথা বলুন। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি পূর্ব্বেও—ত অযোগ অতিযোগের কথা বলেছিলেন। সেও ত শাস্ত্রের কথা, তবে শাস্ত্রে আবার পৃথক ভাবে অযোগ অতিযোগের কথা বলা হয়েছে কেন?

ক। সেটা হ'ল সামান্য অযোগ অতিযোগ, আর এটা হচ্ছে বিপত্তি জনক অযোগ অতিযোগ। তবে ব্যাপদের দু' একটা কথাও পূর্ব্বে বলা গেছে, সমগ্র ব্যাপদ আপনাকে শোনান ঘটেনি।

ডাঃ। আচ্ছা বলুন এখন।

ক। বিরেচনের অতিযোগ হ'লে ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় চাকচিক্য শালী জলবৎ ভেদ হয় পরে মাংসধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হয়, পরে জীবশোণিত নির্গত হয়, মলদ্বার নির্গত হয়ে পড়ে, কম্প এবং বমনের অতিযোগের কথিত উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় রক্তপিত্ত এবং রক্তাতিসারের বিধান অনুসারে চিকিৎসা ক'রতে হয়। মলদ্বার নির্গত হ'য়ে পড়লে তা'তে ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ মাখিয়ে স্বেদ দিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট কর'বে অথবা ক্ষুদ্র রোগের চিকিৎসায় গুদভ্রংশের (হারিশ) যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হ'য়েছে সেইরূপ চিকিৎসা করবে। কম্প হ'লে বাতব্যাধিতে কম্পের যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হ'য়েছে, সেই রূপ চিকিৎসা করবে।

ডাঃ। এই যে সব অমুক রোগের মত চিকিৎসা ক'রবে ব'লে বরাত দেওয়া হয়েছে, এগুলো কি সুবিধা জনক?

ক। সুবিধা জনক বৈকি! নইলে এক প্রকার চিকিৎসার কথা অনেক জায়গায় ব'লতে হয়, আর তা'তে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া কোন লাভ নাই।

ডাঃ। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়।

ক। চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়—এ কথাও বলা যায় না। কারণ সময়ে দরকার হলেও যদি সর্ব্বদা পুঁথি খুলে চিকিৎসা ক'রতে হয়, তবে তাঁকে চিকিৎসক নামে অভিহিত করা যায় না। চিকিৎসা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি তারপর বলুন।

ক। জিহ্বা নির্গত হয়ে পড়লে পূর্ব্বে যেমন বলা হয়েছে সেইরূপ চিকিৎসা করতে হয়। জীবশোণিত অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হয়ে থাকলে গাম্ভারী ফল, কুল, দূর্ব্বা ও বেণার মূল,—এই সকল দ্রব্যের সঙ্গে দুগ্ধ পাক ক'রে শীতল হ'লে তার সঙ্গে ঘৃত ও স্রোতাঞ্জন, (সুরমা বিশেষ) মিশিয়ে আস্থাপন প্রয়োগ করবে। ন্যগ্রোধাদিগণের (বট প্রভৃতি কতক গুলি বৃক্ষের ছালের) কাথ, দুগ্ধ; ইক্ষুরস, ঘৃত ও রক্ত (ছাগাদির) একত্র মিশ্রিত ক'রে বস্তি প্রয়োগ করবে। মুখ দিয়ে রক্ত নির্গত হ'লে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা ক'রবে।

মলদ্বার দিয়ে যে রক্ত নির্গত হয়, সেটা জীব রক্ত কি রক্তপিত্তের রক্ত তাহা পরীক্ষার জন্য সেই রক্ত তুলা বা বস্ত্রে ঘৃত রাখিয়ে উষ্ণ জলে ধৌত ক'রলে যদি দাগ উঠে না যায় তবে জীবশোণিত ব'লে জানবে। আর সেই রক্ত অন্ন বা ছাতুতে মাখিয়ে কুকুরকে খেতে দিলে, যদি খায়, তবে জীবশোণিত ব'লে জানবে। অন্যথায় অর্থাৎ যদি বস্ত্রের দাগ উঠে যায় এবং কুকুরে না খায় তবে রক্তপিত্তের রক্ত বলে জানবে।

ডাঃ। জীব শোণিতটা কি?

ক। শরীরের যে বিশুদ্ধ রক্ত তাই জীব শোণিত, আর পিত্তদূষিত রক্তকেই এখানে রক্তপিত্তের রক্ত বলা হয়েছে। পিত্ত দূষিত রক্ত তিক্তাস্বাদ ব'লে কুকুরে খায় না। আর বিশুদ্ধ রক্ত তিক্ত নয় বলে খেয়ে থাকে।

ডা। আমাদের মতে আর্টারীর রক্ত বিশুদ্ধ এবং ভেনের রক্ত দূষিত। তা হলে কি এখানে আর্টেরিয়েল ব্লড আর ভেনস ব্লডের কথা বলা হইয়াছে।

ক। তা কি করে বলবো। আর্টারির আর ভেনের রক্তের কথা জানি বটে, কিন্তু

এটা ঠিক তাই কি না বলতে পারিনে। তবে জীবরক্ত নামে বিশুদ্ধ রক্ত আর অন্যটী পিত্ত দূষিত রক্ত এটা বোঝা যায়।

ডা। আচ্ছা আমি একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবো। আপনি তার পর বলুন।

ক। এতক্ষণ অতিযোগের কথা বলা হয়েছে, এইবার আধ্মান-ব্যাপদের কথা ব'লব।

বহু দোষযুক্ত, রুক্ষ বা বায়ুকোষ্ঠ (যাহার উদরে কুপিত বায়ু থাকে) ব্যক্তির ভুক্তান্ন অবশিষ্ট থাকলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীর্ণ না হলে যদি অনুষ্ণ এবং অস্নিগ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তা হলে উদরাধ্মান, বায়ু মূত্র ও পুরীষের অপ্রবৃত্তি (নির্গত না হওয়া) আমাশয় স্ফীত হওয়া পার্শ্বদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা, মলদ্বার ও বস্তিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, অন্নে অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলে আধ্মানব্যাপদ্ বলা যায়। এরূপ অবস্থায় স্বেদ দিয়ে আনাহ রোগে যে মলভেদক বর্ত্তির কথা বলা হ'য়েছে, সেই বর্ত্তি প্রয়োগ করবে, যা'তে অগ্নি বৃদ্ধি হয় এরূপ ক্রিয়া ক'রবে এবং প্রয়োগ ক'রবে।

ক্ষীণ দেহ, মৃদু কোষ্ঠ, রুক্ষ বা মন্দাগ্নি বিশিষ্ট বা রুক্ষ ব্যক্তিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অত্যন্ত লবণ রসাত্মক কিম্বা অত্যন্ত রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে—বায়ু, পিত্ত, দূষিত হয়ে পরিকর্ত্তিকা ব্যাপদ উপস্থিত করে। ইহাতে মলদ্বার, নাভি, লিঙ্গ, বস্তি ও মস্তকে কাটার মত যন্ত্রণা হয়, বায়ু স্তব্ধ হ'য়ে থাকে, এবং আহারে অরুচি হয়। এরূপ অবস্থায় যষ্টি মধু ও কৃষ্ণতিল বাটা এবং মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করে পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ ক'রবে।

ডা। পিচ্ছাবস্তিটে কি একটু মোটা মুটি বলুন না?

ক। শিমূলের বোঁটা, শিমূল ফুল, বট; যজ্ঞ ডুমুর ও অশ্বত্থের কুঁড়ি প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা যে পিচ্ছিল গুণ বিশিষ্ট বস্তি প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত হয় তাকে পিচ্ছাবস্তি বলে। পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগের পর রোগীর শরীরে শীতল জল সেচন করবে, ঘৃতমণ্ড ও দুগ্ধের সহিত অন্ন সেবন করবে এবং যষ্টিমধু সিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন প্রযোগ করবে।

ডা। ঘৃতমণ্ড কি? অন্নমণ্ডের মত জলের সঙ্গে ঘৃত পাক ক'রে প্রস্তুত করতে হয় নাকি?

ক। ঘৃতের উপরের তরল অংশকে ঘৃতমণ্ড বলে। মণ্ড শব্দে সারে-মাতে যে সব জিনিষ থাকে তা'র মাতকে বোঝায়।

ডা। বুঝেছি। এইবার পরিস্রাব ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। ক্রূরকোষ্ঠ বা বহুদোষযুক্ত ব্যক্তিকে মৃদু ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) করে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্গত করতে পারে না। সেই সকল দোষ পরিস্রাব জন্মায় অর্থাৎ ক্রমাগত অল্প অল্প ক'রে নির্গত হ'তে থাকে এবং দুর্ব্বলতা, উদরের স্তব্ধতা, অরুচি, ও অঙ্গের অবসন্নতা জন্মায়। বেদনার সহিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা অল্প অল্প ক'রে নির্গত হ'তে থাকে। ইহাকেই পরিস্রাব ব্যাপদ বলে। এরূপ ঘ'টলে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রবে। তা'তে দোষের উপশম হ'লে রোগীকে পুনরায় স্নেহ প্রয়োগ ক'রে সংশোধন ক'রবে।

রোগীকে অত্যন্ত রুক্ষ বা স্নিগ্ধ ক'রে ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে, বেগ উপস্থিত না হ'লে বল পূর্ব্বক বেগ দিলে কিংবা বেগ উপস্থিত হ'লে সে বেগ ধারণ ক'রলে প্রবাহিকা ব্যাপদ

উৎপন্ন হয়। এতে দাহ ও শূলবৎ যন্ত্রণার সঙ্গে বায়ু সংযুক্ত পিচ্ছিল শ্বেতবর্ণ, অথবা কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ যুক্ত কফ নির্গত হ'তে থাকে এবং মলত্যাগ কালে রোগীকে অত্যন্ত প্রবাহন ক'রতে (কোঁথাতে) হয়। এই রোগের চিকিৎসা পরিস্রাব ব্যাপদের ন্যায়।

ডা। প্রবাহিকা মানে যাকে চলতি কথায় আমাশয় বলে এবং আমরা ডিসেণ্ট্রী (Dysentry) বলি—তাইত?

ক। হাঁ তাই বই কি?

ডা। তা'হ'লে বাংলা করে বলুন যে, জোলাপ দিলে কখন কখন আমাশয় হ'তে পারে, আর তার চিকিৎসা এই রকম।

ক। বাংলা করে বলিনি, তবে কি সংস্কৃত ক'রে বলিছি নাকি? তবে আমাশা না ব'লে প্রবাহিকা বলেছি। তা' আমাশয় রোগ নয় একটা যন্ত্র, যাকে আপনারা ষ্টমাক ব'লে থাকেন।

ডা। আচ্ছা তা' হ'ক এখন তার পর কি বলুন।

ক। তারপর হৃদয়োপসরণ। অজ্ঞতা বশতঃ বমন বা বিরেচনের বেগ ধারণ ক'রলে দোষ সকল হৃদয়ে উপসরণ অর্থাৎ গমন করে। প্রধান মর্ম্ম হৃদয় সন্তপ্ত হলে অত্যন্ত বেদনা হয়, রোগী দাঁত কিড়মিড় করে, চক্ষু উর্দ্ধগত হয় জিহ্বা দংশন করে, অবসন্ন হয়, এবং অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্নেহাভ্যঙ্গ করে ও ধান্য স্বেদ দিয়ে যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন দিতে হয় এবং তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন প্রয়োগ করতে হয়।

(ক্রমশঃ)

শিশুর খাদ্য।

— —:০:— —

মাতৃদুগ্ধ শিশুর সম্পূর্ণ পোষণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। একশত ভাগ মাতৃ দুগ্ধে মোটামুটী বলিতে গেলে ৮৯ ভাগ জল, ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তু, ৩ ভাগ স্নেহ, ৩ ভাগ চিনি এবং এক ভাগের ⅘ অংশ ধাতব বস্তু আছে।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে শিশুর খাদ্যের আবশ্যকীয় উপাদানেরও মহৎ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাপ্তবয়স্কের শরীরের ওজনের অনুপাতে যত স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের আবশ্যক একটী দশমাসের শিশুর পক্ষে তাহার শরীরের ওজনের অনুপাতে ঐ দুই জাতীয় পদার্থের তদপেক্ষা তিনগুণ অধিক আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত-বয়স্কের আকৃতির সহিত শিশুর আকৃতি তুলনায় শিশুর পক্ষে যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয়, বস্তুতঃ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্য শিশুর জন্য আবশ্যক। শিশুর পরিবর্দ্ধন অতিক্রুত নির্ব্বাহ হইতে থাকে—শরীরের অস্থি, মাংসাদি ধাতু গঠিত হইতে থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং খাদ্যাধিক্যের আবশ্যকতা হয়।

বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, অতএব ভিন্নরূপ খাদ্যের আবশ্যক হয়। শিশুর মত একজন যুবা কদাপি কেবল দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকিতে পারে না। কেবল দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া বাঁচিতে হইলে একজন যুবককে ৪ সেরেরও অধিক দুগ্ধ পান করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে আহারে স্নেহের ভাগ অত্যধিক হইয়া পড়ে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। শরীরোপাদনের এই ক্ষয় পূরণ ও শরীর-গঠন এবং শরীরের উত্তাপ রক্ষা এই দ্বিবিধ কার্য্য যে আহারের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় তাহাই শরীর রক্ষার উপযোগী আহার। প্রোটিড় জাতীয় পদার্থ, জল এবং বিবিধ ধাতব পদার্থের দ্বারা প্রথম প্রকারের কার্য্য এবং নাইট্রোজেন্ ঘটিত এবং নাইট্রোজেন বর্জ্জিত খাদ্যের দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে খাদ্যে এই সকল অত্যাবশ্যক পদার্থের কোন একটা নাই, কিছুকাল যদি সেইরূপ আহার কোন প্রাণী গ্রহণ করে, তাহা হইলেতাহার শরীর এতদূর ভগ্ন হইয়া পড়িবে যে, পরে তাহাকে গুণকারী আহার প্রদান করিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইয়া থাকে। শিশুর পক্ষেও এইরূপ—যদি কোন শিশুকে ভেজাল দুধ দেওয়া হয়, কিম্বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত এমন কোন খাদ্য আহার করিতে দেওয়া যায়, যাহাতে শিশুর শরীর রক্ষার জন্য যে বস্তর প্রয়োজন তাহা হয় অতি-মাত্রায় নচেৎ অতি অল্প মাত্রায় আছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিশুর স্বাস্থ্য-হানি হইবে।

সমস্ত-প্রাণি-দুগ্ধেই শিশুর শরীর রক্ষার আবশ্যক উপাদান বিদ্যমান থাকিলেও ঐ সকল উপাদানের পরিমাণের অবশ্যই পার্থক্য আছে। ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ, প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাণীর শাবকেরা সকলেই দুগ্ধ পান করিলেও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সমন্বিত বস্তু ভোজন করিতেছে। অতএব ইহা প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র বিবাদ করিতে হয় না যে, নরশিশুর পক্ষে গো বা ছাগ দুগ্ধ কদাচই—যথার্থ উপযোগী খাদ্য নহে। গো দুগ্ধের সহিত নারীদুগ্ধের তুলনা করিলে দেখা যায় নারীদুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে জল কম কিন্তু কঠিন বস্তু (Solids) অত্যধিক মাত্রায় আছে —স্নেহ, লবণ পদার্থ ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ গোদুগ্ধে অধিক, কিন্তু শর্করা অল্প।

গোদুগ্ধ কিরূপে নারীদুগ্ধের সদৃশ হয়?—গোদুগ্ধে জল মিশাইলে উহার এলবুমেন ও লবণ ঘটিত পদার্থ নারী-দুগ্ধের তুল্য হয় বটে কিন্তু শর্করার পরিমাণ আরও কমিয়া যায় এবং মেদের ভাগও অল্পতর হইয়া থাকে। অতএব যদি গোদুগ্ধে জল মিশাইয়া তাহাকে নারীদুগ্ধের সদৃশীকরণের প্রণালীই আমরা অবলম্বন করি, তাহা হইলে উহাতে শর্করা ও স্নেহ মিশ্রিত করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইতে পারে। কত পরিমাণ শর্করা ও স্নেহ মিলাইতে হইবে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু পরে আমরা যে তালিকা দিব তদনুসারে কার্য্য করিলেই গোদুগ্ধ কার্য্যোপযোগিতায় নারী দুগ্ধের সদৃশ হইবে।

কিন্তু আরও কতকগুলি বিষয়ে সমতা উৎপাদন করিতে না পারিলে গো দুগ্ধ ঠিক নারী-দুগ্ধের তুল্য হইবে না। কোন্ কোন্ বিষয়ে সমতা সম্পাদন আবশ্যক? প্রথমতঃ নারী দুগ্ধের প্রতিক্রিয়া ক্ষারধর্ম্মী (Alkaline) কিন্তু গো-দুগ্ধ অম্লধর্ম্মী (Acid)। নারীদুগ্ধ

জীবাণু বর্জ্জিত, গোদুগ্ধ জীবাণু পূর্ণ; গোদুগ্ধ শিশুর পাকস্থালীতে গিয়া দুর্জ্জর মোটা মোটা জমাট পদার্থে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে নারীদুগ্ধ সহজে জীর্ণ হইবার উপযুক্ত দধিবিৎ পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বুঝিতে পারাগেল যে গোরুর দুধকে নারী দুগ্ধের তুল্য গুণান্বিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—

(১) পাৎলা করিতে হইবে।

(২) শর্করা এবং স্নেহ যোগ করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় জমাট বাঁধা পদার্থে যাহাতে পরিণত হইতে না পারে এতদর্থে কোন পদার্থের সংযোগ করিতে হইবে।

(৪) ক্ষার গুণান্বিত করিতে হইবে।

(৫) জীবাণু বর্জ্জিত করিতে হইবে।

"চার" চামচের ৪ চামচ গোদুগ্ধ লইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিশাইলে উপরি-লিখিত মত সংস্কার সাধিত হইবে—

দুগ্ধ ...	চার চামচের ৪ চামচ
জল ...	" " ৭ "
চুণের জল ...	" " ১ "
সোডা সাইট্রেট্	২ গ্রেণ অর্থাৎ ১ রতি
দুগ্ধজাত শর্করা	১০ গ্রেণ অর্থাৎ ৫ রতি
"ক্রীম" (cream)	১০ বিন্দু।

উপরি লিখিত কোন্ বস্তুর দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় জানা উচিত। চুণের জল যোগ করায় ১, ৩, ৪, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বটে—কিন্তু ইহাতে মলবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে করিতে অতিসার জন্মিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ পাৎলা বার্লির জল, অনেকে চুণের জলের পরিবর্ত্তে পছন্দ করেন। বার্লির জলে ১, ৩, উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সোডা সাইট্রেট্ যোগ করিলে দুগ্ধের ক্ষারত্ব সাধিত হইয়া থাকে। "ক্রীম" (cream) কর্ত্তৃক অতিরিক্ত স্নেহ সংযোজিত হইয়া থাকে।

"ক্রীম" (cream) বাজার হইতে ভাল ক্রীম্ সংগ্রহ করা দুষ্কর, অতএব বাড়ীতে প্রস্তুত করাই ভাল। সাধারণতঃ লোকে ক্রীমকে দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানে, কিন্তু বস্তুতঃ "ক্রীম" অধিকতর স্নেহ সমন্বিত দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাল দুগ্ধ হইতেই ভাল "ক্রীম" পাওয়া যায়। ভাল দুগ্ধ হইতে "ক্রীম" উঠাইবার পূর্ব্বে—যত অধিকক্ষণ সেই দুগ্ধকে স্থিরভাবে রাখা হয়, ক্রীম ততই অধিক পাওয়া যায়। উত্তম দুগ্ধ ১২ ঘণ্টা রাখিয়া ক্রীম উঠাইলে সেই ক্রীমে শতকরা ১৬ ভাগ স্নেহ থাকে। দুগ্ধ যত অল্পক্ষণ রাখিয়া ক্রীম উঠান হইবে—তাহাতে ততই অল্প মাত্রায় ক্রীম পাওয়া যাইবে। শিশুর জন্য যে ক্রীম উপযোগী তাহাতে শত করা ১০।১২ ভাগ স্নেহ থাকিলেই যথেষ্ট। দুগ্ধ হইতে ক্রীম পাইবার সহজ উপায়—

এক পাঁইট দুধ ধরে এমন একটী গোল লম্বা টীনের পাত্র প্রস্তুত করাইবে, ইহার তলদেশ সমতল না হইয়া কিছু গড়ানে ভাবের হইবে। একটী ঢাকনি আর নীচের দিকে পাশে একটী ছোট নল থাকিবে। এই পাত্রের ভিতর দিকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ৪টি চিহ্ন থাকিবে। ছোট নলটীর মুখে হইতে দুই ইঞ্চ লম্বা একটী রবারের নল থাকিবে, রবারের নলের মুখ একটী "সেফ্‌টিপিন্" দিয়া বন্ধ থাকিবে।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ ছাঁকিয়া ঐ টিনের পাত্রে রাখিয়া ঢাক্‌নী বন্ধ করিয়া পাত্রটীকে শীতল স্থানে

বা গ্রীষ্মকালে বরফের বাক্সের ভিতর রাখিয়া ৫ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবে। পরে রবারের নলের মুখ খুলিয়া দিলে দুধ বাহির হইতে থাকিবে। টীনের পাত্রে পূর্ব্বে যে সমভাগে চারিটী চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, দুগ্ধ নির্গত হইতে হইতে যখন তিনটী চিহ্ন অতিক্রম করিয়া চতুর্থ চিহ্নে উপর আসিবে অর্থাৎ যখন দুগ্ধের ¼ অংশ পাত্রে থাকিবে, তখন আর দুধ বাহির হইতে দিবে না—নল বন্ধ করিবে। এই ¼ অংশ যাহা থাকিবে তাহা সমস্তই ক্রীম। এই ক্রীম শিশুর পানীয় দুগ্ধে মিশাইবার জন্য রাখিয়া দিবে। ইহাতে শত করা ১০ ভাগ স্নেহ আছে।

বার্লির জল প্রস্তুত প্রণালী—চার চামচের দুই চামচ পার্ল বার্লি লইয়া পরিষ্কার এনামেলের বা পিতলের পাত্রে রাখিয়া কিছু জল দিয়া জোর জ্বালে আন্দাজ ৫ মিনিট কাল ফুটাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া আবার এক পাইট অর্থাৎ ৩০ তোলা পরিস্রুত জল উহাতে ঢালিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইবে ২০ তোলা আন্দাজ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং মস্‌লিনের মত পাৎলা একখণ্ড কাপড় ফুটন্ত জলে ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া ঐ কাপড় দ্বারা ছাঁকিবে।

বার্লির জল প্রস্তুতের অন্য প্রণালী—চার চামচের দুই চামচ যব লইয়া কুটিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া এক পাইট ফুটন্ত জল উহাতে ঢালিয়া নাড়িতে থাক, পরে আগুনের নিকটে এই পাত্রটী এক ঘণ্টা রাখিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে—পরে মস্‌লিনের মত পাৎলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া এক চিম্‌টা লবণ মিশাইয়া লইবে। বার্লির জল প্রতিদিন নূতন প্রস্তুত করিতে হইবে। বাসি বার্লির জল কদাচ শিশুকে পান করিতে দিবে না—গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন হইলে দৈনিক দুইবার ও বার্লির জল প্রস্তুত করিবে।

চুণের জল (Limewater) ডাক্তারী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা নারী দুগ্ধের সহিত অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর দুগ্ধের তুলনা করিব।

উপাদান		নারীদুগ্ধ		গোদুগ্ধ		গর্দ্দভদুগ্ধ		ছাগদুগ্ধ	
প্রোটিড্	কেজিন্ … …	০·৬	২·০	…৩·২৫	৪·০	…১·০	১·৮	…৩·০	৩·৭
	ল্যাক্‌টো এল্‌বুমিন্ …	১·৪		০·৭৫		০·৮		০·৭	
স্নেহ … … …		৩·৫		৩·৫		১·০		৪·২	
শর্করা … … …		৭·০		৪·০		৫·৫		১·০	
ধাতব পদার্থ … …		০·২		০·৭		০·৪		০·৫	

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে গর্দ্দভের দুগ্ধ গুণে প্রায় নারী দুগ্ধের তুল্য বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। গর্দ্দভীর দুগ্ধে অধিক পরিমাণে জল এবং ইহাতে মাখম ও ছানার ভাগ

কম আছে। শর্করা এবং লবণ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। গর্দ্দভীর দুগ্ধ সহজে পরিপাক পায় বলিয়া সে সকল শিশু গো দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে গর্দ্দভীর দুগ্ধ বিশেষ উপযোগী। কিন্তু দোষ এই যে, ইহাতে অধিক মাত্রায় লবণ থাকায় অনেক সময় শিশুর উদরাময় হইয়া থাকে। ইহার বিরেচন শক্তি আছে বলিয়া যে সকল শিশুর যকৃৎ দোষ ও কোষ্ঠ বদ্ধতা আছে তাহাদের পক্ষে উপকারী; কিন্তু সুস্থ শিশুর পক্ষে এত বিরেচন শক্তি যুক্ত দুগ্ধ তাদৃশ ব্যবস্থেয় নহে। আরও দোষ এই যে, যদি সুস্থ শিশুকে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করান হয় তাহা হইলে মাথম এবং এলবুমিন্ ঘটিত অভাব পূরণ জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় দুগ্ধ পান করাইতে হইবে কিন্তু মাত্রাধিক্যের জন্য আবার লবণ, শর্করার পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়িবে। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে গর্দ্দভের দুগ্ধ সুস্থ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য নহে। গর্দ্দভীর দুগ্ধে ক্রীম সংযুক্ত করিলে উহার অনেক দোষ দূরীভূত হইতে পারে বটে কিন্তু এদেশে ভাল ক্রীম সংগ্রহ করা তত সহজ ব্যাপার নহে। নারী দুগ্ধের সহিত তুলনায় গর্দ্দভীর দুগ্ধের দোষ গুণ বিচার করা হইল। এক্ষণে গো দুগ্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যদিও গো দুগ্ধে প্রোটিড এবং লবণ অধিক মাত্রায় আছে তথাপি উহা অনেকটা নারী দুগ্ধের তুল্য। ছাগ দুগ্ধ সম্বন্ধে কথা এই যে, উহাতে ছানা এবং লবণের ভাগ অধিক থাকিলেও, যে সকল শিশুর পরিপাক শক্তি বলবতী তাহাদের প্রতিপালনের জন্য ছাগ দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য প্রাণীর আহারের উপর তাহার দুগ্ধের গুণাগুণ নির্ভর করে। এমন কি আমরা সকলেই জানি যে, মাতা কোন বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে তাহার দুগ্ধেও বিরেচন গুণ সঞ্চারিত হইয়া শিশুর অন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদে অতি শিশুকে ঔষধ পান করানর পরিবর্ত্তে তাহার মাতা বা স্তন্যদাত্রীকে ঔষধ পান করানর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ছাগ বহুভুক্ প্রাণী অতএব ইহাকে যথেচ্ছ বিচরণ পূর্ব্বক যাহা তাহা ভোজন করিতে না দিয়া, যদি বাঁধিয়া রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট ভোজ্য দান করা যায়, তাহা হইলে ছাগলের দুগ্ধের দুর্জ্জরতা (যাহা হজম করা শক্ত) সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহা অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ অতি ঈষৎ অম্লরস হইয়া থাকে—এই অম্লত্ব জিহ্বায় অনুভব করা যায় না—কিন্তু যদি এক খণ্ড নীলবর্ণ 'লিটমাস্' কাগজ লইয়া দুগ্ধে ডুবান যায় তাহা হইলে ঐ নীলবর্ণ কাগজ খণ্ড গোলাপী রঙ ধারণ করিবে। যদি লাল হয় তাহা হইলে দুগ্ধে অম্লত্ব অধিক পরিমাণে আছে বুঝিতে হইবে। দুগ্ধ অতিরিক্ত অম্লরসান্বিত হইলে বুঝিতে হইবে যে উহা পচিতে আরম্ভ করিয়াছে; অতএব এরূপ দুগ্ধ পরিহার করা উচিত। যদি গোদুগ্ধে চা খড়ির গুঁড়া মিশান থাকে তাহা হইলে উহা "লিট্‌মাস" কাগজের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। যদি রুগ্‌ণ গোরুর দুধ হয় তাহা হইলে উহাতে দুগ্ধের স্বাভাবিক অম্লত্বও থাকিবে না—উহা একবারে ক্ষারধর্ম্মী (Alkaline) হইবে। আবার নারী দুগ্ধ ও ক্ষারধর্ম্মী হয় সুতরাং ইহাও—"লিট্‌মাস" কাগজের বর্ণ লাল করিতে পারে না। এই সকল কারণে শিশুর পানীয় গোদুগ্ধে পূর্ব্ব লিখিত পরিমাণ চুণের জল মিশ্রিত করিয়া

সেবন করান ভাল। ইহাতে যে অম্লত্ব দূর হয় তাহা লিট্‌মাস্' কাগজের দ্বারা পরীক্ষা করিলেই প্রতীত হইবে।

দুধ কাটিয়া যায় কেন?—গ্রীষ্মকালে জ্বাল দিতে বিলম্ব হইলে ঋতুস্বভাবজ উত্তাপের জন্য কিম্বা দুগ্ধের পাত্রে বাসি টক্ দুধ থাকিলে দুধ কাটিয়া যায়—ছানা বাঁধে ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় দুধ বেশ আছে—কিন্তু জ্বাল দিতে আরম্ভ করিলেই কাটিয়া গিয়া ছানা বাঁধে। ইহা দেখিয়া আমরা তখন বিস্মিত হই বটে—কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। ঐ দুধ ইতঃপূর্ব্বেই গাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিল তবে যতটুকু 'লাক্‌টিক এসিড'_ সঞ্চিত হইলে বিনা অগ্নির উত্তাপে, অগ্নির উত্তাপ প্রদানানন্তর যাহা ঘটিল তাহা উৎপাদন করিতে পারিত, ততটুকু সঞ্চয় হয় নাই; সুতরাং দুগ্ধ অগ্নিতে চাপাইবামাত্র প্রচুর উত্তাপ পাইয়াই বিবৃত হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে ঐ দুগ্ধ হয়ত কোন পচা দুগ্ধ দূষিত পাত্রে ছিল কিম্বা জ্বাল দিতে বিলম্ব হওয়ায় কালধর্ম্মে উহার উদ্রেক (fermentation) আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপ কাটিয়া যাওয়া দুগ্ধ শিশুকে পান করান নিষেধ। শিশুকে লইয়া অল্প দূরস্থিত স্থানে যাইতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে দুধ লইয়া গেলে বিকৃত হইবে না। দুধকে ফুটাইয়া উহাতে কিছু চিনি মিলাইয়া কিছু গরম থাকিতে থাকিতে অতি উত্তমরূপ পরিষ্কৃত কোন বোতলে পূর্ণ করিয়া (যেন কিছুও ফাঁক না থাকে) তৎক্ষণাৎ ছিপিবন্ধ করিয়া গালা দিয়া মোহর করিয়া দিবে। যদি অতি দূর দেশে যাইতে হয় তাহা হইলে বিলাতী ঘন টীনের দুগ্ধ তৎকালে কাজে লাগিতে পারে। শিশুর বয়স যদি এক মাসের অল্প হয় তাহা হইলে চার চামচের এক চামচ বিলাতী ঘন দুগ্ধে ১২ চামচ অথবা বড় চামচের তিন চামচ জল মিশাইয়া এবং অপেক্ষাকৃত বড় শিশুর জন্য চার চামচের ১ চামচ দুগ্ধে ৮ চামচ বা বড় চামচের ২ চামচ জল মিশাইয়া পান করাইতে হয়।

নানা প্রকারে দুগ্ধে জীবাণুর সম্পর্ক ঘটিতে পারে সুতরাং পানের পূর্ব্বে দুগ্ধ যাহাতে জীবাণু সম্পর্কবর্জ্জিত হয় তাহা অবশ্যকরণীয়। পানের পূর্ব্বে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া পান করিলেই ঐ দোষ দূর করা যাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা দুগ্ধ শিশুর পক্ষে যেমন পোষক জ্বাল দেওয়া দুধ ঠিক সেইরূপ পোষকগুণ বিশিষ্ট নহে। জ্বাল দেওয়া দুধের জীবাণু নষ্ট হয় বটে কিন্তু কাঁচা দুধ অপেক্ষা ইহার উপকারিতা কিঞ্চিৎ অল্প। কিন্তু জীবাণুনাশে উহা ভীষণ ব্যাধি এবং এমন কি মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে বলিয়া এই অল্প গুণ-হীনতা আমরা চিরদিন উপেক্ষা করিব। জ্বাল না দিয়া দুধকে জীবাণুদোষ বর্জ্জিত করিবার জন্য এক প্রকার বিলাতী কল পাওয়া যায়। ইহার নাম "soxhlet's steriliser" মূল্য ২৬_ টাকা। এই কলে দুধকে ঠিক ফুটান হয় না অথচ দুধ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয় মাত্র। ফুটাইলে দুধের যে স্বাদ হয়, এইকলে উষ্ণ করিলে তাহাও হয় না, কিম্বা ফুটাইলে অত্যন্ত উত্তাপ সংযোগে দুধের যে অহিতকর পরিবর্ত্তন জন্মায় তাহাও হইতে পারে না। এই কলে কৃত্রিম উপায়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় ধারোষ্ণ দুগ্ধে স্বভাবতঃই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। দোহন মাত্রে দুগ্ধের যে উষ্ণতা থাকে সেই উষ্ণতা বিশিষ্ট দুগ্ধকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। ধারোষ্ণ

দুগ্ধের উষ্ণতা আছে কিন্তু এই উষ্ণতা অগ্নি-সংযোগ-কৃত নহে বলিয়া ইহাতে পুষ্টিকারিতা গুণের অল্পতা নাই এবং উষ্ণ বলিয় জীবাণু-দোষ-বর্জ্জিত। আয়ুর্ব্বেদে কাঁচা দুধের বহু অপকারিতার যথেষ্ট উল্লেখ এবং জ্বাল দেওয়া দুধের উপকারিতা, অপকারিতা দুইয়েরই উল্লেখ আছে—কিন্তু ধারোষ্ণ-দুগ্ধের নানা গুণের উল্লেখ পূর্ব্বক উহাকে লঘু অর্থাৎ সহজ পাচ্য অগ্নিবর্দ্ধনকারী এবং সুধাসম বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধে জীবাণুর প্রসঙ্গ না থাকিলেও কাঁচা দুধ, জ্বাল দেওয়া দুধ এবং ধারোষ্ণ দুধের যে গুণ বলা হইয়াছে তাহাতে সিদ্ধান্তের এমন অপূর্ব্ব একতা রহিয়াছে যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

কোন বয়সের শিশুকে কত পরিমাণ দুগ্ধ পান করান উচিত ?—

কোন বৈদেশিক গ্রন্থকারের মতে প্রসবের প্রথম এক বা দুই সপ্তাহকাল শিশু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাতৃস্তন হইতে তিন ছটাক হইতে একপোয়া দুগ্ধ পাইয়া থাকে। পরে দুগ্ধ স্রাব বর্দ্ধিত হইয়া দৈনিক তিন পোয়া পর্য্যন্ত হয়। পরীক্ষকগণ, শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পানের পূর্ব্বে ও পরে ওজন করিয়া এবং অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে একটী তিনি মাসের সুস্থ শিশু প্রতিবারে প্রায় তিন ছটাক দুগ্ধ পান করে। দৈনিক এইরূপ পাঁচবার স্তন্য পান করান উচিত ধরিয়া লইলে শিশুর দৈনিক পানীয় দুগ্ধের পরিমাণ তিন পোয়া হইতে এক সেরের কিঞ্চিৎ অধিক হয়। সে সকল ছেলেকে ঢোকা দুধ খাওয়ান হয়, এই হিসাব হইতে, তাহাদিগকে কত দুধ খাইতে দেওয়া উচিত তাহার একটা পরিমাণ জানিতে পারা যায়। বহু বৈদেশিক অনুসন্ধান-কারিগণ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে। জন্ম হইতে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত আধ ছটাক করিয়া দৈনিক দশবার দুগ্ধপান করাইবে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রায় দৈনিক আধসের। একমাস পর্য্যন্ত দৈনিক নয় ছটাক। দ্বিতীয় মাসে দৈনিক একসের ৮ বারে। তৃতীয় মাসে—দিনে ৩ ঘণ্টা অন্তর ৭ বার এবং রাত্রিতে ২ বার, মোট দুগ্ধের পরিমাণ—একসের এক ছটাক হইতে এক সের পাঁচ ছটাক পর্য্যন্ত। অতঃপর বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রতিবারে এক পোয়া করিয়া প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ৫ বার এবং রাত্রিতে আর একবার মোট দুগ্ধের পরিমাণ এক সের ১ পোয়া হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত।

গর্ভাবস্থায় স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তন।

আয়ুর্ব্বেদকারগণ বলিয়াছেন গর্ভধারণ করিলে নারীগণের দুগ্ধ আর সন্তানের পক্ষে হিতকর হয় না। গর্ভাধানের পর কোন্ মাসে স্তন দুগ্ধের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এক্ষণে তাহাই বলিতেছি—গর্ভাবস্থার প্রথম মাসে দুগ্ধের জলীয় ভাগ ও শর্করার অংশ হ্রাস পায়, দুগ্ধের কঠিন পদার্থ (solids) চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। স্নেহ ভাগ ৬ মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। লবণের ভাগ প্রথমে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেও পরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া গর্ভিনীর স্তনপানের ঔচিত্য বিবেচনা করিবে।

দুগ্ধের শর্করা—শর্করা, চিনি বলিলে আমরা যাহা বুঝি দুগ্ধের শর্করা সেই পদার্থ নহে। দুগ্ধশর্করা গুণে দ্রাক্ষাশর্করার তুল্য। দ্রাক্ষাশর্করাকে ইংরেজিতে Grape Sugar

বলে। ভক্ষিত দ্রাক্ষাশর্করা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে যেরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, দুগ্ধ শর্করা ঠিক তদ্রূপ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে।

বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ—বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ দুই প্রকার শর্করাযুক্ত ও শর্করা বিহীন। ইহার মধ্যে শর্করা বিহীনই শিশুর পক্ষে প্রশস্ত। যদি শর্করাহীন বিলাতী গাঢ় দুগ্ধে তিনভাগ জল মিশান যায় তাহা হইলে উহা গো দুগ্ধের প্রায় তুল্য হয়—গো দুগ্ধকে মাতৃ দুগ্ধের সদৃশীকরণের উপায় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

দুগ্ধ ভিন্ন অন্যান্য খাদ্য।

শিশুর প্রধান ও প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট খাদ্য—দুগ্ধ সম্বন্ধে বলা হইল। এক্ষণে অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আন্যান্য খাদ্য অর্থে খৈ, মুড়ি, রুটী, এরারুট, সাবু, বিস্কুট প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত খাদ্য সম্বন্ধে আমরা কুমারতন্ত্রের ২৮।২৯ পৃষ্ঠায়, পূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে বলিয়াছি।এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিতেছি এই সকল খাদ্য শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে খাইতে দেওয়া হইবে না। এই সকল খাদ্যের প্রধান উপাদান শ্বেতসার দুগ্ধে বিদ্যমান নাই এবং এই সকল খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য পরিপাকের ইন্দ্রিয় সকলের যেরূপ শক্তি ও যোগ্যতা আবশ্যক শিশুর তাহা নাই। বড় শিশুর পক্ষে এ সকল খাদ্যের পোষক গুণ আছে বটে কিন্তু যে শিশুর দাঁত বাহির হয় নাই তাহাদের পক্ষে উহারা যে অনুপযুক্ত ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

গরিব লোকেরা ছেলেদের দুধের পয়সা যোগাইতে না পারায় অতি শিশুকাল হইতে ঐরূপ কোন দ্রব্য শিশুকে খাওয়ায় বটে কিন্তু ঐ সকল খাদ্য শিশু কেবল গলাধঃকরণ করে মাত্র পরিপাক করিতে পারে না —সুতরাং একরূপ অনাহারে থাকে। ইহার ফলে তাহাদের শরীর ক্ষয় হয়, চর্ম্ম লোল হইয়া যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্ থাকে তাহারাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়—শেষে অস্থি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অবশেষে উদরাময় বা অন্য কোন ক্ষয় রোগ আসিয়া তাহাদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় দেয়।

অপত্য-হিতৈষী সমস্ত পিতা মাতার এই সার সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, দন্তাবির্ভাবের পূর্ব্বে দুগ্ধ ভিন্ন শিশুকে অন্য কোনও খাদ্য কদাচ দেওয়া উচিত নহে। যদি অজ্ঞতাবশাৎ তাড়াতাড়ি শিশুকে এই সকল খাদ্য আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রকৃতি এ অজ্ঞতা কদাচ মাফ্ করিবেন না। পিতা মাতাকে ইহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। দাঁত বাহির হইবার পূর্ব্বে দিলেত ঘোরতর অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা ধ্রুব; কিন্তু দাঁত বাহির হইলেও হঠাৎ বা অধিক পরিমাণে এই সকল খাদ্য সেবন করাইলে নিশ্চিতই শিশু পীড়িত হইবে। ঋতু-দর্শন মাত্রই যেমন স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ যোগ্যতা জন্মে না—কিছুকাল পরে সেই যোগ্যতা আসে, শিশুর পক্ষেও সেইরূপ দাঁত বাহির হইবামাত্রই তাহার দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্য পরিপাকের শক্তি জন্মে না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ অন্য খাদ্য অল্প অল্প খাওয়াইতে হয়। এবং দুগ্ধ প্রচুর দিতে হয় তবে ঐ সকল নবাভ্যস্ত খাদ্য শিশুর পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে; একবৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন শিশুকে শ্বেতসারযুক্ত কোন খাদ্য খাইতে দিবে না। আমরা এস্থলে আয়ুর্ব্বেদকারের সার সত্য স্বরূপ উপদেশটী আর একবার স্মরণ করিতে বলি। আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে—

"অথৈনং জাতদশনং ক্রমশোঽপনয়েৎ স্তনাৎ।
চরান্নিবেবমানো হ্যন্নংবালো নাতুর্য্যা মণুতে॥"

নিষেধের হেতু কি?—দাঁতবাহির হইবার পূর্ব্বে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্য নিষেধের কারণ? এ সময়ে শিশুর অন্ত্র পূর্ণ দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত না হইয়া হ্রস্ব থাকে। লালাগ্রন্থি হইতে প্রথম কয়েকমাস লালাস্রাব হয় না। তিন মাসে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে শ্বেতসারের উপর Pancreatic fluid কোন শক্তিই প্রকাশ পায় না। তণ্ডুল পাক করিবার পক্ষে অগ্নি যেরূপ আবশ্যক দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্য পরিপাকের পক্ষে ঐ সকল রসের তাদৃশই প্রয়োজনীয়তা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব কৃত্রিম খাদ্য অসময়ে সেবন করাইলে উহা শল্য স্বরূপ উদরে অবস্থিতি বলিয়া বিষক্রিয়া করে দ্বিতীয়তঃ শিশুকে বস্তুতঃ অনাহারে রাখে।

শিশুর প্যাটেণ্ট খাদ্য।

আজকাল বাজারে বিদেশ হইতে আমদানী এমন কতকগুলি শিশুর খাদ্য বিক্রীত হয়, যেগুলি দুগ্ধ ও নহে,—রুটী, বিস্কুট এরারুটও নহে সুতরাং এগুলিকে দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী খাদ্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, এই সকল ফুড্ রুটী এরারুটের জাতীয় হইলেও প্রস্তুতপ্রণালীর কৌশলে রুটী এরারুট জাতীয় খাদ্যের বিরুদ্ধে যে সকল দোষ আরোপ করা হইয়াছে তাহাদের কোনটীই এই সকল ফুডে নাই। যাহা হউক আমরা এই সকল ফুড্‌কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিব।

প্রথম শ্রেণীর খাদ্য—শুষ্কীকৃত দুগ্ধ এবং তৎসহ আংশিক বা সর্ব্বতোভাবে অঙ্কুরিত, শুষ্কীকৃত, ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহিদ্বিদলাদি (malted cereals) মিশ্রিত থাকে।

২য় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে কতকগুলিতে সর্ব্বতোভাবে অঙ্কুরিত শুষ্কীকৃত ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহিদ্বিদলাদি থাকে। শ্বেতসার থাকে না। সর্ব্বথাদ্রবনীয় (souble) কার্ব্বহাইড্রেট জাতীয় বস্তু এবং কিঞ্চিৎ প্রটিড্ থাকে। মেলিন্স ফুড এই জাতীয় খাদ্য। অন্যগুলিতে আংশিক অঙ্কুরিত, শুষ্কীকৃত, ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহি-দ্বিদলাদি এবং শ্বেতসার বেশ থাকে; কিন্তু এই সকল খাদ্য যেরূপে প্রস্তুত করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয় সেই প্রস্তুত প্রণালীর গুণে এই শ্বেতসার—পিচ্ছিল, গুণবিহীন ও শর্করায় পরিণত হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

৩য় শ্রেণীর খাদ্যে কেবল অঙ্কুরিত, শুষ্কীকৃত, ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহিদ্বিদলাদি যথাবৎ বিদ্যমান থাকে—কোনরূপ গুণান্তরিত করা হয় না।

এক্ষণে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই ত্রিবিধ শ্রেণীর খাদ্য ব্যবহৃত হইবার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে।

প্রথম শ্রেণীর খাদ্য কেবল সেই ক্ষেত্রেই দেওয়া যায় যেখানে শিশু দুগ্ধের ছানার ভাগ পরিপাক করিতে না পারে। কারণ এই জাতীয় খাদ্য হইতে অতি সূক্ষ্ম ভাগে দুগ্ধের ছানার ভাগ নিষ্কাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় খাদ্য কদাচ ২।১ সপ্তাহের অধিক সেবন করাইবে না। অতঃপর শিশুকে আবার মাতৃদুগ্ধ সহ্য করাইবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যে শ্বেতসার নাই; সুতরাং ইহা শিশুর তিনমাস বয়স হইতে অতি অল্প মাত্রায় দুগ্ধের সহকারী খাদ্যরূপে সেবন করাইতে পারা যায়। পরে

প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ মাত্রাবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। ইহারা পুষ্টিকর খাদ্য এবং যেমন বার্লির জল দুগ্ধের ছানার ভাগ পরিপাকের সাহায্য করে ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য অন্ততঃ এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুকে সেবন করিতে দেওয়া যায় না। বরং একবৎসরের উপর ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত না দিলে আরও ভাল।

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা কতকগুলি বিলাতী খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দুঃখের বিষয় এই সকল বিলাতী খাদ্যের বহু বিচিত্র আড়ম্বর পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া সাধারণের বিশ্বাস হয় যে এই সকল খাদ্য বস্তুতঃই "শিশুর খাদ্য" কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতেছি যে বস্তুতঃ তাহা নহে। এই সকল বিলাতী খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে আশা করি জনসাধারণ এবং পাঠকবর্গ ঐ সকল বিলাতী খাদ্যের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা অবধারণা করিতে এবং যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি এবং বলিতেছি যে, এই সমস্ত খাদ্য যদৃচ্ছভাবে যখন তখন ব্যবহারের কুফল স্মরণ রাখিতে হইবে এবং এই কথাটা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, দুগ্ধভিন্ন অন্য কঠিন খাদ্য পরিপাকের যোগ্যতা না জন্মিলে ঐ সকল খাদ্য কদাচ শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে না।

জল—শিশুর এই অত্যাবশ্যক পথ্য সম্বন্ধে সকলেরই কিছু জানিয়া থাকা ভাল। প্রাপ্ত বয়স্কের অপেক্ষা শিশুর জলের প্রয়োজন কম নহে, বরং তাহাদের আকারের তুলনায় অধিক। শিশুকে একবারে জলপান হইতে বঞ্চিত করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অবশ্য অতিরিক্ত জলপান করিতে দেওয়া কদাচই হিতকর নহে, কিন্তু পরিমিত জল পান হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার পোষণের বিঘ্ন ঘটিবে এবং তাহার শরীরের মল—ত্বক্‌, বৃক্ক, ফুস্‌ফুস্‌ এবং অন্ত্র দ্বারা যথোচিত ভাবে নির্গত হইতে পারিবে না। কিন্তু শিশুকে জলপানে প্রশ্রয় দিলে সে হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল প্রার্থনা করিতে পারে। এস্থলে তাহাকে বরং কিছু সতর্কতার সহিত জলপান করিতে দিবে। আচ্ছা শিশু যদি কিছু অতিরিক্ত জলই পান করে তাহাতে তাহার কি ক্ষতি হইতে পারে? ক্ষতি অতি সামান্য ;—কিন্তু জল পান করিতে দেওয়া সম্বন্ধে কড়াকড়ি করিলে যে দোষ হয়, তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিতে পারে। সৌভাগ্য বশতঃ জল পানের পিপাসা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি এতই দুর্দ্দনীয় যে তাহাতে আমাদের পছন্দমত ব্যবস্থা চালান দুষ্কর। অবস্থা বিশেষ কিছুকালের জন্য ছেলেদের জলপান প্রবৃত্তি রোধ করা আবশ্যক হয়। আহার করিতে বসিয়াই ছেলেরা যাহাতে অধিক জলপান না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভেই অধিক মাত্রায় জলপান করিলে আমাশয়ের উষ্ণতা হ্রাস পাইয়া সুপরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়। ভোজনের কিছু পরে আমাশয় কার্য্যব্যস্ত থাকিয়া উষ্ণতা লাভ করে সুতরাং তখন জলপান করিলে কোনই ক্ষতি হইতে পারে না। ভুক্ত বস্তুকে ক্লিন্ন ও জীর্ণ করিবার জন্য আমাশয়ে এক প্রকার শ্লেষ্মা আছে। ইহার নাম ক্লেদক শ্লেষ্মা (gastric juice) অনেকের ধারণা আহারের সময় জলপান

করিলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ ক্লেদক শ্লেষ্মা দ্রবীভূত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এই ভয়ে তাঁহারা জলপান সম্বন্ধে এতাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ভ্রম। আহার কালে জলপান করিলে ক্লেদক শ্লেষ্মাকে দ্রবীভূত করা হয় না; বরং পান করা জল শোষিত হইয়া ক্লেদক শ্লেষ্মা স্রাবের পক্ষে সহায়তা করে।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা—শিশুর পক্ষে পানীয় জলের প্রয়োজনায়তা দেখান হইল বটে কিন্তু এই জল বিশুদ্ধ না হইলে হিতে বিপরীত ঘটে। দূষিত জল স্বাস্থ্যের পক্ষে কত অনিষ্ট কারী ও কত উৎকট রোগের জনক তাহা সংক্ষেপে কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের দেহের অধিকাংশই জল—প্রধানতঃ জলের দোষেই অজীর্ণ শূল, পাথরী প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মে। অশুদ্ধ জল পান করিয়াই যে দেশে কলেরা, রক্ত আমাশয়, মারাত্মক সন্নিপাতজ্বর প্রাদুর্ভূত ও বিস্তৃত হইয়া জনপদ ধ্বংস করিতেছে এ বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যে জল বিশুদ্ধ না হইলে এত অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে সেই জলের দোষ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ—আমরা শুচিস্বভাব জাতি; সুতরাং এদেশে যে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক একথা সহজেই বুঝায়। যত-সমাজ-হিত কর অনুষ্ঠান আছে তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জল পাইবার সুব্যবস্থাকে যদি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয় তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া দিঘী সরোবরাদি প্রতিষ্ঠার পুণ্যকরত্ব ঘোষণা পূর্ব্বক জনসাধারণকে তৎপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এ দেশে সুদীর্ঘ, প্রসারিত, অতিগভীর, সুস্বাদু জলপূর্ণ দিঘী পুষ্করিণীর অভাব ছিল না। এখন অভিনব শিক্ষার প্রভাবে এবং অন্যান্য নানা কারণে লোকের হৃদয় হইতে অনেক সুকুমার দেশ-হিতকরপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত বা ক্ষীণ হইয়াছে। লোকে এখন পুণ্যজনক কর্ম্ম বলিয়া আর দিঘী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে না, অথচ স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়াও বিশুদ্ধ জল যাহাতে সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহারও কোন ব্যবস্থা করিতেছে না। যাহা সহস্র সহস্র নরনারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই হউক বা লোকহিতকর বলিয়াই হউক অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার গিয়াছে অথচ নূতন কিছু তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—সমাজের এই অবস্থা বড়ই পরিতাপ জনক ও অনিষ্টকর। দেশের লোকে বর্ষাকালে জলপ্লাবনে পরিত্রাহি চীৎকার করে এবং গ্রীষ্মকালে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া একঘটী জলের জন্য হাহাকার করে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে শিশুকুল রুগ্ণ হইয়া জাতির যে সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশুদ্ধ জলের অভাবে দেশে নানা সাংঘাতিক ব্যাধির অবাধ প্রসার হওয়ায় কিরূপ অনিষ্ট সজ্বটিত হইতেছে তাহাও সংক্ষেপে বলিলাম। ইহা ত বিলাপ মাত্র, এখন কাজের কথা বলি।

জল সংশোধনের উপায়—বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীর পুষ্করণীর জলই দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে এবং জলজ বিবিধ উদ্ভিদের

উদ্ভবে অধিকতর দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর আবার যে পুষ্করিণীতে জল পান করা হয়—তাহাতেই শৌচ, প্রস্রাব; বস্ত্র-প্রক্ষালনাদি তাবৎ কার্য্যই নির্ব্বাহ করা হয়। যখন পুষ্করিণী সুগভীর ছিল বলিয়া জল বিশুদ্ধ থাকিত—তখন এই উভয় কার্য্য একটী পুষ্করিণীতে নির্ব্বাহ করায় যত ক্ষতি হইত, এখন পঙ্কে পুষ্করিণী পূর্ণ—সুতরাং জলও মলিন হওয়ায় ক্ষতির ভাগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব যেখানে বহতা নদী আছে—সেখানে অন্ততঃ পানার্থে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত। মন্দ হইলেও স্রোতের জল তত মন্দ হইতে পারে না, ডোবা-ডাবারির জল কি মাঠের জমা জল পানার্থ কদাচ ব্যবহার করিবে না। জল ফুটাইয়া লইলে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয়। ইহা অপেক্ষা জল শোধনের সহজ উপায় আর নাই। ফিল্‌টার আজকাল অনেক রকম বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সকল ফিল্‌টারকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ফিল্‌টারে জলশোধন করা অনেক স্থলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। বর্ষাকালে অনেক নদীর জল ঘোলা হয়। এক কলসী ঘোলা জলে চার চামচের আধ চামচ ফট্‌কিরির গুঁড়া ঢালিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে জলের যত ময়লা তলায় পড়িয়া যাইবে। তখন আস্তে আস্তে উপরের জল গড়াইয়া লইয়া ফুটাইয়া নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যায়। তাম্রের জলশোধিনী শক্তি আছে—তুঁতেতে তামা আছে—এক জালা জলে ১ রতি তুঁতে দিলে জল বিশুদ্ধ এবং জীবাণু বর্জ্জিত হয়। তাম্রময় জলপাত্র ব্যবহার করা ভাল,—আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ—"তাম্রপাত্রে জলং পিবেৎ।"

(ক্রমশঃ)

কুমারতন্ত্র-রচয়িতা।

বায়ু।

আয়ুকে জানিতে চাহিয়াই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। এই আয়ু আবার বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। বায়ুকে 'জীবন' বলিয়া অভিহিত করা তাই সার্থক। আয়ুর্ব্বেদের মূলীভূত বায়ুতত্ত্বের আজ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রয়োজনীয়তা—পৃথিবীর চারি পার্শ্বে এক বিশাল বায়ুমণ্ডল আছে। এই মণ্ডলস্থ বায়ুকে সেবন করিয়াই পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণী জীবিত থাকে। হৃৎপিণ্ডের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই জীবন সূচিত হয়। বায়ু সাহায্যেই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া পরিচালিত হয়। খাদ্যাভাবে বরং আমরা কিছুদিন বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ু ভিন্ন কয়েক মুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এই বায়ু যত বেশী বিশুদ্ধ, তত বেশী দীর্ঘ জীবনের পক্ষে উপযোগী। বায়ুকে শরীর মধ্যে স্থিরতা দান করিতে পারিলেও দীর্ঘ জীবন লাভ হইতে পারে।

প্রাচীন মনস্বী হিন্দু এই বায়ুর উপকারিতাকে যথাযথ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাই

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিশুদ্ধ বায়ুর গুণকীর্ত্তনে মুখরিত, তাই হিন্দু যোগীর প্রাণায়াম-হঠযোগে বায়ু-স্তম্ভন করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা।

ক্ষয়কাস, ওলাউঠা হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন রোগই মূলতঃ বায়ুর অপ্রচুর ব্যবহার বা অবিশুদ্ধ বায়ু সেবন দ্বারা সূচিত হয়। বায়ু যে জীবনের পক্ষে অত্যাবশুক, তাহার একটী পঠিত প্রমাণ দিতেছি। এক বিখ্যাত ইউরোপীয় চিকিৎসক এক সুবৃহৎ কাঁচপাত্রে একটী জীবিত পক্ষীকে আবদ্ধ করিয়া air-pump (এয়ার পাম্প) দ্বারা পাত্রস্থ যাবতীয় বায়ু বাহির করিয়া লন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পক্ষীটী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ পাত্রের মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল, পর্য্যাপ্ত-বায়ু সেবনে পক্ষীটী অচিরাৎ সজীব হইয়া উঠিল।

বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান—বিশুদ্ধ বায়ু যখন জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, তখন ইহা কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রতি সহস্র ঘন ফুট স্বাভাবিক নির্ম্মল বায়ুতে ৭১০·০ ঘনফুট নাইট্রোজেন, ২০৯·৬ ঘনফুট অক্সিজেন, ·৪ ঘনফুট কার্ব্বন ডায়কসাইড ও অবশিষ্টাংশ ওজোন জলীয়বাষ্প, এ্যামোনিয়া ইত্যাদি অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমানে আছে। এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেনই প্রাণধারণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই অক্সিজেন দ্বারাই জীব-শোণিতের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হয়। এই নির্ম্মল শোণিতই সুগঠিত স্বস্থ দেহ ও উৎসাহশীল মন প্রদান করিয়া মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। পার্ব্বত্য প্রদেশের ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বায়ুতে এই অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়াই, তৎ তৎ স্থানের মানুষ অধিকতর নীরোগ দেহ ও কর্ম্মী। এইজন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ দেশীয় রোগীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং বা পুরী যাইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বাস্তবিকই বিশুদ্ধ বায়ুই অনেক রোগের একমাত্র ঔষধ। কোন ঔষধেই যে রোগ আরোগ্য হয় নাই, শুদ্ধ বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে তাহা অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। ঔষধ ভিন্ন নির্ম্মল বায়ু সেবন দ্বারা রোগারোগ্যের নিদর্শন যত বহুল, নির্ম্মল বায়ু ভিন্ন শুদ্ধ ঔষধে রোগারোগ্যের নিদর্শন ততোধিক বিরল।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনই যদি সমধিক আবশুক, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুধু অক্সিজেনের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে অধিকতর সবল সুস্থ দেহ ও আয়ুষ্মান্ হওয়া যায় কিনা? বাস্তবিকই বিধাতার বুদ্ধির উপর মানুষ কোনদিনই বাহাদুরি দেখাইতে পারে না। যেটি আমাদের ঠিক উপযোগী, বিধাতা ঠিক সেইটিই দিয়াছেন, তা'র উপর তুলি বুলাইতে গেলেই ঠকিতে হয়। বিধাতার জলের উপর কারসাজি করিতে যাইয়া মানুষ কলের জল তৈয়ার করিল, কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) অমনি আসিয়া হাজির হইল। ইলেকট্রিক আলোর বাহাদুরিতে নিত্য কত লোক মারা পড়ে, কত বালক বার বৎসরে চসমাধারী হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

Heber, Wilson, Notter, Firth, প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ রাসায়নিক চিকিৎসক বলেন যে, বায়ুতে যদি কেবলই অক্সিজেন থাকিত—তবে প্রাণিজগৎ অত্যন্ত চঞ্চল ও

ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও নিতান্ত অল্পায়ু হইত। অক্সিজেনপূর্ণ একটী পাত্রের মধ্যে একটী জলন্ত অঙ্গার ধরিলে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়. অঙ্গার খণ্ড. ক্ষণকাল অতীব দীপ্তিমান্ হইয়াই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অক্সিজেনসহ নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাস্ মিশ্রিত থাকায় জীবের পক্ষে বায়ু অধিকতর সহনীয় ও হিতকর হইয়াছে। অধিকন্তু যে উদ্ভিজ্জ-জগৎ অধিকাংশ জীবের আহারীয়ের সংস্থান করে, কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাস্ সেই উদ্ভিজ্জ-জগতের পোষণ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। উদ্ভিদগণ দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ ও স্বীয় সবুজবর্ণ বিশিষ্ট ক্লোরোফিল নামক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্ব্বণিক গ্যাস হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং অক্সিজেন ত্যাগ করিয়া বায়ু-মণ্ডলকে পরিস্কৃত ও অধিকতর হিতকারী করে। নাইট্রোজেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকারী না হইলেও বায়ুকে পরোক্ষভাবে অধিকতর উপভোগ্য করিয়া আমাদের জীবন ধারণের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাইতেছে —বায়ু প্রস্তুতকরণে বিধাতা কম কৌশলের পরিচয় দেন নাই। বায়ুতে এই বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে তিনি জীব-জগৎ ও উদ্ভিজ্জ জগতের যুগপৎ পরিবর্দ্ধনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কি সুন্দর সামঞ্জস্য! যে কার্ব্বণিক গ্যাস মানুষ প্রশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে—তাহাই বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদ কার্ব্বণ গ্রহণ করে ও জীবজগতের শ্বাস-গ্রহণোপযোগী জীবনের পরম হিতকর অক্সিজেন দান করে। ঐ কার্ব্বণ ডায়কসাইড আবার অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া বায়ুকে জীবের সহনীয় ও অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলে।

বিশুদ্ধ বায়ু—অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বায়ুই জীবের পক্ষে প্রকৃত হিতকর। কৃত্রিম উপায়ে মানুষ বায়ু প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু তাহা যে কলের জল ও বৈদ্যুতিক আলোর মতই মানুষের সর্ব্বনাশ করিবে না—তাহা বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক বায়ু এখনও এত সুলভ আছে যে, কৃত্রিমতা অবলম্বনের আদৌ আবশ্যকতা নাই। তবে এ কথাও সত্য যে, স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বায়ু জীবের পক্ষে হিতকারী হইলেও সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ বায়ু সুলভ নহে। প্রকৃতি চিরকালই নগ্না। তাই নানা কারণে স্বাভাবিক বায়ু দূষিত হইতে পারে. কিন্তু কিঞ্চিৎ সতর্ক ও চেষ্টাশীল হইলে আমরা এই দূষিত বায়ুকে সুসংশোধিত করিয়া লইতে পারি। বিশুদ্ধ বায়ু যখন দীর্ঘ জীবনের নিদান ও অবিশুদ্ধ বায়ু আয়ুর্হানিকর ও নানারোগের আকর, তখন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা চিকিৎসার প্রথম ও সর্ব্বোচ্চ সোপান হওয়া উচিত। আমি বিশুদ্ধ বায়ু-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিয়াই অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

বায়ু বিশুদ্ধ করিবার উপায়—

১। আবদ্ধ বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া পড়ে। অতএব বাড়ী এমন খোলা ও চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গন বিশিষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে সর্ব্বদা বায়ু কর্ত্তৃক বিধৌত হইতে পারে। ঘরগুলি এমন জানালাবহুল হওয়া বিধেয় যে, বায়ু এক জানালা দিয়া আসিয়া অনায়াসে অপর জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

২। পর্য্যুসিত ও গলিত পচনশীল জিনিস কিছুতেই বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে না জমিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। কারণ যত সব

রোগবীজাণু সাধারণত পচা জিনিসের মধ্যেই বর্দ্ধিত হয়। বাতাস এই বীজাণুগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া রোগের সংক্রামকতার বৃদ্ধি করে।

৩। রান্নাঘর যতদূর সম্ভব শয়ন গৃহের দূরবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজনীয়। রান্নাঘরেও যাহাতে ধূম জমিতে না পারে—এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। বিলাতে রান্নাঘরের ধূমের অবাধ নিষ্কাসনের জন্য চিমনি রাথার প্রথা অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মনে রাখিতে হইবে—রন্ধন-কাষ্ঠ বা কয়লা কার্ব্বণ পদার্থ। অক্সিজেন সাহায্যে দাহন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। দাহনকালে কার্ব্বণ অক্সিজেনে মিশিয়া কার্ব্বণ ডায়কসাইড নামক গ্যাস্ প্রস্তত হয়। এই কার্ব্বণ ডায়কসাইড্ শ্বাস গ্রহণের পক্ষে নিতান্ত অহিতকর। অতএব ঐ গ্যাস যাহাতে অবাধে বাহির হইয়া সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের প্রচুর বায়ুতে মিশিতে পারে—তাহা করা উচিত। এই জন্যই কলকারখানা যত দূর সম্ভব গ্রাম বা নগরের বাহিরে পরিচালিত হওয়া উচিত। একান্ত অসম্ভব হইলে ঐ ধূম যাহাতে কোনও জলাশয়ের জলের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। একগৃহে অধিক লোক শয়ন করা নিতান্ত অন্যায়। আমরা প্রশ্বাসকালে কার্ব্বণ ডায়কসাইড ত্যাগ করি। শ্বাস গ্রহণের পক্ষে অহিতকর এই গ্যাস গৃহস্থ বায়ুকে নিতান্ত দূষিত করে। তারপর রাত্রিতে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করার যে অভ্যাস তাহাও অত্যন্ত গর্হিত। প্রশ্বাসে যে কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাস বহির্গত হয়, তাহা গৃহে আবদ্ধ থাকিলে কিছুতেই বহির্গত হইতে পারে না। সুতরাং অনেক সময় প্রাণনাশও সম্ভবপর হইয়া থাকে। 'ব্লাকহোল ট্রাজিডি' যে কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাসেরই কীর্ত্তি সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

মোটের উপর বায়ুর অনাবদ্ধতা বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্ব্ব প্রযত্নে যাহাতে বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে বায়ুর চলাচল অবাধ থাকে—তাহা করিতে হইবে। তাহার পর মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা নদী ও সমুদ্রের উপকূলে বেড়াইতে যাইতে পারিলে প্রায়শঃই রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার উপায়—এ তো গেল বিশুদ্ধ বায়ুকে ঘরে আনিবার কথা। কিন্তু বায়ু যখন ঋতুদোষে বা মহামারীর সংক্রাকমতায় পূর্ব্বেই দূষিত হইয়া গিয়াছে,—তখন কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? এই দূষিত বায়ুকে গ্রহণ করিতে থাকিলে রোগকবলিত হওয়া একরূপ নিশ্চিত। অতএব তখন যাহাতে এই দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে—তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১। আবদ্ধতা হেতু বায়ু দূষিত হইলে প্রথমতঃই বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত করা উচিত। বাড়ীর চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ থাকিলে তাহা যথাসম্ভব কাটিয়া ফেলা উচিত। দক্ষিণ দিক হইতেই ভাল বায়ু অধিকাংশ সময়ে আসিয়া থাকে; অতএব বাড়ীর দক্ষিণ দিক একেবারে খোলা রাখাই বিধেয়।

২। অনেক সময়ে বাড়ীর নিকটে পচা পানা পুকুর, অবিরত পচনশীল নাদানর্দ্দামা থাকে। এইজন্য বায়ু দূষিত হইয়া রোগের

সৃষ্টি করে। এই সমস্ত পুকুর নালা-নর্দ্দামাদি পরিষ্কৃত রাখা বায়ুবিশুদ্ধির প্রধান উপায়।

এই সমস্ত সাধারণ কারণ ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কারণে বায়ু দূষিত হইলে অন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

৩। যখন মহামারী প্রভৃতি কারণে সর্ব্বত্রই বায়ু দূষিত হইয়া পড়িয়াছে—তখন বায়ুর অবাধ চলাচল রোধ করাই বরং অনেক ক্ষেত্রে সমীচীন। নতুবা বায়ু প্রবাহ দ্বারা অতি সহজে রোগ সংক্রামিত হয়।

৪। সংক্রামক ব্যাধি প্রসারের সময়ে বায়ুর অবাধ গমনাগমনের জন্য বিশেষ চিন্তিত না হইয়া, নিজ বাসস্থানস্থ বায়ুকে যাহাতে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। বাড়ীর উঠানে সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করা উচিত। ইহাতে বায়ুর লঘুতা সম্পাদিত হওয়ায়, নিম্নস্তরের দূষিত বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়া মহাবায়ু-সমুদ্রে মিশিয়া বিশুদ্ধ হয়, অধিকন্তু প্রজ্জলিত অগ্নিতে অনেক বীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৬। অঙ্গার বা কয়লা—বায়ুশোধনের পক্ষে এক সুলভ উপায়। শুষ্ক পরিষ্কৃত কয়লা গৃহ মধ্যে চারি পাচ হাত উর্দ্ধে কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে রাখিলে গৃহ মধ্যস্থ বায়ু অতি বিশুদ্ধ হয়। অঙ্গারের মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে। অঙ্গার এক রাসায়নিক শক্তি বলে বায়ুর দূষিত অংশ নিজ ছিদ্র মধ্যে টানিয়া লয়। সপ্তাহান্তে একবার করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে একই কয়লা বহুদিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৭। 'ওজোন' নামক এক রাসায়নিক পদার্থ বায়ু বিশুদ্ধ করিতে বিশেষ উপযোগী। দুই ভাগ পটাসিয়াম্ পারমাঙ্গানেট ও তিন ভাগ গন্ধক-দ্রাবক একত্র মিশ্রিত করিলে এই 'ওজোন' উৎপন্ন হয়।

৮। গন্ধকের বাষ্প বীজাণু নষ্ট করিতে ধন্বন্তরি। ধূপ ধূনার ধূমেও বায়ু শোধিত হয়। হিন্দুর পূজায় ধূপধূনা প্রজ্জলিত করা কত বিজ্ঞান-সম্মত—তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

৯। গোময় ও মৃত্তিকা দুর্গন্ধ ও পচন নিবারণে একান্ত সমর্থ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদেরাও মৃত্তিকার দুর্গন্ধ-নাশিকা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। পচনশীল দ্রব্যের উপর মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিলে তাহার দুর্গন্ধ নষ্ট হয় ও তাহাতে আর রোগ-বীজাণু আশ্রয় লইয়া সঞ্চিত হইতে পারে না। গোময়ের প্রলেপে গৃহস্থিত-রোগ-বীজাণু মরিয়া যায়। আজিও বর্ত্তমান হিন্দু-ভবনের গোবর ছড়া দেওয়া বা ঘরের মেঝেয় নিত্য নিত্য গোবর লেপন নিতান্ত নিরর্থক নহে। গোমূত্রও বায়ু সংশোধন করিয়া থাকে।

১০। কার্ব্বলিক য়্যাসিড ত্রিশ গুণ জলে মিশাইয়া গৃহমধ্যে ছড়াইয়া দিলে সকল দুর্গন্ধ দূর হয়, জৈবিক পদার্থের পচন শক্তি বিনষ্ট হয় ও উদ্ভিদ্-বীজাণু প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। ফিনাইল জলে মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলেও একই ফললাভ হয়।

আজি আর কিছু বলিব না। যতটা বলিলাম, তাহাতে বায়ু যে সত্য সত্যই জীবন এ কথা উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা করিয়াছি। নির্ম্মল বায়ুর অভাবেই যে আজি বাঙ্গালী এত জরাজীর্ণ একটু চিন্তা করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। বঙ্গদেশের প্রায় রোগই মূলতঃ বায়ুর অসম্মান করার বিষময় ফল। আশা

করি, বাঙ্গালী এবার চোখ খুলিয়া দেখিবে। আমি বিশুদ্ধ-বায়ু-প্রাপ্তির যে যে পন্থা গুলি আজি উপস্থিত করিয়াছি, সে গুলি চূড়ান্ত না হইলেও পর্য্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

বাঙ্গালার লোকক্ষয়।

সেনিটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী মিউনিসিপাল এলাকা ব্যতীত বাঙ্গালার জেলা সমূহে গত এপ্রিল মাসে কত লোকের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সে ভীষণ তালিকার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

জেলা	জন্ম	মৃত্যু	কলেরা	বসন্ত	জ্বর
বৰ্দ্ধমান	৩৪০৪	৭৪৭৩	১২৭২	৪৭	৫৩৬৯
বীরভূম	২৩২৫	৪৪৭৪	৮৬৯	৫৩	৩২৫৩
বাঁকুড়া	৩৫৩৫	৪২৩৫	৩৩৪	৬৪	৩১১৩
মেদিনীপুর	৬৫০৯	১০৫৪৯	১৫২৮	১৪৪	৭৬৪৪
হুগলী ও শ্রীরামপুর	১৭২৭	৩০৭৫	৩৪৬	৯৩	২১৮১
হাওড়া	১৭৯২	২১৯৫	৩৭৫	১৪৬	১০০১
২৪ পরগণা	৩৮৭৯	৪৪২২	১২৯০	৭০	২৪৫৭
নদীয়া	৩৮৯৬	৭৮৩৪	১৯২৩	৮৩	৫২৮৮
মুর্শিদাবাদ	৩৮২৬	৬৩০২	১৬৭২	২৮	৪০৪১
যশোহর	৩৭৩৯	৪৮২৩	৯৮১	২৮	৩৪৩৩
খুলনা	২৮৯৭	৩৩৩৩	৫৩৩	২	২০৩২
রাজসাহী	৪৫৩১	৫৭১৮	৭৩৬	৬৪	৪৫৩৩
দিনাজপুর	৫৭৫১	৫৭২৩	১৪৪	১০৫৬	৪০৬৮
জলপাইগুড়ি	২৪৫৫	৪১৪০	৯৯৭	১৪৪	২৬৯১
দারজিলিং	৬৪২	১১৬৫	১৬৯	৪৩	৭৬৯
রঙ্গপুর	৭০২১	৮৩৯৯	৯১৮	১২৩৭	৬১৫১
বগুড়া	২৫৮৩	২৩৬০	৩৫০	১৬৫	১৬০৮
পাবনা	৩৪৪৮	৬৫৭১	১৬২২	৬০০	৪১৩৭
মালদহ	২৭৫২	৩১৯৩	৭১২	৯৬	২১৭০
ঢাকা	৭৫৩৮	৮০৬৪	১৪৬৯	১৮০	৪৫৭৯

ময়মনসিংহ	১০৯৪০	১০৮৬৮	১৮০৫	৩৩৮	৭৫৩৯
ফরিদপুর	৫২৬১	৬৬৯২	১৩৮৮	৭৬	৪২৩৪
বাখরগঞ্জ	৭০১০	৮০৭৩	১২৬৭	২৪	৪৭৮৪
চট্টগ্রাম	৩৮২৪	৪৯৭৭	১২৯৫	১৬	৩৪৮২
নোয়াখালী	৩৩৩৪	৩৬৭৮	৫২৯	৬২	২৫৮০
ত্রিপুরা	৫৬৫৯	৬১৬৫	১০৬০	৩৩৭	৩৫৭৮
সমস্ত বাঙ্গালা	১,১০,৫২	১,৪৪৫০১	২৫৮৬৫	৫১৯৬	৯৭০১৫

গত এপ্রিল মাসে সমস্ত বঙ্গদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৩৪ হাজার বেশী হইয়াছে। কেবল দিনাজপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহে জন্ম সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম, আর সর্ব্বত্রই বেশী। কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ব্যাধি। চেষ্টা করিলেই উহা নিবারণ করা যাইতে পারে কিন্তু দরিদ্রতা, অজ্ঞানতা ও শিথিলতার জন্য ঐ ৩ ব্যাধিতে একমাসে ১,২৮,০৭৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বাঙ্গালার যে সকল সহরে ১০ হাজার ও ততোধিক লোকের বাস, সেই সকল সহরে এপ্রিল মাসে ৩৭১০ জনের জন্ম ও ৯৬৫৬ জনের মৃতু হইয়াছে।

রাজপুরুষদের মুখ চাহিয়া আর থাকা উচিত নয়। গ্রামগুলি স্বাস্থ্যকর করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, দরিদ্রতা দূরের উপায় করা আমাদেরই কাজ। যদি আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

"সঞ্জীবনী"—২২শে শ্রাবণ ১৩২৬।

—:*:—

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

বসন্ত চিকিৎসায় পুরস্কার।—বসন্তের দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে এ বৎসর যাঁহারা ময়মনসিংহে সন্তোষজনক ভাবে বসন্ত রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় বসন্তচিকিৎসকগণ উৎসাহ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা সম্বন্ধে সঞ্জীবনী।—ডাক্তার লেপটেনাণ্ট কর্ণেল সাদারল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীর নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সহযোগিণী সঞ্জীবনী প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যে চিকিৎসা প্রণালীর বয়স সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, যাহার সার্থকতায় এত কাল কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, এই বার লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল সাদার ল্যাণ্ড প্রকাশ্যে উহার নিন্দা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ সুযুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, তাহা তিনি কি করিয়া বুঝিবেন? সংকীর্ণ দলাদলীর ভাব হইতে কোন একটি বিষয় আলোচনা করিলে উহার

সত্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার বৈজ্ঞানিকতার অভিমান লইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কবিরাজদের রোগ-নির্ণয়পদ্ধতি তাঁহার আক্রমণের প্রধান বিষয়। অন্ধের হাতী দেখার মত লেপ্টেনাণ্ট কর্ণের সাদার ল্যাণ্ডের আয়ুর্ব্বেদের বোধ জন্মিয়াছে। এমন বোধ হয় তো আরও কাহারও কাহারও থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি আপনার অদ্ভুত বোধ কাগজে ব্যক্ত করিয়া অতি অনিষ্ঠ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।

আমরা লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেলকে ইহাই স্মরণ করাইতেছি যে, এই চিকিৎসা প্রণালী রাজানুকূল্য ব্যতিরেকে কেবল স্বকীয় শ্রেষ্ঠতার জন্যই সহস্র সহস্র বর্ষ সগৌরবে জীবিত রহিয়াছে।"

চিকিৎসকের পরলোক।—রাজা রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ করুণা কুমার গুপ্ত মহাশয় কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ক্ষত চিকিৎসায় ইঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে ইনি যথেষ্ট চেষ্টাবান্ ছিলেন। উপরোক্ত বিদ্যালয় সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ের শল্যবিভাগের ঔষধাবলী ইঁহারই ব্যবস্থায় নির্ণীত হইত। ইঁহার বিয়োগে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। ইঁহার বিয়োগবার্ত্তা প্রচারমাত্র বিদ্যালয় এক দিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছিল। আমরা ইঁহার অভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

রসায়নবিদ বাঙ্গালী বালক।—জব্বলপুর সহরের মিঃ পি, সি, দত্ত নামক জনৈক ব্যারিষ্টারের পুত্র মিঃ ই, দত্ত নামক একটি সতের বৎসর বয়সের বালক রসায়ন শাস্ত্রে নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছেন। কয়লার খনিতে এক প্রকার বাষ্প জন্মে, সে দেখাইয়াছে যে, উহা অন্য স্থানেও জন্মান যাইতে পারে। এই বাষ্প ভিন্ন গন্ধক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াও ঐ বালক সরকার হইতে পেটেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে। সোডা, কার্ব্বনেট, অ্যালুমিনা পটাশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি দ্রব্যও ঐ বালক আবিষ্কার করিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের নূতন ব্যবস্থা।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই শ্রাবণে এই কলেজ ৪র্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। নূতন সেসনে অনেকগুলি graduate ও under graduate কৃতবিদ্য ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। এই সকল ছাত্রের ভবিষ্যৎ উপায়ের জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে, চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১ম ও দ্বিতীয় ছাত্রকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের চিকিৎসকরূপে অথবা সরকারি চিকিৎসালয় সমূহের চিকিৎসকের কার্য্যে উপযুক্ত বেতন নির্দ্ধারণে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। যাঁহারা চিকিৎসা বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চাকরী করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব সুযোগ সন্দেহ নাই।

মনিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স।

বিনা পানের

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য

অল্প মূল্যের নানাবিধ নূতন ফ্যাসনের গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার।

সেপ্টপিন।



১। পতিপরমগুরু সেফ্‌টীপিন ১৮৲। ২। সাবিত্রী শাঁখা ১৪৲—৪০৲। ৩। কুমারী মাকড়ী ৭॥০। ৪। হেয়ার পিন ১৫৲। ৫। তিনখানি পাথরসেট আংটী ২০—৩৫৲। ৬। নথ (নূতন ফ্যাসন) ২০৲। ৭। পারসী মাকড়ী ১৬৲—৩০৲। ৮। কাশ্মিরী মাকড়ী ১৬৲—২৫৲। ৯। নথের টানা (ক্রাউন ওয়ালা) ১২৲—১৮৲। ১০। নথের টানা (প্রজাপতিওয়ালা) ১৫৲—২১৲। ১১। নথের টানা (নামওয়ালা) ১৬৲—২০৲। ১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০৲—১৫৲। ১৩। করোনেশন ইয়ারিং ১৯৲। ১৪। কলেটওয়ালা নাকছাবি ৫৲। ১৫। জড়োয়া নাকছাবি ৫৲। ১৬। কাণের টাব (ডবল থাকা ও পাথর সেট) ১২৲—৩০৲। ১৭। জড়োয়া টাব ১৫৲—৪০৲। ১৮। বেলকুঁড়ি টাব ৮৲—১২৲। ১৯। হরতন নাকছাবি (পাথর বসান) ২॥০। ২০। নাকছাবি ইস্কাতন ২॥০। ২১। ঐ চিড়িতন ২॥০। ২২। ঐ রুহিতন ২॥০। ২৩। হরতন নাকছাবি (প্লেন হাই পালিশ) ১॥০। ২৫। রুহিতন নাকছাবি ১॥০। ২৬। চিড়িতন নাকছাবি ১॥০ টাকা।

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দিই। বিনামূল্যে ৩নং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স,

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—নেক্‌লেস্‌।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত ও

৩য় বর্ষ—১২শ সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩২৬

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

Reg. No. C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।



সম্পাদক—
কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,
" শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগ নির্ণয়ের জন্য ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথকভাবে মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১।৹ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ১৲, বাঙ্গালা ১।৹।

বিষ তন্ত্র।

সকল প্রকার বিষ চিকিৎসার অভিনব পুস্তক। স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ, গর বিষ—মনুষ্য দেহ যে কোনো বিষেই আক্রান্ত হউক না কেন, এ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে পারিলে সকল প্রকার বিষ-চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিবে। এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক শুধু চিকিৎসা ব্যবসায়ীর কথা কেন,—গৃহস্থমাত্রেরই যত্ন করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালায় অনুবাদ লিখিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲, বাঙ্গালা ১।৹ টাকা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ কৃত

বনৌষধি দর্পণ।

দ্রব্যগুণ শিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক—২ খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৪৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা। (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ৷৵৹ দশ আনা, বাঁধান ১৲।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ

১ম ও ২য় বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদ" বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট্ মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবলমাত্র ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটি নাই, কিন্তু উহার জন্য বড় আসিয়া-যাইবে না। এই দুই বর্ষের "আয়ুর্ব্বেদ" আগামী সারদীয়া পূজার মধ্যে লইলে ৩৲ তিন টাকায় দেওয়া যাইবে; মাশুল ।৵৹। সত্বর পত্র লিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

পুস্তকগুলির জন্য ১৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

গ্রাহকদিগের দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান ভাদ্র সংখ্যায় আয়ুর্ব্বেদের ৩য় বর্ষ পূর্ণ হইল, আগামী আশ্বিনে ইহার ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইবে। দুঃখের বিষয় এখনো কয়েকজন গ্রাহকের নিকট ৩য় বর্ষের মূল্য বাকী রহিয়াছে। বাকী মূল্য প্রেরণের জন্য সেই সকল গ্রাহকের সকরুণ দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি, এই সংখ্যা কাগজ পাওয়ার পরই দয়া করিয়া তাঁহারা মণি অর্ডারে মূল্য প্রেরণ করেন—ইহাই তাঁহাদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা।

প্রতি বর্ষেই ইহার মূল্য অগ্রিম পাঠান নিয়ম। যে সকল সহৃদয় গ্রাহক প্রতি বৎসর অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাও কৃপা পূর্ব্বক ৪র্থ বর্ষের জন্য মণি অর্ডার করিবেন—ইহা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

যাঁহারা ৩য় বর্ষের বাকী মূল্য মণি অর্ডার করিবেন, ৪র্থ বর্ষের মূল্য তাঁহারা কোন সময় প্রদান করিবেন তাহা যদি মণি অর্ডার কুপনে লিখিয়া জানান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট আমরা বিশেষ বাধিত হইব, বিশেষ অসুবিধা না হইলে ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের মূল্য একত্র মণি অর্ডার করিলেই আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

ভাদ্র মাসের সূচী।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৬—ভাদ্র। { ১২শ সংখ্যা।

"অশ্বিনী কুমার"।

—:*:—

আদিম যুগের প্রাচীন গাথা বিঘোষিল বেদ সমস্বরে।
যাঁ'দের মহিমা যাঁ'দের গরিমা উথলে আজিও ভুবন ভ'রে॥
ত্রিদিবে যাঁ'দের অতুল প্রভায়, ছাইল অপার যশের রাশি।
শান্ত করিল করুণা ধারায় মুগ্ধ এখনও জগত বাসী॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

জনক যাঁ'দের কশ্যপ সুত ত্রিলোক পূজ্য দেবতা সূর্য্য।
বিশ্বকর্ম্মা-তনয়া- সংজ্ঞা-জননী, জামাতা অমৃতাচার্য্য॥
উত্তর কুরু বর্ষে উদিল যুগল কুমার মধুর দৃশ্য।
বিরাট তীর্থে পুণ্য আলোক উজলি' ছাপিল সারাটি বিশ্ব॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

দক্ষ-সকাশে শিক্ষা লভিলে শিষ্য হইল অমর ইন্দ্র।
অশেষ প্রতিভা প্রকাশি' রচিলে স্বনামে অশ্বিনীকুমার তন্ত্র॥
ভৈরব-ক্রোধ-ছিন্নশীর্ষ যুক্ত করিলে ব্রহ্মাদেবে।
যজ্ঞ অংশ লভিলে সমরে অক্ষত করি' দেবতা সবে॥

ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

ভুজস্তম্ভ ব্যাধি বিমুক্ত তোমারি প্রভাবে, দেবতা ইন্দ্র।
ভগের নেত্র, তপনে দন্ত দানিলে ; যক্ষ্মা মুক্ত চন্দ্র॥
'সুকন্যার' ধর্ম্ম রক্ষা করিলে স্থবির চ্যবনে যৌবন দানি।
ব্রহ্মবাদিনী, ঘোষার কুষ্ঠ নীরোগি' মুছা'লে কুমারী বাণী॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

ইন্দ্র ছেদিত শীর্ষ যোজিলে দধীচি মুনির পুনর্ব্বার।
অরি কর হ'তে রাজা বিমদের পত্নী করিলে সমুদ্ধার॥
তুগ্র পুত্র ভুজ্যুর স্তবে বিশাল জলধি করিলে পার।
ঋজাশ্বেরে নয়নে পশিলে নাশিলে অসীম অন্ধকার॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা॥

খেল নৃপতির জায়া বিশবলা স্তুতিতে লভিল করুণা তব।
সমর ক্ষেত্রে ছিন্ন চরণে লৌহ জঙ্ঘা ঘটিল নব॥
বিজ্ঞানালোক বিকাশি নবীন রাখিলে নিখিল বিমল কীর্ত্তি।
অমর ইন্দ্র বন্দিল পদ নীরোগ মানব স্মরিয়া মূর্ত্তি॥
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ
এইচ্, এল্, এম্, এস্।

প্রাচীন ভারতে কীটাণু তত্ত্ব।

—:o:—

জার্ম্মাণীতে কীটাণুতত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হইয়া সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই কীটাণু-তত্ত্ব আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও সাহিত্যবিজ্ঞানে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে যক্ষ্মা প্রভৃতি কয়েকটী সংক্রামক পীড়ার হেতু বলিয়া কীটাণুকে ধরা হইত,

এইক্ষণে আর তাহা নাই, কীটাণুর ন্যায় তাহার তত্ত্বও বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত রোগেরই বিভিন্ন নিদান বিভিন্ন প্রকারের কীটাণু বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে। পণ্ডিতগণ আবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—কতকগুলি কীটাণু শরীরের অপকারী, কতকগুলি কীটাণু উপকারী। দধিতে এই উপকারী কীটাণু পাওয়া যায়—এইজন্য দধিভোজীরা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। আমাদিগের চিকিৎসাবিজ্ঞানে দধিকে দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়াছে কিনা জানি না, তবে অনাদি কাল হইতে আমাদিগের দেশে যে দধির ব্যবহার ছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এইদেশ হইতেই যে অল্পদিন পূর্ব্বে ভিন্নদেশে দধির আমদানি হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাঁহারা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে নিয়ত যেমন দধির প্রশংসা শুনা যায়, তাঁহারা যেমন সকল রোগেই রোগীকে, দধি পথ্য দিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন আমাদের কবিরাজ মহাশয়দিগের মুখে সেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং সেরূপ ব্যবস্থাও দিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যাহার হুজুগ উঠে, তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ ইউরোপ যেমন নাচিয়া উঠে, আমাদের বৈদ্যদিগের আজও ততটা হয় নাই, তাঁহারা গড্ডলিকা প্রবাহের একান্ত বিরোধী। ব্যাকরণে পর্য্যন্ত আছে —"স্থূলং করণং দধি"। দধি যে উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সকল রোগে দধি যে উপকারী —যাঁহারা দধির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ তাহা স্বীকার করিবেন না। এইরূপ সমস্ত রোগেরই কারণ কীটাণু—এ কথাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না।

দধির মতন কীটাণুতত্ত্বেরও সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে আবিষ্কার হয় নাই। ভারতেই কীটাণু তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কার, এবিষয়ে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, পুরাণ, তন্ত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইতে পারি। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ—বেদে পর্য্যন্ত এই কীটাণুতত্ত্বের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তদ্‌ভাবে ভাবিত; তাঁহাদিগের ভারতীয় ছাত্রগণ বেদের মন্ত্রভাগ প্রথমে রচিত, তাহার অনেক পরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত, মন্ত্রভাগের মধ্যে আবার ঋক্‌সংহিতার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—এই স্বকপোলকল্পিত অভিনব মতের পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু সেই মতের কোন ভিত্তি বেদে পাই না। আমরা সকল বেদকেই নিত্য অনাদিকালসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি। এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের মতসিদ্ধ ঋক্‌সংহিতা হইতেই এই কীটাণুতত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী মন্ত্রের আজ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, পাঠক পাঠিকারা দেখিবেন, ইউরোপ আমাদিগকে আজ পর্য্যন্তও কোন নূতন কথা শুনাইতে পারিতেছেন না। আমরা ঋক্ সংহিতার সেই মন্ত্রগুলির উল্লেখ না করিয়া বা তাহার সায়ন ভাষ্যের উল্লেখ না করিয়া মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত যে সেই মন্ত্রগুলির অনুবাদ করিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতেই নবীনদল অধিক সন্তুষ্ট হইবেন।

১। "অল্পবিষ প্রাণী, মহাবিষ প্রাণী, জলচর, অল্পবিষ প্রাণী দুই প্রকার (জলচর ও স্থলচর), দাহকর প্রাণী, এবং অদৃশ্যরূপ প্রাণী, আমাকে (বিষ দ্বারা) সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত করিয়াছে।

২। যে ঔষধ আসিতেছে তাহা অদৃশ্য

রূপ (বিষধর) প্রাণীকে নাশ করে ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহাকে নাশ করে। বিনষ্ট হইবার সময় নাশ করে এবং পিষ্ট হইবার সময় পেষণ করে।

৩। শর, কুশর, দর্ভ, সৈর্য্যা, মুঞ্জ, বীরণ প্রভৃতি (ঘাসে) অদৃষ্টরূপে অবস্থিত (বিষধরগণ) সকলে মিলিত হইয়া আমাকে লিপ্ত করিতেছে।

৪। যখন ধেনুগণ গোষ্টে উপবেশন করিয়া আছে, যখন মৃগগণ নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করিতেছে, যখন মনুষ্যের চৈতন্য অপগত হইয়াছে তখন অদৃশ্যরূপ (বিষধর) আমাকে লিপ্ত করিয়াছে।

৫। তস্করের ন্যায় এই সকলকে রাত্রিকালে দেখা যায়। উহারা নিজে অদৃশ্য হইলেও সমস্ত জগৎ দর্শন করে। অতএব মনুষ্যগণ! সাবধান হও।

৬। স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা, সোম ভ্রাতা, অদিতি ভগিনী। অদৃষ্ট সর্ব্বদর্শীগণ! তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতি কর এবং যথা সুখে গমন কর।

৭। যাহারা স্কন্দবিশিষ্ট, যাহারা অঙ্গবিশিষ্ট, যাহারা শুচিবিশিষ্ট, যাহারা অত্যন্ত বিষযুক্ত, অদৃষ্টগণ! তোমাদিগের এখানে কি আছে? তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাও।

৮। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করেন এবং অদৃষ্টদিগকে বিনাশ করেন। তিনি সমস্ত অদৃষ্টদিগকেও যাতুধানীদিগকে বিনাশ করেন।

৯। সূর্য্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করতঃ উদয় হইতেছেন, সর্ব্বদর্শী অদৃশ্যদিগের বিনাশক, আদিত্য জীবলোকের মঙ্গলের জন্য উদিত হইতেছেন।

১০। শৌণ্ডিক গৃহে চর্ম্মময় সুরাপাত্রের ন্যায় আমি সূর্য্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করিতেছি। পূজনীয় সূর্য্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্য্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।

১১। ক্ষুদ্র শকুন্তিকা পক্ষী তোমার বিষ খাইয়া ফেলিয়াছিল, সে যেমন প্রাণত্যাগ করে নাই, আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। সূর্য্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধু বিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।

(ঋক্‌বেদ সংহিতা—২য় অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ১ মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত)

সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ সমস্ত দেবতার হিতকারী সর্ব্বরোগনাশক ভিষক (যাঁহার স্মরণ করিলেও সমস্ত রোগের নাশ হয়) বাগ্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রুদ্র আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপদেশ দিউন। হে রুদ্র! সেই সমস্ত সর্পব্যাঘ্রাদিকে বিনাশ করিয়া ও অধরাচি (অধোধোগমনশীলা অর্থাৎ চক্ষুর বাহিরে অবস্থিত) যাতুধানীদিগকে (রাক্ষসীদিগকে) বিনাশ করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দেও। (শুক্লযজুর্ব্বেদ—মধ্যেন্দিত শাখা ১৭ অঃ ৫ কণ্ডিকা)" (১)

বেদ সংহিতা হইতে যে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারাতেই প্রাচীন ভারতে যে কীটাণুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিল,

(১) এই সুক্তটির বাঙ্গালা ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই, যজুর্ব্বেদে মহীধরকৃত ভাষ্যানুসারে এই বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তন্ত্র, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে, তাহা আর এবার উদ্ধৃত করা গেল না। আবশ্যক হইলে পাঠক পাঠিকার জিজ্ঞাসুভাব বুঝিতে পারিলে, বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। এই যে শাস্ত্রকারগণ কুষ্ঠ, যক্ষ্মী রোগী প্রভৃতির সহিত "আলাপাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ" প্রভৃতি বচন দ্বারা সংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাদ্বারাতেও ত বুঝা যায় যে; তাঁহাদিগের কীটাণুতত্ত্ব অবিদিত ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে কিয়দ্দিবসের জন্য (অশৌচ কাল পর্য্যন্ত) যে সেই গৃহ হইতে কেহ দান গ্রহণ করে না, সেই গৃহে কেহ আহার করে না—এমন কি ভিক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা ও বিতরণ করা বন্ধ শবদাহী ও শববাহীর ভিন্নজলাশয়ে স্নান করিয়া গৃহে প্রবেশের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া হাতে, পায়ে, মুখে এবং বক্ষঃস্থলে নিম্বপত্র সংযুক্ত ও অগ্নি স্পর্শ করিবার পদ্ধতি আছে, উত্তপ্ত লৌহ ও উত্তপ্ত শিলাবস্ত হাতে, পায়ে, বুকে ও মুখে স্পর্শ করিবার পদ্ধতি আছে, ইহার মূলেতেও আমরা কীটাণুতত্ত্বের আভাস পাই।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

পঞ্চকর্ম্ম ব্যাপদ্‌ ।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

ডা। এইবার বিবন্ধের কথা বলুন।

ক। দোষ উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়ে নিঃসৃত হ'তে থাকলে যদি রোগী শীতল গৃহে অবস্থান, শীতল জল পান বা শীতল বায়ু সেবন করে অথবা শীতল দ্রব্য শরীরে পরিষেক করে, তা' হলে দোষ সকল স্রোতঃ সমূহে দুর্ব্বল এবং ঘনীভূতভাবে থেকে বায়ু, মূত্র ও পুরীষকে রোধ করে,—বিবন্ধ ব্যাপৎ উৎপন্ন করে। ইহাতে পেটে গুড় গুড় শব্দ, দাহ, জ্বর এবং তীব্র বেদনা হয়ে থাকে। এরূপ স্থলে রোগীকে সত্বর বমন করিয়ে অবস্থা বিবেচনায় চিকিৎসা করবে। দোষ সকল শরীরের অধোভাগে থাকলে সৈন্ধব লবণ; কাঁজি ও গোমূত্র মিশ্রিত ক'রে বিরেচন প্রয়োগ করবে। দোষ অনুসারে আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করবে। আর দোষ ও উভয় মার্গের উপদ্রব লক্ষ্য করে দুগ্ধ, যূষ বা মাংস রস পথ্য দেবে।

ডা। এই বিবন্ধ ব্যাপদে অধোদিকের কথা বলা হ'ল, কিন্তু উর্দ্ধদিকের কথা বলা হল না!

ক। বলা হ'য়েছে বৈ কি।

ডা। কৈ কথন বলা হ'ল?

ক। ম'শায় যদি এতেও না বুঝতে পেরে

থাকেন, তবে শাস্ত্রকার নাচার! প্রথমে বলা হ'য়েছে বমন বিরেচনের ব্যাপদ্ একই। তার পর বলা হ'ল—বিবদ্ধ ব্যাপদে বমন করিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করাবে। তারপর অধোভাগের দোষের চিকিৎসা বলা হ'ল। সুতরাং প্রথমটা যে ঊর্দ্ধভাগের চিকিৎসা সেটা কি বুঝতে বাকী রইল! এতটুকু বিবেচনা শক্তি না থাকলে তার চিকিৎসা করাই বিড়ম্বনা।

ডা। এ দীনহীনের অত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নেই, বিশেষ আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে সব কথা স্পষ্ট করে বলা আছে।

ক। এও তো অস্পষ্ট কিছু নয়, বুদ্ধি থাকলে বেশ স্পষ্ট।

ডা। কিন্তু চিকিৎসার কথা আরও স্পষ্ট ক'রে বলা উচিত।

ক। আরও স্পষ্ট, সে কি রকম? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ের মত? আমরা ইতঃস্তত যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ বলে, পদার্থ তিন প্রকার। চেতন—"

ডা। মাপ করুন মশায়। এখন বস্তি ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। কেননা বমন বিরেচন সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলবার আছে। আপনি হুঁসিয়ার নন ব'লে এ আপত্তি উত্থাপন করেন নি। কিন্তু দেখুন বমন বিরেচন ব্যাপৎ এক সঙ্গে বলা হয়েছে—অথচ নাম বলা হয়েছে পরিকর্ত্তিকা বা গুদপরিকর্ত্তিকা, পরিস্রাব এবং প্রবাহিকা। তা' বমন ব্যাপদে দেহের ঊর্দ্ধ ভাগে প্রবাহিকা প্রভৃতি কি ক'রে হ'বে।

ডা। তাও তো বটে, এখন এর সমস্যা কি বলুন।

ক। এজন্যে ভীত হবেন না, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। বিরেচনে যাহাকে পরিকর্ত্তিকা বা গুদপরিকর্ত্তিকা বলে, বমনের সেইরূপ ব্যাপৎ হ'লে তা'কে কণ্ঠক্ষণম (কণ্ঠদেশ ফুঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা) বলা যায়। শরীরের অধোভাগে যাহার নাম পরিস্রাব, ঊর্দ্ধভাগে তাহার নাম শ্লেষ্ম প্রকোপ (শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া)। অধোভাগে যাহার নাম প্রবাহিকা, শরীরের ঊর্দ্ধভাগে তাহার নাম শুষ্কোদ্গার।

ডা। এখন আপনার বমন বিরেচন ব্যাপদ শেষ হ'ল তো! এইবার বস্তি ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। শেষ যে ঠিক হ'ল তা' নয়। কেননা ভালরূপে বোঝাতে গেলে এর চেয়ে আরও ভাল ক'রে ব'লতে হয় এবং আরও অনেক কথা ব'লতে হয়। সে রকম ভাবে কেন বলিনি সে কথা পরে বলব। এখন ধৈর্য্য ধারণ করে বস্তি ব্যাপদ্ শ্রবণ করুন। কারণ বস্তি ব্যাপদ্ শাস্ত্রে ছেষট্টি (৬৬) প্রকার ব'লে কথিত হয়েছে। তা' ছাড়া স্নেহ প্রত্যাবর্ত্তন না করবার গুটি ছয়েক কারণ আছে।

ডা। আঃ সর্ব্বনাশ!

ক। ভীত হবেন না। ভীত হ'বেন না, ম'শায় অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে বলে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলে অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করতে হয়। তা আপনি যখন সর্ব্বনাশ বলছেন, তখন অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করে বলব।

ডা। সে কি রকম হবে? ছেষট্টি ব্যাপদের মধ্যে তেত্রিশটের বিষয় বলবেন।

ক। না ছেষট্টিটের বিষয়ই বলব, তবে সংক্ষেপে অর্থাৎ অর্দ্ধেক পরিত্যাগ ক'রে।

ডা। আচ্ছা তবে তাই বলুন।

ক। প্রথমে বস্তি ব্যাপদগুলির ভেদ ও নাম বলছি। চলিত, বিবর্ত্তিত, পার্শ্বাবপীড়িত, উৎক্ষিপ্ত, অবসন্ন ও তির্য্যকক্ষিপ্ত এই কয়টী বস্তি নাম বসাইবার দোষ। অতি স্থূল, কর্কশ, অবনত, অনু (ক্ষুদ্রাকার), ভিন্ন (বিদারিত) সন্নিকৃষ্ট কর্ণিক, বিপ্রকৃষ্টকর্ণিক, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম মুখ), অতিচ্ছিদ্র, অতি দীর্ঘ, ও অতি হ্রস্ব এই কয়টী বস্তির নলের দোষ। বহুলতা, অল্পতা, সচ্ছিদ্রতা, প্রস্তীর্ণতা, ও দুর্ব্বলতা এই পাঁচটী বস্তির দোষ। অতি পীড়িততা, শিথিল পীড়িততা, ভূয়োভূয়ঃ অবপীড়ন, ও কালাতিক্রম এই চারিটী পীড়নের (বস্তি টিপিয়া ঔষধ প্রয়োগের) দোষ। আমতা, হীনতা, অতিমাত্রতা, অতিশীততা, অত্যুষ্ণতা, অতি তীক্ষ্ণতা, অতি মৃদুতা, অতি স্নিগ্ধতা, অতি রুক্ষতা, অতিসান্দ্রতা ও অতি দ্রবতা এই এগারটী ঔষধ দ্রব্যের দোষ। অথবা শীর্ষতা (মস্তক নত করিয়া শয়ন), উচ্ছীর্ষতা (মস্তক উন্নত করিয়া শয়ন), ন্যুব্জতা, উত্তানতা, সঙ্কুচিত দেহতা, স্থিততা ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন এই সাত প্রকার শয়ন দোষ। চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ এই চুয়াল্লিশ প্রকার বস্তি ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে। রোগীর নিমিত্ত যে পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদ্ ঘটিয়া থাকে তাহা পরে বলা যাইবে। নেত্র ও বস্তি এই উভয়ের অযোগ, আধ্মান, পরিবর্ত্তিকা, পরিস্রাব, প্রবাহিকা, হৃদয়োপকরণ, অঙ্গোপ্রগ্রহ, অতিযোগ ও জীবাদান এই নয় প্রকার উপসর্গও চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে। সংক্ষেপে এই সাতষট্টি প্রকার ব্যাপদের বিষয় কথিত হইল।

ডা। সর্ব্বনাশ এই সংক্ষেপে! তবে বিস্তার কি?

ক। আপনি বিজ্ঞ চিকিৎসক হ'য়ে এই কথাটা বল্লেন শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি। বিস্তার শাস্ত্রে নেই, চিকিৎসকের স্থির ক'রে নিতে হবে। সংসারে দু'টী মানুষের মুখ যেমন এক রকম দেখা যায় না, তেমনি রোগই থাকুক আর ঔষধ প্রয়োগই বলুন—দু'টী রোগীকে এক রকম দেখা যায় না,—বা দু' জায়গায় ঔষধ প্রয়োগ ক'রে একরকম দেখা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রে যে সাতষট্টি প্রকার বস্তি ব্যাপদের কথা দিগ্‌দর্শন স্বরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা' ছাড়া যে আরও কত রকম ব্যাপৎ ঘ'টতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। সেইজন্যে শাস্ত্রে এরূপ বলা হয়েছে।

ডা। তা' যা' বলেছেন ঠিক। কেবল শাস্ত্রের—অবশ্য আমি আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলছি—উপদেশ শুনে চিকিৎসা করা চলে না। অবস্থা ভেদে নিজের বুদ্ধি বৃত্তির উপর নির্ভর ক'রতে হয়। এটা আবার আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যতটুকু দরকার, আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে তার চেয়ে বেশী দেখছি।

ক। সে জন্যে আমরা শাস্ত্রকারদের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁরা আমাদের উপর এতটা বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছেন ব'লে আপনাদের গৌরবান্বিত বোধ করি। কিন্তু বলতে দুঃখ ও লজ্জায় মরমে মরতে হয়, এখন ঠিক তার উলটো হয়েছে। এখন বংশের মধ্যে যে প্রতিভাহীন, সেই কবিরাজী শেখে, আর যারা প্রতিভাশালী, তারা অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা ক'রে থাকে।

ডাঃ। হাঁ, চিকিৎসা বিদ্যাটা এমনই সোজা বটে। যাক্ সে জন্যে আর দুঃখ ক'রে কি হবে? আপনি তা'রপর কি বলুন।

ক। পূর্ব্বে সাতষট্টি রকম দোষের কথা ব'লেছি, তার মধ্যে স্নেহ প্রত্যাগত অর্থাৎ বস্তি প্রয়োগ করলে ঔষধ ফিরে না আসবার আটটী কারণ আছে। (১) গতাদি ত্রিদোষ দ্বারা অভিভূত হওয়া (২) ভুক্তদ্রব্য দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া, (৩) মলের সহিত মিশ্রিত হওয়া (৪) দেহমধ্যে অধিক দূর-প্রবিষ্ট হওয়া, (৫) স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করা ও অনুষ্ণ ও অল্প আহারকারী ব্যক্তিকে স্বেদ না দেওয়া।

বস্তির নল চলিত বা বিবর্ত্তিত হ'লে গুহ্য দেশে ক্ষত ও বেদনা হয়। ইহাতে খাদ্যাখাদ্যের ন্যায় মধু ঘৃতাদি প্রয়োগ ক'রতে হয়। নল অত্যুৎক্ষিপ্ত (উচ্চদিকে প্রযুক্ত) এবং অবসন্ন (অধোদিকে প্রযুক্ত) হ'লে মলদ্বারে বেদনা হয়। ইহাতে পিত্তনাশকচিকিৎসা এবং স্নেহ পদার্থ সেচন করা উচিত। তির্য্যক্ ভাবে কিম্বা পার্শ্বভাগে নেত্রনল প্রযুক্ত হ'লে মুখ আবৃত থাকায় ঔষধ সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। নল অত্যন্ত স্থূল কর্কশ বা অবনত হ'লে গুহ্যদেশে ক্ষত ও বেদনা হয় এবং পুর্ব্বোক্ত ক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা ক'রতে হয়।

নলের কর্ণিকা বর্ত্তির মুখের খুব নিকটে হলে, নল ভগ্ন হলে অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হ'লে বস্তির ঔষধ বাহির হইয়া পড়ে। নলের কর্ণিকা বৃহৎ এবং নিকটবর্ত্তী হলে মলদ্বার আহত হইয়া রক্তপাত হয়। এরূপ স্থলে পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং পিচ্ছা বস্তি হিতকর। নল হ্রস্ব বা বা নলের ছিদ্র সরু হ'লে বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়, ঔষধ দ্রব্য ফিরিয়া আইসে এবং বস্তি বিঘাত হেতুতে রোগ উৎপন্ন হয়। নল দীর্ঘ এবং খর ও বৃহৎ ছিদ্র বিশিষ্ট হলে অত্যন্ত অবপীড়ন বশতঃ যন্ত্রণা হয়।

বস্তি বিস্তীর্ণ এবং স্থূল হ'লে যেরূপ দোষ হয় সেইরূপ হয়; বস্তি ছোট হলে অল্প ঔষধ ধরে বলে গুণকারী হয় না। বস্তি উত্তমরূপে বাঁধা না হ'লে বা সামান্য ছিদ্রযুক্ত হ'লে, নল ভিন্ন হ'লে যেরূপ দোষ ঘটে—সেইরূপ হয়।

বস্তি অত্যন্ত বল পূর্ব্বক পীড়ন ক'রলে ঔষধ আমাশয়ে গমন করে এবং বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নাক মুখ দিয়া নির্গত হয়। এরূপ ঘটিলে সত্বর গলদেশে পীড়ন, চুল ধরিয়া চালনা করা, তীক্ষ্ণ বিরেচন, তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, শীতল দ্রব্যের পরিসেক করা কর্ত্তব্য। বস্তি আস্তে আস্তে টিপলে ঔষধ পক্কাশয়ে যায় না এবং কোন ফলপ্রদ হয় না। বস্তি বার বার পীড়ন ক'রলে অভ্যন্তরস্থ বায়ু কুপিত হ'য়ে আধ্মান এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। ইহাতে উপযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কাল অতিক্রম করে অর্থাৎ দীর্ঘ কাল ধ'রে বস্তি প্রয়োগ ক'রলে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং রোগ বাড়িয়া যায়। ইহাতে পুনরায় ব্যাধিনাশক বস্তি প্রয়োগ করা উচিত।

আম অর্থাৎ অপক্ক দ্রব্য দ্বারা বস্তি প্রয়োগ ক'রলে মলদ্বারের শোথ এবং উপলেপ হয়। ইহাতে সংশোধন বস্তি ও বিরেচন হিতকর। ঔষধের মাত্রা কম হ'লে কোন বস্তিই কার্য্যকরী হয়ন এবং মাত্রা অধিক হ'লে আনাহ (মল মূত্রের বদ্ধতা এবং অতিসার জন্মে। ঔষধ অত্যন্ত মৃদু বা শীতল হ'লে বায়ুর বিবন্ধ ও আধ্মান হয়। এই সকল অবস্থায় বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অত্যন্ত স্নিগ্ধ বস্তি জড়তাকারক এবং অত্যন্ত রুক্ষ এবং অতি রুক্ষ স্নিগ্ধ বস্তি প্রয়োগ ক'রে প্রতীকার করতে হয়।

রোগীর মস্তক অবনত রেখে বস্তিপ্রয়োগ

করলে বস্তি অতি পীড়ন করার ন্যায় দোষ হয়। মস্তক উন্নত রেখে বস্তি প্রয়োগ করলেও দোষ ঘটে। ইহাতে স্বেদ প্রয়োগ ক'রে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী ন্যুজভাবে থেকে বস্তি গ্রহণ ক'রলে ঔষধ পক্বাশয়ে না গিয়া অন্যদিকে যায়, তাহাতে হৃদয় ও মলদ্বারের বেদনা এবং কোষ্ঠে বায়ু কুপিত হয়। রোগী চিৎ হয়ে বস্তি লইলে পথ আবৃত থাকায় বস্তি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং অভ্যন্তরস্থিত বায়ু কুপিত হয়।

দেহ বা উরুদেশ সঙ্কুচিত থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করলে বায়ু কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া বস্তি প্রত্যাগত হইয়া থাকে। রোগী উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে উহা সত্বর প্রত্যাগত হয় এবং আশয় সকল অর্পিত না হওয়ায় কোনই ফল হয় না। দক্ষিণ ভাগে শুইয়া বস্তি গ্রহণ করিলে তাহা পক্বাশয়ে প্রবেশ করে না। ন্যুব্জাদি অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

স্বেদে বস্তির ঔষধ অনুষ্ণ ও অল্প হ'লে তাহাতে বিষ্টম্ভ আধ্মান ও শূল উৎপন্ন করে। ইহাকে অযোগ ব্যাপদকর। এরূপ অবস্থায় তীক্ষ্ণ বস্তি ও তীক্ষ্ণ বিরেচক প্রয়োগ করা হিতকর। ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হ'লে, আহারের পরে, দোষ থাকা সত্বে যদি অল্প উষ্ণ ও প্রচুর ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, অথবা অনুষ্ণ অতি লবণ সংযুক্ত প্রচুর স্নেহ প্রয়োগ করা যায়, কিম্বা যদি উদরে বহু মল থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তা হলে আধ্মান, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে শূলবদ্ বেদনা উৎপন্ন হয়, এরূপ অবস্থায় তীক্ষ্ণ বস্তি এবং অনুবাসন হিতকর। অতি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ লবণ যুক্ত বা রুক্ষ বস্তি প্রয়োগ ক'রলে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হয়ে পরিকর্ত্তিকা রোগ উৎপন্ন করে এবং নাভি, বস্তি ও মলদ্বারে ছেদন করার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগ করা হিতকর। তীক্ষ্ণ বস্তি বহুবিধ রোগ উৎপন্ন করে এবং ইহাতে অঙ্গের অবসাদ, পিত্ত নির্গমন ও মল দ্বারে দাহ হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের বস্তি হিতকর। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করলে প্রবাহিকা উৎপন্ন হয় এবং দাহ ও শূল সহিত মল ও রক্ত নিঃসরণ হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি দুগ্ধের সহিত পথ্যে ভোজন করা, এবং মধুর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা তৈলের অনুবাসন হিতকর। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা নিরূহ অনুবাসন প্রয়োগ ক'রলে হৃদয়োপসরণ ব্যাপদ্ ঘটে এবং অঙ্গের পীড়া, মত্ততা, শরীরের গুরুতা এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে, ইহাতে সর্ব্বদোষ নাশক শোষণ বস্তি প্রয়োগ করা উচিত। রুক্ষ বায়ুযুক্ত এবং অপ্রশস্ত ভাবে শায়িত ব্যক্তিকে রুক্ষ, মৃদু এবং অল্প ঔষধ প্রয়োগ কর'লে অঙ্গের অবসন্নতা, শরীরের স্তব্ধতা, হাই উঠা, বেষ্টনবৎ পীড়া, কম্প ও সন্ধি ও স্কন্ধে ভেদবৎ যন্ত্রণা হ'য়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় স্বেদ অভ্যঙ্গ ও বস্তি ক্রিয়া হিতকর।

অত্যন্ত উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও বহু পরিমিত বস্তি অতি স্বেদিত বা অল্পদোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক'রলে বস্তির অতিযোগ হয়। এরূপ অবস্থায় বিরেচনের অতিযোগের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য এবং শীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ হিতকর। অতিযোগের ফলে জীবরক্ত নির্গত হ'লে বিরেচনোক্ত জীবাদানব্যাপদের ন্যায়

চিকিৎসা করবে এবং রক্ত মিশ্রিত পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগ ক'রবে।

ডা। এই কি আপনার ব্যাপদ বলা শেষ হল ?

ক। মোটামুটি সব বলা হ'য়েছে। কেবল যে পনর রকম ব্যাপদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন।

অত্যন্ত ক্রোধ হ'লে পিত্ত কুপিত হয়ে পিত্ততা রোগ উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শোক বশতঃ পিত্ত কুপিত হ'য়ে মত্ততা মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন করে। মৈথুন সেবন ক'রলে আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, অঙ্গবেদনা, গুহ্যদেশে শোথ, কাস ও রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব উপসর্গ ঘটে। দিবসে নিদ্রা গেলে প্লীহা, প্রতিশ্যায়. পাণ্ডুরোগ, জ্বর, মোহ, অবসাদ, অপরিপাক প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে। তমোগুণ বৃদ্ধি হ'লে নিদ্রা অধিক হয়। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলায় বায়ু কুপিত হ'য়ে মস্তকে বেদনা, দেহের জড়তা, ঘ্রাণশক্তির হ্রাস, বধিরতা, মূকতা, চোয়ালের শিথিলতা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগ, অর্দ্দিত রোগ, নেত্রস্তম্ভ, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, নিদ্রানাশ, দন্ত চালন প্রভৃতি রোগ জন্মায়, যানে ভ্রমণ ক'রলে বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অঙ্গবেদনা ইন্দ্রিয়বিভ্রম ও ক্লান্তি জন্মায়। অধিক সময় উপবিষ্ট থাকলে বা স্নান ক'রলে কটিদেশে বেদনা হয়। অতিরিক্ত সংক্রমণ (পাইচারি করলে) বায়ু কুপিত হয়ে জঙ্ঘায় বেদনা জন্মায়, অথবা শকথির শুষ্কতা, শোথ ও পাদ হর্ষ উৎপন্ন করে। শীতল দ্রব্য সম্ভোগ বা শীতল জলে পানাদি ক'রলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়ে অঙ্গ বেদনা, বিষ্টম্ভ, শূল, আধ্মান ও কম্প জন্মায়। বায়ু ও আতপ সেবন ক'রলে শরীরের বিবর্ণতা ও জ্বর হয়। বিরুদ্ধ ভোজন বা পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হ'তে ভোজন ক'রলে ঘোর ব্যাধি বা মৃত্যু হয়। অসাত্ম্য দ্রব্য ভোজন ক'রলে বল ও বর্ণের হানি হয়। সেইজন্য বস্তি প্রয়োগের পর এই সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ।

ডা। এইবার সব বলা হয়েছে ত ?

ক। সব আর ব'লেছি কৈ, মোটামুটি বলেছি। বমন, বিরেচন ও বস্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে, প্রয়োগের পর আহারাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক নিয়ম আছে। তা'রপর যোগ অর্থাৎ ওষুদ সম্বন্ধে ত কিছুই বলা হয়নি। ধূম নস্যাদির বিষয়ও সংক্ষেপে ব'লেছি। ব্যাপারটা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আপনার যা'তে মোটামুটি একটা ধারণা হয় এই উদ্দেশ্য। সূক্ষ্মভাবে পঞ্চকর্ম্মের বিষয় বল'তে হ'লে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে। এখন পঞ্চকর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কি বলুন।

ডা। পঞ্চকর্ম্ম যে একটা খুব ভাল জিনিষ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর বিরাট ব্যাপার। সমস্ত পঞ্চকর্ম্ম যদি একজনের শরীরে করা যায়, তা হলে শরীর নূতন হ'য়ে যায়। এর পর কুটী প্রবেশ ক'রে রসায়ন সেবন করলে সে লোক যে দীর্ঘজীবি হবে, নীরোগ হবে, মেধাবী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এখন চিত্রিত দীপের ন্যায় হয়ে পড়েছে। আলো নেই—অন্ধকার।

ক। সে কথা ত আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি। আমাদের যা' ছিল তার কিছুই নেই। আছে কেবল বৃথা অভিমান। পঞ্চকর্ম্মের আবার যদি কখন পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তা'হ'লে আয়ুর্ব্বেদের নিকট অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র নিতান্ত হীন হয়ে পড়বে।

পঞ্চকর্ম্ম সমাপ্ত।

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা।

——:০:——

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

যাহাতে কালে আহারে রুচি হয় সেইজন্য অল্পকালে রোগীকে দন্তধাবন করাইবে। রোগীর মুখে যেরূপ রস থাকে—তাহার বিপরীত রস যুক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা রোগীর প্রিয় বস্তুর দ্বারা দন্তধাবন করাইতে হয়। অথবা বৃক্ষ শাখার অগ্রভাগ (দাঁতন) দ্বারা দন্ত ধাবন করিয়া বার বার মুখ ধৌত করিবে। ইহাতে মুখের বিরসতা নষ্ট হয়, অন্ন পানে আকাঙ্ক্ষা হয় এবং খাদ্যদ্রব্যের রসের আস্বাদন পাওয়া যায়।

এক্ষণে জ্বরের চিকিৎসার বিষয় বলা হইতেছে। কিন্তু জ্বরের বিস্তারিত চিকিৎসা এবং ঔষধের উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল জ্বর চিকিৎসার মূল সূত্রগুলির আলোচনা করা যাইবে।

জ্বর ও আমাশয়ে বহু দোষের অবস্থান হেতু বমন থাকিলে প্রথমেই বমন করান কর্ত্তব্য। কিন্তু বমন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। চরকে কথিত হইয়াছে যে "আমাশয় রোগ কফ প্রধান ও বহির্গমনোন্মুখের বমনেচ্ছা দ্বারা ইহা অনুমান করা যায়। দোষ সকল থাকিলে বমনের উপযুক্ত ব্যক্তিকে যুক্তি পূর্ব্বক বমন করাইবে। কিন্তু দোষসকল বহির্গমনোন্মুখ না হইলে যগুপি রোগীকে বমন করান যায়—তাহা হইলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ, (মল মূত্রের বদ্ধতা) মোহ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। বাগভট বলেন সন্তর্পণ (অতিরিক্ত আহার জনিত) জ্বরে এবং আহার করিবার পর জ্বর হইলে বমন করান হিতকর। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখিতে হইবে যে, রোগী বমনের যোগ্য কি না।

তিমির নামক চক্ষুঃরোগগ্রস্ত, গুল্ম, পাণ্ডু বা উদর রোগগ্রস্ত স্থূলব্যক্তি, ক্ষত, ক্ষীণ, অতিকৃশ, অতিবৃদ্ধ, অর্শ, অর্দ্দিত বা আক্ষেপক রোগযুক্ত রুক্ষ ব্যক্তি, প্রমেহ রোগী, তরুণগর্ভা, উর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তি এবং অত্যন্ত মল বদ্ধতাযুক্ত ব্যক্তি বমনের অযোগ্য। কিন্তু ইহারা যদি অতিরিক্ত কফ পীড়িত হয় তাহা হইলে যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইয়া বমন করান যাইতে পারে।

সাধারণতঃ নবজ্বরে বিরেচন নিষিদ্ধ হলেও অবস্থা বিবেচনায় বিরেচন করাইবার নিয়ম আছে। চরকে কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে যন্ত্রণা থাকিলে পেয়ার সহিত কিসমিস, পিঁপুল, শুঠ প্রভৃতি সারক দ্রব্য পাক করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। ইহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে :—

"কোষ্ঠগত পক্কমল স্রোতে বিবদ্ধ থাকিলে যাহার অল্পকাল জ্বর হইয়াছে তাহাকেও বিরেচন প্রদান করিবে। কারণ পক্কমল নিঃসরিত না হইয়া শরীরে থাকিলে মহান অনিষ্ট করিতে পারে, বিষম জ্বর জন্মাইতে পারে এবং বল ক্ষয় করে। বিরেচন ব্যতীত

স্থশ্রুতে বর্ত্তি প্রয়োগ করিয়া নিঃসরিত করিবারও উপদেশ আছে।

স্থশ্রুতের মতে দোষ নিঃসরণ জন্ম প্রথমে বমন, পরে আস্থাপন, পরে বিরেচন, পরে শিরোবিরেচন অর্থাৎ মস্তক হইতে দোষ নিঃসরণ নস্ত দিবার বিধি আছে। শ্লেষ্ম জ্বর গ্রস্ত বলবান রোগীকে বমন, পিত্তজ্বরে বিরেচন এবং মল মূত্রের বিবদ্ধতাযুক্ত বাতিক জ্বরে নিরূহ প্রশস্ত। মস্তকের গুরুতা ও যন্ত্রণা থাকিলে শিরোবিরেচন হিতকর।

ছর্ব্বল জ্বর রোগীর উদরাধ্মান, পেটফোলা এবং উদরে যন্ত্রণা থাকিলে, দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে এবং ঐ সকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

নবজ্বরে এই সকল ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। পথ্য প্রয়োগের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমজ্বরের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সেই সকল লক্ষণ বলার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"আমজ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ আমদোষ থাকিতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর প্রবলতর হইয়া থাকে।

অপিচ—

তরুণ জ্বরে—কষায় প্রয়োগ করিলে দোষ সকল পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া স্তম্ভিত হয় এবং সেই স্তম্ভিত দোষ বিষম জ্বর উৎপন্ন করে।

এই সকল বচনের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে রোগ জন্মিবামাত্র ঔষধ দেওয়া হয় না। আজকাল সাতদিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া চলে না। ইতি মধ্যে অনেক রোগীরই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা—ইত্যাদি। এই বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদ মতে নবজ্বরে ঔষধ দেওয়া হয় না—একথা ঠিক নহে। কারণ তরুণ জ্বরে মুখ্য ঔষধ দেওয়া নিষিদ্ধ হইলেও "ষড়ঙ্গ পানীয়" এবং পেয়াদির সহিত সিদ্ধ করিয়া ঔষধ দিবার বিধি আছে। ঐ সকল ঔষধ ও পথ্য জ্বরনাশক, দোষপাচক, সারক, ঘর্ম্ম নিঃসরক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। স্থতরাং সে জ্বরে ঔষধ দিবার নিয়ম নাই, ইহা প্রকৃত নহে। স্থশ্রুত বলিয়াছেন :—

"কেহ কেহ বলেন যে সাত রাত্রি দিনের পর ঔষধ দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন যে দশ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। জ্বর অল্প কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও ঔষধ দেওয়া যায়। দোষের পরিপাক পাইলে যে রোগীর অল্পকাল জ্বর হইয়াছে—তাহাকেও ঔষধ দেওয়া যায়।"

এই ত গেল বৈদিক ঔষধের কথা। তারপর বিবিধ ধাতু, উপধাতু, পারদ ও অমৃত ঘটিত তান্ত্রিক ঔষধ নবজ্বরে প্রয়োগ করার বিধি আছে। ডাক্তারেরা প্রথম অবস্থায় যেরূপ জ্বরবিচ্ছেদকারক ঔষধ দেন, আয়ুর্ব্বেদের ষড়ঙ্গ পানীয়, পেয়াসহ সিদ্ধ ঔষধ এবং তান্ত্রিক ঔষধ গুলিও সেইরূপ। ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ জ্বরবিচ্ছেদকারক একোনাইট—তন্ত্রোক্ত হিঙ্গুলেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় রস, জয়াবটী, জয়ন্তী বটী, স্বচ্ছন্দ ভৈরব প্রভৃতি। স্থতরাং আয়ুর্ব্বেদ মতে নবজ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিয়ম নাই একথা বলা যায় না।

"ষড়ঙ্গ পানীয়" জ্বরের প্রথম হইতেই দেওয়া যায় বটে কিন্তু পেয়ার সহিত সিদ্ধ ঔষধ লঙ্ঘনের পর দিতে হয় বলিয়া ২।৩ বা ৪

দিনের পরে ঐ সকল ঔষধ দেওয়া যায়। সাত দিন ঔষধ দিবার নিয়ম নাই—একথা না বলিয়া বরং ২।৩ দিন বলিলে কতকটা সঙ্গত হইতে পারে। কারণ তান্ত্রিক ঔষধ সকলও বিপদের আশঙ্কা না বুঝিলে কোন চিকিৎসকই ২।৩ দিন পরে নহিলে প্রয়োগ করেন না। "কেবল ষড়ঙ্গ পানীয়" জ্বরের প্রথম হইতে দিয়া থাকেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে,—দুই দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম আছে—ইহা হিতকর কি অহিত কর? অনেক সময় ২।৩ দিন না দেখিলে রোগের স্বরূপই নির্ণয় হয় না। বসন্ত রোগের প্রারম্ভে ২।৩ দিন প্রবল জ্বর হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে রোগীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক পশ্চাৎ জ্ঞান পূর্ব্বং
সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ—প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিবে, পরে ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে, পরে বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

দুই তিন দিন রোগের গতি, বল এবং অগ্নিবল, রোগীর অবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ দেওয়াই যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা—তাহা বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। রোগ—বুঝি আর নাই বুঝি, রোগী দেখিয়াই কতকগুলা ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সময় রোগীর অনিষ্ট করিয়া থাকি।

কেহ বলিতে পারেন যে, এই ২।৩ দিনেই হয়ত রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। যদি সেই-রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, যদি দুই এক দিনেই রোগীর নাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে দেখি, তাহা হইলে কি আমরা সাত দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব? না কোন চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিতে পারে? নাড়ী ছাড়িতে দেখিলে আমরা তখনই মৃগনাভি-মকরধ্বজ প্রয়োগ করিতে বাধ্য। নবজ্বর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ী ছাড়ে না বলিয়া শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ হইয়াছে।

অপর কেহ বলিতে পারেন যে, ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়ার ফলে হয়ত রোগ মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া যে ভাল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস যে, ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দিলে যতগুলি রোগ মারাত্মক হইতে পারে, ২।৩ দিন অপেক্ষা না করিয়া ঔষধ দিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে। অপিচ প্রথম হইতেই যে সকল রোগের কঠিন উপসর্গ উপস্থিত হয়—আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারের উপায় বলা হইয়াছে। যেমন সন্নিপাত জ্বর। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

লঙ্ঘণং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনস্তথা।
অবলেহো অঞ্জনায় অযোগ্যং ত্রিদোষজে॥

অনুবাদ:—সন্নিপাত জ্বরের প্রথমেই লঙ্ঘন, বালুকা, স্বেদ, নস্য নিষ্ঠীবন, অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

নিষ্ঠীবন:—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ আদার রসে আপ্লুত করিয়া মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। ইহাতে হৃদয়, মন্যা (ঘাড়) পার্শ্ব, মস্তক ও পাদদেশের শুষ্ক শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া

যায়. শরীর লঘু হয় এবং পর্ব্ব সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, গাত্র বেদনা, মূর্চ্ছা, কাস, গলদেশের রোগ, মুখ ও চক্ষুর গুরুতা, জড়তা, ও বমন ভাব নষ্ট হয়। দোষের বলাবল বুঝিয়া দুই তিন বা চারি বার নিষ্ঠীবন প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা সন্নিপাত জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নস্য—(১) সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিট লবণ, আদার রস ও ছোলঙ্গ লেবুর রসে আপ্লুত এবং উষ্ণ করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সংহতশ্লেষ্মা ভিন্ন হইয়া উঠিয়া যায় এবং মস্তক, হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ, ও পার্শ্বদেশের যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

(২) মৌলের সার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল বাটিয়া উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে অচৈতন্য রোগী সংজ্ঞা লাভ করে।

(৩) সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় বাটিয়া ছাগমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য দিলে তন্দ্রা নিবারিত হয়।

অঞ্জন—শিরীষ বীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, রসোন, মনঃশিলা ও বচ—গোমূত্র সহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে রোগী চৈতন্য লাভ করে।

অবলেহ—কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, দুরালভা ও সা জীরা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত অব-লেহ করিতে দিবে। কিন্তু স্বেদাদি প্রয়োগ রূপ উষ্ণ ক্রিয়া করা হইলে, মধুর পরিবর্ত্তে আদার রস সহ অবলেহ প্রস্তুত করিতে হয়। কারণ মধু উষ্ণের বিরোধী। এই অবলেহ অষ্টাঙ্গাবলেহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রয়োগে সুদারুণ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস ও কণ্ঠরোগ নিবৃত্তি পায়।

উপরোক্ত যোগ সকল দ্বারা সন্নিপাতের প্রবল উপসর্গ সকল, যথা ফুসফুস কণ্ঠাদির শ্লেষ্মপূর্ণতা, সংজ্ঞা নাশ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

স্বেদ—সন্নিপাতে মনুষ্যের দেহ জলময় হয় বলিয়া অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহার শান্তি হয় না। এইজন্য সন্নিপাত জ্বরে মুহুর্মুহু স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। সন্নিপাতজ্বরে সবিষ এবং নির্ব্বিষ নানাপ্রকার ঔষধ আছে বটে, কিন্তু অগ্নির তাপ ব্যতিরেকে তাহারা প্রায়ই স্ব স্ব বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না।

সন্নিপাতের অন্যান্য উপসর্গগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে শাস্ত্রে সুন্দর উপদেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের বিষয় লিখিত হইল না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

মৃত্যুনা সহ যোদ্ধবং সন্নিপাত চিকিৎসতা। অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসায় মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়।

অনেকের বিশ্বাস যে, সন্নিপাতজ্বরে আয়ুর্ব্বেদে কেবল উষ্ণ প্রয়োগেরই বিধি আছে, শৈত্য প্রয়োগের বিধি নাই। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। উষ্ণ জ্বরে শৈত্য প্রয়োগ এবং শীত জ্বরে উষ্ণ প্রয়োগের বিধি আছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদ সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য। কিন্তু আমরা স্থূলবুদ্ধি বলিয়া একেবারে "হাতে হেতেড়ে।" বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারি না।

শাস্ত্রে যে তন্ত্রযুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বাক্যযোজনা এবং অর্থযোজনার সহায়তা করিয়া থাকে বলা হইয়াছে যে, শরীর জলময় হইলে অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত তাহার শান্তি হয় না। এই বাক্যের বিপর্য্যয়ে বুঝা যাইতেছে যে, শরীর অগ্নিময় হইলে শৈত্য বা জল ব্যতীত তাহার শান্তি হয় না। কিন্তু

পিত্তপ্রধান বা দাহ জ্বরে অথবা যে জ্বরে রোগীর শরীরে উত্তাপের অধিক্য হয়, সেই সকল জ্বরে শৈত্য ক্রিয়া করিবার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

নবজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে বমন বিরেচন, লঙ্ঘন, মণ্ডাদি প্রয়োগ, পানার্থ জল প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় বলা হইয়াছে। এক্ষণে জ্বরে অন্যান্য যে সকল সদুপদেশ আছে, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

দাহ ও তৃষ্ণা উপসর্গযুক্ত বাতপিত্তপ্রধান জ্বরের নিরাম-অবস্থায় দোষসকল বদ্ধই হউক বা স্থানচ্যুতই হউক, ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ প্রয়োগ করিয়া জ্বর নাশ করিবে। ইহাই সুশ্রুতের আদেশ।

পূর্ব্ব কথিত ক্রিয়া সকলের দ্বারা জ্বর নষ্ট না হইলে এবং বল মাংস ক্ষীণ না হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিয়া জ্বর প্রশমন করিবে। কিন্তু জ্বররোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তাহার পক্ষে বমন বা বিরেচন হিতকর নহে। এরূপ অবস্থায় ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া অথবা নিরূহ (Enema) প্রয়োগ করিয়া মল নিঃসারিত করিবে।

শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যাহার জ্বর প্রশমিত না হয়, তাহার জ্বর রক্তাশ্রয়ী বলিয়া জানিবে, এই অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ দ্বারা জ্বরের শান্তি হয়।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন, গুরুপাক অন্ন, স্ত্রী সংবাস ক্রোধ, শরীরে বাতাস লাগান, পরিশ্রম এবং কষায়রস পরিত্যাগ করিবে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময়ে কুপথ্যও সুপথ্য হইয়া থাকে। মনে করুন কোন জ্বর রোগীর উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন আদৌ নিদ্রা না হইবার পর চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে যদি দিবাভাগে নিদ্রাকর্ষণ হয়, তাহা হইলে দিবানিদ্রা নিষেধ করা চলে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীর্ণজ্বরে বলকর ও পুষ্টিকর পথ্য প্রয়োগ করিবে। পুরাতন জ্বরে কফ ও পিত্তের ক্ষীণতা ঘটিলে এবং অগ্নি প্রবল থাকিলে রুক্ষ ও বদ্ধপুরীষ ব্যক্তিকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

মস্তকের যন্ত্রণা ও গুরুতা এবং ইন্দ্রিয় সকলের বিবদ্ধতা থাকিলে শিরোবিরেচন নস্য-বিশেষ প্রদান করিবে। ইহাতে অরুচিও নষ্ট হয়।

সর্ব্ব প্রকার জীর্ণ জ্বর দুগ্ধ দ্বারা প্রশমিত হয়। অতএব উপযুক্ত ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ উষ্ণ বা শীতল অবস্থায় পান করিতে দিবে।

জীর্ণজ্বরে শীত এবং উষ্ণ বিভাগ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক উষ্ণ বা শীতল অভ্যঙ্গ, প্রলেপ বা স্নেহযুক্ত অবগাহন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে বহির্ম্মার্গগত জ্বর শীঘ্র প্রশমিত হয় এবং অঙ্গসুখ বল ও বর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যে সকল জীর্ণজ্বররোগীর চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা সেই সকল জ্বরের শান্তি হয়।

বাত প্রধান বিষম জ্বর ঔষধ সহ সিদ্ধ ঘৃতপান, বস্তি প্রয়োগ ও উষ্ণ অন্ন পান দ্বারা প্রশমিত হয়। পিত্ত প্রধান বিষম জ্বরে বিরেচন ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত পান, এবং তিক্ত ও শীত বীর্য্য দ্রব্য দ্বারা প্রশমিত হয়। কফ প্রধান বিষম জ্বরে বমন, পাচন রুক্ষ অন্নপান, লঙ্ঘন, এবং উষ্ণ বীর্য, দ্রব্য প্রয়োগে প্রশমিত হয়।

উন্মাদ প্রভৃতি মানসিক রোগে যে সকল ধূম, ধূপ নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবার বিধি

আছে, বিষম জ্বরেও সেই সকল প্রয়োজ্য। দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ব্যাঘ্রের বসা তিল এবং হিঙ্গু সম ভাগে লইয়া সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে অথবা পুরাতন ঘৃত, সিংহের চর্ব্বি ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। সৈন্ধব, পিঁপুলের দানা, ও মনঃশিলা তিল তৈলসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। গুগগুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী শ্বেত সর্ষপ, যব ও ঘৃত একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। অভিঘাত জ্বর অর্থাৎ পতন আঘাত প্রাপ্তি জনিত জ্বরে ঘৃত পান ও ঘৃত মর্দ্দন, আহত স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ এবং রুচিকর ও হিতকর মাংস বসা সেবন দ্বারা প্রশমিত হয়। অতিরিক্ত মদ্য পান বশতঃ মদ্যসাত্ম্য ব্যক্তির জ্বর হইলে উপযুক্ত মাত্রায় মদ্য এবং সাত্ম্য রস সেবনে প্রশমিত হয়। ক্ষত ও ব্রণরোগ গ্রস্ত ব্যক্তির জ্বর—ক্ষত ও ব্রণরোগের চিকিৎসার দ্বারা ভাল হয়।

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তস্থ হইলে সেক, প্রলেপ ও দোষনাশক ঔষধ, মাংস মেদস্থিত হইলে বিরেচন ও উপবাস এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

কাম, শোক ও ভয় জনিত জ্বর আশ্বাস বাক্য, প্রার্থিত বস্তু লাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষোৎপাদন দ্বারা প্রশমিত হয়। ক্রোধ জনিত জ্বর প্রার্থিত ও মনোজ্ঞ বস্তু, পিত্তনাশক চিকিৎসা এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা প্রয়োগে এবং ক্রোধ জনিত জ্বরে এবং কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন করিলে ভয় ও শোক জনিত জ্বর প্রশমিত হয়।

মনের একটী বেগ যে অপর একটী বেগের দ্বারা আশ্চর্য্য রূপে নিবৃত্ত হয় এ সম্বন্ধে বহু-প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বিষ্ণুপুরের জনৈক রাজা একটী অত্যন্ত উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভ নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে—এমন সময়ে রাজা তাহা দেখিবার ইচ্ছায় রাজমিস্ত্রীরা যে বাঁশের সিঁড়ি দিয়া উঠিত—সেই সিঁড়ি দিয়া স্তম্ভের উপরে উঠেন। স্তম্ভের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা ভয়ে এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, কোনক্রমেই নামিতে পারেন না। অমাত্য বর্গ এবং অন্যান্য লোকের মতে আশ্বাস বাক্যেও রাজার ভয় দূর হইল না। রাজাকে নামাইবার অন্য কোন উপায়ও দেখা গেল না। তখন একজন রাজমিস্ত্রী বলিল, আমি রাজাকে নামাইতেছি, কিন্তু আপনারা আমাকে রক্ষা করিবেন। এইরূপ বলিয়া রাজমিস্ত্রী স্তম্ভের উপরে উঠিয়া বলিল, মহারাজ। আমি যেমন করিয়া নামি, আপনিও তেমনি করিয়া নামুন। রাজা বলিলেন,—না, আমি নামিতে পারিব না। তখনরাজমিস্ত্রী বলিল—উঠেছিলেন কেন? এই কথা শুনিয়া রাজার' ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি পলায়নপর রাজমিস্ত্রীর পশ্চাদানুসরণ করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। এক্ষেত্রে ক্রোধ উৎপাদন দ্বারা ভয়ের উপশম করা হইয়াছিল।

জ্বরের বেগ কাল অর্থাৎ অমুক সময়ে আমার জ্বর আসিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া যাহার জ্বর হয়, বিবিধ ইষ্ট বস্তু এবং বিচিত্র বিষয় দ্বারা তাহার স্মৃতি নষ্ট করিবে অর্থাৎ সে যাহাতে জ্বর আসার কথা না ভাবে এরূপে ভুলাইয়া রাখিবে।

জ্বরযুক্ত বা জ্বর মুক্ত ব্যক্তির বিদাহী যোগ থাইলে অম্ল হয়, গুরু অহিতকর ও বিরুদ্ধ

অন্নপান, স্ত্রীসংসর্গ অতিচেষ্টা, স্নান ও অতিরিক্ত ভোজন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ করিলে জ্বরের উপশম হয় এবং জ্বরের পুনরাগমন হয় না। জ্বর প্রশমিত হইলেও যদি অরুচি, শরীরের অবসন্নতা, শরীর ও মনের বিবর্ণতা থাকে, তাহা হইলে জ্বর পুনরাগমনের ভয়ে শোধন ক্রিয়া—যেমন বিরেচনাদি করিবে। জ্বর দ্বারা কৃশ ব্যক্তিকে সহসা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য দিবে না, কেননা অগ্নি দূষিত হইয়া পুনরায় জ্বর হইতে পারে।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন বলবান না হয়—ততদিন ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ। কেননা বলবান না হইয়া ঐ সকল সেবন করিলে জ্বর পুনরাগমন করে। যে জ্বরিত ব্যক্তি বহুকাল জ্বরভোগ করিয়া ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও দীন চিত্ত হয় সে ব্যক্তির পুনরায় জ্বর হইলে অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অথবা বিনষ্ট না হইলেও কৃশতা, শোষ, গ্লানি, পাণ্ডুতা অরুচি, উৎকোট (গাত্রে চাকা চাকা দাগ) পিড়কা, অগ্নিদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

পুনরাগত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান প্রশস্ত। গুরু অভিষ্যন্দী ও অসাত্ম্যভোজন হেতু জ্বর পুনরাবর্ত্তন করিলে নবজ্বরের ন্যায় লঙ্ঘন ও উষ্ণ উপচার প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিত ধাতুর অর্থ রোগাপনয়ন এবং এই ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং যদ্দ্বারা রোগাপনয়ন হয়—তাহাকে চিকিৎসা বলে। এইজন্য পথ্যও চিকিৎসার অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু আমরা পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ পথ্য ও চিকিৎসা পৃথক বলিয়াছি।

আবার "পথি" হইতে পথ্য শব্দের উৎপত্তি। পথি—হিতম অর্থাৎ রোগীর পক্ষে যাহা কিছু হিতকর তাহাই পথ্য শব্দ বাচ্য।

সমাপ্ত।

শ্রী—বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

তখন সকলেরই মুখমণ্ডল শুষ্ক, কণ্ঠ নীরস হইয়া উঠে,—অতি বড় সাহসীরও বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে ফুস্‌ফুস্ সঙ্কারিত হইয়া যদি তাহার এক অংশ অপর অংশের উপর উঠিয়া পড়ে, তাহা হইলে কাহারো আর জীবনের আশা থাকে না। দুই একবার ভেদ বমি হইতে না হইতেই জীবনের লীলা শেষ হইয়া যায়। একমাত্র ভয় হইতেই এরূপ ঘটনার উপস্থিতি ঘটে। ফলতঃ ভয় হইতে যে কোন রোগের উদ্ভব হউক না কেন, তাহা প্রায়শঃ দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে।

আবার সময় সময় এরূপও দেখা যায় যে, গ্রামের মধ্যে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রকোপ

হইলে যদি কোন ব্যক্তির কণ্ঠ শুষ্ক, ওষ্ঠ নীরস এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণযুক্ত হয়, তবে তাহাকে আর অধিক কাল ইহজগতে বাস ত হয় না, অথচ সেই হতভাগ্য তখনো পর্য্যন্তও জানে না, অথবা তাহার আত্মীয় স্বজনেও বুঝিতে পারে না যে, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহাকে কীদৃশ অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় দুই একবার ভেদ বমি হইতে না হইতে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর সংসারের খেলার অবসান ঘটে। ওলাউঠার ঘোরতর আক্রমণকালে যখন পল্লীমধ্যে হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হইতে থাকে, তখন বায়ুর আধিক্য, মনের চাঞ্চল্য এবং ফুস্ফুস্ বা হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বশতঃ প্রথমেই বমন আরম্ভ হয়। হয় তো সেই বমি হইতেই রোগীর আকস্মিক জীবনান্ত হইয়া থাকে। তাহার আর ভেদ হইবার অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হয় না।

অজ্ঞানতা বশতঃ অনেকে অনেক সময় কাহারও অতিরিক্ত দাস্ত হইতে দেখিলে অমনি অহিফেন্ বা অহিফেন সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসেন। ইহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। অহিফেনের পরিবর্ত্তে যদি কর্পূর সম্পর্কিত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। অহিফেনে যে অনিষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহার সংশোধনের কোন উপায়ই আর থাকে না। আমরা নিদানতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, অতিসার রোগেও তাহার অধিকাংশ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। কোনটি অতিসার, কোনটী বিসূচিকা রোগের প্রথম আক্রমণ—ইহা নির্ণয় করা একটু কঠিন ব্যাপার। চিকিৎসকদিগকেও এই রোগ নিরূপণ কালে অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

অহিফেন—মূত্রশোষক এবং ইহা দ্বারা মূত্র যন্ত্রও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অতিসার রোগে অতিরিক্ত মল নিঃসরণ এবং শরীরস্থ জলীয়াংশের শোষণ হয় বলিয়াই মূত্ররোধ হয়। কিন্তু মূত্রযন্ত্র কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় অহিফেন প্রয়োগ করিলে দ্রব্যপ্রভাবে মূত্রযন্ত্রের আংশিক বিকৃতি বা অধিক পরিমাণে মূত্রশোষণ ঘটিলেও ঔষধ দ্বারা তাহা আনয়ন করা বড় কঠিন হয় না। কিন্তু বিসূচিকা রোগের ব্যাধিপ্রভাবেই মূত্র যন্ত্রের সঙ্কোচন এবং মূত্রের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পর অহিফেন প্রয়োগ করিলে মূত্রসঙ্কোচনের এবং মূত্রক্ষয়ের সহায়তাই হইতে থাকে, সুতরাং সে দোষ সংশোধন করিবার আর কোন উপায়ই হইতে পারে না। এ অবস্থায় মূত্ররোধ বা মূত্রক্ষয় বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অতিসার বা বিসূচিকা—যে রোগই হউক না কেন, প্রথমাবস্থায় যদি কর্পূর বা কর্পূর সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অর্থাৎ মূত্ররোধ হইয়া কাহারও মৃত্যু হয় না। তাই বলিতেছি—বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় কিছুতেই অহিফেন প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে রোগের মধ্যমাবস্থায় অথবা প্রয়োজন হইলে শেষাবস্থায় অহিফেন সংযুক্ত ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহিফেনের সহিত অন্যান্য দ্রব্য সংযুক্ত হইলে, অহিফেন যে রূপান্তর বা গুণান্তর-প্রাপ্ত হয়—ইহা সর্ব্বথা সকলেরই স্বীকার্য্য।

একদোষোৎপন্ন উপদ্রব যেমন অনায়াসেই প্রতিকৃত হইতে পারে, বহু দোষোৎপন্ন উপদ্রব সেইরূপ অনায়াস সাধ্য নহে, এমন কি তাহা অসাধ্যরূপে পরিণত হইতে পারে।

২য়—চিকিৎসা প্রকরণ।

"হরিণা হন্যতে হস্তী হরিণেন কদাপি ন।
জম্বুকাঃ পরিভূয়ন্তে খভিকৃগ্রৈ স্তর্জৈ ন হি॥"

পল্লীমধ্যে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে সকলেরই কটিদেশে অলাবুত্বক্ (লাউয়ের খোলা) ধারণ এবং তাহার ধূমগ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বদা কর্পূর-আঘ্রাণ এবং কর্পূর-সেবন এ রোগোৎপত্তি নিবারণের একটী প্রশস্ত কল্প। প্রথমে পেট ফাঁপিয়া তরল দাস্ত হইতে থাকিলে, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারাদি রোগে কোনো কোনো ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়—অনুপান আদার রস ও চার, পাঁচ রতি সৈন্ধব লবণ। এরূপ ক্ষেত্রে কর্পূরবাসিত জলের সহিত "মুস্তাদ্য বটী" অথবা চিনির সহিত 'কর্পূরাসব' সেবন করাইয়াও ফল পাওয়া যায়। নিম্নে ঔষধ দুইটীর প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল। নানা কবিরাজী গ্রন্থে এক নামের অনেক ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনো ঔষধ বলিয়া কোনোরূপ ঔষধ সেবন করিলে তাহার কোন্‌রূপ ফল পাওয়া যায় তাহা কে বলিতে পারে?

১। মুস্তাদ্যবটী—

১। অব্দাৎ পলদ্বয়ং ক্ষুণ্ণং কণা কর্পূর হিঙ্গুতঃ।
পলং পলং গৃহীত্বা তু মর্দ্দয়িত্বা বটীং চরেৎ॥
চতুর্গুঞ্জামিতাং খাদেৎ কর্পূরাম্বুসুবাসিতাম্।
অতীসারমজীর্ণঞ্চ বিসূচীং ঘোর রূপিণীং
অরোচকং বহ্নি মান্দ্য গ্রহণীমপি দারুণাম্
কাসং পঞ্চবিধং চৈব নাশয়েদ বিকল্পতঃ।

২। তুলাং প্রসন্নাং পরিগৃহ্য শুদ্ধাং,
পলাষ্টকং চোড়ুপতেঃ ক্ষিপেচ্ছ।
এলা চ মুস্তা ঘনশৃঙ্গবেরে
যমানিকা বেল্লন্দ মত্র সর্ব্বং॥

মুতা ১৬ তোলা পিঁপুল, কর্পূর, শোধিত-হিঙ্গু প্রত্যেকে ৮ তোলা। প্রথম তিনটী ঔষধ উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। শোধিত হিঙ্গু, ছাঁকিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। খলে উত্তম-রূপে পেষণ করিয়া লইলেই চলিতে পারে। পরে চারিটী দ্রব্যই জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারি রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিতে হইবে—অনুপান কর্পূরোদক। এই ঔষধ সেবন করিলে বিসূচিকা, অতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

২। কর্পূরাসব;—

পলপ্রমাণং পিহিতে চ ভাণ্ডে মর্গেং নিদধ্যাদ্ ভিষগত্র যত্নাৎ। বিসূচিকায়াঃ পরমৌষধং তন্নিহন্তি চাস্যান্ বিবিধান বিকারান্॥

(৩) কবিরাজী ওজন ৬৪ তোলায় সের গণনা করিতে হইবে। এবং ৫ রতিতে আনা ধরিতে হইবে।

মৃতসঞ্জীবনী অথবা অন্য কোন প্রকার পরিস্কৃত সুরা ১২॥ সের, কর্পূর ১ সের, ছোট এলাচ, মুতা, শুঁঠ যমানী, মরিচ—প্রত্যেক ৮ তোলা—মাত্রায় অর্দ্ধ কুট্টিত করিয়া লইতে হইবে। আর সমস্তগুলি দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাস কাল আবৃত ভাণ্ডে রাখিতে হইবে। ঔষধগুলি উত্তররূপে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। ইহা দ্বারা অপরা-পর নানাপ্রকার পীড়ারও প্রতিকার হইয়া থাকে। মাত্রা ১ মাষা। ওলাউঠা রোগের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই ঔষধ সেবন করিলে কোনও অপকার হয় না। গ্রামের মধ্যে ওলাউঠা রোগের প্রবল আক্রমণ

লক্ষিত হইলে, অতিসার অথবা সাধারণ অজীর্ণ বলিয়া কাহারও তাহা উপক্ষা করা উচিত নহে। সকলেরই বেশ মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ অজীর্ণ বা অতিসার রোগে তিন, চার বার ভেদ হইলেও কাহারও কাহারও দন্ত বা সমস্ত মুখমণ্ডল শ্যামবর্ণ বা নীলবর্ণ হয় না। পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত ভেদ হইতে হইতে রোগ যখন অতিশয় সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, তখন দন্ত এবং মুখমণ্ডলের বর্ণ পূর্ব্বোক্ত রূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

সত্য সত্যই ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগে আক্রমণ করিলে দুই একবার, ভেদ বমি হইয়া অমনি মুখশ্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও দন্ত—শ্যামবর্ণ বা ঈষৎ নীল-বর্ণ হয়। দন্ত একেবারে নীরস হইয়া যায়। শরীরও অতি শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিসূচিকা বিষ সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত হইলে যখন মর্ম্মগ্রন্থি সমূহ একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে, শরীর হইতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া মলাকারে নির্গত হয় এবং সময় সময় রোগীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, যখন ঘোরতর মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়, মধ্যে মধ্যে নেত্র ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠে, তখন নাড়ীস্পন্দন সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু বিশেষরূপ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, অনেক বিলম্বে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার সূক্ষ্মতন্তুর ন্যায় নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়।* এইরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

একখানি কটরা মধ্যে টুক্‌রা টুক্‌রা হরিণ শৃঙ্গ সংস্থাপন করিয়া আর একখানি কটরা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, পরে কর্দ্দমলিপ্ত রজ্জু দ্বারা তাহা উত্তমরূপ বন্ধন ও কর্দ্দম লেপন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। তাহার পর ৬০।৭০ খানা বনঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ হয়—একহস্ত পরিমান গভীর গোলাকার গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্ত এক তৃতীয়াংশ বনঘুঁটে দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর্দ্দমলিপ্ত কটরা স্থাপন করিবে। গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ আরো বনঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরিশেষে উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া মূষাবদ্ধ হরিণ-শৃঙ্গ ভস্ম করিবে। ইহাকে সাধারণ পুট কহে। সাধারণ পুটে বনঘুঁটের বিশেষ কোন পরিমাণ নাই। ২০।২৫ খানা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়োজন মত ১০০ খানা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক প্রকার পুট আছে। যথাস্থানে তাহার বিষয় বর্ণনা করা যাইবে। সকল প্রকার পুটের কার্য্য রাত্রিতে সম্পাদন করা উচিত। পরদিন প্রাতঃকালে পুটস্থিত অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া মূষাবদ্ধ ঔষধ যখন শীতল হইবে, তখন তাহা বাহির করিয়া লইবে এবং উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কাচকূপীর মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ একরতি, অর্দ্ধ তোলা আপাঙমূলের রসের সহিত সেবনীয়। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিনী সকলেই নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। ইহা দ্বারা ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ঠিক থাকে, সুতরাং ব্যাধি শীঘ্র শাঘ্র সাংঘাতিক হইতে পারে না। সর্ব্ববিধ অজীর্ণ বা অম্লাজীর্ণ ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধযব পরিমিত হরিতালভস্ম পূর্ব্ববৎ আপাঙমূলের রসের সহিত সেবন করিলে কখনও নাড়ী স্পন্দন বিলুপ্ত হয় না। এবং সপ্ত ধাতুর ক্ষয়নিবন্ধন উদ্‌বেষ্টন প্রভৃতি

* বিসূচ্যাং নৈব দৃশ্যতে নৈব স্থানং বিমুক্তি।

যে সকল গুরুতর উপসর্গ গুলি উপস্থিত হইয়া থাকে—তাহাও হইতে পারে না। এক্ষণে হরিতাল ভস্মের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইতেছে। বংশপত্র হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া সপ্তাহ কাল চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিলে অথবা পোট্টলী বদ্ধ হরিতাল মৃৎভাণ্ডে দোলাযন্ত্রে ঝুলাইয়া দুই প্রহর কাল চূণের জলে পাক করিলে ইহার শোধন হয়। শোধনের পর কোন মৃৎভাণ্ডের তিন চতুর্থাংশ অশ্বত্থ বৃক্ষের শুষ্ক ছাল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরি শোধিত বংশ পত্র হরিতাল স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপর আরো অশ্বত্থ ছাল রাখিয়া সেই ভাণ্ড পূর্ণ করিবে। দুই সের পরিমিত ছালে পাঁচ তোলা পরিমাণ হরিতাল প্রদান করিবে। এই অনুপাতে অশ্বত্থ ত্বক্ ও হরিতাল দেওয়ার নিয়ম, কিন্তু হরিতাল আড়াই তোলার কম দেওয়া উচিত নহে। ভাণ্ড পূর্ণ হইলে ভাণ্ডের মুখ সরার সম্মুখে উত্তমরূপ অবরুদ্ধ করিয়া দুই প্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। দুই প্রহর অন্তে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যখন ভাণ্ড শীতল হইবে, তখন ভাণ্ডমধ্যস্থিত ভস্ম গুলি হইতে হরিতাল উঠাইয়া লইবে। ইহাই হরিতাল ভস্ম। এই হরিতাল ভস্ম ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ। ওলাউঠা রোগে এই হরিতাল ভস্মের প্রয়োগ করিবার বিধান আছে। অন্যান্য বৈকারিক অবস্থাতে ও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

* বিসর্পণ চূর্ণ।

ফট্‌কিরি ১, বংশপত্র হরিতাল ৩, স্বর্ণ।০ উপরি লিখিত তিনখানি দ্রব্য দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ফট্‌কিরি শোধন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বে যে হরিতাল শোধনের প্রকরণ বলা হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মানুসারে বংশপত্র হরিতাল শোধন করিয়া লইবে। এই ঔষধে জারিত হরিতালের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। স্বর্ণ, বিধিপূর্ব্বক শোধন করিয়া ভস্ম করিয়া লইবে। প্রথমতঃ একখানি কটরা মধ্যে কিঞ্চিৎ জারিত অভ্র স্থাপন করিবে। ইহার পূর্ব্বেই প্রাগুক্ত ফট্‌কিরি এবং বংশপত্র হরিতাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, আলতার জলে সাতবার ভিজাইয়া সাতবার রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটী গোলক প্রস্তুত করিবে।

এই গোলক উল্লিখিত মৃত্তিকাভাণ্ডস্থিত লৌহ ও অভ্রের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। তাহার পর আবার কিঞ্চিৎ লৌহ ও অভ্র দ্বারা ঐ গোলক বেশ করিয়া ঢাকিয়া আর একখানি কটরা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এবং কর্দ্দমলিপ্ত রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন ও দুই অঙ্গুলি পুরু কর্দ্দম লেপন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহাকে বজ্রমূষা কহে। এই মূষাবদ্ধ ঔষধ গোলক, স্বর্ণ সিন্দূর ও মকরধ্বজ পাকের নিয়মানুসারে বালুকা যন্ত্রে আট প্রহর পাক করিবে। পাকান্তে মূষা যখন শীতল হইবে, তখন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সেই মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভাণ্ড সংলগ্ন পীতবর্ণ যে ঔষধ পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত লৌহ, অভ্র, এবং ঔষধ গোলক ঠিক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কোন কর্দ্দমলিপ্ত দৃঢ় কাচকূপীর মধ্যে সংস্থাপন করিয়া খড়িমাটী দিয়া কাচকূপীর

* ফটকারি সমংগ্রাহ্যং হরিতালং প্রয়োমতা। অলক্তক দ্রবৈর্ভাব্যং গোলকং কারয়েৎ ভিষক্॥
মৃৎপাত্রোপরি লৌহে স্থাপয়েৎ গিরিজা মলম্। কৃত্বা চ বজ্রমূষায়াং সংস্থাপ্য দৃঢ় খর্পরে॥
যামাষ্টং বালুকা যন্ত্রে চাতি তীব্রাগ্নিনা পচেৎ। স্বাঙ্গং শীতঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গৃহীত্বা তোলকাষ্টকম্।
শাণমাত্রং স্বর্ণ দত্বা চিহ্নচ্যাক প্রয়োজয়েৎ। খদমাত্রং যবার্দ্ধংবা অনুপানং বিধানতঃ॥

মুখ আল্‌গা ভাবে আটকাইয়া গজপুটে এক রাত্রি পাক করিলেও কাচকূপীর উর্দ্ধভাগে এক প্রকার পীতবর্ণ চটী পাওয়া যায়, তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পীতবর্ণ ঔষধ একতোলা এবং জারিত স্বর্ণ সিকি তোলা একত্র মিশ্রিত করিলেই বিসর্পণ চূর্ণ প্রস্তুত হয়। বোতলের নিম্নদেশে অথবা কটরা দুইটির মধ্যভাগে অসংলগ্ন ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ কঠিন যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা ২।১ রতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপান সহ প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ বৈকারিক ক্ষেত্রে এই ঔষধ ১ রতি ও কস্তুরী ১ রতি অনুপান বিচার করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে বিস্ময়জনক ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

ওলাউঠা রোগে প্রথমতঃ পাত্‌লা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। তাহার পর স্বচ্ছ জল, কুম্‌ড়া পচা জল অথবা জলের সহিত কুমড়া বাটার ন্যায় এক প্রকার ভেদ হইতে থাকে। যখন মর্ম্ম গ্রন্থি হইতে শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া মলাকারে নির্গত হইতে থাকে, তখনই কুমড়া বাটার ন্যায় পদার্থ পতিত হয়। কাহারও বা পূর্ব্ব হইতে বমন আরম্ভ হয়, কাহারও বা অনেক বিলম্বে বমনোদ্রেক হয়। যাহার যত শীঘ্র বমন আরম্ভ হয়, তাহার তত শীঘ্রই ধাতু বসিয়া যায়। পীড়াও নিতান্ত সাংঘাতিক আকার ধরিয়া থাকে। কিন্তু বিলম্বে বমনোদ্রেক হইলে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায়। দাস্ত, বমি, অঙ্গ বিশেষে খাইল ধরা, ঘর্ম্ম এবং শিঃরশূল প্রভৃতি যে প্রকার লক্ষণই উপস্থিত হউক না, তজ্জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া প্রথমতঃ ওলাউঠার দোষ শান্তির জন্য চেষ্টা করিবে। মল নিঃসরণ থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ উৎবেষ্টন, ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এবং মণিবন্ধে নাড়ী স্পন্দন বিদ্যমান থাকিতে যদি বিসর্পণ চূর্ণ সেবন করান যায়, তাহা হইলে কিছুতেই ধাতু বসিয়া যায় না। এবং উল্লিখিত উপদ্রব গুলি দ্বারাও রোগীকে কখনও আক্রান্ত হইতে হয় না। ঐ সকল উপদ্রব গুলির মধ্যে যদিও ২।১টি আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাও অনায়াসে নিবারিত হইয়া থাকে। ফল কথা পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় বিসর্পণ চূর্ণ একবার উদরে প্রবেশ করাইতে পারিলে রোগীর কিছুতেই মৃত্যু হইবে না—ইহা ধ্রুব সত্য কথা। চারি আনা ওজনে আপাঙ শিকড়ের ছাল উত্তমরূপে ধুইয়া শিলে পেষণ করিবে; তাহার পর অর্দ্ধযব পরিমিত বিসর্পণ চূর্ণ তৎসঙ্গে মিশাইয়া শীতল জল সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনের পরক্ষণেই প্রস্ফুটিত ধুতুরা ফুলের মধ্যে যে পাঁচটি শিস থাকে, তাহা লইয়া আড়াইটা মরিচের সহিত শীতল জলে বাটিয়া খাইতে দিবে। এক বৎসরের শিশুদিগের পক্ষে অর্দ্ধখণ্ড মরিচ ও একটি শিস, তিন বৎসরের বালকের পক্ষে একটি মরিচ ও দুইটি শিস, সাত বৎসরের বালকের সম্বন্ধে দেড়টা মরিচ ও তিনটা শিস, দশ বৎসর বালকের পক্ষে একটা মরিচ ও চারিটা শিস, এবং পূর্ণ বয়স্ক যুবক দিগের জন্য আড়াইটা মরিচ এবং পাঁচটি শিস ব্যবস্থেয়। ইহাই ওলাউঠা রোগের প্রথম চিকিৎসা। এই বিসর্পণ চূর্ণ একবারের বেশী কাহাকেও সেবন করাইতে দেওয়া যায় না। এই ঔষধের পরমাণু সমূহ কণ্ঠনালী হইতে আরম্ভ করিয়া আমাশয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেরই মাংস, পেশী ও

ঝিল্লী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। মুহুর্মুহু বমি হইতে থাকিলেও এই ঔষধ উঠিয়া পড়ে না। দ্রব্য শক্তি বা ঔষধের প্রভাব বশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ধুতুরা ফুলের শিস ও মরিচের দ্বারা যে অনুপানের কল্পনা করা হইয়াছে, বমনের সহিত তাহা উঠিয়া পড়া অসম্ভব নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি বমনের সহিত পুর্ব্বোক্ত ধুতুরা শিস ও মরিচ উঠিয়াই পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তেলাপোকার একটু বিষ্ঠা জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। তাহার পরেই আবার ধুতুরার শিস ও মরিচ পুর্ব্ববৎ সেবন করাইতে দিবে। এবারেও যদি ধুতুরার শিষ ও মরিচ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তেলাপোকার বিষ্ঠা শীতল জলের সহিত সেবন করাইয়া ধুতুরার শিস ও মরিচ সেবন করাইবে। এইরূপ প্রণালীতে ধুতুরা শিস ও মরিচ একবার উদরের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। পরে যখন যে কোন উপদ্রব আসিয়া জুটুক না কেন, তাহা নিবারণ করিতে আর কোনো বেগ পাইতে হইবে না। যে পর্য্যন্ত ধুতুরা শিস্ ও মরিচ স্থিতিশীল হইয়া না বসে, সে পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তেলাপোকার বিষ্ঠা সেবন করাইয়া ধুতুরা শিস্ ও মরিচ উদরস্থ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

তেলাপোকার বিষ্ঠা অতিশয় বমন নিবারক। ইহার অদ্ভুত পরাক্রম পরিদর্শন করিলে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। সুস্থ শরীরে এই তেলাপোকার বিষ্ঠা গলাধঃকৃত হইলে অত্যন্ত বমন হইতে থাকে। কিন্তু বমন রোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে বমন বেগ সর্ব্বথা দুরীকৃত হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে বহুবার পরীক্ষিত। পুর্ব্বে যে হরিণশৃঙ্গ ভস্ম ও হরিতাল ভস্মের কথা বলা হইয়াছে, যথাবিধি তাহা সেবন করাইবার পরও এই ধুতুরাফুলের কেশর ও মরিচ সেবন করাইতে দেওয়া যায়, তাহাতে বিসর্পণ চূর্ণের ন্যায় ফল দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কখনও হরিতাল ভস্ম ও বিসর্পণ চূর্ণ সেবন করান উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় পুর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম সেবন করাইয়া পরে ধুতুরা ফুলের শিস্ ও মরিচ সেবন করাইলে গর্ভস্রাব বা অন্য কোন আশঙ্কা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীদীননাথ কবিরত্ন, শাস্ত্রী।

শিশুর খাদ্য।

——:*:——

(কতকগুলি বিলাতী ফুড সম্বন্ধে আলোচনা।)

শিশুর ব্যবহারের জন্য বিদেশী ফুড্ বাজারে এত আছে যে লোকে কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী ব্যবহার করিবে ঠিক্ করিতে পারে না। অতএব কতকগুলি অতি পরিচিত বিলাতী ফুড্ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। পুর্ব্বে বিলাতী ফুড্‌গুলিকে আমরা তিন

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উপাদান কি স্থূলতঃ তাহাও বলিয়াছি, কোন্ শিশুর পক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে তিনটী শ্রেণীর প্রত্যেকের কতকগুলি সুপরিচিত বিলাতী খাদ্যের নাম এবং উপাদানের পরিমাণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রস্তুত প্রণালী বলিব।

প্রথম শ্রেণীর ফুডের মধ্যে হর্লিক্স মল্টেড্ মিল্ক এবং মিলোফুডের নাম করা যাইতে পারে।

হর্লিক্স মল্টেড্ মিল্ক (Horlick's Molted Milk)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৩·৭, প্রটিড্ ১৩·৮, স্নেহ ৯·০, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৭০·৮, ধাতবপদার্থ ২·৭০। শুষ্কীকৃত দুগ্ধ (শতকরা ৫০) গোধূমচূর্ণ (শতকরা ২৬¾), বার্লিমন্ট (শতকরা ২৩) এবং বাইকার্বনেট্ অফ্ সোডার (শতকরা ¼) মিশ্রণে প্রস্তুত। মিশ্রণ কালে অপরিবর্ত্তিত শ্বেতসার (Unaltered Starch) থাকে না। ৪ ঔন্স অর্থাৎ আধপোয়া জলে চার চামচের তিন চামচ মিশাইয়া তিনমাসের শিশুর জন্য ব্যবস্থা।

মিলো ফুড্ (Milo food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল ১·৫৬, প্রটিড্ ১১·০৩, স্নেহ ৩·৯২, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৮১·৩৮, ধাতব পদার্থ ২·১১। শুষ্কীকৃত সুইস দেশীয় দুগ্ধ, ভাজা গোধূমচূর্ণ এবং ইক্ষু শর্করা (শতকরা ৩০)। শতকরা ৬২ ভাগ দ্রবনীয় এবং ১৯ ভাগ অদ্রবনীয় কার্ব্বহাইড্রেট্ আছে। কেবল জল সংযোগে প্রস্তুত করিতে হয়।

মন্তব্য—এই দুইটী ভিন্ন কার্ণরিক্স সলিউবেল ফুড্ (Carnrick's soluble food) এবং এলেন্‌বেরি (Allenbury) প্রভৃতি আরও কয়েকটী ফুড্ এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর খাদ্যকে স্থূলতঃ শুষ্কীকৃত দুগ্ধ বলা যায়। ইহারা মাতৃদুগ্ধের প্রতিনিধি স্বরূপ কল্পিত হয়। ইহাদের দোষ এই—দীর্ঘকাল শিশুর ইহাই আহার স্বরূপ হইলে যদি কয়েক মাসের পর ইহার সহিত কোন তাজা ফলের রস মিশ্রিত না করা যায়, তাহা হইলে শিশুর রক্ত বিকৃতি (Scurvy) জন্মে। অধিকন্তু স্নেহের ভাগও অল্প থাকে। এ সকল দোষ ভিন্ন এক প্রধান দোষ, ইহাদের মূল্য এত বেশী যে, তাজা দুধের দাম তাহার তুলনায় অনেক অল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে ক বর্গে মেলিন্স ফুড্ (Mellin's food) এবং খ বর্গে বেঙ্গার্স ফুডের (Benger's food) নাম করা যাইতে পারে।

মেলিন্স ফুড্ (Mellin's food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৬·৩, প্রটিড্ ৭·৯, স্নেহ অতি সূক্ষ্মাংশ, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৮২·০, ধাতব পদার্থ ৩·৮। ইহা সর্ব্বতোভাবে মণ্ট্ যুক্ত। ইহার সমস্ত কার্ব্বহাইড্রেট্ দ্রবণীয় অবস্থায় স্থিত। ইহাকে শুষ্কীকৃত মণ্টের সার বলা (Malt extract) যায়। এক পাঁইট জল এবং এক পাঁইটের ¼ র্থাংশ দুগ্ধের সহিত বড় চামচের এক চামচ মিশাইয়া তিন মাসের কম বয়স্ক শিশুর জন্য ব্যবস্থা।

বেঙ্গার্স ফুড্—(Benger's food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শলকরা ৮·৩, প্রটিড্ ১০·২, স্নেহ ১·২, কার্ব্বহাইড্রেট্ ৭৯·৫ ধাতব পদার্থ ৩·৮। গোধূমচূর্ণ এবং Pancreatic extract অর্থাৎ জীবশরীরে পরিপাককারী রসস্রাবী Pancreas নামে যে আশয় আছে, তাহার নির্য্যাসের মিশ্রণে প্রস্তুত। উপদিষ্ট প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত করিলে সমস্ত

না হউক অধিকাংশ শ্বেতসার দ্রবনীয় অবস্থায় পরিণত হয়। প্রস্তুত প্রণালীর গুণে খাদ্যের প্রটিড্ ভাগের এবং প্রস্তুতার্থে ব্যবহৃত দুগ্ধের আংশিক পরিপাক হইয়া যায়। প্রস্তুত প্রণালী—বড় চামচের এক চামচ খাদ্য এবং বড় চারি চামচ শীতল গোদুগ্ধ মিশাইয়া তাহাতে আধ পাঁইট ফুটন্ত জল মিশাইয়া কোন উষ্ণ স্থানে ১৫ মিনিট কাল রাখিবে পরে সামান্য ফুটাইয়া লইবে।

মন্তব্য—Cheltine Maltose food, Hovis Baby's food, Savary and Moor's food, Comb's Malted food, Worth's Perfect food এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর খাদ্যে প্রায় শ্বেতসার আছে—ছয় মাসের পূর্ব্বে শিশু শ্বেতসার পরিপাক করিতে পারে না—এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ এই শ্রেণীর খাদ্যে দ্রব্যান্তর সংযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহার ফলে প্রস্তুত কালে খাদ্যগত শ্বেতসার Dextrineও Sugarএ পরিণত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি এই শ্রেণীর ফুড্ ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে একথা বেশ স্মরণ রাখা উচিত যে এই সকল ফুড্ কেবল দুগ্ধের সহকারীরূপে সেব্য হইতে পারে, কদাচ একাকী ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলে কোন্‌টী ব্যবহার করা উচিত এই প্রশ্নের যদি আমাকে উত্তর দিতে হয় তাহা হইলে আমি এই বলিব যে, প্রস্তুত কর্ত্তা যেখানে শ্বেতসারের শর্করায় পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট এবং নিশ্চিত উপায় আবিষ্কারে সমর্থ বলিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে সেই খাদ্যই ব্যবস্থা করা উচিত। মেলিন্স ফুড্ ব্যবহার করা যায় কিন্তু ইহাতে স্নেহের ভাগ এত অল্প আছে যে শিশুকে যদি প্রধানতঃ ইহাই ভোজন করাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহার পথ্য মেদঃসঞ্চারের পক্ষে যে হানিকর হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মেলিন্স ফুডের প্রচারকগণ উহাদের খাদ্যে পালিত বহু স্থূল শিশুর চিত্র আমাদের সম্মুখে ধারণ করিলেও আমরা এই সত্যের অন্যথা করিতে পারিব না।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে রবিন্‌সন্স বার্লির নাম উল্লেখযোগ্য। উপাদান বিশ্লেষ—জল শতকরা ১০·১, প্রটিড্ ৫·১, স্নেহ ০·৯, কার্ব্বহাইড্রেট ৮২·০, ধাতব পদার্থ ১·৯। ইহা পাল´ বার্লি´র সূক্ষ্ম চূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মন্তব্য—Ridges food, Neaves food, Frame food diet, Bananina ompus food, Falona, Scotts oat flour প্রভৃতি এই শ্রেণীর খাদ্য। এই শ্রেণীর খাদ্যগুলির আবিষ্কর্ত্তারা স্পষ্টই বলিয়াছেন ইহাতে মল্টের সম্পর্কও নাই—এগুলি সম্পূর্ণ শ্বেতসারমূলক খাদ্য। যে সকল শিশু শ্বেতসার পরিপাক করিতে পারে তাহাদের পক্ষে এই শ্রেণীর খাদ্যের অধিকাংশই হানিজনক না হইলেও ভাজা গমের ময়দা কিম্বা ভাজা কলায়ের ছাতু অপেক্ষা এই সকল খাদ্যের কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই। যে শিশুর বয়স অন্ততঃ ৬মাস পূর্ণ হয় নাই তাহার পক্ষে এসকল খাদ্য পথ্য নহে—সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ যাঁহারা উপরিলিখিত খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই উহাদের গুণদোষ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমি উপসংহারে এই বলিতে পারি যে ভারতীয় সুস্থ শিশুগণের পক্ষে এই সকল খাদ্যের কিছুই আবশ্যকতা নাই! পীড়িত শিশুর ঔষধ মূলক পথ্য স্বরূপ যদি কোন সময় এ সকল খাদ্য ব্যবস্থা করিবার

প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কোন্‌টী ভাল বিবেচনার সুবিধার জন্য যৎকিঞ্চিত কথিত হইল।

মাতৃস্তন্য-অন্নপরিবর্ত্তন-অন্যদুগ্ধে পালন-কৃত্রিম-আহার।

শিশু কতদিন মাতৃস্তন্য বা ধাত্রীস্তন্য পান করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যদি প্রসূতির স্তন্য প্রচুর ও স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে তাহা হইলে শিশু এক বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিবে। বৎসরের পর স্তন্য প্রচুর এবং প্রসূতির স্বাস্থ্য উত্তম থাকিলেও আর শিশুকে স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। বৎসরাধিককাল স্তন্য পান করাইলে শিশু এবং প্রসূতি উভয়েরই স্বাস্থ্য হানি হইবে।

বৎসরাধিককাল স্তন্য পান করাইলে প্রসূতির ক্ষুধা কমিয়া যায়, পরিপাকের দুর্ব্বলতা ঘটে, মানসিক অবসাদ, শিরঃপীড়া ও মাংসক্ষয়, স্পষ্ট লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন, কাণেশব্দ, মূর্চ্ছা, বুকধড়ফড় করা, বুকে বেদনা দেখা দিলে কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে। বৎসরাধিক কাল স্তন্য পানে শিশু-শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাও অবগত হওয়া উচিত। দীর্ঘকাল স্তন্য পানে শিশুর শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও গাত্রত্বক্ শ্লথ হয়। ভিতরের বল (Stamina) এমন কমিয়া যায় যে পরে আহারাদির অতি সুব্যবস্থা করিয়াও তাহা সহজে পুনরানয়ন করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমাশয় বড় হইয়া যায়, ঘিনঘিনে হয়—নাকিসুরে অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করে—ইহারা প্রায়ই অস্থিবিকৃতি (Rickets) বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে পারা গেল, মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ হিতকর হইলেও কালক্রমে উহাই আবার বিষম অনর্থের কারণ হইয়া থাকে।

অন্নপরিবর্ত্তন।

দ্বাদশ মাসের পর শিশুর মাতার স্তন্য প্রচুর থাকিলেও উভয়ের হিতার্থে শিশুকে স্তন্য-ত্যাগ করাইয়া অন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্তন্য-ত্যাগ হঠাৎ একদিনে করাইবে না। ঠিক্ দ্বাদশ মাসেই স্তন্য-ত্যাগ করাইতেই হইবে এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—যদি এই সময় দাঁত উঠিবার জন্য শিশুর পেটের পীড়া, জ্বর হইতে থাকে তাহা হইলে স্তন্য-ত্যাগ স্থগিত রাখিতে হইবে। পরে সুস্থ হইলে আস্তে আস্তে অন্য খাদ্য অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রথমে মাতা রাত্রিতে স্তন্য-দান বন্ধ করিবেন। তারপর কিয়দ্দিন দিবসে দুইবার মাত্র স্তন্য দান করিবেন। মাতৃস্তন্যের পরিমাণ কম হইলেই ক্ষুধার তাড়নায় শিশু অন্য আহারের প্রতি আগ্রহ দেখাইবে। এই অন্য আহার কি? তাহা আমরা কৃত্রিম আহার বর্ণনা কালে বলিব।

অতঃপর আমরা মাতৃ স্তন্যে পালিত এবং অন্য প্রকার খাদ্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের ও পোষণের তুলনা করিয়া দেখিব।

যে সকল শিশু মাতার অনিচ্ছা, দুর্ঘটনা পীড়া বা মৃত্যু হেতু জন্ম হইতেই তাহার প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট-খাদ্য স্তন্য হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারা প্রায়ই অতি দুঃখে কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। এই সকল দুর্ভাগ্য শিশুগণের শরীরে স্নেহঃ না

থাকায় হাত পা সরু সরু হয়, রক্তে লোহিতবর্ণ কণিকা না থাকায় কিছুমাত্র কান্তি, শ্রী লক্ষিত হয় না। মুখে শিশুজনোচিত কোমলতার পরিবর্ত্তে বার্দ্ধক্য-সুলভ লোল চর্ম্মতা আবির্ভূত হয়, তাহাদের কণ্ঠস্বর নিরবচ্ছিন্ন বিলাপ ধ্বনি বলিয়া মনে হয়, অধিক কি এই সকল শিশুকে যেন মূর্ত্তিমান্ দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতি এই সকল শিশুর জন্য যে খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহাদিগকে সময় থাকিতে যদি তাহা সেবন করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখিবে,—তাহাদের মুখে আর ক্রন্দন নাই, তৎপরিবর্ত্তে সন্তোষের স্পষ্ট চিহ্ন বিরাজমান রহিয়াছে, ক্রমশঃ শিশুজনোচিত কমনীয়তা আবার ফিরিয়া আসিবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও বর্ণ উজ্জ্বল হইবে। অবশেষে বালোচিত হাস্য আনন্দের কোলাহলে তোমার গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, অধিক কি কিছুদিন পূর্ব্বে যাহাদিগের দুঃখ দেখিলে অশ্রু সম্বরণ কষ্ট সাধ্য হইত এখন তাহাদিগকে আনন্দের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেব-শিশু বলিয়া মনে হইবে। কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করিয়া বলিলেন মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত সমস্ত শিশুরই যে এইরূপ দুর্দ্দশা হয় ইহা কদাচ স্বীকার করা যায় না; কারণ আমরা দেখিয়াছি সযত্নে প্রতিপালিত মাতৃহীন বা দৈবদুর্ঘটনায় মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত অনেক শিশু বেশ সুস্থ থাকিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা সামান্য ভাবে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলাম এক্ষণে প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষ্য লইব। কোন্ ভাবে প্রতিপালিত হইলে শিশুর স্বাস্থ্য কিরূপ হয়, বৈদেশিক চিকিৎসক-গণ অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

আহারের প্রণালী।	প্রতিশত শিশুতে যেরূপ ফল:দেখা গিয়াছে।
১। কেবল মাতৃস্তন্য ৯মাস বা তদধিককাল।	৬৩ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৩ জন মধ্যমরূপ বর্দ্ধিত। ১৪ জন নিকৃষ্ট ভাবে বর্দ্ধিত।
২। মাতৃস্তন্য তাদৃশ প্রচুর নহে; অতএব পরবর্ত্তী কালে স্তন্যের সহকারী ভাবে অন্য খাদ্যের আবশ্যকতা ছিল।	৫৭½ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৫½ জন মধ্যমরূপ। ১৬ জন নিকৃষ্ট ভাবে।
৩। স্তন্য নিতান্ত অল্প; অতএব জন্ম হইতেই অন্যান্য খাদ্যের আবশ্যকতা ছিল।	২৭ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৬ জন মধ্যমরূপ। ৪৬ জন নিকৃষ্ট রূপ।
৩। স্তনদুগ্ধে একবারে বঞ্চিত সুতরাং জন্ম হইতেই হাতে-পালা।	১৬ জন সুপরিবর্দ্ধিত। ২৬ জন মধ্যমরূপ। ৬৪ জন নিকৃষ্টরূপ।

উপরি উদ্ধৃত বিবরণের ১ দফার সহিত ৪র্থ দফার তুলনা করিলে দেখা যায় যে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট খাদ্যে অর্থাৎ মাতৃস্তন্যে পালিত ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৬৩ জন সুপুষ্ট ও সুপরিবর্দ্ধিত

হয় কিন্তু হাতে পালা (Handfed) শিশুর শতকরা ১৬ জন মাত্র সুপুষ্ট হইয়া থাকে।

যে সকল শিশু হাতে-পালা এবং যাহা-দিগকে নিয়ম পূর্ব্বক আহার দেওয়া হয় না, তাহারা অতি ধীরে মৃত্যু মুখে অগ্রসর হয়। যদি জন্ম হইতেই ঐরূপ আহারের অনিয়ম হয় তাহা হইলে শিশু প্রায় ২।৩ মাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি কিছুকাল স্তন্য পান করাইয়া পরে হাতেপালা হয়, তাহা হইলে তাহার রোগের আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষার শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক-তর দেখা যায়। মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া নূতন খাদ্যে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইলে যদি চ প্রথম প্রথম কিছুকাল তাহাকে পাণ্ডুবর্ণ বিমর্ষ এবং শিথিলাঙ্গ দেখা যায় তথাপি তাহার দেহ ও শক্তির উপর নূতন পথ্যের প্রভাব কিঞ্চিৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে প্রায়ই শিশুর অস্থি সমূহ কোমল ও বক্র হওয়ায় সে অসমর্থ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শিশুর এই রোগ কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়। শিশুর রীতিমত পোষণ না হইলে এবং বাসস্থলীতে আলোক ও বায়ুর সম্যক্ সুব্যবস্থা না থাকিলে প্রায়ই শিশু রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। দেড় হইতে দুই বৎসরের মধ্যেই প্রায় এই রোগ দেখা দেয়। ইহার বিশেষ লক্ষণ রাত্রিতে ছট্‌ফট্ করা, মাথায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, অতিসার, বিলম্বে দাঁত উঠা, শিশুকে তুলিলে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়, পেশী সমস্ত শিথিল, বিবর্ণ এবং শোথযুক্তের মত, ক্রমে অস্থি নরম হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি জন্মায়।

কারণ—দীর্ঘকাল স্তন্যপান, কেবল নানাপ্রকার ফুড বা গাঢ় দুগ্ধের (Condenced Milk) দ্বারা পালন, বিবিধ দুঃখের আগার স্বরূপ এই রোগের কারণ।

চিকিৎসা—স্বাস্থ্যরক্ষার ও পথ্যের নিয়মানুবর্ত্তন করিবে এবং ছাগলাদ্য ঘৃত তুল্য খাদ্যৌষধ সেবন করিতে দিবে।

মাতৃদুগ্ধে পালিত শিশুর অপেক্ষা 'হাতে-পালা' শিশুগণের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা যে অধিক তর ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠাকর ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। বৈদেশিক ডাক্তার মেরিম্যান সযত্নকৃত বহু অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে সকল শিশু 'হাতেপালা' হয় তাহাদের ৮ জনের মধ্যে ৭ জন বিবিধ ব্যধিতে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বিলাতের অনেক শিশু হাঁসপাতালের বিবরণ পাঠ করিলেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমাদের এই বিশাল দেশে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যার কোনই হিসাব নাই—কোন কোন বড় সহরের কিঞ্চিৎ আছে মাত্র। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে কলিকাতায় শিশুমৃত্যু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পরিবৃদ্ধির কারণ—জননীর স্বাস্থ্যহানি, স্তন-দুগ্ধের অল্পতা, অনেক স্থলে জননীর স্তন্যদানে অপ্রবৃত্তি, বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের দুর্লভতা, বিবিধ বিদেশীয় ফুড এবং গাঢ়দুগ্ধের (Cendenced Milk) প্রচার ও ব্যবহার।

যে মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশুর এতাদৃশ ভীষণ অবস্থা আপতিত হয় কোন্ মাতা ইচ্ছা-পূর্ব্বক বা সামান্য কারণে স্বীয় সন্তানকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন? স্তন্যদানে সন্তানের অনন্ত হিত সাধিত হইলেও মাতার নিজেরও উহাতে যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না

একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (কুমারতন্ত্রের ২১ পৃঃ দেখ)। স্তন্যদানে মাতার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি না হইলে যত দূর পারা যায় ততটুকু মাতৃদুগ্ধ হইতেও সন্তানকে বঞ্চিত করিবে না "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এই মহাবাক্য তুল্য, যে যৎসামান্য স্তনদুগ্ধ মাতা সন্তানকে দান করিবেন তাহাতেই শিশু অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবে।

হাতে-পালা শিশুর খাদ্য।

মাতা শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা হইলে ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত। কিরূপ ধাত্রীর দুগ্ধপান শিশুর পক্ষে হিতকর তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (কুমারতন্ত্র প্রথম অধ্যায়)। যদি ধাত্রী সংগ্রহ না হয় তাহা হইলে অবশ্যই শিশুকে হাতেপালা ভিন্ন উপায় নাই। শিশুর মাতার যেমন অবস্থাই হউক না কেন দুগ্ধদানে সম্পূর্ণ অসমর্থতা কচিৎ ঘটিয়া থাকে। শিশুকে স্বীয় দুগ্ধপান করান মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই অবশ্য-কর্ত্তব্যতা যিনি যতটুকু নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাহাতেই শিশুর প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। যদি মাতার অবস্থা এতাদৃশ মন্দই হয় তথাপি তিনি অবস্থা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে ২ বার করিয়া যদি স্তন্যদান করেন তাহা হইলে বাকিটুকুর জন্য কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। যতই সামান্য হউক স্তনদুগ্ধ পানের সহিত যদি কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করা যায় তাহা হইলে কেবল কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিশুকে হাতেপালা বড় কঠিন ব্যাপার। এই কার্য্য যথাবৎ নির্ব্বাহ করিতে হইলে শিশুর পরিচারিকার এত অধিক যত্ন এবং শিশুর পরিপাক শক্তি ও আহারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম বিবেচনার আবশ্যক হয় যে সাধারণ পরিচারিকার দ্বারা তাহা সম্যক্‌নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন; সুতরাং সাধারণতঃ হাতেপালার ফল প্রায়ই সন্তোষজনক হইতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ ও অভিজ্ঞতা যদি একান্তভাবে প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে হাতেপালা শিশু তেমনিই সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান্ হইতে পারে।

গোদুগ্ধ—যদি শিশুকে হাতে পালিতে হয় তাহা হইলে পিতামাতাকে বুঝাইবার জন্য আমরা বারম্বার এই কথা বলিতেছি যে শিশুর জন্ম হইতে দন্ত না উঠা পর্য্যন্ত প্রায় বৎসরাধিক কাল পৃথিবীতে দুগ্ধ, কেবল দুগ্ধ ভিন্ন এমন কোন হিতকর খাদ্য নাই, যাহা আহার করিয়া শিশু সুস্থ শরীরে বাঁচিতে পারে। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে অন্যান্য তরল বস্তু এবং দুগ্ধজাত শর্করার যোগে গোদুগ্ধকে প্রায় নারীদুগ্ধের সদৃশ করা যায়—কিছু ক্রীম—(ইহা শিশুগণ বেশ সহজে পরিপাক করিতে পারে) যোগ করিলেত কথাই নাই। গোদুগ্ধের কি কি দোষ খণ্ডনের জন্য উহাতে চুণের জল, বালির জল যোগ করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্বেতসার মূলক খাদ্য দাঁত উঠার পূর্ব্বে শিশু পরিপাক করিতে পারে না, অথচ শিশুর দুগ্ধে বালির জল মিশাইতে বলা হইতেছে কেন? উত্তরে বক্তব্য এই বার্লিতে অতি অল্প পরিমাণ শ্বেতসার আছে, যাহা সামান্য পরিমাণ আছে তাহাও আবার অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে থাকে; সুতরাং ইহার ব্যবহারে আপত্তি থাকা উচিত নহে। বার্লি, কেবল বার্লি ভিন্ন আর এমন কোন ব্রীহি-দ্বিদলাদি-মূলক খাদ্য (Farinicious articles) নাই

যাহার দ্বারা বার্লির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। গোরুর দুগ্ধের অম্লতা দোষ দুরীকরণার্থ এক পাইট দুগ্ধে বড় চার চামচের দুই চামচ চুণের জল মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট। মোট কথা চুণের জলের মাত্রা অধিক না হয়, অবশ্য শিশুর উদরাময় থাকিলে উহার মাত্রা বেশী হইলেও দোষ নাই।

সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে—বড় চামচের এক চামচ গোদুগ্ধে পরিস্রুত গরম জল বড় তিন চামচ এবং চার চামচের একচামচ চুণের জল মিশাইয়া কিম্বা গরম জলের পরিবর্ত্তে বার্লির জল মিশাইয়া পান করাইবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধজাত-শর্কবা কিম্বা ইক্ষু-শর্করা মিশাইলে আর কোন ত্রুটি থাকিবে না। Brown sugar মিশাইবে না। ইহা মিশাইলে দুগ্ধ পরিপাক কালে উদ্রিক্ত হইয়া বিদাহপাক (acidity) হইবে।

পুর্ব্বে বলিয়াছি স্তনদুগ্ধ যদি অপ্রচুর হয় এবং তজ্জন্য আহারাভাবে যদি শিশুর মাংসক্ষয় হইতে থাকে তাহা হইলে অন্য খাদ্য দানের আবশ্যকতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিব শিশুকে কতক্ষণ অন্তর কতটুকু সংস্কৃত (diluted) দুগ্ধপান করিতে দিব এবং শিশুর পক্ষে সমস্ত দিনে কতটুকু দুগ্ধের প্রয়োজন।

প্রত্যেক হাতেপালা শিশুকে অন্য খাদ্য সেবন করাইবার পুর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে গোদুগ্ধ সেবন করাইবে অর্থাৎ হাতেপালা শিশুর গোদুগ্ধই প্রথম খাদ্য হওয়া উচিত। যদি বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব হয় তাহা হইলে ছাগদুগ্ধ দিতে হইবে। মাতৃদুগ্ধের সদৃশ করিবার জন্য ছাগ-দুগ্ধের সংস্কার কিরূপ হইবে শিশুর হিতার্থিগণ এই বিষয় চিন্তা করিবেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমি একটী বিবরণী লিখিতেছি।

বয়স	তরল বস্তু মিশ্রণ	২৪ ঘণ্টার মধ্য যত বার খাওয়াইতে হইবে	প্রতিবারের পরিমাণ	২৪ ঘণ্টার জন্য যতটুকু সংস্কৃত দুগ্ধ আবশ্যক	যতটুকু দুগ্ধজাত শর্করা যোগ করা আবশ্যক	যতটুকু ক্রীম যোগ করা আবশ্যক
২-৭ দিন	১ ভাগে ৩ ভাগ	১০	আধ ছটাক	পাঁচ ছটাক	½ চার চামচ	½চার চামচ
১ মাস	১ ভাগে ২ ভাগ	১০	এক ছটাক	আড়াই পোয়া	½চার চামচ	½চার চামচ
২ মাস	১ ভাগে ১½ ভাগ	৯	দেড় ছটাক	চৌদ্দ ছটাক	১চারচ ামচ	¾চার চামচ
৩ মাস	১ ভাগে ১ ভাগ	৮	আধ পোয়া	এক সের	১¼চার চামচ	¾চার চামচ
৪-৫ মাস	১ ভাগে ½ ভাগ	৭	আড়াইছটাক	একসের দেড় ছটাক	১½চার চামচ	১চার চামচ
৬-৭ মাস	১ ভাগে ¼ ভাগ	৬	সাড়ে তিন ছটাক	একসের পাঁচ ছটাক	১½চার চামচ	ঐ
৮-৯ মাস	অমিশ্রিত	৬	ঐ	ঐ	১চার চামচ	ঐ

'ক্রীম' কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি ক্রীম না পাওয়া যায় দুধের সর বাটিয়া প্রস্তুত করা গব্যঘৃত দৈনিক ১০-২০ বিন্দু দিবে। দুধের ছানার ভাগ পরিপাক না হইয়া যদি শিশুকে কষ্ট দেয় তাহা হইলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিকিৎসকেরা বলেন এস্থলে প্রতি আধ ছটাক দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধরতি 'সোডিয়ম্ সাইট্রেট্' মিশাইয়া দিলে দুধের ছানা সহজে পরিপাক পাইবে।

পূর্ব্বলিখিত প্রণালী যত্নসহকারে অবলম্বিত হইলেও যদি শিশুর পোষণ ও পরিবর্দ্ধন না হয়, যদি দুগ্ধ সম্যক্ সহ্য পাইতেছে না বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? আমার বোধ হয় কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন গাঢ় বিলাতী দুধ খাওয়ান ভাল। পশ্চাৎ লিখিত প্রণালীতে গাঢ় বিলাতী দুধকে তরল করিয়া স্নেহের 'অল্পতা পরিপূরণার্থ ক্রীম যোগ করিয়া পান করাইবে। গাঢ় বিলাতী দুধের মধ্যে নেসেলের যে গাঢ় দুগ্ধ মধুরীকৃত নহে তাহাই ভাল। ইহা যদি না পাওয়া যায় মধুরীকৃতই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিলাতী গাঢ় দুগ্ধের সংস্কার— ১ ভাগ গাঢ় বিলাতী দুগ্ধে ১৫ কি ২০ ভাগ জল মিশাইয়া উহার দেড় ছটাকে চার চামচের একচামচ ক্রীম মিশাইবে। এইরূপ সংস্কৃত গাঢ় দুগ্ধ একমাস, প্রয়োজন হইলে ৬ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকাল গাঢ় দুগ্ধ সেবন করাইলে শিশুর রক্তবিকার (Scarvy) বা তাহার অস্থি কোমল ও বক্র হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই দোষের সংশোধন জন্য লেবুর রস মিশাইতে হয়।

হাতেপালা শিশুর আহার সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল যত্নপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত হইলে, শিশু প্রায় দন্তোদ্গম কাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত, যে খাদ্যে শিশুকে হাতেপালা আরম্ভ করিবে তাহার ফল বিশেষ করিয়া বুঝিয়া তবে তাহা বর্জ্জন বা অনুবর্ত্তন করিবে। অন্ততঃ একপক্ষকাল না দেখিয়া কোন খাদ্য বর্জ্জন করিবে না।

ছাগদুগ্ধ—ছাগদুগ্ধে প্রটিড্ এবং স্নেহ অধিক আছে। যদি বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ সহজে সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, এবং শিশুর পরিপাক শক্তি বলবতী থাকে তবে ছাগদুগ্ধ ব্যবহারে কোন বাধা নাই। ছাগদুগ্ধে ছানার ভাগ অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া গোদুগ্ধ অপেক্ষা সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে। গোদুগ্ধ যে প্রকার সংস্কৃত করিবার কথা বলা হইয়াছে ছাগদুগ্ধও সেইরূপে সংস্কৃত করিলে ছাগদুগ্ধের যে একপ্রকার বিশ্রী গন্ধ আছে তাহা অনুভূত হইবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যেথানে গোদুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইবেসেস্থলে অন্যান্য খাদ্য প্রদান করিবার পূর্ব্বে ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করিয়া দেখিবে। যদি কোন স্থলে নিতান্ত পক্ষে কোন ফুড ব্যবহার করাই আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে বিজ্ঞাপনদাতারা যাহাই বলুন না কেন নারীদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ ভিন্ন পৃথিবীতে এমন কোন খাদ্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দীর্ঘকাল নিরাপদে মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐসকল ফুডের কোনটী ব্যবহার করিলে হয়ত

কিছুদিন অস্থায়ীভাবে উহা মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধের প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু উহাদের ব্যবহারে যে বিপদের সম্ভাবনা তাহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৯ মাস বা একবৎসর পর্য্যন্ত উপরি লিখিত ভাবে আহার দিয়া ততঃপর একবৎসর কাল অর্থাৎ শিশুর দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছোট মাগুর মাছ সিদ্ধ ঈষৎ লবণাক্ত করিয়া দিনে একবার দিবে। অন্য খাদ্যের প্রতি শিশুর আগ্রহ এবং তাহা পরিপাকের শক্তি থাকিলে আলু সিদ্ধ, পোরের ভাত, সন্দেশ অতি অল্প ধরান যাইতে পারে। এখন পর্য্যন্ত কিন্তু গোদুগ্ধ প্রচুর দিতে হইবে—এ সকল সহকারী মাত্র। তিন হইতে ৪ চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু পোরের ভাত, রুটীর ছিল্কা, কাঁচা পেঁপের তরকারী, কাঁচ বেগুণ সিদ্ধ, যে কালের যে ফল হিতকর হইবে তাহা খাইতে দিবে। ক্রমে এই সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে দিয়া দুগ্ধের প্রাধান্য হ্রাস করাইতে হইবে।

শিশুকে প্রথম হইতে উত্তমরূপ চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করিতে অভ্যস্ত করিবে। ঘন ঘন খাওয়ার অভ্যাস ভাল নহে। একবার খাইয়া ভুক্তবস্তু সম্যক্ পরিপাক পাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভোজন করিলে কখনই কেহ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না।

শিশুকে লবণ, তিক্ত বস্তু খাওয়ান অভ্যাস করাইবে। এদেশের লোকের মত কোনও জাতি ইচ্ছা করিয়া তিক্তবস্তু ভোজন করে না—কিন্তু ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, তিক্তের প্রতি আমাদের স্বভাবতঃ একটা স্পৃহা আছে। আমাদের দেশে অনেক তিক্ত শাকসবজিও পাওয়া যায়, সেইগুলির কোনটী প্রত্যহ ঋতু অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া ভোজন করিলে বহুহিত সাধিত হয়। এই উদ্দেশে আমাদের দেশে আলুই ব্যবহৃত হইত। মিষ্ট বস্তু শর্করাদি ভোজনে শিশুর স্বাভাবিক লোভ থাকে সুতরাং ইহাকে প্রশ্রয় না দিয়া সংযত করিবার জন্যই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

কুমারতন্ত্র রচয়িতা।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ধন্বন্তরি।

গত আষাঢ় মাসের "ধন্বন্তরি" পত্রে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি মন্তব্য পূর্ণ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয় এই বিদ্যালয়ের কল্যাণ কামনায় চিন্তাশীল হইয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার ঐ সন্দর্ভে কয়েকটি ভুল কথা বাহির হওয়ায় তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি ঐ প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন—"(১) সাধারণতঃ যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক চিকিৎসা কৌশলে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাদের সকলের সহানুভূতি লাভের প্রয়াস পান নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অষ্টাঙ্গের

যে যে অঙ্গে যিনি পারদর্শী, অধ্যাপনায় তাঁহাদের সহায়তা লাভের আশা অতি অল্প।" চিকিৎসাকুশল ও দেশবাসীর নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকমণ্ডলীর সহানুভূতি লাভের প্রয়াস যে ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ করেন নাই—একথা ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয় কাহার নিকট শুনিয়াছেন বলিতে পারি না,—কিন্তু উহার মূলে যে আদৌ সত্যতা নাই—এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিব। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশের চিকিৎসাকুশল ও সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ মহাশয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থী বহুসময়ে তো হইয়াছেনই, তা' ছাড়া কি কলিকাতায় কি মফঃস্বলে যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখনো পরিগণিত হন নাই (অবশ্য চিকিৎসাকুশল নহেন—এ কথা আমরা বলিতে পারি না—কারণ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও অনেকে যে চিকিৎসাকুশল হইয়া থাকেন, ইহা অভ্রান্ত সত্য) তাঁহাদের নিকটও ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়া, তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া, যাঁহার যেরূপ শক্তি—তিনি সেইরূপে ইহার সাহায্যকারী হউন—এরূপ অনুরোধ—প্রতিষ্ঠাতৃগণ অনেক সময়ই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন।

ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া একদিন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শুভাগমন পূর্ব্বক ইহার পরিদর্শকমণ্ডলীর পুস্তক গুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, দেশের ছোট বড় সকল শ্রেণীর চিকিৎসক,—শুধু চিকিৎসক নহেন—অন্য সম্প্রদায়ের বহু লোককেও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য এবং সাহায্য লাভের জন্য বিদ্যালয়ে আনা হইয়াছে এবং এখনো তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং বৈদ্যজাতির মুখপত্র ধন্বন্তরিতে ওরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।

এই বিদ্যালয়ে বেতন লইয়া ছাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়—এজন্য ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—"ইহা জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার পরিপন্থী হইবে।" টাঙ্গাইল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ধন্বন্তরিতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—তখনই আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। জানি, অর্থ লইয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়ার রীতি কোনোকালে ছিল না, স্বীকার করি—এখনো কলিকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের নিকট কতকগুলি ছাত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা পায় কিনা জানি না—কিন্তু স্থান পাইয়া থাকে, তবে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে শুধু মামুলী শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্থ করাইলেই চলিবার উপায় নাই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাদানের জন্য এখানে শিক্ষাব্যপদেশেই যে বহুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়। শল্য চিকিৎসার জন্য তো অর্থব্যয় স্বতঃসিদ্ধ কথা, তা' ছাড়া দ্রব্যগুণের শিক্ষা পর্য্যন্তও এই বিদ্যালয়ে শুধু শ্লোক মুখস্থ করাইলেই চলিতে পারে না—দ্রব্যগুণ শিক্ষা দানের সময়েও প্রত্যেক দ্রব্যটি ছাত্রদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিদ্যালয় সংলগ্ন দাতব্য ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ও শল্য চিকিৎসার বিভাগ দুইটিও ছাত্রশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এ সকল ব্যাপারে যে পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়, তাহাতে কিছু কিছু

বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা না করিলে উপায় কি? মেডিকেল কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণেই এই বিদ্যালয়ে অ্যানাটমী, সার্জ্জারি, ফিজিওলজির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মেডিকেল কলেজে শুধু ডাক্তারি শিক্ষা প্রদত্ত হয়, কিন্তু অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা হয়, অর্থাৎ ডাক্তারি ও কবিরাজীর সমন্বয়ে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। জানি, বৈদ্য জাতির পক্ষে প্রথম প্রথম বেতন দিয়া চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অনেকেই অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অভিভাবকগণ যদি মেডিকেল কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন,—তাহা হইলে সামান্য বেতন ও কলিকাতায় অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতে রাজি হইবেননা কেন? তবে ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয়ের ইহাও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য, আমরা বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেও বহুসংখ্যক অবৈতনিক ছাত্রও এখানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এবার অবৈতনিকের আবেদন এত বেশী পাওয়া গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের পরিচালক বর্গকে তজ্জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছে।

"ধন্বন্তরি"র ৩য় মন্তব্য "বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি ছাত্রাবাস থাকা একান্ত প্রয়োজন, আমাদের ধারণা এ পর্য্যন্ত তাহার ব্যবস্থা হয় নাই, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা সঙ্গত ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

ধন্বন্তরি-সম্পাদকের মত একজন সকল বিষয়ের তথ্যান্বেষী সম্পাদক এরূপ ভুল ধারণা কেন যে করিলেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিনা। কারণ বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করা হইয়াছিল। ৪।১ নং মোহন বাগান লেনে সে ছাত্রাবাস বহুকাল অবস্থিত থাকার পর কলেজের সিলোনি ছাত্রেরা নানা অসুবিধার জন্য ঐ বাটী হইতে গত পূজার পর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের জন্য কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাসও লোপ পায়। কিন্তু তাহার পর ২৭।১এ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একখানি ত্রিতল বাটী উচ্চ ভাড়ায় এবং বহুদিনের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবার ১মং বার্ষিক শ্রেণীতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে এবং তাহারা ঐ ছাত্রাবাসেই অবস্থিতি করিতেছে।

ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয়ের ৪র্থ মন্তব্যের উত্তরে আমরা জানাইতেছি যে, এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন—তাহা অতি যুক্তি পূর্ণ। সৌভাগ্য ক্রমে এই বিদ্যালয়ে ভারতের নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে—এ অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সকল শ্রেণীর ছাত্রগণেরই যে অধ্যয়ন-সৌকর্য্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ সে কথা বিলক্ষণই বুঝিয়াছেন এবং তাহারই ফলে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ২টি "স্পেশাল ক্লাশ"ও খোলা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রগণকে ইংরাজীতে অভিজ্ঞ করিয়া লইলে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

আর একটি বিষম ভুলের সংবাদ ধন্বন্তরিতে বাহির হইয়াছে। ধন্বন্তরি সম্পাদক কলিকাতার কয়েক জন খ্যাতনামা কবিরাজের নাম করিয়া

বলিয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট যতগুলি শিক্ষার্থী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, গত চারি বৎসরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে সে পরিমাণ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কিন্তু ইহার উত্তরে ধন্বন্তরি সম্পাদকের নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি—গত চারি বৎসরের সমগ্র ছাত্রের হিসাবে প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান বর্ষে এক প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই যতগুলি ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে,—তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিলেই তাঁহার অনুমান অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য—ভুল ভ্রান্তি সকলেরই আছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ যেরূপ ভাবে এই বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য নহে—একথা কখনই বলা যায় না। তাঁহাদের ব্যবস্থায় দোষ থাকিতে পারে, তাঁহাদের বন্দোবস্তে ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া, ধন্বন্তরি সম্পাদকের মত প্রবীণ, বিচক্ষণ, স্বদেশ-সেবক, স্বজাতিবৎসল ও সহৃদয় ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করুন—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।
(সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সিন্ধিয়ার রাজমাতা।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা সিন্ধিয়ার (গোয়ালিয়ারের) মাতৃদেবী গত ২৩শে ভাদ্র প্রত্যূষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। এই উপলক্ষে ২৬শে ভাদ্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

চিকিৎসকের পরলোক।—গত ১৯শে ভাদ্র রাত্রি প্রায় ২টার সময় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় হৃদ্রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়াছি। তিনি বৈদ্য ব্যবসায়ের স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন।

চিকিৎসকের অভাব।—বাঙ্গালা দেশে রোগ বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা যে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হওয়া উচিত—একথা বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুরের মুখে আমরা অনেক সময় শুনিয়া আশ্বস্ত হইতেছি। ইহার জন্য ঢাকা সহরের মত বর্দ্ধমানেও মেডিকেল স্কুল স্থাপনার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শুধু বর্দ্ধমানে উহা স্থাপন করিলেই যে চিকিৎসকের অভাব

পূর্ণ হইবে না—ইহা সুনিশ্চিত,—বাঙ্গালা দেশে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করিতে হইলে, শুধু বর্দ্ধমানে নহে বাঙ্গালা দেশের তাবৎ প্রধান প্রধান স্থানেই ঐরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আগে যেমন ক্যাম্পবেল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার পুনঃ প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংপ্রতি বঙ্গেশ্বর ঢাকার মেডিকেল স্কুলে এই প্রসঙ্গ লইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন -"নানা কারণে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।" আমরা কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস, আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে, বাঙ্গালীর মাতৃ ভাষায় উহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে অনেক ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহা শিক্ষা করিয়া দেশের উপকারে সমর্থ হইবে।

শ্রীমতী বেসান্ত ও দেশীয় চিকিৎসা।—১৯১৭ খৃঃ অব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে শ্রীমতী বেসান্ত দেশীয় চিকিৎসার উন্নতিকল্পে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ,—"যখন ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলনে দেশের অভাব পূর্ণ হইতেছে না, এবং বহু শতাব্দীর পরীক্ষিত প্রাচীন কবিরাজি ও হাকিমী চিকিৎসায় অদ্যাপিও সুফল পাওয়া যাইতেছে, তখন সরকার হইতে এ চিকিৎসার সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় একদেশদর্শিতার কার্য্য করা হইতেছে। ডাক্তারি চিকিৎসায় অস্ত্র চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ, কিন্তু কবিরাজী ও হাকিমি চিকিৎসার ঔষধ প্রকরণ ডাক্তারি অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহে। অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়াও এ চিকিৎসা এখনও সম্যকরূপে জীবিত আছে, দেশের অনেকের এখনও এ চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা আছে।" শ্রীমতী এনি বেসান্ত—দেশের অনেকেই যে এ চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন বলিয়াছেন,—অনেক ক্ষেত্রে তাহা না হইয়া যে উপায় নাই, কারণ এমন অনেকগুলি রোগ আছে, যাহা ডাক্তারির অস্ত্র চিকিৎসার মত কবিরাজীতে 'একচেটিয়া' বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ফলকথা গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদিন আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানিকে সাহায্য লাভে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেও এখনও এ দুইটি মৃতকল্প প্রাচীন চিকিৎসাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা যাউক—ইহার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের সকরুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্লেগে মৃত্যু।—প্লেগ রোগে এ পর্য্যন্ত ছয় কোটী ভারতবাসী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

কলিকাতা—২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, হইতে কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও